নানা রসের ৯টি উপন্যাস

প্রথম খণ্ড

কামিনী প্রকাশালয় ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলি-৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রক ঃ
পারিজাত প্রিন্টার্স,
৭, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৬৭

সূচিপত্র

স্বর্গ কে না

আলোর ফুল

জগতে অনেক অসাধারণ ঘটনা ঘটে, এটা হয়তো তারই একটা উদাহরণ। নন্দিতা আর সুমন্তর কাহিনীর কথা বলছি।

প্রথম একদিন মাত্র ট্রামে একটু কাছাকাছি বসার সূত্রে দু জনে দু জনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল, আর সেই আকর্ষণের জোরে অনবরত আরও কাছাকাছি হবার চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত যে দুজনে একসূত্রে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল, এ ঘটনাকে আমি 'অসাধারণ' বলছি না। এ তো সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চলছে, দর্শন মাত্রেই প্রেম সঞ্চার, আর প্রেমের পরিণতি পরিণয়।

ওটা উল্লেখযোগ্য কথা নয়।

সুমন্ত যে একটি সদ্য তরুণ অধ্যাপক, আর নন্দিতা যে একটি সন্তানবতী বিধবা যুবতী, এ ঘটনাকেও এখন আর অঘটনের পর্যায়ে ফেলা চলে না, মাত্র বলা চলতে পারে ঘটনাচক্র। ঘরে-বাইরে পথে-ঘাটে এত তরুণী কুমারী মেয়ের ছড়াছড়ি থাকতে সুমন্ত প্রায় সমবয়সী এক বিধবা মহিলার প্রেমে পড়তে গেল কেন ভাবতে গেলে বলতে হয়—তা অমন যায়।

ওকেই ঘটনাচক্র বলে।

সমাজ আগে সব কিছুই বজ্রমুষ্টিতে আগলে রাখত। ভাগ্যের হাতের ইঁট খেয়ে একবার যদি কারো কপাল ভাঙত তো বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করত—'ব্যস আর নয়, তোমার সব খতম হয়ে গেছে। এর পর আর যদি তুমি পৃথিবীর আলো হাওয়ার দিকে তাকিয়েছ তো যাও—দূর হও। দূর হও সম্মান সম্ভ্রমের আসন থেকে, সংসারের কেন্দ্র থেকে।'

এখন আর তা হয় না।

এখন সমাজের অবস্থা বাড়ির পেনসহ-হয়ে-যাওয়া কর্তার মত। মুষ্টি শিথিল, কণ্ঠ ক্ষীণ। ঘোষণা করে কোন কিছু রায় দেবার সাহস নেই। আড়ালে আব্ডালে অসন্তোষ প্রকাশ আর ফিসফিসিয়ে সমালোচনা করা ছাড়া আর কিছু করে না সে।

'আইন' নামক সংসারের নতুন কর্তা, বুড়ো কর্তা 'সমাজে'র সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে! কাজেই সুমন্ত যে এত কুমারী কন্যার ছড়াছড়ি থাকতে বিধবা নন্দিতার দিকে তাকিয়েই আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না, সেটা এখন আর অসাধারণও নয়, অসম্ভবও নয়। এখন অমন অনেক হচ্ছে।

কপাল ভাঙলেই যে চিরকালের মতন মন ভাঙে না, এ সত্যটুকু এখন প্রকাশ করছে অনেকেই।

অদ্ভুত আর অসাধারণ বলে উল্লেখ করছিলাম ওদের পরবর্তী জীবনের—

কিন্তু তা হলে গোড়া থেকেই বলতে হয়। পরবর্তীর মূল শিকড় তো পূর্ববর্তীতেই।

দু জনে একই ট্রামে সেদিনের আগে আর কোনদিন উঠেছিল কি না ঈশ্বর জানেন। হয়তো উঠেছিল, একদিন কি অনেকদিন। হয়তো যেদিন যেদিন উঠেছিল নন্দিতার মুখটা ফেরানো ছিল ঠিক সুমন্তর চোখের উল্টো দিকে, হয়তো বা অনেকের ভিড়ে মুখটা চোখে পড়লেও চোখে পড়ে নি। কিন্তু সেদিন পড়ল।

সেদিন দু জনে বড় বেশী কাছাকাছি বসতে হয়েছিল। তাই দু জনে দু জনের দিকে স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে তাকিয়ে দেখল।

একজন দেখল ধবধবে ফর্সা মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, মাঝারি রং, লম্বাগড়ন, উজ্জ্বল মুখ, উল্টানো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা। আর একজন দেখল সরুপাড় সাদা শাড়ি, মিহি ব্লাউস, সোনালী রং, মাঝারী গড়ন, নীলচে চুল, চশমাহীন উজ্জ্বল নীলচে চোখ।

শুধু দেখল।

তাও বারবার নয়। বারবার দেখাটা অসভ্যতা, তবু কয়েকবারই দেখল। না দেখে পারল না বলেই দেখল।

দিন দুই পরে ঠিক ওই একই ট্রামে, প্রায় একই জায়গায় আবার বসতে হল দু জনকে কাছাকাছি। আজ দেখাটা আরও খুঁটিয়ে হল। একজন দেখল চুড়িদার পাঞ্জাবীর আগায় পোর্টফোলিও ধরা আঙ্গুলগুলোর লম্বাটে ছাঁদটি বড় সুন্দর। দেখল সেই আঙ্গুলের মধ্যের আঙ্গুলটায় যে সাধারণ চৌকো গড়নের সোনার আংটিটা ঝকঝক করছে, সেটা যেন আঙ্গুলের গুণেই অসাধারণত্ব লাভ করেছে। দেখল ঘড়ির ব্যাণ্ডটা শৌখিন, ঘড়িটা দামী।

আর একজন দেখল গলায় সুতোর মত সরু সোনার হারে যে একটা ঝিনুক বসানো পেণ্ডেন্ট গলার নিচে ঝুলছে, তার কিনারার সূক্ষ্ম সোনার বর্ডারটুকু গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় একাকার হয়ে গেছে।

দেখল একটা হাতে শুধু ঘড়ি, আর একটা হাতে ঝিরিঝিরি কাটা সরু একটা বালা। দেখল হাতের ব্যাগটা সাদা হলেও বেশ একটু বিশিষ্ট, আর সেই ব্যাগ-ধরা আঙ্গুল-কটি এত কমনীয় যে দেখলে মনে হয় না ওরা পৃথিবীর কোন কিছু মুঠিয়ে ধরতে এসেছে। যেন বলিষ্ঠ একখানি হাতের মধ্যে নিজেকে একেবারে শিথিল ভঙ্গীতে সমর্পণ করে দেবার জন্যেই ওই কমনীয় করপল্লবের সৃষ্টি।

দু জনের চেহারার মধ্যে খুঁৎ আছে অনেক, সেগুলো ঠিক ধরতে পারল না ওরা, অথবা ওদের চোখ। চোখেরা শুধু বারে বারে তাকাল।

পরদিনই আবার সেই ঘটনাচক্র।

আজ সুমন্ত একটু হাসল, 'রোজ এইসময় কোথায় যান?'

নন্দিতাও হাসল।

কোথায় যাই বলল না কিন্তু, শুধু বলল, 'আপনিও তো রোজ এই সময়!'—

তা এই সময় রোজ যে নন্দিতা চার বছরের মেয়েটাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরে, এ খবরটা অনেক দিন পর্যন্ত বলে নি সুমন্তকে।

কেন বলে নি নিজেই জানেনা সে।

সুমন্ত অধ্যাপক, সপ্তাহের সবদিনই যে ওর ক্লাস থাকে তা নয়, আর ঠিক একই সময়েও থাকে না। কাজেই প্রথম জোয়ারটা তেমন প্রবল হতে পেল না। আর জোয়ার এলেই ভেসে যাবে, এমন পারিপার্শ্বিকতাও তো নয় নন্দিতার।

সমাজ না হয় পেনসন নিয়েছে, লোকচক্ষু তো আর পেন্‌সন নেয় নি। সে চির অনলস। তা ছাড়া মস্ত শিকড়ের বাঁধন মিঠু। চার বছরের ওই মেয়েটা। বাপের সঙ্গে যার চোখোচোখি হয় নি। সে পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই তার বাপ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে গিয়েছিল।

তা জোয়ার প্রবল না হলেও নদীর পাড় ভাঙে বৈ কি! প্রতিদিনের ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় মাঝেমাঝে ধস নামে, তারপর পাড় ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম ধস নামল এক হঠাৎ নামা বৃষ্টির দিনে। সেদিন মিঠুর ছুটি, নন্দিতা কয়েকটা জামাকাপড় জিনিসপত্র কেনবার জন্যে বেরিয়েছিল, ফেরার সময় ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি। কোনখানটায় দাঁড়ালে মাথাটা না হোক, হাতের জিনিসগুলোও অন্তত বাঁচবে তাই দেখতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, হঠাৎ উজ্জ্বল একটি মুখের ওপর চোখ পড়ল। ভিজে গিয়ে খুশী মুখে চশমা খুলে তার জল ঝাড়ছে। নন্দিতাকে দেখে এগিয়ে এল।

'কী ব্যাপার। এখানে?' বলল সুমন্ত।

যেন এখানে এসে দাঁড়ানো নন্দিতার পক্ষে ভয়ানক একটা কিছু অদ্ভুত কাজ হয়েছে।

'এই যে—'

বেশী কথা বলল না নন্দিতা, শুধু হাতের জিনিসগুলো দেখাল।

'সওদা করতে! কিন্তু ভিজে যাচ্ছেন যে, চলুন চলুন ওই দিকটায়।' একটা স্টেশনারী দোকানের সামনের সিঁড়িটায় গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে।

'কী মুস্কিল দেখুন। বেরোলাম যখন, তখন—' বলল নন্দিতা।

সুমন্ত হেসে বলল, 'ঠিক জীবনের মত। যখন বেরোনো হয়েছে, তখন কে-ই বা জেনে রেখেছে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্র-বিদ্যুৎ আসবে!'

বৃষ্টির ছাট্ লাগছিল চোখে মুখে, পায়ের নিচের দিকে ছাটের প্রাবল্যে ভিজে যাচ্ছিল কাপড়ের প্রান্ত, জুতোর আগা। কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না বৃষ্টির শব্দে, তবু কথার উত্তর দিল নন্দিতা, 'আপনার কণ্ঠে এমন দার্শনিকের হতাশা কেন? আপনাকে দেখে তো মনে হয় না ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্র-বিদ্যুৎ কোন কিছুর খবর আপনি জানেন?'

'দার্শনিকেরা কি শুধুই ব্যক্তিগত কথা বলে? আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।'

'ব্যাখ্যাটা শুনতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু ভারী মুস্কিলে ফেললে তো, এত জোর জল এল!'...তারপর গলার স্বর নিচু করে বলল, 'দেখুন আমরা অপরের প্রতি কত উদাসীন। দোকানের কাউণ্টারে যিনি বসে আছেন তিনি ভদ্রলোক, খুব সম্ভব শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু এই যে শান্ত দুটি চোখ মেলে বসে বসে আমাদের দুরবস্থা দেখছেন এটা কি ভদ্রতার চিহ্ন? একবার বলে দেখলে তো পারতেন, বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন, উঠে এসে বসুন না!'

'বলতেন,' সুমন্ত একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'শুধু আপনি একা থাকলে বলতেন।'

'তা হলে ওঁর আমন্ত্রণ নিত কে?'

'না নেবার কি আছে?'

'সে আপনি বুঝবেন না।'

'আরে এ যে দাপট বেড়েই চলছে'—সুমন্ত বলে ওঠে, 'দোকানদার ভদ্রলোকের ভদ্রতাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠার আশাটা বোকামি হবে। চলুন কিছু কেনার ছুতো করে দোকানে ঢুকে পড়া যাক।'

'কি আর কেনবার দরকার?'

'দরকার কিছুই নেই হয়তো। কিন্তু কেনাটাই দরকার। যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে, ততক্ষণ আপনি প্রাণ ভরে দোকানের সমস্ত জিনিসের দর করবেন।'

'সমস্ত জিনিসের দর করব? কি বলে?'

'অন্য কিছু বলে নয়, কেবলমাত্র আপনি মহিলা বলে। অকারণ দোকানের সমস্ত জিনিসের দর করা মহিলাদের স্বধর্ম।'

'এ রকম মহিলা কত দেখেছেন?'

'দেখার চোখ থাকলে অনেক জনকে দেখতে হয় না।'

নন্দিতা একজন বাইরের লোকের কাছে সহসা এত প্রগল্ভ হয়ে উঠল কি করে? বিধবা হয়ে পর্যন্ত কথাবার্তা তো খুবই সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছিল সে!

স্থির শান্ত নম্র, মেয়েকে স্কুলে দিয়ে যায় নিয়ে যায়, শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে দু চারটি কথা বলে কি না বলে। যাবার সময় যদি বা মিঠুকে চালনা করতে দুটো কথা কয়, ফেরার সময় তো নির্বাক।

দৈবাৎ কোন চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বড়জোর সামান্য একটু হাসির স্বীকৃতি। তাও নিষ্প্রভ হাসি। কিন্তু সুমন্ত কী মন্ত্র পড়ল কে জানে! কথা কইতেই ইচ্ছে করছে, কথা কইতে ভাল লাগছে। কথা কইতে নেশা লাগছে। যেমন লাগত সেই কতদিন আগে।

তাই সুমন্তর কথার উত্তরে বলে ওঠে, 'সব মেয়েই কি এক ছাঁচের?'

'উঁহু, মোটেই না! আমার বক্তব্য "মেয়েলি মন" বলে যে একটা জিনিস আছে, তার একটা ছাঁচ আছে, এবং সব মেয়ের মধ্যেই অল্পবিস্তর ওজনে সেই মেয়েলি মনটি অবস্থিত আছে। কাজেই সেই বিশেষ জায়গায় সব মেয়েই এক।'

'ব্যাপারটা তর্কসাপেক্ষ।'

'তা হলে তর্কটা মুলতুবি রইল, এখন আপাতচিন্তা। চলুন দোকানে উঠেই পড়া যাক।'

বলে উঠে পড়ল সুমন্ত।

অগত্যা নন্দিতাও।

অথচ পিছু পিছু নন্দিতাকেও যে যেতেই হবে তার কোন মানে ছিল না।

সামান্যই পরিচয়।

কেউ কারো নামটাও জানে না।

জানে না কে বা কোথায় থাকে। কার বা কেমন ঘর-সংসার। শুধু মাঝে মাঝে পথ চলতে দেখা। দু-একটা অর্থহীন সাময়িক কথার আদান-প্রদান এই তো!

শুধু তো এইটুকু।

নন্দিতা অনায়াসেই বলতে পারত, 'থাক না বেশ আছি।' বলতে পারত, 'এই তো এখুনি বৃষ্টি কমে যাবে, চলে যাব বাড়ি।' বলতে পারত 'না না, কাজ আছে—দেরি করলে চলবে না।'

কিন্তু এসবের কিছুই সে বলল না।

নিয়তির অন্ধ আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে গেল সুমন্তর পিছু পিছু।

বিশেষ কিছু না। কয়েকটা চকোলেট, এক প্যাকেট কাজু বাদাম, সামান্য কিছু ডালমুট।

তবু ইচ্ছে করেই খানিকটা সময় ক্ষেপণ করল সুমন্ত—এটা ভাল হবে কি না, ওটা টাটকা হবে কি না—এই সব বৃথা প্রশ্নে।

নন্দিতা দাম দিতে চাইল, খুলল বটুয়ার মুখের বাঁধন, সুমন্ত শুধু দৃষ্টি দিয়েই ওর উদ্যত হাতখানা থামিয়ে দিল।

'বৃষ্টিটা কমল বোধ হয়।'

স্বগতোক্তি করে এগিয়ে এসে একবার দেখে নিল নন্দিতা, পরে বলল, 'মনে হচ্ছে কমেছে।'

'চলুন যাওয়াই যাক।'

বলে পথে নামল সুমন্ত।

পিছনে নন্দিতাও।

নেমেই সুমন্ত যেন হাতে ভগবান পেল।

সামনেই একখানা খালি ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি নেওয়া সঙ্গত কি না, নিলে দুটো মানুষের সমস্যার সমাধান হবে কি না, এসব আর মনে এল না সুমন্তর, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই—এই ট্যাক্সি!'

আশ্চর্য অঘটনই বলতে হবে, ট্যাক্সিড্রাইভার ডাক শুনে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল না, গাড়ির গতি থামিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

দরজাটা খুলে ধরে সুমন্ত বলল, 'উঠুন।'

নন্দিতার অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ়! 'উঠুন' মানে কি! এক গাড়িতে উঠবে কি!

না, কোন সন্দেহ এল না। মনে হল না লোকটা কুমতলববাজ, শুধু নিজের মধ্যে থেকে একটা বিপন্নভাব অনুভব করল।

অথচ দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। মাথার ওপর জোর বৃষ্টি, আর হাতের সামনে মাথার আচ্ছাদন. পথ চলার নিশ্চিন্ত আরামের বাহন!

'উঠবেন না?'

সুমন্তর গলায় প্রকাশ পেল না হৃদয়ে কোন ভাবের খেলা চলছে তার।

নন্দিতা ইতস্তত করে বলল, 'না—মানে, এই তো কাছেই বাড়ি, পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা।'

'গাড়িতে উঠে সে হিসেবটা করলেই ভাল হয় না কি? না কি সাহস হচ্ছে না?'

'কী যে বলেন!'

বলে ঝপ্ করে উঠে পড়ল নন্দিতা ট্যাক্সিতে।

'কোন্ দিকে বাড়ি?'

'মনোহরপুকুর রোড।'

'ও আচ্ছা,' বলে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে সুমন্ত মৃদু হেসে বলল, দেখছেন তো, হতভাগ্য পুরুষজাতি ভদ্রতা প্রকাশ করতে কেন নারাজ? উঃ কী ভয় আপনাদের!'

নন্দিতা আরক্ত হয়ে বলে, 'ভয় আবার কি, ভয় কেউ করে নি।'

'ভরসাও খুব দেখায় নি।'

'বাঃ অকারণ আপনি আমার জন্যে খরচা করবেন—'

সুমন্ত হেসে উঠে বলে, 'করলামই না হয়,—আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে!'

'আপনি এই বয়সে কি করে যে এত তত্ত্বজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন তাই ভাবি।'

হঠাৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলে বসল সুমন্ত, 'ভাবেন? আমাদের মত হতভাগ্যদের কথা ভাবেন? অপচয় করবার মত এত সময় আপনার আছে?'

'এমন অদ্ভুত কথা বলেন আপনি! আপনার সঙ্গে কতদিন দেখা হল, কিছু ভাবা যায় না আপনার সম্বন্ধে?...এই...এই যে এই রাস্তা!'

এত ঝঞ্ঝাট বাধানোর পর গাড়িতে চড়তে না চড়তেই বৃষ্টি থামল।

পুরনো গোছের একটা ছাইরঙা দোতলা বাড়ি, সামনে খানিকটা রোয়াক, আর তার কোলে কতকটা পোড়ো জমি।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে নন্দিতা দু হাত জোড় করে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'নমস্কাব! ধন্যবাদের জন্যে অনেক ধন্যবাদ!'

তবু তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠল না।

নন্দিতা একবার ওই দোতলা বাড়িটার দিকে তাকাল। সামনের সব জানলাগুলো বন্ধ, জলের হাত থেকে রেহাই পেতেই অবশ্য।

মৃদু হেসে বলল, 'উঠে পড়ুন রথে?'

সুমন্তও তেমনি হেসে বলল, 'কই বললেন না তো, দরজা থেকে ফিরে যাবেন? একটু বসে যান, ভিজে এসেছেন—এক পেয়ালা চা খেয়ে যান!'

কথা শেষ করা হল না, নন্দিতা তার সেই সোনালি-রঙা মুখের ওপর আঁকা নীলাভ চোখ দুটি বিষণ্ণ ধূসর করে বলল, 'বলার ভাগ্য কোথায়? বাড়ি কি আমার? আমাকে কি কোন সংসারের কর্ত্রী বলে মনে হচ্ছে?'

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল সুমন্ত। আস্তে বলল, 'ক্ষমা করবেন। ওজন বুঝে কথা বলার অভ্যাস আমার কম। নিন খান—' বলে হাতের প্যাকেটগুলো খপ্ করে নন্দিতার হাতে দিয়ে পালিয়ে এল।

দ্বিধা করবার সময় হল না। একজন ঢুকে গেল সেই পুরনো দোতলাটার কোন একটি প্রবেশপথে, সুমন্ত উঠে বসল গাড়িতে। কিন্তু দুটি মনের মধ্যে কেমন করে যেন একটা অদৃশ্য সেতু রচিত হয়ে গেল।

ধস্ নেমে খানিকটা ভাঙল।

দ্বিতীয়বার ধস্ নামল এক রোদ-ঝকঝকে আশ্বিনের সকালে।

মিঠুর ছুটি নয়, সুমন্তর ছুটি।

যথারীতি মিঠুকে স্কুলে পৌছে ফিরছে নন্দিতা, ট্রাম থেকে নেমে দেখা। 'রোজ কোথায় যান, আজ বলুন।'

বলল সুমন্ত পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে। যেন পথে দেখা হলেই পাশাপাশি হাঁটতেই হবে এমন কোন চুক্তি হয়েছে ওদের।

আর পথে দেখাটাই কি দৈবের ঘটনা?

অন্তত আজকের?

কিন্তু আজও নন্দিতা সে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এড়িয়ে গেল। হেসে বলল, 'আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার কোন চাকরি জুটেছে না কি আপনার?'

পথ কি ঘর মানে না সুমন্ত, বেশ বড় গলায় হেসে ওঠে, 'সে চাকরি জুটলে কি আর আপনার নিকটবর্তী হয়ে আপনাকেই প্রশ্নটা করতাম? তা হলে প্রশ্ন করতাম আপনার পাড়া-পড়শীকে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অনুসরণ করতাম আপনার পিছু পিছু।'

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অনুসরণ যে কেউ করছে—একা তাকে নয়, তাদের দু জনকেই—একথা অবশ্য স্বপ্নেও ধারণা করতে পারল না নন্দিতা। প্রসন্ন মুখে বলল, 'তা ঠিক।'

'হাঁটতে আপনার কষ্ট হয়?'

বলল সুমন্ত।

'না, কেন?' সচকিত হল নন্দিতা, 'কোথায় হাঁটতে?'

'এমনি পথে। একটু কম জনবহুল পথে। মানে আর কি—এমন পথে যেখানে পথের লোক অন্তত ধাক্কা মেরে ফেলে না দেয়। চলুন না একটু গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। এতদিন দেখা হল, কেউ কারুর নামই জানলাম না।'

সুমন্ত কি বাঙালী গেরস্ত-বাড়ির ছেলে নয়? সুমন্ত কি নন্দিতাকে দেখে বোঝে নি নন্দিতা বিধবা? একজন বিধবা যুবতীর কাছে এ প্রস্তাব করা সঙ্গত কি না, এ প্রশ্ন তার মনে ওঠা উচিত ছিল না কি?

আর নন্দিতা?

নন্দিতার পক্ষে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কি আরো অনেক বেশী অসঙ্গত হল না? স্থান কাল পাত্র সব কিছু বিস্মৃত হয়ে সে চলল কি করে তেমনি পাশাপাশি সেই অপেক্ষাকৃত জনবহুল রাস্তায়?

তা এমনি করেই তো জগতের এইসব সমাজ সংসার গুরুজন পরিজন অননুমোদিত ব্যাপারগুলো ঘটে। সবাই সব সময় স্থানকাল-পাত্রের হিসেব রেখে কাজ করলে, ভুবন জুড়ে যে ফাঁদ পাতা আছে, সে ফাঁদে পড়ত কে?

সেদিন সেই পথ চলতে চলতেই দুজনে দু জনের বিষয়ে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে ফেলল।

নন্দিতা জানল, সুমন্ত দু'বছর আগে এম-এ পাশ করে বেরিয়েছে, ইংরিজিতে অনার্স ছিল। মাস আষ্টেক হল একটি প্রতিষ্ঠাপন্ন বেসরকারী কলেজে লেক্চারারের পদ গ্রহণ করেছে।

না ছাত্রী নয়, ছাত্রই পড়ায়।

ছাত্রবৃন্দ সুমন্তর প্রতি একান্ত প্রসন্ন। যেটা নাকি এ রকম অল্পবয়সী অধ্যাপকদের ভাগ্যে প্রায় দুর্লভ। সুমন্তর মা নেই, বাপ নেই, দুজন দাদা-বৌদি আছেন। মেজদাদা আলাদা অন্যত্র আছেন। বড়দার কাছেই সুমন্তর স্থিতি।

বাড়িটা ভাড়াটে, কাজেই যে কোনদিন বড়দাও আলাদা হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারেন, অথবা সুমন্তকে অন্যত্র যাবার নির্দেশ দিতে পারেন। আপাতত দুটোর একটাও হয় নি, অতএব সুমন্ত চেনা হোটেলে থাকার মত নিশ্চিন্তই আছে।

জিনিসপত্র গেঞ্জি-তোয়ালে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রাখলে খোয়া যায় না, ময়লা কাপড়ের বাক্সে ময়লা জামাকাপড় ফেলে রাখলে, সাতদিন পরে সেগুলোকে ধোবার বাড়ি ঘুরে আসা ফরসা চেহারায় নিজের ঘরে পাওয়া যায়, সময়ে খেতে বসলে বাড়া ভাত, এবং অসময়ে খেতে এলে রাখা ভাত পাওয়া

যায় পুরো মাপে। এর চাইতে সুবিধে আর কি চাইতে পারে মানুষ? আর কি চাইবার থাকে?

পাতের পাশে নুন-লেবুর অভাব অথবা থালার পাশে জলের গ্লাসের অনুপস্থিতি—এসব ধর্তব্যের বিষয় নয়, ওসব ধরতে গেলে চলে না।

নন্দিতা যে 'আহা' বলল সেটা বাহুল্য বলা।

সুমন্ত জানল, ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে নন্দিতার বিয়ে হয়েছিল, আর বি-এ পাশের বছরেই সব চুকেবুকে গিয়েছিল। একেবারে আকস্মিক ব্যাপার। নন্দিতা যখন অনাগত শিশুর স্বপ্নে বিভোর, আর ভার-মন্থর দেহ নিয়ে পিত্রালয়ের বিশ্রামসুখে নিমজ্জমান, তখন সহসা তিনদিনের জ্বরে মারা গেল ওর স্বামী।

বাপের বাড়ি কলকাতার বাইরে।

ট্রেনে চড়ে আসার ব্যাপার। সেই অবস্থায় অর্ধমূর্ছিতের মত কে জানে কাদের সঙ্গে যেন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল আলোড়ন উঠল দেহের সমস্ত স্নায়ুশিরায়, মোচড় দিয়ে উঠল প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু। স্বামীর শেষ শয্যার ধারে যেতে পেল না নন্দিতা, নিজেরই শয্যা পাততে হল বাড়ির একটা অলক্ষিত কোণের ঘরে।

তাও জন্মাল এক মেয়ে!

ঘরে সংসারে কেউ তার মুখ দেখতে চাইল না, তার ন্যূনতম চাহিদাটুকুও বাড়াবাড়ি বলে মনে করতে লাগল সবাই। এবং সব হাঙ্গাম-হুজ্জুত মিটে যেতে সকন্যা নন্দিতাকে চালান করে দিল বাপের বাড়ি।

কিন্তু ভাগ্যের ফের এমনি, বছর না ঘুরতেই বাপও চলে গেলেন জামাইয়ের কাছে। অতঃপর বিধবা মা দুটি নাবালক ছেলে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি আশ্রয় নিতে গেলেন। সেখানে তো আর নন্দিতাকে চালান করা চলে না? সে যে তাঁদের পক্ষে 'শাকের ওপর বোঝার পাহাড়' হয়ে দাঁড়াবে।

অগত্যা আবার নন্দিতাকে সেই দাবিহীন দাবির আশ্রয়ে এসে পড়তে হল। তবে একটা সুবিধে এই, স্বামী কাজ করতেন ভাল, আর জীবনের ওই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই রীতিমত মোটা অঙ্কের একটি জীবনবীমা করে গিয়েছিলেন তিনি। সেই টাকাটার ষোল আনা দাবিদার হয়েছে নন্দিতাই।

এবারে এসে নন্দিতা দেখল খুব বেশী অপ্রসন্নতা জা ভাসুর বা শাশুড়ীর নেই। কারণ বোধ করি টাকার যে উপস্বত্বটা এতদিন অন্য সংসারে পড়ছিল, সেটা ওঁদের সংসারে পড়বে এই চেতনাটা এসেছে তখন। আর একটা কথা, মেয়েটা এত 'জলি' হয়ে উঠেছে ততদিনে যে, তাকে 'দূর ছাই' করা প্রায় অসম্ভব। শিশুর হাসিখুশি পথের শত্রুকে ফিরে চাইয়ে ছাড়ে, আর এ তো একেবারে রক্তের সম্পর্ক, নাড়ির সম্পর্ক!

অতএব শ্বশুর বাড়িতে বাস করা অসম্ভব হচ্ছে না।

চার বছর হওয়াতে সম্প্রতি মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে নন্দিতা, নিজে পৌছে দিয়ে আসে, ফেরার সময় বাড়ির চাকর কিছুটা সময় কাজের ছুটি করে নিয়ে আসে।

নন্দিতারও কোন অসুবিধে নেই, কারণ স্বামীর সংরক্ষিত টাকাটা তার হাতেই আসে। শাশুড়ীর একটা নিরামিষ হেঁসেল আছে, খাওয়ার সুবিধে মন্দ হয় না।

দুজনে দুজনের নামও জানল।

ওর নাম সুমন্ত মিত্র, এর নাম নন্দিতা মজুমদার।

নন্দিতার মেয়ের নাম তার ভাগ্য-বিবেচনায় সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়েছে 'ছায়া', কিন্তু ওই বুকচাপা শব্দটা দিয়ে সর্বদা মেয়েকে ডাকতে পারে না বলে নন্দিতা নিজে একা ডাকে 'মিঠু'। এই নামকরণ নিয়ে বাড়ির সকলে ব্যঙ্গহাসি হাসে, এ প্রশ্নও করে, ওই অপয়া মেয়েকে অমন মিষ্টিমধুর নামে ডাকতে পারে নন্দিতা কোন হৃদয় দিয়ে?

সুমন্ত বলল, 'ঈস্!' এর চাইতে বেশী কথা আর ঠিক এই ক্ষেত্রে ওর মুখ দিয়ে বেরোল না।

এত কথা জানতে খুব যে একটা দেরি হল তাও নয় কিন্তু। কোথা থেকে কোন্ কথায় এসে পড়ে পড়ে সবই কেমন বলা হয়ে গেল।

আশ্চর্যও বৈকি! নন্দিতার মেয়ে যে তার স্বামীর মৃত্যুর দিনে জন্মেছে, এই ভয়ানক তথ্যটুকু কবে কার কাছে নিজে মুখে বলেছে নন্দিতা?

আর সুমন্তই বা কবে কার কাছে বলে ফেলেছে, 'খেতে বসে জলটা ধারে কাছে কোথাও দেখতে না পেলেই এক-একদিন হঠাৎ মেজাজ ভারী খারাপ হয়ে যায়।'

'সেদিন আপনি আমাকে খাইয়েছিলেন, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব।'

বলল নন্দিতা। ফেরার মুখে।

সুমন্ত অবাক্ হয়ে বলল, 'আমি আপনাকে খাইয়েছিলাম! এত ভয়ানক সৌভাগ্য আমার হল কবে?'

'বাঃ বিষ্টির সময় সেই ভদ্রতাবোধহীন দোকানদারটার কাছে কত কি কিনলেন, সব তো আমাকে খাওয়ালেন।'

সুমন্ত একবার ওর ওই নীলাভ চোখের দিকে তাকিয়ে যেন আকাশের আশ্বাস পেল, তাই গভীর একটি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'সত্যি খেয়েছিলেন আপনি?'

এ চোখের সামনে যা-তা বলে ভাঁওতা দিতে অপরাধ বোধ আসে, নন্দিতা মাথা নীচু করে বলল, 'দেওয়া আর নেওয়াটাই তো শেষ কথা, খাওয়াটা বাহুল্যর মধ্যে।'

'বাহুল্যর বার্তাও পেতে ভাল লাগে।'

নন্দিতা মাথাটা তুলে মৃদু একটু হাসল, 'ওসব জিনিস যে খেতে হয়, ভুলেই গেছি।'

'ভুলেই গেছেন!'

'বাঃ বড হয়েছি না?'

'বড় হয়েছেন! আচ্ছা, মাঝে মাঝে একটু ছেলেমানুষ হতে ইচ্ছে হয় না আপনার?'

'কী মুশকিল, এ আবার একটা প্রশ্ন না কি?'

'এ একটা বড় প্রশ্ন। আসুন একটু ছেলেমানুষই হয়ে পড়া যাক, চকোলেট খাওয়া যাক।'

নন্দিতা ভুলে যাচ্ছে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাচ্ছে সে, ভুলে যাচ্ছে যা কিছু করছে সে এখন, অপরের চোখে সেটা বিরাট অশোভন। ভুলে গেছে বলেই বলে, 'বেশ চলুন। কিন্তু পূর্ব সর্তটা মনে আছে তো? আজকের ওই চকোলেটের বিপুল ব্যয়ভারটা আমার।'

'সর্তটা পালন করব, যদি আশ্বাস দেন ভবিষ্যতে আর একদিন আমার পালা আসবে।' এইভাবেই পাড়ের মাটি আলগা হয়।

ছোট ছোট ঢেউয়ের ধাক্কায়, এক-আধটা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আছড়ানিতে।

ওদিকে পুরনো সেই ছাইরঙা দোতলা বাড়িখানার মধ্যে এক প্রচণ্ড তরঙ্গের বিক্ষোভ।

এক-আধ দিন নয়, পর পর কয়েকদিন দেখেছেন মেজ নন্দাই অলক্ষ্য থেকে। এক-আধ দিন দেখায় কিছু বলতে আসতেন না তিনি, ভাবতেন কত সময় কত কারণে কার সঙ্গে কার কথা বলতে হয়!

কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই যদি কাউকে একই লোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখা যায়, অবশ্যই ধরে নিতে হবে কারণটা একটা বিশেষ কারণ।

তখনও ফেরে নি নন্দিতা, তাই সমালোচনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। শাশুড়ী আঁচল দিয়ে গরম চায়ের গ্লাসটা চেপে ধরে থেকেই ঠাণ্ডা করে ফেলে বলেন, 'আমি তোমাদের কদিনই বলছি না বড়বৌমা, ছোটবৌমাব আজকাল মেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছতে অনেকক্ষণ দেরি হচ্ছে! সেদিন মেয়ের ছুটি, তবু বিকেলবেলা কোথা থেকে এক-গা ভিজে বাড়ি ফিরল! হামেসাই এ রকম হচ্ছে দেখছি তো!'

বড়বৌমা শিথিল কণ্ঠে বলেন, 'কি করে বুঝব তা বলুন মা? যে কথা স্বপ্নের অগোচর, ধারণার অগোচর, জ্ঞানের অগোচর, সে কথা ভাবব কি করে? ঠাকুরজামাই নিজের চক্ষে দেখেছেন, তাও যেন বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

'পারবে বিশ্বাস করতে, যখন মাথায় মুগুর মারবেন তিনি!'

বলে চায়ের গ্লাসটা ঢকঢক করে শেষ করেন শাশুড়ী।

নন্দাই বলেন, 'আমার চোখে পড়েছে, আমি খবরটা দেওয়া উচিত বিবেচনায় দিয়েছি। ব্যস্‌, আর আমি এর মধ্যে নেই। তবে আমার মনে হয়, এতটা রাশ আলগা করা উচিত হয় নি আপনাদের! একা উনি মেয়ে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন, দোকানে জিনিস কিনতে যাচ্ছেন—এর মানে কি? কেন বাড়িতে আর লোক নেই?'

মেজ জা এটাকে কেন গায়ে পেতে নেন ঈশ্বর জানেন, তিনি ব্যাজার মুখে বলেন, 'লোক কেন থাকবে না? বারোশো বাহান্ন জন লোক আছে। তেমনি তাদের কাজও আছে। বসে কেউ থাকে না। কিন্তু একটু রাশ আলগা পেলেই রাশ খুলে বেপরোয়া বেরিয়ে যাবে, এমন মতি বুদ্ধি ভদ্রঘরের মেয়ে-বৌয়ের হবেই বা কেন, তাও তো জানি না। রাস্তায় তো আজকাল শতকরা নিরেনব্বইটা মেয়েই বেরোচ্ছে, বিধবা-টিধবাও আছে বৈ কি, তা বলে কি সবাই রাস্তার লোকের সঙ্গে ভাব করে চকোলেট আর কাজুবাদাম কিনে কিনে একসঙ্গে খাচ্ছে বেড়াচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে?'

'বাপ মুখপোড়া মরেই যে আমাকে আরো জ্বালিয়ে গেল,' শাশুড়ী কপালে ঘা মেরে বলেন, 'মরার ওপব খাঁড়ার ঘা দিয়ে গেল আমায়! এখন ওই বলা মুখ আর চলা পা কি করে বন্ধ করি আমি? কি কবে খাঁচায় পুরে ছেকল দিই তাকে?'

হঠাৎ মেজ ভাসুর দোতলা থেকে নেমে এসে বলেন, 'তোমরা তোমাদের আলোচনা থামাও। আসছেন তিনি, দেখতে পেলাম বারান্দা থেকে। এলোমেলো করে কিছু বলতে যাবাব দরকার নেই, মা তুমিও কিছু বলো না। যা বলবার দাদা বলবেন।'

দাদা!

যা বলবার দাদা বলবেন!

দাদার স্ত্রী বিপদ গনে বলেন, 'মেয়েমানুষ মেয়েমানুষে কথা, এর মধ্যে উনি আর কী বলবেন?'

'কথাটা নিছক মেয়েয় মেয়েয় কথার মত হালকা নয় বৌদি, এটা হচ্ছে বংশের কলঙ্ক আর কুলের পবিত্রতা অপবিত্রতার কথা। এ নিয়ে যা বলতে হবে একেবারে মোক্ষম করেই বলতে হবে। স্পষ্ট করে জানিযে দিতে হবে এসব বেয়াডাপনা আমাদের বাড়ি বসে চলবে না। অন্যত্র গিয়ে যা খুশি করুন গে।'

'বেয়াডাপনা বেহায়াপনা কোনখানে বসেই চলবে না,' শাশুড়ী কেঁদে ফেলে বলেন, 'আর কোথাও চলে গিয়ে যা খুশি করলেই কি বংশের মুখে চুনকালি কিছু কম পড়বে নিধু? তোবা ওর হাতে পায়ে ছেকল বেঁধে এখানেই ফেলে রাখ্‌। ভেবে দেখ্‌ ও কার বৌ, কার পুতবৌ!'

তাঁরা যখন ওই সব ভাবছেন, তখন নন্দিতা ভাবতে ভাবতে আসছে, এইভাবে কদিন চলবে? কদিন চলা সম্ভব? জীবনের ভবিষ্যৎ পথ একটা নির্ণয় করবার দিন কি আসে নি? তার শ্বশুরবাড়ির সংসাবটা নেহাৎ আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত আর অন্যের সম্পর্কে উদাসীন বলেই এখনো কেউ কিছু লক্ষ্য কবছে না।

লক্ষ্য পডলে কি আর রক্ষা রাখবে?

তা ছাড়া ওদের নন্দিতা ঠকাবেই বা কেন? নন্দিতা যে নিজের মন বুঝতে পারছে।

সংঘর্ষ উঠল সংসারে।

কিন্তু নন্দিতার এই মন বুঝতে পারা মনের সঙ্গে সংগ্রামটা জোরালো হয়ে উঠতে পারল না।

নন্দিতা অপরাধ অস্বীকার করল না, রাগ প্রকাশ করল না। শুধু মৃদু অথচ দৃঢভাবে বলল,'আমায় আপনারা ছেড়ে দিন!'

ছেড়ে দিন!

হাতে পায়ে ছেকল বেঁধে ফেলে রাখার পরিবর্তে একেবারে ছেড়ে দিন!

বড় জা বললেন, 'ছাড়ান পেয়ে কি করবি তুই তাই শুনি? ভুলে যাস্‌ নি গলায় একটা মেয়ে গাঁথা, ওকে গলায় নিয়ে কোন্‌ পথ খোলা তোর?'

মেজ জা মৃদু টিপ্পনি দিয়ে বলল, 'গলায় মেয়ে নিয়েও আবার ফুলশয্যে হয় আজকাল দিদি, হতে

বাধা নেই। ছাড়ান পেয়ে কি করবে ভেবে আকুল হচ্ছ কেন? বই কাগজই না হয় বেশী পড় না, দেশের আইন-কানুন কি আর জান না? বিয়ের আপিস তো খোলা আছে।'

তা মেজ জার কথা মিথ্যে প্রমাণিত হল না।

জা ভাসুর শাশুড়ী ননদের ছেড়ে দেওয়া না দেওয়া প্রশ্নটা ভেসেই গেল, বিয়ের আপিসেই গেল নন্দিতা।

তবে একটি মাত্র সুবুদ্ধির কাজ করল সে, নন্দিতা মজুমদার থেকে নন্দিতা মিত্র হবার আগে আইনবলে প্রাপ্ত মৃত অরুণ মজুমদারের জীবনবীমার টাকাগুলো অরুণ মজুমদারের মাতা সুনীতি মজুমদারের নামে দান করে গেল।

শাশুড়ী অবশ্য নিজে হাত পেতে দানপত্রটা নিলেন না, তবে বড় নাতিকে বললেন 'তুলে রাখ ভাল করে, বাবা এলে দেখাস্।'

বড় নাতির বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, 'এ টাকার কিছু ছায়ার বিয়ের জন্যে রেখে দিলে পারতেন ছোটবৌমা, এটা ওর বাপের টাকা।'

মেজ বৌ বড় ভাসুরের পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদু টিপ্পনি করল, 'ছায়ার এখন নতুন বাবা হচ্ছে, কত খাওয়াবে পরাবে, কত ভাল বিয়ে দেবে।'

'যা করবে তা জানতেই পাচ্ছি—' বলে বড় ভাসুর ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

তবু টাকাটা দিয়ে এইটুকু হল, হয়তো বা তাঁর নির্দেশেই হল, যাবার সময় নন্দিতাকে কেউ বিশেষ জ্বালাতন করল না।

নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘর থেকে পথে, আর পথ থেকে নিজের ঘরে আনাগোনা করতে লাগল সে। তারপর বিয়ের সপ্তাহখানেক আগে এক কলেজের সহপাঠিনীর কাছে গিয়ে উঠল। সহপাঠিনী বলল, 'ঠিক করছিস বেশ করছিস, জীবনের এখনও কত বাকী, কে তোকে দেখত? বিধবার সম্মান তো আর এখন কোন সংসারে নেই, মিথ্যে সম্মানের খোলস আঁকড়ে পড়ে থেকে লাথি ঝাঁটা খেয়ে কি হবে? যাদের সংসারে থাকবি, তাদেরও তো জ্বলুনি রে বাবা!'

সহপাঠিনীর স্বামী বললেন, 'আপনার শ্বশুরবাড়িকে উদার বলতে হবে।'

তা এ হচ্ছে সেই গোড়ার কথা।

বিয়ের আগে 'লাখ কথা'র মত।

লাখ কথা নইলে কোন বিয়েই হয় না।

বিয়ের কদিন আগে সুমন্ত উঠে পড়ে লেগে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে ফেলেছিল, আর তার এক বন্ধুর বৌদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওর দিকের ভার নিয়েছিলেন।

নিজের দাদা-বৌদি তো বলেছিলেন, 'চুলোয় যাও গোল্লায় যাও।' মেজদা মেজবৌদি শুনে একদিন দেখা করতে এসে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে আইবুড়ো মেয়ের এত আকাল পড়েছিল জানতাম না। শুধু বিধবা নয়, আবার 'সবৎসা'! ছি ছি!'

তা' এটা আর বিশদ বলার মত কথাই বা কি? এ ধরণের বিয়ে করে কে আর কবে কার আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়? 'ছি ছি' সম্বল করেই তো এ হেন দম্পতির সংসারে নামা।

প্রথম রাত্রিটায় মিঠু সেই সহপাঠিনীর বাড়িতেই থাকল। মানে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা হল। কিন্তু নন্দিতা চলে যেতেই সহপাঠিনী বিপদ গনল, মিঠু বিছানায় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত খেলনা পুতুল, ছবির সব বই ছড়িয়ে ফেললো।

কি হয়েছে?

কি হয়েছে?

মিঠু বলল, 'তোমরা কেন মিছে কথা বললে? কেন বললে মা নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে। মা তো বিয়ে করতে গেল।'

সহপাঠিনী স্তম্ভিত হল, বিব্রত হল, কিন্তু ভয়ানক একটা বিস্মিত হল না। ভাবল এতবড় মেয়ের কাছে কি আর এতখানি আগুন চেপে রাখা যায়? তা ছাড়া নন্দিতার শ্বশুরবাড়িতে নন্দিতার শুভানুধ্যায়ীর অভাব অবশ্যই ছিল না, আগুন তারা লাগিয়েই রেখেছে।

সহসা একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করল সে।

খপ্ করে মিঠুর ঠোটে একটা হাত চাপা দিয়ে সকৌতুকে বলে উঠল, 'এই এই চুপ চুপ, এখন ও কথা মুখে আনছিস কি? এখন কি বলতে আছে?'

মিঠু রেগে বলল, হ্যাঁ বলতে আছে।'

'না রে বাপু না, এখন বলতে নেই। মা আগে বিয়ে করে আসুক তখন বলিস। এখন বললে মা মরে যায়।'

মিঠু বলল, 'মা মরে যাক। মা বিয়ে করতে পাবে না।'

সহপাঠিনী বলল 'ছি ছি, ওই কথা বলছ? বিয়ে হলে মা কত গয়না পরবে, কত ফুল মাথায় দেবে, কেমন লাল শাড়ি পরবে, এ সব তোমার ভাল লাগে না?'

এসব যে মিঠুর ভাল লাগে না তা নয়।

সবাই গয়না পরে, লাল কাপড় পরে, মিঠুর মা শুধু ঠাকুমার মতন বিচ্ছিরি একটা কাপড় পরে, এটা মিঠুর কোন দিনই ভাল লাগত না, কিন্তু তার জন্যে বিয়েটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হবে কেন? মার কাছে কি টাকা নেই? মা কি দোকানে গিয়ে কিনতে পারে না?

'কিনে তোর মা কার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?' বলল সহপাঠিনী, 'এই তো আমি এক্ষুনি তোব মেসোমশাইয়ের গাড়ি চড়ে বেড়াতে যাব, তোর সেই বডজেঠি মেজজেঠি জেঠামশাইদের সঙ্গে বেড়াতে যায়, মাকে কে নিয়ে যাবে?'

মিঠু বলল, 'আমি নিয়ে যাব।'

'তুমি? বাঃ চমৎকার! রাস্তায় যদি বাঘ-ভালুক আসে, যদি চোর-ডাকাত আসে, যদি পুলিস আসে, মাকে কামড়ে দেয়, তুমি মারতে পারবে তাদের?'

মিঠু ঈষৎ বিমনা হয়ে বলল, 'বিয়ে করলে মা পারবে?'

'বাঃ মা পারবে কেন? সেই যার সঙ্গে বিয়ে হবে; যে তোমার বাবা হবে, সে সবাইকেই মারবে।'

কথাটা হঠাৎ মিঠুর মনঃপূত হল।

তার একটা বাবা না থাকাটা তার কাছে বিশেষ দুঃখজনক ছিল, হঠাৎ একটা বাবা পাওযাটাকে বেশ একটু লোভনীয়ই মনে হল যেন।

বলল, 'বাবা বিচ্ছিবী না ভাল?'

'ওমা শোন কথা, বাবা আবার কারুর বিচ্ছিরী হয়? খুবই ভাল।'

মনটা অনুকূল হল মিঠুর।

দ্বিতীয় দিনে মিঠুকে নিয়ে গেল ওরা।

সুমন্ত আর নন্দিতা!

মিঠু সম্পর্কে নতুন আর কোন প্রশ্ন উঠবে না, বিয়ের আগে সেসব কথা হয়ে গেছে।

নন্দিতা বলেছিল, 'তুমি ওকে সহ্য করতে পারবে তো?'

মনের অতলে ডুবুরি নামালে দেখা যেত সুমন্ত প্রথম যখন শুনেছিল নন্দিতার চার বছরের একটা মেয়ে আছে, সেদিন আচমকা একটু যেন অবাক হয়েছিল, আহত হয়ে যাওয়ার মত অবাক। কিন্তু সেটা নিতান্তই মনের অতলের ব্যাপার, বাইরের মন সভ্য মার্জিত হৃদয়বান।

তাই নন্দিতার এই প্রশ্নে সুমন্ত ক্ষুব্ধ ভাব দেখিয়েছিল, বলেছিল 'এমন বিশ্রী একটা প্রশ্ন করতে বাধল না তোমার?'

'আমার আবার বাধা! অবস্থাটাই কি খুব একটা সুশ্রী আমার? বল সহ্য করা শক্ত নয় কি?'

'আমার তো মনে হচ্ছে না শক্ত।'

'মনে হচ্ছে না?'

'নাঃ! এতটুকু একটা শিশুকে অসহ্য মনে করব, একথাটা উঠতে পারে তা ভাবতেই লজ্জা করছে নন্দিতা!'

নন্দিতা ওর কাঁধে মাথা রেখে বলেছিল, 'তুমি মহানুভব, তুমি মহানুভব!'

কিন্তু মনে মনে একবার বুঝি ভাবল—এ মন তুমি রাখতে পারবে তো?

কে জানে শুনে বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন কি না।

সহপাঠিনী মিঠুকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার সময় চুপি চুপি নন্দিতাকে গত রাত্রের কথা বলল, তার সঙ্গে নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথাটাও বলতে ছাড়ল না। আর বলে দিল, 'সুমন্তবাবুর যাতে ওর ওপর একটু মন মায়া পড়ে তার চেষ্টা করবি, কাছে কাছে এগিয়ে দিবি। একা নিজস্ব করে রাখতে যাসনি, তাতে ভবিষ্যতে খারাপ হবে।'

কিন্তু আশ্চর্য এই, এগিয়ে দেবার ক্লেশটুকু স্বীকার করতে হল না। নন্দিতাকে মিঠুর ওপর তার সৎ-বাপের মায়া পড়াবার কোন চেষ্টাই করতে হল না। মিঠু এত সাংঘাতিকভাবে সুমন্তকে ভজতে শুরু করল যে, মাঝে মাঝে নন্দিতারই অসহ্য হতে লাগল।

অনেক শূন্যতার মরুভূমি পার হয়ে পূর্ণ জলাশয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নন্দিতা, এখন যদি কেউ অনবরত সেই জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করতে আসে, শিশু বলেই কি তাকে সব সময় ভাল লাগে?

মিঠু তার একান্ত আপন ধন, একান্ত প্রাণের প্রাণ, তবু যখন তখনই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় নন্দিতার।

যেমন হয়তো সিনেমা যাচ্ছে ওরা, নন্দিতা ঝিকে বলে কয়ে মিঠুকে বুঝিয়ে প্রস্তুত হয়েছে, মিঠু সুমন্তর হাত ধরে ঝুলে পড়ল, 'আমি যাব বাবু আমি যাব।'

হ্যাঁ, এই 'বাবু' ডাকটা নন্দিতাই শিখিয়েছে। মিঠু প্রথমে মায়ের বান্ধবীর শিক্ষা অনুযায়ী সুমন্তকে 'বাবা' বলতে চেয়েছিল, সতেজে বলেছিল, 'হ্যাঁ ও আমার বাবা, মাসী বলেছে।' কিন্তু নন্দিতার যে কী আপত্তি হল তাতে!

যেন খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপার, এইভাবে বিরক্তির ধমক দিয়ে বলতে লাগল, 'কেন বাবা বলবে কেন? কেউ কি বাবা বলে ওকে? ওই তো খোকার মা বলে বাবু, নিমাই বলে বাবু, ধোবা বলে বাবু, জমাদার বলে বাবু—বলে কি না বল? তুমিও তাই বলবে। আর কোনদিন যেন শুনি না 'বাবা' ডাকছ।'

সুমন্ত শুনে বিব্রত হয়ে হেসে বলেছিল, 'সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য করে তুলছ কেন? ছেলেমানুষ যা খুশি বলে বলুক না।'

'নাঃ!'

'কেন বল তো?' একটু কৌতুক করে বলেছিল সুমন্ত, 'আমাকে ওই সম্ভ্রমের পোস্টটা দিতে আপত্তি?'

নীলচে চোখে বিদ্যুৎ শিখা হেনে নন্দিতা বলেছিল, 'আজ্ঞে না, কারণ অন্য।'

'শোনা যায় না?'

'না। সে একেবারে গোলকের গোপন কথা।'

তা গোপন কথাই বটে।

হৃদয়ের একান্ত কথা।

সুমন্তকে প্রথম 'বাবা' বলে সুমন্তর নিজের সন্তানই ডাকবে, এমনি একটু তুচ্ছ অথচ অটুট সংস্কার মনের মধ্যে কাজ করেছিল নন্দিতার।

বারে বারে মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে বাবু-ই বলতে শিখেছে মিঠু, কিন্তু খুব বেশী অসুবিধে তাতে হয় নি ওর। বাবুকে পেড়ে ফেলার ব্যাপারে সত্যিকার কন্যার চাইতে কম কিছু নয় সে।

কেমন করে কে জানে, যে মা ছিল মিঠুর একমাত্র আশ্রয়, সংসারের সকলের কাছে অনাদর আর

অবহেলা পাওয়া গুটিয়ে-থাকা মনটিকে কেবলমাত্র যে মায়ের কাছেই মেলে ধরত, সেই মাকে ছাপিয়ে বাবু-ই তার বেশী আপন হয়ে উঠেছে।

কাজেই হাত ধরে ঝুলে পড়ে আবদার জানাতে সে এখন মার থেকে বাবুকেই বেশী উপযুক্ত মনে করে।

'আমি যাব আমি যাব।'

তারস্বরে বলতে থাকে মিঠু।

'তুমি যাবে কি?' নন্দিতা বকে ওঠে, 'কি বললাম তোমায় এতক্ষণ? বললাম না খোকার মার কাছে দুধ খাবে, নিতাইয়ের কাছে রুটি খেয়ে নেবে, আমরা তোমার ঘুমের আগেই চলে আসব।'

'না আমি যাব!'

দু হাতে সুমন্তকে নরম দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মিঠু বলে, 'বাবু আমায় নিয়ে যাবে।'

সুমন্ত নন্দিতার দিকে চোখ তুলে বিপন্ন কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, 'এ ছাড়বে না।'

'ছাড়বে না মানে?'

নন্দিতা গায়ের জোরে ছাড়িয়ে নেয়, 'আবদারের প্রশ্রয় দিতে নেই।...মিঠু অবাধ্যতা কর না, খোকার মার কাছে চলে যাও।'

'না, আমি খোকার মার কাছে থাকব না, খোকাব মা বিচ্ছিরী পচা।...ও বাবু!

নন্দিতার ভয় অগ্রাহ্য করে মিঠুকে কোলে তুলে নেয সুমন্ত, বলে, 'পারা যাবে না নন্দিতা, এভাবে ফেলে গেলে গিয়ে মনে সুখ পাওয়া যাবে না।'

নন্দিতা হতাশভাবে বলে, 'এভাবে আবদারের প্রশ্রয় দিলে, ও তো ক্রমশ বাডিয়েই যাবে।'

'আহা তাই কি আর হয়? বড় হলে ঠিকই সেরে যাবে।'

অতএব মিঠুরই জয় হয়।

হয়তো বা খাওয়ার সময় সুমন্তর কাছে আছড়ে এসে পড়বে, 'আমি দুধরুটি খাব না, আমি লুচি দিয়ে আলুভাজা খাব।'

আবার সুপারিশ করতে হয় সুমন্তকে, 'যাকগে একদিন খাক না?'

'না না, ছোট বাচ্চাদের ঘি-তেল খাওযা ঠিক না।'

সুমন্ত হতাশভাবে বলে, 'ওই শোন মিঠু, তোমার মা-জননী বলছেন ছোট্ট বাচ্ছাদের লুচি দিয়ে আলুভাজা খেতে নেই।'

'হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ আছে,' মিঠু দুর্বার হয়ে ওঠে, 'আমি দুধরুটি খাব না, আমার বিচ্ছিরী লাগে।'

আবাব সুমন্তর সুপারিশ। এবার শুধু চোখের ইশারায়, 'একদিন খাক গে।'

নন্দিতা কঠিন সুরে বলল, 'একদিন খাওয়াটা কিছু না, কিছু ওই যে জেনে ফেলেছে বেয়াড়া আবদাব করতে পারলেই সব কিছু আদায় করা যায়, ওইটাই খারাপ। কই আগে তো এ রকম করত না।'

সুমন্ত মৃদু হেসে মিঠুর রেশম রেশম চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে বলে, 'তখন বেচারা পিতৃহীনা দুঃখিনী ছিল, সাহস করত না।'

নন্দিতা সহসা এসে পড়া হাসি গোপন করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'তা বটে, মনে ছিল না বটে, ওর একটি ভালবাসার অবতার সৎ-বাপ জুটেছে। কাজেই সাপের পাঁচ পা দেখবাব রাইট্ জন্মেছে ওর।'

কথার মোড় ঘুরে যায়।

সুমন্ত কপট গাম্ভীর্যে বলে, 'ভালবাসার অবতার, সে কথাটা কি মিথ্যে?'

নন্দিতা বাঁকা কটাক্ষে বলে, 'থাক, নিজের মহিমা-কীর্তনে আর কাজ নেই।'

তবু সব দিনই যে কথার মোড় ঘোরে তা নয়, কোন-কোন দিন নন্দিতা মেয়েকে বাধ্য আর সভ্য করে তোলবার জন্যে সমুচিত শাসন-শক্তি প্রয়োগ করে, সুমন্ত বিমর্ষ মুখে সরে যায়, চলে যায়, হয়তো বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু এটা একরকম, আর একরকম হচ্ছে রাত্রে। যেটা সত্যি বিরক্তিকর।

নন্দিতা চায় মেয়েকে সকাল সকাল খাইয়ে সকাল করে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে, যাতে নিজেরা ওরা যখন ঘুমোতে আসে, তখন যেন সুষুপ্তির গভীর স্তরে তলিয়ে থাকে চালাকচতুর বছর পাঁচেকের মেয়েটা।

নিজেদের মধ্যের কথা গল্প-হাসির আদান-প্রদান যেন সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছতে না পারে। নাড়া দিয়ে সচকিত করতে না পারে।

কিন্তু বেয়াড়া মেয়েটা রাতদুপুর পর্যন্ত জেগে থেকে গল্প শুনবে তার বাবুর কাছে!

আর সুমন্তও তেমনি, মিঠুর 'কি, কেন, কে, কি জন্যে, কবে, কোথায়, কখনে'র কন্টকবন ঠেলতে ঠেলতে গল্প যে এগোতেই পারছে না, সে খেয়াল থাকে না তার, নিখুঁৎভাবে উত্তর দিতে বসবে সেই প্রশ্ন শরজালের।

নন্দিতা ভুলে যায় নিজেই সে মেয়ের ওই অভ্যাসটি সৃষ্টি করিয়েছিল। রাতে শোবার সময় দশ-বিশটা গল্প না শুনলে ঘুম আসে না মিঠুর বরাবরই।

মনে পড়ে না এইজন্যে যে, অভ্যাসটা করিয়েছিল মিঠুর প্রয়োজনে ততটা না, যতটা নিজের প্রয়োজনে।

তখন নিজের তাপদগ্ধ মনের একমাত্র শান্তি আর সান্ত্বনা ছিল মিঠু। মিঠুর সেই অর্থহীন কি, কেন, কে, কোথায়, কবে, কখন সারাদিনের বহু বাঁকা-কথা-শোনা কানে মধুবর্ষণ করত।

এখন অবস্থা তা নয়।

এখন তাই মনে হয় সুমন্ত একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছে।

সেদিন মিঠু ঘুমোলে কথাটা তুলল নন্দিতা, 'আচ্ছা ওকে তুমি এত বাড়াবাড়ি আদর কর কেন বল তো? এ কি আমাকে প্লীজ করতে?'

সুমন্ত বোধ করি এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই শুনেই একটু থতমত খেল, তার পর আস্তে বলল, 'না নন্দিতা, এ রকম ধারণা করো না। বাড়াবাড়ি কি না জানি না, তবে আদর যা করি, তা তোমাকে প্লীজ করতে নয়, ওকে প্লীজ করতেও নয়, নিজেকে প্লীজ করতে।'

নন্দিতা ওর সেই সমর্পিতের মত কমনীয় আঙ্গুল কটি সুমন্তর হাতের ওপর রেখে মৃদু হেসে বলে, 'তুমি যে মনোবিজ্ঞানকে একেবারে পালটে দিচ্ছ!'

'কি জানি অত বুঝি না। একটা মিষ্টি শিশু, আগ্রহ আর ভালবাসা নিয়ে ছুটে আসে, তাকে রিফিউজ করা সম্ভব? মানুষ কি ভাইপো-ভাইঝিকে ভালবাসে না? ভাগ্নে-ভাগ্নীকে ভালবাসে না? ভালবাসে না বন্ধুর মেয়ে-ছেলেকে, পাড়ার বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের? ছোট ছেলেকে ভাল না বেসে কে থাকতে পারে?'

হঠাৎ সেই কমনীয় হাতটা দিয়ে সুমন্তর হাতখানায় একটু গভীর চাপ দিয়ে নন্দিতা মাথা নিচু করে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'এতটা রাখতে পারবে? এই তো আসছে নিজের—'

কথা শেষ করে না নন্দিতা, শুধু হাতটায় আরও গভীর চাপ দেয়।

কিন্তু সুমন্ত অধীর আগ্রহে আকুল হয়ে ওঠে। স্পষ্ট করে শুনতে চায় সে, নির্ভুল হতে চায়।

'সবটা বল নন্দিতা, থেমে যেও না—' নীচু করা মুখটা দু হাতে তুলে ধরে সুমন্ত, সেই ওর কাটা-ছাঁটা গড়নের সোনালিরঙ মুখটা।

হয়তো আর একটু স্পষ্ট হত নন্দিতা, নয়তো বা আর একটু অস্পষ্ট, যদি সুমন্তর মুখটা আসত নেমে, কিন্তু নামিয়ে আনতে যাওয়া মুখটা সুমন্ত ঝট্ করে সোজা করে নিয়েছে ততক্ষণে। কারণ ঠিক তক্ষুনি মিঠু জেগে উঠে একেবারে উঠে বসে বলছে, 'জল খাব।'

নন্দিতা কঠিন মুখে উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে মেয়ের হাতে দেয়, খাওয়া হলে গ্লাস ফেরত নিয়ে যথাস্থানে রাখে, তারপর একটিও কথা না বলে শুয়ে পড়ে।

অপরাধী যেন সুমন্তই।

তাই সে অপ্রতিভাবে বলে, 'শুয়ে পড় মিঠু, শুয়ে পড়। শীগগির ঘুমিয়ে পড়, তোমার মা-জননীর মাথা ধরেছে, কথা কয়ো না।'

মিঠু মা-জননী সম্পর্কে কিছুমাত্র সমীহ প্রকাশ না করে বলে ওঠে, 'গরম হচ্ছে!'

'গরম হচ্ছে?'

সুমন্ত উঠে পাখার জোর বাড়িয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতা উঠে একখানা চাদর টেনে আগাগোড়া ঢেকে শোয়।

অর্থাৎ তার শীত করছে।

সুমন্ত হেসে হালকা করে নিতে বলে, 'আচ্ছা ছেলেমানুষ তো! ওর কি কোন বুদ্ধি আছে?'

'আছে কি না কিছুদিন পরেই টের পাবে।'

বলে পাশ ফিরে শোয় নন্দিতা; এবং রায় দেবার ভঙ্গীতে বলে, 'কাল থেকে ওঘরে খোকার মার কাছে শোবে।'

ওঘর বলতে অবশ্য আধখানা ঘর। ফ্ল্যাট দেড়খানা ঘরের!

কিন্তু মিঠু তো নেহাৎ অবোধ শিশু নয়?

পরদিন পাশের ছোট্ট ঘরটায় ওর সরু ছোট্ট চৌকিটা নিয়ে যাবার চেষ্টা চলতেই কেঁদে রসাতল করে সে।

'আমি ওঘরে শোব না, আমি ওই বিচ্ছিরি ঘরে শোব না। খোকার মা কালো, খোকাব মার গায়ে গন্ধ।'

সুমন্ত পায়ে চটিটা গলিয়ে পালায়। •

অনেকক্ষণ পরে যখন ফেরে, কান পেতে শোনে কান্নার আওয়াজ উঠছে কি না। না, উঠছে না। অতএব সাহস করে ঢুকে পড়ে। দেখে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। সরু চৌকিটা পুরনো জায়গাতেই বিরাজমান এবং নন্দিতা ওই ভারী মেয়েটাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুমপাড়ানোর ভঙ্গীতে।

সুমন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, 'এই এই তুমি ওকে নিয়ে বেড়িও না! ওটা ঠিক হবে না।'

'আর ঠিক!' নন্দিতা মেয়ের পিঠে আস্তে হাত বুলিয়ে প্রশ্রয়ের সুরে বলে, 'মাথাই বেঠিক কবে দিচ্ছে।'

'তা হলে জুনিয়ারেরই জয়?'

সাহস পেয়ে হাসতে থাকে সুমন্ত।

'তা ছাড়া আর কি। এমন কান্না জুড়লে যে সর্দি হয়ে জ্বর এসে যাবাব জো! পাড়াব লোক যে কেন পুলিস ডাকে নি তাই ভাবছি।'

'ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে!'

'পড়াই সম্ভব। কাহিল হয়ে গেছে তো।'

'দাও আমাকে দাও, তুমি আর বেশীক্ষণ এভাবে—'

'থাক্। থাক্ আর একটু।'

নন্দিতার গলাটা বুঝি অনুতাপে স্নিগ্ধ শোনায়। ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'থাকুক এ কটা মাস, এরপর তো শুতেই হবে ওঘরে।'

হ্যাঁ শুতেই হল বৈ কি।

নইলে জায়গায় কুলোবে কি করে? ঘরের জায়গা আর মায়ের মনের জায়গা দুইযেব ভাগ বসাতে যে আর একজন এল!

কাঁচের পুতুলের মত ছোট্ট সুন্দর মিষ্টি!

এ আরও দামী, মিঠুর থেকে অনেক দামী।

বিশ্বজগৎ সেই কথাই বলে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে এই দামী জিনিসটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকে নন্দিতা। এ যেন নন্দিতার প্রথম মাতৃত্ব।

সত্যিকার প্রথম মাতৃত্বের স্মৃতি তো একটা বীভৎস বিভীষিকা!

কতদিন তাকাতে পারে নি মিঠুর দিকে, আতঙ্কে আর দুরপনেয় এক লজ্জায় আদর করতে পারে

নি কতদিন। কলঙ্কিতা জননীর অবৈধ সন্তানকে নিয়ে যেমন ভয় লজ্জা যন্ত্রণা, অনুভূতি ছিল মিঠুকে *নিয়ে।*

অনেকটা বড় হতে, তবে কিছুটা সহজ হয়ে এসেছিল। কিন্তু এ তো তা নয়। এ যেন তার সুখের কমল।

এ জন্মাবার খবর পাওয়া মাত্র সুমন্ত ছুটে গেল হাসপাতালে—আনন্দ আর উৎকণ্ঠা, সুখ আর ভয় মুখে ভরে, বুকে ভরে।

কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলেছিল সুমন্ত, 'যা চেয়েছিলে তাই পেয়েছ তো?

'পাবই তো!'

নিতান্ত ক্লান্ত মুখেও কৌতুকের হাসি হেসেছিল নন্দিতা। তারপর বলেছিল, 'কেন তুমি খুসি হওনি?'

সুমন্ত আস্তে ওর নীলচে রুক্ষু রুক্ষু চুলগুলোর ওপর একটু হাত রেখে পরম স্নেহের স্বরে বলেছিল, 'মেয়ে হলেও কিছু কম খুশি হতাম না।'

নন্দিতা অভিমানের অভিযোগ কণ্ঠে এনে বলেছিল, 'মেয়ে তো আছেই।'

'তা অবশ্য।'

'দেখেছ?'

'দূর! ছুটে আসছি আগে ছেলের মাকে দেখবার জন্যে। দেখতে যাব! নার্সেরা যেটাকে দেখাবে সেটাকেই নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করব।' হাসতে থাকে সুমন্ত।

'যাঃ অসভ্য!'

ক্লান্ত নন্দিতা চোখ বুজেছিল একটুকু। তারপর চোখ খুলে আদরে আর সুখে মেশা গলায় বলে উঠেছিল, 'এ তোমাকে বাবা বলবে।'

সুমন্তকে যে বাবা বলবে, সুমন্তর ঘরেই তার আসন প্রতিষ্ঠিত হল। মিঠুকে যেতেই হল পাশের ঘরে।

নতুন মানুষটা ছোট্ট, কিন্তু তাব আসবাব উপকরণ যে অগাধ।

কোথায় ধরবে মিঠুকে?

প্রথম রাতটা মিঠু টের পায় নি।

টের পায় নি কখন তার খাটখানা ওঘরে চালান হয়ে গেছে, আর কখন তার জায়গায় একটা দাঁড়ানো বেতের দোলনা বসানো হয়েছে।

ও যখন ইস্কুলে ছিল তখনই হয়েছে এসব।

রাত্রে ঘুমন্ত তুলে দিয়ে আসা হয়েছিল মিঠুকে, সকালে ছুটে এসে এঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। সামনেই যা দৃশ্য, সেটা দৃষ্টি-সুখকর নয়।

ওর থমকে দাঁড়ানো দেখে নন্দিতার মনটা কেমন করে উঠল, সস্নেহে ডাকল, 'আয় মিঠু, সোনা আয়। দেখ কেমন ভাইটি! ছোট ছোট পা, ছোট ছোট আঙ্গুল!'

কিন্তু মিঠু এই সস্নেহ ডাকে সাড়া না দিয়ে 'ছাই ভাই,' বলে ছুটে পালিয়ে গেল।

আর আশ্চর্য, নন্দিতার স্নেহকোমল কণ্ঠ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল, 'হিংসুটি খলুটি! যেমন বাড়ির মেয়ে তেমনি স্বভাব!'

মিঠুর বাড়িব কথা তুলে মন্তব্য নন্দিতাব এই প্রথম।

মিঠু যে অন্য আর এক বাড়ির এ কথা কি এতদিন মনে ছিল না নন্দিতার? মনে পড়ল এ বাড়ির মালিককে যে বাবা বলবে তাকে দেখে?

নন্দিতার মন্তব্যে সুমন্তর মনটা ধ্বক্ করে উঠল, আহা বেচারা রে! এ কদিন আশ্বাস ছিল মা হাসপাতালে গেছে, কাল আসবে। কিন্তু মা যে চিরকালের মত আর একজনের হয়ে আসবে, এ কথা তো জানত না।

'মিঠু মিঠু, শোন শোন—' বলে তার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল সুমন্ত। নন্দিতা আবার ভাবল বড্ড বাড়াবাড়ি করছে সুমন্ত, নিজের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখবারও সময় নেই বাবুর, চাড়ও নেই। চললেন সতাতো মেয়ের মান ভাঙাতে। ভাবল, যা রয় সয় তাই ভাল।

ভাবল, মিঠুকে নন্দিতার চাইতে কিছু আর সুমন্তর বেশী ভালবাসা সম্ভব নয়, এ এক ধরণের আদিখ্যেতা!

কোলের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখল।

মোম দিয়ে গড়া একটি মায়ার পুতুল! একে বুকের মধ্যে ভরে রাখলেও বুঝি তৃপ্তি হয় না, আরো নিবিড় করে নিতে ইচ্ছে করে। মিঠুকে নিয়ে ঠিক এমন অনুভূতি বুঝি আসেনি কোন দিন।

আবার ভাবল, না না, মিঠু তার দুঃখ-সাগর ছেঁচা ধন, মিঠু তার প্রথম সন্তান, মিঠুকে সে ভালবাসে না নাকি! তা বলে শাসন করতে হবে না, শিক্ষা দিতে হবে না? স্নেহে অন্ধ হতে হবে?

'খোকা কোথায় ছিল বাবু?'

চুপি চুপি প্রশ্ন করে মিঠু।

সুমন্ত ওর চুলের গোছা নেড়ে দিয়ে বলে, 'তোমার মা-জননীর বুকের ভেতর।'

'সেখানেই থাকল না কেন? বেরিয়ে এল কেন?'

'তোমার সঙ্গে খেলা করবে বলে।'

মিঠু একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'খেলতে আমার ভাল লাগে না।'

সুমন্ত হেসে বলে, 'আরে বোকা মেয়ে, খেলতে ভাল লাগে না? তবে তোর কি ভাল লাগে শুনি?'

'পড়তে। তুমি আমায় পড়াও বাবু!'

কোথা থেকে খুঁজে আনে ওর রংচঙে ছবিদার বইগুলো। আগে যে গুলোয় হাত দিতে বললেই স্রেফ লুকিয়ে ফেলত মিঠু। স্বচ্ছন্দে বলত, 'খুঁজে পাচ্ছি না।'

আজ বোধ করি এই পড়া আর পড়ানোর সূত্র দিয়ে একজনকে অন্ততঃ বাঁধতে চায়।

ঘরে আর ইদানীং আসতে চায় না মিঠু, বাইরের ছোট্ট বারান্দাটুকুই তার পীঠস্থান। যেখানে নন্দিতা আর সুমন্তর জন্যে দুটি সৌখিন বেতের মোড়া পাতা থাকে। সন্ধ্যার অবসরে এখানে বসত তারা নিয়মিত।

পুত্র গরবে গরবিনী নন্দিতার আর এখন ফুসরৎ হয় না সেভাবে এসে বসতে। সারাক্ষণই বুঝি কাজ তার।

সুমন্ত মাঝে মাঝে বলে, 'ওকে 'খোকার মার' কাছে দাও না?'

নন্দিতা মুচকে হেসে বলে, 'খোকার মার কাছেই তো আছে।'

'হুঁ। লজিকের জ্ঞান পুরোপুরি! না শোন, ওরা বুড়োসুড়ো মানুষ, ছোট বাচ্চা মানুষ করাব ব্যাপারটা বোঝে ভাল।'

'কী যে বল!' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নন্দিতা—'স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন চেতনা আছে ওদের?'

'তা পুরনোটাকে যে তুমি একেবারে আমলই দিচ্ছ না!'

'তুমি তো তার সে অভাব পুষিয়ে দিচ্ছ'—বলে একটু ভ্রুভঙ্গী করে নন্দিতা, 'দেখ দিকি কী চমৎকার ঠোঁটটা, কি চমৎকার আঙ্গুলগুলো!'

খোকার কচি ঠোঁটটার ওপর একটি আঙ্গুল রাখে নন্দিতা।

সুমন্তরই কি মনটা সরস হয়ে ওঠে না অপূর্ব এক স্নেহসুধায়?

আত্মজ!

একেবারে আত্মার আত্মীয়! দেহের অংশ, বংশের ধারক, সুমন্তর আকৃতি, প্রকৃতি, প্রাণসত্তা, শোণিতধারা, সব কিছুর বাহক। ছেলেকে আদরে ভরিয়ে দেয় সুমন্ত, আর বুকে তুলে নিয়ে ভাবে—তা নন্দিতা ভুল বলে না। মেয়ে আর ছেলে অনেক তফাৎ বৈ কি! কন্যা আদরের, পুত্র সম্ভ্রমের! কন্যা খেলার পুতুল, পুত্র গৃহদেবতা! কন্যার মধ্যে নিজের বিকাশ কোথায়?

আর সুমন্তর খেলাঘরে যে মেয়েটি পুতুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে?

সে তো সুমন্তর কেউই নয়।

স্কুলে তার নাম লেখানো আছে ছায়া মজুমদার। সুমন্ত মিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

তবু মেয়েটাকে ভালবাসে সুমন্ত, বড় বেশী ভালবাসে। মেয়েটা যে নিজের থেকে এসে ধরা দিয়েছে। যেন সুমন্তর ছায়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

বারান্দার সেই মোড়াটায় নন্দিতা আর আজকাল বসে না, বসে মিঠু, আর ডাকাডাকি করে, 'ও বাবু, এস না। বিচ্ছিরী বিচ্ছিরী গরম ঘরে বসে তুমি কি করছ?'

নন্দিতা স্নেহে কৌতুকে বলে, 'ওঃ দ্রাক্ষাফল অম্ল! ঘরটা এখন বিচ্ছিরী হল! আয় মিঠু এখানে আয়, সবাই মিলে গল্প করি।'

মিঠু অনমনীয় স্বরে বলে, 'না!'

'কেন, 'না' কেন? আয় না ছোট্ট ভাইটিকে কোলে দেব!'

'না'।

'মিঠু মিঠুয়া, তুই বুঝি আমাকে আর ভালবাসিস না?'

'না!'

'না? তুই আমাকে ভালবাসিস না?'

'কেন বাসব? তুমি তো ওই বিচ্ছিরী পুঁচকেটার মা।'

নন্দিতার কৌতুক-হাস্যমণ্ডিত মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'আমি বলি বলে তুমি 'ইয়ে' কর, দেখতে পাচ্ছ দিনদিন কী রকম হিংসুটে হয়ে যাচ্ছে মিঠু?'

'ছোট বাচ্চারা ওরকম হয়। ওটা হিংসে নয়, অভিমান।'

'এতই বা কিসের অভিমান? এই তো মেজদির—' একটু ঢোক গিলে বলে নন্দিতা, 'মনোহরপুকুরে মেজদির কথা বলছি—প্রত্যেক বছরে একটি করে 'ইসু', কই এরকম মান-অভিমান তো দেখি নি ছেলেমেয়েদের।'

সুমন্ত হেসে ফেলে বলে, 'তাদের বোধ হয় গা সহা হয়ে গেছে।' একটু থেমে আবার হেসে বলে, 'মনোহরপুকুরের জন্যে মন কেমন করে তো?'

'হ্যাঁ করে! বলেছি তোমায়!' বলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে আবার হেসে ফেলে নন্দিতা, 'ছোট বাচ্চাগুলোর জন্যে একটু-আধটু না করে তা নয়!'

'মিঠুরও হয়তো করে!' সুমন্ত বলে, 'সেখানে তোমার ওই দিদিদের প্রতি বছরের 'ইসু'র ফলে সঙ্গী-সংখ্যা তো কম ছিল না ওর? এখানে বেচারার একটিও বন্ধু নেই।'

নন্দিতা মৃদু হেসে বলে, 'তুমি তো রয়েছ।'

'ছোটদের বন্ধু হওয়া কি অত সহজ? অনেক বড় না হতে পারলে ছোটদের বন্ধু হওয়া যায় না।' সুমন্ত বলে।

নন্দিতা কি বলতে যাচ্ছিল, সহসা সুমন্ত ছুটে চলে যায় মিঠুর ডুকরে কেঁদে ওঠার শব্দে। নন্দিতাও গেল।

'কী হল রে মিঠু, কী হল?'

'আরে কি হয়েছে তাই বল্ না?'

কিন্তু মিঠু কিছুই বলে না, শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এই অহেতুক কান্নাটাকে ভোলানোর চেষ্টায় একেবারে ব্যর্থ হয়ে নন্দিতা 'শয়তান কোথাকার' বলে মেয়ের গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে চলে যায়।

আর জীবনে এই প্রথম মায়ের কাছে মার খেয়ে মিঠু একেবারে আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে। আড়ষ্ট হয়ে থাকে সুমন্তও এই অহেতুক নিষ্ঠুরতায়।

মিঠুর কচি গালের ওপর যে নীল নীল শিরাগুলো ফুটে ওঠে, সেগুলোকে নন্দিতার নীলচে চোখের

বিদ্যুতের মত মনে হয় সুমন্তর।

বারেবারে সেই অনেকদিন আগে ট্রামগাড়িতে দেখা কমনীয় একখানি করপল্লবের ছবি ভেসে ওঠে সুমন্তর চোখের সামনে।

তারপর সে করপল্লব কত অজস্রবার দেখল, অহরহ দেখছে, তবু সেই প্রথম দেখাটাই মনে পড়তে থাকে। মনে পড়ে আর মনে হয়, কোমলতা কমনীয়তা এ কথাগুলো কি তবে অর্থহীন?

কিন্তু নন্দিতারও আজকাল প্রায়ই যখন তখন সেই আগের কথা মনে পড়ে।

ট্রামগাড়িতে শুধু চোখ তুলে দেখা, বৃষ্টির দিনে আচমকা এক ট্যাক্সিতে চড়ে বুকের কাঁপুনি, রোদে ঝকঝকে সকালে স্থান কাল পাত্র ভুলে নিরালা রাস্তায় যত ইচ্ছে হেঁটে হেঁটে বেড়ানো। মনে পড়ে আর মনে হয়—সেই বুঝি ভাল ছিল। সেই বুঝি ছিল সবচেয়ে সুখের দিন, সোনার দিন!

মনে হয় সুমন্তর চোখের সে দৃষ্টি কোথায় বুঝি হারিয়ে গেছে। সেই আবেগে বিহ্বল, প্রত্যাশায় উজ্জ্বল!

সেদিনটা আবার ফিরে আসে না? আসতে পারে না?

আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মনোহরপুকুর রোডের ছাইরঙা পুরনো দোতলা বাড়িটা, ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় চোখ বুজতে ইচ্ছে করে।

সুমন্তর চোখের পলাতক দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় নতুন করে মোহিনী হয়ে উঠতে চায় নন্দিতা। নীল চোখে কালো কাজলের রেখা টানে, কবরীতে রজনীগন্ধার মালা জড়ায়, দেহবল্লরীতে লাল সিল্কের শাড়ি জড়িয়ে অগ্নিশিখার মত জ্বলতে থাকে।

কিন্তু সুমন্ত কি নন্দিতার মোহিনী মূর্তিতে ভুলেছিল?

'খোকার দিকে তুমি ফিরেও তাকাও না', নন্দিতা অভিমানে মধুর হয়ে বলে, 'মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি এই খোকাটারই তুমি সৎ-বাপ।'

সুমন্ত মৃদু হেসে বলে, 'আর আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি মিঠুটার তুমি সৎ-মা।'

সুর কেটে যায়, নন্দিতা তীক্ষ্ণ সুরে বলে—'কেন মিঠুর প্রতি সৎমা-জনোচিত কি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে?'

'এই সেরেছে! ঠাট্টায় রেগে উঠছ, লক্ষণ তো ভাল না। সন্দেহ হচ্ছে নন্দিতা, তোমার লিভার ফাংশন ভাল যাচ্ছে না।'

নন্দিতা ওর সেই ঝকঝকে দাঁতের হাসিতে আর ভোলে না এখন, ক্রুদ্ধস্বরে বলে, 'মোটেই ঠাট্টা না, আমি দেখছি তোমার আজকাল একটা ধারণা হয়েছে, মিঠুকে আমি দেখতে পারি না।'

'আহা তাই কখনো ধারণা করতে পারি? তবে একথা ঠিক, ওর ওপর নজরটা ঠিক মত রাখা হচ্ছে না আর আজকাল।'

'একটা মানুষ তো দুটো হতে পারে না?' নন্দিতা বিরক্ত স্বরে বলে, 'আর একটা অসহায় জীব আমার ভরসাতেই আছে তা ভুলে যেও না।'

সুমন্ত তবু হার স্বীকার করে না, বরং বলে ওঠে, 'সেই অসহায় জীবটা নেহাৎই একটা জীবমাত্র, তার-মন নামক পদার্থটার বালাই এখনও হয় নি। তাকে সময়ে খানিকটা গিলিয়ে দিতে পারলেই তো মিটে গেল তার চাহিদা! মনওলা মানুষটার মনের দিকে তাকানো বেশী দরকার।'

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে নন্দিতা, বলে বসে, 'চিরকালের প্রবাদটা ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়? মনে রেখো—মার চেয়ে দরদটা হাস্যকর।'

সুমন্তর চির-উজ্জ্বল মুখটা কি একটু মলিন হয়ে যায়? হয়তো হয়, হয়তো হয়ও না। তবু কথা সে সমান হেসেই বলে, 'ও থিয়োরি আমি মানি না। মানবিকতা বলে একটা জিনিস আছে, সেটা ছক্‌বাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।'

এমনি ছোটখাটো সংঘর্ষ, টুকরো-টাকরা ঘাত প্রতিঘাতে প্রায়ই বাষ্প জমে ওঠে দু জনের মধ্যে।

সব থেকে বিরক্তিকর লাগে নন্দিতার, মিঠুকে পাশের ঘরে রাখা নিয়ে সুমন্তর বাড়াবাড়ি ভাবালুতা। সুমন্তর চোখের নীরব দৃষ্টিতে, সামান্য একটু আক্ষেপোক্তিতে, ধরা পড়ে যায় সেই ভাবালু মনের অভিযোগ!

কেন, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে মা-বাপের কাছছাড়া হয়ে শোয় না? এই তো ছ বছর বয়েস হয়ে গেল মিঠুর, নেহাত কিছু বাচ্ছা নয়। মনোহরপুকুরের মেজদির ছেলেমেয়েগুলো একটু বড় হলেই তো ঠাকুমার ঘরে গিয়ে শোয়।

সভ্যতা ভব্যতা আধুনিকতা কিছুই যেন নেই সুমন্তর, আছে খালি খানিকটা মেয়েলী মায়া। যেটা অর্থহীন।

সেদিন অমনি বলল, 'রাত্রে মিঠুটা শুতে যাবার সময় এমন বেচারীর মত এ ঘরের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে যায়, দেখলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

আর একদিন বলল, 'একটা বড় ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট খুঁজছি, যাতে একটা ঘরে সকলে মিলে শোয়া যায়।'

খোকাটা হয়ে যে এ ঘরের জায়গা জুড়েছে, সেটাই যেন মস্ত এক অপরাধ।

খোকনের সম্পর্কিত ব্যাপারে নন্দিতার বাঘিনীর মনোভাব।

একা ওকে শুইয়ে রেখে নাইতে খেতে গিয়েও স্বস্তি নেই যেন। ঝি 'খোকার মাকে' বসিয়ে রেখে যায় এবং কড়া হুকুম দেয়, 'মিঠুর কোলে টোলে দিও না যেন।'

খোকার মা বলে, 'মিঠুর তো ভাইকে নেবার জন্যে বয়ে যাচ্ছে। আমি তো কত বলি, চল দেখি তো ভাইটি কেমন হাসছে খেলছে, হাত পা নাড়ছে, মেয়ে তোমার মা যেন কাঠ-গোঁয়ার, খালি বলবে, ভাই বিচ্ছিরী, ভাই পচা। বুড়োদের মতন আবার নিশ্বেস ফেলে।'

'তা ফেলবে বৈ কি!' মনে মনে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে যায় নন্দিতা। 'অপয়া লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! জন্মাবার আগেই আমার সব সুখ খেয়ে তবে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, আবার এখন এটুকুর ওপর বিষ নিশ্বাস ফেলছে। একবার স্বামীর নাম ঘুচিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে, আবার স্বামীর ভালবাসাটুকু কেড়ে নিচ্ছে আমার!'

সুমন্ত যদি মিঠুর সম্পর্কে উদাসীন হত, তা হলেই বুঝি মিঠুর পক্ষে ভাল হত।

খোকার দিকে মিঠু কেমন করে যেন তাকায়!

এই চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না নন্দিতা। মিঠুর চোখের দৃষ্টিটা ঠিক যেন ওর মনোহরপুকুরের ঠাকুমার মত। ওই রকম দৃষ্টিতে তিনি এক-এক সময় তাকিয়ে থাকতেন মিঠুর দিকে, দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত নন্দিতার।

এখনও সহসা মিঠুর দৃষ্টি দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়।

অমন যে লাবণ্য, সব যেন ঝরে পড়েছে মেয়ের মনের আগুনে আগুনে।

কি তবে করবে নন্দিতা? ওকেই খুব করে আদর করবে? খোকাকে ভাসিয়ে দিয়ে ওকে নিয়েই মাতবে? খোকা জন্মাবার আগে পর্যন্ত যেমন মিঠুর নাওয়া খাওয়া স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে সারাক্ষণ ব্যাপৃত থাকত তেমনি থাকবে?

কর্তব্য নির্ধারণ কবতে থাকে নন্দিতা মনে মনে, হয়তো বা পুরনো সুরে কাছে ডাকেও, কিন্তু মিঠু নিজেই যেন দূরে সবে গেছে।

তার পর একদিন ঘটল সেই অঘটন।

মানে নন্দিতা যেটাকে অঘটন ভাবল। ভয়ঙ্কর একটা গুরুত্ব দিল নন্দিতা জিনিসটাকে। অথচ যে কেউ যদি শোনে, বলবে, 'এর চাইতে স্বাভাবিক ঘটনা আর কি আছে?'

ব্যাপারটা এই, বিকেলের দিকে নন্দিতা কোথায় যেন গিয়েছিল ছেলে নিয়ে। মাঝে মাঝে ছেলেকে ওজন করাতে যায়, হয়তো সেখানে, হয়তো বা সেই সহপাঠিনীর বাড়ি।

ফিরল সন্ধ্যায়।

রিকশ করে ফিরতে হয়েছে, ছেলে ঘুমিয়ে গেছে।

এদিকে সুমন্তও বেরিয়েছিল মিঠুকে নিয়ে, ঝি খোকার মা একা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত রয়েছে বলে। কিন্তু নন্দিতার আগেই সুমন্তকে ফিরতে হয়েছে, ঘুমিয়ে গেছে মিঠুও। রাত দশটা পর্যন্ত যে মেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সাধ্যপক্ষে বিছানায় যেতে চায় না, সে মেয়ের পক্ষে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক। নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়া মেয়েটাকে দেখে মায়া হল সুমন্তর—এক্ষুনি ওকে ওর খোকার মার ঘরের নিরানন্দ বিছানায়

নির্বাসন দিতে প্রাণ চাইল না। আস্তে শুইয়ে দিল খোকনের বিছানাটায়। নিজে বসে বই পড়তে লাগল পাশে চেয়ারে।

নন্দিতা ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে করে সিঁড়িতে উঠে, হাঁপিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকেই খোকনের বিছানা দখলিত দেখে খুব যেন অঘটন ঘটনা ঘটেছে এইভাবে ব্যস্ত আর বিরক্তস্বরে বলে ওঠে, 'এর মানে? ও আবার এক্ষুনি ঘুমিয়েছে কি করতে? এ বিছানাতেই বা কেন?... খোকার মা! খোকার মা!'

'খোকার মা শোয়ায় নি, আমি বেড়িয়ে ফিরে—থাক্ ওকে ডাকতে হবে না, আমি তুলে দিচ্ছি।'

মিঠুকে তুলে ওঘরে শুইয়ে দিয়ে আসে সুমন্ত।

খোকনকে শুইয়ে দিয়ে নন্দিতা হাঁপিয়ে বলে—'বাবাঃ ঘুমন্ত ছেলে নিয়ে—'

হাত ব্যথা হওয়ার কথাটা বলতে গিয়ে থেমে যায় নন্দিতা, নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে মায়েদের মতই। কারণ খোকনটি ভারীসারী হয়ে উঠেছে যথেষ্ট। 'হাত ব্যথা' কথার মধ্যে পাছে তার ইঙ্গিত ধরা পড়ে।

'মিঠু আবার ঘুমুল কখন? খেয়েছে?'

'না কখন আর খেল?'

'খুব হেঁটেছে বুঝি?' ছেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে নন্দিতা। সুমন্ত বলে, 'না মোটেই না, আজ তো গাড়ি চড়ে বেড়িয়ে এল।'

'গাড়ি চড়ে? কোথায় এ অভিযান?'

হেসেই বলল নন্দিতা।

কিন্তু উত্তর শুনে আর হাসিমুখ থাকল না।

সুমন্ত বলল, 'পরেশনাথের মন্দির দেখিয়ে আনলাম।'

নন্দিতার মুখটা থমথমে হয়ে উঠল, 'ওঃ। অতটা ট্যাক্সি খরচ করে শুধু মিঠুকে বেড়িয়ে আনা হল! এ সংকল্পটা আগে প্রকাশ করলে আমি না হয় ওখানে যেতাম না। খোকাটা গাড়ী চড়তে কী ভালই বাসে!'

সুমন্ত গম্ভীরভাবে বলে, 'সংকল্পটা আগে হয় নি।'

'তা হলে হল বোধ করি আমার নিষ্ঠুরতা দর্শনে। সপত্নীকন্যাকে ফেলে রেখে নিজের ছেলেটিকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম!' বিদ্রূপের সঙ্গে বলল নন্দিতা।

'তোমার আচরণটা প্রায় সেই রকমই।' সুমন্ত ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'মিঠু একটু এ বিছানায় শুয়েছে বলে তুমি এমন আর্তনাদ করে উঠলে, যেন মনে হল বিছানায় একটা সাপব্যাঙ কিছু উঠেছে।'

নন্দিতা বলে, 'ওঃ দোষটা আমারই হল! বাইরে খেলা করে আসা জামা পরে ছোটদের সঙ্গে মাখামাখি, তাদের বিছানায় শোওয়া, কত অস্বাস্থ্যকর তা জান?'

'না জানি না। বাঙালী গেরস্থ ঘরে দু-পাঁচ ভাইবোন একই বিছানায় শোয়, কি হয় তাতে?'

'কি হয় তাতে!' নন্দিতা বিদ্রূপে মুখ কুঁচকে বলে, 'চমৎকার! আর কিছু বলার নেই আমার।'

'সত্যিই আর কিছু বলার নেই,' সুমন্ত বলে, 'কারণ ওটা তোমার আসল বক্তব্য ছিল না।'

'তবে আসলটা কি ছিল?'

'থাক্, বলে আর কি হবে? কিন্তু নন্দিতা, জেনো ভালবাসার তীব্রতা কোন পক্ষেরই কল্যাণকর নয়। না নিজের, না ভালবাসার পাত্রের।'

'তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ!' বলে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে নন্দিতা।

খানিক পরে খোকার মা ডাক দেয়, 'মা, মিঠু তো খায় নি!'

'ডেকে খাওয়াও না'—নন্দিতা বিরক্তভাবে বলে, 'একদিন নিজে থেকে কিছু করতে পার না? আমি বাড়ি নেই, ব্যস মেয়ে না খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে!'

খোকার মা বলে ওঠে, 'ডাকাডাকি তো করলাম, মেয়ে সাড়া দিল না। গায়ে হাত দিয়ে দেখছি গা যেন গরম গরম।'

'তোমার মাথাটাই গরম!' বলে উঠে পড়ে নন্দিতা, কিন্তু ওঘরে গিয়ে মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মিঠুর।

তার মানে জ্বর হওয়াতেই মিঠু অসময়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তার মানেই জ্বরগায়ে খোকনের বিছানা বালিশে শুয়েছে। যে বিছানায় খোকন এখন শুয়ে আছে।

'মেয়েকে আদর করে খুব গাড়ির হাওয়া লাগাও—' সুমন্তকে পেড়ে ফেলবার সুযোগ পেয়ে যেন খুশী হয়ে ওঠে নন্দিতা, 'জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে।'

সুমন্ত আস্তে ওঘরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মিঠুর মাথার কাছে। এই তো ক'ঘণ্টা আগে কত খেলল, কত লাফাল! কী হল হঠাৎ?

কিন্তু শুধুই কি জ্বর?

পরদিন সকালে মাথা ঘুরে গেল নন্দিতার। শুধু জ্বর নয়, মিঠুর সর্বাঙ্গে হাম বেরিয়েছে।

তার মানে সেই হাম নিয়েই খোকনের বিছানায় শুয়েছে!

তার ওপর আবার মস্ত যন্ত্রণা, জ্বরে ছটফটিয়ে মিঠু খালি 'মা মা' করছে। কই এখন তো 'বাবু বাবু' ডাক নেই?

মনে মনে একটা উল্লাস অনুভব করে নন্দিতা, কিন্তু যন্ত্রণাও কম নয়। সে যে একটা নেহাত শিশুর মা, মাতৃদুগ্ধেই যে শিশুর প্রাণ। কোন্ সাহসে তবে নন্দিতা সংক্রামক রোগীর কাছে এসে বসবে? তাকে কাছে টেনে নেবে, বুকে টেনে নেবে?

ডাক্তারও তো মানা করে গেছে নন্দিতাকে ওঘরে ঢুকতে। অথচ ওর ওই 'মা' ডাকে প্রাণটা ফেটে যেতে থাকে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নন্দিতা ছলছল চোখে কাতর কণ্ঠে বলে, 'এই যে মা আমি! এই এখানে আছি। ডাক্তারবাবু আমায় ওঘরে যেতে মানা করেছে সোনা! তুমি ভাল হয়ে ওঠ, কত কোলে করব।'

মিঠু লাল লাল চোখ মেলে তাকায় আর বলে, 'তুমি বাতাস কর।'

সুমন্ত বলে, 'এই যে লক্ষ্মী মেয়ে, আমি বাতাস করছি।'

মিঠু চোখ বুজে পাশ ফিরে শোয়।

আর নন্দিতা?

তার যে শাঁখের করাত!

সে চোখভর্তি জল নিয়েও খোকনকে আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তার গায়ে কিছু বেরোল কিনা। মিঠুর ঘরে না ঢুকলেও বার বার কার্বলিক সাবান দিয়ে হাত ধোয়।

কিন্তু সাবধানেই কি সব আটকানো যায়?

মিঠুর যেদিন জ্বর ছেড়েছে, একটু ভালর দিকে গেছে, নন্দিতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্নেহকোমল স্বরে প্রশ্ন করছে, 'মিঠু মিঠু, আজ কী খেতে ইচ্ছে করছে রে?'

ঠিক সেই সময় খোকনের কান্না শোনা গেল। অর্থাৎ ঘুম ভেঙেছে তার।

নন্দিতা চঞ্চল হয়ে বলে, 'কই বললি না মিঠু?'

হঠাৎ মিঠু বিছানায় উঠে বসে।

রোগের ক্ষীণ কণ্ঠ তীব্রতায় চিলের মত করে তুলে বলে, 'না বলব না! কেন বলব তোমাকে? তুমি কি আমাকে ভালবাস?'

খোকার কান্না তীব্র হয়ে উঠেছে, তবু নন্দিতা ম্লানভাবে বলে, 'আমি তোকে ভালবাসি না?'

'না না, তুমি তো আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ, তুমি তো খোকনের মা!'

নীল আকাশের অতল স্নিগ্ধতায় নীল বিদ্যুৎ শিখা জ্বলে ওঠে।

আর কিছু নয়, সুমন্তর কুশিক্ষা।

উঃ কি বিষকন্যা মেয়েই তার জন্মেছিল যে সবটা গ্রাস করতে চায়! বাপের কাছে খোকনের যেটুকু প্রাপ্য পাওনা সেটুকু সে পেল না ওই মেয়ের নজরে নজরে।

রোগা মেয়ের ওপর যে মমতা এসেছিল, উপে যায় তা, তীব্রস্বরে বলে ওঠে নন্দিতা, 'ঠিক আছে, শুধু খোকনের মা আমি! বেশ করেছি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। ঢুকবও না তোর ঘরে। ডাকছিস কেন তবে 'মা মা' করে?'

বলে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে যায়।

কারণ খোকনের কান্না তখন প্রবল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু রাত্রে ঘুমের অবসরে খোকনের যে এইসব কাণ্ড হয়ে আছে, তা তো ভোরবেলায় ওঠার সময় দেখে নি নন্দিতা?

এ কী! এ কী!

যা ভেবেছিল তাই হল?

আর কিছু নয়, সেই সেদিনের ছোঁয়াচ! হাম নিয়েই তো খোকনের বালিশে শুয়েছিল লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে। সব খাবে ও নন্দিতার, সব খাবে।

খোকনের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

খোকনের সর্বাঙ্গ লাল টকটকে।

সুমন্ত গিয়েছিল ফল কিনতে। নিয়ে এসে দেখল মিঠু শুয়ে শুয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

আবার কি হল!

'কি হয়েছে রে মিঠু, কি হয়েছে?'

মিঠুর কান্না থামতে চায় না।

রোগা মেয়ে, এ কি বিপদ! সুমন্ত বলে, 'আরে বাবা, হল কি তাই বল্।'

'মা বলেছে আমার মা থাকবে না, শুধু খোকনের মা হবে।'

সুমন্ত অবাক হয়ে যায়, হতাশ হয়ে যায়। ক্লান্ত স্বরে বলে, 'কখন বলল মা একথা?'

'এখন! বলল, বেশ করেছি তোকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। বলল, ঢুকব না তোর ঘরে। বলল 'মা মা' করে ডাকিস কেন?'

সুমন্ত ফলের ঠোঙাটা খুলতে থাকে আস্তে আস্তে।

কতকগুলো ছাড়ানো পানিফল প্লেটে করে মেয়ের সামনে ধরে দিয়ে সুমন্ত এঘরে এসে দাঁড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতা যেন ফেটে পড়ে, 'হয়েছে, এইবার তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়েছে? খোকাকেও রোগে ধরেছে!'

'আমাদের মনস্কামনা!'

কষ্টে উচ্চারণ করে আড়ষ্ট সুমন্ত।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার আর তোমার মেয়ের! অবাক হচ্ছ কেন? খোকন তো তোমাদের চক্ষুশূল, ও এসে জায়গা জুড়েছে, ওর জন্যে তোমার সোহাগের পুতুল ঘরছাড়া হয়েছে, ও না বাঁচলেই বা কি—'

সুমন্ত এবার কথা বলে, স্বভাব-বহির্ভূত চেঁচিয়েই বলে, 'কি বকছ পাগলের মত?'

নন্দিতা যদি হঠাৎ কেঁদে ফেলত, যদি ছেলের ভাবনায় ভেঙে পড়ত, তা হলে বদলে যেত নাটকের বাকী অংশটা।

সুমন্ত এই ভীরু জননী-হৃদয়কে ভরিয়ে দিত স্নেহ দিয়ে সাহস দিয়ে। ছেলের জন্য তৎপর হয়ে উঠে ডাক্তার আনতে যেত, উৎকণ্ঠিত পিতৃহৃদয় নিয়ে রাত জাগত বসে বসে, আর সেই পথ দিয়ে প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘাত-প্রতিঘাতের গ্লানি মুছে গিয়ে নতুন করে ভাস্বর হয়ে উঠত তাদের প্রেম। ভুল ধারণা মুছে ফেলে মিঠুকে আবার অবোধ শিশু ভাবতে শিখত নন্দিতা, মিঠুর অভিমানকে স্নেহে কৌতুকে সহ্য করে নিত।

হয়তো সুমন্ত যোগাড় করে ফেলত একটা বড় ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট, যে ঘরে মিঠুকেও কুলতো।

সেই বড় ঘরে মনও বড় হয়ে যেত হয়তো—নন্দিতার, মিঠুর। ছায়া মজুমদার আর খোকন মিত্তিরকে নিয়ে একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলত সুমন্ত আর নন্দিতা।

কিন্তু নন্দিতা কাঁদল না, নন্দিতা ভেঙে পড়ল না!

নন্দিতা পক্ষিমাতা নয়, ব্যাঘ্রীমাতা।

হয়তো ঘর ভেঙে অনেক দুঃখের সাগর সাঁতরে এসে আবার ঘর পেয়েছে বলেই সে ঘর ফের হারাবার ভয়ে এত প্রখর হয়ে উঠেছে নন্দিতা।

তাই নন্দিতার কটা কটা নীলচে চুলগুলো সাপের ফণার মত দুলে উঠল, নীলাভ মণি দুটো হঠাৎ জ্বেলে দেওয়া নীল বাল্‌বের মত ঝলসে উঠল, আর কণ্ঠ ঝলসে উঠল আগুনের মত, 'পাগল আমি সাধে হই নি! চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি ওই মজুমদার গুষ্টির মেয়ের বিষাক্ত নিশ্বাসে আমার সব যাবে!'

'দেখতে পাচ্ছ? বাঃ চমৎকার দিব্য দৃষ্টি তো তোমার!' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুমন্ত।

আর বেরিয়ে এ ঘরে এসে অদ্ভুত একটা কাজ করে বসল।

মিঠুর কাছে এসে নীচু হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'এই মিঠু শোন শোন, উঠতে পারবি? আস্তে আস্তে ওঠ, আমার কোলে উঠে পড়, চল আমরা এখান থেকে পালাই।'

'পালাব আমরা বাবু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—পালাব।'

ডাক্তার এসে রোগীকে দেখে ভরাট গলায় বলেন, 'ভাবনার কিছু নেই। বাড়িতে একটা কেস হলে বাচ্ছাদের হবেই, ও রোখা যায় না। বাতাসে করে। বাড়িতে কেন, পাড়াতে এলেও হয়। আপনার মেয়েটিকেও কিন্তু খুব সাবধানে রাখবেন, অসুখের শেষের দিকটাই বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার! প্রফেসর মিত্র কবে আসবেন?'

কবে আসবেন!

নন্দিতা অবাক হয়ে বলে, 'কবে আসবেন মানে?'

অবাক ডাক্তারও হলেন।

'উনি আমাকে কল্ দিতে গিয়ে যে বললেন, কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন। আমাকে দু বেলা এসে বাচ্ছাকে দেখে যেতে বললেন।'

নন্দিতা সামলে নিয়ে বলে, 'যাবার কথা একটা আছে বটে, কিন্তু খুব ঠিক নেই।'

তারপর নন্দিতা বাঘিনীর মত ফুঁসতে লাগলো।...চলে গেল? নিজের শিশু সন্তানের ওই রকম মারাত্মক অসুখ দেখেও চলে গেল?

তা মারাত্মক ছাড়া আর কি!

হাম রোগটি ছোট বাচ্ছাদের যে কতদূর অনিষ্ট করতে সক্ষম, তার নজীর কি জানা নেই নন্দিতার? না কি সুমন্তরই জানা নেই? সেই ভয়ঙ্কর আশঙ্কার গ্রাসের মধ্যে অসহায় নন্দিতাকে একা ফেলে রেখে চলে গেল শাস্তি দিতে?

শাস্তিই।

তাছাড়া আর কী?

স্বস্তি দিতে নিশ্চয়ই নয়!

শাস্তি দিতে। জব্দ করতে। নন্দিতার সঙ্গে সুমন্ত এই রকম দুর্ব্যবহার করেছে, এ কথা যতবারই ভাবছে নন্দিতা, মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে তার।

কী দুর্ভাগিনী নন্দিতা! কী দুর্ভাগিনী!

যে ভালবাসা সমগ্র পৃথিবীকে তুচ্ছ করে নন্দিতাকে কাছে টেনেছে, সেই ভালবাসা এমন করে নির্মূল হয়ে গেল তার ভাগ্যে!

কেন? কেন?

কেন, ভাবতেই আবার সেই পুরনো অপরাধিনীর চেহারাটাই চোখের উপর ভেসে ওঠে।

সেই কপালের উপর চুল এসে পড়া, গোলগাল মুখ মেয়েটা! অসুখে যে সে মুখ চুপসে গিয়েছিল, তা আর মনে পড়ে না নন্দিতার, ঘুরে বেড়ানো মেয়েটাকেই মনে পড়ে। আর মনে পড়ে যায়, মেয়েটার আকৃতিতে কোথাও নেই নন্দিতার ছাপ। ঠিক ওই মজুমদার বাড়ির মত গোলগাল বেঁটে খাটো!

শনি শনি, ওই মেয়েই নন্দিতার শনি! এখন বুঝতে পারছে নন্দিতা, কেন তার শাশুড়ী ওই মেয়েটাকে বিষ নজরে দেখতেন। বিষকন্যা, তাই বিষ নজরে দেখতেন। আশ্চর্য! আশ্চর্য! নিজের শত্রুকে নিজের গর্ভে ধরেছে নন্দিতা, নিজের সবটুকু স্নেহরস দিয়ে বড় করে তুলেছে।

ওরাই তো ঠিক বলতো।

নন্দিতার শ্বশুর বাড়ির মেয়েরা।

বলতো, 'কোন প্রাণে যে ওই মেয়েকে অত সোহাগ করে নন্দিতা! মনে পড়ে না ওই অপয়া মেয়ে কী দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে নন্দিতার!

এখন, এখন ও তাই।

নন্দিতার মরে যাওয়া জীবন আবার যখন ষোলোকলায় বিকশিত হয়ে উঠেছে, তখন ওই অলক্ষণা মেয়ে, তার ভাগ্যের রাহু, সেই জীবনকে থেঁতলে দিল!

তারপর অন্য সন্দেহ আসে। শুধু মিঠুই নয়, আরো অন্য কিছু। খোকনটা হয়ে পর্য্যন্তই যেন সুমন্তর মন ঘুরে গেছে। তার মানে, বিধবা বিয়ের সন্তানকে বরদাস্ত করতে বেধেছে। চিরাচরিত বাঙালী মনের সংস্কার তাকে সহসা বিমুখ করেছে।

ঝোঁকের মাথায় বিয়েটা করে ফেলেছিল, হয়তো সখ মিটে গেলে ত্যাগ করতো, দেখলো বন্ধনের গ্রন্থী শক্ত হচ্ছে, তাই ভয় পেল!

সুমন্ত নামের মানুষটাকে স্বচ্ছ চোখে দেখতে চাইল না নন্দিতা, অন্ধ অভিমানের দৃষ্টিতে একটা কালিমূর্ত্তি চেহারার কল্পনা করতে লাগলো।

আর সেই কল্পনাই ক্রমশঃ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠলো যেন।

হয়তো এমনিই হয়।

মিঠুকে নিয়ে মনোহরপুকুরের বাড়িতে থাকতে, ভিতরে ভিতরে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটা মজবুৎ হচ্ছিল নন্দিতার, আর সকলকেই শত্রুপক্ষ ভাববার অভ্যাস দৃঢ় হচ্ছিল, সেই প্রবৃত্তি আর অভ্যাস নিজের কাজ করে চলছে। তবে তখন অসহায়তায় যেটা ছিল গোপন মৃদু, এখন সহায় সম্বলের সিংহাসনে বসে, সেটাই প্রখর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাই অনায়াসেই ভাবতে পারে নন্দিতা, ও আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। মিঠুর ওপর দরদ দেখিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আচ্ছা আমিও দেখে নেব!

কেস্ করবো ওর নামে।

খোকা একটু ভাল হয়ে উঠলেই ধরছি হাল। মেয়ে চুরির অভিযোগ আনবো। বলবো বি-পিতার হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করতে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে। হয়তো গুম্ খুন করে ফেলতে, হয়তো বেচে ফেলতে। বলবো এই কথা উকিলের কাছে।

আমায় জব্দ করা বার করছি!

সাপিনীর মত ফুঁসতে থাকে।

সুমন্তর সেই আদালতে দাঁড়ানো মূর্ত্তিটা কল্পনা করে হিংস্র একটা উল্লাস বোধ করতে থাকে।

বান্ধবী তার সহায়, তাকে ডেকে পাঠায়।

তার সঙ্গে পরামর্শ করে।

সে এসে গালে হাত দেয়, তারপরে স্বামীকে ধরে তিনজনে পরামর্শ চালায় কী ভাবে কেস সাজানো যায়। তাদের কাছেও অবশ্য নন্দিতা ওই বি-পিতার হিংস্রতার কথাই বলে ঘটা করে।

বান্ধবী একবার বলে বটে, 'কিন্তু তুই যে বলতিস মেয়েটাকে না কি খুব ভালবাসে—'

'দেখাতো! দেখাতো!' নন্দিতা কাঁদো কাঁদো হয়, 'হাত করবার জন্যে অভিনয় করতো। কচি বাচ্ছা, ভুলেছিল সে অভিনয়ে। তাইনা ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো! ভুলিয়ে কি জোর করে, তাই বা কে জানে! বিছানায় শোওয়া রুগী, গেলই বা কী করে!'

ওদের না তাতালে কাজ এগোবে না, তাই ওদের কাছে যা ইচ্ছে বলে চলে নন্দিতা। আর সেটা মেনে নেওয়া অসম্ভবও হয় না ওদের। বিমাতায় বিষ খাওয়ান, এতো আদি অন্তকালের ঘটনা। বি-পিতাই বা যিশুখৃষ্টের অবতার হতে যাবে কেন?

দিন চারেক পরে সুমন্ত ফিরলো।

একা! দেখেই মনটা ধ্বক্ করে ওঠে। শূন্যতাটা হিংস্রতা হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই তাই বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে আসে নন্দিতা। 'কোথায় রেখে এলে তাকে?'

সুমন্ত ইতিমধ্যের খবর জানে না।

জানে না, তার নামে কেস্ সাজানোর তোড়জোড় চলছে। তাই অবহেলায় বলে, 'সে কথা না জানলেই বা ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি নেই? আমার মেয়েকে তুমি চুরি করে সরিয়ে ফেলবে, আমার ক্ষতি নেই?'

সুমন্ত আগে ডাক্তার বাড়ি ঘুরে এসেছে, ছেলের সুস্থতার খবর জেনে এসেছে, তাই বলে, 'তোমার ছেলে নিয়েই থাকোনা নিশ্চিন্ত হয়ে, মেয়ে ভাল জায়গাতেই আছে।'

'ভাল জায়গায়?'

নন্দিতা ওই অগ্রাহ্য আর অবহেলা আঁকা মুখ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অপরাধীর কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দুঃখ নেই, অকারণ নন্দিতাকে এতখানি অপমান করছে।

নন্দিতাও তবে অপমান করবে না কেন?

নন্দিতাও তাই চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'ভাল জায়গায়? কোথায়? মাটির নীচে না গঙ্গার তলায়?'

'কী বললে?'

'যা বলেছি ঠিকই বলেছি', ক্ষিপ্ত নন্দিতা আরো চেঁচায়, 'কে বিশ্বাস করবে মিঠুকে তুমি দরদ করে ভালো জায়গায় রেখে এসেছ? আমি বলবো তুমি ওকে খুন করেছ, নয় বেচে দিয়ে এসেছ। কেস করবো তোমার নামে।'

অবর্ণনীয় একটা বিস্ময়ের ধিক্কারে স্তব্ধ হয়ে যায় সুমন্ত, তাকিয়ে থাকে নন্দিতার দিকে। ভাবে একে দেখে আমি ভুলেছিলাম? তারপর ঘৃণার গলায় বলে, 'বেশ, করো কেস।'

অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় চলে গেল সেই দিনই। বালিতে এক পিসতুতো বোনের বাড়িতে রেখে এসেছিল মিঠুকে, চুপিচুপি কিছুটা অবস্থা জানিয়ে। অবশ্য সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে।

বলেছিল, 'ওই ছোঁয়াচ ছোঁয়াচ করে তোদের বৌদি পাগল। অথচ এটার এই অসুখের অবস্থায় অযত্ন হচ্ছে ভেবে অস্থির। তা কে আর এ বেচারার ভার নেবে বল? না ওর পিতৃকুল, না আমার পিতৃকুল, না তোদের বৌদির পিতৃকুল। ভাবতে ভাবতে তোর কথা মনে পড়ে গেল—যদি আপত্তি না থাকে—'

বোন বলেছিল, 'আমার আর আপত্তি কি? শূন্য ঘর নিয়েই তো আছি, একটা বাচ্ছা যদি দুদিনও ঘোরে বর্তে যাই। ও থাকতে পারবে কি?'

'পারবে, পারবে।'

তারপর তাকে পারাবার জন্যে অনেক গল্প ফেঁদেছিল। মিঠু অনেক বড় হলে একা মিঠুকে নিয়েই যে সুমন্ত বিলেত যাবে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এবং নিজে দুদিন থেকে, মন বসিয়ে, 'কাল আসবো' প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করে তবে এসেছিল।

নতুন পিসিকেও ভারী ভালো লেগে গেছে মিঠুর, সেটাও অবস্থা অনুকূলে আনতে সাহায্য করেছে।

'এটা যদি তোমার সম্পত্তি হতো তো মানুষ করবার জন্যে চেয়ে নিতাম—'বোন হেসে বলেছিল। 'বলতাম তোমাকে তো ভগবান নতুন খেলনা দিয়েছেন!'

সুমন্ত হেসেছিল, 'যদি আমার হতো!' তারপর বলেছিল, 'তা নতুন খেলনাটি নিয়ে তোদের বৌদি যে রকম হিমসিম খাচ্ছেন, বলা যায় না তোর অভিলাষ পূর্ণ হয় কি না।'

হাসতে হাসতেই চলে এসেছিল, এবং ভেবেছিল, নন্দিতা এই দু'দিনেই নিশ্চয় যথেষ্ট কাবু হয়ে গেছে, যতই হোক মায়ের প্রাণ! তাছাড়া সুমন্তর ওপরও অভিমান হয়েছে। অতএব শিক্ষা' একটু হয়েছে, যেটার দরকার ছিল।

মিঠুর অনুপস্থিতি দিয়ে মিঠুর মূল্যটা বোঝাতে চেয়েছিল।

এসে দেখলো নন্দিতাই তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর।

'কেস'এ কী কী পয়েন্ট থাকবে, নিজেই বাহাদুরী করে বললো নন্দিতা।

সুমন্ত এই অবিশ্বাস্য ধৃষ্টতার দিকে তাকিয়ে বলে গেল, 'ঠিক আছে! আদালতে যদি কাজীর বিচারের মত বিচার হয়, তুমি নিশ্চয়ই মেয়েকে কেটে আধখানা নেবার পক্ষেই সম্মতি দেবে?'

উত্তরটা শুনল না, চলে গেল।

নন্দিতার ওই চোখরাঙানিকে গ্রাহ্য করল না।

ও তো জানে 'চোরাই মাল' তার অনুকূলেই সাক্ষ্য দেবে।...

তারপর ঘর পর আত্মীয় স্বজন বন্ধু কুটুম্ব সকলেই জেনে ফেলল, নন্দিতার দ্বিতীয় স্বামী নন্দিতাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। অবিশ্যি একেবারে নৃশংসতা করে নি, বাড়িভাড়াটা যুগিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত, আর কলেজ থেকে দারোয়ানকে দিয়ে টাকাও পাঠাচ্ছে মাসকাবারে। কিন্তু নন্দিতাকে জব্দ করতে ওর পূর্বস্বামীব সন্তান পাঁচ-ছ বছরের মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

বাড়ির ঝি-চাকর বলে, ওই মেয়েটাকে নিয়েই নাকি কলহের সূত্রপাত। হওয়াই স্বাভাবিক, সপত্নী সম্পর্ককে বিমাতারাই সহ্য করতে পারে না, তা পিতা! কে বলতে পারে মেয়েটাকে আটকে রেখে গুম-খুন করে ফেলবে কি না।

অবিশ্যি নন্দিতাও নিশ্চেষ্ট বসে নেই, সে মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন করেছে। দুটো চার্জ গড়া হচ্ছে সুমন্তর নামে, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ, এবং মেয়েচুরি।

বেশ কিছুদিন ধরেই হয়তো সে কেস অনেকের খোরাক যোগাবে। উকিলের, ব্যারিস্টারের, সাংবাদিকের। সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই আমার আপনার সকলেরই চোখে পড়বে সে খবর।

নন্দিতা ভুলে গেছে, সুমন্ত আর সে শুধু একবার দেখা হওয়ার জন্যে মিছিমিছি ট্রামে চড়ত। ভুলে গেছে, বৃষ্টির দিনে শুধু মাথা বাঁচাবার জন্যে অকারণ দোকানে উঠে ডালমুট আর চকোলেট কিনেছিল ওরা, আর রোদে ঝকঝকে সকালে অকারণ রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছিল।

আর সুমন্ত ভোলবার সাধনা করছে একদা একটি ঝিরিঝিরি সরু সোনার বালা পরা হাতের কমনীয় কবপল্লবখানি আপন করায়ত্ত করার জন্যে সে ঘর সংসার আত্মপরিজন সব তুচ্ছ করেছিল।

সুমন্ত যদি সেই পিপাসার্ত হাতখানি না বাড়াত, যদি শুধু সেই দূর থেকে দেখাটাই জীবনেব কেন্দ্রে অচল করে রাখত জীবনের ধ্রুবতারার মত, তা হলেই কি ঠিক করত?

সুমন্ত ভুল করেছে তপস্বিনীকে মোহিনী বানিয়ে? না কি সেটা ভুল নয়, ভুল শুধু সুমন্ত মিত্র হয়ে ছায়া মজুমদারের জন্যে পিতৃস্নেহের সুধাধারাখানি উজাড় করে দেওয়া!

এখন সকলের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শুধু নন্দিতা আর সুমন্ত।

বহু লোকের বহু অনুমান নানা উল্টোপাল্টা পরিস্থিতিতে ঠেক খেয়ে গড়িয়ে পড়ে, ঝরে পড়ে। সত্যকার সত্যকে অনুমান করতে পারে এতখানি কল্পনাকুশলী হৃদয় সংসারে কোথায়?

থাকবেই বা কোথা থেকে?

একে অপরের জীবনের বহির্দৃশ্যটাই তো শুধু দেখতে পায়, ভিতরের অমৃতকুম্ভের সন্ধান কে পায়?

বাইরেটুকু নিয়েই নাড়াচাড়া সংসারের, সেইটুকু নিয়েই পাশ-ফেলের নম্বর দেওয়া।

জীবনের কত সুর, কত গান, কত কাব্য এমনি করেই রূপ হারায়, ছন্দ হারায়, বিকৃত মূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

লোকে বলে, ছি ছি, এই প্রেম! এরই এত বড়াই! বলে, ছি ছি সত্যিই বটে, মানুষ জীবটা ধুলোমাটি ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বর্গকেনা

এই ঝুরি-নামা বটগাছটা ওদের ভালবাসার সাক্ষী। ওদের অভিসারের কুঞ্জ। স্বর্ণ আর সর্বেশ্বরের।

ঝুরিগুলো এমন ঘেঁষ ঘেঁষ নেমেছে, দেখে মনে হয় বৃক্ষকাণ্ডটাকে ঘিরে ঝুরি পুঁতে পুঁতে কে যেন একটা বৃত্ত প্রাচীর রচনা করে রেখেছে। হয়তো রেখেছে, হয়তো অনন্তকালের প্রেমের দেবতাই অবসর কালের খেলায় মেতে এমন অভিনব একটি ঠাঁই গড়ে রেখেছেন ওদের জন্যে। নইলে সাহস ওদের হয় কি করে? হাত কয়েক দূরেই তো ভৈরবীকালীর মন্দিরে যাবার পথটা মাঠের মাঝখান দিয়ে সর্পিল রেখায় এগিয়ে গিয়েছে বহুজন পদতাড়নার চিহ্ন বহন করে। দৈনিক কম লোক তো যায় না ভৈরবীকালীর মন্দিরে! এমনিতে নিত্যযাত্রী বাদে শনি-মঙ্গলবারে তো আছেই বিশেষ পুজো। তাছাড়াও আছে সংক্রান্তি, অমাবস্যা, কৃষ্ণচতুর্দশী, এটা ওটা। সর্বোপরি আছে মানসিকের ভার। মানসিক করতে আর মানসিক শোধ দিতে দূর দূর গ্রাম থেকে লোকের আসা-যাওয়া।

মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে আর বহুবিধ কুসংস্কারমুক্ত হচ্ছে বলে যে বিপদকালে দেবতার কাছে ধর্ণা দিতে আসবে না তা তো নয়!

আসবে। আসে। চিরকাল যেমন এসেছে, তেমনিই আসে। হয়তো বা সভ্যতার কল্যাণে দুর্গম পথ সুগম হয়ে যাওয়ার সুবিধেয় বেশিই আসে। স্যুটে বুটে নিখুঁত সাহেবও ঝকঝকে গাড়ির মধ্যে বুটটাকে ছেড়ে রেখে এসে কষ্টে হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে কালীতলার মাটি মাথায় মাখেন, আর পুজো-প্রণামীর সম্ভারে ঐশ্বর্যের পরিচয় ঘোষণা করে দীন-দুঃখী আর্তের ভঙ্গীতে নম্রমুখে নিয়ে যান কবচ-মাদুলী প্রসাদী-পুষ্প।

উপায় কি? মানুষ যেখানে চির-পরাস্ত, বিজ্ঞান যেখানে নিশ্চিত ভরসার বিদ্যুৎ-বাতি জ্বেলে দিতে পারে না, সেখানে ওই ভয়-ভয় অন্ধকারে গড়া জাগ্রত দেবতার পীঠ-মন্দিরের ধুম্রমলিন প্রদীপশিখাটুকুই তো আশ্রয়।

বহু বছরের, হয়তো বা যুগ-যুগান্তের, ধোঁয়ার সঞ্চয়ে পুষ্ট গাঢ় কালো মসৃণ দেয়ালের পৃষ্ঠপটে ওই ধূমোদ্গারী লালচে শিখাটা যেন মানুষের অসহায়তার হিসেব রেখে চলে।

ঘিয়ের প্রদীপের সেই একটি বিশেষ গন্ধ, সে যেন দেশের নাড়িতে নাড়িতে আছে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে। তাকে ভুলে থাকা যায়, নিভিয়ে ফেলা যায় না। বিপদে পড়লেই মনে পড়ে, ছুটে আসে। জাগ্রত দেবতার সেবাইত সেই ছুটে-আসা মানুষের সামনে প্রদীপটা উস্কে তুলে ধরে বলে, 'নিন, ফুল হাতে নিয়ে সংকল্প করুন—'

তাই বীরপুরের অদূরেই রেলস্টেশন এসে গেলেও, এবং রেলস্টেশনের অনুষঙ্গ হিসেবে আধুনিক সভ্যতার বহুবিধ উপকরণ আর উপসর্গ এসে জুটলেও বীরপুরের ভৈরবীকালীর মন্দিরের পথ কদাচ নির্জন।

বরং আগের থেকে অনেক বেশী সশব্দ, গাড়ির গর্জনে। আগে প্রায় সকল যাত্রীই পায়ে হেঁটে আসত, কেউ কেউ গোযানে। এখন নানা যান। হাওয়াগাড়ি, রিক্সাগাড়ি, সাইকেলগাড়ি, গরুর গাড়িও। মোটর-বাইকের দর্শনও দুর্লভ নয়। বীরপুরের যে ছেলেরা রেলস্টেশন এগিয়ে আসার সুবিধেয় আর 'মেসের

ভাত' খেয়ে চাকরি না করে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করছে, তাদের মুখে মুখে রটনা হয়ে দেবীমাহাত্ম্য শহরের স্নায়ুকে চঞ্চল করে তুলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

মন্দিরে লোক-সমাগম এখন অতএব কম তো নয়ই, বরং বেশি।

কিন্তু স্বর্ণ আর সর্বেশ্বর কি এখনকার? বীরপুরের যে মেয়েরা দল বেঁধে রেলে চড়ে তিন স্টেশন দূরে গিয়ে সিনেমা দেখে আসে, স্বর্ণ কি তাদের দলের? আর সর্বেশ্বর সেই ছেলেদের দলের? যে ছেলেরা হাওয়াই চপ্পল পরে, সেফটি রেজারে দাড়ি কামায়, আর সন্ধ্যাবেলায় পথে বেরোতে হলে টর্চ নিয়ে বেরোয়?

নাঃ। তা নয়। স্বর্ণ আর সর্বেশ্বর অনেক আগের।

ওরা যে আমলের, তখন বীরপুরের লোক তো কোন্ ছার, অনেক 'পুরের' লোকই রেলগাড়ির নামও শোনেনি। কলকাতাই অবাক বিস্ময়ে ওই অলৌকিক যন্ত্রযানটার দিকে তাকিয়ে ছড়া বাঁধতে বসেছে—

'এসো কে বেড়াতে যাবে শীঘ্র কর আজ,
ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ!'

কিন্তু সেটুকুতে ভৈরবীকালীর বয়সের খুব একটা তারতম্য ঘটে না। ভৈরবীকালী স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে বিরাজ করছেন বহুবিভূতির মহিমা নিয়ে। আগে নাকি এ মন্দির নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা ছিল। নরবলি হত, এবং আরো অনেক কিছুই হত, আইনের দাপটে সে সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পুণ্যরক্তপূত সেই হাঁড়িকাঠটি আছে এখনো অনেক কিংবদন্তী বহন করে।

বহুপুরুষে সেবাইত পাঠক-বংশের সঙ্গেও ওই রকম একটি কিংবদন্তী জড়িত। সেটা হচ্ছে এই সর্বেশ্বর পাঠকের কোন এক পূর্বপুরুষ নাকি নিতান্ত বালক বয়সে 'সর্বসুলক্ষণযুক্ত' ব্রাহ্মণ-তনয় হিসেবে কোন একস্থান থেকে আনিত হয়েছিল 'বলি' হবার জন্যে।

এই উপলক্ষ্যে সমারোহে পূজার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু উৎসর্গীকৃত বালক যখন হাঁড়িকাঠের কাছাকাছি এবং ঢাকিঢুলিরা মহোৎসাহে বলির বাজনা শুরু করেছে, তখন তদানীন্তন সেবাইত সহসা পুজোর আসন থেকে ছুটে এসে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন, 'ওরে থামা, থামা, মা নিষেধ করছেন!'

মা নিষেধ করছেন!

এ কী অভাবিত আর অভূতপূর্ব কথা?

সমস্ত পরিবেশটার উপর যেন একটা বজ্রপাত হল। সেই আঘাতে উদ্দাম নৃত্যরত উন্মত্ত মানুষগুলো পাথর হয়ে গেল।

অমাবস্যা রাত্রির মধ্যভাগ, এতক্ষণ জ্বলন্ত মশালের লেলিহান শিখাগুলো এখানে ওখানে নেচে বেড়িয়ে জায়গাটাকে যেন 'অগ্নিকাণ্ডে'র চেহারা করে তুলেছিল, হঠাৎ সমস্ত মশালগুলো এক একটা জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেবাইত রুদ্র আদেশের সুরে বললেন, 'এ বলি হবে না। এ পুজো বন্ধ করতে হবে। মা-র আদেশ!'

আবার নামল স্তব্ধতা।

রক্তাম্বরধারী সেবাইত সেই ছোট ছোট খিলেনে গাঁথা গর্ভমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কোন এক ভয়াবহ নায়কের মত, মশালের আলোগুলো বাতাসে কেঁপে কেঁপে তাঁকে আরো অনৈসর্গিক চেহারায় দাঁড় করাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠল। মায়ের নিষেধ, মায়ের আদেশ, কিন্তু সেটা এল কোন্ অলৌকিক পথ বেয়ে?

স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করবার সাহস কারো হচ্ছে না, কিন্তু অসন্তোষের গুঞ্জন রোধ করতে পারছে না। এতবড় একটা সমারোহের আমোদ থেকে বঞ্চিত হবে তারা শুধু একটা ধরা-ছোঁয়াহীন নিষেধে?

একটুক্ষণ পরে ওই গুঞ্জনধ্বনির মাঝখান থেকে একটা ভাঙা আর কর্কশ গলার সাড়া উঠল, 'আমার তবে এখন কী কোর্তব্য ঠাকুরমশাই?'

এ গলা কামারের।

তিনদিন ধরে যে ব্যক্তি তার খাঁড়াখানা পাথরে শান দিয়ে দিয়ে ধারালো করেছে। হ্যাঁ, কামার। ভৈরবীকালীর এই নিয়ম। বলি দেবে নিখুঁত নীরোগ কামারের ছেলে। এক কোপে কাটতে পারবার খ্যাতি আছে লোকটার, সেই অহঙ্কারে খাঁড়াখানা দু'হাতে মাথার উপর তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্ফালন করছিল, সেই উল্লসিত উত্তেজনার ওপর কিনা ঠাকুরমশাই অকারণ এক কলসী জল ঢেলে দিল?

মা-র নিষেধ। ছেলের হাতের মোয়া!

এক পলকের মধ্যে চুপি চুপি মা কী নিষেধ দিয়ে বসলেন শুনি? নির্ঘাৎ বুড়োর ওই টুকটুকে ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। ছেলে তো নেই নিজের, শুধু গণ্ডাভর্তি মেয়ে।

কিন্তু এই কি সম্ভব? পাপের ভয় নেই? অকল্যাণের ভয় নেই?

মায়ের নামে উচ্ছুগ্যু বলির জীবকে মায়া করে বাঁচালে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল হবে না? আয় তবে তুই নিজে এসে হাঁড়িকাঠে মাথা দে!

ধেনো মদের মাহাত্ম্যে এরকম অনেক কথাই মাথার মধ্যে গজগজিয়ে ওঠে লোকটার, তবে কথা সে ওই একটাই বলে। কর্তব্যের নির্দেশ চায়।

তা ওর কথার সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ অরণ্যে ঝড় ওঠে। সকলের মুখ থেকে একটাই কথা ওঠে, 'বেপারটা কি ঠাকুরমশাই?'

'ব্যাপার?' সেবাইত ঠাকুর একটা ধাতব গলায় বলেন, 'ব্যাপার জানতে চাও? তবে এসো। মাকে দেখে যাও।'

এই রহস্যময় কথায় অনেকেই নিথর হয়ে যায়, তবু দু'চারজন এগিয়েও যায় গুটি গুটি। অজানিত কালের ধোঁয়ার সঞ্চয়ে মসৃণ কালো দেয়ালের গায়ে ছায়া ফেলে ধুমোদ্গারী লালচে আলোর শিখাটা তুলে ধরেন সেবাইত ঠাকুর। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা অস্ফুট আর্তনাদের ঢেউ বহে যায়।

দেবীর জিভ নেই।

সেই ভয়াবহ অথচ আশ্বাসবাহী, ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর, লেলিহান জিহ্বাখানি অন্তর্হিত। দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী শূন্য জায়গাটা যেন সর্বনাশের ইঙ্গিত নিয়ে স্থির হয়ে আছে।

'ঠাকুরমশাই, এ কী!'

'এ কেমন করে হল?'

'মা জানেন!' এই একটি মাত্র কথাই পাওয়া গেল ঠাকুরমশাইয়ের মুখ থেকে।

কিন্তু কখন হল?

কখন হল?

তা, সেটার একটা উত্তর আছে। ধ্যানে বসে হঠাৎ মন্ত্র ভুলে গেলেন ঠাকুরমশাই, সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল, দিশেহারা হয়ে উঠলেন তিনি, চোখ খুলে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে—

তারপর কতদিন যেন অঙ্গহীন প্রতিমা অপূজিতা হয়ে পড়ে রইলেন, মন্দিরের আশেপাশে জঙ্গল বাড়তে লাগল, আর সেই অশুচি ছেলেটা বাড়তে লাগল এ-বাড়ি ও-বাড়ির দাক্ষিণ্যের খুদমুঠো খেয়ে। তারপর আবার সহসা একদিন দেবীর কপাল ফিরল, কপাল ফিরল কিশোর বালক অভিলাষ পাঠকের। গ্রামের জমিদার স্বপ্নাদেশ পেলেন, মৃত্তিকায় গড়া দেবীর সোনার জিভ গড়িয়ে দিতে, এবং সেই অশুচি ছেলেটাকেই অভিষেক করে পুরোহিত পদে বসাতে।

পূর্ব সেবাইত ঠাকুরমশাই তো তদবধি ঘরছাড়া হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন।

স্বপ্নাদেশের উপর কথা নেই, তার উপর আবার জমিদারের স্বপ্ন। তদবধি দেবীর সোনার জিভ, আর ওই পাঠক-বংশই সেবাইত। ঠাকুরমশাইয়ের ছোট মেয়েটার সঙ্গে মালাবদল ঘটিয়ে প্রাচীনে এবং নবীনে মিতালীর বন্ধন পাকা করে দিলেন জমিদারমশাই তীর্থ থেকে সেবাইতকে ফিরিয়ে এনে।

এই কিংবদন্তী।

পরবর্তী যুগের অবিশ্বাসীরা অবশ্য দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মন্তব্য করে, 'সব সেই বুড়ো বামনার

কারসাজি! ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল, জামাই করবার বাসনা জেগেছিল, তাই দেবীর জিভটি খসিয়ে নিয়ে—'

বিশ্বাসীরা বলে, 'তাই কখনো সম্ভব? এতবড় ভয়ঙ্কর পাতক করে পার পাবে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিজ খসে পড়বে না তার? মা কি সোজা মা?'

মা যে সোনা নয়, তা বেকায়দায় পড়লে সবাই স্বীকার করে। অতএব বেশি কথার চাষ হয় না। বলতে গিয়েও থেমে যায় লোকে। বরং বাইরের যাত্রী এলে মায়ের মাহাত্ম্য বোঝাতে ওই কিংবদন্তীটাই সাড়ম্বরে আর সালঙ্কারে শোনায়। সেটাই নিরাপদ, কে জানে বাবা 'মা'-টি কখন কি অনিষ্ট ঘটিয়ে বসেন!

তবে যে যাই বলুক, কোন পক্ষের প্রতিবাদই জাগ্রতাদেবীর সোনার জিভ নড়ে না। কোথাকার যেন পাঠক-বংশকে এই বীরপুরের ভৈরবীকালীর সেবাইতরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে মা একবারই সেই জিভ নেড়েছিলেন। মাটির জিভখানা নড়ার ফলে ভেঙেই পড়েছিল। বোধকরি নিজের ওপরও তেমন আস্থা ছিল না মা-র, ভেবেছিলেন অভিলাষ পাঠক নামক সেই বালকটাকে বাঁচানো আমার কড়ে আঙুলের কর্ম নয়, বড় একটা কিছু দাম দিতে হবে।

আর সেই কথাটা? যেটার কথাও কেউ কেউ তোলে। এত লোক থাকতে মা কালী জমিদারবাবুকেই বা স্বপ্ন দিতে গেলেন কেন? যে ব্যক্তি নাকি সেবাইত ঠাকুরের 'এক গেলাসের ইয়ার'!

বাঃ, ওটা আবার একটা প্রশ্ন নাকি? স্বপ্ন দিলেন কি পূজুরীর বন্ধু বলে? তা নয়। স্বপ্ন দিলেন জমিদার বলেই। বিগ্রহ আর কুগ্রহ দুইয়েরই ভরসা ধনপতিদের ওপর। বিগ্রহও ওদের ওপর ভর করেন, কুগ্রহও ওদের ওপর ভর করেন, এতো জানা কথা।

যাক, কিংবদন্তী মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে অনেক পল্লবিত হয়, অতএব ওর সব কথা বিশ্বাস না করলেও এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই, কোথাকার সেই পাঠক-বংশই এতাবৎকালে দেবীপ্রদত্ত অধিকারে এখানে সম্মান আর সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছে।

হালদারদের মেয়ে স্বর্ণর প্রাণেশ্বর সর্বেশ্বর সেই বংশেরই বংশধর, সেই কুলেরই কুলমণি। ভৈরবীকালীর দীনতম দাবিদার ওই হালদাররা। কোন পূর্বপুরুষের পুণ্যে বছরের মধ্যে একদিন মাত্র মা-র মন্দিরের উপসত্ব ভোগ করে হালদার-বংশ। ভাদ্র সংক্রান্তির উপসত্ব। নোটো হালদার সেদিন কোমরে গামছা বেঁধে আর খেঁটে মোটা একটা লাল টকটকে ছালতির ধুতি পরে, মন্দিরের দরজা পাহারা দেয়। নোটোর ডাক-হাঁকে বোধকরি ভৈরবীকালীরও হার্ট প্যাল্‌পিটেশন হয়।

কিন্তু উপায় কি নোটোর? কড়া পাহারা না দিলে? ওই মহাপুণ্য দিনের ভোগরাগ থেকেই তা নোটোর সংবৎসরের ভাত-কাপড়। ভাদ্র সংক্রান্তিটা যে মায়ের একটা বিশেষ পরবের দিন!

স্বর্ণ সেই নোটো হালদারের মেয়ে। তিন বছর বয়েস থেকে বাবার সঙ্গে মন্দিরে আসে, পাওনা-গণ্ডা আদায় মানেটা, কি, তা বুঝে ফেলতে।

সর্বেশ্বর ছোট থেকে মন্দিরে আসত বাপের সঙ্গে। বাপ শিবেশ্বর পাঠক বলত, 'চল, এখন থেকেই তিথি নক্ষত্র নিরীক্ষণ করে দেখবি চল! দেখতে দেখতেই শিখে নিবি।'

সর্বেশ্বরের মা চন্দ্রাননী মুখঝামটা দিত, 'ওরে আমার ছেলের সোহাগ! বলি এখন থেকে পূজোর রীতি-নীতি শিখে ওর হবেটা কি শুনি? কোমরে এখনো কাপড়খানা রাখতে শেখেনি ছেলে!'

'শেখেনি, শিখবে।' শিবেশ্বর পেশীবহুল মুখটা বাঁকিয়ে বলত, 'আজন্ম একটা মানুষই ভুগবে না কি? রোগ হলে পর্যন্ত নিস্তার নেই আমার। ছোঁড়াটার গলায় সুতোটা তুলে দেওয়া পর্যন্ত আছি ধৈর্য্য ধরে। তারপর দিনে-অদিনে ওকেই করতে হবে।'

চন্দ্রাননী রেগে উঠে বলত, 'তার মানে তুমি তখন সাপের পাঁচ পা দেখবে, রাজা কেষ্টচন্দর হবে, মায়ের পুজোর দায়টা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিনরাত্তির সেই চুলোয় গিয়ে পড়ে থাকবে।'

বলা বাহুল্য প্রায়শঃই এরপর লেগে যেত ধুন্ধুমার। 'চুলো'র উল্লেখটা যে বড় মর্মান্তিক উল্লেখ। মা-বাপের এই দাম্পত্য-লীলার দর্শক সর্বেশ্বর ছেলেবেলায় ভয় পেত, একবার মাকে এবং একবার বাবাকে থামাবার

চেষ্টা করত, কিন্তু বড় হয়ে অন্য চাল ধরল। যেই দেখল বাড়িতে কাক-চিল উড়ছে, সেই এক ফাঁকে হাওয়া। সহজে আর বাড়ির ত্রিসীমানায় নয়। জানে, ভাত খাবার সময় এলেই মা ঠিক নিজের গরজে পাড়া তছনছ করে খুঁজে বার করবে তাকে।

এই সময় গিয়ে জুটত হালদার বাড়ি। স্বর্ণর মা-ও প্রশ্রয় দিত ছেলেটাকে, কারণ দস্যি মেয়েটার খেলার সঙ্গী বলতে বাড়িতে কেউ নেই, মাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খায়, কাজ করতে দেয় না, সঙ্গী একটা জুটলে থাকে ভাল। অতএব সর্বেশ্বর এলেই সাগ্রহে বলে, 'আয় বাবা, বোস বাবা। আগানে-বাগানে যেও না মানিক, বসে বসে খেলা কর।'

তা' বসে বসে খেলাতেও দস্যি স্বর্ণ অরাজী নয়। রান্না-বান্না ঘর সংসার সাজানো খেলাটাও তার বিশেষ প্রিয়। মুদির দোকান সাজানো খেলাটাও চলে। অতএব কখনো স্বর্ণর গিন্নীপনার নীচে তাঁবেদার কর্তার ভূমিকা নিতে হয় সর্বেশ্বরকে, আবার কখনো ওজন দাঁড়ি হাতে দোকানদার সেজে ক্রেতাকে তোয়াজ করতে হয়। হ্যাঁ, কালটা সেকাল, বিক্রেতাই ক্রেতাকে তোয়াজ করছে দেখতে অভ্যস্ত ছিল তারা।

স্বর্ণর মাকে খুব ভাল লাগত সর্বেশ্বরের, বেশ কেমন লক্ষ্মীঠাকুরের মতন শান্ত নরম, তার মা-র মত রণচণ্ডী নয়।

বিশেষণটা অতিশয়োক্তি নয়, ভাত খাবার সময় ছেলেকে যখন খুঁজতে বেরতো চন্দ্রাননী, তখন নামের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে রুদ্রাণী-রূপেই আবির্ভূত হত হালদারদের বাড়ি এবং ছেলের নড়াটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে স্বর্ণর মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলের রাতদিন মেয়েমানুষের সঙ্গে মেয়েলী খেলা! হবে একটা মেনিমুখো! সমবইসী খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা নেই, চব্বিশঘণ্টা একটা পুঁটকে মেয়ের সঙ্গে রান্নাবাড়ি খেলছে।'

সর্বেশ্বর অবশ্য সতেজে সে কথার প্রতিবাদ করত। বলত, 'আমি কি রান্না করি? আমি তো হাটে যাই, গরু চরাই, খড় কাটি—'

চন্দ্রাননী আরও ছিটফিটিয়ে ওঠে ছেলের সেই প্রতিবাদে। ছেলের চুলের ঝুঁটিটা নেড়ে দিয়ে অথবা গালে একটা ঠোনা মেরে ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তাই করবি লক্ষ্মীছাড়া বামুনের ঘরের বাছুর, গরুই চরাবি, খড়ই কাটবি—'

পরদিন আবার এ বাড়িতে উদয় হলে, হয়তো স্বর্ণর মা সভয়ে বলত, 'আবার তুমি স্বর্ণর সঙ্গে খেলতে এসেছ মানিক? মা রাগ করবে—'

সর্বেশ্বর প্রবল অগ্রাহ্যে সে সাবধানবাণী উড়িয়ে দিয়ে বলত, 'করুকগে। মা তো সবতাতেই রাগ করে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে যাব না হাতী করব! হেরো, পটলা, বংশী মারে না বুঝি? আর হেরোর মা, বংশীর মা, পটলার মা, নাড়ু দেয়? ক্ষীরতক্তি দেয়?'

বলা বাহুল্য, তখন স্বর্ণর চাইতে স্বর্ণর মায়ের বদান্যতার আকর্ষণটাই বেশী ছিল সর্বেশ্বরের কাছে। ক্রমশঃ পালাবদল হল।

একটু বড় হতেই ঘরে বসে খেলার চাইতে বাগান-আগানটাকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করল ওরা। এবং স্বর্ণই তাতে অগ্রণী। সর্বেশ্বর যদি বলত এই উঠোনেই খেলি না রে 'কুমীর কুমীর' কি 'বাঘ শেয়াল', স্বর্ণ ঝঙ্কার দিয়ে বলত, 'পচা খেলা, ছাই কেলা, জন্মভোরই তো খেলছি ওই খেলা। বাগানে চল্, বাগানে চল্—'

স্বর্ণর জন্মভোরটা যদিও তখনো বছর সাতের বেশী নয়।

স্বর্ণর মা রণচণ্ডী হতে জানে না বটে, তবু রেগে বলত, ' গেছো মেয়ে! গেছো মেয়ে! ও বেটাছেলে, ও ঘরে বসে খেলতে চাইছে, উনি চললেন, গাছে উঠতে!'

স্বর্ণ বলত, 'আহা রে, ভালমানুষ নাড়ুগোপাল, খেল তবে তুই বাড়ির উঠোনে, ওই খোকাটার সঙ্গে খেল, আমি চললাম।'

খোকা স্বর্ণর পরবর্তী। তারও পরে আছে একটা মেয়ে।

নোটো হালদারের বুড়ো বয়সের অবদান এসব। দু-দু-বার অকালে বৌ মরে যাওয়ার পর নোটোর এটি তৃতীয় পক্ষ। কিন্তু নোটোর দাপটে তৃতীয় পক্ষ একেবারে কেঁচো। স্বর্ণ পিতৃসদৃশ প্রবলা, তাই স্বর্ণকেও এঁটে উঠতে পারে না স্বর্ণর মা।

আর নোটোর এই বড় মেয়েটির প্রতি অগাধ প্রশ্রয়। স্বর্ণর জন্মকাল থেকেই না কি নোটোর আয়-উন্নতি বেশী। মা বকলেই অতএব স্বর্ণ বাবা বাড়ি ফিরলেই লাগিয়ে দেওয়া রূপ মহৎ উপায়টি অবলম্বন করে। আর নোটো রান্নাঘরের দরজায় এসে ডাক ছাড়ে, 'আবার ওকে মুখ করেছ তুমি? আবার? নিষেধ করিনি তোমায়?' স্বর উত্তরোত্তর চড়ে।

স্বর্ণ তখন দয়ার গলায় বলে, 'থাক্ বাবা, আর বেশী বোকো না, গরীবের মেয়ে, মা নেই বাপ নেই, জন্মদুঃখী!'

স্বর্ণর মা তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদে।

সর্বেশ্বর কখনো কখনো দুঃখিত চিত্তে বলে, 'মা-র নামে লাগিয়ে দিস কেন নোটোকাকার কাছে? ছিঃ!'

স্বর্ণ বলে, 'আহারে! ভারী দয়ালু এলেন! বলে না দিলে মা আমাকে খেলতে যেতে দেবে? ঠিক বলবে ঘরে বসে কাজ শেখ। পরের ঘরে যেতে হবে।'

সেটা অবশ্য সর্বেশ্বরের মনঃপুত নয়। অতএব তারা কেটে পড়ে, এবং বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু সেই অনাবিল সুখ ক'টা দিনের জন্যই বা পেয়েছে ওরা? স্বর্ণ আট বছরের কোঠা ছাড়াতে ছাড়াতেই পাড়ায় নিন্দের 'টী টী' পড়ে গেল। স্বর্ণর মা প্রতিবেশিনী মহিলাদের গঞ্জনা খেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে স্বামীর দরবারে নালিশ করে মেয়েকে শাসিত করে ফেলল, ওদিকে শিবেশ্বর পাঠক ছেলের মাথায় খড়মের খুরো ঠুকে মাথাটায় গোটা কতক আলু গজিয়ে দিয়ে টোলে ভর্তি করে দিয়ে এল।

শিবেশ্বর পাঠকের মাসশ্বশুর হরিনাথ তর্করত্ন তখন ভাগ্যান্বেষণে বহরমপুর থেকে এই বীরপুরে এসে পড়ে একটি টোল খুলেছেন।

হরিনাথ তর্করত্ন বারো বছরের নাতিকে ব্রহ্মচর্য ও চরিত্ররক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে দিতে পাকে-প্রকারে বুঝিয়ে দিতে থাকলেন বয়স্থা কুমারীর সঙ্গে একত্রে বিচরণ কত গর্হিত ও অশাস্ত্রীয়, আর শিবেশ্বর পাঠক ছেলেকে 'দ্বিজত্বে' উন্নীত করে ফেলার সুযোগে ভৈরবীকালীর একবেলার পুজোর ভার ছেলের উপর প্রায় পুরোপুরিই চাপিয়ে দিয়ে 'চুলোয়' বাসের মাত্রাটা বাড়িয়ে ফেলতে থাকলেন। চন্দ্রাননীর গলাবাজি কোন কাজে লাগছে এমন দেখা গেল না।

পুজোয় সর্বেশ্বরের বেজার নেই।

বরং সন্ধ্যা না হতেই সে দেবী-দর্শনে তৎপর হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, সন্ধ্যাপুজোটাই ছেলের উপর ঠেকিয়েছে শিবেশ্বর। কারণ, সন্ধ্যাপুজোটা সংক্ষিপ্ত। এ সময় বাইরের যাত্রী আসে না, মানসিক পড়ে না, অনুযোগ হয় না, লোক-সমাগমও সকালের তুলনায় অনেক কম। শুধু আরতি আর ভোগ উৎসর্গ।

ভোগটাও সংক্ষিপ্ত। ঘনদুধ কলা আর নারকেল-কোরা।

নারকেল-কোরাটি চাই-ই ঠাকুরের, এই বিধি। আইন-মাফিক প্রথায় এ-সব গোছগাছ পূজারীরই করে নেবার কথা, কিন্তু গোলগাল একটা নারকেলকে গুঁড়োয় পরিণত করে ফেলা সর্বেশ্বরের কর্ম নয়, ওটা তাই চন্দ্রাননীই করে দিয়ে পাথরবাটিতে ভরে কলাপাতা চাপা দিয়ে ছেলের হাতে দিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু বিধির নির্বন্ধে চন্দ্রাননী একবার বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে বেলডাঙা চলে গেল ক'দিনের জন্যে। বলে গেল 'হালদার খুড়িকে বলিস নারকেলটা কুরে দুধটা জ্বাল দিয়ে দেবে।'

হালদার বাড়িটা মন্দিরের আরো নিকটবর্তী, কাজেই অসুবিধে নেই কিছু। অসুবিধে ছিল না, সুবিধে ঘটল বিস্তর।

সর্বেশ্বর নারকেল কুরতে জানে না শুনে ন' বছরের স্বর্ণ হেসে কুটি কুটি হল, এবং সদর্পে বলল,

'ওটা গিয়ে আমিই কুরে দিয়ে আসব। যা দেখছি পিদ্দিমের সলতে পাকাতেও পারবে কি না সর্ব-দা সন্দ! ধুনো দিয়ে, পিদ্দিম সাজিয়ে, দুধটা আওটে, নারকেল কুরে দিয়ে আসব আমি এক দণ্ডে।' সেই দণ্ডকালের সুবিধেটা কৌশলে আদায় করে নিল স্বর্ণ নিরীহ মা-টার কাছ থেকে। দেবী ভৈরবীর পাদপীঠে কোনরকম অশাস্ত্রীয় ঘটনা ঘটা সম্ভব, স্বর্ণর মা-র ধারণা নেই। সে শুধু মেয়েকে বলে দিল, 'সর্ব-দা সর্ব-দা করে হি হি করবি না, বুঝলি? ঘাড় হেঁট করে আপন মনে কাজটুকু সেরে চলে আসবি। বড় হয়েছ, এখন পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানো নিন্দের!' স্বর্ণ অম্লানবদনে বলে, 'তাকাতে আবার যাচ্ছে কে? মন্দিরে কুড়িটা-পঞ্চাশটা লোক বসে নেই। বলি মায়ের থানে যাব, আরুতিটা দেখব না? এমন মহাপাতুকী হতে বল হব।'

মা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আরুতি দেখতে তোকে দিব্যি দিইনি আমি। সোমত্ত মেয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, তাই সাবধান করা।'

স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বলে, 'পাঁচজনের পাঁচটা মুখ, পাঁচ কথা বলবে এ আর আশ্চর্যি কি? অত কানে নিলে চলে না।'

স্বর্ণর মা বলে, 'বেথা হয়ে গেলে কানে নিতাম না। আইবুড়ো মেয়ে তাই ভয়। কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা রটবে, বে দিতে বিপদ হবে এই ভয়।'

'বিপদ হয়, মা ভৈরবীকালীর থানে নিয়ে বলি দিয়ে দিও, চুকে যাবে ল্যাঠা।' বলে সুতির শাড়িখানা ছেড়ে মায়ের বিয়ের চেলিখানা গুছিয়ে গুছিয়ে পরে নিতে থাকে স্বর্ণ।

মা বলে, 'ষাট ষাট, কি যে অকথা-কুকথা বলিস।'

'বলাচ্ছ তাই বলতে হচ্ছে'। বলে হনহনিয়ে বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে যায় স্বর্ণ।

স্বর্ণর মা কোলের মেয়েটাকে তোষামোদ করে, 'দিদির সঙ্গে যা না, আরুতি দেখগে।' কিন্তু বছর চারেকের সেই মেয়েটা আরো অবাধ্য, মায়ের অনুরোধ কদাচ রাখে।

স্বর্ণকে পাহারা দেওয়া অতএব হয় না। কিন্তু ন' বছরটাও যে নেহাত নিশ্চিন্তের বয়েস নয় সেটা স্বর্ণই প্রমাণ করে ছাড়ে। স্বর্ণ যেন দিব্যি গিন্নীদের মতন ভোগের ঘরের উনুনে কাঠ-কুটো জ্বেলে বড় পেতলের সরায় একসরা দুধ জাল দিয়ে ঘন করে, মুখে আঁচল জড়িয়ে নারকেলটি কুরে এগিয়ে দেয়, ধুনুচিতে আগুন ধরিয়ে মন্দিরে ধূম্রলোকের সৃষ্টি করে, তেমনিই আবার গিন্নীদের মত মুচকি হেসে বলে, 'তোমার দিকে চাইতে মানা, বুঝলে সর্ব-দা?'

সর্বেশ্বর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'কে মানা কবল?'

'মা।'

'মা? তবু রক্ষে!' হালদারকাকীকে তত ভয় নেই সর্বেশ্বরের। তাই সে-ও একটু হেসে বলে, 'কি বলে মানা করল?'

'বলল, পরপুরুষেব দিকে চাইতে নেই।'

'ওঃ!' সর্বেশ্বর দেবীর চরণ থেকে বাসি ফুল-পাতা সরাতে সরাতে বলে, 'বললি না কেন পবপুরুষের দিকে চাইতে মানা, সে কথা মানব। সর্বেশ্বর পাঠকের দিকে ছাডা আর কারুর দিকে তাকাব না।'

'ইললি! মাকে ওই কথা বলি আমি।'

'বললেই ভাল হয়।' সর্বেশ্বর মনক্ষুণ্ণভাবে বলে, 'মা ভৈরবী কালীকে নিত্য জানাচ্ছি, মা তো ওদের মনে সুবুদ্ধির উদয় দিচ্ছে না, কে তবে বলবে?'

'চমৎকার। আমিই তবে বলিগে।'

'আর না-বলাও তো বিপদ, চারিদিক থেকে সম্বন্ধ আসছে—'

'একা তোমারই আসছে না, আমারও আসছে।'

'তবে?' সর্বেশ্বর বিবর্ণ মুখে বলে, ' তোরই বুদ্ধি বেশি স্বর্ণ, তুই একটা বুদ্ধি বার কর।'

স্বর্ণ বিরক্ত ভাবে বলে, 'আমার ওপর ভরসা। তুমি না বেটাছেলে?'

'এক্ষেত্রে বেটা ছেলে মেয়েছেলে দুই-ই সমান নিরুপায়। বাপ-মা ধরে বিয়ে দিলে করবটা কি?

'পালাতে পার।' স্বর্ণ জ্বলন্ত স্বরে বলে, 'রাতারাতি চম্পট দিতে পার।'

'আমি নয় পালালাম, বলি তুই? তুই কি করবি? ফিরে এসে দেখব তোকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে?'

'ইস্! নিয়ে গেলেই হল? বড় পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে?'

'তবে তো বড্ড বুদ্ধির কথাই হল', সর্বেশ্বর বিরক্ত গলায় বলে, 'আমি সন্নিসি হয়ে গেলাম, তুই ডুবে মরলি, ব্যস, হয়ে গেল পরম সুখ!'

বাইরে লোক চঞ্চল হয়ে ওঠে আরতির দেরি দেখে, ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারে, স্বর্ণ তখন গলা তুলে বলে, 'হাত-পা যে তোমার চলছে না সর্ব-দা! একটু তড়ি-ঘড়ি কর। জ্যেঠামশাই কী সোন্দর একদণ্ডে আরুতি সারেন, তুমি তাঁর ছেলে হয়ে কী গো! আর বসে থাকতে পারব না, আমি তোমার ধুনোয় বাতাস দিতে। দেরি হলে মা মুখ করে।'

বাইরের লোকেরা বলে, 'নোটো হালদারের মেয়েটা হচ্ছে বটে একখানা! বসানো বাপ! গলা কী! মেজাজ কী! যাদের ঘরে যাবে তাদের বুঝিয়ে দেবে ঠ্যালা।'

তবু ঠিক এই মুহূর্তে কেউ সন্দেহ করতে পারে না মায়ের ওই গর্ভমন্দিরের মধ্যে বসে ওরা এতক্ষণ প্রেমালাপ করছিল।

তা, প্রেমালাপ ছাড়া আর কি?

দুজনে একসঙ্গে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়, 'মাগো, দুজনের মা-বাপের কাছেই স্বপ্ন দাও—'স্বর্ণর সঙ্গে সর্বর বিয়ে দে! নচেৎ তোদের ভাল হবে না।'

আবার একসঙ্গে ফুল হাতে করে সংকল্প করে, 'মা, বিয়ের পর জোড়ে এসে তোমায় একশো আট রক্তজবা দিয়ে পুজো করে যাব।'

বয়সের পক্ষে যথেষ্ট পাকামী বৈকি!

এ যুগের কাছে অবিশ্বাস্য রকমের পাকামী। কিন্তু পাঁচ বছর বয়েস থেকে যাকে বিয়ে আর বরের স্বপ্ন দেখানো হয়, আর পরের ঘরে যাবার তালিম দেওয়া হয়, তার পক্ষে এ পাকামী অপ্রত্যাশিত নয়।

সেই পাকামী বাড়াবার সুযোগটি দিয়ে গেছে চন্দ্রাননী।

বাড়তেই থাকে অতএব।

বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এল চন্দ্রাননী। এসেই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করল। বলা বাহুল্য বেশ প্রসন্ন হল না।

দুপুরবেলা হালদারবাড়ি গিয়ে স্বর্ণর মাকে বলল, 'হ্যাঁরে নতুন বৌ, এ আবার কি বুদ্ধি তোর, মায়ের ঘরের যোগাড়ের ভার মেয়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বসে আছিস! কাঁচা ছেলে, কী নাকি অপরাধ ঘটিয়ে বসে, তার ঠিক কি! হয়তো পা ঠেকে গেল, হয়তো চুল পড়ল। তোর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে গেলাম আমি—'

স্বর্ণর মা পাঠকদিদির এই অমূলক আশঙ্কায় হেসে উঠে বলল, 'ও দিদি, সে ভয় করো না। স্বন্ন আমার থেকে ঢের ওস্তাদ। ওর কাজকর্ম্ম দেখলে তাক লেগে যায়। কে বলবে একটা পাকা গিন্নীর কাজ নয়। ওতে তুমি নিশ্চিন্দি থেকো। বাপের ব্যামোয় খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে এসেছ, দুদিন জিরেন খাও। মায়ের ঘরের যোগাড় স্বন্ন যেমন চালাচ্ছে চালাক।'

চন্দ্রাননী এই ন্যাকাচণ্ডীর কথায় জ্বলে না উঠে পারে না। ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'চালাক বললেই তো আর চলতে দেব না আমি, আমার কাণ্ড-জ্ঞান আছে। বলি, ভোগের যোগাড়ের ছুতোয় তোমার ওই বয়েসওলা মেয়ে সন্ধ্যেভোর সর্বর কাছে ঘুর ঘুর করে, এটা দেশে ধর্মে ভাল? না নিশ্চিন্দির বস্তু?'

ইতিপূর্বেই যে মেয়েটাকে চন্দ্রাননী কাঁচা ছেলে বিশেষণে ভূষিত করেছে, সেটা আর খেয়াল থাকে না তার।

স্বর্ণর মা-র ঘাড়টা হেঁট হয়। বছর খানেক আগে থেকে সোমত্ত বয়েসের ছুতোয় সর্বর সঙ্গে খেলাধুলো

করা বারণ হয়ে গেছে স্বর্ণর। সে তো স্বর্ণর মা-র অবিদিত নয়। পড়শীনীদের গঞ্জনায় নিজেই সে স্বামীর কাছে কেঁদে পড়ে মেয়ে শাসন করেছে।

কিন্তু এটা হল আলাদা কথা।

কাজটা মায়ের, আর জায়গাটা মহাপীঠস্থান, এখানে দুটো ছেলেমেয়ের একত্র উপস্থিতি যে দুষ্য হতে পারে, সেটা স্বর্ণর মা কনকের বুদ্ধির অগম্য।

যোগ-যাগের দিন, শনি-মঙ্গল, অমাবস্যা-সংক্রান্তির দিন যখন মায়ের মন্দির ভিড়ে ভেঙে পড়ে, চেঁড়ে-চ্যাপ্টা অবস্থা ঘটে মানুষের, তখন কি মেয়ে-পুরুষে বিভেদ থাকে? গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। কই, তখন তো কেউ দৃশ্যকটুর কথা তোলে না? ধর্মস্থান পুণ্যস্থান, ও-কথা মনে আনাও তো পাপ।

সেই কথাই বলে কনক অস্ফুট গলায়, 'মায়ের থান—'

'থাম্ তুই নতুন বৌ! মায়ের থান বলে আগুন আগুনের কাজ করবে না?

হ্যাঁ, হতিস যদি আমাদের পালটি ঘর, এতে চোখবুজে থাকতাম। আর—' বাকি কথা শেষ হবার আগেই সহসা বোকাসোকা কনক এক কাজ করে বসে। আচমকা চন্দ্রাননীর দুটো পা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'নাই বা হল পালটি ঘর, ভেন্নজাত তো নয়! ভাসুরঠাকুর ইচ্ছে করলে সবই হতে পারে দিদি। তুমি আমার স্বন্নকে পায়ে ঠাঁই দাও।' কনক বোকা। চন্দ্রাননী বোকা নয়।

চন্দ্রাননী পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে কৃপাহাস্যে বলে, 'এই এক বদ্ধ পাগল। একজাত হলেই হল? অসম্ভব কখনো সম্ভব করা যায়? এদের এই পাঠক বংশ হল জাত গোখরোর বংশ। আর হালদার হল হেলে-ঢোঁড়ার জাত।'

স্বয়ং নোটো হালদার যদি এখানে উপস্থিত থাকত, সন্দেহ নেই, বংশসর্পের এই শ্রেণী-বিভাগে ফাটাফাটি কাণ্ড করে ছাড়ত। ঈশ্বর কৃপায় নেই।

কনক নোটোর অনুপযুক্ত সহধর্মিণী, তাই সে ভয়ে কাঁটা হয়ে বলে, 'রাগ করো না দিদি! উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ সবই জানি, তবে শুনেছি নাকি শাস্তরে আছে 'দুষ্কুলাদপি স্ত্রীরত্নং', সেই ভরসায় বলছি ভাসুরঠাকুর যদি—'

চন্দ্রাননীর মুখে একটু দার্শনিক হাসি ফুটে ওঠে। চন্দ্রাননী আপসোসের মনটাকে কঠিন ভূমিতে স্থাপন করে বলে, 'শাস্তরের কথা শাস্তরে আছে, মানুষের কথা মানুষে। এ-কথা তোর ভাসুরের কানে তুললে আমায় পাঁশপেড়ে কাটবে। নইলে তোর মেয়ে তো সোন্দর। বৌ করার অযুগ্যি নয়। সত্যি বলতে—'

শুধু সোন্দর বলে থেমে গেল চন্দ্রাননী, সে নিতান্তই পড়শীর মেয়ে বলে। নিজের মাসি-পিসির ঘরের মেয়ে হলে বলত 'অতুল্য সুন্দরী, আর্মানীবিবির মতন ছাঁদ। হলে বৌয়ের মতন বৌ হবে।'

কিন্তু ওইটুকুই কি কম? যেটুকু বলে ফেলেছে চন্দ্রাননী? একটা অবোধ বালিকা-মনের কাছে ওইটুকুই পরম আশ্বাসবাহী।

স্বর্ণ ছাদে উঠেছিল শুকনো কাপড় তুলে আনতে, সিঁড়িতে নামতে নামতে শুনতে পেল 'তোর মেয়ে তো সোন্দর, বৌ করার অযুগ্যি নয়।'

স্বর্ণর মনের সামনে হঠাৎ এক স্বর্গপুরীর বন্ধ দরজা খুলে গেল। মা ভৈরবীকালী তাহলে প্রার্থনা শুনেছেন। পাঠক-জ্যেঠিমা নিজে এসেছেন সম্বন্ধ নিয়ে। মা, মাগো, কালই তোমার পায়ে একশো আট জবা দেব মা!

স্বর্ণ আর নীচে নামতে পারল না। সেই কাচা কাপড়ের ডাঁই নিয়ে আবার পা টিপে টিপে উপরে উঠে গেল। নামলে হয়তো ভালই হত, পরবর্তী কথাগুলো শুনতে পেত, আকাশ-কুসুমের সুরভিত শ্বাসে স্পন্দিত হত না। কারণ চন্দ্রাননীর কথায় কনক আর একবার তার পা চেপে ধরে আকুল গলায় বলে বসে, 'এটি তোমায় ঘটাতেই হবে দিদি, ছোটকাল থেকে দুটোতে বড় ভাব। যেন নাটক-নভেলের মতন ভালবাসা। চোখে চোখে চায় যেন শুভদৃষ্টি—'

বলা বাহুল্য, কথা সে শেষ করতে পায় না। চন্দ্রানীর মুহূর্তপূর্বের ঈষৎ দুর্বলতাটুকু মুহূর্তেই তিরোহিত

হয়। চন্দ্রাননী যেন আগুনের দাহে ছিটফিটিয়ে ওঠে। 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা, তুই যে আমায় তাজ্জব বানিয়ে দিলি নতুন বৌ! বলি, ঘরে বসে বসে এইসব কুচ্ছিৎ কথা শিখলি কোথায়? তোর ওই পাড়া-মজানি মেয়ের কাছে নাকি? ছি ছি! গোল্লায় যা নতুন-বৌ, গোল্লায় যা। ও মাগো, ঘেন্না আমি রাখব কোথায়! যাচ্ছি লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার কাছে, চ্যালাকাঠ পিটিয়ে তার নাটক-নভেল বার করছি। দেখতে ভিজে বেড়াল, ভেতরে ভেতরে পিপুল পেকেছে। চললাম আমি, আর এই বলে গেলাম—তোমার মেয়ে যেন আর মায়ের ভোগের যোগাড়ে না যায়। আজ থেকে আমিই করব।'

দুমদুমিয়ে চলে যায় চন্দ্রাননী।

ছাদ থেকে দেখতে পায় স্বর্ণ সেই যাওয়াটা। স্বপ্নেও বুঝতে পারে না শেষ কী মনোভাব নিয়ে গেলেন পাঠক-জ্যেঠিমা। অনেকক্ষণ পরে পা টিপে টিপে নামে। ভয়ে ভয়েই নামে, কে জানে মা বকে উঠবে কিনা। বলবে কি ছাদে কি তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি স্বর্ণ?

কিন্তু মা কালীর দয়া, মা সে-সব কিছু বলল না। মা শুধু ঘর থেকে বলল, 'তোকে মন্দিরে যেতে হবে না, ও বাড়ির জ্যেঠি এসে গেছেন। তোকে যেতে মানা করে গেছেন।'

স্বর্ণর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। স্বর্ণর বুকের ভিতরটা খালি হয়ে গেল। তবু স্বর্ণর চোখটা আহ্লাদেই উপচে উঠল।

জ্যেঠিমা বারণ করে গেছেন। তার মানে সম্বন্ধটা পাকা করে ফেলবার আগে ওদের দেখা-সাক্ষাতে নিষেধ করেছেন। মা ভৈরবীকালী, সেই কোন্ কালে যেন সর্বদার কোন্ ঠাকুদ্দাকে তুমি নাকি বলি থেকে রক্ষে করেছিলে, আজ আমাকে তাই করলে। কে জানে বাবার কখন কি মর্জি হত, দিত কোথাকার কাদের কাছে বলি। তাছাড়া আর কি, বিয়ে হওয়া মানেই তো এককোপে সাবাড়।

জ্যেঠিমার পায়েই একশো আট ফুল দিয়ে পুজো করতে ইচ্ছে করছে স্বর্ণর। সত্যি, মানুষটা দেখতেই রণচণ্ডী, ভেতরটা ভাল, মায়া-মমতা আছে। পুজুরী জ্যাঠা ওনার কথা ঠিক শুনবেন। দেখি তো জোড়হস্ত।

দশে এখনো পা দেয়নি স্বর্ণ, তবু দাম্পত্য-লীলার এসব লীলা সে বোঝে। দেখে দেখে আর শুনে শুনে সে হাডহদ্দ।

তা, স্বর্ণর আপাতদর্শনটা ভুলও নয়।

শিবেশ্বর পাঠক চুলো নামক জায়গাটার নেশায় যতই আকৃষ্ট থাক, বাড়িতে গৃহিণীকে যমের তুল্য দেখে। সংসারে চন্দ্রাননীর গলাবাজির কাছে অহরহই তার নতি-স্বীকার। চেঁচামেচি করে চন্দ্রাননী পাছে শিবেশ্বরের চুলোর ঠিকানাটা পাড়া জানায়, তাই শিবেশ্বর আরো জোড়হস্ত।

কিন্তু চুলোটা?

সেটা পালিয়ে, লুকিয়ে। সন্ধ্যায় মায়ের ভোগারতির পালা চুকলেই কেটে পড়ত শিবেশ্বর, গভীর রাত্রের আগে আর বাড়ি ঢুকত না। কখনো কদাচ হয়তো একেবারে সকালেই। এখন 'সন্ধ্যের' সেই কর্তব্যের দায়টাও ঢুকেছে, কাজে কাজেই বিকেলবেলা থেকেই গা-ঢাকা। তারপর রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে যথারীতি হাতে-পায়ে ধরা, নাক-কান মলা, মা কালীর দিব্যি গালা। এবং সেই পুরনো গল্পটাকে অন্য অন্য পোশাকে মঞ্চে আনা। এসব তো আছেই।

গল্পটা এই ধরণের—

মন্দিরের এলাকা থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কেমন দিকভুল হয়ে গেল, মনে হল কে যেন মন্তরপড়া দিয়ে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পথ-ঘাট সব নতুন অচেনা, চলেছি তো চলেছি, তারপর এক মায়াবিনী পিশাচী খলখল করে হেসে উঠে বেঁধে নিয়ে কোথাকার এক বধ্যভূমিতে নিয়ে চলল। তখন কোনমতে সেই বাঁধন কেটে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। কোন্‌দিকে ছুটছি জানি না, কেন ছুটছি জানি না, শুধু জানি ছুটতে হবে। সেই ছুটতে ছুটতে হঠাৎ 'দেখি দরজা—সাজিয়ে-গুছিয়ে। এই গল্পটাই চন্দ্রাননীর কাছে পেশ করতো শিবেশ্বর।

একটা অলৌকিক, একটা ডাইনির হাতছানি, একটা নিশিতে পাওয়া-পাওয়া ভাব থাকবেই।

প্রথম দু-একদিন ভয় পেয়েছিল চন্দ্রাননী, তারপরই থুড়তে শুরু করল বরকে। সেকালের সতীসাধ্বী পতিব্রতা বলে যে কিছু কসুর হল তা নয়। কিন্তু শিবেশ্বর তবু পালানোও ছাড়ে না, গল্প বলাও ছাড়ে না। 'হ্যাঁ যাব, বেশ করব।'—এ কথা বলতে পারে না বলেই এত জ্বালা শিবেশ্বরের।

কিন্তু সংসার লীলার শিবেশ্বর বশংবদ।

চন্দ্রাননী তাই ঠিক করল ছোঁড়াটার বিয়ে দিয়ে তবে আর কাজ আমার। হালদারের মেয়ের সঙ্গে নভেল-নাটকের শুভদৃষ্টি ঘোচাচ্ছি বাছার। এখানে সে-ই কর্ত্রী, অতএব ঘটককে ডেকে পাঠানো তারই কাজ।

মেয়েটার রূপের জন্যে কদাচ কখনো মনে উদয় হয়েছে সত্যি, আহা, যদি আমাদের পালটি ঘর হত। কিন্তু বোকা কনক নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে, নিজেব মাথা নিজে খেয়েছে। সেই বেখাপ্পা কথাটা বলে বসেছে। চন্দ্রাননী অতএব ভাবতেই থাকে। ও মেয়ে ছোট থেকেই মোহিনী। ওকে সায়েস্তা করা আমার কর্ম নয়। তায় আবার এদেশেরই ঝিউড়ি মেয়ে! ছেলে তো আমার ওর সঙ্গে বে' হলে ওই পাদপদ্মেই আত্মসমর্পণ করবেন।

তাছাড়া হবেই বা কি করে? বামন হলেই তো আর কুলিন হয় না? তা হলে তো ডানার গরবে আরশোলাও পাখী হত।

যদিও পাঠক-বংশকেও এই বীরপুরের কেউ খুব একটা উঁচু কুলিন ভাবে না। শুধু দেবী-মাহাত্ম্যে পাঠকদের সম্মান। তবু নিজেদেরকে ওরা খুবই উঁচু ভাবে। এবং দেশ-বিদেশ থেকে নিজেদের 'মেল' যোগাড় করে কাজ-কর্ম করে। কিন্তু তাতে তো কিছু এসে যায়নি। ইতিপূর্বে পাঠকদের কোন ছেলে-মেয়ে গ্রামের আর কোন ছেলে-মেয়ের দিকে শুভদৃষ্টির চোখে তাকিয়েছে এমন ইতিহাস জানা নেই বীরপুরে। অন্ততঃ এমন উদ্‌ঘাটিত হয়নি সে ইতিহাস।

চন্দ্রাননী ঘটককে ডাকতে পাঠিয়ে মন্দিরে গেল।

এদিকে নিঃশঙ্ক হরিণী আনন্দে বিবশ হয়ে টুক করে একফাঁকে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যায় 'মাকে' কৃতজ্ঞতা জানাতে। আজ একাই, তারপর ওকে খবরটা জানিয়ে কোন এক ফাঁকে কাল যাবে জোড়ে।

কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, পথে বেরিয়েই দেখা।

স্বর্ণ এদিকে-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'মন্দিরে যাচ্ছ?'

'না, এক্ষুনি কি? এখনো তো সূয্যিমামা রূপোরঙা। যাচ্ছি গদাইদের বাড়ি। তুই?'

স্বর্ণ একটু মুখ টিপে হেসে ভ্রূভঙ্গী করে বলে, 'আমি যাচ্ছি 'মায়ের' কাছে।'

মায়ের কাছে যাবার নামে এই মুখটেপা হাসি ও ভ্রূভঙ্গিটা বেখাপ্পা। তা ছাড়া স্বর্ণব পরনে সেই লাল চেলিখানাও নেই, যে-খানায় স্বর্ণকে বিয়ের কনে ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

সর্বেশ্বর তাই বলে ওঠে, 'এক্ষুনি মায়ের বাড়ি? আর এই বস্তরে?'

স্বর্ণ আবার সেই যুবতী হাসিটুকু হেসে বলে,''মাকে পেন্নাম জানাতে যাব তার আবার বস্তরেব বিচার। তবে দেখাই যখন হয়ে গেল, ভাবছি যুগলে পেন্নামটা আজই সেরে নেওয়া যেত। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে।'

সর্বেশ্বরের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সর্বেশ্বরের চোখ ড্যাবা হয়ে ওঠে।

সর্বেশ্বর শিউরে বলে, 'কি বললি?'

'বলিনি কিছু'—স্বর্ণ টিপে টিপে ছাড়ে। 'বলছি একটা সুখবর ছিল—'

সুখবর! সর্বেশ্বর নিজের বিশ্বাসে সুখবরটার মূর্তি কল্পনা করে।

নির্ঘাৎ মা-বাপের বাড়ি থেকে ফিরে স্বর্ণর ওই দেবী-সেবার কাজের সুখ্যাতি শুনে কাজটাতে ওকে বরাবরের জন্যেই বহাল রাখল।

অতএব নিত্যকার সেই দর্শন-সুখটা রইল।

সুখের দিন ফুরলো বলে—এই দুঃখেই তো মরছিল।

তাই সর্বেশ্বর আশান্বিত চিত্তে বলে, 'সুখবর? মা বুঝি—'

'হ্যাঁ, জ্যেঠাইমা গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি। মানে, মা ভৈরবীকালীর প্রেত্যক্ষ কৃপা। অথচ মাকে আমরা কাল্লা বলে কত দুষেছি। সব বলছি, চল। অনেক কথা।'

স্বর্ণর ছোট বুকটা আহ্লাদে ওঠা-পড়া করতে থাকে, স্বর্ণর চোখ দুটো আবেশে প্রায় জল-ভরা হয়ে আসে।

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বলে, 'যাব কোথায়?'

'চল না তোর সেই বটঝুরি ঘরে। যেখানে লুকিয়ে বসে তামাক খেতে শিখেছিলি পাকামী করে।'

তা পাকামীই বটে। তবে সর্বেশ্বরের নয়, স্বর্ণরই।

সেই কতদিন যেন আগে ছেলেবেলায় স্বর্ণই একদিন জায়গাটা আবিষ্কার করে সর্বেশ্বরকে দেখিয়েছিল। বলেছিল, 'তামাক খাবার এত বাসনা, খড়মপেটা খাবার ভয়ে তো পারিস না, চল তোকে একটা গুপ্ত কুঞ্জ চিনিয়ে দিই।'

স্বর্ণ তো চিরদিনই সর্বেশ্বরের সকল অকাজের গুরু। সকল অকাজের পরামর্শদাতা। তাই তামাক খাবার জায়গা খুঁজে দিয়েছিল।

তা ছাড়া মাঝে-সাঝে আচারটা আমসত্ত্বটা চুরি করে ওইখানে ডেকে নিয়ে যেত স্বর্ণ সর্বেশ্বরকে। ইদানীং বড় হয়ে পর্যন্ত কুঞ্জ পরিত্যক্ত ছিল। আজ গোপন সুখবরটা পরিবেশন করবার জন্যে মনে পড়ল স্বর্ণর।

আগের চেয়ে যেন আরো গভীর আর ঘন হয়ে গেছে ঝুরিগুলো। একটা ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়তেই যেন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় চিরকালের নরনারী একখানা বন্ধ-দরজা ঘরের আড়ালে ঢুকে গিয়ে।

* কিন্তু ওরা কি সত্যিই নরনারী যে এই নিভৃতির সুযোগ নেবে? না, তা নিতে জানে না ওরা।

স্বর্ণ শুধু বলে, 'দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে দুটো কথা বলব কি, পাপচক্ষু পৃথিবী হাঁ হাঁ করে মাকে দশকথা শোনাতে আসবে। যাক্ শুনলিতো ঘটনা? দেখলি মা ভৈরবীকালীর শক্তি! আমার মন নিচ্ছে নির্ঘাৎ জ্যেঠিমা বাপের বাড়িতে স্বপ্ন পেয়েছে।'

সর্বেশ্বর কিন্তু এতটা উৎসাহিত বোধ করে না। সর্বেশ্বর বিশ্বাস করে না। পাঠকে হালদারে যে কিছুতেই বন্ধন-সেতু রচনা করা যায় না, সে বোকা হলেও বোঝে, তাই অনেকবারের পর আরো একবার বলে, 'আমার যেন কিছুতেই যেন প্রেত্যয় নিচ্ছে না। এও কি সম্ভব? এত সুমতি হবে মা-র? তুই কি শুনতে কি শুনেছিস।'

স্বর্ণ সতেজে বলে, 'এতবার বললাম তবু সন্দ? কেন, মা ভৈরবীকালীর ওপর বিশ্বাস নেই? মা ইচ্ছা করলে হয়কে নয়, রাতকে দিন করতে পারেন না?'

'তা পারেন বটে', সর্বেশ্বর ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিন্তু মা কি সত্যিই সে ইচ্ছে করেছেন?'

'বেশ করিসনি বিশ্বাস।' বলে স্বর্ণ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

যদিও পড়ন্তবেলার ছায়ায় ওদের অবস্থান-স্থানটা এত বেশী অন্ধকার হয়ে গেছে যে ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না, তবু বেচারী কিশোর সর্বেশ্বর এই পরিবেশের কোন সুযোগই নিতে পারে না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, 'বিশ্বাস করব না তা বলছি না, বলছি এত সুখ কি সইবে?'

'সইবে না কেন?' স্বর্ণ তীব্রস্বরে বলে, 'কারুর সুখের ঘরে আগুন দিতে যাইনি আমরা যে সইবে না। এই বটবৃক্ষ সাক্ষী, আমরা—'

স্বর্ণ একটু ঢোঁক গেলে।

স্বর্ণ অতঃপর যথার্থই নাটক-নভেলের মত পাকা পাকা কথায় বলে, 'আমরা ইহ-পরকালে পতি-পত্নী।'

স্বর্ণ নাটক-নভেল পড়েনি বলে স্বর্ণ এসব কথা শিখতে পারবে না তার কোন মানে নেই। স্বর্ণ কি গ্রামের যাত্রা-অপেরা দেখেনি? প্রেম প্রণয়, নাথ প্রাণেশ্বর, এসব শোনেনি? প্রণয়জনিত যন্ত্রণা, প্রণয়-প্রতিজ্ঞায় মৃত্যু—অনেক কিছুই স্বর্ণর জানা। তবে হ্যাঁ, স্বর্ণর বয়সের সব মেয়ের এত বোধশক্তি

নেই। স্বর্ণর সেটা আছে। আর স্বর্ণর মুখস্থ করবার ক্ষমতাও আছে।

তাই স্বর্ণ অনায়াসে ইহ-পরকালের শপথবাক্যখানি উচ্চারণ করতে পারে।

কিন্তু সর্বেশ্বরের হয়ে যায়। সর্বেশ্বরের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠে।

সর্বেশ্বর এই অসমসাহসিকার একটা হাত ধরে ভ্যাবলাগলায় বলে ওঠে, 'স্বর্ণ!'

পড়ন্তবেলা দ্রুত পড়তে থাকে, ভিতরটা আরো ঝাপসা হয়ে আসে, শুধু স্বর্ণর গলাটা ঝাপসা নয়। স্বর্ণ মাজা-ঘষা পরিষ্কার গলায় বলে, 'মনে রাখিস, পাণিগ্রহণও হয়ে গেল।'

'স্বর্ণ!' সর্বেশ্বর আবেগের গলায় ডাকটা ডেকে ওঠে, কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। তাই হঠাৎ বলে ওঠে, 'স্বর্ণ, তাই যদি, তবে তুই এখনও আমায় 'তুই' ডাকছিস কেন?'

স্বর্ণ একটু চকিত হয়। স্বর্ণ অতঃপর অনুতাপের গলায় বলে, 'তা বটে। আচ্ছা, আজ থেকে আর 'তুই' বলব না। এই পেন্নাম করে এতদিনের পাপের প্রাচিত্তিরটা করে নিই।'

বলে মুণ্ডু হেঁট করে সর্বেশ্বরের পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে ফেলে স্বর্ণ।

ভ্যাবলা সর্বেশ্বর ভ্যাবলার মতই দাঁড়িয়ে থাকে। দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের কথাটাও মনে পড়ে না তার। একটু পরে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'মাঝে মাঝে এখানটাতেই আসিস স্বর্ণ, নইলে আর দেখা হওয়ার আশা নেই।'

সেই থেকে ওই ওদের দেখা-সাক্ষতের জায়গা। চোর চোর খেলার মত ঝপ করে এক সময় ওর মধ্যে এসে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তো স্বর্ণ, এবং প্রায়শঃই দেখতে পায় সর্বেশ্বর তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশাব কামড় খাচ্ছে। এই চলছে বেশ কিছুকাল। স্বর্ণকে আসতে হয় অনেক কৌশলে, তাই দেরি হয়। স্বর্ণকে দেখলেই সর্বেশ্বরের অভিমান উথলে ওঠে। আজও উঠল। বলল, 'পষ্ট বলিস না কেন তোর আর আসার সুবিধা হবে না। কাঁহাতক আর এমন যন্ত্রণা সহ্য হয়?'

স্বর্ণও ক্ষুব্ধ অভিমানের গলায় বলে, 'আমারই যেন বড় সাধ যে তোমায় যন্ত্রণা খাওয়াই। মা কী খিটখিট করে আজকাল জান না তো? বিয়ে বিয়ে করে পায়ে বেড়ি পড়েছে আমার?'

'বিয়ে তাহলে হয়ে যাচ্ছে তোর।'

স্বর্ণ তীব্র ঝঙ্কারের সঙ্গে বলে ওঠে, 'তা' তুমি যদি তোমার বিয়ে করা পরিবারকে আর কারুর হাতে তুলে দাও তো হবে। বলি পষ্টাপষ্টি বল এবার তোমার মাকে।'

সর্বেশ্বর করুণ গলায় বলে, 'তার চেয়ে বল না কেন বাঘকে বলতে। সেদিন তুই কি শুনতে কি শুনলি, একটা অঘটন ঘটনা হল, তারপর তো দেখছি বিপরীত্ত। মা তো তোদের নামে খড়্গহস্ত। ঘটকও তো যাচ্ছে আসছে। সহসা কেন যে তুই বললি মা তোর সঙ্গে আমার—'

সর্বেশ্বর চুপ করে যায়। কেন না চুপ করতে বাধ্য হয়।

স্বর্ণ সহসা গলায় আঁচলটা দিয়ে হাত জোড় করে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, 'ঘাট হয়েছিল, অন্যায় হয়েছিল, আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা তোমার এত গলগ্রহ মনে হবে তা বুঝতে পারিনি। শুনলাম মা-র কাছে জ্যেঠিমা রব কাটছেন—'মেয়ে তোমার সোন্দর, বৌ করবার যুগ্যি।' ভাবলাম, মা ভৈরবীকালী বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।' গলাটা প্রায় সবটাই বুজে আসে স্বর্ণর, শেষ কথাগুলো অস্পষ্ট শোনায়।

সর্বেশ্বর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমি কি তাই বলছি—'

'যা বলছ, তা বুঝেছি।' স্বর্ণ গলা পরিষ্কার করে বলে, 'মা-বাপ আমার গলায় চোপ দেবে, তুমি মুখে তালা-চাবি লাগিয়ে সঙের মতন তাই দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ব্যস্! বেশ তাই হোক। তাহলে এই শেষ। আর আমি মাকে ভাঁড়িয়ে একশো মিছে কথা বলে ধেয়ে ধেয়ে এখানে এসে জুটতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।'

'স্বর্ণ তোর পায়ে পড়ি। দুদিনে পাঁচদিনে একবার না দেখা হলে প্রাণটা বড্ড খাঁ খাঁ করে।'

'করুক। জন্মভোরই তো করবে।'

'মা ভৈরবীকালী তাহলে আমাদের মুখ চাইলেন না!' নিশ্বাস ফেলে সর্বেশ্বর।

কিন্তু স্বর্ণ এখন হিংস্র। দৃঢ় গলায় বলে, 'চাইতেন, যদি তোমার তেমন প্রার্থনার জোর থাকত। তুমি আলগা আলগা বলেছ।'

'স্বর্ণ, স্বর্ণ, এই কথা বললি তুই আমায়! রাতদিন মাকে জানাচ্ছি না 'মা যেন আমায় বিয়ে দিয়ে না ফেলে।'

'মা কালা!'

'তা হলে উপায়?'

'উপায় আবিষ্কার- কর।'

'আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

'বেশ, তবে এই শেষ। বুঝছি মরণই আমার গতি।'

স্বর্ণ আশ্রয়-কুঞ্জ ত্যাগ করে। রীতিমত বিক্রম সহকারেই করে।

কিন্তু বেচারী সর্বেশ্বর কি করবে? স্বর্ণর সামনে মনে হয় ঠিক আছে, কাউকে দিয়ে বলাব মাকে, হালদারদের ঘরেই বিয়ে দাও আমায়, পাঁচজনকে বল যে মা ভৈরবীকালী স্বপ্নাদেশ করেছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে চন্দ্রাননীর গোলালো আননখানি দেখলেই পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকে যায় তার।

তবু আজ মরি না মরতে আছি প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি ফিরল সর্বেশ্বর।

চন্দাননী ছেলের জন্যে ঘরবার করছিল। কারণ ঘটক-ঠাকুর এক কন্যাদায়গ্রস্ত বাপকে সরাসরি ধরেই এনেছেন, তিনি পাত্রটিকে দেখে যাবার আকিঞ্চন করছেন।

অতিথি-সৎকারের ব্যাপার মিটেছে, সর্বেশ্বরের টোল থেকে ফেরার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ। শিবেশ্বর মায়ের দ্বিপ্রাহরিক ভোগরাগ সেরে বাড়ি ফিরে খুঁজতে বেরিয়েছেন ছেলেকে, ছেলের দর্শন নেই।

কখন চান করবে, কখন ভাত খাবে ছেলে! তাছাড়া লোকটা বসে রয়েছে, সেও একটা অস্বস্তি। ঘরবার করছে তাই চন্দ্রাননী।

যখন হতাশ ভদ্রলোক ঘটকের কাছে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেন না, ছেলে কী অবাধ্য দুর্বিনীত, এবং ঘটক যখন তার বিপরীতে বহু অকাট্য আশ্বাস দিতে থাকে, তখন অদূরে দেখা যায় শিবেশ্বর ছেলের কান ধরে নিয়ে আসছেন।

চন্দ্রাননী প্রমাদ গনে। এ দৃশ্য দেখলে কোন ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করবে? ছেলে যে পাজী তা তো বুঝেই যাবে।

চন্দ্রাননী খিড়কির পথে বেরিয়ে পড়ে দ্রুত এগিয়ে বলে, 'কান ছাড়ো।'

'কান ছাড়ব?' শিবেশ্বর ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেন, 'কান ছাড়ব? আজ তোমার ছেলের হাড় থেকে মাংস ছাড়াব। আমি হতভাগা গরু খোঁজা করে ছেলে খুঁজছ, আর বাবা আমার লভ্ করছেন।

'চুপ, চুপ!' চন্দ্রাননী তখনকার মত কথাটায় ধামা-চাপা দেয়।

শিবেশ্বর ঘুরে বড়রাস্তা দিয়ে বাড়ির সদরে ঢোকেন।

এবং যেমন ঘর্মাক্তকলেবর মূর্তি ছিল সেইভাবেই ভাবী শ্বশুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় সর্বেশ্বরকে। কি ভাগ্যি তখনো শিবেশ্বরের হাতে সর্বেশ্বরের কানটা নেই।

নেই, কিন্তু প্রাণটা তো শিবেশ্বরেরই মুঠোয়।

পাত্র পছন্দ করিয়ে কথা পাকা করে ফেলেন শিবেশ্বর।

সর্বেশ্বর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, তারপর শাস্তিটা ভালই হয় সর্বেশ্বরের। শিবেশ্বরেব খড়মের গুলোর মর্মান্তিক আস্বাদ গ্রহণ করে সর্বেশ্বর দারুণ চিৎকারের সঙ্গে। চন্দ্রাননী শুদ্ধু সায় দেয়, আটকায় না।

আটকানো দূরস্থান, বরং ঘটনা শুনে রণমূর্তি নিয়ে চেঁচায়, 'হ্যাঁ, দিয়ে দাও আরো দু-ঘা, জন্মের শোধ পাজীমো করা ঘুচুক। অ্যাঁ, বল কি তুমি, মায়ের মন্দিরে গিযে হাত-ধরাধরি! এই পুণ্যির বংশে এমন

পাতুকী জন্মাল কী করে গো? কী কুলাঙ্গার পেটে ধরলাম আমি!...ওগো, আমার যে বিষ খেতে ইচ্ছে করছে গো!'

কিন্তু সবেরই বোধকরি মাত্রা থাকা দরকার।

শাসনের মাত্রা ছাড়ালেই সহ্যের মাত্রাও ছাড়ে। হঠাৎ এক বিপরীত ঘটনা ঘটে। প্রহার-জর্জরিত সর্বেশ্বর হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হাত ধরেছি তো হয়েছে কি? মা কালীকে সাক্ষী রেখে ওকে বিয়ে করেছি আমি।'

হঠাৎ শিবেশ্বরের হাত থেকে খড়মটা খসে পড়ে, শিবেশ্বর স্খলিত স্বরে বলেন, 'কী বললি? কী বললি? মাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছিস ওকে?'

চন্দ্রাননী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

আর পরক্ষণেই শিবেশ্বর বাঘের মত ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেন, 'আয়, আজ তোকে খুন করে সেই রক্তে হাত ধুই।'

কিন্তু শুধুই কি সর্বেশ্বর খুন হচ্ছিল? স্বর্ণ হচ্ছিল না? স্বর্ণর বাপও কি ধরে ফেলেনি তার মেয়ে প্রেম করছে? আর সেই ধরে ফেলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই?

ব্যাপারটা এই—

শিবেশ্বর যখন ভরদুপুরে চনচনে রোদে ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, নোটো হালদার তখন মন্দিরের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল।

হঠাৎ হুঙ্কার শুনতে পেল নোটো। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল পিছনে শিবেশ্বর। তাঁর দু-হাতে দুটো কান। একটা কান শিবেশ্বরের নিজের ছেলের আর একটা কান নোটোর মেয়ের।

মানে!

মানে ব্যাখ্যা করবার সময় এখন নেই শিবেশ্বর পাঠকের, শুধু কুৎসিত একটা মুখভঙ্গী করে মেয়েটাকে নোটোর হাতে সমর্পণ করে বলে যান, 'কেলেঙ্কারী কতদূর গড়িয়েছে আমি জানিনে নোটো। তবে তোকে এই বলে যাচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে যদি মেয়ের বিয়ে না দিস, ভবিষ্যতে কী করে তুই মেযেব বিয়ে দিস দেখব। এই সাতদিন সময় দিলাম।'

ছেলের কানটা করায়ত্তে রেখে হন হন করে চলে যান শিবেশ্বর।

আর বাঘা নোটো শেয়ালের মত ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে সেই গমনপথের দিকে।

কিন্তু বাঘা নোটো হালদার কতক্ষণ আর শিয়ালের ভূমিকা অভিনয় করতে পারে? মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্রেফ তাকে দেয়ালের কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়ে মাথাটা ঠুকতে লাগল দেযালে। ঝুনো নাবকেল হলে অথবা পাকা বেল হলে চৌচির হত সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য শক্ত স্বর্ণর মাথাটা। হয়তো তার মেঘপ্রমাণ চুলের খোঁপাটাই তাকে চৌচির হওয়া থেকে রক্ষা করল। শুধু গোটাকতক জায়গায় আলুর মতন হয়ে উঠল।

স্বর্ণ নিথর। স্বর্ণ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবারও চেষ্টা করে না, স্বর্ণ কেঁদে ওঠে না। নোটো যতই চাপা গর্জন করে, 'বল হারামজাদি, কোথায় কি করছিলি?' স্বর্ণ ততই যেন প্রস্তরত্বে পরিণত হয়। স্বর্ণ না তার বাপের বড় আদরের?

কনক যখন রান্নাঘর থেকে সাড়া পেয়ে ছুটে এসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী হয়েছে গো? কী সর্বনেশে কাণ্ড করছ!'—তখন স্বর্ণ ছাড়া পায়। নোটো হালদার মেয়েকে ছেড়ে এবার বৌয়ের মুণ্ডুটা ধরে।

'মেয়ে গলায় বেঁধে দীঘিতে ডুবে মরগে যা লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ! কাঁসি কাঁসি ভাত গিলতে পার আমার, আর মেয়ে সামলাতে পার না? মেয়ে রাস্তা-ঘাটে কেলেঙ্কারী করে বেড়ায়। আজ এক খাঁড়ায় দুজনকে কোপ দেব! মায়ের মন্দিরে হয়ে যাক দুটো নারী-বলি। অ্যাঁ, এমনি করে আমার গালে মুখে চুনকালি দিলি তোরা?.... এই শুনে রাখ স্বর্ণর মা, সাতদিনের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, হুকুম হয়ে গেছে। ঘাটের মড়া, বুড়ো তেজবরে, চারবরে, যা জোটে কপালে।'

ভাবা স্বাভাবিক—এরপর ক্ষুব্ধ অপমানাহত প্রহার-জর্জরিত সর্বেশ্বর ঘৃণায় অভিমানে গৃহত্যাগ করল এবং নির্যাতিতা উৎপীড়িতা স্বর্ণ দীঘির জলের নীচে আশ্রয় নিল। প্রেমিক-প্রেমিকার বয়েস ষোল আর এগারো হলেও পক্বতাটা যখন অত বেশী! অতএব বাল্যপ্রেমের একটা জ্বলন্ত মহিমার ইতিহাস লেখা রইল বীরপুরের মাটিতে।

অথবা এও ভাবা চলে, ওরা না গেল পালিয়ে, না ডুবল জলে। সর্বেশ্বর গায়ের ব্যথা নিয়ে দিন দুই বিছানায় পড়ে থেকে রথারীতি আবার বেনিয়ানের উপর চাদর চাপিয়ে হেঁট মুণ্ডে টোলের দিকে রওনা দিল, এবং স্বর্ণ মাথার ব্যথা নিয়েই নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে মায়ের রান্নার সাহায্য করতে লাগল। আর এরপর বাল্যপ্রেমের চিরন্তন রীতি অনুসারে যথাকালে দুজনের দু'জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল। সর্বেশ্বর বিয়ে করতে যাবার সময় একটু কম আমোদ করল, আর স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় একটু বেশি কাঁদল।

হয়ে গেল প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন।

কিন্তু না, এ-সবের কিছুই হতে পেল না। কারণ শিবেশ্বরের ওই কড়া আদেশের পরদিনই এই বীরপুর গ্রামে এমন ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক এক কাণ্ড ঘটল, যাতে সবকিছু বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

যা ধারণাতীত, যা কল্পনাতীত, যা সমস্ত কিছু আশঙ্কার অতীত, তাই কিনা ঘটে বসে আছে? জাগ্রত দেবী কি এতদিন পরে আর একবার প্রমাণ করে ছাড়লেন তিনি কত জাগ্রত?

সমস্ত বীরপুর গ্রাম অজানিত কোন এক সর্বনাশের আশঙ্কায় থমথমিয়ে মন্দিরের ধারে কাছে জমায়েৎ হয়। সক্কালবেলাই যাদের উনুনে আগুন পড়েছিল, তাদের উনুন জ্বলে-পুড়ে নিভে যায়, যাদের উনুনে আগুন পড়েনি, তাদের উনুন ভয়াবহ শূন্যতার প্রতীকের মত বসে থাকে আয়োজনহীন রন্ধনশালায়!

বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে শান্ত করতে কারো মা-ঠাকুমা গুচ্ছিরখানি মুড়ি-চিঁড়ে ঢেলে দিয়ে যায়, কারো মা-ঠাকুমা তাদের প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে বেরিয়ে যায়। তারাও অতঃপর হেই হেই করতে করতে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

বীরপুরের বহু বাড়িতে আজ ছড়া ঝাঁট পড়ে না, গোয়ালের গরু ছাড়া হয় না। অথচ আজ সকাল সকাল কাজ সেরে নেওয়ার তাড়া ছিল।

আজ কৌশিকী অমাবস্যা, মায়ের বিশেষ উৎসব, বিশেষ ভোগরাগ। নিত্য সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখে অহরহই তো মায়ের কাছে মানত চলে, সে-সব পুজো এই সব বিশেষ বিশেষ দিনে পড়ে। তাই বিশেষ দিনে মহিলারা তৎপর হয়ে কাজ সেরে নেন, যাতে ভোগারতির সময় গিয়ে পৌঁছতে পারেন। অনেক গিন্নী অবশ্য নিত্য যান মন্দিরে, অনেকে আবার ন'মাসের ছ'মাসের যাত্রী। এঁরা বিশেষ দিনে ভোগ দেখতে চঞ্চল হন।

আজও হলেন। কিন্তু এ চাঞ্চল্য কি ভোগারতির সময় উপস্থিত হতে পারবার প্রস্তুতির চাঞ্চল্য? তা' নয়। এ এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখবার প্রস্তুতি-চাঞ্চল্য।

প্রথম দেখলেন অবশ্য শিবেশ্বরই।

কারণ তাঁকে আজ ভোরে উঠতে হয়েছে মঙ্গলারতির জন্যে। বিশেষ পুজোর দিনে, একটু বেশী ভোরে মঙ্গলারতির নিয়মটা এখনও বজায় রেখেছেন শিবেশ্বর। ইদানীং মাঝে মাঝে সর্বেশ্বরকে পাঠাচ্ছিলেন অবশ্য। ভোরবেলা ছেলেকে ঠেঙিয়ে তুলে অকারণ একটা আড়মোড়া ভেঙে বলছিলেন, 'শরীরটে তেমন ভাল ঠেকছে না সর্বা, তুই একটু যা দিকি মুখ-হাত ধুয়ে।'

আজ কিন্তু সে আরামের উপায় ছিল না, আজ চন্দ্রাননী বলে দিয়েছে, 'শেষ রাত্তিরে ছেলেটাকে টেনে তুলো না, গায়ের ব্যথায় নড়তে পারছে না হতভাগা।'

শিবেশ্বরকেই তাই ভোরবেলা ঘুমের খোঁয়াড়ি ভেঙে উঠে আসতে হয়েছিল। তা' আরতিটা যে করেননি তা নয়, করেছিলেন। ঘুম ঘুম চোখে ঢং ঢং করে ঘণ্টা নেড়ে আরতির পর্ব সেরে ফেলেছিলেন, চামর ব্যজন কালে ব্যাপারটায় চোখ পড়ল।

চোখ পড়ল।

চোখটা বিস্ফারিত হতে থাকল।

চোখটা স্তব্ধ হয়ে পল্লব পড়া বন্ধ হয়ে গেল। হাতের চামরটা মাটিতে পড়ে গেল। তারপর দাঁড়ানো শিবেশ্বর নিজেও 'মা' বলে একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়লেন।

প্রথম ঘটনা এই।

তারপর শিবেশ্বর ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাবুদের বাড়ির উদ্দেশে।

এ হেন প্রভাতকালে জমিদারবাবুর ঘুম ভাঙানো প্রায় অবিশ্বাস্য ধৃষ্টতা, তবু তাই করতে হল শিবেশ্বরকে। এত বড় বিপদের বার্তা আর কাকে জানাতে যাবেন?

বাবু—'অ্যাঁ! বল কি পাঠক?' বলে কাছা আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে এলেন।

রাতবাস কাপড়ে মন্দিরে ঢুকলেন না, বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বাইরের চাতালে বসে পড়ে বললেন, 'তুমি ঠিক দেখেছ পাঠক?'

হ্যাঁ, পাঠক ঠিক দেখেছেন বৈকি। অতবড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য কি ভুল হয়?

বাবু স্খলিত বচনে বলেন 'পাঠক, মায়ের পুজোয় কোন অনাচার ঘটেনি তো?'

পাঠকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরণ ঘটে। পুজোয় অনাচার! পুজোয় কিসের অনাচার? কেটে মটকা ছাড়া পরেন না কখনো পাঠক, হাত-মুখ না ধুয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন না।

শিবেশ্বরের কথা যোগাতে দেরি হয়।

আর কিছু নয়, সেই কালকের ব্যাপার। পুজোয় অনাচার নয়, মন্দিরে অনাচার। তারপর তিনিও স্খলিত স্বরে বলেন, 'পুজোয় কোন অনাচার ঘটেনি—'

অর্থাৎ অশ্বত্থামা হত ইতি গজ!

বাবু মাথায় হাত দিয়ে বলেন 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু এখন উপায়?'

'মা জানেন।' বলেন শিবেশ্বর, কিন্তু মনে মনে উপায় ঠিক করতে থাকেন।

তবে এক্ষুনি হবে না, ভিড়ে ভেঙে পড়ছে মন্দির।

সকালবেলা বাবুর হঠাৎ মন্দিরে ছুটে আসার ব্যাপার থেকেই খবরটা চাউর হয়ে গেছে। আগুন আর দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছোটে। এ-চাল থেকে ও-চালে, এ-মুখ থেকে ও-মুখে। দণ্ডখানেকের মধ্যে বীরপুর গ্রামের কারো আর জানতে বাকি থাকল না বীরপুর গ্রামে বজ্রপাত ঘটেছে।

মা ভৈরবীকালী অঙ্গহীন হয়েছেন। দেবীর যে-টি অভয় হাত, সেই ঊর্ধ্বোত্থিত ডান হাতটির করতল খানি উধাও।

স্রেফ উধাও!

আশে-পাশে ফুল-পাতার মধ্যে, হোম-কুণ্ডে, কি পদতলের শতদল পদ্মের খাঁজে খাঁজে কোথাও নেই সেই ভগ্নখণ্ড। তার মানে হঠাৎ ভেঙে পড়ে যায়নি, মা নিজেই হরণ করেছেন। গুটিয়ে নিয়েছেন অভয় কর। যেমন অনেককাল আগে নিয়েছিলেন লেলিহান রসনা।

এবারেও যদি জিভ হত, হয়তো এত ভয় পেত না কেউ, কারণ এখন দেবী স্বর্ণজিহ্বা। অতএব ভাবা যেত সেই সোনাটুকুর লোভেই হয়তো চোরে—

না, চোরের অসাধ্য কাজ নেই, চোরের অসাধ্য পাপ নেই। জিভ হলে চোর ভেবে মাকে পঞ্চগব্যে শোধন করে নিয়ে আবার সোনার জিভ গড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর! এ যে সর্বনাশ!

কে বলতে পারে এখন সমগ্র গ্রামটায় মড়ক লাগবে কিনা! কে বলতে পারে বাজ পড়বে কিনা, আগুন লাগবে কিনা!

কেউ ভাবছে না মৃণ্ময়ী প্রতিমা পুরনো হয়ে গেছেন, জীর্ণ হয়ে গেছেন, একটা অংশ খসে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সে অংশ রাশীকৃত শুকনো জবার মালা আর বাসি ফুল-পাতার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ঝুড়িখানেক তো নির্মাল্য জমে প্রতিদিন। দুবেলা সরাতে হয়।

কে বলতে পারে গত রাত্রেই এ ঘটনা ঘটেছে, কিংবা আরো আগেই ঘটেছে। আধো-আলো আধো-ছায়া ঘরে ঘৃত-দীপের শিখাটা জ্বালিয়ে ধরা মাত্র সিঁদুর লেপা সোনার জিভখানাই চোখের সামনে চক চক করে ওঠে। তাই হয়তো এ ত্রুটি নজরে পড়েনি।

না, এ-কথাটা কেউ ভাবছে না, ভাবছে না দৈবাতের ঘটনা। সকলেই মা কালীকেই দায়ী করছে। মা কুপিত হয়েছেন, মা অভয় কর সরিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু কেন?

তা কে বলতে পারে? নির্ঘাৎ বীরপুরের উপর কারো অভিসম্পাত পড়েছে।

পাপ, অনাচার, অভিসম্পাত, এই সবই ভাবছে সবাই। কার পাপ, কার অনাচার, কার উপর অভিসম্পাত, এটা চট করে কেউ ভাবতে পারছে না। পারছে শুধু শিবেশ্বর পাঠক। তার গায়ের রোম থেকে থেকে খাড়া হয়ে উঠছে রাগের ধাক্কায়।

'আজ আর তাহলে মায়ের পুজো হবে না ঠাকুরমশাই?' কে একটি বৃদ্ধা প্রশ্ন করেন।

শিবেশ্বর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'না, হবে না। দেখছ না মা কুপিত হয়েছেন!'

'তা মায়ের রোষ শান্তি করতে তো বেশি করে পুজো করাই দরকার বাবা!'

শিবেশ্বর তীব্রস্বরে বলেন, 'তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে গেছি আমি? পুজো এনেছ, রেখে যাও ওই দালানে। ব্যস্, সরে পড়।'

বৃদ্ধা কাতর গলায় বলেন, 'আজ কুশী অমাবস্যে, শ্যাঁকা-শাড়ি দিয়ে পুজো এনেছিলাম মা-র——'

'এতো ভাল ঝামেলা হল'—শিবেশ্বর বলে ওঠেন, 'বলছি রেখে যাও, মায়ের নিতে ইচ্ছে হয় নেবেন, নচেৎ নেবেন না।...'

তারপর বুকে হাত আড় করে বিজ বিজ করে বলতে থাকেন, 'রোষ শান্তি! রোষ শান্তি! পাজী-নচ্ছার ছোঁড়াটাকে এই দালানে এনে মেপে সাত হাত নাকে খৎ দেওয়াব, আর হারামজাদি ছুঁড়িকে—

বাকি কথাটা আরো অস্পষ্ট হয়ে আসে।

বীরপুর গ্রামের এই আকস্মিক বিপৎপাতে গ্রামসুদ্ধ এসে ভেঙে পড়েছে, আসেনি খালি নোটো হালদার আর তার স্ত্রী-কন্যা।

আসার উপায় নেই বলেই হয়তো আসেনি নোটো। গতকাল সেই মারাত্মক চেঁচামেচির ফলে নোটোর মাথার শিরা প্রায় ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছিল। আজ তাই নোটো মাথা তুলতে পারছে না। অতএব তার স্ত্রী মাথার কাছে বসে পাখা নাড়ছে, আর কন্যা চুপচাপ হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে।

সকালবেলা রাখাল ছেলেটা গরু খুলতে এসে গরু না খুলেই খবরটা দিয়ে চলে গেছে, গরুগুলো চেঁচাচ্ছে, তাদের ভার নেবে এমন উৎসাহ কারো নেই। গরু এখন গৌণ।

কনক একবার উসখুস করেছিল, বলেছিল, 'স্বর্ণ, পাখাটা একটু ধর তো, ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসি' নোটো এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'কেন, কী একখানা মহৎ দৃশ্য যে দেখতে যেতে হবে?'

কনক অস্ফুটে আর একবার বলেছিল, 'সবাই যাচ্ছে—'

'যাচ্ছে যাক! তোমার যাওয়া হবে না, ব্যস। মাথার যাতনায় ঘাড়ের শির ছিঁড়ে পড়ছে আমার, উনি যাবেন মজা দেখতে!'

কনক শিউরে দু-হাত জোড় করে বলে, 'মজা! মজা দেখতে যেতে চাইছি!'

'তা ছাড়া আবার কি?' নোটো হালদার রগের শিরটা টিপে ধরে বলে, 'মা কালীর হাত খসে পড়েছে, এ দৃশ্য দেখবার জন্যে এত ভীড়! মজা মজা, যাতে তাতে মজা পেলেই হল। উঃ! মাথাটার মধ্যে যেন কুকুরে চিবোচ্ছে—'

এই সময় ঘাড়গোঁজা স্বর্ণ হঠাৎ কথা বলে ওঠে। বলে, 'ফাটল একজনের মাথা, যাতনা ধরল আর একজনের মাথায়। এত একরকম মজা!'

স্বর্ণর গলার শ্লেষ, না অভিমান?

নোটো কাল থেকে মেয়ের দিকে তাকাতে পারেনি। এখনো তাকাল না, শুধু উত্তর দিল। ক্ষুব্ধ অভিমানের গলায় দিল, 'কার লাগা কোথায় লাগে, সে কথা এখন বুঝবি না। আগে বয়েস হোক, সন্তান হোক, বুঝবি।'

হয়তো বুঝেছে স্বর্ণ। তাই বাবার ঘরেই বসে আছে ঘাড় গুঁজে। কিন্তু উঠে গেলেও তো পারত! অন্ততঃ যখন শিবেশ্বর পাঠক বাড়িচড়াও হয়ে এসে যাচ্ছেতাই কোরে বকাবকি করল, তখন উঠে গেলে পারত।

তা গেল না। যেমন ঘাড় গুঁজে বসেছিল, তেমনি বসেই রইল। খানিকটা বেলায় শিবেশ্বর এলেন সাপের মত ফুঁসতে ফুঁসতে। বিনা ভূমিকায় বলে উঠলেন, 'দেখ্ নোটো, ভাল চাস তো এই দণ্ডে তোর ওই শয়তানী মেয়েটাকে নিয়ে বীরপুর থেকে বেরিয়ে যা।'

অকস্মাৎ শিবেশ্বরকে দেখেই নোটো হালদার ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। এখন এই আদেশে হাঁ করে তাকাল। আবার কী হল? গত কালই তো সাতদিনের মেয়াদে দণ্ডাদেশ হয়ে গেছে, সেই অবধি মেয়েটা ঘরের মধ্যে পড়ে আছে, নতুন কী ঘটল তবে?

হাঁ-করা নোটোর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে শিবু পাঠক আবার চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'শুনতে পেয়েছিস? ঢুকেছে মাথায়?'

নোটো গম্ভীর ভাবে বলে, 'না!

'মাথায় ঢোকেনি? তা ঢুকবে কেন? এখনো রাজশয্যে ছেড়ে ওঠা হয়নি যে! তোর ওই পাপিষ্ঠি মেয়ের ওপর রোষযুক্ত হয়ে মা কী সর্বনেশে শোধ নিয়েছেন সেটা শুনিসনি তাহলে?'

নোটো এবার নিজমূর্তি ধরে। কড়া গলায় বলে 'মেয়ের নামে যা ইচ্ছে তাই বোলো না বড় পূজুরী। হয়েছেটা কী তাই শুনি?

'শুনবি? শুনতে তাহলে বাকি আছে তোর এখনো? শোন তবে'—শিবেশ্বর কণ্ঠস্বরে বজ্রস্বর আনেন, 'মায়ের মন্দির কলুষিত হয়েছে। মা সেই কোপে রাগে দুঃখে আঙুল মটকেছেন, বুঝলি? অভিসম্পাত দিয়েছেন আঙুল মটকে, সে ধাক্কায় ডান হাতের চেটোখানা নিশ্চিহ্ন।'

হঠাৎ নোটো হালদার স্পর্ধিত ব্যঙ্গে হা হা করে হেসে ওঠে। 'মা কালীও তাহলে আমাদের বিন্দুপিসির মত আঙুল মটকে শাপমন্যি দেন বড় পূজুরি?'

অন্য সময় শিবেশ্বরকে নোটো 'শিবুদা বা পাঠকদা' বলে, রাগের সময় বলে, 'বড় পূজুরী।' এখন সেই পালা।

'হাসি! হাসছিস্ তুই? বড্ড বুকের পাটা দেখছি যে নোটো! এখনো বলছি নোটো, ভাল চাস তো মেয়ে নিয়ে গাঁ ছেড়ে বিদেয় হ', নচেৎ সামলাতে পারবি না। মা-র অঙ্গক্ষয়ের কারণটা প্রকাশ হয়ে পড়লে গাঁ-সুদ্ধু লোক তোকে আস্ত রাখবে ভেবেছিস? তোর ওই কুলের ধ্বজা মেয়েকে তোকে হয় হাতে করে বিষ দিতে হবে, নয় গলায় পাথর বেঁধে দীঘিসই করতে হবে।'

'বটে!' আর ধৈর্য ধরতে পারে না নোটো। দাঁড়িয়ে উঠে বাঘের হুঙ্কারে বলে ওঠে, 'মুখ সামলে কথা বল পাঠক, আর যদি আমার মেয়ের নাম মুখে আনবে, মা ভৈরবীকালীর থানে নিয়ে গিয়ে বলি দেব তোমায়!'

'কী? কী বললি?'

'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। কাল থেকে অনেক সহ্য করেছি, আব নয়। আমার ওই শিশু মেয়েটার নামে অনেক বলেছ তুমি—'

'শিশু! শিশু!' শিবেশ্বর যেন নেচে ওঠে। 'ওই হাতী হোঁৎকা মেয়ে তোর শিশু? বয়সে বে দিলে এতদিন কোলে ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করত। তোর ওই পাতকী মেয়ের অনাচারেই মা ভৈরবাকালী অভয় হাত গুটিয়েছেন—এই বলে দিলাম। মানে মানে ওকে যদি না সরাস, সবংশে ধ্বংস হবি নোটো। মায়ের মন্দিরে অনাচার কদাচার। মায়ের মন্দিরে বসে পেজোমি!'

নোটো আর চেঁচায় না। রূঢ় গলায় বলে, 'অনাচার কদাচারের জ্বালায় যদি মা নিজের অঙ্গে নিজে আঘাত হানত পাঠক, তবে এতদিনে মা সর্বঅঙ্গ ভেঙে নাক কান বোঁচা করে বসে থাকত। বলি তুমি কী? তুমি নিজে? পদি কামারনীর কথা না জানে কে? বিশ বছর যাবৎ তুমি তার সঙ্গে বসবাস করছ, তার হাতে জল খাচ্ছ, পান খাচ্ছ, তামাক খাচ্ছ, তুমি পতিত হচ্ছ না?'

'নোটো!' শিবেশ্বর প্রায় নোটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'মুখ সামলাবি তুই?'

নোটোও বিক্রম ছাড়ে না, কড়া গলায় বলে, 'কেন সামলাব? হক কথা বৈ বানানো কথা বলিনি। তবু তো রেখে-ঢেকে বলেছি। আরো বলব? পদি কামারনীর ঘরে যে হাঁস-মুরগীর পাল ঘোরে, সেগুলো—'

শিবেশ্বর সহসা তীব্র একটা হুঙ্কারের সঙ্গে গলার পৈতেটা ছিঁড়ে নোটোর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'এ-আস্পদ্দার প্রতিফল পাবি, পাবি, পাবি! ওই মেয়েকে বিষ গিলিয়ে মারতে তোকে হবে হবে হবে। চললাম আমি গাঁ-সুদ্ধু সবাইকে জানাতে। তোর মেয়ের—'

নোটোর চোখদুটো রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, নোটোর মুখটা অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠে। নোটো আর গুরু লঘু মানে না। ছেঁড়া পৈতেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিংস্র গলায় বলে ওঠে, 'সাপকে সাপের বিষ লাগে না পাঠক! পৈতে ছিঁড়ে নিজেই নিজের ক্ষেতি করলি। শুধু আমার মেয়ের কলঙ্ক রটাতে গেলে চলবে তোর? তার সঙ্গে তোর নিজের ঘরের কলঙ্ক ছড়াতে হবে না? কান তুই একজনের ধরিসনি সেটা বুঝি ভুলে যাচ্ছিস?'

শিবেশ্বর রাগে ঠক ঠক করে কাঁপে, মাটিতে দুম করে একটা পা ঠোকে, তারপর তীব্র কটু কঠোর গলায় বলে, 'তোর ওই ন্যাকা শাস্তর রাখ নোটো, পুরুষ পরশ-পাথর, আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ, এ-কথা তুই ছাড়া আর সবাই জানে। আমি এই চললাম—মা যদি জাগ্রত হন, রাত্তিরের মধ্যে বজ্রাঘাতে সপুরী একগাড়ে যাবি তুই, যাবি, যাবি, যাবি।

দুঁদে নোটো হালদার আবার একবার তেমনি স্পর্ধিত ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে। থেমে থেমে হেসে হেসে বলে 'জাগ্রত? মড়া আবার জাগ্রত হয় নাকি রে পাঠক? তোর মতন গেঁজেল কুচরিত্রের হাতের পুজো খেতে খেতে কোনজন্মে মরে ভূত হয়ে গেছে মা। তোর শাপ আর ফলবে না। তবে হ্যাঁ, কোথাও যদি কণিকামাত্তর পদার্থ এখনো টিকে থাকে মা-র, তাহলে তুই এই অন্যাই উৎপীড়নের ফল পাবি পাবি পাবি!'

'আচ্ছা!' শিবেশ্বর আর একবার মাটিতে পা ঠুকে বলেন, 'আচ্ছা, আমিও শিবেশ্বর পাঠক। মা ভৈরবীকালীর অনুরক্ত ভক্ত, আমিও দেখব তোর এই অহঙ্কারের প্রতিফল পাস কি না। হাতে হাতে ফল পাবি নোটো, তে-রাত্তিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবি। তোর এই ভিটেয় ঘুঘু চরবে, তোর বেটাবেটি শেয়াল-কুকুরের মতন পথে পথে ঘুরবে, আর তোর ওই কুলের ধ্বজা মেয়ে'—শিবেশ্বর একটা দম নেন। 'থাক, সেই পাপ কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলাম না, শুধু বলে গেলাম হবে হবে হবে। তিনসন্ধ্যে গায়ত্রী না করে জল খাই না আমি, আমার শাপ না লেগে যাবে কোথায়?'

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে, স্বর্ণর মা কনক এতক্ষণ অবধি ধৈর্য ধরে পাশের ঘরে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। বোধকরি আর ধৈর্য ধরতে পারে না; হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে শিবেশ্বরের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে।

কথা বলার উপায় নেই, মেয়েমানুষ! শুধু কান্নাতেই যা করতে পারে।

শিবেশ্বর চলে যাচ্ছিলেন, আবার এই এক নতুন মজায় দাঁড়িয়ে পড়েন। ভাবটা যেন, কেমন রে নোটো, তুই অপমান করছিস, তোর পরিবার এসে পায়ে আছড়াচ্ছে। দেখ, দেখ এখন।

নোটো অবশ্য তার পরিবারের এই খেলোমি বরদাস্ত করতে পারে না, তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'স্বর্ণ, তোর মাকে উঠিয়ে নিয়ে ও ঘরে যা।'

স্বর্ণ? স্বর্ণ নামের মানুষটা যে এখানে বসে রয়েছে, সে খেয়াল এতক্ষণ যেন ছিল না দুটো গোঁয়ার পুরুষের। এখন হল। স্বর্ণ বাপের ডাকে উঠে দাঁড়াল, মাকে তুলল না, স্পষ্ট চোখে শিবেশ্বরের মুখের

দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা হাতে করে দিতে পারবে না জ্যেঠামশাই, তুমিই বরং একবাটি বিষ গুলে পাঠিয়ে দিও, খেয়ে পাপের শাস্তি করে দিয়ে যাব।'

মাকে না তুলেই ও-ঘরে চলে যায় স্বর্ণ।

বলা বাহুল্য, মেয়ের এই নির্লজ্জতায় কনকের কান্না থেমে যায়।

'মেয়ে তোর শিশু, তাই না রে নোটো?' তীব্র একটা ব্যঙ্গহাসি হেসে হন হন করে বেরিয়ে যান শিবেশ্বর। আর তন্মুহূর্তেই নোটো হালদারই যেন বিষাহতের মত বিছানায় ঢলে পড়ে শিথিল গলায় খিঁচিয়ে ওঠে, 'আর নাটক করতে হবে না মাগী, জল দে এক গেলাস।'

আকস্মিকতার আঘাতটা ক্রমশঃ পুরনো হয়ে আসে, ভিড় পাতলা হতে থাকে মন্দিরের, সকলেরই ক্রমে নিত্য সংসারের কাজগুলো পিঠে ছাট মারতে থাকে। ফিরতে থাকে ঘরের দিকে।

চন্দ্রাননীও ঘরে ফেরে, অনেক বেলায়। শিবেশ্বর যখন মন্দির থেকে গনগন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একবার প্রশ্ন করেছিল, 'এখন মন্দির ছেড়ে যাচ্ছ কোথায়?'

শিবেশ্বর বলেছিলেন, 'পাপ তাড়াতে!'

চন্দ্রাননী কতকটা আঁচ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে যাবারও ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সাহস হয়নি। বাড়ির মধ্যে রণচণ্ডী হলেও বাইরে তেমন সাহস হয় না। তবে সন্দেহ নাস্তি গন্তব্যস্থলটা নোটোর বাড়ি। ....ঈশ্বর জানেন, হারামজাদি ছুঁড়িটা ভাল মানুষ সর্বটাকে ছলনার জালে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কি করেছে মায়ের মন্দিরে।

ছেলের জন্যে মনটা উথলে উঠল চন্দ্রাননীর। আহা, সকাল থেকে কিছু খেতে পায়নি বাছা।

বলতে ভুল হয়েছিল। শুধু সপরিবার নোটো হালদারই নয়, মন্দিরের কৌতুক দেখতে আরো একজন বাকি ছিল, সে হচ্ছে সর্বেশ্বর।

মার খাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সর্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার ব্যথা জন্মেছে সর্বেশ্বরের। বাপ মন্দিরে গেল দেখে একটা নিশ্চিন্ত শান্তির নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে আর এক পালা ঘুমের সাধনা করছিল, এবং সে সাধনায় সফলও হয়েছিল।

হঠাৎ আগুনের হলকার মতন ওই সংবাদটা কানে ঢুকল। দুধ দোয়ানী গয়লাপিসি তার চাঁচাছোলা গলায় চন্দ্রাননীর কাছে ব্যাপারটা বিবৃত করছে।

সর্বেশ্বর প্রথমটা যেন ভাল বুঝতে পারল না, কান খাড়া করে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, তারপর বুঝতে পারল।

মা ভৈরবীকালী ভয়ঙ্কর কোন অভিশাপে উদ্যত হয়ে নিজের অঙ্গে নিজে আঘাত হেনেছেন। সে আঘাত স্পর্শ কবেছে মা-ব উর্ধ্বোত্থিত অভয় করে।

বীরপুরে সর্বনাশ আসন্ন।

শুনতে শুনতে সর্বেশ্বরের সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল। এবং যখন গয়লাপিসি বলে উঠল 'জানিনে বৌদি, কার পাপে এই ঘটনা,—'তখন আর সন্দেহ থাকে না সর্বেশ্বরের কার পাপে।'

আর কেউ নয়, সর্বেশ্বর। আর কিছু নয় সেই হাত ধরা।

বটঝুরি কুঞ্জে যে পাপ সহ্য হয়ে গিয়েছিল, মায়ের মন্দিরে পুণ্যস্থানে তা হল না। পরনারীর হাত ধরা কি সোজা পাপ?

কিন্তু স্বর্ণ কি পরনারী? পরনারী মানে কী? অপরের বৌ, তাই না?

স্বর্ণ কার বৌ?

অনেকক্ষণ ভাবল, তারপর ভাবল কারুর বৌ না হোক, সর্বেশ্বরেরও তো নয়। অথচ সর্বেশ্বর তার হাত ধরেছে। শুধু কি হাতই ধরেছে? মায়ের প্রসাদী বড় একগাছা গাঁদার মালা পরিয়ে দেয়নি স্বর্ণর গলায়?

স্বর্ণ বলেছিল, আর একটা থাকলে আমার কাজটাও মিটত।

সর্বেশ্বর ভয়ে ভয়ে বলেছিল, থাক্ থাক্।

তারপরই তো পিছন থেকে কৃতান্তের দরশন। মালাটা কি তখন স্বর্ণর গলায় ছিল? কে জানে।

তবে মন্দিরে পাপ ঘটেছিল। ওই সব লীলাখেলা মন্দিরের মধ্যে করা উচিত হয়নি তাদের। কিন্তু এত পাপ ঘটল তাতে যে, মা অঙ্গহীন হলেন?

সর্বেশ্বর আর ভাবতে পারে না। সর্বেশ্বর আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। হয়তো বা দেহের ব্যথায় আর খালি পেটের যন্ত্রণায় ঘুমিয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙে মা-বাপের কলরোলে, নোটো হালদারের বাড়ির কাহিনীটি সবিস্তারে বিবৃত করছেন শিবেশ্বর কটু কাটব্যের সঙ্গে। অবশ্য কামারনী ঘটিত অংশটুকু বাদে। বাকিটায় বরং আরো রঙ চড়াচ্ছেন।

সর্বেশ্বর শুনতে থাকে। সর্বেশ্বর মা ভৈরবীকালীর কাছে এই মুহূর্তে মৃত্যু প্রার্থনা করে। কিন্তু মৃত্যু হয় না। বাপের শেষ কথাটা শুনতে পায় সর্বেশ্বর। 'নোটাকে আমি দেশছাড়া করব এ তুমি দেখে নিও।'

কিন্তু শিবু পাঠকের অহঙ্কার কি বজায় থাকে? নোটো হালদারকে দেশছাড়া করবার গৌরব তার ভাগে পড়ে? পড়ে না।

নোটো হালদার নিজেই দেশ ছাড়ে।

মানুষের দেওয়া শাস্তিকে কলা দেখিয়ে নোটো পৃথিবী থেকেই বিদায় নেয়। তা' সেখানে শিবুর ভূমিকা আছে। শিবুর অভিশাপেই তো—

কে তবে বলবে কলির ব্রাহ্মণ শক্তিহীন?

ফলল তো শিবু পাঠকের অভিশাপ। মরল তো নোটো তিন রাত্তিরের মধ্যে।

লোকে অবিশ্যি বলল সন্ন্যাস রোগ, কিন্তু কনক তো জানল অভিসম্পাতের ফল। শিবেশ্বরও ভাবল সে-কথা। মহোৎসাহে একবার চন্দ্রাননীর কাছে, আর একবার পদি কামারনীর কাছে সে নিজের সেই মহিমা প্রচার করল, তবে বলতে বারণ করে দিল আর কাউকে। যতই তেজ করে বলে আসুক পুরুষ পরশপাথর, তবু নিজের ছেলের নামটা জড়িয়ে আর মন্দির কলুষের কলুষ-কাহিনী রটিয়ে বেড়াল না।

অবশ্য চন্দ্রাননী আর পদি কামারনীর কথা আলাদা। তা' ওরা এ নিষেধের মান রাখল। কুন্তীর উপর রাগে যুধিষ্ঠিরের যে অভিশাপ সমগ্র নারীজাতির উপর বর্ষিত হয়েছিল, সে অভিশাপও এখানে খাটল না। দুটো মেয়েমানুষই পেটে কথা রাখল।

চন্দ্রাননী রাখল নিজের ছেলের দুর্নাম রটার ভয়ে, আর পদি রাখল শিবু পাঠক কখন এই গোলকের গোপন কথাটি তার কাছে ফাঁস করে গেল, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ভয়ে। ...ঢাকে ঢোলে কাঠি, উলু দিতে মানা!

পদির বর ভূষণো কামার যে রাতে বাড়ি থাকে না, অথচ পদির ঘর থেকে তামাক খাওয়ার শব্দ ওঠে, কামারপাড়ার কে না জানে একথা? পদি কামারনীর আঁচতলায় ছাঁচতলায় ঠাকুরমশাইয়ের ছায়াই বা কে না দেখেছে? খড়ম দেখেছে, কালী-নামাঙ্কিত নামাবলীর কোণ উড়তে দেখেছে, রাত দুপুরে পদির রান্নাঘর থেকে হাঁসের ডিম ভাজার গন্ধও পেয়েছে অনেকেই। কার্যকারণ মিলিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করে সবাই, তবে পষ্টাপষ্টি বলা-কওয়া নেই। অতএব পদিকে মুখে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হয়। নইলে কম গল্প তো শোনে না ঠাকুরমশাইয়ের কাছে।

যাক ওসব ছেঁড়া কথা, নোটো হালদার? সন্ন্যাসরোগেই মারা গেল, এটাই জানল সকলে এবং স্তব্ধ আতঙ্কে প্রহর গুনতে লাগল সর্বনাশ এবার আবার কার ঘরে ঢোকে। মায়ের মন্দিরের দুর্ঘটনার পরই এ-ঘটনা সবাইকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিল আশঙ্কা অমূলক নয়।

যাবে, বীরপুর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে, এ তো দেখাই যাচ্ছে। 'এক পয়সার' ভাগীদার নোটো হালদারকে দিয়েই শুরু।

আর একজন অবশ্য অভিসম্পাতের কথা চাপল, বুক চাপড়ে বলে বেড়াল না। কারণ কে জানে কোন্ কথায় কোন্ কথা বেরোবে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠবে। কথা চাপল কনক।

বোকা হাবা কনকও মেয়ের অপবাদের ভয়ে চালাক হল। তবে সন্দেহ নেই, পেটের মেয়ের উপরও বিশ্বাস হারিয়েছে সে। হোক মোটে এগারো বছরের, তবুও—

এগারো বছর বয়সের পাকামীর নজীরও যে নেই তা তো নয়। এই তো নোটো হালদারের নিজেরই মাসতুতো ভায়ের বেটার বৌ।

দশবছরের কচি বাচ্চা বৌটা 'রোগা-রোগা' বলে কোবরেজ এল, বলে গেল, বৌয়ের অন্য কিছু রোগ নেই, সন্তান-সম্ভবা।

কলিতে সবই সম্ভব।

শিবু পাঠকের অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্যি। সত্যি না হলে উপরোউপরি দু-দুটো এতবড় দুর্ঘটনা ঘটে? মেয়ের দিকে তাই তাকাতেই পারে না কনক, ভয়ে লজ্জায় ধিক্কারে।

আর স্বর্ণ? স্বর্ণর কথা বোঝা যায় না। স্বর্ণ যেন একদিনে দশবছর পার করে ফেলেছে। স্বর্ণর জানা জগতের বাইরের একরাশ শব্দ স্বর্ণকে প্রথমে দিশেহারা করেছে, তারপর ভয়ঙ্কর এক ভয়ের অন্ধকার গর্তে নিক্ষেপ করেছে।

অনেক আবছা জ্ঞান, অজানা রহস্য, সেই অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁত খিঁচিয়ে তাকায়। স্বর্ণ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

স্বর্ণ দুর্দান্ত, স্বর্ণ দুঃসাহসী, স্বর্ণ প্যাকাচোকা মেয়ে, কিন্তু স্বর্ণর সেই পাকাত্ব কি ওই রহস্যের বার্তা জানত?

স্বর্ণ তাই চুপ হয়ে গেছে, গুম হয়ে গেছে। বাপের এই আকস্মিক মৃত্যুও তাকে এলোমেলো করে ফেলতে পারেনি। অথচ পাঁচদিন আগে যদি নোটো হালদার মরত, নির্ঘাত বীরপুরের সবাই টের পেত স্বর্ণর বাপ মরেছে।

নোটো হালদারের ছেলে নাবালক, কনকই নমো নমো করে কাজ সারল। তারপর একদিন স্বর্ণর মামা এসে স্বর্ণদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে কালনায় না কাটোয়ায় কোথায় যেন ফিরে গেল। এমন কি সামান্য জমি-জমা যা ছিল তাও বেচে দিয়ে গেল।

অর্থাৎ হালদারের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে গেল বীরপুর থেকে। সমাপ্তি ঘটে গেল স্বর্ণর আর সর্বেশ্বরের বাল্য-লীলার।...

যাবার সময় দেখাটাও হয় না।

কালের খাতায় আঁচড় পড়ে চলে, কাঁচা চুলে পাক ধরে, কাঁথায় শোওয়া শিশুগুলো ডাং-গুলি খেলে, গাছে চড়ে।

বীরপুরের সেই ভয়ঙ্করের চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর আর কোন নতুন ঘটনা নেই। স্তিমিত হয়ে গেছে দেশটা। যেন নোটো হালদারকে 'বলি' নিয়েই মা'র রোষ শান্তি হয়ে গেছে। দেশটাও তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। যোগে-যাগে মায়ের মন্দিরে যাত্রী আসে অবশ্য, আগের থেকে বেশী বৈ কম নয়, গাজনের বাদ্যিতেও গগন ফাটে। রটন্তী চতুর্দশীতে মেলা বসে, মানতি পুজো শোধের বহরে হাঁড়িকাঠ রক্তে স্নান করে। তবু দেশের নাড়ির সঙ্গে যেন ক্রমশঃই ভৈরবীকালীর যোগ কমে যাচ্ছে।

তার কারণ পূজুরীদের বোলবোলাওটা ঘুচেছে। নোটো হালদাব বছরে একদিনের ভাগীদার ছিল, কিন্তু নোটোর ডাক-হাঁকে মন্দির সরগরম থাকত। শিবেশ্বর তো তারে বাড়া, এখন শিবেশ্বর বাতের ব্যথায় প্রায় উত্থানশক্তিরহিত, কাজ চালায় সর্বেশ্বর যো-সো করে, বাপের মত রম্‌রমা নেই তার কাজের।

বলির সময় যে 'মা মা' করে গগনভেদী চিৎকার করতে হয়, একথা জানে না সর্বেশ্বর। তা ছাড়া ছোঁড়া যেন জন্মদুঃখী। দু-দুবার বিয়ে হল, দুটো বৌয়ের একটাও টিঁকল না। একটা ছেলে-মেয়েও রেখে গেল না কেউ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ।

চন্দ্রাননী আবার মেয়ে দেখাদেখি করছে। তবে সর্বেশ্বর বাধা দিচ্ছে। বলছে, 'আর কেন মা, বেশ

তো আছি। দেখলে তো ভাগ্যে সইল না?' তাই তেমন তোড়জোড় নেই। তা ছাড়া পাঠকদের সঙ্গে কুল মেলা ঘর জোটা বড় দুর্লভ।

সম্প্রতি কলকাতায় কালীঘাটের সেবাইত হালদারদের বাড়িতে একটা সম্বন্ধ চলছে, মেয়েটা দেখতে সুবিধের না হলেও অন্য সুবিধে বিস্তর। বাপের একমাত্র মেয়ে, ভাই নেই, কাজেই বাপের সম্পত্তির ষোল আনার মালিক। সে প্রায় রাজার ঐশ্বর্য্য।

মেয়ের রূপের অভাবেই তারা তেজবরে বরের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে। রঙ মা কালী, একটা পা টেনে চলে।

সর্বেশ্বর আগে শোনেনি, যেদিন শুনল স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'হালদার! হালদারদের বাড়ি! তাহলে নোটোকাকা কোন্ অপরাধে মুখে রক্ত উঠে মরেছিলেন মা?'

চন্দ্রাননী প্রথমটা থতমত খেয়েছিল বৈকি। কারণ ঘটকের মুখে হালদার শব্দটা শোনামাত্রই তো অনেক স্মৃতিকথা, অনেক ইতিহাস উথলে উঠেছিল। তবে ভেবেছিল সর্ব অত খেয়াল করবে না। দশ বারো বছর আগের কথা কি আর মনে গেঁথে রেখে দিয়েছে সর্ব?

দেখল গেঁথে রেখে দিয়েছে। তবে প্রথমটা থতমত খেয়েই পরক্ষণে ধমকে ওঠে, 'নোটোকাকা! নোটোকাকার কথা তুলছিস? তার মানে সেই লক্ষ্মীছাড়ী স্বর্ণর কথা এখনো মনে রেখেছিস? হায়া হল না তোর সর্ব, লজ্জা করল না সেই পাপিষ্ঠির বাপের নাম মুখে আনতে? যে মেয়ে কুলের কলঙ্ক, বংশের কলঙ্ক, বীরপুর গাঁয়ের কলঙ্ক!'

তা' কথাটা মিথ্যে নয়। সর্বকে তাই মাথা হেঁট করতে হয়েছে।

কানাঘুসো নয়, লোকমুখে পাকা খবর এসেছে এখানে। স্বর্ণর গবীব মামা অতগুলো নতুন 'হাঁ' নিয়ে গিয়েও চেষ্টা-যত্ন করে ভাগ্নীটার বিয়ে দিয়েছিল। বলতে কি ভালই দিয়েছিল। রূপটা তো আছে? কিন্তু ওই রূপই কাল। সর্বনাশী মেয়ে ঘর-বর ছেড়ে কুলত্যাগ করে চলে গেছে।

ওই মেয়ে ঘাড়ে চাপতে আসছিল চন্দ্রাননীর। উঃ! ও মেয়ের হাড়ে মজ্জায় কুকাজের নেশা। উঃ কতজন্মের পুণ্যফল ছিল সর্বর যে ওই কুচরিত্র মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে ঘটেনি। ঘটেনি, হালদারদের সঙ্গে তাদের করণকারণ হয় না বলেই না? তবে এখন?

এখন? চন্দ্রাননী বড় গলায় বলে, 'কিসেয় আর 'কিসেয় সোনায় আর সীসেয়! ওদের সঙ্গে এরা? এরা কতবড় উঁচু বংশ! কালীঘাটের কালীর পূজুরী। তাছাড়া অবস্থায় রাজা জমিদার বললেই হয়।'

ঘটকের অত্যুক্তির ফলে এই রকমই বলে চন্দ্রাননী।

সর্বেশ্বর আর কত বলবে? যা বলেছে তাই ঢের। বাল্যসখীর এই শোচনীয় পরিণামের খবরে সর্বেশ্বরই যেন লজ্জায় মরমে মরে গিয়েছিল। আর কিছু বলতে পারল না সর্বেশ্বর।

অনেক সময় স্বর্ণর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করে সর্বেশ্বর। কিন্তু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যায়। ঠিক ঠিক রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। শুধু এক টুকরো রঙই মাঝে মাঝে চোখে ভেসে ওঠে। কখনো একটু হাতের অংশ, কখনো কপাল, কখনো চিবুক কণ্ঠা গলা। কখনো পায়ের পাতা, কাঁধের কোণ। এক টুকরো ফর্সা ধবধবে রঙ।... রেখাগুলো ধরা দেয় না কেন? খারাপ হয়ে গিয়ে, অসতী হয়ে গিয়ে স্বর্ণ কি সব রেখা হারিয়ে ফেলেছে?

চৈত্রমাস পড়ায় বিয়ের কথা স্থগিত আছে। গাজনের উৎসবের ধুম পড়েছে। সেই নিয়ে মন্দিরের কাজ বেড়েছে। সর্বেশ্বর তাই একটু ব্যস্ত।

আজ সংক্রান্তির আগের দিন, নীলপুজো। যাত্রী আসছে অসংখ্য, ডাবের পাহাড় পড়েছে নাট-মন্দিরের চাতালে, সর্বেশ্বর মন্দিরের মধ্যে। একজন সহকারী পাণ্ডা যাত্রীদের হাত থেকে পুজো নিচ্ছে আর মন্দিরে চালান দিচ্ছে। চালান দিচ্ছে আবার মুহূর্তে বার করে নিয়ে আসছে।

হঠাৎ একজনের প্রশ্নে থতমত খেল লোকটা। সুরেলা মেয়েলী গলায় একজন ব্যঙ্গহাসির সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'মা-র সামনে ধরছ আর কেড়ে নিচ্ছ পাণ্ডাঠাকুর, মাকে খেতে অবসর দিচ্ছ কই?'

গলাটা কার? এমন মাজা-ঘষা সুরেলা। সর্বেশ্বর চমকে বাইরে চোখ ফেলল। ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে বুঝতে পারল না।

কত মেয়ে, কত পুরুষ, কত তরুণী, কত বৃদ্ধা! পাণ্ডার জবাবী গলাটা শুনতে পেল সর্বেশ্বর, 'মা-র কি আর খেতে সময় লাগে দিদিমণি? মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী! লহমায় খান।'

'হুঁ, তাই দেখছি। তা' মায়ের একটা হাতের চেটো সোনার কেন? কেউ মানত করেছিল বুঝি, সোনা দিয়ে হাত বাঁধিয়ে দেবে মা-র?'

সর্বেশ্বর আর পাণ্ডার উত্তরের দিকে কান পাতে না। সর্বেশ্বরের খেয়াল থাকে না এই মুহূর্তে সে কি করেছিল।

সর্বেশ্বর মন্ত্রাহতের মত মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অগণিত মুণ্ডের সারির মধ্যে চোখ ফেলে দেখতে চেষ্টা করে কোথা থেকে উঠে এল ওই সুর।

কিন্তু কি করে বোঝা যাবে? কত সুর, কত স্বর, কত রোল! অথচ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াবারই বা অবকাশ কোথায়? লোকের পর লোক আসছে, চিনি সন্দেশের ঠোঙা এগিয়ে ধরে তাড়া লাগাচ্ছে, 'ঠাকুরমশাই আমারটা আগে।'

কাজের ধাক্কায় আবার সেই তিন সিঁড়ি নীচু অন্ধকার গর্ভগৃহের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয় সর্বেশ্বরকে, কাজের স্রোতে হাবুডুবু খেতে হয়। চিনি সন্দেশের ঠোঙা মায়ের দিকে এগিয়ে দিতে হয। অসংখ্য পাতা হাতের উপর চরণামৃত দিতে হয় রূপোর কুশী করে ঢেলে ঢেলে।

প্রণামীর পয়সা আনি দুয়ানি সিকি যে যেমন ইচ্ছে ছুঁড়ে দিচ্ছে মায়ের চরণ লক্ষ্য করে, সে সব হাতড়ে হাতড়ে জড় করতে হয়। আর একবার বেরিয়ে পড়ে দেখবার অবকাশ মেলে না সুরের উৎসটা কোথায়।

তবু সেই সুর সেই হাসি যেন অবিরাম ধ্বনিতে সর্বেশ্বরের মাথার মধ্যে রিমঝিম কবে বাজতে থাকে, আর সারা শরীরে প্রবাহিত রক্তের মধ্যে ভয়ানক একটা আক্ষেপ ওঠে।

যে এই হাসি-কথায় আগুন ছড়িয়ে গেল, সে কেন মন্দিরের দরজায় এল না? অথবা এসেছিল, সর্বেশ্বর তাকিয়ে দেখেনি। দুটোতেই আক্ষেপ।

আজ আব দুপুরের পর ভিড় কমার কোন উপায় নেই, উত্তোরত্তর বেড়েই চলেছে। সন্ধ্যাপুজোব ভিড়ই বেশি। মন্দিরধারে ভৈরব শিবের ছোট্ট দরজায় খুনোখুনি কাণ্ড চলছে। বাড়তি পূজুরী দু'জনকে নেওয়া হয় এ-সব দিনে, আজও হয়েছে। বিকেলের দিকে একবার তাদেরই একজনের ওপর ভার ঠেকিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এল গলদঘর্ম সর্বেশ্বর। ভেবেছিল মন্দিরের পুকুরেই একবার ডুব দিয়ে নেবে, কিন্তু সে দিকে পা বাড়াবার জো নেই। কোন দিকেই কি আছে? যাত্রীর ভিড়ে সর্বত্রই নরককুণ্ড। পুকুর পাড়ে ছেঁড়া শালপাতা আর ভাঙা মাটির ভাঁড়ের যা স্তূপ হয়েছে তা' একত্রে জমালে পাহাড়। সর্বেশ্বব দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকেই পা চালাল। একবার মাথায় দু' ঘড়া জল আব গলায় একবাটি চিনির পানা ঢেলে নিতে পারলেই আবার সারারাত যুঝতে পারা যাবে।

নির্জন কোথাও নেই। মাঠের মাঝখানেই জায়গায় জায়গায় ঝুপড়ি বসেছে, ঝুবিনামা বটগাছটাকে ঘিরে বসেছে মেলার বাজার।

পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল সর্বেশ্বরকে—সেই স্বর না? কাকে কি বলছে? তাকেই নাকি? কি বলছে যেন?

'হনহনিয়ে চললে কোথায় গো ঠাকুরমশাই?'

সর্বেশ্বর সামনে পিছনে তাকাল, দেখতে পাচ্ছে না তো কে এই গলায় ডাক দিচ্ছে। স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

সর্বেশ্বর নিজেকে ধিক্কার দিল। মাথায় ভূত চেপেছে তার, পেত্নীতে পেয়েছে। তাই মাঠের মাঝখানে অলৌকিক স্বর শুনছে। দ্রুত পা চালাল। পিছনে একটা হাসি শুনতে পাচ্ছে, বাচাল বাচাল হাসি।

বাড়ি ফিরে তোলা জল দু ঘড়া মাথায় ঢেলে, আর এক গেলাস জোলো চিনির শরবৎ খেয়ে ফের যখন ফিরল সর্বেশ্বর, তখনো বেলা আছে। চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় অপরূপ আলো আর অনির্বচনীয় বাতাস দেহ-মন-চোখ সব জুড়িয়ে দিচ্ছে। স্নানস্নিগ্ধ সর্বেশ্বর ভূত পেত্নীর চিন্তা ত্যাগ করে সন্ধ্যে-পুজোর মোহড়া সামলানোর চিন্তা করতে করতে যাচ্ছিল।

বাবুদের বাড়ি থেকে বিরাট পুজো আসে আজ ভৈরব-শিবের তলায়, সেখানে মূল পূজারী না থাকলে মাঠাকরুণ রুষ্ট হন, ওদিকে মায়ের মন্দিরে—

হঠাৎ আবার শরীরের সমস্ত রক্ত নিশ্চল হয়ে গেল সর্বেশ্বরের। যে চিন্তা ত্যাগ করেছিল, সেটাই মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলল, 'ঠাকুরমশাই যে বড় ব্যস্ত দেখছি।'

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সর্বেশ্বর অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করল, 'স্বর্ণ!'

'যাক, তবু চিনতে পারলে!' স্বর্ণ একটু ভ্রূ-ভঙ্গী করল, 'তখন তো ডাক শুনে ভূতে তাড়া খাওয়ার মত ছুটলে।'

সর্বেশ্বর শুকনো গলায় বলে, 'তা কেন, কাজের তাড়ায়। কবে এসেছ?'

'কবে মানে? আজই তো।'

'কাকীমা এসেছেন? কেমন যেন বেভুলের মত প্রশ্নটা করে বসে সর্বেশ্বর।

'কাকীমা!' স্বর্ণ ভুরুটা আরো কুঁচকে বলে 'মা-র কথা বলছ? তুমি তাহলে সেই অবধি আমার কোন খবরই রাখনি আর?'

সর্বেশ্বর এবার ঈষৎ আত্মস্থ হয়। সর্বেশ্বর জোর দিয়ে বলে, 'রাখব না কেন? সবই রেখেছি। কীর্তি কি কখনো চাপা থাকে?'

'ও, তাও তো বটে।' স্বর্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'তবে আর কাকীমার প্রশ্ন কেন?'

সর্বেশ্বর যে চট করে একটা উত্তর খুঁজে পায় এটা আশ্চয্যি। এটা তার ধাত নয়। তবু আজ হঠাৎ সঙ্গেসঙ্গেই বলে ওঠে, 'সে প্রশ্ন করেছি তোমার সাহস দেখে। বীরপুরে এসে মুখ দেখাচ্ছ, বড় গলায় কথা কইছ, হাসছ, ভাবলাম সুপথে ফিরেছ।'

স্বর্ণর সেই গভীর কালো চোখ দুটোয় হঠাৎ যেন ধ্বকধ্বক করে দুডেলা আগুন জ্বলে ওঠে, আর আগুনের গলাতেই বলে ওঠে সে, 'ওঃ, তাই বুঝি? তাই ভাবলে? এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লে? মেয়েমানুষ কুপথ থেকে সুপথে ফিরতে চাইলেই সুপথ তাকে সুড় সুড় করে পথ ছেড়ে দেয় কেমন?'

সর্বেশ্বর ঠাকুর-মন্দিরে থেকে থেকে দু-চারটে ধর্ম কথা শিখে ফেলেছে, তাই বলে, 'অনুতাপের পথ সবাইয়ের জন্যেই খোলা।'

'অনুতাপ! ওঃ!' স্বর্ণ ধিক্কারের গলায় বলে, 'কে বলেছে তোমায় আমি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি? কিসের অনুতাপ? কুপথ তো আমি ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছি জেনে বুঝে।'

'জেনে বুঝে?'

'তবে না তো কি?'

সর্বেশ্বর এবার নরম আর কাতর গলায় বলে, 'ও-কথা বলে নিজের ওপর ঝাল ঝাড়ছ স্বর্ণ বুঝতে পারছি। স্বামী মাতাল গোঁয়ার অত্যাচারী হলে ক'টা মেয়েমানুষ—'

'কে বললে আমার স্বামী মাতাল গোঁয়ার অত্যাচারী?' স্বর্ণ দৃপ্তস্বরে বলে, 'মামা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল আমার, সমাজ যাকে আমার স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছে, সে লোক খুব মহৎ, খুব ভাল।'

সর্বেশ্বর স্খলিত বচনে বলে, 'তবে?'

'তবে?' স্বর্ণ সাপিনীর মতন ফোঁস করে ওঠে, 'তবে? বুঝতে পারনি তবেটা কি? সমাজ তাকে আমার স্বামী বলেছে বলেই সে আমার স্বামী? জগতে সত্যি অসত্যি নেই? পরপুরুষের ঘর করব আমি?' হঠাৎ উল্টোমুখো ফিরে হনহন করে মাঠের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যায় স্বর্ণ সেই ঝুরি বটতলার দিকে।

ওইখানেই তাহলে আস্তানা নিয়েছে। কিন্তু কী সব বলে গেল স্বর্ণ? প্রহেলিকার মত লাগছে। পর

পুরুষটা কে? নিজেই তো কুলত্যাগ করেছে। কার ঘর করছে তবে?

এতক্ষণে ভাবতে চেষ্টা করে সর্বেশ্বর স্বর্ণর বেশ-ভূষাটা কি ছিল। পরনে গেরুয়া না? উভোঝুঁটি করে বাঁধা রুক্ষু কেশের তাল, গলায় স্ফটিক না রুদ্রাক্ষের মালা কতকগুলো, হাতে দণ্ডী! হ্যাঁ, তাই। তখন চোখে পড়েনি, তখন শুধু স্বর্ণ নামের অবয়বটা সর্বেশ্বরের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

এই সাজ ছিল স্বর্ণর। কিন্তু এ কি শুধু গাজনের দণ্ডীর সাজ, না বরাবরের সাজ? স্বর্ণ কি তাহলে কুলত্যাগ করেছে পরম দেবতার উদ্দেশ্যে? লোকে সেই কুলত্যাগকে কুৎসিত চেহারা দিয়ে নিন্দে রটিয়েছে?

কিন্তু তা যদি হয়, স্বর্ণ নিজমুখে কেন বলল, ইচ্ছে করে কুপথ বেছে নিয়েছি।

হায় ভগবান, এমন দিনে আর এমন পরিস্থিতিতে দেখা হল স্বর্ণর সঙ্গে। কে জানে ক'দিন থাকবে!

কাল সংক্রান্তি, কাল তো বাণ-ফোঁড়াফুঁড়ি কাণ্ড। কাল কি আর পাওয়া যাবে ওকে? পরশুই হয়তো চলে যাবে।

কিন্তু এত দেশ থাকতে বীরপুরেই বা আসতে ইচ্ছে করল কেন স্বর্ণর গাজন-উৎসবের উদযাপন করতে?

মন্দিরের দিক থেকে তুমুল কলরোল আসছিল, বোঝা যাচ্ছে না, শুধুই মারপিট হচ্ছে, না খুনোখুনি হচ্ছে?

মারপিটটা হয়। বড় যোগ-যাগ মাত্রেই হয়, গাজনের সময় তো হয়ই। সেটা গা-সহা। খুনোখুনি না হলেই মঙ্গল। সর্বেশ্বর সমুদ্রতাড়িত ঝরা পাতার মত শব্দ-তরঙ্গে তাড়িত হয়ে এগিয়ে যায়।

এবং সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত বিস্ময়, সমস্ত অস্বস্তি ছাপিয়ে মনের মধ্যে একটি কথা বাজতে থাকে—স্বর্ণ এসেছে। স্বর্ণ এসেছে।

কিন্তু কোথায় উঠেছে স্বর্ণ?

পরদিন জানা গেল কোথায় উঠেছে স্বর্ণ। ঘৃণায় লজ্জায় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে মাথা হেঁট করে ফিরে গেল সর্বেশ্বর, কোথায় উঠেছে স্বর্ণ সে-কথা টের পেয়ে।

মাঠের ও-প্রান্তে মেলার বাজারের শেষ সীমা বরাবর যে খারাপ মেয়েমানুষের একটা দল গাজনের সন্ন্যাসিনী হয়ে এসে আড্ডা গাড়ে, এবারেও সেই দলটা এসে আড্ডা গেড়েছে। স্বর্ণ আছে সেই দলে। তার মানে স্বর্ণ নাম-লেখানো খারাপ।

সর্বেশ্বরের মনে হল, পৃথিবী দ্বিধা হও। এ খবর শোনার পর তিলার্ধ আর বাঁচতে সাধ থাকে না সর্বেশ্বর পাঠকের। সেই স্বর্ণ! সেই চঞ্চল দুষ্টু ডাকাবুকো স্বর্ণ! তার এই পরিণতি! এই জন্যেই মা বলেছিল ও জন্মপাপী।

জন্মপাপী না হলে ভাল স্বামীর হাতে পড়ে—

হঠাৎ চোখদুটো জ্বালা করে আসে সর্বেশ্বরের।

সর্বেশ্বরই না বলেছিল, ইহজন্মে পরজন্মে আমরা পতি-পত্নী। এখন মা-বাপ হালদারদের মেয়ে ঘরে আনতে চাইছে। তখন যদি এ সুমতি হত, হয়তো স্বর্ণর এমন পরিণাম হত না। এই বীরপুরে মা ভৈরবীকালীর থানে পড়ে থাকতে পেলে কেমন সে জন্মপাপীর মূর্তি দেখাত, দেখতাম।

চেলির কাপড়ের কোণে চোখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি গিয়ে মায়ের মন্দিরে ঢোকে সর্বেশ্বর।

দুদিন মহাহুল্লোড়ের পর আজ সব নিথর-নিথর। গাজনের দল প্রায় সকলেই বিদায় হয়েছে। কেউ কেউ মেলাতলার আকর্ষণে রয়ে গেছে গেরুয়া বিসর্জন দেওয়ার পরেও।

স্বর্ণর দল যায়নি। আসার সময় দেখে এসেছে সর্বেশ্বর নদীর পাড় থেকে। ওদেব ঝুপড়ি থেকে হাসি-হুল্লোড়, উনুনের ধোঁয়া, রান্নার সুবাস—অনেক কিছুই উঠছে। আজ খাওয়ার ঘটা। এতদিনের কৃচ্ছ্রসাধনের শোধ তুলবে সবাই।

আশ্চর্য, ওই খারাপ মেয়েগুলোর দলে স্বর্ণ আছে? হয়তো স্বর্ণও ওদের সঙ্গে বিড়ি খাচ্ছে, মুখে খড়ি মাখছে!

হঠাৎ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই সর্বেশ্বর নিজের মাথায় গঙ্গাজল ছিটোয়। কেন তা জানে না। কিন্তু ছিটোনোর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে আসে সেই হাসি। 'কী হল ঠাকুরমশাই, খামোকা মাথায় গঙ্গাজল ছিটোচ্ছ কেন? পরনারীর চিন্তা করছিলে বুঝি ভুলে ভুলে?'

সর্বেশ্বরের বুক কেঁপে ওঠে। সর্বেশ্বর একবার চারিদিকটা তাকিয়ে দেখে। মন্দিরের দিক এই সন্ধ্যাতেই প্রায় জনশূন্য। ব্রতীরা খাওয়া মাথায় ব্যস্ত, যাত্রীরা মেলার বাজারের কেনা-কাটায় ব্যস্ত। ভাঙা মেলা আরো ক'দিন থাকলেও মূল মেলা আগামী কাল অবধি। সারা বছর ধরে গ্রামের লোক এই মেলাটার প্রতীক্ষাতেই থাকে।

অতএব সহজে কেউ এদিকে আসছে না। তবু বুক কাঁপে সর্বেশ্বরের। স্বল্পালোকিত দালানের কোণে যে মানুষটা একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে আছে, সে যেন একটা সর্বনাশের সম্ভাবনা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

দেবীর যেদিন অঙ্গ-হানি ঘটেছিল, বীরপুরের সবাইয়ের প্রাণের মধ্যে এমনি সর্বনাশের ইশারা এসে পৌঁছেছিল। আর ওই দালানে ওই থামটার সামনেই।

সর্বেশ্বর ছটফটিয়ে উঠে এল। বলল, 'অসময়ে এখানে কেন?'

'মায়ের মন্দিরের আবার সময় অসময় কি?' তেমনি নির্লিপ্ত ভাবে ঠেস দিয়ে বসে থেকে বলে স্বর্ণ।

'বাঃ, সময় অসময় নেই? সবাই চলে গেল—'

স্বর্ণ তেমনি স্তিমিত গলায় বলে, 'সবাইয়ের সঙ্গে আমার কি? স্বর্ণর চোখটা কি বোজা?

সর্বেশ্বর অসহায় সুরে বলে, 'লোকে নিন্দে করতে পারে—'

ঝপ করে খাড়া হয়ে বসে স্বর্ণ। শিথিলতা ত্যাগ করে নিজস্ব ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'নিন্দে? আমার আবার নিন্দে কি? বলে সমুদ্রে পেতেছি শয্যে, গোস্পদে কি ডর! খারাপ মেয়েমানুষের আবাব কিছুতে নিন্দে হয় নাকি গো ঠাকুরমশাই?'

সর্বেশ্বরের অসহায়তা ঘোচে। সর্বেশ্বর তীব্রস্বরে বলে, 'তা তোমার সে ভয় না থাকে, আমার তো আছে!'

'মিথ্যে কথা!' স্বর্ণ সহসা দাঁড়িয়ে ওঠে।

আর এতক্ষণে চোখ পড়ে সর্বেশ্বরের, স্বর্ণ ব্রতশেষে গৈরিক ত্যাগ করেনি। আধা-অন্ধকারে গেরুয়ার পরিমণ্ডলে স্বর্ণর মুখটা যেন জ্বলছে, আর দপদপ করছে চোখ দুটো। সেই চোখে যেন সর্বেশ্বরকে ভস্ম করে ফেলার আগুন।

'মিথ্যে কথা ঠাকুর মশাই! তোমাদের আবার নিন্দের ভয়! কেন, ছোটবেলা থেকে এ শিক্ষা পাওনি পুরুষ পরশ-পাথর? তার গায়ে পাপ স্পর্শ করে না!'

সর্বেশ্বর গম্ভীর ভাবে বলে, 'এ-কথা কে বলেছে তোমায়? পাপ হচ্ছে আগুন। আগুন কি মেয়ে পুরুষ বাছে?'

'বাছে বৈকি!' স্বর্ণ তেতো গলায় বলে, 'বাছে না? জান না? দেখনি নীচু বামুনের ঘরের মেয়ে আনতে যাদেব জাত যায়, নীচু জাতের ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে থালায় খেতে, এক বিছানায় শুতে জাত যায় না? দেখনি কামারের উঠোন ডিঙিয়ে এসেই মায়ের মন্দিরে আসন করে 'অপবিত্র পবিত্রো বা' করে ভোগ নিবেদন করতে? পুরুষের আবার নিন্দে! হাসালে তুমি সর্বদা!'

হি হি করে আবার সেই বাচাল হাসি হাসতে থাকে স্বর্ণ।

সর্বেশ্বরের পা দুটো কাঁপতে থাকে। সর্বেশ্বর রুদ্ধ গলায় বলে, 'গুরুজনের কথা নিয়ে তামাশা কোরো না স্বর্ণ!'

'তামাশা করব কেন গো? হক কথাটা বলছি। তুমি ভয়ে কাঁটা হচ্ছ কিনা নিন্দে হবে ভেবে, তাই চৈতন্য করাচ্ছি।'

'আমার চৈতন্যে দরকার নেই।' সর্বেশ্বর বলে, 'তুমি যাও!'

'কেন, ভয় করছে?'

'করছে স্বর্ণ, করছে। যাও তুমি।'

'যাব কি গো!' স্বর্ণ তেমনি হাসির সঙ্গে বলে, 'নির্জনে আমায় দেখলে এখনো তোমার ভয় করে, এ কি কম আহ্লাদের কথা? খবর নিলাম, দু-দুবার মালাবদল করেছ, টেঁকেনি। ভাবতে ইচ্ছে করছে—গেছে তোমার কারসাজিতে। বিষ-টিষ দাওনি তো গো? মেয়েমানুষ অসুবিধে ঘটালে ও জিনিসটার ব্যাভার মন্দ নয়। ঝামেলা মেটে।'

সর্বেশ্বর বিচলিত গলায় বলে, 'বাবা তোমার জন্যে বিষের ব্যবস্থা করেছিল, সে-কথা শুনেছিলাম স্বর্ণ, কিন্তু সে তো ভৈরবীকালীর কোপ-শান্তির জন্যে।'

'ওঃ, তা বটে! বীরপুরের তা-বড় তা-বড় বীরেরা পার পেয়ে গেল, মায়ের কোপশান্তির জন্যে কোপ দিতে হল নিরীহ নিরপরাধ অবোধ বাচ্চা একটা মেয়ের ওপর!

সর্বেশ্বর ক্লান্ত সুরে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমিও পাপী, তাই বলি নিরপরাধ কি করে বলি? মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে হাত-ধরাধরি করেছি আমরা, ভালবাসাব কথা কয়েছি, শুভদৃষ্টি করেছি—'

'হি হি হি!' স্বর্ণ হেসে উঠে বলে, 'হায় হায়, এখনো দেখছি সেই বালকটাই আছ তুমি সর্বদা! দু-দুবার তো বিয়েও হয়েছিল, জগতের কিছুই শেখনি? মায়ের মন্দিরে কত কীর্তি ঘটছে—'

সর্বেশ্বর রুদ্ধস্বরে বলে, 'কিন্তু দেখলে তো পষ্ট, মা কুপিত হয়ে—'

'কী? রাগের চোটে আঙুল মটকে গাল দিতে গিয়ে আঙুলগুলো মটমটিয়ে ভাঙল মা?' স্বর্ণ আরো হি হি করে হাসে, 'বলিহারী বুদ্ধি সব! মা ভৈরবীকালীর হাতের চেটো কে ভেঙে দূর কবে দিযেছিল জান সর্বদা? এই স্বর্ণ পোড়ারমুখী।'

'কী! কী! কী বললে?' সর্বেশ্বর বসে পড়ে। মাথাটা দেয়ালে ঠেকিয়ে শুযে পড়াটা থেকে রক্ষা কবে নিজেকে। আর্তচিৎকারে আবার বলে ওঠে, 'স্বর্ণ!'

'সর্বনাশ! তুমি যে একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিলে গো। আশ্চয্যি যে এতগুলো মাথা দেশেব, কারুর একটু সন্দেহও হয়নি?'

সর্বেশ্বর ঝিমোনো গলায় বলে, 'সন্দেহের অতীত বস্তু, সন্দেহ হবে কেন? স্বর্ণ, আমার মন নিচ্ছে এ তোমার মিথ্যে অহঙ্কারের কথা।'

'দেখ সর্বদা, স্বর্ণ পাপিষ্ঠী, কিন্তু স্বর্ণ মিথ্যুক নয়। মায়ের ওপর অভিমানে আক্রোশে ডান হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিতে গিয়েছিলাম। পেরে উঠলাম না, নাবালকের জোর বৈ তো নয়! শুধু আঙুল ক'টা সমেত 'অভয় কর' না কি মটকে ভেঙে এল।'

সর্বেশ্বর স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আশ্চর্য। ভয় করল না?'

'ভয়? কই, মনে পড়ছে না তো। অবোধের রাগ আর কি! কাণ্ডজ্ঞানহারা! মা কালীর ওপর বড্ড ভরসা করেছিলাম, বাপের হাতে প্রহার খেয়ে সে ভরসার খেসারৎ দিতে হল। বললাম, 'কিছুই যদি পারিস না তো দরকার কি অমন হাতে? দেব মুচড়ে ভেঙে।'

সর্বেশ্বরের গায়ে তখনো মুহুর্মুহু কাঁটা দিচ্ছিল। তবু উদাস গলায় বলে সে, 'হাতে হাতে তার শাস্তিও পেলে। অবোধ বলে মা কি ছেড়ে দিলেন? তে-রাত্তিরের মধ্যে পিতৃহারা হলে।'

স্বর্ণ একটু ঘৃণার হাসি হেসে বলে, 'পিতৃহারা আমি মায়ের শাস্তিতে হইনি সর্বদা, হয়েছি তোমার পিতৃদেবের মহিমায়। তেনার কটুকাটব্যের চোটে বাবার মাথার রক্ত টগবগিয়ে উঠল, ঘাড়ের শিরটা গেল ছিঁড়ে—'

বাচাল খারাপ স্বর্ণর গলাটা হঠাৎ বুজে আসে।

'স্বর্ণ!' সহসা আর এক সর্বেশ্বর মৃদু রুদ্ধ গলায় বলে, 'মাঠের ভিড় তো ফুরিয়ে গেছে, আমাদের সেই জায়গাটায় একবার গিয়ে বসা যায় না? কত কথা জমে ছিল, কত কথা বলবার ছিল—'

'সত্যিই কি ছিল ঠাকুরমশাই?' স্বর্ণ বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে, 'না কি এখন সন্ধ্যেকালে, নির্জন স্থানে সুন্দুরী যুবতীর চোখের জল দেখে—'

'স্বর্ণ খারাপ মেয়েমানুষের দলে মিশে তোমার কথাবার্তা বড় মন্দ হয়ে গেছে।'

'হয়েছে? মন্দ হয়েছে?' স্বর্ণ যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে, 'তাই তো চাই গো। মন্দ হবার জন্যেই তো শ্বশুরঘর ত্যাগ করে পথে ভেসেছি। নীচু ঘরের মেয়েকে ঘরে তুলতে তোমাদের আপত্তি, নীচ চরিত্রের মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকতে তো আপত্তি নেই, তাই সেই সাধনায় সিদ্ধি হয়ে ফিরে এলাম গাঁয়ে। ভাবছি এবার বাগদীপাড়ায় একটা ঘর নেব। হ্যাঁ গো, আসবে তো সেখানে? তবে বড় আক্ষেপ, সতীন নেই, লড়াইয়ে জেতার সুখটা মিলবে না।'

'স্বর্ণ, তোমার মাথাটার আর ঠিক নেই মনে হচ্ছে।'

'মাথার ঠিক নেই? বল কি? এই মাথা নিয়ে কত কৌশল খেলছি, আর তুমি বলছ ঠিক নেই? গেরুয়ার ভেক নিয়ে, ওদের গুরু হয়ে দলকে দল জপিয়ে জপিয়ে গাজনের সন্নিসী করেছি, ভৈরবীকালীর মাহাত্ম্য প্রচার করে এই দিকে ভিড়িয়েছি।'

সর্বেশ্বর আস্তে বলে, 'তার বিনিময়ে কী পেলে স্বর্ণ?'

'পাইনি পাব। তোমায় পাব। সেই আশায় পড়েই তো এত কাণ্ড! তোমায় পাব, তোমায় নিয়ে সংসার করব, হাতে করে তোমার সেবা করব, এই সাধেই যে জ্বলে-পুড়ে মরছি। ভাগ্যদোষে মা-ঠাকুমার মতন করে সংসার করতে পেলাম না, ভাবছি পদী কামারনীর মত করেই করব।'

'স্বর্ণ!' সর্বেশ্বর পাঠক বলে ওঠে, 'সে সংসারে আমার রুচি আসবেই এ-কথা ভাবছ কেন?

'শোন কথা! রুচি আসবে না? 'স্বর্ণ গালে হাত দিয়ে বলে, 'পরিবার থাকতেই তোমাদের মোহান্ত-মহারাজদের দু-একটা করে সেবাদাসী লাগে, আর তোমার তো শূন্য ঘর।'

সর্বেশ্বর এবার দৃঢ়স্বরে বলে, 'স্বর্ণ, তুমি যাও। তোমার কথাবার্তা বড় নীচ হয়ে গেছে, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

স্বর্ণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। একবার যেন কেঁপে ওঠে। তারপর সহসা পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে দালান থেকে নেমে চত্বর পার হয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যায়।

কিন্তু সর্বেশ্বর ঠাকুরও কেন দ্রুত পায়ে নেমে চত্বর পার হয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল? তার না ঘৃণা আসছিল, কষ্ট হচ্ছিল? সে না ধিক্কার দিচ্ছিল এক্ষুনি সামনের ওই মানুষটাকে নীচ হয়ে গেছে, মন্দ হয়ে গেছে বলে?

তবে ও অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বেশ্বরও অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়ে দৌড়ের বাজিতে জিতে ওকে ধরে ফেলে কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, 'স্বর্ণ!'

স্বর্ণ কিন্তু পিছু ফেরে না। দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে বলে, 'ছিঃ ঠাকুর, মেলাতলার মেয়েমানুষের পেছন পেছন ছুটো না। লোকে নিন্দে করবে।'

'স্বর্ণ!' সর্বেশ্বর বলে ওঠে, 'স্বর্ণ, আমায় মাপ কর, হঠাৎ কেমন রাগ চড়ে গেল, কি বলতে কি বললাম!'

স্বর্ণ এবার ফিরে দাঁড়ায়। বলে, 'ঠিকই তো বলেছ।'

'না না স্বর্ণ, সব ভুল বলেছি। তোকে দেখে অবধি'—সর্বেশ্বর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'তিলার্ধ স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'বেশ তো, চলে যাব কাল ওদের সঙ্গে, মিটে যাবে অস্বস্তি।'

'স্বর্ণ, তোর যাওয়া হবে না।'

স্বর্ণ হেসে উঠে বলে, 'তাহলে বাগদীপাড়ায় ঘর দেখি?'

আহত সর্বেশ্বর ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'এতদিন পরে কি তুই আমায় ব্যঙ্গ করতেই এসেছিস স্বর্ণ?'

অন্ধকার মাঠে পাশাপাশি চলছে দুজনে, সাপখোপের ভয়ও লুপ্ত হয়ে গেছে যেন।

সর্বেশ্বরের কথার উত্তরে বলে স্বর্ণ, 'বুঝতে পারছি না সর্বদা! হঠাৎ ভারি আশ্চয্যি লাগছে। মনে হচ্ছে, সত্যি কী করতে এলাম? অথচ—'

স্বর্ণ হাসির মত গলায় বলে, 'অথচ এই এতগুলো বছর শুধু এই আসার স্বপ্নই দেখেছি। আসার দিনই শুনেছি। কী আশ্চয্যি বল তো? মামা বিয়ে দিল, ঘর ভাল, বর ভাল, সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করব মিটে যাবে ল্যাঠা, তা নয়, হাবা বুদ্ধির বশে ভাবতে বসলাম, এ বিয়ে পাপ, এ বরের ঘর করা পরপুরুষের ঘর করার সামিল। মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেই যে শপথ, সেটাই আসল, সেই বিয়েই বিয়ে, সেই বরই বর। একেই বোধ করি বলে-সুখে থাকতে ভূতের কীল খাওয়া, তাই না? ঘরবসতের সময় এল, বেঁকে বসলাম, বললাম যাব না। মা গাল দিল, গলায় দড়ি দিতে উপদেশ দিল, দিতে পারলাম না। মনে ভাবছি, এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার, তোমাকে একবার না জানিয়ে মরি কি করে ছাই! তুমি যদি ভাব 'কী বিশ্বাসঘাতক!' দেখা হলে বলে মরব, 'দেখ, বাধ্য হয়ে আত্মঘাতী হতে হচ্ছে আমায়, দোষ নিও না। ছেলেবুদ্ধির যা বহর, তাই আর কি! তখন তাই গলায় দড়ি না দিয়ে, পুকুরে ডুবে না মরে—শ্বশুরবাড়ি গেলাম। যাব না বলে তো ছাড়ান হল না। যে মা অত স্নেহময়ী ছিল, সেই মা তখন উঠতে বসতে গঞ্জনা করছে আমায়।...

শ্বশুরবাড়ি এসেই ওই দুশ্চিন্তা, বরের ঘরে যাই কেমন করে শেষ অবধি দুগ্‌গা বলে কথাটা বলে বসলাম তাকে।

সর্বেশ্বর অবাক হয়ে বলে, 'কী বলে বসলে?'

ওই যে বললাম, 'মনে কিছু করো না। তোমার সঙ্গে বসবাস আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আগে অন্যত্র বিয়ে হয়েছে আমার।'

'অ্যাঁ!' সর্বেশ্বর শিউরে ওঠে। 'এই কথা বললে স্বামীকে?'

'স্বামী! মানে লোকচক্ষে স্বামী! তা সে যাই হোক, না বললে আত্মরক্ষেটা হবে কি করে?' স্বর্ণ অনুচ্চ একটু হেসে ওঠে, 'তখনকার যেমন মতি বুদ্ধি ছিল তেমন চিন্তা, এই আর কি!'

সর্বেশ্বর অস্ফুটে বলে, 'শুনে কি বলল সে?'

'শুনে? সে এক আশ্চর্য রহস্য! মনে ভেবেছিলাম শুনেই হয়তো লাথি-ঝাঁটা মারবে, দূর করে তাড়িয়ে দেবে। ও মা, সে সবের কিছু না। শুধু বলল, 'তোমার মাকে দেখে মনে হল না তো এতটা অসৎ কাজ করতে পারেন?'

আমি বললাম, 'মা জানলে তো সৎ অসৎ? তারপর সব ঘটনা খুলে বললাম।'

সর্বেশ্বর আবার শিউরে ওঠে, 'ভয় করল না?'

'নাঃ, ভয় আবার কিসের? কথাতেই তো আছে মরাব বাড়া গাল নেই! আমায় যদি মেরে ফেলে কি তাড়িয়ে দেয়, বেঁচে যাই। কিন্তু সে গুড়ে বালি। সব শুনে হেসে বলল, 'ওঃ, তাই বল। খেলাঘরের বিয়ে? ছেলেবেলায় অমন বিয়ে-বিয়ে খেলা আমিও কত খেলেছি। ওতে দোষ নেই।'

যতই বোঝাই খেলাঘরের নয়, ততই হাসে লোকটা। আর বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেয়েমানুষের তো সতীন থাকে, বেটাছেলেদেরও না হয় একটা থাকল—'

'আশ্চর্য!' সর্বেশ্বর অস্ফুটেই বলে, 'আশ্চর্য লোক তো!'

'তা আশ্চর্যই।' স্বর্ণ একটু উদাস উদাস গলায় বলে, 'অমনটি আর দেখলাম না। ছেড়ে চলে এসে তার জন্যেও মনের মধ্যে হু হু করে। মনে হয় দেবতুল্য লোকটা আমায় কী পাতকীই ভাবল! আসল কথা কী জানো, সংসারের আরো পাঁচজনের পথ যে যেতে পারবে, সে-ই সুখী, নচেৎ দুঃখের পসরা বইতেই হবে। আর পাঁচজনের মতন না হয়েই আমি হলাম জন্মদুঃখী। আমার মতন আর—'

সর্বেশ্বর ক্ষুণ্ণগলায় বলে, 'আমিও কম দুঃখী নই স্বর্ণ!'

'ওমা, সে কি!' স্বর্ণ আবার ওর স্বভাবসিদ্ধ বাচাল হাসি হেসে বলে ওঠে, 'তোমার আবাব দুঃখু

কি? কথায় বলে, অভাগ্যের ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বৌ মরে। দু-দুবার ভাগ্যবান হয়েছ তুমি। অথচ সত্যি যদি বিষ খাইয়ে না মেরে থাক, ভাগ্যবান হতে একফোঁটা খাটতে হয়নি তোমায়। যা করবার ভগবানই করেছে। আবার তা যদি ভগবান না করত, এতদিনে দিব্যি বৌ-ছেলে ঘর-সংসার নিয়ে সুখে রাজ্যিপাট করতে। আমায় যে আগাগোড়াই নিজের ভার বইতে হচ্ছে। লোকটা যদি মারধোর করত, হয়তো ভাল হত, সন্দেহ করে যদি আমায় স্পর্শ না করত, বাঁচতাম। তা তো হল না, সে বলল কিনা খেলার বিয়েয় দোষ নেই, তুমি আমি জন্মে জন্মে এক। কি তবে করব বল না পালিয়ে? লুকিয়ে একটা ইঁটখোলার নৌকো চড়ে পলায়ন দিলাম।'

'একা? একা পালালে?'

'তা ছাড়া? কে আমার দুর্বুদ্ধির সঙ্গী হবে? ভেবেছিলাম যেমন করে হোক একবার বীরপুরের মাটিতে এসে পা দেব, তোমার সঙ্গে একবার দেখাটা করেই প্রাণ বিসর্জন দেব। কিন্তু সে সুযোগ কি সহজে এল! কত ঘাটে ঘুরতে হল, কত ঘাটের জল খেতে হল, সে এক মহাভারত। কাকে বলে জেলা, কাকে বলে গ্রাম, কিছুই জানি না, শুধু বীরপুর বললে বোঝেই না কেউ।...অনেক সমুদ্দুর পার হতে হতে, বয়েস হয়ে উঠল ভরা, মন গেল বদলে। প্রাণে সংসার-সাধ জাগতে লাগল। ভাবলাম, মরব কেন? পৃথিবীতে এত সাধ-আহ্লাদ, আর আমি নিজেকে সব থেকে বঞ্চিত করে আত্মঘাতী হব? কেন? আমি বাঁচব। তোমার কাছে এসে হাজির হব। যেমন করে হোক তোমার সঙ্গে মিলব। লোকে আমায় মন্দ ভাববে ভাবুক, আমি তো মনে-প্রাণে জানব আমি সতী, আমি খাঁটি!'

মাঠের পথ শেষ হয়ে এসেছে, এখন দুজনের দুই পথ। সর্বেশ্বরকে যেতে হবে বাড়িতে, স্বর্ণকে যেতে হবে সেই খারাপ মেয়েদের ঝুপড়িতে।

সর্বেশ্বর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'স্বর্ণ, গাঁয়ের বুকে তোমায় নিয়ে আমি বাস করব কী করে?'

স্বর্ণ তীক্ষ্ণগলায় বলে, 'কেন? যেমন করে তোমার বাবা কামারপাড়ায়—'

'থাক স্বর্ণ, ওকথা থাক। এই বীরপুরের বুকে তোমায় নিয়ে সংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চেয়ে চল আমরা পালাই।'

সহসা স্বর্ণ দাঁড়িয়ে পড়ে। গাঢ় গভীর গলায় বলে, 'পারবে? বীরপুরের এই মোহন্তগিরীর রাজ্যিপাট ছেড়ে চলে যেতে পারবে?'

'পারব স্বর্ণ।'

'তবে এখনই চল না!'

'এখন?' সর্বেশ্বর বিচলিত গলায় বলে, 'এখন কী করে হবে? চারিদিকে কত কর্মবন্ধন—'

'স্বর্ণ হেসে ওঠে। বলে, 'বন্ধন ছিঁড়তে হলে, চোখ-কান বুজে ছিঁড়তে হয় গো! উইল করে, ঘর-সংসার গুছিয়ে, দেনা-পাওনা মিটিয়ে বন্ধন ছেঁড়া যায় না। ও তোমার দ্বারা হবে না।'

সর্বেশ্বর অভিমানের গলায় বলে, 'আমাকে তুমি এমন অধম ভাবছ স্বর্ণ? যতই হোক মা ভৈরবীকালীর মুখটাও তো চাইতে হবে। তাঁর সেবার একটা ব্যবস্থা না করে—'

'হি-হি-হি' স্বর্ণ যেন মুখে আঁচল গুঁজে হাসি রোধ করবার চেষ্টা করে। ওর কথার সুরে সেই চেষ্টার আভাস—'এই সেরেছে, কেন জানি না হঠাৎ বড্ড হাসি পাচ্ছে! ঘরে গিয়ে বরং একটু হাসি গে, কেমন? তুমি বাড়ি যাও।'

দ্রুতপায়ে কেরোসিনের কুপীর ধোঁয়া ওড়ানো লালচে আলোর ইশারাবাহী ঝুপড়িগুলোর দিকে এগিয়ে যায় স্বর্ণ। মিলিয়ে যায় কোথায় যেন।

মিলিয়ে তো যায়, কিন্তু বেচারা সর্বেশ্বরকে যে একেবারে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিয়ে যায়।

সর্বেশ্বরের স্তিমিত শান্ত বিবর্ণ জীবনের ওপর হঠাৎ এ কী দুরন্ত ধাক্কা? এ কী চড়া রঙের বিদ্যুৎদীপ্তি? সর্বেশ্বর দিশেহারা হয়ে যায়। স্বর্ণকে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে। স্বর্ণর দুর্মতির সংবাদে ঘৃণা করতে

অভ্যাস করেছিল, ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল স্বর্ণর চিন্তায়, হঠাৎ স্বর্ণ সেখানে একটা সর্বনাশা কুল-ভাঙা বন্যার বেশে এসে আছড়ে পড়ল।

স্বর্ণর বাচনভঙ্গী আর এক জগতের, স্বর্ণর দুঃসাহস আর এক জগতের, স্বর্ণর চিন্তাধারা আর এক জগতের। বীরপুরের মাটিতে মাটি হতে থাকা সর্বেশ্বর পাঠকের কাছে এ এক অদ্ভুত নতুন ভয়ঙ্করী আকর্ষণ।

সর্বেশ্বরের সমস্ত চৈতন্য ওর পিছু পিছু ছুটতে চাইছে। অথচ সর্বেশ্বর ওকে ঘৃণা করছে, ওকে অস্পৃশ্য ভাবছে, ওকে মহাপাতকী ভাবছে।

ভাবছে, আবার ভাবছে সত্যিই কি তাই সম্ভব? মা ভৈরবীকালীর হাত মুচড়ে ভাঙতে গিয়েছিল? অসম্ভব! মন্দ সঙ্গে মিশে মিশে মুখের তো আর এখন রাখ-ঢাক নেই ওর, মিথ্যে বাহাদুরী দেখাতে বলে নিল আমি ঠাকুরকে অঙ্গহীন করেছি।...সত্যি তাই করলে আর ওই রূপসী অঙ্গ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত না? কিন্তু আশ্চর্য, কী নির্ভীক! ভয় বলে বস্তুটাই যেন নেই। লোকভয়, ধর্মভয়, সমাজভয়, এই নিয়েই তো মানুষ, এই নিয়েই জীবন কাটাচ্ছে! এই সর্বেশ্বরের জানিত জগৎ! ভয় করতে করতেই এত বড়টা হল সর্বেশ্বর।

হঠাৎ এই ভয়শূন্যতা তাকে যেমন ভয়ও পাওয়াচ্ছে, তেমনি একটা দুর্বার আকর্ষণেও টানছে।

মাঠের পথ পার হয়ে বাড়ির পথ ধরেছিল সর্বেশ্বর, ভুলে বাড়ি পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অজস্র প্রশ্ন ওর মাথাটাকে যেন মাছির মত ছেঁকে ধরছে।

আমাদের সেই ছেলেখেলার বিয়েটাকে স্বর্ণ তাহলে মনে-প্রাণে এত সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল? কই, আমি কি—

কিন্তু যতই স্বর্ণ আজীবন ভজে থাকুক, যতই পরপুরুষ স্পর্শ না করুক, কুলত্যাগ যখন করেছে, অবশ্যই সমাজে পতিত, তাছাড়া খারাপ মেয়েমানুষের দলেই আছে। গেরুয়া পরলে আর কি হবে? কুসঙ্গ বলে কথা! এখন স্বর্ণ আমার আশ্রয়ে এসে থাকতে চাইলেই আশ্রয় দেব আমি? এদিকে বলছে সতী আছে, অথচ নষ্টচরিত্র মেয়ের পরিচয়ে থাকতে চায়। সত্যি সতী হলে মুখ দিয়ে বার করতে পারত একথা?

বলে যে আমার সেবা করার সাধ!

মা ভৈরবীকালীর বিষয়ে কথাটা যদি সত্যি হয়, ওর ওই পাপ হাতের সেবা আমি নেব?

প্রশ্নগুলো মাথাটাকে কামড় দিতে থাকে, কিছুতেই নামতে চায় না। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হয় বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

কী আশ্চর্য, পাগল হয়ে গেল নাকি সে? একেই বোধহয় বলে মোহিনী মায়া! মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে—কে বলতে পারে স্বর্ণ ডাকিনী-মন্ত্র শিখে এসেছে কিনা!

দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরে আসে সর্বেশ্বর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, কাল সকালবেলাই ওকে জানিয়ে দেবে, বীরপুর থেকে বিদায় হও তুমি। যে দলে মিশে এখানে এসেছ, সেই দলের সঙ্গেই বিদায় হও। তোমাতে আমার আর বিন্দুমাত্র রুচি নেই।

কিন্তু রাত্রের সেই প্রতিজ্ঞা কি সকালে রক্ষা করতে পারল সর্বেশ্বর? তবে কেন সকালের রোদে দেখা গেল, সর্বেশ্বর মন্দিরের পিছনের পুকুরধারে দাঁড়িয়ে কাতর বচনে বলছে, 'দোহাই তোর স্বর্ণ, একবার আমাদের সেই জায়গাটায় চল। সেই আমাদের ছেলেবেলার ভালবাসার জায়গা। তুই চলে গিয়ে পর্যন্ত কতদিন আর ওদিকে তাকাতে পারিনি। ভেবেছি, যদি আবার কোনদিন আসিস তুই—'

হ্যাঁ, এই কথাই বলছিল সর্বেশ্বর। কথাটা পরনের পট্টবস্ত্রের সঙ্গে বেমানান হলেও বলছিল।

অথচ সর্বেশ্বর সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও দৃঢ় সংকল্প করেছিল পুজো সেরে ফেরার সময় ওদের ওই মাঠের ধারে গিয়ে ডাক দিয়ে বলবে, 'স্বর্ণ, তুমি যাদের সঙ্গে এসেছ তাদের সঙ্গেই বিদায় হও। তোমাকে আমার ঘৃণা হচ্ছে।'

কিন্তু মাঠের দিক পর্যন্ত কি যেতে হয়েছিল সর্বেশ্বরকে? হয়নি। মন্দিরের দরজায় এসেই থমকে দাঁড়িয়ে

পড়তে হয়েছিল তাকে। নাটমন্দিরে গান হচ্ছে। মৃদু মধুর গুঞ্জনধ্বনি। শ্যামসঙ্গীত না শ্যামাসঙ্গীত বোঝা যাচ্ছে না। সুরটা বুঝি কীর্তনেরই।

মুহূর্তে সর্বেশ্বরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে যায়, সর্বেশ্বর থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গায়িকার চোখ বোজা, গালের উপর জলের ধারা। সদ্য ভিজে চুলগুলো ঘাড়ে পিঠে ছড়ানো, গেরুয়া শাড়িতে সকালের আলোর আভা।

এই ছবিকে সর্বেশ্বর বলবে, 'তুমি দূর হও? তুমি বিদায় হও?'

সর্বেশ্বর গান শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। শেষ হলেও দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ গানের শেষেও স্বর্ণর চোখ বোজা।

অনেকটা পরে একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় স্বর্ণ, আর সর্বেশ্বর 'দূর হয়ে যাও'য়ের পরিবর্তে বলে, 'স্বর্ণ! এমন অদ্ভুত গান গাইতে পার তুমি?'

স্বর্ণ বলেছিল, 'চলে যাব, তাই শেষবারের মত মাকে নিশ্চিন্তে দেখতে এসেছিলাম। বেলায় ভীড় হয়ে যায়।'

সর্বেশ্বর বলেছিল 'চলে যাবে? তাই আর কি? দেখি কেমন যেতে পার?'

'শোন কথা, আমি সত্যি থাকতে এসেছি?' স্বর্ণর চোখে জলের আভাস, মুখে হাসি। দলেরা পোঁটলা-পুঁটলি বাধছে, ভাবলাম এই তক্কে—'

'স্বর্ণ, দলেরা যে যেখানে যাবে যাক, তোমার যাওয়া হবে না।'

স্বর্ণ একবার ওই পট্টবস্ত্রপরিহিত, তরুণ দেহকান্তির দিকে তাকিয়ে দেখে। পাঠক-বংশের চেহারা ব্রাহ্মণোচিত বটে। দীর্ঘ উন্নত চেহারা তীক্ষ্ণ নাক, সুগঠিত চিবুক। শিবেশ্বরের গড়ন একটু স্থূল, সর্বেশ্বর একহারা। তাই লম্বা একটু বেশী দেখায়।

দেখলে মনে হয় বুদ্ধিমান পণ্ডিত।

তা, স্বর্ণকে দেখেও তো মনে হচ্ছে সন্ন্যাসিনী।

স্বর্ণ এখন আর বাচাল হাসি হেসে ওঠে না। স্বর্ণ বেশ গম্ভীর গলায় বলে 'শুনে বাঁচলাম। তা থাকার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে?'

'থাকার জায়গা?' সর্বেশ্বর থতমত খেয়ে বলে, 'কার?'

'ওমা! এ যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার পিতে। আমার দলেরা তো আজই তাঁবু গুটোচ্ছে, ওদের সঙ্গে যাওয়া বন্ধ হলে আশ্রয়টা দিনের আলোয় দেখে রাখতে হবে তো?

সর্বেশ্বর ব্যস্তভাবে বলে, 'আচ্ছা, সে সব কথা হবে, দোহাই তোমার আমাদের সেই জায়গাটায় একবার চল। সেখানেই কথা হবে। এখানে এখুনি কে আসবে, হয়তো চিনে ফেলবে—'

'চিনে!' স্বর্ণ একটা উদাস নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কোথায়? এই তো এই তিনদিন মন্দিরে আসছি যাচ্ছি, কেউ তো চিনল না, তাকিয়েও দেখল না। বলল না, 'ও মা, স্বর্ণ না?'

'না বলেছে সেটাই তো মঙ্গল', সর্বেশ্বর ব্যস্তভাবে বলে, 'চিনলেই তো কেলেঙ্কারী হত!'

'ও, তা বটে।' স্বর্ণ মুচকি হেসে বলে, 'কিন্তু ভাবছি তোমার যেমন কেলেঙ্কারীর ভয় দেখছি, বিপাকে পড়লে আমায় গঙ্গায় ঠেলে ফেলে দেবে না তো?'

'স্বর্ণ, এমন নিষ্ঠুর কথা তোমার মুখেই সাজে। কিন্তু কথা রাখবে তো? চলে যাবে না?'

স্বর্ণ একটা বিচিত্র হাসি হেসে বলে, 'চলে যাব বলে তো আসিনি, থাকব বলেই এসেছিলাম। কিন্তু সেই পালানোর পরামর্শটার কী হল গো?'

সর্বেশ্বর মৃদু গলায় বলে, 'সে-কথা অনেক ভাবলাম। কিন্তু শেষ পরে ভেবে ভেবে দেখছি, চলে গেলে বৃদ্ধ মা-বাপকে কে দেখে, মায়ের পুজোর কি হয়? তাছাড়া জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি বাবা তো আজকাল দেখতেই পারে না। আমি উপযুক্ত ছেলে, আত্মসুখের জন্যে ওঁদের অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাব, সেটা কি ভাল হবে?'

স্বর্ণ সায় দিয়ে উৎসাহ সহকারে বলে, 'পাগল, তাই কখনো হয়! আমি কি সত্যি বলছিলাম গো? পরিহাস করছিলাম বৈ তো নয়!'

সর্বেশ্বর নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। সজ্ঞানের কথার মতন তো লাগেনি কথাটা। সে যাক, একটা পরামর্শ দিচ্ছিলাম—'

স্বর্ণ মহোৎসাহের গলায় বলে 'কী পরামর্শ গো?'

বলছিলাম, 'অত চিন্তার কি আছে? পথ তো তুমি পরিষ্কার করেই রেখেছ। গেরুয়া নিয়েছ, রুদ্রাক্ষ পরেছ, পুরো ভৈরবী বেশ। মায়ের মন্দিরেই স্থিতি হও না! এমন তো কতই থেকে গেছে। মনে নেই তোমার সেই শঙ্করী ভৈরবীকে? সেই যে—'

স্বর্ণ কৌতুকোজ্জ্বল মুখে বলে, 'খুব মনে আছে। পাঠকজ্যাঠার সঙ্গে মাঝে মাঝে লেগে যেত ধুন্ধুমার। ভাবও যত, আড়িও তত।'

সর্বেশ্বর অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'বাবার সঙ্গে লাগত পেসাদ পেসাদ কবে। কিছুতেই যে তেনার মন উঠত না। পেটটি তো রাক্ষসের ছিল!'

'ওঃ তবু ভাল।' স্বর্ণ নিশ্চিন্ত সুরে বলে, 'আমার আর তবে ভয় নেই, এক ছটাক চালের ভাত খাই। কিন্তু হ্যাঁ গো, গেরুয়া পরেই জীবন কাটাতে হবে? তাহলে আমার সংসার-সাধের কী হবে?'

সর্বেশ্বর আশ্বাসের স্বরে বলে, 'সংসারে বাধা কি? পেসাদ খেয়েই দিন কাটাতে হবে তারও কোন মানে নেই। ওদিকের ওই যাত্রী ঘরগুলোর একটাতে ইচ্ছেমত রেঁধে-বেড়ে খেতে পার। শঙ্করী ভৈরবী একবার ঝগড়া করে পেসাদ ছেড়ে দিয়ে রেঁধে খেত, বেশ মনে আছে? বড়ি শুকোতে দিত, আচার বানাতো—'

'সত্যি? তাই বুঝি? 'স্বর্ণ যেন খুশিতে ফেটে পড়ে, 'তবে আবার কি? বড়ি দিয়ে আচার বানিয়ে বেঁধে বেড়ে দিব্যি সংসার করতে পাব তাহলে! থাকার ঘরও পাব!'

সর্বেশ্বর মহোৎসাহে বলে, 'তাইতো বলছি। অথচ নিত্য দুবেলা দেখা হবে। হরদমই হবে। বাবা তো চলৎশক্তিহীন, সর্বদাই আমি।

'যাক, একটা ব্যবস্থা তাহলে হল।' স্বর্ণ নিশ্চিন্তের গলায় বলে, 'অথচ দেখ কত ভেবে মরছিলাম। কিন্তু ভাবছি—'

'আবার কি ভাবছ?'

'ভাবছি থাকতে থাকতে যদি কেউ চিনে ফেলে?'

'এই কথা?' সর্বেশ্বর ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়—'এই চিন্তা? তখন চিনল তো বয়েই গেল। সন্নিসীর সাজ নিয়েছ, আর ভয়টা কি? বলবে, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এই পথের পথিক হয়েছি।'

'বাঃ রে! আজকাল অনেক ভাল ভাল ভাষা শিখেছ তো! তাহলে ওই কথাই রইল?'

সর্বেশ্বর বিগলিত গলায় বলে, 'হ্যাঁ। তুমি যে এত সহজে রাজী হবে তা, ভাবিনি স্বর্ণ! তোমার পোঁটলা-পুঁটলি তাহলে ওদের থেকে আলাদা করে এখানে এনে রাখ। আমি বরং ঘরটা ধুইয়ে—'

'থাক্ থাক্, যা আছে তাই থাক্। বৃথা কষ্ট করবে কেন? যাই তাহলে?'

'যাই বলতে নেই।'

'আচ্ছা আসি।'

'হ্যাঁ, এখুনি এস। ওরা বিদেয় হলেই। তবে একটা আর্জি, দুপুরে সেই আমাদের বটঝুরির ওখানে যাওয়া চাই, বুঝলে তো? মন্দিরে তো দুদণ্ড মুখোমুখি বসা যাচ্ছে না, সর্বদা ভয়। কত কথা কইবার রয়েছে। আসবে?'

স্বর্ণ বিচিত্র হাসি হেসে বলে, 'আসব।'

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যে বিকেল হয়ে আসে, কোথায় স্বর্ণ?

সর্বেশ্বর সেই বাল্যকালের মতই অপেক্ষা করে, মশার কামড় খায় আর ছটফটিয়ে মরে। স্বর্ণ কি তবে বেইমানী করল? স্বর্ণ ভোগা দিল? স্বর্ণ মিথ্যে স্তোক দিল?

মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দেখে সর্বেশ্বর, আর মাথাটা আবার ঢুকিয়ে নেয়।

আশ্চয্যি, সেই বদ মেয়েমানুষগুলো এত বন্ধু হল যে তাদের বিদায় না দিয়ে আর আসতে পারছেন না!

এগুলো বন্ধ করতেই হবে।

ভাবল সর্বেশ্বর। আর অনেকক্ষণ পরে বেলা যখন প্রায় পড়ে এসেছে, স্বর্ণ এসে দাঁড়াল। স্বর্ণর মুখে পড়ন্ত সূর্যের স্বর্ণাভা।

সহসা ভয়ানক একটা উন্মাদনা অনুভব করল সর্বেশ্বর। নীতি দুর্নীতি পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি সব কিছু যেন ঝাপসা হয়ে গেল তার চেতনা থেকে। স্বর্ণকে হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এই লোকলোচনের অন্তরালে একবার সাপটে ধরে দলিত মথিত করে ফেলবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল।

কেন নয়? স্বর্ণ তো তার বিয়ে-করা বৌ। এই দীর্ঘকাল ধরে তো স্বর্ণ সেই ধারণা নিয়েই কাটিয়ে এসেছে, এবং বহুচেষ্টায় বীরপুরে এসে হাজির হয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে। অতএব স্বর্ণকে উপভোগ করার মধ্যে কোন পাপ নেই। দেবতার জন্যে সাজানো নৈবেদ্য, দেবতা গ্রহণ করলেই তো নৈবেদ্যর সার্থকতা।

স্তিমিত সর্বেশ্বর পূজুরীর দৈনন্দিন জীবন ছিল ছকে বাঁধা, সেখানে উন্মাদনাব কোন অবকাশ ছিল না। দু' দুবার বিয়েই হয়েছে, বৌ দুটো তো ঘরবসতের আগেই খতম। একটা কলেরায়, একটা জ্বর-বিকারে। লোকমুখে বার্তা পেয়ে চন্দ্রাননী যখন পাড়া জানিয়ে চিৎকার করে কেঁদেছে, সর্বেশ্বর শুকনো মুখে অপরাধী ভাবে ঘুরেছে। আবার মা যখন হাঁড়ি-কুড়ি ফেলে নেয়ে ধুয়ে ছেলেকে ডাক দিয়ে বলেছে 'স্বামীর ওপর অশৌচ লাগে না, তুই তোর রাজুপিসির কাছে মাছ-ভাত খেয়ে আয়,' তখন গেছে সুড়সুড় করে। অবশ্য ব্যাপারটা যাতে শিবেশ্বর বা পাড়ার আর পাঁচজনের কানে না ওঠে, সে ব্যবস্থাও করেছে চন্দ্রাননী। সর্বেশ্বর তাতে সহযোগিতা করেছে। এই, একটুমাত্র বৈচিত্র্য তার জীবনে দুবার দেখা দিয়েছে। বৌ মরার জন্যে বৌয়ের অভাবজনিত যন্ত্রণা কই কখনো অনুভব করেছে বলে মনে পড়ে না। ঘরে একটা বৌ থাকলে মন্দ হয় না। মা-র সঙ্গে ঘোরে ফেরে, রাত্তিরে ঘোমটাটি দিয়ে মল বাজিয়ে ঘরে ঢোকে, রোমাঞ্চ আছে এমন ভাবনায়, কিন্তু সে ভাবনায় তীব্রতা ছিল না। আবেগ-ইচ্ছা-উন্মাদনা, এসবের স্বাদ জানা ছিল না সর্বেশ্বরের। হঠাৎ আজ তার চিরবুভুক্ষু দেহমন যেন উন্মাদ হয়ে উঠতে চাইল।

স্বর্ণর একটা হাত চেপে ধরে সংকীর্ণ একটা ফাঁক দিয়ে ভিতরে টেনে নিল সর্বেশ্বর, চাপা উত্তেজনায় বলে উঠল, 'স্বর্ণ, নিজেই তুমি স্বীকার করেছ তুমি আমার বিয়ে-করা পরিবার।'

স্বর্ণ আস্তে কৌশলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'তা তো করেইছি গো! তাই তো যাবার আগে একবার গলবস্তর হয়ে প্রণাম করে নিতে এলাম। না এসে মন মানল না।'

'যাবার আগে!' সর্বেশ্বরের ভঙ্গী শিথিল হয়ে যায়। সর্বেশ্বর শিথিল গলায় বলে, 'যাবার আগে মানে?'

'মানে গরুর গাড়িতে ওঠার আগে। ওরা সব মালপত্তর চাপিয়ে তিনখানা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, আমি মাঠের ওপর দিয়ে আগে আগে এসে গেলাম। জানি তো অনেকক্ষণ অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাচ্ছ।'

সর্বেশ্বর আশাভঙ্গের আঘাতে ছিটফিটিয়ে বলে ওঠে, 'ওঃ সে জ্ঞান ছিল। কিন্তু যাবার কথাটা কি হল? ও-কথা তো ছিল না।'

'শোন কথা,' স্বর্ণ গোপন অভিসারের মর্যাদামাত্র না রেখে দিব্যি খোলা গলায় হেসে বলে ওঠে, 'ঠাট্টা-তামাশার কথাটা সত্যি ভেবে বসে আছ তুমি? পূজুরিগিরি করে করে বুদ্ধি তোমার সেরেফ ভোঁতা হয়ে গেছে গো! যাকগে, পেন্নামটা সেরে নিই।' ....আর সত্যিই গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে একটু থামে স্বর্ণ, তারপর বলে, 'আর শোন, যার জন্যে এখানে আসা! এই বুড়ো বটের গোড়ায় গর্ত খুঁড়ে

পুঁতে রেখে গিয়েছিলাম মায়ের সেই ভাঙা হাত। দিব্যি গেলেছিলাম, 'মা, যদি কখনো দিন পাই, তোমার এই ভাঙা হাতকেই প্রতিষ্ঠা করে আমাদের এই সাক্ষীবটের নীচে তোমার জন্যে আলাদা একটা মন্দির বানাব।'

ছেলেবুদ্ধির গলায় দড়ি! ভেবেছিলাম, সব কিছু পোঁতা থাকলেই বুঝি চিরকাল থাকে। দিন পেলে তুলে নিয়ে ইচ্ছে বাসনা মেটানো যায়। ভাব মুখ্যুমী। আশায় ভর করে এসে খুঁড়ে দেখি—ওমা, কোথায় কি! পুঁতে রাখা জিনিস কোন ফাঁকে উইয়ে শেষ করে রেখেছে। আর কি করা যায় বল? চলি তাহলে—'

'এইখানে পুঁতে রেখেছিলে!' শিউরে উঠে সর্বেশ্বর। 'ভাগ্যিস! মা নিজেই রক্ষে করেছেন।' একটু আগেই না সর্বেশ্বর হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে এখানেই অসংযমী হয়ে বসছিল?

ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলে, 'রেখেছিলেই যদি তো রাখবার আর জায়গা পাওনি? এইখানে পুঁতে রেখে গিয়েছিলে! আচ্ছা বোকা তো!'

'ও বাবা, তা আবার বলতে! রামবোকা! ভেবেছিলাম এই বটবৃক্ষ আমাদের ভালবাসার আর তার দিব্যি দিলাসার সাক্ষীবট, এ রাখবে যত্ন করে। সেই ভরসায় এতদিন পরে কবেকার সেই পোঁতা জিনিস খুঁজতে এলাম। বলে গিয়েছিলাম কিনা, 'হে বটবৃক্ষ তুমি যদি সত্যকালের বট হও, তবে রক্ষা কর এটি। আর আশীর্বাদ কর, যে হাতে আমি মা ভৈরবীকালীর হাত ভেঙেছি, সেই হাতেই যেন তাঁর নতুন মন্দির গড়ে দিতে পারি।'

সর্বেশ্বর বেকুবের মত বলে, 'তা, তুমি যদি তেমন ইচ্ছে কর, এখনও করতে পার। মায়ের মন্দিরের একটু মাটি এনে এখানে গেড়ে ভিৎ পুজো করে'—কথা শেষ হতে পায় না। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি সেই ঝুরির সারি সরিয়ে ভিতর কোটর থেকে বেরিয়ে এসে মুখে আঁচল দিয়ে বলে, 'ও বাবা, আবার যে আমার সেই রকম হাসি পাচ্ছে গো! ভেতর থেকে হাসি ঠেলে উঠছে। ও আর আমার দ্বারা হবে না, আসল জিনিসটাই যখন উধাও, তখন আর একটু মাটি এনে—না বাবা, হল না। চললাম গো, ওঃ, হাসি রুখতে পাচ্ছি না।'

ছুট মারে স্বর্ণ মুখে আঁচলটা তেমনি চেপে ধরে।

দূরের দিকে তাকিয়ে দেখে সর্বেশ্বর মাঠের ওপার ঘুরে খান তিনেক গরুর গাড়ি আসছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে মাল আর মানুষ বোঝাই দিয়ে। স্বর্ণ দ্রুত গিয়ে ওদের একটাকে ধরে ফেলে, একটু দাঁড় করিয়ে একটাতে উঠে পড়ে। গাড়িগুলো এগোতে থাকে মন্থর গতিতে। সর্বেশ্বর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। নতুন কোন দৃশ্য নেই, শুধু ধুলো উড়ছে পিছনের চাকা থেকে। তবু সেই দৃশ্যটাতেই এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সর্বেশ্বর, বহুক্ষণ পর্যন্ত যে চাকার সেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা কানে আসছে না, সেটা তার খেয়ালেই আসে না।

অনেকক্ষণ তেমনি মূঢ়ের মত তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ নিজ মনেই সশব্দ মন্তব্য করে ওঠে সর্বেশ্বর, 'দূর, মাথাটাই বিগড়ে গেছে, নইলে এত হাসে কেউ!'

তারপর হনহন করে এগিয়ে যায়।

অনবগুণ্ঠিতা

গুরুজন সম্মানের পাত্র এ কথা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু চরিত্রহীন গুরুজনকে সে সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, দেওয়া সম্ভব কি না, এ প্রশ্ন ক্রমশঃই সংসারের তলায় তলায় ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। যেন হঠাৎ কোন অসতর্ক বাতাসে জ্বলে উঠবে সেই উত্তপ্ত ধূমজাল।

মাঝে মাঝেই যেন সেই বাতাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে আজকাল। মনে হচ্ছে চন্দ্রভূষণকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো বুঝি!

প্রথম প্রথম সংসারের প্রধান সদস্যা ভাদ্রবৌরা আড়ালে তাদের 'আইবুড়ো বট্‌ঠাকুর'কে নিয়ে হাসাহাসি করছিলো, বলছিলো, 'ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত যাই হোক, বট্‌ঠাকুরের অভিসার যাত্রাটি বন্ধ হবে না!' কিন্তু ব্যাপারটা আর যেন হাসিঠাট্টার পর্যায়ে থাকছে না।

ওরা বলছে, 'আশ্চর্য! বুদ্ধির অগম্য! এতই যখন দুর্বলতা, তখন আর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার 'শো' কেন?'

বলছে, 'আরো আশ্চর্য, লজ্জা বলে বস্তুটার বালাইমাত্র নেই। যখন যান আসেন, কে বলবে কোনো খারাপ জায়গায় যাচ্ছেন! কী সপ্রতিভ!'

আবার নিজ নিজ বরের কাছে ঠোঁট উলটে মন্তব্য করছে, 'ওই দাদাকে যে তোমবা কী কবে এত পূজ্যি কর বুঝি না।'

তা' 'পূজ্যি' কথাটা অতিশয়োক্তি নয়।

ছোট তিন ভাইয়ের কাছে বরাবর সেই আসনই ছিল চন্দ্রভূষণের। দাদাই ওদের আদর্শ নায়ক, দাদাই ওদের জীবনের 'হীরো'! দাদার সব কিছুতেই মুগ্ধ বিমোহিত হতো ওরা।

হয়তো তার কিছুটা কারণ ছিল চন্দ্রভূষণের প্রকৃতির প্রাবল্য, আর কিছুটা ছেলেবেলার দূরত্বের মোহ।

হ্যাঁ' দূরত্ব ছিল।

ছেলেবেলায় দাদা ওদের কাছে দুর্লভ বস্তু ছিল। কারণ চন্দ্রভূষণের পাঠ্যাবস্থাটা কেটেছে রাজশাহীতে মামার কর্মস্থলে। ছুটিছাটায় কলকাতায় আসতো চন্দ্রভূষণ মা বাপেব কাছে।

বাড়িতে তখন ঠাকুমা, পিসি, জেঠা, কাকার ভিড, চন্দ্রভূষণের মা'রও প্রথম ছেলেটির জন্মের পর বছব পাঁচেক বিরতির অন্তে উপর্যুপরি তিন মেয়ে, তিন ছেলে। অবশ্য সাতটি সন্তান এমন কিছু আশ্চর্যের ঘটনা নয়, চন্দ্রভূষণের জেঠিমার তো তেরোটি! কাকীমার দশটি!

কিন্তু আশ্চর্যের জন্যে নয়, হিতচেষ্টাতেই চন্দ্রভূষণের বড়মামা বলেছিলেন, 'তোদের এই ভেড়ার গোয়ালের মধ্যে পড়ে থাকলে, চন্দরটার লেখাপড়া কিছু হবে না সুষি, তা' বলে রাখছি। ছেলেকে যদি মানুষ করতে চাস তো আমার সঙ্গে দে, ওখানেই পড়াশুনো করুক দেবুর সঙ্গে।'

দেবু বড়মামার একমাত্র ছেলে দেবব্রত।

এক সন্তানের পিতার অবশ্যই এদের সংসারকে 'ভেড়ার গোয়াল' বলবার অধিকার আছে, কাজেই সে অপমান গায়ে মাখলেন না চন্দ্রভূষণের মা সুষমাসুন্দরী, তবে দিশাহারা হলেন আচমকা এই প্রস্তাবটায়। চট্ করে উত্তর দিতে পারলেন না।

বড়মামা বোনের এ বিমনা অবস্থা দেখে আর একটু জোর দিলেন, 'ছেলেটার ব্রেন আছে বলেই বলছি। দেখেছি তো কথা কয়ে, সব দিকে চৌকস বুদ্ধি! এমন ছেলেটা মাঠে মারা যাবে, ভেবে কষ্ট হচ্ছে রে।'

মারা যাওয়া শব্দটায় বোধকরি শিউরে উঠেছিলেন সুষমাসুন্দরী, বড়ভাই সেটা লক্ষ্য করে অন্য অর্থে নিয়ে ব্যঙ্গহাসি হেসে উঠেছিলেন, 'তবে থাক্ বাবা ছেলে তোর আঁচলের তলায়! তোর ওই শামুক গুগ্‌লিদের

কাঁথা পাট করবে, আর ঝিনুক-বাটি কাজললতা এগিয়ে দেবে, ভালই থাকবে! কালে ভবিষ্যতে কাকার মত কবরেজ হবে।'

সুষমাসুন্দরী এবার বিচলিত হলেন তাঁর মগজওলা ছেলের এই ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কায়। কাতর হয়ে বললেন, 'না না দাদা, তুমি নিয়ে যাও।'

'নিয়ে যাও' বললেই অবশ্য এককথায় নিয়ে যাওয়া হয় না। মা কিন্তু আর ছেলের গার্জেন নয়। এ প্রস্তাবে আপত্তি আর মন্তব্যের ঝড় উঠেছিল সংসারে—কলকাতা ছেড়ে পণ্ডিত হতে যাবে 'বাঙাল দেশে' গিয়ে, এ হাসির ঢেউও বয়েছিল, তবু কেমন করে যেন শেষ পর্যন্ত ঘটেও গেল ঘটনাটা! মামার কর্মস্থল রাজশাহীতে চলে গিয়েছিল চন্দ্রভূষণ তার স্বল্পসঞ্চয় জামা কাপড় আর পুঁথিপত্তর নিয়ে।

ছোট ভাই বোনেদের কাছে দিনটা দুর্দিন হলো। দাদাই যে তাদের দুষ্টুমির গুরু, যথেচ্ছাচারের পৃষ্ঠপোষক। নিত্যনূতন খেলার উদ্ভাবক দাদা, বড়দের ফাঁকি দিয়ে মজা করার ব্যাপারে দাদা, ভূতের ভয় দেখাতে, এবং ভূতের গল্প বলতে দাদা! দাদার প্রকৃতির প্রাবল্য, দাদার প্রাণপ্রাচুর্য, দাদার কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, এবং নেতৃত্বের বুদ্ধি তাদেরকে মোহিত করে রাখতো।

শুধু তাদেরই বা কেন, জেঠতুতো খুড়তুতো বয়সে বড় ভাই বোনেরা পর্যন্ত চন্দরের গুণে বিগলিত হতো। তারাও অধস্তন বনে যেত। এহেন চন্দরের বিরহবিচ্ছেদ রীতিমত শোকাবহ বৈকি!

আবার সে যখন ছুটিতে বাড়ি আসতো, উৎসবের সাড়া পড়ে যেত। বুঝি বা আরো উজ্জ্বল হয়ে আসতো দাদা, আরো দীপ্ত তীক্ষ্ণ চঞ্চল! পুব-বাংলার উদ্দাম প্রকৃতি তাকে বুঝি যোগান দিত অধিকতর প্রাণরস।

এ বাড়িতে খেলাধুলোর পাট ছিল না, চন্দ্রভূষণ মামার বাড়ির আবহাওয়ায় সেটা রপ্ত হয়ে খেলাধুলায় স্বাক্ষর রাখতে শুরু করলো। এ বাড়িতে গানবাজনার চর্চা 'বখাটে ছেলে'র লক্ষণ বলে গণ্য হতো, চন্দ্রভূষণ সে বাড়িতে গান আনলো। চন্দ্রভূষণের কৈশোর যৌবনের কণ্ঠ তর্কে কল্লোলিত, উৎসাহে উল্লসিত।

চন্দ্রভূষণের তর্কে কেউ রাগ করতে পারতো না! ঠাকুমা বলতেন, 'ওকে কে এঁটে উঠবে বাবা, ডাকাত একটা!'

পিসিমা বলতেন, 'রূপেই মজিয়েছে তোমার নাতি! যা বলে তাই শোভা পায় কী আর সাধে! বলতে নেই মামার বাড়ি থেকে কেমনটি হয়ে আসে!'

জেঠা কাকারা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হতেন, 'বুঝলাম তো বাবা তোর যুক্তি, কিন্তু তুই লেখাপড়া বজায় রেখে গানবাজনা খেলাধুলো করিস, সেটা সহ্য হয়, এগুলো যে এক-একটি গরু! এর উপর আবার গান ধরলে?'

এটা অতিশয়োক্তি, বাড়ির সব ছেলেরাই 'গরু' নয়, তবে হয়তো চন্দ্রভূষণের মত মেধাবী সবাই নয়। কিন্তু ওই রকমই বলতেন তাঁরা।

চন্দ্রভূষণ বলতো, 'ব্যায়ামে মাথা পরিষ্কার হয়।'

'গানবাজনা তো আর ব্যায়াম নয়?'

'বলো কি? নিশ্চয়। সমস্ত স্নায়ু শিরার ব্যায়াম, মগজের ব্যায়াম। তা'ছাড়া এ যে একটা সাধনা! গানের সাধনা ঈশ্বর সাধনার সমতুল্য।

যুক্তিটা তাঁরা অখণ্ডনীয় বলে মেনে নিতেন কি না জানা নেই, তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যেত অচলায়তনের দেয়াল ভাঙছে কিছু কিছু।

কিন্তু এসব তো অনেককালের কথা।

রাজশাহী থেকে ছুটিতে আসা, এবং পড়া শেষ করে আসার কাল। তারপর কতগুলো কাল গেল, সংসারের কত চেহারা বদল হলো। চন্দ্রভূষণ উত্তরবঙ্গের একটা কলেজে অধ্যাপনা করতে চলে গেল, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেল, ভাইরা বড় হলো, চকমিলোনো বাড়ির উঠোনে পাঁচিল পড়লো, কাকা জেঠারা সেই পাঁচিলের অন্তরালে অন্তর্হিত হলেন।

কিছু পরে মা বাপ অন্তর্হিত হলেন ইহলোক-পরলোকের প্রাচীরের অন্তরালে। ভয়ানক মর্মবেদনা নিয়ে গেলেন, চন্দ্রভূষণ বিয়ে করলো না বলে। অথচ তার আশা একেবারে ত্যাগ করে মেজ সেজর বিয়েতেও উৎসাহী হতে পারেননি। চার চারটে ছেলেকে বেওয়ারিস রেখে মরা দুঃখজনক তাতে আর সন্দেহ কি।

মা বাপের সে দুঃখ অনুভব করেনি কি তাঁদের বড় ছেলে? হয়তো করেছে। তবু বিয়ে করতে নারাজ থেকেছে বহু অনুনয় মিনতি ঠেলে।

'বিয়ে করব না' হুজুগ তো সে আমলে সব ছেলেই তুলতো একবার করে, আবার শেষ পর্যন্ত টোপর মাথায় চড়িয়ে মাকু হাতে নিয়ে 'ভ্যা'ও করতো। এক আধটা মাত্র থেকে যেত অনড় অচলদের দলে। চন্দ্রভূষণ পড়ে রইলো সেই দলে।

মা থাকতেই চন্দ্রভূষণ তার সেই কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলো। বাপ তখন সবে মারা গেছেন। বললো, 'ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছি।'

সুষমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'ঝগড়া করবার ছেলে তুমি নও বাবা, তা' আমি জানি। কিন্তু আমায় আগলাতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসলে, সংসার চলবে কিসে?'

চন্দ্রভূষণ হেসে উঠে বললো, 'এই সেরেছে! তোমাকে আগলাতে এলাম একথা আবার কে বললো? ঝগডা, স্রেফ ঝগড়া! ঠিক করেছি আর চাকরি নয়, ব্যবসা করবো এবার।'

'ব্যবসা করবি?'

মা হতাশ নিঃশ্বাস ফেললেন, 'তুই করবি ব্যবসা?'

'কেন মা, আমি কি তোমার এতই অধম সন্তান যে অতবড় একটা নিঃশ্বাস ফেললে? জানো না বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ!'

মা আরো হতাশ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'লক্ষ্মীর আশা আর করি না! যে পাথুরে প্রতিজ্ঞা তোমার। স্ত্রীভাগ্যে ধন বুঝলি? এমন বাউণ্ডুলে হয়ে বেডালে মা লক্ষ্মী কার আঁচলে ধরা দেবেন?'

চন্দ্রভূষণ আবার হেসেছে, 'মা লক্ষ্মী কেবল আঁচলেই ধরা দেন, পকেটে ধরা দেন না, এমন ভুল ধারণা কেন বল তো? অনেক 'বাউণ্ডুলে'র নজির দেখাতে পারি তোমায়, কিন্তু সে সব থাক। আমিই দেখিয়ে দেব।'

হয়তো মায়ের বিষণ্ণতা দূর করতেই এত উৎসাহের অবতারণা!

হযতো সুষমার কথাই সত্যি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগডাটা বানানো গল্প। হয়তো মাকে আগলাতেই চলে আসা তার। চলে আসা সংসারের অভিভাবকত্ব নিতে।

মার দুঃখ ঘোচাতে বাড়িতে বৌ আনা দরকার, মেজ সেজর বিয়ে দিয়ে ফেলা হোক, এসব সে ভেবেছে দূরে বসে। তবু বাপ বেঁচে থাকতে সে ভাবনাটা ছিল লঘু মেঘের মত, ক্ষণিক ছায়া ফেলেছে, ভেসে চলে গেছে।

এখন অন্য দায়িত্ব অনুভব করেই হয়তো চলে আসা।

হয়তো ভেবে দেখে স্থির করা বাইরে থেকে সামান্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা অমানবিকতা। এখনো সুষমার দায়িত্বের উপর তিন ছেলে, যাদের মধ্যে একজন এখনো মানুষ হয়ে ওঠেনি, আর দুজনও খুব একটা কৃতী হয়নি। কিছু করছে এই পর্যন্ত।

কলকাতায় কি অধ্যাপনার সুযোগ জুটতো না চন্দ্রভূষণের? পরীক্ষার রেজাল্ট যার অত ভাল ছিল। কিন্তু সে সুযোগ নেয়নি চন্দ্রভূষণ, চলে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গের একটা মাঝারি কলেজে। সেখানের দক্ষিণা আর কত?

বিয়ে কেন করলো না, কেরিয়ার কেন গড়লো না, এ নিয়ে আর ভাবেননি চন্দ্রভূষণের বাবা। বলেছিলেন, 'কিছু না, খেয়াল! আগাগোড়া দেখছো না খামখেয়ালের রাজা! কিচ্ছু করবে না ও ছেলে, স্রেফ্ সব দায়িত্ব এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দেবে, এই তোমায় বলে রাখছি। পরের ঘরে মানুষ হওয়া ছেলে পরই হয়, বুঝেছ?'

কিন্তু বাপের ভবিষ্যৎবাণী সফল করেনি চন্দ্রভূষণ। দায়িত্বে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দেয়নি, সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করে চলেছে তদবধি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসে যে আপ্রাণ চেষ্টায় একটা কারখানা খুলে বসলো, সে তো শুধু ওই বহনটা করবে বলে!

তাই কি অধ্যাপকের উপযুক্ত নির্বাচন? খুলে বসলো একটা ফার্নিচারের কারখানা। না, নিজের দোকান নেই, শো-রুম নেই, শুধু অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ। ভাল কাঠ, ভাল মিস্ত্রী, ভাল তদারক, ভাল কাজ! বড় বড় ফার্নিচারের দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে যায়, এবং বেশ তাড়াতাড়িই প্রমাণিত হয়, বাণিজ্যে *বসতে লক্ষ্মীঃ!*

কিন্তু মাকে কি সেই লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা দেখাতে পেরেছিল চন্দ্রভূষণ?

পারেনি!

ব্যবসার নিতান্ত শৈশবদশায় সুষমাসুন্দরী দেহরক্ষা করলেন। তখন সবে মেজ ছেলের বিয়ে হয়েছে, সেজ ছোট বাকি।

তারপর ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, আরও দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, শাবকের আবির্ভাবও ঘটেছে। মোটকথা, এখন একটি ভরন্ত সংসার। সংসারের কর্তা যে কেবলমাত্র গৃহকর্তা, কারও ভর্তা নয়, তার জন্যে কোনো শূন্যতা নেই। বিপত্নীক তো নয়, চিরকুমার!

যদিও ইদানীং ওই 'কুমার' কথাটা শুনতে পেলে হেসে গড়িয়ে পড়ে চন্দ্রভূষণের ভাদ্রবৌরা।

যাই হোক, এ সংসারের বর্তমান চেহারা এই—তিনটি দম্পতি, তাদের শাবককুল, এবং সারা সংসারের রসদদার ব্যাচিলার চন্দ্রভূষণ।

হ্যাঁ, রসদের ভারটা সম্পূর্ণ চন্দ্রভূষণের। ভাইদের কাছ থেকে মাথাপিছু ট্যাক্স আদায় করে সংসার পরিচালনা করাকে নিতান্ত নির্লজ্জতা মনে করেন চন্দ্রভূষণ।

হিতৈষী জনেরা অবশ্য কানে মন্তর দিতে আসে। যেমন বোনেরা, ভগ্নীপতিরা। চন্দ্রভূষণ বলেন 'চাঁদা তুলে সংসার করতে পারবো না। যতক্ষণ চালাতে পারবো চালিয়ে যাব, যখন না পারবো, ওরা ভার নেবে।'

হিতৈষীরা বলেছে, 'ব্যাচিলারদের সংসারজ্ঞান যে কম হয়, আর একবার সেটা প্রমাণ করলে তুমি! তুমি যখন পারবে না, তখন ওরা চালাবে? ওই আনন্দেই থাকো!'

'তা যেদিক থেকেই হোক আনন্দটা পেলেই হলো। ওটার জন্যেই তো সব!'

'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তো তুমি কর দেখতে পাই, সংসারের কাজগুলোও তো ওরা করতে পারে?'

'বাঃ ওদের সময় কোথা? ওদের নটায় ভাত খেয়ে অফিসে ছুটতে হয়—'

'তোমার কাজ কাজ নয়? যাতে টাকা আসছে সংসারে?'

'তবু পরের চাকরি নয়, স্বাধীন ব্যবসা।'

'তিনজনেই পরের চাকরিতে ঢুকলো কেন? তোমার সাহায্যে লাগলেও পারতো কেউ?'

'ওদের ভাল লাগে না। বলে কাজটা সম্ভ্রান্ত নয়।'

'অসম্ভ্রান্ত কাজের আয় থেকে তো দিব্যি—'

'আঃ ওসব কথা থাক্ না।'

বাধা দেন চন্দ্রভূষণ। বলেন, 'ওদের কাজ থেকেই কি ঘরে টাকা আসে না?'

'আসবে না কেন?' হিতৈষী বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'ওদের ঘরে আসে!'

চন্দ্রভূষণ এবার গম্ভীর হন। বলেন, 'ওদের ঘরটা কি আমার ঘর নয়?'

'হুঁ, কথাটা উচ্চাঙ্গের, কানে শুনতে ভালই লাগলো, কিন্তু ভাবছি তোমার এই উদারনীতির মর্ম্ কে বুঝবে?'

'অন্ততঃ আমি বুঝবো!'

'বুঝবে ভাল কথা', কিন্তু ভবিষ্যৎ?

'ভবিষ্যৎ?'

চন্দ্রভূষণ হেসে উঠেছেন, 'ভবিষ্যৎ কি কেউ ছক কেটে সাজিয়ে রাখতে পারে? কত পাশা উলটোয়, কত ঘুঁটি কাটা যায়!'

বলা বাহুল্য, হিতৈষীরা বিরক্ত হয়ে বিমুখ হয়েছে।

চন্দ্রভূষণ হেসেছেন।

চন্দ্রভূষণ তাঁর দরাজ গলা, দরাজ মেজাজ, আর দরাজ হৃদয় নিয়ে আপন পরিমণ্ডলে বাস করছেন। ভাইপো ভাইঝি, ভাগ্নে ভাগ্নী, এদের নিয়েই সুখে মশগুল, এদের বায়না মেটাতেই তৎপর।

তারাও জানে, মা বাপ কিছু না, চন্দ্রভূষণই তাদের আসল আশ্রয়। জানে, চন্দ্রভূষণ যতক্ষণ উপস্থিত ততক্ষণ তাদের কোনো ভয় নেই। আর যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণই তো ওরা তাঁর দেহলগ্ন!

চন্দ্রভূষণের ব্যবসা এখন অনেকটা যেন নিজের চাকাতেই চলছে, গড়গড়িয়ে চলছে। চন্দ্রভূষণ ধীরে সুস্থে বেলার দিকে যান, ঘণ্টা দুই তিন থাকেন, হিসেবপত্র দেখেন, অর্ডার নেন, মাল ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করেন, তারপর চলে যান 'সেখানে'।

'সেখান' শব্দটাই ব্যবহার করে এরা। আর কি বলবে? ফিরে এসে নেহাত যৎসামান্যই আহার করেন চন্দ্রভূষণ। বুঝতে অসুবিধে হয় না, খাওয়াটা সেখানেই সারা হয়ে গেছে। নেহাত বাড়িতে ভাইদের সঙ্গে খেতে বসার ঠাট বজায় রাখতেই—

ভাইরা যে খাওয়াটা তুলে রেখে বসে থাকে। বৌরা ব্যস্ত করলেও বলে, 'দাদা আসুন না।'

মেজবৌ মুখের জন্য বিখ্যাত, সে ঝংকার তোলে। কিন্তু সেজ ছোটই কি কম যায়? এ যুগে আবার কে কিসে কম যাচ্ছে? বিশেষ করে কথায়?

তবে মেজবৌ রেগে রেগে তেতো গলায় বলে, সেজ ছোট তা নয়, তারা যা বলে হেসে হেসে।

বলে, 'দাদা আসুন বলে তো রাত দশটা অবধি বসে থাকবে? দাদা এসে খাবেন তো কত। 'সেখান' থেকেই তো আসল খাওয়া সেরে আসেন, এখানে কেবল খাওয়ার অভিনয়!'

'সেখান' শব্দটাই চলিত হয়ে গেছে। ওটা নিয়েই বিরক্তি, ওটা নিয়েই ব্যাখ্যানা। সবদিক দিয়ে ভাল আর সুবিধের একটা লোকের এত বড় একটা গর্হিত দিক থাকবে, এটা কি কম অসহ্য?

তাই ওরা বলে, 'বলে গেলেই পারেন বাড়িতে খাব না! তা'হলে আর সবাই মিলে ঝুলে থাকি না।'

বাস্তবিকই হয়তো সেটাই সুব্যবস্থা হতো। কিন্তু চন্দ্রভূষণ তা' বলেন না। রাত্রের ওই একত্রে খাওয়াব পর চার ভাইয়ে বসে গল্পটাও যে প্রায় পারিবারিক ঐতিহ্যের সামিল।

সেই যখন তরুণ চন্দ্রভূষণ ছুটিতে আসতো, তখন দাদার গল্পের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো ছোটরা।

মাও থাকতেন।

ছুটে ছুটে একবার এসে বসতেন।

কিন্তু অবকাশ কোথায় তখন তাঁর?

পরে—

মা'র জীবনে কেমন করে না জানি এলো অনেক অবসর! আশ্চর্য, সংসারেব কাজগুলো তো সবই রইলো! শুধু ভাত রাঁধার সময় একটা মানুষের ভাগের চালটা কম বান্না হবে, রুটি গড়ার সময় একটা মানুষের রুটি দুখানা কম হবে। আর কি? আর কি কাজ ছিল শশীভূষণের জন্যে? দৃশ্যতঃ কিছুই না।

কিন্তু অদৃশ্যলোকে কোথায় ছিল কাজ, কে জানে! বিধবা সুষমাকে দেখে মনে হতে লাগলো দিন বুঝি আর কাটতে চাইছে না তাঁর অফুরন্ত অবসরের ভারে।

চন্দ্রভূষণও তখন আর দূরের ছেলে নয়, ঘরের ছেলে, তখন মায়ের মনের বিষণ্ণতা দূর করতে যত গল্প ফাঁদতো রাত্রে খাবার সময়।

মা মারা গেলেও প্রথাটা রয়ে গেল।

নইলে সব ভাইরা একত্র হবে কখন?

আর তখনো তো সেজ ছোটর বিয়ে হয়নি। সিন্ধু আর বিন্দু আপন মেরুদণ্ডে স্থির আছে। ইন্দুভূষণের অবশ্য মুশকিলের অবস্থা ঘটেছিল, এদিকে যত রাত বাড়তো, বৌয়ের তত মেজাজ চড়তো। তবু ওদিকের ভয়ের থেকে এদিকের চক্ষুলজ্জাটা ছিল প্রবল।

তা' আজও সেটা কিছু আছে বৈকি।

সেটাই আছে শুধু।

চক্ষুলজ্জাতেই ভাইরা বলে, 'দাদা আসুন না!'

বলে, 'তাড়া কি? দশটা তো বাজেনি এখনো?'

বৌরা এ ইচ্ছে প্রকাশ করেছে—খেয়ে নিয়ে দাদার জন্যে বসে থাকা হোক, কিন্তু সেটার যেন তেমন সায় পায়নি। ভাইরা ভেবেছে ওতে দাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। দাদাকে লজ্জায় ফেলা হবে।

এখন যে দাদা এসেই হৈ হৈ করে বলেন, 'কি? সব আছিস তো না খেয়ে? তোরা সারাদিন খাটিস খুটিস, খেয়ে নিলে হয়!....আচ্ছা, জলদি জলদি—'

এরা তো তখন বলতে পারে, 'না না, খিদেই পায়নি এখনো। সন্ধ্যেবেলা এসে চা-টা খাওয়া হয় কতকগুলো—'

খেয়ে দেয়ে বসে থাকলে বলতে পারবে সেটা।

লজ্জা উভয় পক্ষে!

ছোটবৌ উদিতা একটু বেশী প্র্যাকটিক্যাল।

উদিতা বলে, 'এই অর্থহীন সেন্টিমেন্টের কী মূল্য বুঝি না! নাওয়া, খাওয়া, ঘুম, মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। যার যখন সময় হবে, সুবিধে হবে, প্রয়োজন হবে, সে তখন সেরে নেবে! তা' নয় একজনের জন্যে বাড়িসুদ্ধ সবাই ঝুলে বসে থাকবে। মানে নেই কোনো!'

উদিতার বর সিন্ধুভূষণ বলে, 'তা জগতে তো কতই মানেহীন কাজ ঘটছে। ধর, আমার সঙ্গে তোমাকে জুড়ে দেওয়া, এটাই কি বিধাতার একটা মানেপূর্ণ কাজ হয়েছে?'

উদিতা রেগে গুম হয়ে যায়।

সেজবৌ সুনন্দা বলে, 'রাত করে খেয়ে খেয়ে অম্বলের অসুখ ধরে গেল!'

'তুমি খেয়ে নিলে পারো।'

বিন্দুভূষণ বলে।

সুনন্দা ভ্রূভঙ্গী করে উঠে যায়।

মেজ গজরায় বসে বসে। একশোবার ঘড়ি দেখে এবং প্রায়শঃই ঘুম পেয়েছে বলে শুয়ে পড়ে।

তা' সত্যিই তো, ঘুম পায় না মানুষের?

খিদে পায় না?

একটা আধবুড়ো আইবুড়ো ভাসুরকে নিয়ে নিত্য এত অসুবিধা পোহাবার দরকার?

সংসারের রসদ যোগান বলে?

দরকার নেই যোগাবার।

যে যেমন পারবে নিজ নিজ সংসার চালাবে! তাতে স্বাধীনতা, তাতে সুখ, তাতে স্বাচ্ছন্দ্য!

হ্যাঁ, গুরুজন বলে মানা উচিত।

একশোবার উচিত।

কিন্তু গুরুজন যদি চরিত্রহীন হয়?

থাকবে শ্রদ্ধা, ভক্তি, উচিতবোধ?

যখন এসব ছিল না, এ রোগ ধরেনি, তখন কি বৌরা করেনি মান্য ভক্তি?

ভাইদের অবশ্য এখনো তেমন করে টলানো যাচ্ছে না, বলছে কি, 'থাক্ না—ও নিয়ে আলোচনায়

দরকার কি? বাড়িতেও তো অশোভন কিছু করছেন না! ব্যাচিলার মানুষের একটু আধটু দুর্বলতা আসাই স্বাভাবিক।'

কিন্তু মেজবৌ শেফালীর বিদ্রোহটাই বেশী। ও ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'বরং উলটো! না থাকাই স্বাভাবিক। স্বেচ্ছায় যখন এ জীবন বেছে নিয়েছেন! এমন তো নয় যে, সংসারের জ্বালায় বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি গো! তাই অতৃপ্ত ক্ষুধার বশবর্তী হয়ে—'

মেজ ইন্দুভূষণ গম্ভীর হয়ে বলেছে, 'শেফালী, দাদা তোমার ভাসুর—'

'ভাসুর, সে কথা অস্বীকার করছি না, তবু হক্‌কথা আমি বলবই।'

'আমার শ্রবণশক্তির সীমানাটা বাদ দিয়ে বললেই ভাল হয়—'

'ভাল মন্দ আমি বুঝি না। জানি যা সত্য, তা' সত্য।' সত্যভাষিণী শেফালী সত্যের মহিমায় আরো উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, 'শ্রদ্ধার যোগ্য হলে তবেই শ্রদ্ধা!'

সেজবৌ সুনন্দাও তার স্বামীর কাছে একথা তোলে। তবে রেগে নয়, হেসে। বলে—

'নিত্য যদি ভাসুরের অভিসার যাত্রা দেখতে হয়, তা'হলে কি করে তাঁর মানসম্মান রেখে চলা যায় বল তো?'

সেজ বিন্দুভূষণ সর্বদাই ঈষৎ কৌতুকের গলায় কথা বলে, মুখের হাসিতেও সেই প্যাটার্ন। বলে, 'দেখতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? না দেখলেই পারো।'

'আহা' চোখের দেখাটাই যেন সব! মনে মনে দেখছি না? আমার মা দাদা সবাই যখন ওই কথা তোলেন, মাথা কাটা যায়।'

'তাঁদের তোলার দরকার কি?'

'দরকার নেই? বাঃ। কুটুম্বের সমালোচনা কে না করে?'

'করে বুঝি? তবে তুমি তো কুটুম্ব নয়, তোমার এসব কথা থেকে বিরত থাকাই ভাল। যতই হোক গুরুজন!'

সুনন্দা হেসে গড়িয়ে বলে, 'গুরুজনের পোস্টটা আর রাখতে পারছেন কই?'

ছোটবৌ উদিতাও বলে, 'অবিশ্বাস করতে পারলে বেঁচে যেতাম, কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারছি কই? শুনলে তো সেদিন তোমাদের ছোট জামাইটার কথা?'

ছোট জামাইবাবু বলেছে বটে সেদিন, 'সেই যে কথা আছে না, 'সাধলে জামাই কাঁঠাল খায় না, শেষে আবার খোসা পায় না।' আমাদের বড়দাটির হয়েছে তাই! আরে বাবা, জগতের সার তত্ত্ব হচ্ছে নারীতত্ত্ব! জোর করে তাকে অস্বীকার করলেই হলো? হয় না। পরিণামে এই হয়। পঞ্চাশ বছরে লোক হাসায়! আরে বাবা, প্রকৃতি বড় কড়া জমিদার, সে প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েও বাকি খাজনা আদায় করে।

ছোট জামাইবাবুই বেশী বলে।

রহস্যের হদিসও সেই প্রথম দিয়েছিল। নইলে এরা কি স্বপ্নেও সন্দেহ করতো? করতে পারতো? এরা তো ভাবতো, ব্যবসার জন্যে বেচারা দাদাকে আজকাল বেশী রাত অবধি খাটতে হয়।

ছোট জামাইবাবুই প্রথম খবর আনলো, 'রোজ সন্ধ্যেয় বড়দা বেলেঘাটায় যায় কেন বল দিকি?'

'বেলেঘাটা?'

'সে কি? বেলেঘাটার ধারেকাছেও তো দাদার যাবার দরকার পড়ার কথা নয়। তবে বোধহয় দৈবাৎ কোনোদিন মিস্ত্রীটিস্ত্রীর সন্ধানে—'

'উঁহুঁ, ছোট জামাইবাবু রহস্যের হাসি হেসেছে 'দৈবাৎ নয়, প্রতিদিন। মিস্ত্রী নয়, বোধকরি ওর সঙ্গে ছন্দ মেলানো আর কিছুর খোঁজে—'

'তার মানে?'

'আছে মানে।'

'কী ব্যাপার তাই শুনি?'

'ব্যাপার ঘোরতর! নারীঘটিত ব্যাপার!'

প্রথমটা বিশ্বাস করেনি এরা, ওকেই অবজ্ঞা করেছিল, কিন্তু ও অনেক চেষ্টায় নিজের প্রতিষ্ঠায় এসেছে। এমন প্রমাণপত্র যোগাড় করেছে, যাতে অবিশ্বাসের আর পথ থাকেনি।

অনেকদিন বেকার ছিল ছোট জামাইবাবু, চন্দ্রভূষণ মাসিক সাহায্য করে ওকে অসুবিধের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তাই হয়তো ঋণশোধের এই চেষ্টা কৃতজ্ঞ লোকটার!

দাদার এই বুড়োবয়সের অধঃপতন ভাইদের মাথা হেঁট করছে বৈকি। তবু দাদাকে মুখোমুখি কিছু বলতে যেন বাধে!

আর মুখোমুখি দাঁড়ালেই কি বিশ্বাস হয় লোকটা চরিত্র হারিয়েছে?

সেই ফরসা রং, সেই দীপ্ত দৃপ্ত চেহারা, সেই দীর্ঘ ঋজু ভঙ্গী, আর সেই উদাত্ত দরাজ মেজাজ! তারতো এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি, তবে কোন্ ফাঁকে সাপে দংশে নীল করছে তাঁকে?

ঘুম থেকে ওঠেন চন্দ্রভূষণ সকলের আগে। স্নান করে নেন তখনি, উঠে যান তিনতলায় ঠাকুরঘরে, যেখানে সুষমার ফেলে যাওয়া ঠাকুরগুলি আছেন। গোপাল, গুরুদেব, রাধাকৃষ্ণ।

সুষমার বড় যত্নের জিনিস ছিল।

চন্দ্রভূষণ কি সেই যত্নের প্রতিমাগুলিকে পূজো করতে যান? নাকি মাকে? হয়তো একটা থেকেই দুটো হয়। হয়তো মায়ের এই আদরের আর ভক্তির বিগ্রহগুলির পূজা করলেই মাকে পূজা করা হলো ভাবেন চন্দ্রভূষণ।

তা যাই ভাবুন, তিনি যখন পূজো করে নামেন, পরনে থাকে মায়ের দরুনই একখানা গরদের থান ধুতি আর চাদর, দেবতার মত দেখতে লাগে তাঁকে। অন্ততঃ ওঁর ছোট ভাইদের চোখে লাগে। তখন মনে হয় না, 'বেলেঘাটা' নামক একটা জায়গা আছে, এবং সেখানে কোনো এক কুশ্রী রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছেন দাদা।

চন্দ্রভূষণের পূজো করে নামার সময় ওরা ঘুম থেকে ওঠে কি ওঠে না। চন্দ্রভূষণই হইচই করে জাগান, চায়ের টেবিলে এসে বসেন, বৌমাদের নাম করে করে ডাকেন, সকালের খাদ্যতালিকার খোঁজ নেন। অপরাধীর ছাপ কোথায় সে মুখে?

ভাইরা ভাবে—আশ্চর্য!

বৌরা ভাবে—পাকা আসামী!

ভাবে, বেলেঘাটায় সেইখানে গিয়ে একবার হাতে নাতে ধরতে পারা যেত!

এ বাড়িতে চায়ের টেবিলের প্রবর্তক চন্দ্রভূষণই।

আগে চন্দ্রভূষণের মায়ের আমলে রান্নাঘরে মেজেয় বসে চা বানানো হতো। কেউ সেখানে গিয়েই হয়তো মাটিতেও চাপটি খেয়ে, কেউ বা চৌকাঠে উবু হয়ে বসে চা পর্ব সারতো। কারো এক পেয়ালা হয়তো তার শোবার ঘরেই পৌঁছে দেওয়া হতো।

মা রান্নায় ব্যস্ত থাকলে বোনেরা চায়ের সঙ্গে এগিয়ে দিত বড় বড় কাঁসার রেকাবিতে হয়তো লুচি আলুচচ্চড়ি, হয়তো পাঁপরভাজা হালুয়া।

চন্দ্রভূষণ শৌখিন মানুষ, চাকে চায়ের টেবিলে তুলেছেন, চায়ের মর্যাদা রেখে টা'য়ের আয়োজন করেছেন।

আরো অনেক কিছুই করেছেন চন্দ্রভূষণ। পৈত্রিক বাড়িকে রং করে বদল করে ঢেলে সাজিয়েছেন। করেছেন ঘরে ঘরে ভাল ভাল ফার্নিচার। কিনেছেন ফ্রিজিডেয়ার, মোটর, রেখেছেন চাকর ঠাকুর।

অন্য সব ব্যাচিলারদের মতই চন্দ্রভূষণও ঘোরতর সংসারী। কোথায় কি পাওয়া যায়, কখন কি পাওয়া যাবে না, কিসের কখন ঘাটতি ঘটতে পারে, এসব তথ্য চন্দ্রভূষণেরই চিন্তার জগতে আশ্রয় পায়, কদাচ অন্য ভাইদের নয়।

বৌদের অতএব সংসার পরিচালনার জন্যে কোনোদিন বেগ পেতে হয় না।

তবু অসহ্য লাগতে শুরু করেছে তাদের।

কারণ?

ওরা বলে, কারণ গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে না পারা! ভাসুর যখন পূজো করে নেমে মার গোপালের প্রসাদ খাও বলে সন্দেশের রেকাবি এগিয়ে দেন, ওদের নাকি বেলেঘাটার কথা মনে পড়ে যায়।

ওদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

অন্য কারণও কি বিদ্যমান নেই?

হয়তো আছে, হয়তো সত্যকার কারণ স্বাধীনতার সুখের অভাব।

তা' সে অভাব আছে।

জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, চন্দ্রভূষণ সে অভাব ঘটান!

হয়তো বরেদের ছুটির দিনে বৌরা প্রোগ্রাম ভাঁজছে নিজ নিজ পিত্রালযের দিকে ঢল নামানো যায় কিনা, চন্দ্রভূষণ চায়ের টেবিলে দুম্ করে বলে বসলেন, 'আজ একটা ভোজ লাগানো যাক—কী বল মেজবৌমা? মেজবৌমাই সুষমার আমলের বৌ, সংসারের অনেক চেহারা দেখেছে সে, কাজেই বাড়ির গৃহিণীর মর্যাদাটা তাকেই দিয়ে থাকেন চন্দ্রভূষণ, পরামর্শের কাজেও তাকেই ডাকেন। আর দাবি তো তারই। বৌ হিসেবে সেই তো বড়! •

তবে প্রশ্ন করার পর কি আর উত্তরের ধার ধারেন চন্দ্রভূষণ? তৎক্ষণাৎ গায়ে জামা চড়িয়ে উঠে পড়েন। হুকুম হয়ে যায়, 'ছোটবৌমা, মাংসটা তুমি ছাড়া আর কেউ যেন হাত না দেয়। ও তোমাদের জগন্নাথের হাত পড়লে মাংসের বারোটা বেজে যাবে!.... সেজবৌমা, চপের মাছ আনছি তাহলে? নাকি ফ্রাইয়ের ভেটকি? ওটা তো আবার তোমার ডিপার্টমেন্ট। যা বলবে আনবো।'

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে মনিব্যাগের পেট ভরাট করে বেরিয়ে পড়া!

নিশ্চিত জানা, প্রথমেই তিন বোনকে স-স্বামী স-সন্তান নেমন্তন্ন করে আসবেন, তাবপর পর্বতপ্রমাণ বাজার করে আনবেন। অর্থাৎ বেচারা বৌদের আশার কুসুমকলির উপর বসিয়ে দেবেন খাঁড়ার কোপ।

ননদরা আসা মানেই তো সারাটাদিনের মত নিশ্চিন্দি!

নিত্যি ভাল লাগে?

. ভাসুর না হয় পয়সা খরচ করেন, কিন্তু গতর খরচটি? সে বস্তু তো আব পয়সা দিয়ে মেলেনা? নিজের যার স্ত্রী নেই, তার আবার নিত্যি এত শখ করা কেন?

স্ত্রী নেই বলেই যে শখ, একা স্ত্রীতেই যে জীবনেব সব শখ মেটে, এটা খেয়াল করে না ওরা।

তাই আড়ালে বলে, 'যান না বাবু, বোন ভগ্নীপতিকে ওঁর সেই বেলেঘাটার সংসারে নেমন্তন্ন করুনগে যান না!'

বলে অবশ্য জায়েদের মধ্যে। আর বেশী সাহস হয় না।

বৌদের পিতৃকুলকেও বঞ্চিত করেন না চন্দ্রভূষণ, ডাকেন মাঝে মাঝে তাঁদেরও। সেদিন হয়তো পরিশ্রমটা ওদের গায়ে লাগে কম কিন্তু সেদিনই আবার মন বিগড়োয় বেশী।

নিজের নিজের ছোট ছোট বোনেদের কি বৌদিদের স্বাধীনতা দেখলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারা ইচ্ছে মত খরচ করতে পায় ছুটির দিনগুলো।

তা'ছাড়া ওঁরা নেমন্তন্ন খেতে এসে আলোচনা করে যান, 'বাড়ি তো তোমাদের তিনপুরুষের, যতই ওপরে রং বুলোও ভেতরে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। আর কী সুখেই বা আছ? পুরনোকালের প্যাটার্ন, 'অ্যাটাচড্ বাথ' নেই, হালকা ব্যালকনি নেই, ডাইনিং স্পেস নেই, বিরাট বিরাট কতকগুলো ঘরই আছে মাত্র। খেতে যাবে সেই বান্নাঘরের পাশে খাবারঘরে! অথচ তোমাদের এই বাড়িটার ইঁট কাঠ বাদ দিয়েও শুধু জমিটার দামই লাখ টাকার বেশী!'

তা খুব অত্যুক্তিও করেন না তাঁরা।

সত্যিই এ অঞ্চলে মাটির দর এখন সোনার দরের বেশী! আর অনেকটাই মাটি আছে সাবেকী বাড়িতে।

ওইটাই মনে পড়িয়ে দেওয়া।

ওইটুকুই ইশারা!

বাড়িটা বেচে ফেললে, ফেলে ছড়ে দুলাখ! যে যার ভাগ নিয়ে সরে পড়তে পারলে বেহালায় কি গড়িয়ায়, দমদমে কি পাতিপুকুরে ছোট্ট একটু সুন্দর ছবির মত বাড়ি করা যায়।

সেই ছবির ছবি এঁকে দিয়ে যান ওঁরা চকিতের জন্যে।

কী সুন্দর সেই ছবি!

এই মোটা মোটা থামওলা দালান, উঠোনের উপর বুকচাপা এক বিরাট পাঁচিল, কাঠের কড়ি বরগা দেওয়া স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠা সিলিং, তিনতলা একতলা করে কাজ করা, সবটাই তো কষ্টের!

অথচ এ কষ্টের লাঘব করা যায়।

তা'ছাড়া—

স্বাধীনতা যে একা বড় ভাসুরই খর্ব করছেন তাও তো নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের করছে। উদিতার রুচি পছন্দর সঙ্গে সুনন্দার মেলে না, সুনন্দার সঙ্গে মেলে না শেফালীর, অথচ সেই অমিল নিয়েই মিলের অভিনয় করে চলতে হচ্ছে।

সিনেমা দেখতে, শুধু নিজের বরটির সঙ্গে ইভনিং শোতে যাওয়ার যে সুখ, তা আর পায় না কেউ। হয় একজনের বর তিনজনকে, হয়তো বাড়তি দু'একটা বোনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে, রীতিমত একটি বাহিনীর মত, নয়তো তিন জায়ে গলদঘর্ম হয়ে ম্যাটিনি শোতে যাও।

সে যেন ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ, তার মধ্যে শৌখিন খাবারের স্বাদ কোথা?

ছেলে মেয়ে, জামা জুতো, এটা সেটা টুকিটাকি, সব নিয়েই তো অস্বস্তি! অনেক জোড়া চোখের সামনে দিয়ে ব্যবহার করতে হবে সেগুলোকে। কেউ দাম জিজ্ঞেস করে বলবে, 'উঃ এতো!' কেউ কটাক্ষের মধ্যেই উচ্চারণ করবে, 'উঁঃ এতো!'

সে জিনিস ব্যবহারে সুখ আছে?

কত সময় বরের দেওয়া উপহারকে লুকিয়ে হাত ঘুরিয়ে এনে বলতে হয়, 'বাবা দিয়েছেন।'

অথচ এই সব কিছু নিয়ে চোখের আওতার বাইরে চলে যাওয়া যায়।

কিছুই না, শুধু একটু সাহসের ওয়াস্তা!

শুধু একবার বলে ফেলা, 'দাদা, এতবড় এক পুরোনা বাড়ি রেখে কি লাভ? বেচে ফেলা হোক।'

তারপর দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

কিন্তু সেই সাহসটুকু সঞ্চয় করতে পারছে না ইন্দু, সিন্ধু, বিন্দু। বলে কিনা 'দাদার সামনে ওই কথা উচ্চারণ করবো? অসম্ভব!'

আবার এদিকে বৌরা যদি বলছে, 'বেশ, আমরাই বলছি', হাঁ হাঁ করে বারণ করে।

বলে, 'দাদার সামনে পারবে উচ্চারণ করতে?'

পুরুষ এত কাপুরুষ?

যত দুঃসাহস একজনের!

তিনি বড় বড় বিবাহিত ভাইদের স্বচ্ছন্দে বলেন, 'তুই একটা গাধা!'

বলেন, 'তোর মাথাটায় কী আছে বল তো? কয়লার গুঁড়ো?'

বলেন, 'বুড়োবয়সে কানমলা খাবার সাধ হয়েছে দেখছি।'

অথচ?

অথচ সেই মুখ নিয়েই তক্ষুণি ছুটবেন 'সেখানে।'

এর থেকে দুঃসাহস আর কি হতে পারে?

ভাদ্রবৌরা ঠোঁট উলটে বলে, 'এসব কেলেঙ্কারি করার থেকে বিয়ে করা ঢের ভাল। এখনো করলে করতে পারেন, চল্লিশ বছরের আইবুড়ো মেয়েরও অভাব নেই।'

বলে, 'বয়েসকালে বিয়ে না করে—'

কিন্তু সত্যি, বিয়ে কেন করেননি চন্দ্রভূষণ?

এত মাতৃভক্ত ছেলে, অথচ মায়ের কথা রাখেননি, দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে, আশ্চর্য!

কারণ কি?

সাধু নয়, বৈরাগী নয়, দেশোদ্ধারী নয়, শৌখিন ফুর্তিবাজ ভোগী মানুষ, তাঁর পক্ষে এই চিরকুমারব্রত নেওয়াটা আশ্চর্য্য বৈকি!

কারণ? তা' সে কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেকটা দূর পিছিয়ে যেতে হয়।

যেতে হয় সেই দেশে, যে দেশটা এখন নাকি ভারতছাড়া হয়ে গেছে।

সেখানে উঁকি দিতে পারলে দেখতে পাওয়া যাবে, একটা বছর চোদ্দর ছেলে ভেড়ার গোয়াল থেকে পালিয়ে মামার বাগানে চরে বেড়াচ্ছে!

সঙ্গে মামার ছেলে দেবু, আর মামার শালীর একটা বছর আট নয়ের মেয়ে। খিদমদগারের পোস্টটা পেয়েছে সে। মা বাপ মরা মেয়ে মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছে, মাসীর কাছ থেকে যত আদর খায়, তার চতুর্গুণ কানমলা খায় মাসীর ছেলের কাছ থেকে।

হ্যাঁ, বড় চাকুরে বাবার একমাত্র ছেলে দেবুর মেজাজটা ছিল একটু প্রভুত্বপ্রিয়।

আর হাতের কাছেই যখন অধস্তন একজনকে পাওয়া যাচ্ছে, কেন নেবে না হাতের সুখ করে?

কিন্তু রাশিচক্র গ্রহনক্ষত্র, এগুলো ভারী মজার বস্তু। ওদের খেয়ালে কিংবা নীতিতে অঘটন ঘটনা অনায়াসে ঘটে। তাই ভেড়ার গোয়াল থেকে পালিয়ে যাওয়া 'চানু' মামার বাড়িতে গিয়েই দু'দিনে দলপতির পদটা অর্জন করে ফেললো, এবং 'শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে' মন্ত্রের অনুসরণে চম্পাকে তার মাসতুতো দাদার হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিল।

সবেমাত্র ভাই বোনেদের মধ্যে থেকে চলে গেছে, তাই হয়তো তার মনের মধ্যে মমতা রয়েছে ভরা। আর হয়তো বা তার প্রাণটাই মমতার প্রাণ।

প্রাণটা মমতার প্রাণ, কিন্তু কথাবার্তা মমতায় বিগলিত নয়। বরং উলটোই। যাকে শাসন করে তাকে যে স্বরে বলে, 'এই দেবু, খবরদার বলছি চম্পার কানে হাত দিবি না! কান দুটো ওর বেওয়ারিস নাকি?' ঠিক সেই স্বরেই যাকে রক্ষা করে, তাকে বলে, 'এই চম্পা, খবরদার বলছি দেবাটার কথা শুনবি না। তুই ওর ঝি নাকি?'

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত চম্পা অতএব তার রক্ষাকর্তারই দাসী বনে বসে তাকে। চানুদা মরতে বললে মরতে পারে সে, বাঁচতে বললে বাঁচতে পারে!

চানুদার পায়ে পায়ে ঘোরে, তার একটু কাজ করতে পেলে কৃতার্থ হয়।

দেবুরই বাড়িতে দেবুর পদমর্যাদা খাটো হতে হতে যেন শূন্যে পৌঁছচ্ছে।

দেবু ডাকে, 'এই চম্পি, একটু জল নিয়ে আয়।'

চম্পা নির্ভয়ে বলে, 'আমি এখন চানুদার মার্বেলগুলো সাবান দিয়ে ধুচ্ছি।'

দেবু বলে, 'আমার কাজটা আগে করে দিয়ে যা বলছি—'

চম্পা সতেজে বলে, 'হিংসুটের কাজ আমি করি না।'

কে বলতে পারে কেন আর চম্পার দেবুর হাঁকডাক শুনে বুক কাঁপে না!

দেবু চেঁচায়, 'জল দিলি না তো? আর-জন্মে চাতক পাখী হবি বলছি—'

চম্পা চেঁচায়, 'চানুদা বলছে, 'এ-জন্ম' 'আর-জন্ম' সব বাজে কথা! শুধু মানুষকে শাসনে রাখবার কৌশল!'

দেবু গলা আর এক কাঠি চড়ায়, 'মা, চম্পা বলছে ভগবান টগবান কিছু নেই!'

চম্পা রক্তমুখে বলে, 'মিথ্যুক মিথ্যুক! কখন আবার বললাম ওকথা? দেখ মেজমাসী, দেবুদা মিথ্যে কথা বলছে।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি?' দেবু বীরদর্পে বলে, 'নিজে বলে আবার অন্যকে দোষ দেওয়া? বলিসনি এ-জন্ম আর-জন্ম বলে কিছু নেই?'

চম্পা এহেন কূট প্রশ্নের সদুত্তর দেবার আগেই চানু হাল ধরে। বলে, 'বোকার মত কথা বলিস না দেবু! ভগবান আর কুসংস্কার এক জিনিস নয়।'

'কুসংস্কার মানে?'

'মানে? মানে হচ্ছে এই তুমি যাতে বিভোর। 'এ-জন্ম' আর-জন্ম।' এ-জন্মে জল না দিলে আসছে জন্মে চাতক পাখী হবি, এ জন্মে তেল না দিলে আসছে জন্মে তেলাপোকা হবি—'

'তেলাপোকার কথা বলেছি আমি?' দেবু প্রায় ছিটকে ওঠে, 'তেলাপোকার কথা কখন হলো?'

'হলেই হলো!' চানু অবজ্ঞাস্বরে বলে, 'আসছে জন্মটা যখন কেউই দেখতে পাবে না, যা ইচ্ছে বললেই হলো।'

'মা চানুটা আমায় ভ্যাঙাচ্ছে—'

দেবুর মাকে অগত্যাই হাতের উপন্যাসখানা মুড়তে হয়। বলেন, 'সবসময় ঝগড়া করিস কেন দেবু?'

'চানুটাই তো ঝগড়া করছে।'

'মোটেই না!' চানু জোরের সঙ্গে বলে, 'আমি শুধু বলেছি কুসংস্কার আর ভগবান এক জিনিস নয়।'

'তার মানে তুই শাস্ত্র মানিস না!'

ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে দেবু।

দেবুর মা হাসি গোপন করে বলেন, 'অ্যাঁ বলিস কি? শাস্ত্র মানে না? চানুর তো তা'হলে নরকেও ঠাঁই হবে না।'

চানু এবার মামীকেই একহাত নেয়, 'ওটাও তোমার ঠিক বলা হলো না মামী! নরক বলে কিছু নেই।'

মামী আরো চমকে বলেন, 'ওমা বলিস কি চানু, নরক বলেও কিছু নেই?'

'না।'

'সর্বনাশ! তা'হলে আমরা কোথায় যাব রে!'

চানু মামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, 'ওঃ ঠাট্টা করা হচ্ছে!'

মামীকে ভারী ভাল লাগে চানুর।

কী উজ্জ্বল, কী সুন্দর, কী হাসিখুশী!

চানুর কাকীমার মতই তো বয়েস, কিন্তু কত যেন ছোট লাগে! যেন নিজেদের সমবয়সী বন্ধুর মত মনে হয়।

প্রত্যেকটি কথা এমন হাসির সুরে বলা, এ দৃশ্য চানু তাদের কলকাতার বাড়িতে দেখেনি। নেহাত সাধারণ কথারও যেন একটা আলাদা মূল্য আছে! মামার বাড়িতে এসে এত মন বসে গেছে হয়তো ওই মামীমার জন্যেই।

মামীমার মধ্যে যেন মহিলা জাতির একটা আদর্শ খুঁজে পায় চানু। ঠিক এইরকমটি বুঝি চায় সে। অথচ ওদের বাড়ির কেউ এমন নয়।

বাড়িটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে যে কত ভাল লাগে, একথা কেনই যে বোঝে না চানুর মা, কাকীমা, জেঠিমা? মা অথচ এ বাড়িরই মেয়ে।

একথা বোঝবার বয়েস চানুর তখন হয়নি—লোকসংখ্যাই সব সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে। চানুদের বাড়ির মত যদি দিন দুবেলা তিরিশটা করে পাত পাড়াতে হতো চানুর মামীকে, এই রুচি সৌন্দর্য সুষমার কতটুকু অবশিষ্ট থাকতো?

ওটা তখনও ভেবে দেখতে জানতো না চানু, তাই ভাবতো, বাড়িটা একটু সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে—

কিন্তু পরে যখন বুঝতে শিখেছিল কথাটা, তখনও ভাবতো অন্ততঃ কথাটা সুন্দর করে বললে কী হয়? ওতে তো পয়সা খরচ হয় না! হয় না বটে, পয়সা খরচ হয় না, কিন্তু বাড়িতে ভিড় থাকলে সে রুচিও যে থাকে না, তাও জানতো না চানু। অন্য এক ধরনের হলেও, পিসি বরং সুন্দর করে কথা বলে কিছুটা। যেমন ছেলেপুলেকে ঘুম ভাঙাতে হলে বলে, 'ওহে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, দয়া করে গাত্রোত্থান করুন। আপনার খানা প্রস্তুত!' বলতো, 'কালে ভবিষ্যতে লাট হবি তোরা, এই আমার নিয্যস বিশ্বাস। এখন থেকে অভ্যেসটা রপ্ত করছিস!'

ভাজেদের ডাকতো, 'ওগো বড়লোকের গিন্নীরা, 'আজ কি আর নীচে নামা হবে না?'

মামীর মত সুন্দর কথা না হলেও শুনতে একরকম ভাল লাগে।

আর জেঠাইমা?

সক্কালবেলাই শুরু করে দেন, 'এই লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর ছেলে, এখনো ঘুম মারছো? বলি লেখাপড়া নেই?'

শুনলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। অথচ সেই তো মানুষের মুখ, সেই তো বাংলা ভাষা! আর মামীমার কথা? যেন আলাদা এক জগতের! মামীমার শাড়ি পরার ধরনটি চমৎকার, মামীমার গায়ে সর্বদা জামা, মামীমা বাইরে বেরোতে হলে চটি পায়ে দেন। এ মামীতে মুগ্ধ হবে না ওই বয়সের ছেলেটা?

তবে বোকা হাবা তো আর নয় চানু যে, সেই মুগ্ধভাবটা ব্যক্ত করবে? করে না। কথা বলে সহজ ভাবেই। তাই বললো 'ওঃ ঠাট্টা করা হচ্ছে!'

মামী যেন আকাশ থেকে পড়েন।

বলেন, 'ঠাট্টা কি রে? এতবড একটা জীবনমরণ সমস্যা, তাই নিয়ে ঠাট্টা করবো? এখন না হয় ভাগ্যিক্রমে তোর মামার এই বাগানওলা দিব্যি খাসা বাড়িটিতে রয়েছি, মরার পর কোথায় ঠাঁই হবে, ভাবতে হবে না সেকথা?'

চানু চট্ করে বলে বসে, 'তা স্বর্গ নরক যদি থাকে, তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে!'

'স্বর্গে!'

মামীমা হেসে উঠলেন, 'একেবারে স্বর্গের টিকিট রেডি!... ওগো শুনছো, মরার পর আর তোমার সঙ্গে ঘর করা হবে না আমার! তুমি তো নির্ঘাৎই নরকগামী হবে?'

সবটাই ঠাট্টা, তা বোঝে চানু।

মামাও যে বলেন, 'দেখ, আবার তুমি কুসংস্কারে নিমজ্জিতের মত কথা বলছো? জানো চানু ওসব ভালবাসে না!' সেটাও যে ঠাট্টা তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু তবু কেমন চমৎকার!

বড়রা বিনা কাজে কথা বলছে, এ দৃশ্য কবে দেখেছে চানু? কাজের কথা বলবে বডরা, আর রেগে রেগে বলবে, এটাই তো বিধি।

হঠাৎ সংকল্প করে বসতো চানু, সে যখন বড় হবে বৌয়ের সঙ্গে অমনি শুধু শুধু কথা বলবে। অমনি হেসে হেসে।

বৌ?

সে জিনিসটা সম্পর্কে অবশ্য তখন কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তবু 'বৌ' শব্দটা ছিল অনুভূতির মধ্যে, বাসনার ঘরে।

যেমন থাকে এতটুকু মেয়ের মধ্যেও 'বরে'র চেতনা।

এই তো চানুর নিজের ছ বছরের বোনটাই তো বলে, 'বড় হয়ে আমি কেমন চন্নন পরবো, মালা পরবো, গয়না পরবো। লাল কাপড় পরে বরের সঙ্গে চতুর্দোলায় চেপে চলে যাব।'

চেতনাটা প্রকৃতির দেওয়া, কল্পনার রূপটা গঠিত হয় পারিপার্শ্বিকতার উপাদানে। উৎসবের রাজা উৎসব

যে বিয়ে, রূপের মধুরতর রূপ যে বরকনের মূর্তি, আর জীবনের পরমতম পরিণতি যে বৌ নিয়ে বা বর নিয়ে ঘর করা, এটা ধরে ধরে শিক্ষা দিতে হয় না।

তাই শিশু মেয়েটিও ভাবে, 'আমার যখন বিয়ে হবে', কিশোর বালকটিও ভাবে 'আমার যখন বিয়ে হবে।'

তা' সবাই ভাবে কি না কে জানে, চানু অন্ততঃ ভাবতো।

ভাবতো 'আমার যখন বৌ হবে—'

ক্রমশঃ বুঝি সেই 'বৌ' নামক শব্দটা কল্পনার বাষ্পপুঞ্জ থেকে একটা অবয়ব নিচ্ছিল!.... একবার করে ছুটিতে কলকাতায় আসতো চানু, ভাল নাম যার চন্দ্রভূষণ, আর ছুটির শেষে ফিরে গিয়ে যেন সেই বাষ্পপুঞ্জকে একটা গড়ন নিতে দেখতো!

দেবুরা ছুটিতে এখান ওখান বেড়াতে যেত, হয়তো দার্জিলিঙে, হয়তো বা কাশীতে পুরীতে। চম্পাও অতএব যেত। আর সেই বেড়ানোর সূত্রেই বুঝি এক ডিগ্রি করে 'বড়' হয়ে যেত চম্পা।

দেবুও আর তত উৎপীড়ন করতো না তাকে অধস্তন ভেবে, হয়তো বা চম্পার ব্যক্তিত্ব, চম্পার আভিজাত্য তাকে সে সাহস থেকে নিবৃত্ত করতো। অতএব চম্পাকে পক্ষপুটে আশ্রয় দেবার কাজটা কমে যাচ্ছিল চানুর।

এখন আর দেবুকে তীব্র তিরস্কারে ধিক্কৃত করতে হয় না, 'এই দেবু, চম্পার মা নেই তা জানিস? মা বাবা ভাই বোন কেউ?' পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন।

অগত্যাই দেবুকে স্বীকার করতে হতো, নেই কেউ চম্পার।

'তবে?' চানু আরও ঘৃণা হানতো, 'এ জ্ঞান থাকতেও তুই ওকে ওইরকম উৎপাত করিস! মারিস, বকিস, চুল টানিস!'

'আর ও একেবারে ভালমানুষের রাজা!' দেবু ফেটে পড়তো, 'একটা কথা শুনতে চায় আমার?'

'ভালভাবে বললেই শুনতো। তোমার যেমন বিচ্ছিরী করে হুকুম করা! কই আমার অবাধ্য তো হয় না কখনো!'

দেবু বলে, 'তোর? হুঁঃ! তুই তো ওর গুরুদেব! তোর অবাধ্য হবে?'

'গুরুদেব হয়ে জন্মাইনি আমি ওর', বলতো চানু, 'ভাল ব্যবহার করলে বনের পশুও বশ হয় জানিস?'

'জানি না! তুই এত কথা জানলি কি করে?'

'কি করে আবার! মানুষ সব কিছু জানে কোথা থেকে? বই পড়ে।'

'তোর মতন এত বই কে পড়তে যাবে?'

চানু গম্ভীরভাবে বলতো, 'মানুষমাত্রেই পড়বে। আর পড়লেই এ জ্ঞান আসবে, যে মানুষ তোদের বাড়ি রয়েছে, দায়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তাকে এরকম কষ্ট দেওয়া কত খারাপ! ভেবে দেখ দিকি, ওর মত তোকে ওইরকমভাবে পরের বাড়ি থাকতে হচ্ছে, আর তাদের ছেলে তোকে—'

না, এসব কথা ক্রমশঃ আর বলতে হচ্ছিল না। যখন চম্পা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, তখন থেকে দেবু সমীহর দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

তা'ছাড়া জীবন তখন এগিয়ে যাচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে, স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে কলেজে ভরতি হয়েছে দুজন। চম্পাও স্কুলের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

পুজোর ছুটির পরে ফিরে সেবার প্রথম দেখলো চন্দ্রভূষণ, 'চানুদা' বলে একগাল হাসি নিয়ে ছুটে এলো না চম্পা। অথচ বোঝা যাচ্ছে আছে ভিতরে, অতএব জানতে পেরেছে।

আর না পারবেই বা কেন?

স্টেশনে স্বয়ং মামা গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে আনতে।

তাজা তরুণ চন্দ্রভূষণ এ অবহেলায় বড় বেশী আহত হলো। ভাবলো ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে বলে অহংকার হয়ে গেল নাকি চম্পির?

এই তো যাবার সময়ও কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে বলেছে, 'যাও, মায়ের বাছা মায়ের কাছে যাও।'

মামী বলেছেন, 'তাতে ঠাট্টার কি আছে? সত্যিই তো মায়ের বাছা।'

'চানুদার মায়ের আরও কত 'বাছা' আছে। চানুদার জন্যে তো ঘুম হচ্ছে না তাঁর। মনেই থাকে না হয়তো চানুদার কথা।'

মামী হেসে উঠেছিলেন।

'আরো অনেক বাছা আছে বলে ভুলেই যাবে? বড় হ, বাচ্চাকাচ্ছা হোক, তখন বুঝবি।'

'বুঝে দরকার নেই আমার! আমি তো বড় হয়ে ডাক্তার হবো।'

চন্দ্রভূষণ হেসে উঠেছিল, 'তা' মন্দ নয়। ভাল প্রফেশনই বেছেছিস। রুগীদের আর বেশীদিন ভুগতে হবে না।'

'ভাল হবে না বলছি চানুদা!' বলে উঠেছিল চম্পা, মুখে রাগ ফুটিয়ে।

চন্দ্রভূষণ গাড়িতে উঠেছিল।

সেই চম্পা হঠাৎ এই দু'মাসে এত কি লায়েক হলো যে, চানুদা এলো তা দৃকপাতই নেই!

ঠিক আছে, চন্দ্রভূষণও মান খোওয়াবে না যতক্ষণ না চম্পা ডেকে কথা কয়। প্রতিজ্ঞা!

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কি রাখা গেল?

গেল না!

চানুই আগে মান খোওয়ালো, চানুই ডেকে কথা কইলো।

কিন্তু সেই সামান্য ব্যাপারটুকুর জন্যে হঠাৎ নির্জনতা খুঁজতে গেল কেন চানু? কই, ইতিপূর্বে তো কখনো এ খেয়াল হয়নি? আগে এমন হলে মামীর সামনে, দেবুর সামনে, হয়তো বা মামার সামনেই হাঁক পেড়েছে, 'কি হে চম্পাবাবু, আপনার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না! ইউনিভার্সিটির ছাতটা নিতান্তই নামাচ্ছেন তা'হলে?'

চম্পা পড়া ফেলে উঠে আসতো।

চম্পা বলতো, 'দেখ মেজমাসী, চানুদা আমার পড়া খুঁড়ছে! একেই তো আমার মাথায় ঢোকে না, তার ওপর আবার—'

তার ওপর আরো কি সেটা হয়তো চট্ করে মনে পড়ে না চম্পার, তাই হঠাৎ থেমে যায়, আর পাদপূরণ করে দেয় চানু, 'তার উপর আবার সময় পাই না।'

'সময় পাই না? সময় পাই না মানে?' চম্পা রেগে বলে, 'বলেছি আমি তোমাকে ওকথা?'

'আহা বলতে হবে কেন? ইহা যে সত্য ঘটনা।'

চম্পা বিপন্নমুখে বলে, 'সত্য ঘটনা মানে? কী কাজ করি আমি? তাই সময় পাব না?'

বাস্তবিকই কাজের চাপ কিছু ছিল না চম্পার। মাসী কোনোদিন তার কাজের প্রত্যাশা করতেন না। কেবল বলতেন, 'ভাল করে পড়ে পড়ে মানুষ হ।'

বলতেন, 'তোর মা'র কত সাধ ছিল, মেয়ে ছেলে খুব বিদ্বান হবে, খুব নামডাক হবে! তা ছেলে তো চলেই গেল—'

চম্পা কি সেই তার অদেখা মা'র মনের বাসনাটুকুকে রূপ দেবার ইচ্ছেতেই বলতো, 'বিয়েই করব না, ডাক্তার হবো'!

নাকি ছেলেমানুষের বাহাদুরির কথা?

হয়তো তাই।

কিন্তু এই দু'মাস সময়ের মধ্যে কি হঠাৎ বড় একটা মানুষ হয়ে উঠলো চম্পা? তাই চানু তাকে ডেকে কথা বলবার জন্যে নির্জনতা খুঁজলো?

চম্পাকে আবিষ্কার করলো চানু রান্নাঘরের পিছনের শসা কুমড়োর বাগানে।

একটা লোহার শিক দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ছিল চম্পা।

চানু খুব কাছাকাছি এসে মৃদু হেসে বললো, 'আজকাল বুঝি খুব পেটুক হয়ে উঠেছিস চম্পা?'

চম্পা অবশ্যই এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চম্পা চমকে দাঁড়িয়ে উঠে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তার মানে?'

'মানে অতি প্রাঞ্জল। সামনের ফুলবাগান ছেড়ে পিছনের শসাবাগানে আশ্রয়! তা'ছাড়া সারাদিন রান্নাঘরের কাছাকাছি অবস্থান! এসব কিসের লক্ষণ বল?'

চম্পা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'নিজেও ফুলবাগান ছেড়ে শসাবাগানে এসেছ!'

'এসেছি কি আর সাধে? সারাদিন বাবুর পাত্তাই নেই, একটা মানুষ যে দু'মাস পরে এলো, সে জ্ঞানই নেই! ভাবলাম কি হলো? হঠাৎ এর মধ্যে ঠ্যাংট্যাং ভাঙলো নাকি—'

চম্পা তেমনিভাবে জোরে জোরে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলে, 'যা মুখে আসবে, তা বলবে ভেবে এসেছ বুঝি চানুদা? তাই ঠ্যাং ভাঙার কথা বলতে ইচ্ছে হলো?'

'ইচ্ছের কি আছে!' চানু উদাস গলায় বলে, 'ঠ্যাং ভাঙলেই মানুষ চলৎশক্তিরহিত হয়।'

'তুমি এসেছ বলেই যে ছুটে ছুটে দেখতে যেতে ইচ্ছে হবে, তারও কোনো মানে নেই।'

চানু বোঝে এটা ইচ্ছাকৃত।

ঝগড়া করতেই ইচ্ছে ওর।

মৃদু হেসে বলে, 'দেখতে না যাওয়ারও কোনো মানে নেই। সবাই গেছলো। মামী, দেবু, কানাই, বিধু ঝি—'

'তা' নিজেকে যদি বিধু ঝিয়ের দলে ফেলতে না পারি!' চম্পা উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ধুলো ঝেড়ে বলে, 'মামী গেছে, দেবু গেছে, ওরা তোমার আপনার লোক! আমি কে? কেউ না। অতএব কানাই কিংবা বিধুর দলে!'

'হঠাৎ তুই আমার কেউ না, এমন ভাববার দুর্মতির হেতু?'

'দুর্মতি আবার কি?' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চম্পা বলে, 'যা সত্যি তাই বলছি।'

চম্পার এ রূপ নতুন! চন্দ্রভূষণ বুঝি একটু অবাক হয়।

বলে, 'হঠাৎ এমন নির্জলা সত্যিটা আবিষ্কার করে ফেললি যে?'

'তুমিই ফেলিয়েছ!' ঘাড়টা বাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকায় চম্পা।

অদ্ভুত সুন্দর এই ভঙ্গী!

চন্দ্রভূষণের সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে যেন একটা আলোক প্রবাহ বহে যায়! বহে যায় অজানিত এক আনন্দের তরঙ্গ!

একেবারে নতুন লাগে চম্পাকে, অপরিচিত লাগে। কে বলবে এই মেয়েটাকেই সে বছর আষ্টেক বয়েস থেকে দেখে আসছে! দেখে এসেছে কখনো পেনি পরা, কখনো ফ্রক পরা! কখনো উল্লাসে অধীর, পুলকে চঞ্চল, কখনো ব্যথায় বিবর্ণ, ক্রন্দনে বিধুর।

কান্নাটাই অনেক সময়।

দেবুর উৎপীড়ন অবিরত কাঁদিয়েছে তাকে।

আর সেই উৎপীড়নটা যেন চন্দ্রভূষণ আসার পর থেকে অধিকতর উগ্র হয়ে উঠেছিল।

হয়তো এই হয়ে ওঠার পিছনে আছে অন্য এক মনস্তত্ত্ব! দেবু এ বাড়ির শিবরাত্রির সলতে, দেবু সর্বেসর্বা আসল, দেবু দামী মাল, তথাপি দেবু নিজেকে 'হঠাৎ-এসে-পড়া' চানুটার থেকে হেয় জ্ঞান করে। কেন করে কে জানে! মনকে বোঝাতে চেষ্টা করে, পরীক্ষায় দুটো বেশী নম্বর পায় বলে মাথা কিনেছে নাকি? ভারী একেবারে!

কিন্তু মন অবুঝ।

মন যে পথে যেতে চায় যাবেই।

মন মনেমনে ওই চানুটাকেই বরমাল্য দিয়ে বসে।

সেই ঘটনাটাই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বুদ্ধিতে যদি বা খাটো হয় দেবু, শক্তিতে নয়, এটা বোঝাবার জন্যেই হয়তো একটা অধস্তনের উপর সেই শক্তির প্রকাশ দেখায়। হয়তো এটাই মানুষের স্বভাবধর্ম। অসহায়ের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ করে মনে করে 'শক্তি দেখাচ্ছি'।

তা' সেই শক্তি দেখাতো দেবু।

হঠাৎ হঠাৎ তুচ্ছ কারণে হুকুম দিত চম্পাকে, 'কান ধরে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক্।' হুকুম দিত, 'মেপে সাত হাত নাকে খৎ দে।'

অকারণে বলতো, 'দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে এক থেকে হাজার অবধি গোণ্।'.... আর নয়তো বা শক্ত শক্ত এক মুঠো অঙ্ক দিয়ে বলতো, 'দশ মিনিটে কষে নিয়ে আয়।'

না পারলে চুল টানা, কান মলা, রামচিমটি, শ্যামচিমটি, বোম্বাই গাঁট্টা, মোগলাই কিল!

মাসীকে লাগিয়ে দিয়ে দেবুকে বকুনি খাওয়ানো শক্ত ছিল না চাঁপার পক্ষে। মাসী ন্যায়বিচারক। অন্যায়কারী ছেলের পক্ষ সমর্থন করবেন না তিনি ঠিকই, কিন্তু সে পথে যে আরো ভয়!

বকুনি খাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আরো হিংস্র হয়ে উঠবে না দেবু? তখন? আবার লাগিয়ে দেবে? কেবল কেবল লাগাতে যাওয়ার মধ্যে লজ্জার গ্লানি নেই?

চানুর কাছেই নালিশ জানাতো চম্পা, চানুর কাছেই কেঁদে ভাসাতো।

'জানো চানুদা, দেবুদা মাথায় এমন গাঁট্টা মেরেছে, মাথাটা আলু হয়ে উঠেছে!...দেখো চানুদা, কী জোর রামচিমটি কেটেছে দেবুদা, নী-ল হয়ে উঠেছে!'

চানু দেখতো।

দেখে চানুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যেত, কঠোর হয়ে যেত। বলতো, 'তুই কী করেছিলি?'

তা' অপরাধের তালিকা নগণ্যই ছিল। হয়তো, দেবু তার জন্যে একশোটা টোপা কুল তুলে রাখতে বলেছে, পঁয়তাল্লিশের বেশী রেখে উঠতে পারেনি চম্পা। হয়তো ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবার জন্যে ময়দার আটা করে রেখে দেবার কথা, হয়ে গেছে ভুল।

ব্যস! লেগে যায় শাস্তির ব্যবস্থায়।

চানু চম্পার অপরাধের ওজন শুনে গম্ভীর হয়ে যেত।

তারপর ধরতো দেবুকে।

বলতো, 'বাহাদুরিটা দেখাচ্ছিস ভাল দেবু! বাঃ এই তো বীরত্ব!' বলতো, 'পূর্বজন্মে নবাব বাদশা ছিলি বোধহয়, তাই ক্রীতদাস নির্যাতনটা অভ্যাস থেকে মুছে যায়নি এখনো! তা' শুধু ওর চুলের বেণীটা জানলায় বেঁধে দিয়ে ওকে ছুটতে বললি কেন? মাথার খুলিটা খুলে নিতে পারলিনে? তাতে কাজটা নিখুঁত হতো।'

বলতো, 'মোটে সাত হাত নাকখৎ? আরে ছিঃ! সাত হাত আবার একটা মাপ? ওটুকুতে তো চম্পির যেমন বাঁশীনাক তেমনিই থেকে যাবে রে! এমন শাস্তি অন্ততঃ দে, যাতে নাকটা খেঁদিয়ে গিয়ে তোর শিল্প কাজের মহিমা চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারে!'

এই ব্যঙ্গের ঘায়ে মাথাটা হেঁট হয়ে যেত দেবুর। মুখ তুলে উত্তর দিতে পারতো না।

আবার কখনো চানু তীব্র তিরস্কারও করতো।

বলতো, 'তুই তার মানে চাস যে আমি এখানে না থাকি, কেমন?'

দেবু মিনমিনিয়ে বলতো, 'তোর সঙ্গে কি?'

'আমার সঙ্গে কিছু না, কিন্তু মানুষ তো আমি? মানুষের চামড়া গায়ে আছে তো? এই অবিচার, এই অসভ্যতা, চোখে দেখে সহ্য করা আমার কর্ম নয়।...একটা অসহায় জীবের ওপর বীরত্ব ফলানোয় বাহাদুরি নেই দেবু, এইটুকুই শুনে মনে রাখিস। ঠিক আছে, মামাকে বলে চলে যাব আমি। খুব সম্ভব আমার হিংসেতেই এরকম করিস তুই!'

মামাকে বলে দেবার নামে ভয় পেত দেবু।

তখন প্রতিজ্ঞা করতো, 'আর কক্ষনো করবো না, মা কালীর দিব্যি।'

তা' চলে যাবার নামে ভয় কি শুধু দেবুই পেত?

চম্পা আকুল হতো না?

বলতো না, 'তা'হলে তো তুমি আমায় খুব মায়া দেখালে চানুদা! যদি বা তুমি একটু ভালো কথা বল, ভালো ব্যাভার কর, তাও ঘুচে যাবে।'

ভাল কথা!

ভাল ব্যাভার!

হ্যাঁ, এইটুকুই বলতে জানতো তখন মেয়েটা।

'ভালবাসা' কথাটা ব্যবহার করতে জানতো না।

কিন্তু আজ?

আজই কি ব্যবহার করবে সে কথাটা?

তা' করবে না।

তা' কোনো মেয়ে করে না।

শুধু অভিব্যক্তিকে কাজে লাগায়।

বোঝায় গ্রীবার ভঙ্গীতে, মুখের রক্তিমায়। বোঝায় উলটো-পালটা কথায়, অকারণ ঝংকারে, অহেতুক অভিমানে।

তরুণ চন্দ্রভূষণ সেই অপরূপ অভিব্যক্তির দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে ওর মুখটা ধরে ঘুরিয়ে আনে। সঙ্গে সঙ্গে যেন দিশেহারা হয়ে যায়।

স্পর্শের কী শিহরণ!

চম্পাকে কি কোনোদিন স্পর্শ করেনি চন্দ্র?

কত শত বারই তো করেছে!

হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছে, খেলতে খেলতে ধরে ধরে ঘুরিয়ে ঠিক পথে দাঁড় করিয়েছে, চোর কুমীর খেলায় পা ধরে টেনে 'জলে' নামিয়েছে। এই সেদিনও যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় সৈন্য সমাবেশের লাইনে ফেলে কাঁধ ধরে ঠিক করেছে। জানা অজানা কত স্পর্শের প্রবাহ বহে গেছে চম্পার গায়ের উপর দিয়ে, অথচ আজকের এই সামান্য স্পর্শটুকুতে যেন বিদ্যুতের শক্!

চম্পা সেই 'শক্' খেয়ে বিবশ হয়ে বসে পড়ে, চন্দ্রর সেই 'শকে' একটা বন্ধ দরজা খুলে যায়।

চন্দ্র অনুভব করে এই আনন্দ, এই ভয়, এই শিহরণ, এই দাহ! এরই নাম ভালবাসা!

চম্পা আমায় ভালবাসে!

তাই চম্পা অমন করে অভিমান জানালো।

আমি চম্পাকে ভালবাসি, তাই চম্পার স্পর্শে আর এক জগতের স্পর্শ পেলাম আমি!

আশৈশব এই যে আমার প্রতি আকর্ষণ চম্পার, তার নামই ভালবাসা।

বরাবর চম্পার প্রতি আমার যে অফুরন্ত মমতা, তার নামই ভালবাসা।

আমরা দুজনে দুজনকে ভালবেসে আসছি, অথচ এতদিন টের পাইনি। আশ্চর্য, আশ্চর্য! কী অন্ধের মত, কী বোকার মত কাটিয়েছি আমরা এতদিনে!

কি জানি, হয়তো চম্পা টের পেয়েছিল, হয়তো চম্পা অন্ধও নয়, বোকাও নয়। তাই আজ চম্পা অভিমানে ফেটে পড়তে চাইছে। চম্পা আমাকে কী বুদ্ধুই না ভেবেছে তা'হলে!

আস্তে নীচু হয়ে ওর কাঁধে হাত রাখে চন্দ্র।

ডাকে—'চম্পা!'

চম্পা মুখ তোলে না।

চম্পার ঘাড় আরো গুঁজে যায়।

চন্দ্রভূষণ এবার সাহসের কাজ করে, ওই দুই বাহুমূল ধরে তুলে দাঁড় করায় জোর করে। আস্তে বলে, 'তাকাও, তাকাও আমার দিকে।'

কিন্তু তাকাবে নাকি চম্পা?

তাই কেউ তাকায়?

চন্দ্র আর একটু সাহস দেখায়, সেই শিথিল দেহটাকে আর একটু কাছে টেনে আনে, আরো কাছে, জোরে চাপ দেয়। আবেগের গলায় বলে, 'চম্পা চম্পা। চম্পা, আমি কী বোকা!'

খুলে গেছে বন্ধ দরজা।

জানাজানি হয়ে গেছে মন।

অন্য সকলের জগৎ থেকে পৃথক হয়ে গেছে দুজনায়।

এ এক অনাস্বাদিত স্বাদ!

কেউ জানে না নবজন্ম ঘটেছে এদের।

অলক্ষ্যে যে দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বলে উঠে আরতি করে পরস্পরকে, সেকথা আর কেউ টের পায় না। সবার মাঝখানে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছুঁয়ে যায় একটু আঙুলের ডগা, জাগিয়ে দিয়ে যায় একটু শিহরণ, সে কেউ ধরতে পারে না।

সহজ কথাগুলোর মধ্যেই যে লুকোনো থাকে কত অর্থ, সে কথাই বা বুঝবে কে?

যদি ওদের হঠাৎ চেনা জানা হতো, যদি ওরা যৌবনের আবেগে সহসা কাছাকাছি আসতো, তা'হলে ধরা পড়তো। তা'হলে লোকে ওদের মুখের হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোর অর্থ আবিষ্কার করতে বসতো!

কিন্তু তা তো নয়।

ওরা চেনার জগতের।

ওদের কাছাকাছিত্ব দেখে দেখে অন্যের চোখ অভ্যস্ত। ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বরাবরের, তাই সেটা সন্দেহের বাহক নয়।

যবে থেকে আকর্ষণ, সেই বয়সে কি প্রেম করতে বসেছিল ওরা?

অবশ্যই নয়, অথচ ভালবাসা রয়েছে। অতএব 'ভাই বোনের মত'।

অতএব ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, অনেকগুলো বোনটোন ছেড়ে এসেছে চানু, তাই চম্পাটাকে মায়া করে।

আর—দেবুটা বড্ড উৎপাত করে বলে ভালমানুষ চানুকে ভাইয়ের মতো ভালবাসে চম্পা।

আছেই তো সেই ভালবাসা।

নতুন করে আবার চোখ ফেলতে যাবে কে ওদের ওপর?

মামী থেকে থেকে বলেন, 'তুই যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবি চম্পা, দেখিস দেবু তোকে সাতজন্মেও দেখতে যাবে না, যেতে হলে ওই চানুই যাবে।'

তবে মামা একদিন একটা বেফাঁস কথা বলে বসেছিলেন। বলেছিলেন, 'এক গোত্র না হলে, সুষিকে বলতাম, চম্পাটাকে তুইই বৌ করে নে, ভাল মানুষ শাশুড়ীর হাতে পড়তো মেয়েটা!'

মামী তাড়াতাড়ি "থাবা" দিলেন।

বললেন, 'কী যে বল! সেই ছোট্ট থেকে ভাই বোনের মত একসঙ্গে মানুষ হচ্ছে! তবে বল না কেন আমিই চম্পাকে বৌ করি?'

অকাট্য এই যুক্তিটি প্রয়োগ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মামী।

চানুর সঙ্গে বিয়ে!

বাবা, সেই ভেড়ার গোয়ালে!

ননদের বাড়িতে একবেলার জন্যে গেলেই তো প্রাণ হাঁপিয়ে আসে তাঁর!

চম্পাকে তিনি ভাল বিয়ে দেবেন। কৃতী ছেলে, স্বাধীন সংসার! টাকা আছে চম্পার বাবার, মেয়ের বিয়ের নামে লাইফ ইনসিওরেন্স। দু'বছরের মেয়ে যখন, তখনই করেছিল লোকটা। হেসেছিল চম্পার মা, বলেছিল, 'দিদি, দেখছিস কী দূরদর্শী ব্যক্তি, এখন থেকে মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবছে।'

কিন্তু পরে দেখা গেল দূরদর্শীই বটে। সেই টাকা বিয়ের সময় তুলবে মাসী, ভাল করে বিয়ে দেবে।

চানু ভাল ছেলে।

চানু দেখতে সুন্দর।

চানুর প্রাণে মায়ামমতা আছে।

চানু মেয়েটাকে স্নেহ করে। কিন্তু বিয়ে দেওয়া চলে না চানুর সঙ্গে। আহা চানু যদি ওই গোয়ালের ছেলে না হতো! তাছাড়া এক গোত্র তো বটে? সেটা মামীর পক্ষে অনুকূল।

মামার প্রস্তাবে ফুটে উঠছিল দুটি আলোর ফুল, মামীর ঝঙ্কারে নিভে গেল, অন্ধকারে ডুবে গেল।

তারপর আবার আস্তে আস্তে জ্বলে উঠলো।

সংকল্পের আলোয় জ্বলা সেই দুটি ফুল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি হয়ে উঠলো।

মামী কি জানে? মামী কি বোঝে?

মামী কি বুঝেছে, মামীর চোখের সামনেই একটা প্রেমের ঘটনা ঘটছে? বুঝেছে কি, দুটো প্রাণ নতুন জন্ম নিয়ে জ্বলে উঠেছে?

মামী কি জেনেছে, ওরা কোনো এক অবসরে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, 'আমি তোমার, তুমি আমার!'

আর এ কথাই কি জেনেছে, ঠিক করে ফেলেছে ওরা, ওই এক গোত্রটোত্র মানবে না তারা। দরকার হয় বাড়ি ছাড়বে!

বাড়ি ছেড়ে শুধু দুজনে দুজনকে ভালবেসে ঘর বাঁধবে।

হ্যাঁ, এ প্রতিজ্ঞা হয়ে গেছে ওদের।

অবশ্য ভাষাগুলো খুব কাব্যিক হয়নি।

চম্পা বলেছে, 'থাক্ তোমাকে আর দিব্যি গালতে হবে না! খবর রাখো, এক গোত্র আর তার মানে কি? বেটাছেলেদের আর কি, দুম্ করে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসলেই হয়ে গেল।'

চানু ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'সত্যি, এক গোত্র জিনিসটা কি?'

চম্পা দুঃখের হাসি হেসেছে, 'কিছুই জানো না চানুদা, শুধু বড় বড় কথা বল। ওসব প্রতিজ্ঞাটতিজ্ঞা রাখো! কিছুই হবে না।'

'হবে না?'

চানু ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, 'হবে না মানে? চন্দ্রভূষণকে চেনো না তুমি, তাই ওকথা বলছো। হইয়ে ছাড়বো! বলবো ওসব আমি মানি না।'

'সবাই যদি তোমার ওপর রাগ করে?'

'করুক! তুই না করলেই হলো। বল এখনো। তুই করবি রাগ?'

তা' মুখ ফসকে 'তুই'টা বেরিয়ে যায় বৈকি মাঝে মাঝে। বাইরে তো 'তুই'টাই বাহাল আছে। বাইরের ঠাট বজায় রাখতে 'তুই' করেই তো কথা কইতে হয় সকলের সামনে।

চম্পা মুখ নেড়ে বলে, 'আহা! রাগ করবো?'

'ওতেই হবে, ব্যস! তোকেই চিরকাল বৌ ভেবে এলাম, এখন এক গোত্র দেখাতে এসেছে!'

'চিরকাল ভেবে এলে! বানিয়ে বানিয়ে বাজে কথা বোলো না বলছি।'

'বানিয়ে বানিয়ে বাজে কথা?'

'তা' না তো কি? আমি যে চিরকাল তোমার জন্যে মরেছি, টের পেতে?'

'টের পাইনি একথা কে বললে? মনে মনে পেয়েছি।'

'হুঁ। তাই কলকাতায় গিয়ে সবাইকে চিঠি দেওয়া হলো, আর—'

'ওঃ সেইদিনের রাগ?'

চন্দ্রভূষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর গালে একটা টোকা দেয়। বলে, 'ভাগ্যিস দিইনি! তাই না সেদিন—!'

'আহা যেন জেনে জেনে—'

'জেনে না হোক অজানায়, তবু সেই রাগেই তো খুলে গেল বন্ধ দরজাটা?'

'এবার কিন্তু গিয়ে চিঠি দেবে।'

ভাষার নমুনা এই!

কিন্তু এবার মানে কি?

এবারটা নিয়েই তো ভাবনা।

এবার যে বি.এ. পরীক্ষা হয়ে যাবে চন্দ্রভূষণের! তারপর আর রাজশাহীতে আসার প্রশ্ন কোথায়? এম.এ. যদি পড়ে তো কলকাতায় পড়বে। না পড়ে তো কলকাতায় চাকরি-বাকরি খুঁজবে।

অথচ দেবু এখনো আই.এ. ফার্ষ্ট ইয়ার, দেবু পড়তেই থাকবে।

আর চম্পা ম্যাট্রিক দেবে এবার। শোনা যাচ্ছে মামীমা ওকে কলেজে পড়াতে চান। তা'ছাড়া বিয়ের খোঁজও করছেন। যেটা আগে লেগে যায়। বিয়ে হয়ে গেলে পড়তে যাবে না।

কিন্তু ওদের যা ব্যবস্থাই হোক, চন্দ্রভূষণের আর আসবার প্রশ্ন রইলো না।

তা'হলে?

তা'হলে আর কিছু নয়। যে কটা দিন না বি.এ. পরীক্ষা হয়।

তারপর?

তারপর রইলো বিশ্বাস।

রইলো দৃঢ়তা।

'জোর করে কেউ কাউকে বিয়ে দিতে পারে?' চন্দ্রভূষণ বলে, 'আমায় কেউ দিক দিকি? কেটে ফেললেও করব না।'

চম্পা আবেগে দুঃখে হতাশায় বিচলিত ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'তুমি আর ওকথা বলবে না কেন? মেয়েমানুষ তো নও?'

'মেয়েমানুষ তো কি? মেয়েমানুষ মানুষ নয়? নিজেদেরকে অমানুষ ভেবে ভেবেই তোমাদের এই দশা!'

'শুধু ভেবে?' চম্পা উত্তেজিত হয়। 'মেয়েমানুষের ওপর সবাই যত জোর ফলায়, তোমাদের ওপর তা' ফলায়?'

'জোর করে প্রতিবাদ করলে, কার সাধ্য আর দ্বিতীয়বার জোর ফলায়? তেমন জোর করা চাই। বলবি অন্য সম্বন্ধ করলে বিষ খাব। তারপর আর বলবে কেউ কিছু? তা তো নয়, তোদের কেবল ভাবনা লোকে নিন্দে করবে। আরে বাবা, করলই বা নিন্দে? গায়ে ফোস্কা পড়বে? তবে যদি আর কোনো সুন্দরকান্তি সুপাত্র জুটে যায়, আর তোমার বাসনা হয়—'

'ভাল হবে না বলছি। ওসব কথা বললে—'

'ঠিক আছে। সত্যি যদি তোমার মধ্যে ভালবাসা থাকে, কেউ টলাতে পারবে না তোমার মনকে।'

যদি ভালবাসা থাকে।

হঠাৎ এক ঝলক জল এসে পড়ে বেচারার চোখে।

'যদি থাকে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, বলা ভুল হয়েছে। বলছি তোমার এই ভালবাসার জোরেই লড়তে পারবে তুমি।'

হঠাৎ মামা ওদিকের বারান্দা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, 'লড়ালড়ির কথা কি হচ্ছে রে?'

ওদিকটা বাগানের ওঁচা দিক, ওদিক থেকে কারো আসার কথা নয়, হঠাৎ মামা ওদিকে! চানু অবাক হলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'চম্পিটাকে বলছিলাম, মনের জোর বাড়ানো দরকার। মনের জোর প্রচুর

থাকলে তবেই জীবনের পথে লড়তে পারবে তুমি।'

মামা ওর পিঠ ঠুকে দিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছিস! এই হচ্ছে আসল কথা! এই দেখ্ দেবুটা বোকা নয়, কিন্তু পাশ করবোই এই মনের জোর নিয়ে পড়ে না বলে ভেস্তে যায়।'

কিন্তু মনের জোরই কি সব?

পৃথিবী কি এখনো এমন সভ্য হয়েছে যে মনের জোরই নিয়ন্ত্রণ করবে সে পৃথিবীকে? আর কোনো জোর নেই? গায়ের জোর? পশুশক্তির জোর?

এই সময় ওদের বাড়িতে 'জামির' নামের একটা ছেলে আসতে শুরু করলো। দেবুই তাকে অন্দরের দরজা চেনালো। কারণ দেবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু সে। খেলার মাঠের বন্ধুত্ব প্রাণের মধ্যে আসন গেড়েছে।

মামীও ছেলের বন্ধুকে ছেলের মতো দেখতেন, আদর করে খেতে দিতেন, আর বলতেন, 'কী শান্ত সভ্য ভদ্র ছেলে! কে বলবে আমাদের ঘরের নয়!'

মামা বলে উঠতেন, 'এ কথায় আমি আপত্তি করছি রুবি! আমাদের ঘরের ছেলে হলেই শান্ত সভ্য ভদ্র হবে, নচেৎ নয়?'

মামী হাসতেন, 'আহা তাই কি বলছি? বেশ সৎ শান্ত, সেই কথাই হচ্ছে।'

হতো সেই কথা।

সৎ শান্ত, সভ্য ভদ্র।

জামির নামের সেই ছেলেটা।

দেবুর প্রাণের বন্ধু।

কিন্তু চন্দ্রভূষণ প্রথম থেকেই তাকে দু'চক্ষের বিষ দেখতো।

বলতো, 'বন্যজন্তুকে আদর করে বাড়িতে ডেকে আনাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় দেবু!'

দেবু রেগে উঠতো।

বলতো, 'তোমার চোখ ঈর্ষার চোখ! ও যে চম্পির সঙ্গে কথা বলে তাতেই তোমার মাথা খারাপ! বুঝি তো তোমার ইয়ে—'

'বোঝো? শুনে খুশী হলাম। বোঝাই মঙ্গল। অতএব আমি চাই না ওই বুনো বাঁদরটা চম্পার সঙ্গে কথা কয়।'

দেবু আরও রেগে উঠতো, 'তা বলে চম্পা তোমার হারেমের বেগম নয়!'

আহত চন্দ্রভূষণ ঠিক করলো, এ পথে হবে না। ওই পাজীটাকেই শায়েস্তা করতে হবে।

কিন্তু সত্যই কি পাজী মনে হতো জামিরকে?

সুকুমার মুখ, ভদ্র বিনীত ভঙ্গী।

চন্দ্রভূষণ যখন তাকে সমঝে দেবে বলে ঠিক করে এগিয়ে যায়, ও হয়তো হাস্যমুখে এসে বলে, 'চানুদাকে তো দেখাই যায় না, খুব পড়ছেন, তাই না?

চন্দ্রভূষণ ভুরু কোঁচকায়।

জামির সেটা বুঝতে পারে না।

তেমনি আহ্লাদভরা গলায় বলে, 'উঃ ভেবে দিশেহারা হয়ে যেতে হয় চানুদা, আপনি আমার থেকে মাত্র এক বছরের বড় অথচ বি.এ. পড়ছেন! আর আমি? এখনো ইস্কুলে ঘষটাচ্ছি!'

কথাটা মিথ্যা নয়।

দেবুর সঙ্গে খেলার মাঠে বন্ধুত্ব, সহপাঠিত্বের সূত্রে নয়।

চন্দ্রভূষণের ভুরুটা সরল হতো।

চন্দ্রভূষণের মনে হতো, যা ভাবি তা বোধহয় নয়। নেহাৎই গবেট একটা! কিন্তু চম্পার সঙ্গে কথা কইতে দেখলেই যে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে!

অতএব ঝালটা এসে পড়ে চম্পার উপর।

'খুব যে আড্ডায় মত্ত? তোমারও যে 'পরীক্ষা' বলে একটা জিনিস আছে সেটা বোধহয় মনে নেই?'

'কে বললে মনে নেই?'

'আছে মনে? তবু ভাল। যে রকম আড্ডার বহর দেখি। জামির এলে তো জ্ঞান থাকে না—'

চম্পা আরক্ত হয়।

চম্পা বোধকরি অপমানিতও হয়।

বলে, 'মুখে যতই প্রগতির কথা বল চানুদা, মনটা তোমার সেই জেঠামশাইদের মতই। তবে জেনে রেখো, আড্ডা আমি দিই না। দেবুদার বন্ধু জামির অঙ্কে খুব ওস্তাদ, ওর কাছে অঙ্ক শিখে নিই।'

চন্দ্রভূষণ গম্ভীর হয়। বলে, 'দুই আর দুইয়ে চার, এটাই অঙ্কের প্রথম পাঠ, বুঝলে?'

চম্পা প্রথমটা বোকার মত তাকায়, তারপর লাল হয়। বলে, 'অকারণ রাগ করছো তুমি।'

'অকারণ হলেই মঙ্গল। তবে বলে দিচ্ছি, ওই জামিরটি একটি ঘুঘু।'

'ও ঘুঘু?' হেসে ওঠে চম্পা। বলে 'ওই অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়ে একের নম্বরের বোকা।'

'শুনি তো কবিতাও লেখেন।'

'তা লেখে—' চম্পা হাস্যমুখে বলে, 'কবিতা বললে কবিতা, পদ্য বললে পদ্য। দেবুদা ওইতেই মোহিত। ডেকে নিয়ে গিয়ে মেজমাসিকে শোনায়।'

চন্দ্র বিরক্তির সঙ্গে কথা বলে, 'তা মেজমাসিও বোধহয় মোহিত?'

'ধেৎ, মেজমাসি তেমনি বোকা নাকি?...শুনবে তবে কবিতার নমুনা?...

'উষার রক্তিম আভা ফুটেছে আকাশে,
শাদা শাদা মেঘগুলি সে আকাশে ভাসে।
লালের পরশ পেয়ে শাদা হয় লাল,
এ শোভা মিলাবে হায় রবে ক্ষণকাল।

চম্পা হাসতে থাকে।

'এই হলো কবিতার নমুনা!'

চন্দ্রভূষণ কিন্তু হাসে না।

গম্ভীর মুখে বলে, 'তবু তো মুখস্থ করে ফেলেছ!'

ভাবে, সত্যিই তো! মুখস্থ করে তো বসে আছে। তার মানে আমার সামনে যত হাসছে, তত খারাপ ভাবে না। কে জানে, সব কবিতাই এরকম নিরামিষ না আমিষও আছে।...হয়তো প্রেমের কবিতা লিখে লিখে চম্পাকে উপহার দেয়। হয়তো চম্পা সেইগুলোও মুখস্থ করে!

চন্দ্রভূষণ কি মামাকে সাবধান করে দেবে?

বলবে, 'একগোত্র ছেলে থেকে তুমি মন সরিয়ে নিচ্ছ, অথচ সম্পূর্ণ অগোত্র ওই ছেলেটাকে তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার দিচ্ছ—'

বলবে ভাবে, বলা হয় না।

জামিরের প্রতি ওঁদের স্নেহের আধিক্য মূক করে রাখে চন্দ্রভূষণকে। জামিরে বিগলিত ওঁরা।

জামির এমন বিবেচক যে, নিজেদের বাগানের ফল এনে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'ধুয়ে নেবেন মাসিমা!'

জামির এমন নিরহংকার যে, জলতেষ্টা পেলে হাত পেতে জল খায়, কিছুতেই গ্লাসে খেতে চায় না।

জামিরের এত হুঁশ যে, কদাচ উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাচা কাপড়গুলো ছোঁয় না, কদাচ কুয়োতলার দিকে যায় না।

এসব কী সোজা গুণ?

হিন্দু নয় বলে নিজেকে নীচু ভাবার যুগ আর আছে নাকি?...অথচ জামির তা' ভাবে।

অতএব বিরক্তিকন্টক উৎপাটিত হয় না।

কন্টকবিদ্ধ মন নিয়েই বি.এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়। এবং সর্বস্ব এখানে রেখে চলেও যেতে হয়।

মা বাপ চিঠির উপর চিঠি লিখছেন।

তা'ছাড়া আর এখানে থাকার যুক্তি কি?

যাবার আগে হঠাৎ একটু নিষ্ঠুরতা করে চন্দ্রভূষণ। নিভৃত একটু দেখা হবার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। বরং চম্পার চেষ্টাটা এড়ায়। কারণ চম্পা সে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। চম্পা হয়তো অকারণেই বলে উঠলো, 'এই সেরেছে! ছাতের কাপড়গুলো বোধ হয় শুকিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে—'

বলে টুক্ করে উঠে গেল ছাতে।

তারপর নেমে আসতে এতটা সময় ব্যয় করলো সেই তুচ্ছ কাজটাতে, যেটা স্বাভাবিকের গণ্ডির অনেক ওপারে। তার মানে, কোনো এক প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে, এবং অবশেষে হতাশ হয়ে নেমে এসেছে।

চন্দ্রভূষণ এই সময়ক্ষেপণের হিসেবটা রেখেছে, চন্দ্রভূষণের মনটা সহস্র বাহু নিয়ে ছাতের সিঁড়ির দিকে ধাবিত হয়েছে। তবু চন্দ্রভূষণ এক নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতে নিজেকে আটকে রেখেছে।

চম্পা এসে চোখে চোখে তাকাতে চেষ্টা করেছে, হয়তো মনটা একটু নরম হয়ে এসেছে, আর হঠাৎ হয়তো সেই মহামুহূর্তে শনির মত এসে উদয় হয়েছে জামির, ছ্যাবলার মত বলে উঠেছে, 'কি চানুদা, যাবার জন্যে তোড়জোড় লাগিয়েছেন তো? দেখবেন যেন আমাদের ভুলে টুলে যাবেন না।'

ব্যস, মেজাজের পারা চড়াৎ করে শেষ সীমায় উঠে বসেছে, মনটা হিংস্র হয়ে উঠেছে। তাই চোখাচোখিব চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে চম্পার।

তবু চম্পা আশে-পাশে ঘুরঘুর করে বেড়িয়েছে, খামোকা চানুকে দেখিয়ে দেখিয়ে বাগানের দিকে চলে গেছে, এবং তাতেও ছাতের ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

অথচ চন্দ্রভূষণ অবোধের ভানে 'সরল মুখ' নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

মামী কোনোদিনই সন্দেহবাতিক নয়, কাজেই এতটুকু ইচ্ছে করলেই একবার নির্জনে দেখা হতে পারতো! কতই তো অমন হয়েছে এযাবৎ, কিন্তু সে 'ইচ্ছে'কে দমন করেছে চন্দ্রভূষণ। আর এ পর্যন্ত এই চন্দ্রভূষণই করেছে সুযোগ সংগ্রহ।

পরস্পর যে 'জীবনে মরণে আমরা এক' বলে বাক্যবদ্ধ হয়েছে, সে কি মামার কানের গোড়ায়, না মামীর সামনে?

কিন্তু এখন চন্দ্রভূষণ অবোধের ভানে মামার বৈঠকখানাতেই আড্ডা গাড়ছে। আবার ঠিক গাড়ছেও না। চঞ্চল হয়ে মাঝে মাঝেই উঠে যাচ্ছে। ঘুরে আসছে এঘর ওঘর, আর যেই চম্পাকে দেখতে পাচ্ছে, না দেখার মত করে চলে আসছে।

করেছে, দিনের পর দিন এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করেছে চন্দ্রভূষণ।...পরে সেই কথা ভেবে নিজেকে নিজে মারতে ইচ্ছে হয়েছে চন্দ্রভূষণের, তবু তখন করেছে সেই ব্যবহার।

এটা করতে কি বুক ফেটে যাচ্ছিলো না চন্দ্রভূষণের?

যাচ্ছিলো।

তবু করছিল।

যেন একটা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে।

কিন্তু হঠাৎ সেই রাত্রে ঘটলো এক ঘটনা।

ভয়ংকরই মনে হয়েছিল সে ঘটনাকে চন্দ্রভূষণের। ভোরবেলা যাত্রা, শেষরাত্রি থেকে ঘুম ভেঙে গেছে, এবং গত ক'দিনের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে ছটফট করছে নিরুপায় মন। এমন সময়, সেই রাত্রির অন্ধকারে ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে চম্পা এসে ঘরে ঢুকলো।

হ্যাঁ, সত্যিকার চম্পা। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, স্রেফ রক্তমাংসের।

চন্দ্রভূষণ তবে হাতে স্বর্গ পেল?

তাই পাওয়াই তো উচিত ছিল।
কিন্তু তা হলো না।
চন্দ্রভূষণ হাতে স্বর্গ পেল না, ভয় পেল।
রুদ্ধ গলায় বললো, 'এর মানে?'
চম্পা বসে পড়লো একটা ট্রাঙ্কের উপর।
বললো, 'কী করবো? তুমি তো—'
'তাই বলে এই সময়? না না, ছি ছি, শীগগির ঘরে যাও।'
চম্পা রেগে উঠলো।
বললো, 'ঘরে যাব না তো কি তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাবার জন্য আবদার করবো? শুধু জানতে এসেছি, যাবার সময় এরকম করলে কেন?'
চন্দ্রভূষণ ভাঙা ফ্যাকাশে গলায় বললো, 'কি রকম?'
'জানো না কি রকম? একটা কথা কইতে সুযোগ দিলে না—'
শেষরাত্রে উঠে ঘড়ি দেখবে বলে একটা হ্যারিকেন জ্বালা ছিল ঘরে, যতটা সম্ভব মৃদু শিখায়। জানলার বাইরে তখনো ঊষার রক্তিম আভা ফোটেনি।
এই প্রায়ান্ধকার ঘরে এই বিদায়ের মুহূর্তে চম্পা কেন দেখা দিতে এলো?
চন্দ্রভূষণ কি করে নিজেকে সংযত রাখবে? চন্দ্রভূষণ কেন ওই প্রিয় দেহটাকে কাছে টেনে নিতে যাবে না?
হ্যাঁ, চন্দ্রভূষণ সেই মানবিক রীতিরই অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো, চন্দ্রভূষণ ওকে দু'হাতে কাছে টেনে নিয়ে আবেগের গলায় বলে উঠেছিল, 'চম্পা চম্পা, আমি একটা গাধা, একটা জানোয়ার—'
তারপর?
তারপর কি একটা জানোয়ারের মতোই ব্যবহার করতো চন্দ্রভূষণ? মার্জিতবুদ্ধি ভদ্র চন্দ্রভূষণ? তা হয়তো অসম্ভবও ছিল না। আর হয়তো নিজে সে তখন নিজেকে জানোয়ার না ভেবে দেবদূতই ভাবতো। কারণ চম্পা সেই মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠে ভেঙে পড়েছিল তারই গায়ের উপর। কিন্তু ঠিক সেই সময় নিষ্ঠুর বিধাতা তীব্র একটা পরিহাস করলেন।
অথবা দয়াময় বিধাতা কল্যাণের হাত বাড়িয়ে—
না, অবশ্যই ঠিক সেই মুহূর্তে বিধাতাকে দয়াময় ভাবেনি ওরা, কারণ বিধাতা চন্দ্রভূষণের মামার গলায় বলে উঠেছিলেন, 'ওরে চানু, উঠেছিস নাকি? আর তো সময় হয়ে এলো—'
বলা বাহুল্য চানুর সাড়া পেলেন না।
কারণ চানু তখন 'গভীর ঘুমে' আচ্ছন্ন।
মামা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, চটির শব্দে টের পাওয়া গেল সেটা, তারপর মামার স্বগতোক্তি শোনা গেল, 'বেদম ঘুমোচ্ছে! আচ্ছা ঘুমোক, আরও মিনিট পনেরো ঘুমিয়ে নিক।
মামার চটির শব্দ আবার উঠলো, মিলিয়ে গেল।'
কিন্তু সেই মেয়েটা?
সেটা মিলিয়ে গেল কোথায়?
তাকে কি আর দেখতে পাওয়া গেল?
না, চন্দ্রভূষণ অন্ততঃ তাকে আর দেখতে পায়নি।
চোখ বুজে 'ঘুমিয়ে পড়া'র পর অনুভব করেছিল চন্দ্রভূষণ, বাগানের দিকের ছোটো দরজাটা খুলে নেমে গেল সে।
ব্যস!
আর দেখা হলো না।

যাত্রাকালে নয়, সগোত্র বিয়েতে বাড়ির সম্মতি আদায় করে ফিরে এসে নয়! সারা জীবনে আর কবে কোথায়?...

হ্যাঁ, সগোত্র বিয়েতে সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল চন্দ্রভূষণ ওপরওলাদের।

তর্কাতর্কি করে, নির্লজ্জতার চূড়ান্ত করে।

কিন্তু সে তো পরে।

সেদিন? সেদিন ট্রেনে যখন চাপলো, মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যখন একা হলো, তখন চন্দ্রভূষণ যেন ভয়ে ভয়ে সাবধানে সেই অদ্ভুত ঘটনাটাকে বন্ধ বাক্স থেকে বার করলো।

আচ্ছা, ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটেছিল?

চন্দ্রভূষণের একাগ্র বাসনার স্বপ্ন নয় তো?

কিন্তু স্বপ্ন যদি তো কেন চন্দ্রভূষণের সমস্ত স্নায়ু শিরায়, রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায় স্পর্শের এমন রোমাঞ্চ স্বাদ?

কেন চন্দ্রভূষণের সমস্ত চেতনায় এমন তীব্র আক্ষেপের আছড়ানি?

আচ্ছন্নের মতই সারা রাস্তাটা কাটলো।

তারপর সংকল্পে দৃঢ় হলো চন্দ্রভূষণ।

ভাবলো, দেরি নয়, দেরি নয়! এখনই বাড়ি গিয়ে—

চন্দ্রভূষণদের আমলে বি.এ. পাসের সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের নজীর ছিল। তাই ভাবাটা হাস্যকর হলো না। চন্দ্রভূষণ ভাবলো, শেষ পর্যন্ত ব্যবহারটা জানোয়ারের মত হলো। শেষকালে দেখা করে এলাম না।

কী ক্ষতি হতো, যদি সাহস করে বলতো পারতো, 'মামা, আমি চম্পিকে বিয়ে করতে চাই।' বলতে পারেনি, এটুকুও বলতে পারেনি, 'কই চম্পিকে দেখছি না?'

না, সে সাহস হয়নি তার।

নিতান্ত কাপুরুষের ভূমিকা অভিনয় করেছে সে।

তার কারণ তখনো রক্তের মধ্যে তোলপাড় করছিল একটা অনাস্বাদিত স্বাদের ঢেউ। আর নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছিল।

ক্রমশঃ বাড়ির পথে আসতে আসতেই সংকল্পে দৃঢ় হলো।...'সগোত্র' কথাটার মতে একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে জীবনকে এলোমেলো করবে না চন্দ্রভূষণ!

বলবে, আরো তিন ভাই আছে চন্দ্রভূষণের, কুল শীল গোত্র গাঁই মিলিয়ে বিয়ে দেবেন তাদের, চন্দ্রভূষণকে যেন তাঁরা মুক্তি দেন।

মনে মনে তো ঠিক করাই আছে, অধ্যাপনার কাজই করবে সে। মোটামুটি আন্দাজও করে রেখেছে কোন্ দিকে করবে।

কলকাতায় নয়, কলকাতায় কাজ করলেই তো এই 'অচলায়তনে'র মধ্যে মাথা গুঁজতে হবে! চলে যাবে বাইরে। পূর্ববঙ্গে, উত্তরবঙ্গে অথবা বিহারে, উত্তর ভারতে, যেখানে হোক।

যেখানে হোক!

চম্পাকে নিয়ে একটি সুখের নীড় বাঁধবার জন্যে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এতটুকু একটু বাসা। শুধু এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে নয়। এখানে চম্পা হাঁপিয়ে উঠবে।

হ্যাঁ, এইরকমই ভেবেছিল সেদিন যুবক চন্দ্রভূষণ।

অথচ আজ যখন প্রৌঢ় চন্দ্রভূষণের ভাই বলতে এলো, 'দাদা, বাইরে একটা অফার পাচ্ছি, বেশ ভবিষ্যৎ আছে মনে হচ্ছে, ভাবছি ওখানে একটা অ্যাপ্লাই করি,' চারিদিক শূন্য দেখলেন যেন চন্দ্রভূষণ।

যেন মনে হলো পৃথিবীতে এমন অনিয়ম হয় না।

বাইরে চাকরী!

তার মানে ভিটে ছেড়ে চলে যাওয়া!

না না, তা হয় না।

'ভিটে' নামক বস্তুটার কি একটা আত্মা আছে? তাই সেই চন্দ্রভূষণ ভিটেয় বাস করতে করতে এখন ভিটেটার মায়ায় মরছেন।

যুবক চন্দ্রভূষণের আবেগ ছিল অন্যত্র। তাই ভেবেছিল, এ বাড়িতে নয়। ভেবেছিল, বাবার তো আরো তিন ছেলে আছে।

আর সেই ভাবনা থেকেই নির্লজ্জের চূড়ান্ত হয়ে সগোত্র বিবাহে সম্মতি আদায় করেছিল ওদের ওই গোঁড়া বাড়ি থেকে।

কিন্তু ঠিক সম্মতিই কি? অনেকটা যেন হার মেনে ছেড়ে দিয়েছিল সংসার।

প্রথমে তো জেঠামশাই বলেছিলেন, 'সগোত্র কন্যা বিবাহ, সহোদরা বিবাহের তুল্য পাতক।'

বলেছিলেন, 'ওতে আয়ুক্ষয় হয়।'

চন্দ্রভূষণ জেঠাইমার মারফত বললো, 'আয়ুক্ষয়ের কথা ভাবি না। ওটা অবান্তর। তবে প্রশ্ন করছি, সাতপুরুষের দূরত্ব হয়ে গেলেই তো গোত্রের বন্ধন শিথিল হয়ে যায় তোমাদের, মরে গেলে অশৌচ লাগে না, তবে? এ তো কোনো পুরুষে সংস্রবই নেই।'

'তবু বিবাহ নিষিদ্ধ, কারণ কোনো এককালে একরক্ত ছিল।'

'কিন্তু এই যে দেখি 'দত্তক' নেওয়া হয়, তাতে তো গোত্রান্তর ঘটে, তাদের বেলায় কি হয়? গোত্রান্তর ঘটে, কিন্তু রক্তান্তর তো হয় না?'

'একে বলে কুতর্ক।'

জেঠামশাই রেগে বলেছিলেন, 'ইচ্ছে হয় খ্রীষ্টান মুসলমান যা খুশি বিয়ে করগে না, অনুমতি নেওয়ার থিয়েটারটা কেন?'

বাবা বলেছিলেন, 'মামা যে কেন অত আগ্রহের আড়ম্বর করে ভাগ্নেকে নিয়ে ঘরে পুষেছিলেন, তা' বোঝা যাচ্ছে এখন। একটা লভ্ ঘটিয়ে শালীর মেয়েটাকে পার করার ফন্দী! মামা মহৎ, মামা হিতৈষী, দেখ এখন!'

মা কপাল চাপড়ে বললেন, 'এত বুদ্ধি ধরিস তুই, আর এই ফাঁদে পা দিলি? বুঝতে পারলি না, এ তোর মামীর কারসাজি! নইলে এতদিনে ওর বিয়ের চেষ্টা করে না?'

চন্দ্রভূষণ বললো, 'মামী এর বিরুদ্ধে! মামীও সগোত্র বলে মূর্ছা যাচ্ছে।'

মা বিশ্বাস করেননি সে কথা।

মা তাঁর স্বভাববহির্ভূত গলায় বলেছিলেন, 'বকিসনে খোকা। বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে আসিসনে?'

পিসি বললেন, 'গুণ তুক করেছে কিছু, এ আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। দেখতে না, ইদানীং ছুটিতে বাড়ি এসেও ছেলে যেন রাতদিন তাদের ভাবেই বিভোর, তাদের চিন্তোয় উন্মুখ!'

শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রভূষণ। আশ্চর্য তো!

ভেবেছিল, মনস্তত্ত্বের ছাত্রী না হয়েও পিসিমা তো ও বিদ্যেটায় কাঁচা নয় দেখছি।

চন্দ্রভূষণ তো নিজের সেই উন্মনা ভাবটা নিজে বুঝতে পেরে, ধরা পড়বার ভয়ে যতদূর সম্ভব হইচই করেছে, যতটা পেরেছে সহজ হয়েছে। রাজশাহীর নাম মুখে আনেনি এদের কাছে, তবু পিসিমা এমন এক মোক্ষম কথা বলে বসলেন!

ঠাকুমাও মেয়ের কথায় সায় দিলেন।

বললেন, 'গুণ তুক ছাড়া আর কি? দেখছ না, নিজেরা একটা পত্তর লিখে প্রস্তাব করলো না, ওই বেহায়া ছোঁড়াটাকে দিয়েছে লেলিয়ে! জানে ওতেই কাজ হবে, নিজেরা হেঁট হবে কেন?'

চন্দ্রভূষণ হেসে বলেছিল, 'এই কথাটাই খাঁটি ঠাকুমা, ছোঁড়াটা বেহায়া! নইলে বিশ্বাস কর, তাঁদের মনোভাব তোমাদের থেকে কিছু কম কড়া নয়।'

'তা' তুই হতভাগাই বা এত বেহায়া হতে গেলি কেন? আমরা কোথায় চারদিকে ঘটক পাঠাচ্ছি সুন্দর

মেয়ে খুঁজতে, ইত্যবসরে তুই কিনা নিজেই নিজের কনে ঠিক করে বাপ জেঠার মুখের ওপর বলছিস, 'শাস্তরে থাকুক না থাকুক ওকেই আমি বিয়ে করব!'

'তা' তোমরাই তো বল ঠাকুমা, যার সঙ্গে যার মজে মন—' চন্দ্রভূষণ ঠাকুমার ন্যাড়ামাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ঠাকুমা হেসে ফেলে বলেন, 'তা মনকে এত সাততাড়াতাড়ি মজাবার কী দরকার ছিল? বয়েস কি পেরিয়ে যাচ্ছিলো? তা'ছাড়া—সেই কচি খুকীটা থেকে দেখলি মেয়েটাকে, এখন তাকে নতুন করে ভাল লাগছে?'

চন্দ্রভূষণ হেসে উঠে বলে, 'ঠাকুমা, তোমারও তো শুনেছি ন'বছরে বিয়ে হয়েছিল, ঠাকুর্দাও অতএব সেই কচি খুকীটাকে দেখেছিলেন? তারপর 'নতুন করে' ভাল লাগেনি?'

ঠাকুমা আরো হেসে ফেলেছিলেন।

বলেছিলেন, 'দূর হ হতভাগা ছেলে! কিসের সঙ্গে কি! শুভদৃষ্টির পরিবার আলাদা জিনিস, বুঝলি?'

'বুঝলাম না। নাপিত ব্যাটা 'ধরে ভদ্র ঘটিয়ে' শুভদৃষ্টি করিয়ে দিলেই তবে শুভদৃষ্টি হবে, নচেৎ হবে না, একথা আমার বুদ্ধির বাইরে।'

'তাহোক যাই বলিস, এ বিয়েয় সুখ নেই। সাধ-আহ্লাদ হবে না, নতুন একটা কুটুম্ববাড়ি হবে না, সেই পচা পুরনো মামার বাড়িটাই হবে শ্বশুরবাড়ি, ছিঃ! মামীর বুনঝির সঙ্গে বিয়ে নতুন কথা নয়, কিন্তু মামীর কাছে মানুষ হওয়া মেয়ে তো মামীরই মেয়ের তুল্যি!'

এখানটায় একটু বিচলিত হয়েছিল চন্দ্রভূষণ। ভেবেছিল, তা বটে। সেই বাড়িতে জামাই সেজে চম্পাকে নিয়ে বাসরে বসবো! ব্যাপারটা আদৌ লজ্জার নয়, একথা বলা যায় না।

তা' সে ভাবনাকে দাঁড়াতে দিল না।

চেনা জানার মধ্যে বিয়ের অনেকগুলো নজীর চোখের সামনে মেলে ধরে মনকে ঠিক করে নিল। অবিরতই যে চোখের সামনে ছায়া ফেলে ফেলে চলেছে, সেই একখানা প্রায়ান্ধকার ঘর, সেই একখানা ক্রন্দনাকুল নারীসত্তা!..... চোখে দেখতে পায়নি, শুধু স্পর্শ অনুভব করেছিল। তাই সেই নারীদেহটুকু দেহের স্থূলতা অতিক্রম করে একটি সত্তায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

চম্পা যদি দিনেরবেলা এসে কাঁদতে বসতো, মায়া হতো, এমন হতো না। শুধু মনে হতো চম্পা কাঁদছে। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত সময়ে এলো চম্পা, সে যেন শরীরিণী রইলো না, যেন একটা আকুলতার রূপ হয়ে অনুক্ষণ শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো।

এখন এক একসময় ভাবেন চন্দ্রভূষণ, আশ্চর্য, ইন্দুর ওই বড় মেয়েটার নাকি পনেরো বছর বয়স। এযুগে বুদ্ধির এত বাড়, শিক্ষার এত বাড়, কিন্তু মনটা কি করে থাকে অপরিণত?

চম্পার ষোলো বছর বয়েস ছিল তখন।

মামী চেষ্টা করেছিল, ওকে 'বালিকা' ভাবতে। চেষ্টা করেছিল, ওর মনে চেতনা না জাগাতে। তাই মামী ওকে—'কি হয়েছে, ছেলেমানুষ তো'—বলে জামিরের কাছে পড়তে দিচ্ছিল। কিন্তু যে জাগাবার সেই জাগায়। কে জানে একালেও হয়তো একই হয়। শুধু শাড়ী পরে না বলে ধরা পড়ে না।

ওই জামিরটাও ছিল একটা দুশ্চিন্তা! দেবু ওকে দেবতা দেখে, মামী নিজের ছেলের মত, চম্পাও যদি ওইরকম কোনো নতুন চক্ষে দেখে?

কথাটা ভেবে লজ্জিত হলো চন্দ্রভূষণ। ভাবলো, এ আমি কী পাপ করছি! সেই ছোট্ট থেকে চম্পা আমাকে—

ভাবলো, কেবলমাত্র তুচ্ছ একটু চক্ষুলজ্জায় জীবন নষ্ট করা যায় না। দু' দুটো জীবন! তবু চিঠি লিখতে দ্বিধা হয়, লজ্জা আসে, ভয় করে।

চন্দ্রভূষণের আমলে যে ভাবে ভাবা সম্ভব, যে পদ্ধতিতে চলা সম্ভব, তাই করলো চন্দ্রভূষণ এবং শেষ পর্যন্ত সম্মতি আদায় করলো।

জেঠামশাই বললেন, 'বেশ, তবে অপর কেউ সেই মেয়েকে 'দত্তক' নেওয়ার মত করে আগে গোত্রান্তর করুক, তারপর—'

এই মর্মে চিঠি লিখলেন চন্দ্রভূষণের মা তাঁর ভাইকে।

সে চিঠির উত্তর এলো না।

তবে হয়তো পৌঁছয়নি চিঠি ডাকের গোলমালে, তাই এবার ভাজকে দিলেন, সে চিঠিরও একই ফলাফল।

দু' দুখানা চিঠি পৌঁছবে না? আর যে দুখানাতেই নাকি জীবন-মরণ সমস্যা!

চন্দ্রভূষণ অপেক্ষা করতে করতে অধীর হয়ে উঠে একটা মিথ্যাভাষণ দিল।

বললো, 'একটা চাকরির ইনটারভিউ দিতে কুচবিহার যাচ্ছি। ফিরতে দু'চার দিন দেরি হতে পারে।'

দেরি কেন?

'আহা যাচ্ছিই যখন, একটু বেড়াব না?' চন্দ্রভূষণকে কেউ ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে এমন আশঙ্কা নেই। চন্দ্রভূষণ অতএব 'কুচবিহার' শব্দটাকে সরিয়ে ফেলে অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করলো।

অবশ্যই রাজাশাহী।

•

কিন্তু সেখানে গিয়ে কোন স্মৃতির সুরভি সঞ্চয় করে এনেছিল চন্দ্রভূষণ?

নিতান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদই কি এমন মর্মান্তিক?

আশ্চর্য!

আশ্চর্য!

জগতে তা'হলে বিশ্বাস করবার কিছু নেই? কোথাও কিছু?

'কই আর,' দেবু মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'বিশ্বাস' কথাটাই উঠে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। নইলে চম্পা এই কাজ করে? বাবার মুখে চুনকালি! শীগ্গিরই রিটায়ার করছেন বাবা! অসময়েই করছেন।'

চন্দ্রভূষণ ওর গলার কলার চেপে ধরে ভীষণ স্বরে বলে, 'না, বিশ্বাস করি না আমি! যাচ্ছি মামীর কাছে—'

'এই খবরদার! মার সামনে তার নাম আনিসনি। এমন করে মানুষ করলো মা, আর ও কিনা শেষটায় একটা মোছলমানের ছেলের সঙ্গে—'

'তাকে তুমিই বাড়ির মধ্যে এনেছিলে— 'ক্রুদ্ধ চন্দ্রভূষণ ওর জামার কলারটা আর একবার চেপে ধরে—'সেই পাজী শয়তানটাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ে অন্দরে ঢুকিয়েছিলে। একশোবার সাবধান করে দিইনি আমি? মনে পড়ছে সে কথা? বল্ বল্ কী·হলো শেষ অবধি?'

দেবু এ অপমান সহ্য করে।

কারণ দেবুর মধ্যে রয়েছে এই অভিযোগের অপরাধবোধ। তাই দেবু তার সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়ের জামার কলার চেপে ধরতে পারে না। পারে না চীৎকার করে প্রতিবাদ তুলতে।

দেবু আমতা আমতা করে বলে, 'শেষ আর কি। জন্মাষ্টমীর মেলা দেখতে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, তারপর ভিড়ের মধ্যে থেকে দলছাড়া হয়ে হাওয়া!'

'দলছাড়া হয়ে হাওয়া? তার মানে হারিয়ে গেছে? তবে যে বললি শুয়োর, মোছলমানের ছেলের সঙ্গে—'

'আরে বাবা গলা ছাড়, বলছি সব। আছে প্রমাণ। সেই সন্ধ্যে থেকে জামিরটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না—'

'তার মানেই তাই? দুটো আলাদা আলাদা ঘটনা হতে পারে না?'

দেবু মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'ভেবে আনন্দ পেতে চাইলে হতে পারে। তবে আরো অকাট্য প্রমাণ আছে।

ইদানীং জামিরটার সঙ্গে ফুসফুস গুজগুজের ঘটাটা যা বেড়েছিল—'
'চুপ!'
দেবু থতমত খায়।
দেবু মিনমিনে গলায় বলে, 'বাঃ আমার কি দোষ?'
দেবু মিনমিনে গলায় কথা বলছে!
দেবুর মুখের রেখায় অধঃপতনের ছাপ। তার মানে দেবু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
দেবুর বাবার একটা ভাগ্নে ভেড়ার গোয়ালে থাকলে মানুষ হবে না বলে ভাগ্নেটাকে নিজের কাছে এনে ফেলেছিলেন না দেবুর বাবা?
দেবুর বারণ শোনেনি চন্দ্রভূষণ।
মামীর সঙ্গে দেখা করেছিল। চম্পার নাম মুখে এনেছিল।
মামী যখন শুকনো মুখে বলেছিলেন, 'থাকবে তো দু'দিন?' 'থাকবো, থাকতে হবে—' চন্দ্রভূষণ হঠাৎ অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে স্পষ্ট গলায় বলেছিল, 'চম্পাকে খোঁজার দরকার তো—'
মামী গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'না, আর দরকার নেই। ধরে নাও সে মরে গেছে। হ্যাঁ. সেই কথাই ভাবছি আমি। তোমাকেও ভাবতে হবে মরে গেছে চম্পা।'
চন্দ্রভূষণের সঙ্গে সেই শেষ কথা মামীর।
মামী আর দাঁড়াননি। থাকতেও বলেননি, খেতেও বলেননি।
চন্দ্রভূষণ ওই পাথর হয়ে যাওয়া মানুষটার ধাতব কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত শব্দটা উচ্চারণ করে, 'মরে গেছে, মরে গেছে, ধরে নাও মরে গেছে।'
তার মানে দেবুর কথাই ঠিক।
ঠিক না হলে মামী আছড়ে পড়তো, কেঁদে বলতো, 'তাই কর বাবা চানু, খুঁজে বার কর তাকে।'
মামী তা বলেনি।
মামী জানে আসলে কী হয়েছে।
আর সেই জানার পর মামী ধরে নিয়েছে 'চম্পা' মরে গেছে।
মামার রান্নাঘরের পিছনের সেই বাগানটায় এসে দাঁড়াল চন্দ্রভূষণ। নেহাৎ শশা কুমড়োর বাগান। তবু এ এক পরমতীর্থ ছিল তাদের কাছে। তার আর চম্পার। একদা এইখানেই তো সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল তাদের দু'জনের হৃদয়রহস্য!
চন্দ্রভূষণ ভেবেছিল, সেই জায়গাটায়, যেখানে সেদিন চম্পা বসে বসে গাছের গোড়া খুঁড়ছিল, সেখানটা কুপিয়ে খুঁড়ে পদদলিত করে চলে যাবে জন্মের শোধ, কিন্তু এসে দাঁড়াতেই আর এক হৃদয়রহস্যে সহসা তার আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন চোখ দুটো থেকে একটা তপ্ত বাষ্পোচ্ছ্বাস তরল হয়ে গড়িয়ে পড়ল।
কিন্তু এ জল কি দুঃখের?
না দাহের?
দাহ, বড় তীব্র দাহ!
জ্বলে যাচ্ছে ভিতরটা!
এতটুকু একটা মেয়ে এতখানি অপমান করে গেল তাকে? এতটা প্রবঞ্চনা?
এ যে যতটা অবিশ্বাস্য, ততটা নিষ্ঠুর!
সেই জামিরটা—ইতর ছোটলোক, নীচ পাজী জামিরটা কি না চম্পাকে—আর চম্পা কি না তাকে—
তার মানে চতুর মেয়েটা চন্দ্রভূষণের সঙ্গে ভালবাসার ভান করে এসেছে এতদিন। আর ওই জামিরটার সঙ্গে করেছে ষড়যন্ত্র। অথচ মূর্খ চন্দ্রভূষণ সেই ভানটাকেই পরম সত্য ভেবে হাস্যাস্পদ হয়েছে বসে বসে!
তাই। হাস্যাস্পদই।
এখনও হয়তো জামিরের সঙ্গে বসে চন্দ্রভূষণের বোকামি নিয়ে কত হাসাহাসি করছে ছলনাময়ী মেয়েটা,

'চম্পা' নামের সুন্দর একটি খোলস এঁটে যে এই বাগানে, এই বাড়ীতে, ঘুরে বেড়াতো।

আশ্চর্য, কিছুতেই যেন মিলানো যাচ্ছে না চম্পার সঙ্গে একটা কুলত্যাগিনী মতলববাজ মেয়েকে।

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো চন্দ্রভূষণ, অনেকগুলো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলো, অবশেষে দিশেহারা হলো।

অবিশ্বাসিনীই যদি, তবে সেই শেষ রাত্রের ঘটনাটা কি?

মামা যা বলেছেন তাই?

শুধু অসংযম?

না কি একজনকে কবলিত করতে পারল না বলে আর একজনকে গিয়ে ধরলো?

তবু—সমস্ত বিরুদ্ধ চিন্তা আর তীব্র বিদ্বেষ ছাপিয়ে মনের সামনে ভেসে ভেসে ওঠে—ছাত থেকে নেমে আসা সেই হতাশ হতাশ মুখ, বাগান থেকে ফিরে গিয়ে ঘুরে বেড়ানো সেই অভিমানাহত মুখ।

ভান এত গভীর হয়?

তবে কি এই ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্য দায়ী চন্দ্রভূষণ নিজেই? চন্দ্রভূষণের অবহেলার ফলেই অভিমানের ঝোঁকে এমন একটা ভয়ানক কাজ করে বসলো সে?

কিংবা সবটাই দেবুর বুদ্ধিহীন মস্তিষ্কের কল্পনা? আসলে ও গোলমালের সুযোগে কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করেছে!

অনেকগুলো জলের ফোঁটা চোখের কোলে এসে ভীড় করে, ঝরে পড় পড় হয়, কষ্টে তাদের শুকিয়ে ফেলে চন্দ্রভূষণ।

ভাবে, মিথ্যে আশা করছি, জামিরের সঙ্গে মেশামিশি তো স্বচক্ষেই দেখেছি আমি। জামিরের কাছে নইলে অঙ্ক শেখা হয় না, জামিরের লেখা পদ্য মুখস্থ করতে ইচ্ছে হয়!

খুব একটা আকর্ষণ ছাড়া এসব হয় নাকি?

চম্পা, চম্পা, ছি ছি, তুমি এই!

আমার কথা দূরে যাক, তোমার মাসীমা-মেসোমশাইয়ের কথাটাও ভাবলে না একবার? ভেবে দেখলে না, কী ভাবে মুখ পোড়ালে তুমি তাঁদের!

সেই মামীমা, দেবীর মত মেয়ে, কী দশা করেছো তুমি তাঁর, দেখে গেলে বুঝতে।

কী অদ্ভুতভাবে বদলে গেছেন তিনি।

আমি এসেছি, বুঝলে চম্পা, আমি এসেছি, অথচ আমাকে খেতে বললেন না তিনি, বললেন না 'আয় বোস।'

বললেন না, 'চানু ভাল আছিস তো?'

মামার সঙ্গে সুদ্ধু কথা বলছেন না।

খাওয়া দাওয়াও নাকি প্রায় বন্ধ।

মামা আমাকে কাছে ডেকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, 'তোর মামীর ব্যবহারে কিছু মনে করিস না বাবা! সেই দুর্ঘটনার পর থেকে—কেমন একরকম হয়ে গেছে তোর মামী। শকটা খুব বেশী লেগেছে।'

মামার মুখের রেখায় রেখায় চিন্তা আর বার্ধক্যের ছাপ।

এই ক'টা দিনে মামা এত বুড়ো হয়ে গেলেন!

চন্দ্রভূষণ হতাশ কঠিন অভিযোগ করে, 'এরকম একটা কিছু হবে এ আমি বুঝেছিলাম। যখনই ওই পাজীটাকে বাড়ির মধ্যে এনে আদর করতে দেখেছি, তখনই—'

মামা গম্ভীর ভারী গলায় থামিয়ে দেন ওকে। বলেন, 'ওকথা আমি মানি না চানু! চম্পা যদি ভাল মেয়ে হতো, সৎ মেয়ে হতো, জামিরের কী সাধ্য ছিল তাকে—আসলে ওর মধ্যেই ছিল অসংযম, তাই—'

মামা কথা শেষ করেন না, পায়চারি করতে থাকেন।

আর চন্দ্রভূষণের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে যায়।

ঠিক।

ঠিকই তো!

ওর মধ্যেই ছিল অসংযম।

নইলে জামিরের কী সাধ্য ছিল—

চম্পার অসংযমের কথা এবার মনে পড়লো চন্দ্রভূষণের।

ওর মধ্যে অসংযম না থাকলে সেই রাত্রে চন্দ্রভূষণের ঘরে আসে ও?

এবার সমাজনীতির ছাঁচের মধ্যে থেকে চম্পাকে দেখলো চন্দ্রভূষণ! দেখলো নির্লজ্জ অসংযম!

বাংলাদেশের রক্ষণশীল ঘরের একটা অনূঢ়া যুবতী মেয়ের রাত্রে একজন অনাত্মীয় পুরুষের ঘরে আসবার সাহস হয় কোথা থেকে?

আর কোথা থেকে? নির্লজ্জ বাসনার বেপরোয়া অসংযম থেকে। তার মানে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল চন্দ্রভূষণকে। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন চন্দ্রভূষণকে! হ্যাঁ, মামার গলা দিয়ে ঈশ্বর কথা বলেছিলেন সেদিন!'

যদি ঈশ্বর সদয় না হতেন, যদি তখন মামা না ডাক দিতেন, কী ঘটে যেত কে জানে! কী না ঘটে যেতে পারতো!

নিশ্চয় জামিরটার সঙ্গেও করতে গেছে তেমনি ছলাকলা, আর ওই শয়তানের বংশধর সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছে!

কী ঘৃণা, কী ঘৃণা!

কী লজ্জা, কী লজ্জা!

মন মোহমুক্ত হয়ে গেল।

বিষাক্ত বাষ্পের তীব্র স্পর্শে মিলিয়ে গেল সদ্যোন্মেষিত চম্পার সৌরভ।

বিয়ে না করার ইতিহাস এই।

একটা ষোলো বছরের মেয়ে আর একটা একুশ বছরের ছেলের ইতিহাসও এইখানেই শেষ।

তবু আর কোনোদিন বিয়েতে রাজী করানো গেল না চন্দ্রভূষণকে।

চন্দ্রভূষণের মা মাথা খুঁড়লেন, বাপ জেঠা ধিক্কার দিলেন, ঠাকুমা পিসি বাক্যযন্ত্রণা দিলেন, ছোট বোনেরা মিনতি করলো, দিদি জবরদস্তি করতে চেষ্টা করলো, বন্ধুরা বোঝাতে এলো।

চন্দ্রভূষণ টললো না।

চন্দ্রভূষণ বললো, 'বেশ তো আছি বাবা, সুখে থাকতে ভূতের কিল খাই কেন?'

হাসিখুশী চন্দ্রভূষণ, কৌতুকপ্রিয় চন্দ্রভূষণ, তার স্বভাবের পরিবর্তন হতে দিল না, যা রইলো তার মনের গভীরেই রইলো। সে ওদের সকলের সঙ্গে লড়লো কৌতুকের হাতিয়ার নিয়ে।

হয়তো বা সেই হাতিয়ারটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মানুষের। ঝকমকে মজবুত! সব আক্রমণ ঠেকাতে পারে।

ঠাকুমাকে বললো, 'এই বুড়োবয়সে তোমার একটা খিদমদগার তো দরকার ঠাকুমা, কেনা চাকরটাকে অন্য মনিবের কাছে বিলিয়ে দিতে চাইছ কেন?'

ঠাকুমা বললেন, 'চাকরে দরকার নেই আমার।'

চন্দ্রভূষণ বললো, 'ওরে বাবা, তোমারই বেশী দরকার!'

পিসিমাকে বললো, 'তোমার 'শেষরক্ষা'র ভার আমি নেব ঠিক করেছিলাম পিসিমা, সেটা তা'হলে করতে দেবে না?'

পিসি রেগে বলেন, 'কেন, বিয়ে করলে আর কেউ মা পিসিকে দেখে না?'

'প্রাণ থেকে দেখে না, চক্ষুলজ্জায় দেখে। সে দেখা কি দেখা?'

বোনেদের বললো, 'ভবিষ্যৎকালে বাপের বাড়ি বলে একটা জায়গা তোদের থাকে, এটা বুঝি চাস না?'

ওরা বললো, 'কেন, বিয়ে করেই দরজা বন্ধ করে দেবে?'

চন্দ্রভূষণ বললো, 'আমি দেব কেন, যে দেবার সে দেবে। জানিস্ না—ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত!'

মাকে বললো, 'একটা ছেলে তোমার নিজস্ব থাক্ না মা।'

মা বললেন, 'এ মতি তো আগে ছিল না তোর। বিয়ের জন্যে তো ক্ষেপেছিলি, লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়েছিলি—'

'দুর্মতি হয়েছিল। ভগবান রক্ষা করলেন।'

বাপকে চন্দ্রভূষণ কিছু বললো না, তিনিই বললেন, 'হ্যাঁ, ভীষ্মদেব শুকদেব শুনতে ভাল, নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেই হলো।'

সরাসরি বলেননি, তবু মোড় ঘুরে কথাটা চন্দ্রভূষণের কানে এসে পৌঁছলো বৈকি। চন্দ্রভূষণ ব্যঙ্গের হাসি হাসলো। বোধকরি ভাবলো, 'আচ্ছা দেখো!'

কিন্তু দেখাতে কি পেরেছে চন্দ্রভূষণ?

ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি এই মর্তলোক পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়, চন্দ্রভূষণের সেদিনের অভিভাবকরা দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁদের শুকদেব ছেলে যৌবনটা সব পার করে ফেলে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পা দিয়ে চরিত্র খারাপ করে বসেছে?

লজ্জার বালাই না রেখে নিত্য যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর কাছে এবং সেই যাওয়ার মধ্যে যেন প্রেমে বিভোর নবযুবকের ভঙ্গী।

উদিতা বলে, 'বট্‌ঠাকুর যখন বেলেঘাটায় যাবার জন্যে বেরোন, মুখের ভাবটা কি রকম দেখায় জানো? ঠিক যেন নতুন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কোনো ইয়ং ছেলে! দেখি তো ওপরেব বারান্দা থেকে?'

সুনন্দা হেসে গড়ায়, 'যা বলেছিস, যেন টগবগ করতে করতে চলেছেন!'

ওটাই যে চন্দ্রভূষণের ভঙ্গী, তিনি যখন বাড়ির সব ছোট ছেলে মেয়ে কটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, তখন যে ওই ভঙ্গীতেই যান, যখন মনিব্যাগের পেট ভরতি করে নিয়ে বাজার করতে বেরোন, ভঙ্গীটা যে অবিকল ওই, তা' মনে থাকে না ওদের।

হেসে হেসে ভাসুরের অভিসার যাত্রার নকল করে।

শেফালী অবশ্য হাসে না।

মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'একদিন তো এমন সুবিধে হয় না যে, পিছু নিয়ে গিয়ে দেখে আসি, সেটি কেমন মাল! যার জন্যে মানুষ বুড়োবয়সে জাত খোওয়াতে পারে, ঘৃণা লজ্জা মান সব খোওয়াতে পারে!'

কিন্তু সত্যিই যদি যেত শেফালী, তা'হলে যে আরও মুখ বাঁকাতো, তাতে আর সন্দেহ কি! বলতো, 'এই জন্যে এই! ছি ছি!'

না, বুড়োর মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে এমন রূপ যৌবন নেই চন্দ্রভূষণের নায়িকাব।

স্রেফ সাধারণ! সাধারণ, মাঝারি!

রং গড়ন মুখশ্রী, এমন কি বয়েসটা পর্যন্ত সবই মাঝারি। খুঁজে পেতে দেখলে হয়তো দেখা যাবে চোখ দুটো একটু বড়, হয়তো হাসলে দেখা যাবে হাসিটা একটু মিষ্টি।

তার বেশী নয়।

তা' সেটা আর এমন কি দুর্লভ?

তা' তো নয়, ওটা উপলক্ষ মাত্র।

মূল কারণ প্রকৃতির প্রতিশোধ।

তুচ্ছ একটা ঝোঁকের মাশুল দিতে জীবনকে রেখে এসেছেন বঞ্চিত করে, এখন তার খেসারত দিচ্ছেন। এটাই কারণ।

বঞ্চিত বাসনাই তো ডেকে আনে যত বিকার বিকৃতি!

এসব কথা শেফালীও বলে তার বরের কাছে। কারণ শেফালী অনেক বই পড়ে। পড়ে পড়ে অনেক শিখেছে সে।

তা' বলে হয়তো খুব ভুলও নয়।

চিত্তের বিকার না হলে চন্দ্রভূষণ ওই খারাপ মেয়েমানুষটাকে ডাকেন 'চম্পা' বলে?

অর্থাৎ চিরদিনের ডাকার পিপাসা মেটান!

সে আপত্তি করেছে, অবাক হয়েছে, কারণ জানতে চেয়েছে, অবশেষে হাল ছেড়েছে।

কিন্তু শুধু প্রথমা প্রিয়ার নাম ধরে ডেকে আর কি হবে? প্রথম বয়সের ব্যাকুল আবেগ কোথায় পাবেন? চন্দ্রভূষণের ভাদ্রবৌরা যতই তাঁর অভিসার যাত্রার উন্মাদনার নকল করুক, অর্থহীন প্রেমের কাকলী, অথবা নীরব গভীর হৃদয়গুঞ্জনের ভূমিকা অভিনীত হয় না এখানে।

ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি, নীচতলায় দোকান, পাশ দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। একটা বাচ্চা চাকর বসে থাকে সেখানে, সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়। চন্দ্রভূষণও উঠে যান সেই সিঁড়ি দিয়ে।

উঠে আসেন স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে। নিজের ঘরবাড়ির মত জুতোটা খোলেন সিঁড়ির ধারের র‍্যাকে, আর ঠিক এই সময় চন্দ্রভূষণের কলঙ্কনায়িকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হাস্যবদনে।

কিছু বলে না, শুধু এসে দাঁড়ায়, শুধু হাসে । আর তখনই মনে হয় হাসিটা খুব সুন্দর তো। এখনো, এই বয়সে আছেও সুন্দর।

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'চম্পা!'

ও বলে, 'আজ্ঞে বলুন।'

'বলছি না কিছু, শুধু বলছি এত পা টিপে টিপে আসি, তবু টের পাও কি করে বল তো?'

কে জানে কি নাম তার, নতুন নামকরণ হয়েছে যার চম্পা, সে হেসে বলে, 'কি করে টের পাই নিজেই জানি না। কিন্তু পা টিপে টিপে আসবার হেতু?'

'তোমায় ঠকাবার ইচ্ছে!'

'ইচ্ছেটা সফল করতে পারছো না?'

'কোনো দিন না।'

চন্দ্রভূষণ কথায় জোর দেন। যেন কোনো একদিনও ওকে ঠকাতে না পেরে নিতান্ত ক্ষুব্ধ।

ওর যখন নাম জানা নেই, আর ওকে যখন 'মহিলা'টিও বলতে বাধছে, তখন নাহয় ওকে চন্দ্রভূষণের দেওয়া নামটাতেই ডাকা হোক! বলা হোক চম্পা!

চম্পা এই ক্ষোভ দেখে হেসে উঠে বলে, 'বেশ একদিন ঠকবো।'

'দূর, বলে কয়ে ঠকায় আবার মজা আছে নাকি?'

'তবে আর হলো না। টের আমি পাবোই।'

'সত্যি আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য পরে হয়ো, চলো বসবে চলো। তোমার প্রত্যাশায় চায়ের জল তিনবার গরম হলো, তিনবার ঠাণ্ডা হলো।'

'খাওনি তো একবারও? খেলে পারতে!'

'থাক্ খুব ভদ্রতা হয়েছে।'

'দেখ, এটা কিন্তু খুব অন্যায় তোমার,' চন্দ্রভূষণ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'রোজ বলি তুমি ঠিক সময়ে একবার চাটা খেয়ে নেবে। পরে বরং—আমার কি সবদিন ঠিক ঘড়ির কাঁটায় আসা হয়? তাছাড়া বৌমাদের পাল্লায় পড়ে আমাকে তো খেতেই হয় একবার চা! এটা বাড়তি!'

'বাড়তিটাই মিষ্টি—' নকল চম্পা মিষ্টি হেসে বলে, 'যেমন মাইনের থেকে এলাউয়েন্স, টাকার থেকে সুদ, ন্যায্যের থেকে ঘুষ!'

কথা বেশ বলতে পারে মেয়েটা।

আর পারবে নাই বা কেন? কথাই তো ওদের জীবিকা।

চন্দ্রভূষণ যে ঘরটায় এসে ঢোকেন, সেটাই শোবার এবং বসবার ঘর, কারণ সেটাই একমাত্র ভাল ঘর। পাশের ছোট ঘরটায় ভাঁড়ার থাকে, আর নাকি চম্পার পুজোর ঠাকুর থাকে।

ঠাকুর রাখাটাও নাকি এদের একটা পদ্ধতি। চম্পাই বলেছিল সে কথা, 'ঠাকুরঘর একটা দরকার বৈকি, ঠাকুর না থাকলে চলবে কেন? ওটা আমাদের চাইই চাই। পাপের ভরা নামাবার ঠাঁই।'

ভেজানো দরজার ওপারের ওই ঘরটায় চন্দ্রভূষণকে কোনোদিন উঁকি মারতে দেয়নি চন্দ্রভূষণের চম্পা। চন্দ্রভূষণ একদিন তো প্রায় জোরই করেছিলেন, 'দেখি না তোমার ঠাকুর—'

চম্পা মৃদু হেসে দরজায় হাত রেখেছিল, 'পাগল। গুরু আর ইষ্ট—ও কি কারুর সামনে প্রকাশ করতে আছে?'

'আমিও তা'হলে 'যে কেউ'য়ের দলে?'

অভিমানে মুখ ভারী হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রভূষণের।

হ্যাঁ, এমন অদ্ভুত ধৃষ্টতাই করে বসেন চন্দ্রভূষণ। অথচ এইতো ক'দিনের দেখাশোনা! হঠাৎ একদিন রেলগাড়িতে দেখে ভাল লেগে গেল, ভার নিয়ে বসলেন তার। এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন এই বাড়িটিতে। নীচতলার ওই হার্ডওয়ারের দোকানটাও বসিয়েছেন চন্দ্রভূষণই। তাতে আর একজনকে পোষা হতো। ইদানীং আবার ইলেক্‌ট্রিকের সরঞ্জামও রাখছেন কিছু কিছু, ওই দোকানের আয়েই যাতে চলে যায় মেয়েলোকটার। যাতে না আর অন্নচিন্তায় উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হয়।

শুভদৃষ্টি বড় সর্বনেশে জিনিস, তা' নইলে, চলন্ত রেলগাড়ির কামরায় সেই 'দেখা'র ফল কিনা এই!

হয়তো ওই মানুষটাও উঞ্ছবৃত্তি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই বলেছিল, 'কেউ যদি এমন ভার নেয়, তো বেঁচে যাই বর্তে যাই! লোক ঠকাতে সাধু সেজে বেড়াতে বেড়াতে কাহিল হয়ে গেছি।'

তা' কথাটা সত্যি।

রেলগাড়িতে ওর পরনে ছিল গেরুয়া।

ও বলেছিল, 'গেরুয়া ধারণে ট্রেনের টিকিট লাগে না, সেকথা জানা নেই আপনার? আশ্চর্য তো! আমাদের ভারতবর্ষের এতবড় একটা খবর, রেল কোম্পানির এমন একটা বদান্যতা, জানা ছিল না?'

সত্যিই হয়তো জানা ছিল না চন্দ্রভূষণের, অথবা জেনেও না জানার ভান করছিলেন। তবে সেবারের সেই যাত্রাটা যে চন্দ্রভূষণের নিতান্ত অযাত্রা হয়েছিল তা'তে আর সন্দেহ কি!

চন্দ্রভূষণ অবশ্য কবিত্ব করে বলেন, 'ওটাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্রা।'

কবিত্বটবিত্ব একটু বোঝে মেয়েমানুষটা, তাই না এত শখ চন্দ্রভূষণের।

কিন্তু কবিত্ব বাদ দিলে, অযাত্রা ছাড়া আর কি?

গিয়েছিলেন চন্দ্রভূষণ ব্যবসার সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে, ফেরার সময় ওই ঘটনা। ওই অতি সাধারণ চেহারার এক গেরুয়াধারিণী, গেরুয়াটা যার ভেক মাত্র, তাকে দেখে মন কেন বলে উঠলো, 'এই তো সেই! একেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি জীবনভোর!'

তাই এক মুহূর্তে বলে উঠলেন, 'এসো আমার সঙ্গে'—

'এসো আমার সঙ্গে—'

তার মানে, নিয়ে এসো কলঙ্ক, নিয়ে এসো লজ্জা, নিয়ে এসো অখ্যাতি! আর নিয়ে এসো নেশার সুখ! এসেছে সেই সব।

তবে?

অযাত্রা ছাড়া আর কি?

অথবা সুযাত্রা!

যে কাজে গিয়েছিলেন সে কাজে বেশ সাফল্য হ'ল দেখে মনটা বেশ ভাল ছিল, সেকেণ্ড ক্লাশ একটা কামরায় চড়ে আসছেন, হঠাৎ চোখে পড়ল সিটের একেবারে শেষ প্রান্তে জানলার ধারে এক গেরুয়াধারিণী

বৈষ্ণবী। নাকে তিলক কাটা, গলায় কণ্ঠি, হাতে এক গেরুয়ার পুঁটুলি।

ও কে?

ও কখন উঠল?

আগে থেকে উঠে বসেছিল, না চন্দ্রভূষণের চোখ এড়িয়ে চোখের সামনে দিয়ে—

চন্দ্রভূষণের মনে হ'ল এই বৈষ্ণবী যেন তাঁর চির চেনা।

পূর্বজন্ম মানবেন চন্দ্রভূষণ? ভাববেন কোন এক অতীত জন্মে ও চন্দ্রভূষণের নিকট-আত্মীয় ছিল? তা নইলে কেন এমন হচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে এগিয়ে এগিয়ে ওর কাছে গিয়ে বসি?

চন্দ্রভূষণ একটা সভ্য-ভব্য শিক্ষিত ভদ্রলোক। চন্দ্রভূষণের চলন-বলন, সাজ-সজ্জা, সবকিছু মার্জিত পরিচ্ছন্ন, অথচ চন্দ্রভূষণ একটা ভেক নেওয়া বৈষ্ণবীকে দেখে আকৃষ্ট হচ্ছেন, এর চাইতে আশ্চর্য ঘটনা আর কি আছে?

অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন নিজেকে নিবৃত্ত করতে, শেষ অবধি চেষ্টা পরাজিত হ'ল। সুযোগও এল, বোষ্টমীর সামনে বসা লোকটা উঠে গেল। চন্দ্রভূষণ লোক-লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে সেই খালি সিটটায় বসলেন।

আর লোকলজ্জাই বা কি?

রেলগাড়ীতে সর্বক্ষণই তো এ ঘটনা ঘটছে। যারা মাল মোটের ভারে বিব্রত, তারা হয়তো একবার পেয়ে যাওয়া জায়গাটি ছাড়ে না। কিন্তু যারা ঝাড়া হাত পা, তারা তো করছেই এখান ওখান। জানালার ধারটি পেলে তো কথাই নেই।

অতএব লোকলজ্জারও প্রশ্ন নেই।

তা' তারপর যদি কথাই শুরু করে থাকেন, তাতেই বা কে তাকাচ্ছে? 'গেরুয়ার প্রতি মোহ বহু লোকেরই থাকে, চেনা হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই কেউ চোখ ফেলল না চন্দ্রভূষণের উপর।

চন্দ্রভূষণ নিরঙ্কুশ প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনি?'

ও প্রথমে বলেছিল, 'কী সর্বনাশ, এ যে জবর প্রশ্ন! 'আমি কে' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই তো কোটি বছর পার করে ফেলল মানুষ, তবু পাচ্ছে না উত্তর। আর আমি চট করে উত্তর দিয়ে বসবো?'

'বাজে কথা রাখুন,' চন্দ্রভূষণ প্রায় ধমকে উঠেছিলেন, 'বলুন আপনি কে?'

বৈষ্ণবী তখন বলেছিল, 'তা' সেকথা যদি আমার জানাও থাকে, আপনাকে বলতে যাব কেন?'

তারপর কথার পিঠে কথা চড়তে তাকে। আশ্চর্য যে, বৈষ্ণবী রাগ করে ওঠে না। হয়তো—বৈষ্ণবী বলেই করে না। আর চন্দ্রভূষণও ক্লান্ত হন না। চন্দ্রভূষণই কথার জনক।

অনেক কথার বিনিময় হবার পর চন্দ্রভূষণ বলে ওঠেন, 'আপনি' বলে মরছি কেন, আশ্চর্য তো! শোনো আমি তোমায় চিনেছি।'

বৈষ্ণবী হেসে উঠে বলে, 'সেরেছে! একেবারে চি-নে-ছি! ভদ্রলোকের ভারী অহঙ্কার তো! মশাই, নিজেকে চেনেন? নিজে কে? ফস্ করে ঘোষণা তো করে বসলেন, চিনেছি!'

চন্দ্রভূষণ সমীহ করলেন না।

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'এযে দেখি গেরুয়ার মলাটে একটা অপাঠ্য বই! এ স্রেফ বটতলা!'

বৈষ্ণবী এবার চটেছিল।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বলেছিল, 'বাবু মশায়, এই বটতলার বইখানা পড়তে তো কেউ সাধেনি আপনাকে?'

চন্দ্রভূষণ পুলকিত হয়েছিলেন।

চন্দ্রভূষণ বুঝেছিলেন, এই ফোঁটা তিলক কাটা বৈষ্ণবী নেহাৎ নিরক্ষর নয়।

তাই চন্দ্রভূষণ জায়গাটা থেকে নড়বার নাম করেননি, বরং আরো যেন গুছিয়ে বসে বলেছিলেন, 'বলে না কেউ, তবু অপাঠ্যের দিকেই ঝোঁকা মানুষের রীতি।'

বৈষ্ণবী জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তীব্র কণ্ঠে বলেছিল, 'ওঃ তাই! তাই বাবুর এমন নেক নজর! ভাবছেন, রসের বোষ্টুমী ঘেঁসে এসে বসলেই গলে যাবে, কেমন? আর আমি ভাবছিলাম বাবুর বুঝি গেরুয়ায় ভক্তি।.....তা' আপনার মত বাবু ভদ্দরলোকের একটা ভিখিরি বোষ্টুমীর সঙ্গে বসে গালগল্প করলে নিন্দে হবে না? কে কখন দেখে ফেলবে—'

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'আমি অত নিন্দে সুখ্যাতির ধার ধারি না।'

'সে কি কথা বাবু'—প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীর চোখে যেন তরুণীর চোখের আগুন ঝলসে ওঠে, 'এ যে বড় তাজ্জব কথা বলছেন! লোক নিন্দের ভয়ে স্বয়ং রামচন্দ্রই সীতাকে ত্যাগ করলেন—'

'রামচন্দ্র?' চন্দ্রভূষণ জোরের সঙ্গে বলেন, 'এ যুগে কেউ রামচন্দ্রের ওই কাজটাকে সমর্থন করে না।'

বৈষ্ণবী কেন এই সাধারণ কথায় এত জ্বলে ওঠে? কেন এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সে?

কারণ বোঝা যায় না। শুধু দেখা যায়, তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, 'ওসব হচ্ছে ছেঁদো কথা। সমাজের মন এখনও সেই ত্রেতাযুগেই অচল আছে। এখনও মেয়েমানুষকে পুরুষের সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু ভাবা হয় না, এখনও মেয়েমানুষের মূল্য মাটির পাত্রের থেকে বেশী নয়। তার জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয়, একবার যদি কেউ উচ্ছিষ্ট করে দিয়ে গেল তো, দূর করে ফেলে দাও আঁস্তাকুড়ে।'

চন্দ্রভূষণ সচকিত হলেন।

চন্দ্রভূষণ চোখের চশমাটা একবার খুললেন আর একবার পরলেন, তারপর বলে উঠলেন, 'অস্বীকার করে লাভ নেই। তোমায় চিনে ফেলেছি আমি। তোমাব নাম চম্পা।'

বৈষ্ণবী আকাশ থেকে পড়ল।

বৈষ্ণবী চোখ গোল করলো।

তারপর বললো, 'বাবুর বোধকরি একটু নেশাভাঙের অভ্যাস আছে।'

চন্দ্রভূষণও আশ্চর্য, তবুও চটলেন না।

বললেন, 'যে কথা বলেই ধাঁধাঁ লাগাতে চাও, আমি চটছি না, ধাঁধাঁয় পড়ছি না।'

'সে আপনার মর্জি! ধাঁধাঁয় পড়বো না, এমন অহঙ্কারের কথা শুনতে বেশ মজাদার!'

'বেশ তবে তুমি বল তোমার নামটা কি?'

ও বলেছিল, 'সন্ন্যাসিনীদের কি নাম বলতে আছে?'

'বলতে নেই?'

'না।'

'গেরুয়া তো তোমার ছল।'

'ছলনাই তো জীবন আমাদের।'

'বেশ, আমি একটা নামকরণ করি?'

বলেছিলেন বুড়োধাড়ী চন্দ্রভূষণ।

বাড়িতে যাঁর তিন তিনটে ভাদ্রবৌ।

এরা যে বলে 'ডাকিনীর মায়া', বলে 'মোহিনী মন্ত্র', ভুল বলে না।

গেরুয়ার আবরণে মোহিনীই তো! নইলে ওই সাধারণ চোখে অমন অসাধারণ কটাক্ষ হয়? সেই কটাক্ষের সঙ্গে বলেছিল, 'নামকরণ? অক্লেশে! একটা কেন, একশো আটটাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু যে দু'দণ্ডের পথের সাথী, তার নাম নিয়েই বা এত মাথাব্যথা কিসের?'

'দু'দণ্ডের যদি না হয়?'

বলে ফেললেন অবোধ চন্দ্রভূষণ।

এককালে যে নাকি মেধাবী ছাত্র ছিল, ছিল বুদ্ধিমান চটপটে। কারবার করতে করতে ভোঁতা হয়ে গেছে লোকটা, তাতে আর সন্দেহ কি?

তিলককাটা বৈষ্ণবী লহরে লহরে হেসে উঠলো। বললো, 'বলেন কি বাবু, এ যে বড় সর্বনেশে কথা। এটাই আপনার স্বভাব নাকি?'

চন্দ্রভূষণ আর একবার চশমা খুললেন, চশমা পরলেন। দেখলেন আরো একবার, তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন.......

ও কি শুধু আমাকে ব্যঙ্গ করতেই এমনটা করছে, না কি সত্যিই এমন হয়ে গেছে ও? এমন বাচাল, বেহায়া, আর বেপরোয়া!

হয়তো তাই।

দু'যুগ পার হয়ে গেছে, কত ঘাটের জল খেয়েছে, এখনো সেই কচি কুসুমটি থাকবে এ তো আশা করাই অন্যায়। কিন্তু তাই বলে, ও বদলে গেছে বলে আমি ওকে ফেলে চলে যাব? নেমে যাব নিজের মনে?

তার মানে ইহ জীবনে আর দেখা হবে না!

না না, সে হয় না, একবার ভুল করেছি আর করবো না। ওকে ধুলো ঝেড়ে তুলে নেব। কিন্তু ও তো স্বীকার পাচ্ছে না।

তবে কি আমারই ভুল?

আমি কি শুধু একটু সাদৃশ্য দেখে—

আবার ভাবেন, অসম্ভব! ভুল হতেই পারে না। বাইরের ভাবভঙ্গী সাজ-সজ্জা যাই বদলাক, কাঠামো বদলায় না। আর বদলায় না—

জুৎসই শব্দ খুঁজে পেলেন না চন্দ্রভূষণ, শুধু ভাবতে লাগলেন, আর বদলায় না সেই বস্তু, যার নাকি সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সেটা মুখে থাকে, না চোখে থাকে, নাকি চামড়ার নীচেয় থাকে, কে জানে! তবু সেইটাই অবিকৃত থাকে। ও চম্পা!

'বাবু মশায়ের রাগ হ'ল না কি?'

বৈষ্ণবী নিজেই সেধে ডেকেছিল।

চন্দ্রভূষণ ফিরে তাকিয়েছিলেন।

চন্দ্রভূষণের চোখটা লাল লাল দেখাচ্ছিল। আর মুখের চেহারায় একটা জিদের ভাব ফুটে উঠেছিল।

বৈষ্ণবী বলেছিল, 'আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কাকে কি বলে বসি জ্ঞান থাকে না, অপরাধ নেবেন না। কথাটা না হয় ফেরতই নিচ্ছি।'

'ফেরৎ নেওয়ার দরকার নেই। ধরে নাও ওই আমার স্বভাব। তবে আমি যা সংকল্প করি, তার নড়চড় হয় না। শুধু জীবনে সেই একবারই ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে—দেবু আমায় পরে সব বলেছে।'

কিন্তু এবার চন্দ্রভূষণকে সত্যিই থতমত খেতে হয়।

বৈষ্ণবী অবোধ দুই চোখ তুলে বলে, 'দেবু? দেবু কে? কি বলেছিল সে? আমি তো বাবু কিছু বুঝতে পারছি না?'

'কিছু বুঝতে পারছো না তুমি? দেবুকে চেনো না? রাজশাহীর দেবু?'

বৈষ্ণবী বলে উঠেছিল, 'বাবু রঙ্গে আছেন বলায় তো রাগ করলেন, কিন্তু এসব কি কথা বলুন? সাতজন্ম যে নামধাম জানি না, জবরদস্তি চিনতে হবে তাদের?'

চন্দ্রভূষণ ভাবলেন, ঠিক আছে, নেমেই যাবো। পথের দেখা পথেই মিলোক, আর কথায় কাজ নেই। এই রইলাম চুপ করে।

কিন্তু পারলেন কই?

একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'পরেছ গেরুয়া, অথচ অনর্গল মিথ্যে কথা বলে চলেছ।'

'কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা' কি নির্ণয় করা সোজা বাবু? কত নদী পার হয় মানুষ, কত পাহাড় ডিঙোয়, কত তাঁবু খাটায়, কোনটা যে সত্যি—জল, না স্থল, না ঘর, তা সে কি নিজেই জানে?'

চন্দ্রভূষণ নির্নিমেষে একটু তাকিয়ে অভিভূত গলায় বলেছিলেন, 'এ সব কথা তুমি শিখলে কোথায়?'

'ওমা, এই এতখানি বয়েস হলো, দুটো কথাও শিখবো না? আমাদের 'সখীকুঞ্জের' গুরুগোঁসাই যে কথার সাগর গো! তাঁর আশ্রয়ে থাকতে থাকতে বোবারও বোল ফুটলো!'

'তা' বলে বোবা তুমি ছিলে না কখনো—' যেন রেগে রেগে বলে ওঠেন চন্দ্রভূষণ, 'কথায় চিরদিন ওস্তাদ।'

বৈষ্ণবী এবার গালে হাত দেয়, 'তাই বলুন, বাবু হচ্ছেন গণৎকার! এতক্ষণ বলতে হয় সে কথা!'

চন্দ্রভূষণ এবার প্রায় চড়া গলায় বলেন, 'না বলে পারছি না—তুমি বড় বাচাল হয়ে গেছ।'

বৈষ্ণবী সচকিত ভঙ্গীতে বলে, 'আস্তে বাবুমশাই, লোকে কান করছে, চোখ ফেলছে। ভাববে বাবুর সঙ্গে বুঝি আমার আগের কোনো সম্পর্ক ছিল। 'সখীকুঞ্জে'র অষ্ট প্রহরের বোষ্টুমী, সামাজিক মান মর্যাদাটা তো জোরালো নয় তার?' এক সকাল থেকে পরদিন সকাল অবধি নাম গান হয়, একশো আট নাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই নাম।'

পরিচয় পাওয়া গেল।

নবদ্বীপের 'সখীকুঞ্জে'র বৈষ্ণবী।

নামগানের বিনিময়ে ভাত কাপড় জোটে।

পুণ্যটা কুঞ্জের মালিকের, ভাড়াটে নাম-গাইয়েদের ওই ভাত কাপড়ের উপর 'ফাউ' লাভ হচ্ছে 'রসনাশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি'।

আর ক্রমশঃ রীতিমত চিত্তশুদ্ধির পরিচয় দিতে পাবলে 'গেরুয়া'!

চাইতে হবে সেটা মালিকের কাছে।

ও নাকি চেয়েছিল।

তবে শুদ্ধিটুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নয়। শুধু বুদ্ধির জোরে।

বলেছিল, 'শাদা কাপড় বড্ড ময়লা হয়ে যায় মহারাজ, গেরুয়ায় সুবিধে। দিয়ে দিন না।'

তাক্ মাফিক বলতে পারলে সব হয়, এ তো শুধু শাদার বদলে গেরুয়া!

তা' নাম একটা ছিল বৈকি।

সখীকুঞ্জে অষ্টসখীর নাম হচ্ছে বাধ্যতামূলক। কাজেই সেখানে 'বড় বিশাখা, ছোট বিশাখা, বড বৃন্দা, ছোট বৃন্দা। ললিতার আবার মেজ সেজও আছে। এর নাম ছিল 'ছোট ললিতা'।

মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, 'মনের ময়লা ত্যাগ করে তবেই গেরুয়া নিতে হয় ছোট ললিতা!'

ও বলেছিল, 'ত্যাগের চেষ্টাই তো করছি মহারাজ!'

কিন্তু কে জানতো, 'সখীকুঞ্জটা'ই ত্যাগ করবার চেষ্টায় ছিল ছোট ললিতা। গেরুয়াদের রেলের টিকিট লাগে না, গেরুয়াদের ইহজগতের অনেক টিকিট হাতে এসে যায়, তাই মহারাজকে ভুলিয়ে আদায় করে নিল দু'সেট গেরুয়া!

শাড়ি, সেমিজ, চাদর।

ব্যস, পরদিন আর ছোট ললিতাকে নামগানের আসরে দেখা গেল না।

কি হলো?

অসুখ?

কিন্তু অসুখ যদি তো ওর বাসা শূন্য কেন?

কোথায় গেল ঝাঁপি, কোথায় গেল পুঁটলি?

কোথায় গেল রান্নার বাসন?

উনুনটাই শুধু পড়ে আছে।

তাও নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত।

ছোট ললিতা যেন তার এই পরিত্যক্ত জীবনের সাক্ষী ওই উনুনটার উপরই আক্রোশ ফলিয়ে চলে গেছে।

ছোট ললিতা মহারাজজীর বিশেষ প্রিয় শিষ্যা বলে ঈর্ষা ছিল আর সকলের, তাই বিস্ময়ের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো বড় ললিতা, মেজ ললিতা, আর বড় বিশাখা, ছোট বিশাখারা।

কিন্তু চন্দ্রভূষণের কাছে নিজের সেই নামটা প্রকাশ করলো না ছোট ললিতা, বললো, 'নতুন নামকরণ? অক্লেশে।'

হয়তো ভাবলো, যতবার মনিব বদল হচ্ছে ততবারই তো নাম বদল হচ্ছে, ওতে আর ভাববার কি আছে?

নয়তো বা ভাবলো, ও নিয়ে আপত্তিটা হাস্যকর।

তাই বললো, 'একশো আটেও আপত্তি নেই।'

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'আটও নয় শতও নয়, শুধু এক। ওইটাই বলবো একশোবার করে। নাম দিচ্ছি 'চম্পা'।'

আশ্চর্য!

মিলিয়ে গিয়েছিল তো কোন্ কালে চম্পার সৌরভ, তবু ওই নামটাই ইচ্ছে হলো চন্দ্রভূষণের।

ছোট ললিতা বললো, 'আমাকে 'এসো তুমি' বলে ডাকলেই নাহয় আমি হাত ধুয়ে বসলাম, কিন্তু আপনার দশা কি? বয়েস হয়েছে, সমাজে মানসম্মান আছে, বৌ ছেলে আছে—'

'বৌও নেই ছেলেও নেই!' চন্দ্রভূষণ হেসে উঠেছিলেন, 'ওদিকে শূন্যি!'

'ওঃ বৌ বুঝি মরেছে? আর—ছেলে মেয়ে হয়নি?'

চন্দ্রভূষণ মৃদুগম্ভীর হাস্যে বলেন, 'বৌ মরেনি, বৌ শুধু হারিয়ে গিয়েছিল। তবে হুকুম জারি হয়েছিল যেন জপ করি 'মরেছে মরেছে।' অতএব মরেছে। কাজেই ছেলের প্রশ্ন নেই।'

'সে জপ করা হয়েছিল?'

'সে আর বলতে? আজীবন!'

'যাক শুনে বাঁচলাম। থাকা হয় কোথায়?'

'সেটা অবশ্যই বাড়িতে। ঠাকুদ্দার ভিটেয়।'

'আছে কে আর?'

'ছোট তিন ভাই, তাদের তিন বৌ, ছেলে মেয়ে।'

'তিন ভাদ্রবৌ, ওরে সর্বনাশ!' ছোট ললিতা ভয়ের ভান করে, 'অবস্থা বড় খারাপ! কী বলবে তারা, এখন এ বয়সে মেয়েছেলে পুষলে?'

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'পোষবাব জিনিস পুষতে চাইলে কেউ যদি আপত্তি করে, নাচার!'

'ভাবছি—'

'কী ভাবছো?'

'ভাবছি বিনি খাটুনিতে নিশ্চিত অন্ন, বিনি নামগানে নিশ্চিত আশ্রয়, এটা ত্যাগ করবো? বড় বোকামি হবে না?'

'হবে।'

'তবে নাহয় আপনার সঙ্গেই যাই।'

'যাই নয়, আসি।'

সেই আসা!

নবীন উৎসাহে বাসা গোছ করেন চন্দ্রভূষণ, নবীন উৎসাহে সংসার পাতার সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন, ছোট ললিতা নতুন জন্ম আর নতুন নাম পরিগ্রহ করে ঢুকে পড়ে সেই সংসারে।

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'গেরুয়া চলবে না।'

চন্দ্রভূষণের চম্পা বললো, 'ছাড়তে পারলেই তো বাঁচি। চওড়া লালপাড় শাড়ি পরে ঘরসংসারী কাজ করে বেড়াচ্ছি, এ সাধ জন্মাবধি।'

হঠাৎ চন্দ্রভূষণ একটা কাজ করে বসেন। সন্ন্যাসিনীর একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'শুধু ঘরসংসারী কাজ করে বেড়ানোর সাধ? ঘরসংসারের সাধ নেই?'

সন্ন্যাসিনী হেসে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'বুদ্ধিমান বামনরা চাঁদে হাত দিতে চায় না।'

'আর চাঁদ যদি ইচ্ছে করে হাতে নেমে আসতে চায়?'

বললেন চন্দ্রভূষণ আবেগের গলায়।

বোধকরি ভুলে গেলেন, পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়েস হয়েছে তাঁর।

গেরুয়া হেসে উঠে বলে, 'চাঁদ এমন অবোধই বা হবে কেন?'

'চম্পা!'

চম্পার নামে নামকরণ যার, সে যেন চম্পার চোখেই তাকায়। ওরও যে অমন তাকানোর বয়েস নেই, তা ভাবে না।

'চম্পা, বহুকাল আগে বৌ হারিয়ে গিয়েছিল, বৌয়ের সাধ মেটেনি, ইচ্ছে হচ্ছে সে সাধ মেটাই, সম্মান, সম্ভ্রম, অধিকার দিই তোমায়!'

'সর্বনাশ! ইচ্ছে হলেই হলো? সম্মান, সম্ভ্রম, অধিকার—'

ও সহসা হেসে উঠে বলে, 'শব্দগুলো ভয়ানক ভারী, ঘাড়ে সইবে না। হালকা ঘাড় নিয়ে, রেলের টিকিট ফাঁকি দিয়ে দিয়ে চলা অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভটাই সহজ মনে হচ্ছে।'

চন্দ্রভূষণ কিছুক্ষণ ওই বহু অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া মাঝারি বয়সের মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'এত কথা শিখলে কোথায়?'

'কেন, সখীকুঞ্জের আখড়ায়।' ও হেসে ওঠে, 'কথারই চাষ যে সেখানে! কথার সিঁড়ি গেঁথে গেঁথেই স্বর্গে ওঠা!'

তা' হয়তো এ একটা মস্ত উপকার করছে 'সখীকুঞ্জে'র আখড়া। অনেক কথা শিখিয়েছে একটা ভেসে বেড়ানো পথের মেয়েকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আখড়ায় পুরে ফেলে।

কথার চাষই বটে।

ধর্মকথা, দার্শনিক কথা, রহস্যময় কথা, আবছা ধোঁয়াটে রসের কথা, কথার শেষ নেই।

সেই 'কথা'র সঞ্চয় নিয়ে এসেছে ছোট ললিতা।

কথাই তো আসল।

কথাই তো আকর্ষণ রজ্জু।

ওতেই প্রকাশ, ওতেই বিকাশ, ওতেই ব্যঞ্জনা।

ব্যঞ্জনাহীন সৌন্দর্যের মূল্য কি?

কথায়-দরিদ্র রূপসীর থেকে অনেক বাঞ্ছনীয়া ভাষায় ঐশ্বর্য্যবতী রূপহীনা।

তাই চন্দ্রভূষণ ওই বাক্যশালিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

চন্দ্রভূষণের মন যায় হারিয়ে।

অনেক অনেক বছর আগে ফেলে আসা একটা দিনের চারপাশে আছড়ে মরে সে মন।

ছোট ললিতাকে 'চম্পা' বলতে সাধ হলো কেন চন্দ্রভূষণের?

এখন কি মনে হয় 'চম্পা' নামের সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটার ওপর অবিচার করে এসেছেন চিরকাল? তাকে খোঁজা উচিত ছিল? উচিত ছিল ক্ষমা করা?

ছোট ললিতা বলে, 'মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে গল্প কর দিকি! শুনি তোমার ছোট ভাইয়েব ব্যাপারটা। বদলীই হলো তাহলে?'

চন্দ্রভূষণের মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ে।

একদা যে নিজেই চন্দ্রভূষণ ভাবতেন, যেখানেই কাজ করি কলকাতায় কদাচ না, কলকাতায় থাকলেই বাড়িতে থাকতে হবে—সে কথা মনে পড়ে না বলেই ওই ছায়াটা পড়ে।

সেই ছায়া-ছায়া মুখে বলেন চন্দ্রভূষণ, 'হলো বৈকি! সামনের সোমবারে রওনা দেবে।'

'তা' ভালই তো—ছোট ললিতা বলে, 'বদলী হলেই উন্নতি—'

'নাঃ চম্পা, ওইখানেই মজা। ও নাকি বদলী হয়ে নীচু পোস্টে চলে যাচ্ছে ইচ্ছে করে, আর একজনের বদলে।'

'কে আবার একথা বললে তোমায়?'

'বললে? যে ছেলেটির বদলী রদ হলো, সে বলে গেল কৃতজ্ঞতা জানাতে। বিন্দু তখন বাড়ি ছিল না, আমাকেই বললো। বললো, 'এমন মহানুভব! আমার বদলী হওয়ায় অসুবিধে রয়েছে বলে নিজে যেচে—'

'তা সেটাই ভাবো না—' ছোট ললিতা সহজ গলায় বলে, 'ভাবো না আমার ভাই মহানুভব। তোমার কাছ থেকে চলে যাবার জন্যেই স্বেচ্ছায় একথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ কেন?'

'সেটাই যে সত্যি কথা,' চন্দ্রভূষণ বলেন, 'যখন তখন সেই কথারই আভাস পাই যে!'

তা' সত্যি, সেই আভাসই ঝিলিক দিয়ে ওঠে আজকাল যখন তখন। উদিতা আর চন্দ্রভূষণের তাঁবে বৌগিরি করে থাকতে রাজী নয়। আর শুধু তো চন্দ্রভূষণই নয়, শেফালী নেই? সুনন্দা নেই? মাথার উপর এতগুলো লোক নিয়ে কী সুখ জীবনে? উদিতার যেদিন শুধু বরটির সঙ্গে দুটি দামী সিটে বসে বিখ্যাত একটি বিলিতী ছবি দেখতে ইচ্ছে করে, ঠিক সেদিনই হয়তো জা-ননদ ভাগ্নে ভাগ্নী ইত্যাদি করে একটা রেজিমেন্টের সঙ্গে একটাকা চল্লিশের সিটে বসে একখানা অখাদ্য বাংলা ছবি দেখে আসতে হয়।

কারণ, তার উদারচিত্ত আমুদে ভাসুর সকলকে নিয়ে আমোদ করে উল্লসিত হচ্ছেন।

উদিতার যেদিন ইচ্ছে হয় নিজের ছেলে দুটিকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে যাবে, এবং ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবে, ঠিক সেইদিনই হয়তো ভাসুর বাড়ির সবকটা বাচ্চাকে নিয়ে সার্কাস দেখাতে কি স্টীমারে বেড়াতে, একজিবিশন দেখাতে, কি পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়বেন।

'ঠিক সেইদিনটা' যে হাতগোনার ব্যাপার তা' অবশ্য নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে সুবিধাজনক ছুটির দিনটি তাক্ করেই তো সকলের আমোদ প্রমোদের চিন্তা।

এছাড়া নিজেদের ব্যাপারেও আছে বৈকি।

উদিতার বেশী বিশ্বাস বাপের বাড়ির ইয়ং ডাক্তারের উপর, চন্দ্রভূষণের ঘোরতর বিশ্বাস তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ ডাক্তারবাবুর উপর। দুজনের বিশ্বাস গড়ে ওঠার মূলে অবশ্য কারণ আছেই কিছু।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চন্দ্রভূষণের বিশ্বাসেরই জয় হয়। কারণ চন্দ্রভূষণ কারো অসুখ হতে না হতে ডাক্তারকে এনে হাজির করেন, নিজে বোঁ করে বেরিয়ে যান প্রেসকৃপশনটা হাতে নিয়ে, এবং দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ খাওয়ান।

খরচ সব চন্দ্রভূষণের।

সিন্ধুভূষণ যদি স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দাদার কাছে টাকা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, চন্দ্রভূষণ আহত গলায় বলেন, 'তোর ছেলের অসুখ, তাই তুই ডাক্তারের ফীজ দিবি, ওষুধের দাম দিবি?'

এরপরও আর কে বলবে 'হ্যাঁ দেব!'

কিন্তু উদিতা তাই বলতে চায়।

চন্দ্রভূষণের উদারতা তার হজম হচ্ছে না আর।

সিন্ধুভূষণ বলে, 'কি আর করা যাবে, ওঁর নিজের ছেলেমেয়ে নেই তাই, থাকলে অবশ্যই করতেন না এত!'

করতেন না যে অবশ্যই তার নজীর আছে। গায়ের কাছেই আছে। ইন্দুভূষণ যদি 'পথে বেরোচ্ছেন' হিসেবে কারো কোনো জিনিস কিনে আনবার 'ফেরে' পড়েন, কদাচ সে 'ফেরে' পড়ে থাকেন না। বাসভাড়া লাগলে সেটারও বিল কাটেন।

সেজদা অতটা না হলেও বড়দার মত আদৌ নয়।

অতএব ধরে নিতে হবে বড়দার নিজের ছেলেমেয়ে নেই বলেই—

তা' সেই ধরে নেওয়াটুকুতে আদৌ রাজী নয় উদিতা। ওর মানমর্যাদাজ্ঞান বড় বেশী। কাজে কাজেই সেই বস্তুটাকে বাঁচাতে বদলীর চেষ্টা করতে হচ্ছে সিন্ধুভূষণকে।

কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বুক ফেটে গেলেও করতে হচ্ছে।

ঝামেলা কি কম? ছেড়ে যেতে কত দিকে কত ব্যবস্থা। তা'ছাড়া ছেলে দুটোর স্কুল ছাড়ানোর প্রশ্ন রয়েছে।

চন্দ্রভূষণ যখন শোনেনি বদলী হওয়াটা চেষ্টাকৃত, তখন কাতর কাতর গলায় বলেছিলেন, 'তা' ওরা সুদ্ধু যাবে কেন? বছরের এই মাঝামাঝি? তাছাড়া সেখানে ভাল স্কুল আছে কি না ঠিক নেই—'

উদিতা শেফালীর মত সেকেলে বৌ নয় যে ভাসুর দেখে ঘোমটা দেবে। অতএব জবাবটা দেয় মুখোমুখিই, 'ওদের রেখে যাব? আমরা চলে যাব, ওদের রেখে যাব? দেখবে কে?'

উদিতা ইচ্ছে করলে লাঠি না ভেঙে সাপ মারতে পারতো। খুব নরম করে বলতে পারতো, 'ওদের ছেড়ে থাকতে পারবো না বড়দা।'

তাতেও কাজ হতো।

চন্দ্রভূষণই হয়তো লজ্জিত হয়ে ভাবতেন, 'তাইতো সত্যিই তো। আমারই একথা ভাবা উচিত ছিল।'

কিন্তু তা' বললো না উদিতা।

সাপটা সে মারলো বটে, কিন্তু লাঠিটাও ভাঙলো।

চন্দ্রভূষণ আহত হলেন।

চন্দ্রভূষণ আহত বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'বাড়িতে এতগুলো লোক রয়েছে ছোটবৌমা, বুবু টুটুকে কেউ দেখবে না?'

সিন্ধুভূষণ ওই আহত আহত মুখের দিকে তাকিয়ে মরমে মরলো। সিন্ধুভূষণ তাড়াতাড়ি ভাঙা বাসনটায় তালি দিতে বসলো, বসলো ছেঁড়া কাপড়টায় রিপু করতে।

বলে উঠলো, 'শোনো কেন দাদা ওসব কথা। ছেলেদের ছেড়ে থাকতে পারবে না, অথচ মান খুইয়ে বলবে না সে কথা।'

কে জানে ভাঙা বাসন জোড়া লাগলো কি না।

চন্দ্রভূষণ আর কিছু বললেন না।

না প্রতিবাদ, না সমর্থন।

উদিতা ঘরে ফিরে এলে সিন্ধু বললো, 'কথাটা ওভাবে না বললেও পারতে!'

উদিতা গম্ভীর গলায় বললো, 'জানি না কী ভাবে তোমাদের দাদার চিত্তে আঘাত না দিয়ে কথা বলা যায়! তুমি তো মলম বুলিয়েছ তা'হলেই হবে।'

তারপর বললো, 'তোমাদের এই 'কর্তাভজা'র বাড়িতে তিষ্ঠানো শক্ত। উনি যা খুশি করতে পারেন, যেহেতু উনি কর্তা। আর সেই হেতুই ওঁর দোষের দিক থেকে চোখ বুজে ভজতে হবে ওঁকে। জানো, ওই বেলেঘাটার ব্যাপার নিয়ে আমাদের বাড়ীতে কী নিন্দে, কী ব্যঙ্গ।'

সিন্ধুভূষণ মাথা হেঁট করে।

দাদার ওই বেলেঘাটার ব্যাপারটাই তাদের মাথা হেঁট করিয়েছে, বিশেষ করে বৌদের কাছে।

যতই বৌদের বোঝাতে চেষ্টা করুক, অবিবাহিত মানুষ, ওরকম একটু-আধটু দুর্বলতা স্বাভাবিক, ওটা প্রকৃতির প্রতিশোধ, তবু বলতে মনে জোর পায় কই?

দাদার উপরই অতএব রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়।

সেদিন আবার জামাইবাবুর আচমকা প্রশ্নে বলা হলো কিনা 'জানো না, ওখানে যে সংসার পেতেছি! তোমরা যে রসে হাবুডুবু খাচ্ছো, সে রসটা কেমন জানতে ইচ্ছে হলো হঠাৎ!'

লজ্জার লেশ নেই, যেন ঠাট্টাতামাশা।

যেন আসলে ব্যাপারটা সত্যি নয়।

বড় জামাইবাবু ভালমানুষ, অতটা জানেন না, হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন। ভাবলেন ঠাট্টাই।

কিন্তু ছোট জামাইবাবু তো জেনে এসেছে।

বুড়োবয়েসে নাকি একটা বোষ্টমী নিয়ে—ছি ছি।

লোকে যে রসে হাবুডুবু খাচ্ছে সে রসটা কেমন, এতদিন পরে জানতে ইচ্ছে হলো তোমার?

সেদিন আবার পাড়ার গোবিন্দবাবুকে বলা হচ্ছিল, 'বেলেঘাটায় একটা হার্ডওয়ারের দোকান দিয়েছি—' যেন সেটাই আসল।

সেটা তো হলো নিত্য গতায়াতের কারণ দেখানো। জানতে তো বাকী নেই কিছু? দিয়েছেন অবিশ্যি একটা দোকান, সে তো নাম কা ওয়াস্তে। আবার সে দোকানে বসানো হয়েছে কাকে? না গেঁজেল পাজী দেবুটাকে।

মেজদা তো মুখফোঁড়, বলেছিল সেদিন, 'পাড়া রাজ্য ছাড়িয়ে বেলেঘাটায় দোকান! আশ্চর্য বটে! আর সে দোকানে বসাবার জন্যে আর লোকে পেলে না? দেবুদা? ছি ছি! অথচ আমার সেজ শালাটা—'

তা' দাদার উত্তর হলো কিনা—'মামা মামী মরে পর্যন্ত দেবুটা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে. ওর একটা ব্যবস্থা করা তো দরকার! মামা মামীর কাছে তো আমার ঋণের শেষ নেই!'

কেন নেই, তা'ও জানি না।

মামা সাধ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাই, নইলে বাবার কি ছেলেকে মানুষ করে তোলবার ক্ষমতা ছিল না? মামার সখকে যদি ঋণ বল তো ঋণ!

কে বলতে পারে ওই দেবুদাটাই কুপথের মন্ত্রণাদাতা কিনা! নষ্ট তো হয় মানুষ সঙ্গদোষেই। বুড়োবয়সেও যে হয়, তার নজীর আছে। আবার সেটা নতুন করে দেখালো দাদা।

দেবুদার উপর এত কর্তব্যজ্ঞান না দেখালেও চলতো! স্বর্গ থেকে মামা মামী নিশ্চয় ওই ছেলের গুণে গালে মুখে চড়াচ্ছেন!

ঠিক, ওইটাই দাদাকে নষ্ট করছে।

ওই বোষ্টমী যোগাড়ের কর্ত্তাও ওই দেবু।

সিন্ধু অনেক ভাবে।

কিন্তু ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায় না।

'দাদা খারাপ হয়ে গেলেন—' এটা উচ্চারণ করেও যেন বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না, দাদা দেবুদা'র সঙ্গে মিশছেন।

পুরুষের যত রকম দোষ থাকা সম্ভব, তার কোনোটিতে তো ঘাটতি নেই দেবুদার।

নেশাভাঙ, বদভ্যাস, চরিত্রহীনতা, জালজোচ্চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি, সবেতে পটু। সেই লোকটাকে ক্ষমা করতে হবে? আগে তো ঠিক উলটো ছিল, আগে তো দাদা দেবুদাকে দেখলে জ্বলে যেত, কথা বলতো না।

মামা যখন মারা গেলেন, দেবুদা এলো জানাতে, অর্থাৎ সাহায্য চাইতে। দাদা বললো, 'ওর হাতের পিণ্ডি খেয়ে মামার তো স্বর্গ হবে না, হবে অনন্ত নরক, সেই নরকের পথ প্রশস্ত করবার সাহায্য করতে পারব না।' অবিশ্যি দিল শেষ পর্যন্ত টাকা, তবে কথা বলেনি।

আর এখন কিনা 'ও ভেসে বেড়াচ্ছে' বলে ওই বুড়ো বদমাশটাকে দোকান পাতিয়ে দিয়ে পুষত হবে?

অন্য কিছু নয়, ওই।

এখন রতনে রতন চিনলো!

দাদা এমন হয়ে গেল।—সিন্ধুভূষণ যেন দিশেহারা হয়ে যায়।

ভাবে, আমার শাশুড়ী যে বলেন, 'মোহিনী মায়া', নির্ঘাত তাই। তুকতাকেরই ব্যাপার!

দাদার অধঃপতন বিন্দু সিন্ধুকে মরমে মেরেছে!

সিন্ধু শেষ পর্যন্ত চলেই যাচ্ছে।

কারণ উদিতা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না ওই ভাসুরকে প্রণাম করতে, সমীহ করে কথা বলতে, তাঁকে সেবা যত্ন করতে।

অতএব কলকাতা ত্যাগ।

এতে যদি চন্দ্রভূষণ ভাবেন তাঁর পাঁজরের একখানা হাড় খসে গেল, তো বোকার মত ভাবা হবে সেটা।

বিন্দুভূষণ অবশ্য বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না, তবে বাড়ির মধ্যেই আলাদা হতে চায়।

শেফালীর গিন্নীপড়া আর সহ্য করতে পারছে না সুনন্দা। বয়সে সামান্য তফাত, কিন্তু মান্য দাবি করে অসামান্য। কারণ বড় ভাসুর তাকেই সংসারের কর্ত্রীর পোষ্টটা দিয়ে রেখেছেন।

অসহ্য নয়?

তার থেকে অনেক ভাল, ঘরের মধ্যে 'জনতা' জ্বেলে ভাতে ভাত রেঁধে খাওয়া।

ঢের সুখের, ঢের স্বস্তির।

আর সম্মানের তো বটেই।

কিন্তু চন্দ্রভূষণের উপস্থিতিই এই সম্মানজনক পথটা নিতে দিচ্ছিল না।

দাদা দুঃখিত হবেন!

দাদা আহত হবেন!

দাদা কি মনে করবেন!

বিন্দুভূষণ তাই বলে। বলে—

দাদার যদি মতিচ্ছন্ন ঘটেও থাকে, সন্দেহ নেই সেটা সাময়িক।

সেটা—ওই বুড়ো বদমাইশ দেবুদাটার কেরামতি! যতই হোক দাদা পুরনোকালের বন্ধু, কবলে ফেলতে বেশী দেরি হয়নি। এখন ওই পাজীটা দাদার খরচে বদমাইশি করবে এই মতলব! তাই তুক তাক করেছে।

তা ওরা যদি বলে একথা, তুকতাক করেছে দেবু চন্দ্রভূষণকে, তাহ'লে অন্যায় বলে না। বাস্তবিক দেবুর ওপর করুণা আসবার কোনো যুক্তি আছে কি? চন্দ্রভূষণের সমস্ত জীবনটা ভেস্তে যাওয়ার মূলে কে? দেবু নয়? দেবুই কি ধ্বংস করে দেয়নি চম্পা নামের এক টুকরো শুভ্র পবিত্রতাকে?

দেবু যদি সেদিন শুধু একটু 'বকুনি' খাবার ভয়ে কাতর না হয়ে মা বাপের কাছে এসে আছড়ে পড়ে বলতো, 'মা, জামির পাজীটা চম্পাকে ভুলিয়ে নিয়ে—'

যদি বলতে পারতো, 'বাবা আমায় কেটে দু'খানা করে ফেল তুমি, আমি মহামুখ্যু। শুধু তুমি চম্পাকে—'

তা করেনি দেবু।

সামান্য একটু বকুনি খাবার ভয়ে ধর্মাধর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছিল সে। তার উপর আবার নীচতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল চম্পার নামে ঘৃণ্য অপবাদ দিয়ে।

অথচ সেই দেবুই পরে বাপের বাক্স ভাঙলো, নেশা করলো, উচ্ছন্ন গেল। কই তখন তো বকুনি খাবার ভয় করল না? খুব বেশী পরের কথা তো নয় সেটা!

দেবু বলে, 'মনের গ্লানি ভুলতে নেশা ধরেছিলাম ভাই—'

তা' অমন কথা সব নেশাখোরেই বলে থাকে।

মনের গ্লানি ভুলতে তুমি ভগবান না ধরে মদ ধরতে গেলে! তা' গ্লানি ভুলতেই বোধ হয় বাপমার বুকে শেল মারলে, সর্বস্বান্ত করলে তাঁদের, দুর্গতির চরম করলে! মনের কষ্টে কষ্টেই মরে গেল মানুষ দুটো!

চন্দ্রভূষণ জানেন না সে সব?

তবু চন্দ্রভূষণের দয়া উথলে উঠলো।

'মাতুল ঋণ' শোধ করতে দেবুকে আশ্রয় দিতে গেলেন।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য্যই বৈকি।

লোকে যে ভাবে চন্দ্রভূষণের ওই কলঙ্কনায়িকার জন্যেই বেলেঘাটায় দোকানের ছল, সেটা ভুল। দেবুকে যখন দোকান করে দিয়েছিল তখন কোথায় কলঙ্ক? তখন তো চন্দ্রভূষণ নিষ্কলঙ্ক চাঁদ।

কাজেই আশ্চর্য ওই দেবুকে সাহায্য করা।

মা বাপ মরার পরে অনেক দিন কোনো পাত্তা ছিল না বাউণ্ডুলে দেবুর। কে জানে মরেছে কি বেঁচে আছে।

হঠাৎ একদিন এসে উদয় হলো।

নির্লজ্জের মতো বললো, 'খেতে পারছি না রে চন্দর, মাইরি বলছি আজ তিন চার দিন চায়ের দোকানে চেয়ে চিন্তে দু'বেলা একটু একটু চা খেয়ে কাটাচ্ছি।'

বাড়িতে আসতে সাহস করেনি, চন্দ্রভূষণের কারখানায় গেছে।

চন্দ্রভূষণ ওই ভিক্ষুকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, জরাজীর্ণ একখানা র‍্যাপার গায়ে, ময়লা ছেঁড়া একটা ধুতি। র‍্যাপারের নীচে সার্টের চিহ্ন নেই, খুব সম্ভব শুধু ছেঁড়া গেঞ্জি।

মুখে বেশ কয়েক দিনের দাড়ি, এবং মুখের রেখায় রেখায় দৈন্যের নির্লজ্জ রেখা।

ওই মূর্তিটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন চন্দ্রভূষণ, 'তবু মরতে পারনি?'

'কই আর পারলাম?' দেবু হতাশ গলায় বলেছিল, 'মরলে প্রায়শ্চিত্ত করবে কে?'

চন্দ্রভূষণ সেই চাপা গলাতেই তীব্র হয়েছিলেন, 'আছিস কোথায়?'

'বেলেঘাটার একটা বস্তিতে।'

'বেলেঘাটায়? আছে কে সেখানে?'

'কেউ না। ওখানে একটা লোহা লক্কড়ের দোকানে কাজ করতাম, ওই অঞ্চলেই ছিলাম, তা একদিন চাকরীটা গেল—'

'চাকরীটা গেল?' চন্দ্রভূষণ ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠেছিলেন, 'তা তো যাবেই! মহাপুরুষ বোধহয় তাদের মাল সরিয়ে বেচে দিয়েছিলেন?'

দেবু মাথা হেঁট করেছিল।

চন্দ্রভূষণ একটুক্ষণ থেমে বলেছিলেন, 'অনেক তো হলো, এবার ক্ষ্যামা দাও না। বংশের মুখে আর কত কালি মাখাবে? ... বস্তিতে। বেলেঘাটার বস্তিতে। ছি ছি! কার ছেলে তুই, একথা মনে পড়ে না দেবু? লেখাপড়াও তো শিখেছিলি কিছু। একটু সৎভাবে থাকতে ইচ্ছে করে না?'

দেবুর হেঁট হয়ে যাওয়া মুখের চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল, 'ইচ্ছে হলেই বা উপায় কোথা? অসৎদের সঙ্গে মিশে মিশে সৎরাস্তার ঠিকানা ভুলে গেছি।'

'ঠিক আছে'—চন্দ্রভূষণ বলেছিলেন, 'আমি তোমায় একবার চান্স দেব। নিজের দোকান করে দেব তোমায় একটা। অবশ্য ছোট্টই। তবে যে দোকানে কাজ করতিস সেই ধরনের দোকানই ভাল। জানা জিনিস। আমার এই ফার্ণিচারের দোকান থেকেই দেখছি তো—তুচ্ছ ওই স্ক্রু, পেরেক, কব্জা, চাবির কল থেকে কী লাভটা মারে! ওরই একটা দোকান—'

দেবু কাতর গলায় বলেছিল, 'তার থেকে তোর এই দোকানেই একটা কাজ দে না! যা হোক কাজ। ধুলো ঝাড় দিতেও রাজী। তার বদলে দুবেলা দুমুঠো ভাত আর একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই। সাত মাস ঘর ভাড়া বাকি পড়ে আছে, বাড়িওলা তিনবেলা দূর দূর করছে।'

'না।'

চন্দ্রভূষণ গম্ভীর হয়েছিলেন।

বলেছিলেন, 'না। নিশ্চিন্তের আশ্রয়, আর পেটের ভাত পেলেই তুমি আবার উচ্ছন্নর রাস্তা ধরবে। তোমায় খাটতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। নিজের দোকান হোক। তার থেকে তো আর চুরি করতে পারবি না?' বলে এবার একটু হেসেছিলেন।

তারপর বলেছিলেন, 'বিয়ে করেছিস?'

দেবু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েছিল।

চন্দ্রভূষণ বলেছিলেন, 'যাক্ এই একটা পুণ্যেই তোর পাপের লাঘব। আবার যে বংশে তোর ধারা রেখে যাচ্ছিস না এটাই বোধ করি মামার কপালে সোনার আঁচড়। ... তা' হলে আশ্রয়েরও সমস্যা নেই, দোকানেই থাকবি।'

এই হল দেবুর দোকানের ইতিহাস।

বেলেঘাটার একটা সরু রাস্তার মোড়ে ওই দোকান ঘরটা। দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তা থেকে সরু সিঁড়ি উঠে গিয়ে তার দোতলায় দেড়খানা ছোট্ট ঘর। জোগাড় করে ফেলেছিলেন চন্দ্রভূষণ কম দিনের মধ্যেই।

কিন্তু বেলেঘাটায় কেন?

নিজের কাছাকাছি নয় কেন?

তা সেটা হয়তো উদার চন্দ্রভূষণেরও সঙ্কীর্ণতা!

ভেবেছিলেন হয়তো, নাম ডোবানো আত্মীয়, দূরে থাকাই মঙ্গল। ভাইদের কাছে প্রকাশও করেননি তখন। ভেবেছিলেন, দেখি ওর ভাব গতিক। মুখটা আর বেশী হাসাব না।

কিন্তু দেবু বদলে গিয়েছিল, দেবু মুখ হাসায়নি তার দয়ালু আর মহৎ পিসতুতো ভাইয়ের।

চন্দ্রভূষণের ভাইরা এতদিনের ইতিহাস জানে না। ওদের কানে এসে পৌঁছেছে ইদানীং। কাজেই ওরা ধরে নিয়েছে চন্দ্রভূষণের বুড়োবয়সের দুর্মতির অধিনায়িকার জন্যই দোকান।

আর ধরে নিয়েছে দেবুটাই এই সব দুর্মতির প্ররোচক, দাদাকে ওই প্রলোভন দেখিয়ে বেশ কিছু হাতাচ্ছে, বেশ কিছু বাগাচ্ছে।

কিন্তু দাদার নিশ্চয় বুদ্ধি ফিরবে।

আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিন্দুভূষণ পুরুষমানুষ, তাই ওকথা ভাবে। ভাবতে পারে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার বেঠিক হয়ে যাওয়া সংসার যে আর 'ঠিক' হয় না একথা ওর জানা নেই।

বেঠিকটা ঠিক হয় গল্পে, উপন্যাসে, সিনেমার ছবিতে, সাজানো রঙ্গমঞ্চে।

একটা মহামুহূর্তকে অবলম্বন করে যেখানে যবনিকাপাত করা হয়।

সত্যকার জীবনে ওই মহামুহূর্তটি তো আর স্থিরচিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না! আবার আসে অগ্নিমুহূর্ত।

তাই ঠিক হবার উপায় আর নেই।

চন্দ্রভূষণ যদি মোহমুক্ত হয়ে ফিরে এসে গঙ্গাস্নান করে আবার সংসারে বসেনও, সুনন্দা আর শেফালীতে যে মুখোমুখি ঝগড়াটা হয়ে গেল সেদিন, তার দাগ কি মিলোবে? শেফালীর বড় মেয়েটা যে সেদিন সেজকাকার কথা না শুনে নাকের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল, তার জ্বালা কি একেবারে ঠাণ্ডা হবে?

হয় না।

হয়তো স্বার্থ এবং সুবিধার প্রয়োজনে, হয়তো বা সাময়িক এক টুকরো শুভবুদ্ধির বশে, ভাঙা টুকরোগুলো আবার একত্র হবার চেষ্টা করতে রাজী হয়, কিন্তু তার অসঙ্গতিটা ধরা পড়ে প্রতিমুহূর্তে, তার অগ্নিমুহূর্তগুলো ধ্বংস করে বসে সভ্যতা, ভব্যতা, শালীনতা, সম্ভ্রম।

হবেই তো।

বাইরের ঘটনাগুলো যে নিমিত্তমাত্র, ভাঙছে তো 'কাল'! ভাঙাই যার কর্তব্য কর্ম, ভাঙাই যার চাকরি। বিধাতা-নির্দিষ্ট এই চাকরিতে কর্তব্যকর্মে ত্রুটি নেই তার কখনো। অহরহ এগিয়ে চলেছে সে তার চক্রের আঘাত হানতে হানতে।

'ঘটনাগুলো শুধু তার চক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলোমাত্র। যদি একদার 'একবৃন্তে'র মানুষগুলো দূরে দূরে থাকে,

তা'হলে শুধু ওই ধুলোটা ওড়ে না। কিন্তু 'কালে'র কাজ অব্যাহত থাকে। নিঃশব্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা।

কর্তব্যনিষ্ঠ 'কালে'র সেই চক্রের ঘায়ে ভাঙছে সমাজ, ভাঙছে রাষ্ট্র, ভাঙছে যুগযুগান্ত সঞ্জাত মূল্যবোধ, ভাঙছে বহুসাধনাপুষ্ট ধর্মবিশ্বাস।

মানুষ আবার গড়তে বসছে নতুন নকশা।

শেফালী সুনন্দা উদিতা, ওরা যদি ওদের নিজ নিজ নকশায় ঘর বাঁধতে চায়, যদি চন্দ্রভূষণের মায়ের নকশার খাঁজের ইঁট হয়ে থাকতে না চায়, ওদের দোষ দেওয়া চলে না।

ওরা তা' চাইছিল।

ওরা সেই চাওয়ায় উত্তাল হচ্ছিল, অসহিষ্ণু হচ্ছিল, অস্থির হচ্ছিল, শুধু দুর্গপ্রাকারের কোনখানটা কমজোরি, কোনখানটা ভেঙে বেরোনো যাবে, তাই খুঁজে পাচ্ছিল না।

চন্দ্রভূষণ দেখিয়ে দিলেন সেই জায়গাটা।

চন্দ্রভূষণ ওদের উপকার করলেন।

চন্দ্রভূষণ যদি এখন ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখে পাঁজরের মধ্যে শূন্যতা অনুভব করেন, সেটা হবে পাগলামি।

চন্দ্রভূষণের নিজের জীবনের নকশাও কি বদলায়নি?

তবে চন্দ্রভূষণ ভাবছেন না বদলাচ্ছি।

তা' কেই বা ভাবে, আমি বদলে যাচ্ছি, আমি আমার নকশা বদলাচ্ছি! সবাই ভাবে, 'ওরা বদলাচ্ছে।' ভাবে, বদলাচ্ছে পারিপার্শ্বিকতা, বদলাচ্ছে দিন রাত্রির রং, আমিই শুধু ঠিক আছি, অবিকল আছি।

হ্যাঁ, তাই ভাবে সবাই, আমি যেমন ছিলাম তেমনিই আছি। আমার পরিবর্তন দেখে যে অন্যরা চমকে যাচ্ছে তা' ভাবছি না।

চন্দ্রভূষণও তাই ছোট ললিতাকে নিয়ে 'সংসার সংসার খেলা'র শখ মেটাতে বসেও টের পাচ্ছেন না, তাঁর জীবনের নকশা বদলে গেছে।

টের পাচ্ছেন না, কারণ দিনের কাজগুলো তো চলছেই প্রায় যথানিয়মে। সেই তো সক্কালবেলা উঠেই বাজার যাচ্ছেন, ঝাঁকামুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে আসছেন প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ভার। তার সঙ্গে নিত্য নিয়মে বাড়ির ক্ষুদে সদস্যদের জন্যে কিছু না কিছু খেলনা।

বাজার থেকে ফিরে ওটাই আমোদ চন্দ্রভূষণের। বাচ্চাদের নিয়ে খানিকক্ষণ হইচই। তারপর বৌমাদের ডেকে ডেকে রান্নার গল্প, বাজারের গল্প।

'বুঝলে সেজবৌমা, যা ফার্স্টক্লাস কাঁকড়া দেখলাম বাজারে, ইচ্ছে হলো সবগুলো কিনে আনি, বেবিটার পেট ভাল নয় বলে আর আনলাম না। ...বুঝলে ছোটবৌমা, ইলিশের জোড়াটা নিল ষোলো টাকা, কি আর করা যাবে, সব জিনিসের দামই তো আগুন, ওটা কিন্তু বামুনঠাকুরকে ছেড়ে দিও না বাপু, তুমি তোমার সেই তেলঝালের স্টাইলে রান্না করবে। ...মেজবৌমা, তুমি কিন্তু বাপু আজ রেগে যাবে, মোচা এনে বসেছি। ...তা' এক কাজ করলে পারো, তোমাদের ওই ঝিটাকে দিয়ে কুটিয়ে নিলে পারো।'

এই সব কথা বাজারফেরত চন্দ্রভূষণের।

এ সময় ভাইরা ব্যস্ত থাকে স্নানে, দাড়ি কামানোয়, খবরের কাগজে, হয়তো বা ঘুমেও।

এরপর তারা এসে খেতে বসে।

অফিসের বাবুর রীতি অনুযায়ী সুটকোট এঁটে এক মিনিট মাত্র সময় হাতে রেখে। খাওয়াটাকে নিতান্ত বিরক্তিকর কাজের মত সেরে নেয়। চন্দ্রভূষণ তাদের খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসেন, এবং অনুযোগ করতে থাকেন খাওয়ার পদ্ধতি এবং পরিমাপ নিয়ে।

বলেন, 'অত তাড়াতাড়ি খাসনে সিন্ধু, হজম হবে না। খাওয়ার জন্যে আর একটু সময় হাতে রাখতে পারিস না?' ...বলেন 'মাছ ভাজাটা ফেলে যাচ্ছিস যে বড় ইন্দু? কীরে? একখানা ভাজা মাছ খেতে

কতক্ষণ যায়? ...আর বিন্দু, নাঃ তুই দেখছি এই বুড়োবয়সে কানমলা খাবি। হয়ে গেল খাওয়া? সব ভাতই তো পড়ে রইলো... মেজবৌমা, দাও দিকি ওকে আর দুখানা ঝালের মাছ, কেমন ভাত ফেলে যায় দেখি! কী আশ্চর্য, আমি যে তোদের ডবল খাই!' দোকানী মানুষ। খান গুছিয়ে-গাছিয়ে, সেটা মিথ্যে নয়।

নিজে বেরোন বেলায়, ওই অফিসের বাবু কটাকে পার করে দিয়ে তবে স্নান করতে যান। অতএব বৌদের আর কোনোদিন স্বামীদের পাতের কাছে বসে 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলার সুযোগ হয় না। কাজেই রাগ হয়।

নিজ নিজ পকেট ভেঙে, এবং নিজে খেটেখুটে যোগাড় করতে হলেও যে সে সুযোগ বেশী আসে না, তা' অবশ্য বুঝতে পারে না। বুড়ো ভাসুরটি সামনে বসে থেকে আর ঘ্যান ঘ্যান করে কেবলমাত্র ওদের বিরক্তিই উৎপাদন করেন, এই ভেবে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয় তারা। বিরক্তিকর এই ঘ্যানঘ্যানানি। বুড়ো ভাসুরের উপকারিতাটুকু বুঝতে পারে না।

তবু কিছুদিন আগে পর্যন্তও ঠাট বজায় ছিল।

বৌমারা বলতো, 'বাঃ একজন খাবে না বলে আনবেন না? কাঁকড়া আমরা কী ভীষণ ভালবাসি!'

বলতো, 'ইলিশ মাছ আমি বামুনঠাকুরের হাতে ছেড়ে দেব? কী যে বলেন বড়দা?'

শেফালী সেকালের রীতিতে ভাসুর সমক্ষে নীরব থাকে, তবু একে ওকে দিয়ে বলাতো, 'রাগ করবো কী বলুন, আপনি মোচা ভালবাসেন, আর আমি রাগ করবো?'

আজকাল আর তেমন উত্তর জোটে না।

আজকাল হয়তো বা উত্তরই জোটে না।

ভাইরাও প্রায় তদ্রূপ।

হয়তো একই ধরনের কথা শুনে শুনে সত্যিই ঘ্যানঘ্যানানি মনে হয়, হয়তো বা অলক্ষ্যে একজন উষ্ণ হচ্ছে ভেবে সংকুচিত হতে থাকে, তাই খোলামেলা উত্তর দিতে পারে না। আর হয়তো বা চন্দ্রভূষণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খাওয়া সম্ভব নয় জানে বলেই গ্রাহ্য করে না আর।

তবু বিন্দু সিন্ধু মেজদা ইন্দুর মত অতটা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেনি। তবু তারা হয়তো বলে, 'আমাদের মত নটার সময় খেতে হলে তুমিও কেমন খেতে বুঝতাম!'

হয়তো বলে, 'তোমার মনের মত খেয়ে ওঠা আমার কর্ম নয় দাদা!'

সেই বলার মধ্যে আগের মত ভালবাসায় গদগদ মধুর সুরটি ফোটে না। অন্তরহীন যন্তর থেকে উত্থিত শব্দের মত লাগে, তবু অভ্যাসটা থাকে।

ইন্দু চিরদিনই একটু কাঠখোট্টা।

ইন্দু চিরদিনই কথা বলে খট্‌খটে শুকনো। কিন্তু এখনকার মত বিদ্রূপাত্মক কথা বলতো না কখনো।

আজকাল বলে।

তীব্র ব্যঙ্গের মুখে বলে, 'বাজারটা তোমার, কিন্তু পেটটা আমার। তুমি ষোলো টাকার মাছ কিনতে পারো বলেই যে আমাদের সেটা খেতেই হবে, তার মানে নেই।'

বলে, 'একগাদা খাওয়াই পরমার্থ নয়। বেশী খাওয়া অসংযমের জন্মদাতা!'

এই সূত্র ধরে বুঝি চন্দ্রভূষণের অসংযমের ইঙ্গিত করে।

কিন্তু চন্দ্রভূষণ সেটা বিশ্বাস করেন না।

চন্দ্রভূষণ ভাবেন, ইন্দুটা দিন দিন আরো কাঠখোট্টা হচ্ছে। হবেই। মেজবৌমাটির মধ্যে তো কোমলতার প্রাচুর্য নেই।

মেয়েরা যে শক্তির মূর্তি, তা' ধরা পড়ে এইসব নমুনা থেকেই। বয়সে আট দশ বছরের ছোট একটা মেয়ে আস্ত একটা পুরুষকে কাদার ডেলার মত ভেঙে নিজের ছাঁচে গড়ে ফেলতে পারে।

সহসাই আবার উন্মনা হয়ে যান।

অন্য কত কি ভাবেন। আবার একসময় ভাবেন, এরা বড় বদলে যাচ্ছে!

চন্দ্রভূষণের চরিত্রহীনতা যে ওদের সেই বদলকে ত্বরান্বিত করে আনলো, সেইটাই শুধু বুঝতে পারেন না।

ওটা যে চরিত্রহীনতা সেটাই বুঝতে পারেন না বলে নাকি কে জানে!

হঠাৎ মনে করেন, যা ভাবছি তা' নয়। সবাই ঠিক আছে। বাড়িতে অনেকদিন আমোদ আহ্লাদের আয়োজন হয়নি বলেই হয়তো ঝিমিয়ে যাচ্ছে। তখনই বেরিয়ে যান বোনেদের নেমন্তন্ন করতে। হয়তো বা ভাইদের শ্বশুরবাড়িতেও যান।

কিন্তু সেদিন ছন্দপতন হলো।

চন্দ্রভূষণ যেই বললেন, 'এদের তো সব বলে এলাম। মাছ দুরকম কিনেছি, মাংস কতটা লাগবে বল তো সেজবৌমা?'

সেজবৌমা নির্লিপ্তগলায় বললে, 'ঠিক বলতে পারছি না। তা'ছাড়া আমি তো থাকছি না আজ।'

আমি তো থাকছি না আজ!

এ আবার কি ভাষা!

সেজবৌমা না থাকলে সবদিক ম্যানেজ করবে কে?

চন্দ্রভূষণ বিমূঢ়ের মত বলেন, 'তুমি থাকছ না?'

'না।'

'কোথায় যাবে?'

'রিষড়েয় দিদির বাড়ি।'

'কেন? সেখানে কি?'

চন্দ্রভূষণ বিস্ময়ের গলায় বলেন।

সেজবৌমা এ বিস্ময়কে আমল দেন না। অবহেলা ভরে বলেন,

'কিছু না, অনেকদিন থেকে একবার বেড়াতে যেতে বলছেন দিদি—'

'ওঃ কোনো অকেশান নয়?' চন্দ্রভূষণ যেন অকূলে কূল পান, 'তাহলে কাল পরশু যেও, আজ ওরা আসছে—'

সেজবৌমা আরো নির্লিপ্তের সুরে বলে, 'আজ যাব বলে ঠিক করেছি। বদলে লাভ কি? সকলে তো রইলো, আমি একা না থাকলেই বা?'

আমি একা!

'একা যাবে তুমি?' চন্দ্রভূষণ আর একবার বিস্ময়াহত হন। সুনন্দা ভুরু কুঁচকে বলে, 'আমি মানে আমাদের কথাই বলছি।'

ওঃ।

'আমাদের' মানেই ছেলে মেয়ে বাড়ী সমেত যাত্রা!

অথচ ভেটকির ফ্রাই ভালবাসে বিন্দু। যেটা আজ হচ্ছে।

আর সেজবৌমার ছোট ছেলেটা রাবড়ি দেখলে সবটা খেতে চায়। যা নাকি অধিক করে অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছে।

তবু চন্দ্রভূষণ চেষ্টা করেন।

বলেন, 'আজ বাড়িতে ভোজ, ছেলে মেয়েরা চলে যাবে?'

সুনন্দা মৃদু হেসে বলে, 'মাসির বাড়ি যাচ্ছে যখন, খাবেই যাহোক।'

আর কি বলবেন?

উৎসবের বুকের উপরই তো একটা বিদারণ রেখা পড়লো। সেজবৌমারই তো সন্তানসংখ্যা সর্বাধিক। তারাই যদি না থাকলো!

আশ্চর্য, যাচ্ছেও তো ছেলেমেয়েগুলো বেশ হাসতে হাসতে!

জানে, বাড়িতে আজ পিসিরা আসবে, আসবে পিসতুতো ভাই বোনেরা—

ওই পিসিরা আর পিসতুতো ভাই বোনেরা চন্দ্রভূষণের কাছে যতখানি মূল্যবান, ততটা যে ওদের কাছে নয়, বোনেরা এলে চন্দ্রভূষণ উৎসবের যে রূপটি দেখতে পান, তা' চন্দ্রভূষণের ভাদ্রবৌদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, তা' খেয়াল করেন না চন্দ্রভূষণ।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ কোন ঘর থেকে যেন আওয়াজটা এলো, 'শখের মধ্যে কতকগুলো বাজার করা আর বোনেদের গুষ্টীবর্গকে ডেকে খাওয়ানো! হাড় জ্বলে যায়! আর কারুর কিচ্ছু থাকবে না, খালি ওঁরই সব থাকবে! কেন বাবা, আরো তো নতুন নেশা হয়েছে, আর এসব কেন?'

চন্দ্রভূষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন। চন্দ্রভূষণ যেন বুঝতে পারলেন না এ কণ্ঠস্বর কার? চন্দ্রভূষণের সম্পর্কে এই ভাষা ব্যবহার করছে বিন্দুর বৌ!

চন্দ্রভূষণ পাথর হলেন।

কিন্তু তাঁর ভাদ্রবৌকে কি সত্যিই খুব দোষ দেওয়া যায়?

একটা বুদ্ধিমান লোক যখন অবিরত অবোধের মত কাজ করে যায়, আঘাত তাকে পেতে হবে বৈকি!

সারাদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কাটালেন।

ছোটবোন বললো, 'দাদার কি শরীর ভালো নেই?'

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'আছে তো!'

মেজবোন বললো, 'দাদা, তুমি আজ একেবারে কিছু খেলে না কেন বল তো?'

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'কই? খেলাম তো!'

ওরা অবশ্য আগের মতই নাকে মুখে চোখে গল্প করলো, কিন্তু এ কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন চন্দ্রভূষণ, ওরা বোনেরা মজলিশ করে বসে দাদার 'অধঃপতনে'র আলোচনা করছে, দাদার 'বিমনা' ভাবের কারণ নির্ণয় করে হাসাহাসি করছে!

হাসাহাসিই করে।

বৌদের মত অত গাত্রদাহ হয় না ওদের, তাই হাসাহাসি করতে পারে।

ওরা বলে, 'নিজের ওই নতুন ভাব গোপন করতে দাদার কী চেষ্টা দেখেছিস? যেন কিছুই হয়নি, যেন যেমনটি ছিলেন তেমনটি আছেন। অথচ সর্বদাই মন উন্মনা।'

ছোটবোনের বরই সংবাদদাতা, কাজেই সে সব থেকে বেশী জানে। সে বলে, 'যাই বল, এ ওই দেবুদা পাজীটার শয়তানীর ফল। নইলে এ তো বলেছিল, আশেপাশের কোথা থেকে যেন খবর জোগাড় করেছে, দেখতে নাকি একেবারে বাজে। একটা বাচ্চা চাকর রেখেছেন 'মহিলা', তাকে একটা টাকা ঘুষ দিয়ে খবর বার করে নিয়েছে ও, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা নাকি হাজরে দেওয়া চাইই চাই।'

বড়বোন হেসে বলে, 'মহিলা! মাগী বল। আগে নাকি তেলককাটা গেরুয়াপরা বোষ্টুমী ছিল, এখন সাদা কাপড় পরে।'

মেজবোন হেসে গড়ায়, 'তা, সেটা না করে দাদা নিজেই তেলক কণ্ঠী ধারণ করে কণ্ঠিবদল করে নিলে পারতো। তাতে ধর্মের কাছে মুখোজ্জ্বল থাকতো।'

বড়বোন শখের ধমক দেয়, 'থাম্ বাবু, আবার মুখোজ্জ্বল। বুড়ো বয়সের কেলেঙ্কারী! সারাজীবন সৎপথে থেকে—শেষে কিনা একটা বোষ্টুমী!

'আহা বুঝছিস না মেজদি', ছোট বোন হি হি করে, 'দুর্ভিক্ষের খিদেয় লোকে কাঁচা কচুর ডাঁটা খায়, মরুভূমির তেষ্টায় কাদা জল খায়—'

'কি জানি বাবা, বিয়ে না করা লোকও তো দেখেছি ঢের। এই তো আমারই পিসতুতো ভাসুর—'

'আরে বাবা, পিসতুতো ভাসুর! কী জানো তুমি তার? দেখগে যাও খোঁজ নিয়ে কোন বেলেঘাটা কি আঘাটায় ডুবতে যাচ্ছেন।'

এমনি কথার স্রোত বহায় ওরা। যেটা নাকি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না চন্দ্রভূষণ।

তবু আবার এই তিন বোনের মজলিশে এ কথাও ওঠে, 'তা মরুকগে বাবু, বাইরে বাইরে যা করে করুকগে। বুড়ো বয়সে যে একটা বিয়ে করে গিন্নী এনে ঘরে ঢোকায়নি, এই আমাদের পরম লাভ। তাহলে আর বাপের বাড়িতে এসে একদিনের জন্যে দাঁড়াতে হত না। দাদা যাই আছে, তাই তবু এখনে এসে দাঁড়াতে পাচ্ছি।'

মতিগতি খারাপ হয়েছে বটে লোকটার, তবে স্নেহ মমতাটা কমেনি। অতএব দুর্বলতা ক্ষমা করা যায়। বরং বরেরা যখন হাসে, তখন তাদের সঙ্গে তর্কও করা যায়, 'তা করা যাবে কি? রক্ত মাংসের মানুষ তো? সময়ে জোর করেছে, প্রকৃতি এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে!'

কিন্তু সত্যিই কি প্রকৃতির প্রতিশোধ?

চন্দ্রভূষণের যা ভঙ্গী, সেটা কি কারো প্রতিশোধ নেওয়ার ফল?

চন্দ্রভূষণ সারাদিন কাজ করেন আগের মতই অটুট উৎসাহ আর যুবকের কর্মক্ষমতা নিয়ে। চন্দ্রভূষণ সংসারের কি আছে নেই, কোন দিকে জল পড়ছে—অতএব কোনদিকে ছাতি ধরতে হবে, সে চিন্তায় সর্বদা তৎপর। চন্দ্রভূষণ নিত্য কাজে এতটুকু ঢিলে দেন না, শুধু চন্দ্রভূষণ সন্ধ্যারতির সময় দেবমন্দিরে গিয়ে বসার মত নিত্য অভ্যাসে সেখানে গিয়ে খানিক বসেন।

আর চন্দ্রভূষণের সারাদিনের সমস্ত কর্মের পিছনে আবহ সঙ্গীতের মত একটি মধুর আবেগময় সুর মৃদুমূর্ছনায় ধ্বনিত হতে থাকে—'গিয়ে বসবো।'

অ-ধরাকে ধরে বসে আছেন চন্দ্রভূষণ।

শুকনো চাঁপার ডালের মধ্যে নব চম্পকের সৌরভ আবিষ্কার করে বিভোর হয়ে আছেন।

এ যদি প্রকৃতির প্রতিশোধ নেওয়া হয় তো তাই।

কিন্তু ওরা এত কথা জানে না।

ওরা হাসাহাসি করে। ওরা বলে 'দাদা একটা দেখালো বটে!'

দিনটা কাবার হয়, ওরা চলে যায় আপন আপন বাড়িতে। রাতে থাকা বহুদিন বন্ধ হযে গেছে। জায়গা থাকলেও, বিছানাপত্তরের হ্যাঁপা সামলায় কে?

সে তো আর বাজার থেকে ঝাঁকা-মুটে দিয়ে কিনে আনবার নয়।

করতে হলে বৌরা।

কত আর পারবে তারা? ওই ননদরা একদা এ বাড়িতে জন্মেছিল বলেই যে মাথা কিনেছে তার মানে নেই।

ছিল একজন, হয়েছে এক ডজন, তবে?

বড়দার নাহয় পয়সা আছে, খরচ করছেন বোনেদের জন্যে। আনছেন, শাড়ি কিনে দিচ্ছেন, ওদের ছেলেদের খেলনা দিচ্ছেন, কিন্তু গতর খরচটি করে কে? নিজের তো গিন্নী নেই বাপু যে এত শখ চালাচ্ছ!

সর্বদা এই কথাই বলে ওরা।

অতএব বাপের বাড়িতে রাত্রিবাসের সৌভাগ্য বোনেদের হয় না।

অতএব ওরা চলে গেল!

চন্দ্রভূষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন দাঁড়িয়ে। বেচারারা বাপের বাড়িতে একটা রাতও কাটাতে পায় না।

দোকানঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়িতে উঠে গেলেন চন্দ্রভূষণ। আস্তে জুতোটা খুললেন। দাঁড়ালেন।

সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একখানা হাস্যোৎফুল্ল মুখ, 'কী? ঠকাতে পারলে?'

চন্দ্রভূষণকে ক্লিষ্ট দেখালো একটু। তবু হাসলেন।

বললেন, 'কই আর পারলাম? কাকেই বা পারছি? নিজেই ঠকছি শুধু।'

'নিজেই ঠকছো?'

ছোট ললিতা রেগে উঠে বলে, 'নিজেই ঠকছো? অপমানিত হচ্ছি কিন্তু এ কথা শুনে।'

চন্দ্রভূষণ হাসেন।
হাসিতে আহ্লাদটা কম দেখা যায়।
বলেন, 'চম্পা, শেষ পর্যন্ত দেখছি আমি একটা বোকা।'
ছোট ললিতা হেসে ওঠে। বলে, 'শেষ পর্যন্ত দেখতে হলো? তা'হলে স্বীকার করতেই হবে বোকা।'
তারপর বললো, 'চায়ের জল চারবার ঠাণ্ডা হয়েছে আজ।'
'চা? নাই বা খেলাম আর। এইমাত্র—'
'ঠিক আছে, আমি মরি মাথা ধরে।'
'এই, আরে না না। বানাও তবে—' চন্দ্রভূষণ বসে পড়েন চৌকির উপর।
'মনটা যেন ভাল নেই মনে হচ্ছে?'
'ঠিকই বলেছ, আজ বড় ধাক্কা খেয়েছি।'
'ধাক্কা?'
হ্যাঁ, তা' ধাক্কাই।' ধীরে ধীরে সকালের সেই কথাটা বলেন চন্দ্রভূষণ। বিন্দুর বৌ তাঁর 'নতুন নেশা'র কথা উল্লেখ করে ধিক্কার দিয়েছে।
কিন্তু ছোট ললিতা এ দুঃখে সহানুভূতি দেখালো কই?
ও যে হেসে একেবারে খানখান হলো।
চন্দ্রভূষণ অপ্রতিভভাবে বলেন, 'অত হাসছো যে?'
'হাসছি কি আর সাধে? হাসছি তোমার বুদ্ধি দেখে। এত বুদ্ধিমান ছিলে আগে, এত বোকা হয়ে গেলে কি করে বল তো? বুদ্ধির গোড়ায় বৌ না থাকলেই এই দশা হয়।'
হঠাৎ চন্দ্রভূষণ ঐ হাস্যবিধুরার দুই বাহুমূল চেপে ধরেন, রুদ্ধগলায় বলেন, 'আগের কথা স্বীকার করলে তা'হলে এতদিনে?'
ছোট ললিতা তাড়াতাড়ি হাসি থামিয়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'ওমা শোনো কথা!... আগের কথা আবার কি? স্বীকার করাই বা কি?'
'এই আগে চিনতে আমাকে! স্বীকার করনি কোনোদিন—এ পর্যন্ত শুধু রহস্যের আবরণেই রয়ে গেছো।'
কথাটা সত্যি।
কথাটা ঊনপঞ্চাশ বছরের তরুণ প্রেমিক চন্দ্রভূষণের কবিত্ব মাত্র নয়।
স্বীকার করে না ও। স্বীকার করেনি।
যেদিন রেলগাড়িতে চন্দ্রভূষণ সেই গেরুয়াধারিণীর সামনে গিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'কে আপনি?' সেদিন তো নয়ই, এখনো পর্যন্ত নয়।
'তুমি চম্পা।'
'চম্পা!' ও হেসে উঠে বলেছিল, 'কী মুশকিল! সেটা আবার কে?'
'চাপা দিতে চেষ্টা কোরো না—' চন্দ্রভূষণ সামনের সিটে বসে পড়ে নিজে চাপা উত্তেজিত গলায় বলেছিলেন, 'আমাকে ঠকাতে পারবে না তুমি, গেরুয়া পরেও নয়। স্বীকার কর তুমি চম্পা।'
কিন্তু এত সাহস হয়েছিল কি করে চন্দ্রভূষণের, দুঃসাহসই বলা যায় যাকে? ... ওই গেরুয়াধারিণী যদি একবার চেঁচিয়ে উঠে বলতো, 'কাকে কী বলছেন?' গাড়িসুদ্ধ লোক পিটিয়ে পাট করে ফেলতো না চন্দ্রভূষণকে?
কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠেনি ও।
বোধকরি ওর চোখের দৃষ্টিতে ছিল প্রশ্রয়।
ওই গেরুয়াটা যে ওর ছদ্মবেশ মাত্র, সে কথা যেন মুহূর্তে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই দৃষ্টি। তাই ওর সামনের সিটে বসতে ভয় পাননি চন্দ্রভূষণ।
গাড়ির কেউ গ্রাহ্য করেছিল, কেউ করেনি।

নাকে রসকলি আঁকা পুঁটলি কাঁধে বৈষ্ণবী এমন একটা দুর্লভ দৃশ্য নয় যে, তাকিয়ে দেখবে লোকে।

হয়তো ভেবেছিল চেনাশোনা।

হয়তো বা ভেবেছিল, লোকটা গেরুয়ার প্রতি আকর্ষণশীল।

কেউ গ্রাহ্য করেনি।

গেরুয়া নিজেও নয়।

অবহেলার মত করেই বলেছিল, 'হঠাৎ আপনাকেই বা ঠকাতে যাব কেন? আপনি কোথায়, আমি কোথায়, রাজশাহীটাই বা কোথায়?'

'কোথায় সেটা যদি ভুলে গিয়ে থাকো, মনে পড়িয়ে দেব', চন্দ্রভূষণ বলেছিলেন, 'এখন কোথা থেকে আসছো?'

'পৃথিবীর কোনো একখান থেকে।'

'ওঃ তাই বুঝি। পৃথিবীর। তবু ভালো। প্রেতলোক থেকে নয়তো? ঠিক আছে। যাচ্ছ কোথায়?

'জানি না।'

'জানি না।'

'ঠিক তাই। রেলগাড়িতে উঠে বসেছি, যেখানে ওর মর্জি নিয়ে যাবে।'

হেসে হেসেই বলে।

রেগে রেগে বলে না—'আমাকে খামোকা 'তুমি' করে কথা বলবার মানে? কে দিল এ অধিকাব?'

বলে না।

তাই চন্দ্রভূষণই রেগে বলেন, 'বাজে কথা বোলো না। টিকিট কেটেছ কোথাকার?'

বৈষ্ণবী বৈষ্ণবীর মর্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে হেসে খানখান হয়ে বলেছিল, 'টিকিট? গেরুয়া পরলে আবার টিকিট কাটতে হয় নাকি? ভারতবর্ষের এই মহান ব্যবস্থা, রেল কোম্পানির এই বদান্যতা জানা নেই আপনার?

চন্দ্রভূষণ অভিভূতের মত তাকিয়ে থেকেছিলেন সেই মুখের দিকে।

গাড়ির গতি পিছিয়ে পড়ছিল সেই নির্নিমেষ দৃষ্টির অন্তরালে উত্তাল উদভ্রান্ত মনটার থেকে। রেলগাড়ির চেয়ে দ্রুত ছুটছে সেই মন, ফেলে আসা লাইন ধরে।

রাজশাহীটা আবার কোথায়, বললেই কি ভোলাতে পারবে ও চন্দ্রভূষণকে?

একদিনই শুধু ভোলাতে পেরেছিল একজন। পেরেছিল ঠকাতে। সে হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া দেবু।

সবাইকে ঠকিয়েছিল। মিথ্যা কথা সাজিয়ে—

কিন্তু বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি সেই মিথ্যাকে।

হঠাৎ একদিন হাউমাউ করে কেঁদে বলে ফেলেছিল, 'আমি মহাপাপী রে চানু, আমার পাপের ক্ষমা নেই। আমার দোষেই চম্পি—'

চানু নামের সেই বাইশ তেইশ বছর মাত্র বয়সের ছেলেটা ওর ঘাড়টা চেপে ধরতে গিয়েছিল। বলেছিল, 'বল কী বলতে যাচ্ছিলি? চম্পা কি?'

'চম্পির সর্বনাশের কারণ আমিই রে চানু—আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। তবু বিশ্বাস কর ভাই, আমি বুঝতে পারিনি, আমি শয়তানটাকে চিনতে পারিনি—'

' সত্যিই পারেনি চিনতে। সত্যিই ঠকেছিল সে।

জামির যখন সেই জন্মাষ্টমীর মেলার দিনে বলেছিল, 'এই দেবু, নদীর ওপারে এক ফকির এসেছে, ভূত ভবিষ্যৎ সব বলতে পারে, যাবি সেখানে?'

তখন দেবু উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিল, ভাবেনি এটা একটা শিকারের জাল।

কী করে ভাববে? জামির তো তার মত বয়সেরই একটা ছেলে মাত্র, কিন্তু জামির সেই জাল পেতেছিল। সরল আর স্নেহময় মুখ করে বলেছিল, 'চম্পাকেও নিয়ে গেলে হয়। পরে শুনে হয়তো হায় হায় করবে।'

'চম্পিকে মা ছাড়বে না।'

দেবু অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করেছিল।

তবু শয়তান ছাড়েনি।

বলেছিল, 'ছাড়বে না সে তো জানা কথা। গোলমালের মধ্যে থেকে চুপিচুপি বার করে আনবি, এই আর কি। কতক্ষণই বা লাগবে? যাব আর আসবো। যেতে আসতে বড়জোর মিনিট কুড়ি।'

'ফকির যদি বসিয়ে রাখে এক ঘণ্টা?'

'দূর! সে তো মুখ দেখেই বলে দেয় সব।'

মুখ দেখে ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে, এমন সাধু ফকির যে কখনো না দেখেছে দেবু, তা' নয়, তাই অবিশ্বাস করেনি। শুধু মাথা নেড়ে বলেছিল, 'মা ঠিক জানতে পারবে, বকবে।'

'তবে থাক্।' বড় যেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে এইভাবে বলেছিল জামির, তবে থাক্। পরে শুনলে আপসোস করবে মেয়েটা, তাই—'

জামিরের ওই সহানুভূতির পরিচয়ে চম্পার নিজের ভাই দেবু লজ্জিত হয়েছিল, ভেবেছিল আমার থেকে ওর মমতাটা বেশী হচ্ছে। তাই বলেছিল, 'আচ্ছা আনছি ডেকে।'

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান।

সব চোখের উপর জ্বলজ্বলিয়ে উঠবে।

এ এক বড় ভয়ানক প্রলোভন।

এ প্রলোভনে আবালবৃদ্ধবনিতা ভোলে, বিজ্ঞ ভোলে, পণ্ডিত ভোলে।

আর এ তো একটা কিশোরী মেয়ে মাত্র।

যে নাকি তার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোথাও দেখছে না আলোর রেখা।

চম্পা ভিড়ের মধ্যে থেকে মাসির সঙ্গচ্যুত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তো ফিরে আসবে, তখন বললেই হবে, 'কোন্ দিকে ছিলে তোমরা, আমি খুঁজে খুঁজে—'

তীরে নৌকো বাঁধা ছিল।

যে নৌকোয় চড়ে ওপারে গিয়ে আপন ভাগ্যের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জেনে ফেলবে চম্পা।

তা হয়তো দেবুর সেই শয়তান বন্ধুর কথা মিথ্যাও নয়, জানতেই তো পেরেছিল সেদিন চম্পা তার ভূত ভবিষ্যৎ। শুধু জানবার জন্যে কষ্ট করে আর খেয়া পার হয়ে ফকিরের আস্তানায় যেতে হয়নি। শয়তানই সে ভাগ্যলিপি পড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু দেবু?

দেবু যায়নি।

দেবু নৌকোয় চড়েনি।

ঠিক শেষ মুহূর্তে দেবুর বন্ধু দেবুকে বলেছিল, 'সর্বনাশ করেছে। ফকিরের জন্যে যে একটু কর্পূর নিয়ে যেতে হয়। ওই কেবল ওঁর দক্ষিণা। আর কিছু না। ইস্ একদম ভুলে গেছি। ... দেবু, দোহাই তোর, যা ভাই একবার ছুটে, মেলার বাজার থেকে একটু কর্পূর নিয়ে আয়।'

কর্পূর! শুনতে তুচ্ছ, মুহূর্তে উড়ে যাবার, কিন্তু জিনিসটা ঠিক সেই পরিস্থিতিতে সহজপ্রাপ্য হয়নি, অনেকটা খোঁজাখুঁজি করে যখন নিয়ে গিয়ে হাজির হলো দেবু, দেখলো কর্পূরের মতই উপে গেছে তার বন্ধু, তার বোন!

খেয়া নৌকোখানা যেমন ঘাটে বাঁধা ছিল তেমনিই পড়ে রয়েছে।

'বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম রে চানু, তবু তখনো তার শয়তানির ওজন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, তবে কি হঠাৎ মা বাবা এসে পড়েছিলেন? জামিরকে কি তিরস্কার করেছিলেন এই দুর্বুদ্ধির জন্যে? চম্পাকে ধমক দিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন?

তারপর বুঝতেই পারছিস অবস্থা?

ভিড়ে মেয়ে হারিয়ে ফেলা উদভ্রান্ত মা বাবার সেই মূর্তির সামনে আমি বলতে পারলাম না আমার

বোকামির কথা। আমি শুধু আড়ালে মাথা ঠুকতে লাগলাম। ছেলেবেলা থেকে চম্পিকে যত উৎপীড়ন করেছি, সব মনে পড়ে বুক ভেঙে যেতে লাগলো, আর তখনই বুঝতে পারলাম ওকে আর পাওয়া যাবে না। বুঝতে পারলাম জামির কত বড় শয়তান।'

একটা মুখ্যু ছেলের মুখ্যুমিতে হারিয়ে গেল চম্পা নামের সেই 'অসংযমী' মেয়েটা। যে নাকি এক অনাত্মীয় পুরুষের শোবার ঘরে এসে ঢুকতে সাহস পায়—

'অনেকদিন পরে জামিরকে একদিন দেখেছিলাম কলকাতায়—' দেবু বলেছিল, 'চেপে ধরেছিলাম তাকে 'কোথায় চম্পি?' বলে। অচেনার ভান করেছিল, বলেছিল, 'কাকে কি বলছেন?' ...রাস্তায় লোক জমে গেল, ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম।'

আর বলেছিল দেবু, 'সে কি আর বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই সুইসাইড করেছে। যে অভিমানী!'

অতএব মরেই গিয়েছিল চম্পা।

কিন্তু কত বছর যেন পরে চন্দ্রভূষণ বলে উঠলেন, 'আমায় তুমি ঠকাতে পারবে না, গেরুয়া পরেও না।'

তারপর, আরও কি যেন কথার পর বলেছিলেন, 'কোথাও যেতে হবে না, আমার সঙ্গে এসো'।

বৈষ্ণবী এবার ওই বেপরোয়া লোকটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'তারপর?'

'তারপর আবার কি? থাকবে চিরকাল।'

'ওমা তাই নাকি? বৈষ্ণবী চোখের নীচেটা আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বলেছিল, 'সত্যি? আহা! চিরকালের ভার নেবেন? গ্যাবান্টি?'

'গ্যারান্টি।'

'আহা তবে আর রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে, আর দু'পয়সার ছোলাভাজা খেয়ে খেয়ে ঘুরে মরি কেন? চলুন চলুন।'

যেন শুধু লীলাকৌতুকে চন্দ্রভূষণের সঙ্গে নেমে পড়েছিল বৈষ্ণবী। যেন শুধু মজা করবার জন্যেই, যেন ওই নামাটা সত্যি নামা নয়। হঠাৎ আবার কখন চড়ে বসবে ট্রেনে।

কিন্তু নাম বলে না।

বলে না, 'চম্পা নামের একটা মেয়েকে চিনতাম।' বলে না, 'রাজশাহী আবার জানি না? সে কি ভোলবার জায়গা?'

বলে, 'রাজশাহী আবার কোথায়? চম্পাটি কে গো?' আর বলে, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে, অনেক 'মহাপুরুষ' দেখতে হয়েছে, এখন বলুন কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবেন আমাকে?'

চন্দ্রভূষণ তার উত্তর দেননি, চন্দ্রভূষণ বলে উঠেছিলেন, 'ফেলবো, একথা তো বলিনি, চিবকাল মাথায় করে রাখবো সেই কথাই হয়েছে।'

'যাক্ বাবা বাঁচা গেল—' বৈষ্ণবী বেপরোয়া হেসে উঠেছিল, 'এতদিনে মনের মতন একটা লোক পেলাম, যে যাবজ্জীবনের ভার নিতে রাজী। কার মুখ দেখে আজ যাত্রা গো—'

কথার ধরনই ওই।

যেন কৌতুক করছে।

যেন মোটেই নামবে না চন্দ্রভূষণের সঙ্গে, তামাসা করছে মাত্র।

যেন নামেও যদি, তো সহসা কোথায় হারিয়ে যাবে আবার।

শুধু মূঢ় চন্দ্রভূষণের ধৃষ্ট প্রস্তাবটাকে ব্যঙ্গ করতেই যেন ওর এই নেমে পড়া।

অথচ রয়ে গেল।

যেন আকাশের পাখী স্বেচ্ছায় খাঁচায় এসে ঢুকলো।

কিন্তু রইলো যেন সূক্ষ্ম একটুখানি জালের ওড়নায় মুখ ঢেকে।

চম্পাকে চেনে না, শোনেওনি কখনো তার নাম। তবে তুমি যদি সে নামে ডেকে সুখ পাও, ডাকো।

তুমি আমায় চিনেছ?

বেশ তো। ভাল কথা। তাতেই যদি খুশি হও তো হও।

কিন্তু থাক্ না ওই পর্যন্তই। আমি তোমায় এই নতুন চিনলাম। আমার এই ওড়না আমি নাই বা খুললাম নিজে হাতে।

তাই বলেছিল, 'ভিখিরী, বোষ্টম, সন্নিসী, এদের কি নাম থাকে গো?'

'নাম যদি থাকে না তো আমার দেওয়া নামটাই পাকা হোক।'

'নাম আবার কাঁচা পাকা! কতজন তো কত নামে ডাকলো, তুমিও না হয়—হি হি হি!'

'কিন্তু আমি তো তোমায় বানানো নাম দিচ্ছি না। তুমি যেখানে প্রথম ফুটেছিলে, যেখানে তোমার সেই সদ্যফোটা কুসুমজীবনের সৌরভ ছড়িয়ে আস্তে আস্তে দল মেলেছিলে, এ যে সেখানকার নাম!' বলেছিলেন চন্দ্রভূষণ, এই ভাষায় না হোক, এই ধরনে।

'ওমা তাই বুঝি! শোনো কথা! ভূতেরও আবার জন্মদিন থাকে? নতুন কথা শুনছি যে!'

হেসে গড়িয়েছে বৈষ্ণবী।

কতদিন কত মুহূর্তে চন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'চম্পা, তোমার মনে পড়ে না রাজশাহীতে সেই একদিন—'

ও বলেছে, 'এই দেখ, আবার তুমি কার সঙ্গে কাকে গুলোচ্ছ! বললে সেদিন, 'নাম নেই তো একটা নাম দিই—' তাই জানি। ভাবলাম নামটাম ছিল না কিছু, তবু একটা মিষ্টি নাম হলো। ওমা এখন আবার লোকটা বলে কী গো! তোমার কথা শুনে মনে হয় নামটা একটা সত্যি মানুষের! তার ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, আপনজন ছিল। না না, ওসবের মধ্যে আমি নেই। আমার ভূতও নেই, ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বর্তমান। যদি তাতেই খুশী থাকো, তোমারও কষ্ট লাঘব, আমারও কষ্টের লাঘব।'

তবু আজ সহসা অসতর্কতায় বুঝি উড়ে গেল সেই ওড়না।

পাতানো চম্পা আসল চম্পার গলায় বলে উঠলো, 'আগে তো বেশ বুদ্ধিমান ছিলে, এমন বোকা হয়ে গেলে কেন? বুদ্ধির গোড়ায় বৌ না থাকলে—'

চন্দ্রভূষণ বাধা দিয়ে বলেন, 'স্বীকার করছ তা'হলে, আগে চিনতে আমাকে?'

চম্পা হেসে ওঠে, 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে না চাপিয়ে ছাড়বে না দেখছি। কোথায় কবে একটা পাজীর পা-ঝাড়া মেয়ে ছিল, মাঝরাত্রে পরপুরুষের ঘরে এসে ঢুকতে পেছপা হতো না, আর লক্ষ্মীছাড়ামি করে মোছলমানের ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছল, তার ত্যাগ করা খোলসে আমায় পুরে না ফেলতে পারলে বুঝি শান্তি নেই তোমার?'

চন্দ্রভূষণ কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'না শান্তি নেই। আমি স্পষ্ট হতে চাই। চম্পা, মাঝখানের এই দিনগুলো কি সত্যিই অলঙ্ঘ্য? পার হয়ে যাওয়া যায় না? মুছে ফেলা যায় না? ফিরে যাওয়া যায় না সেই দিনটায়? যেদিন তুমি—'

'আমি নয়, তোমার সেই লক্ষ্মীছাড়ি চম্পা বল—'

'তুমিই আমার সেই চম্পা, যে আমায় লক্ষ্মীছাড়া করেছে!'

চম্পা আস্তে চন্দ্রভূষণের একটা হাত হাতে তুলে নেয়, বলে, 'বেশ না হয় তাইই হলো, চম্পার সেই ছাড়া খোলসের ভিতর আবার না হয় ঢুকলাম, তারপর?'

'তারপর?' চন্দ্রভূষণ যেন অবোধের মত উচ্চারণ করেন।

'হ্যাঁ, তার পরটা দেখতে হবে না? না বুঝে সুঝে ঢুকলেই হলো?'

'চম্পা, তবে তারপর আবার ফিরে যাই চল সেদিনের পরের সকাল থেকে। তোমার মুখে আশা প্রত্যাশা আনন্দ, আমার মুখে দৃঢ় সংকল্প। বাড়ির সকলের মত করিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল চম্পা! সে চিঠির জবাব এল না। কিন্তু মনে হচ্ছে এতদিনে পেয়েছি জবাব।'

চম্পা যদি তো চম্পা, বলে ওঠে, 'শুনতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু জবাব পাওয়ার পরটাও ভেবে রাখতে হবে তো? তারপর?'

চন্দ্রভূষণ আহত গলায় বলেন, 'সব সময় সব কথা হেসে উড়িয়ে দিও না। বল যদি তো বলি, তোমার আপত্তি শুনবো না আর। আমার শুধু প্রিয়া নিয়েই চলছে না, আমার বৌ চাই। যে বৌ আমার ঘরে সংসারে অধিকারের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যশাসন করতে পারবে। আমার—'

চম্পা খুব গম্ভীর আর নিরীহ গলায় বলে, 'আচ্ছা তোমার বয়স কত হলো বলতো? বোধহয় উনপঞ্চাশ, তাই না? এই বয়সেই উনপঞ্চাশী ধরে শুনেছি।'

চন্দ্রভূষণ সহসা উঠে পড়েন।

বলেন, 'আচ্ছা, আমার কথার উত্তর পেয়েছি। চললাম দেবুকে বোলো দোকানটা তারই রইলো—'

চন্দ্রভূষণ সেই সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যে সিঁড়িটার শেষ প্রান্তটা গিয়ে ঠেকেছে রাজরাস্তায়।

চন্দ্রভূষণ ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন, চন্দ্রভূষণ ওই রাজরাস্তায় পড়বেন। চন্দ্রভূষণ তারপর হয়তো ধূসর হয়ে যাবেন, মিলিয়ে যাবেন। আর কোনদিন ওই সিঁড়ির ধাপে ধাপে চন্দ্রভূষণের বলিষ্ঠ পদশব্দ শোনা যাবে না।

চন্দ্রভূষণ আহত হয়েছেন।

চম্পা মাত্রা ছাড়িয়েছে।

কিন্তু চন্দ্রভূষণ যে একটা ভয়ানক অবাস্তব চিন্তার মধ্যে বাস করছেন, আঘাত করা ছাড়া গতি কি? না বলে উপায় কি, 'আগে তো বেশ বুদ্ধিমান ছিলে!'

না বলে উপায় কি, 'বয়েস কত হলো, উনপঞ্চাশ?'

তাই বলে ওকে কি চলে যেতে দেবে চম্পা? যেতে দেবে চম্পার জীবন থেকে? কে জানতো চম্পার জীবনপথে আবার ওর পা পড়বে! কে জানতো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে না গিয়ে ও বলে উঠবে, 'এসো আমার সঙ্গে!'

আশ্চর্য যে সত্যই চলে এসেছিল চম্পা। হয়তো চরম একটা ভুল করে বসেছিল সে।

সেই ভুলটা না করলে আবার সব ঠিক হয়ে যেত।

চন্দ্রভূষণের সাজানো ছক এলোমেলো হয়ে যেত না। জেঠামশাই হয়ে যাওয়া চন্দ্রভূষণ কলঙ্কের মালা গলায় পরতে বসতো না। উন্মনা হয়ে ক'দিন হয়তো ভাবতো, কে ও স্বীকার করল না, কিন্তু মনে হচ্ছিল ও বুঝি চম্পা। তারপর ভুলে যেত।

উচিত কাজ সেদিন করেনি চম্পা। চম্পা চলে এসেছিল। কারণ চম্পা লোভে মরে গিয়েছিল।

চম্পা 'অসংযমী' হয়েছিল। যে চম্পা রাতের অন্ধকারে একদিন ওর কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল আরো অনেক অন্ধকারের পাথারে, সেই চম্পা দিনের আলোয় আবার ওর কাছে এসে দাঁড়াবার ডাক পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি।

ভেবে দেখেনি, চম্পাকে ঘিরে যে অন্ধকারের বলয়, দিনের আলোকে 'আলো' থাকতে দেবে না সে, ম্লান করে দেবে।

চম্পা আবার জীবনের হাতছানিতে লুব্ধ হবে? জীবনের তেতাল্লিশটা বছর পার করে আসা চম্পা!

কিন্তু সত্যিই কি তেতাল্লিশ?

তিনশো বছর নয়?

শতাব্দীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেনি চম্পা, তার জীবনের এক এক মোড়ে?

চন্দ্রভূষণ তাকে বৌ হতে বললেই হতে পারবে সে?

চন্দ্রভূষণের দিকেও যুক্তি ছিল বৈকি। চন্দ্রভূষণ একদিন শুনেছিলেন উদিতার নিজের দাদার কাহিনী। 'অনেক হাত ফেরত' চিত্রজগতের এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করে, সমাজে নাকি একজন মান্যগণ্য বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছে উদিতার দাদা। সেই বৌদি দাদার থেকে বয়সে বেশ খানিকটা বড়, কিন্তু তাতে কি? ওটাও তো প্রগতির আর এক চিহ্ন।

উদিতা অতএব তার দাদা বৌদির 'হনিমুনে'র হরেক ছবি ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে আনন্দে, গৌরবে, পুলকে।

বাড়িতে যে বেড়াতে আসবে, সে যেন দেখতে পায় উদিতার দাদা কেউকেটা নয়। যেন দেখতে পায় উদিতার পিতৃকুল কত প্রগতিশীল। তা' দেখছে সেই চোখে।

ভাগ্নে ভাগ্নীরা তো তদবধি উদিতাকে পরমপূজ্যি করতে শুরু করেছে।

'মালিনী বসু' তোমার নিজের বৌদি ছোটমামী? তোমাদের বাড়িতেই থাকেন? উঃ কী মজা তোমার। আচ্ছা উনি ঠিক আমাদের মত?'

উদিতা কৃপার হাসি হাসে।

কারণ উদিতার মর্যাদা বেড়ে গেছে, কৃপার হাসি হাসবার অধিকার জন্মেছে।

উদিতার পিতৃপরিবারকে কেউ সমাজচ্যুত করেনি। উদিতার সেই আর্টিস্ট ভাইবৌ যে বাড়িতে অতিথি গেলে কখনো কখনো নিজে হাতে চা কফি পরিবেশন করে, এ শুনে মোহিত হয় লোকে, উদিতার বাবার ভাগ্যকে ধন্য ধন্য করে।

চন্দ্রভূষণ এই শোনাটা থেকে যুক্তি—

কিন্তু এ যুক্তি কি চন্দ্রভূষণের কাজে লাগবে?

চম্পা কি আর্টিস্ট? তাই ওর সাতখুন মাপ হবে?

চম্পা তো একদম রাবিশ।

আর চন্দ্রভূষণ?

উনপঞ্চাশের দরজায় এসে পৌঁছনো জেঠামশাই।

তবে?

কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা?

কিসের সূত্রে কিসের যুক্তি?

না, চন্দ্রভূষণের যুক্তি তাঁর জীবনের কাজে লাগবে না।

তবু চম্পা এগিয়ে আসে, সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পথ আগলায়।

বলে, 'নিষ্ঠুরতায় দেখছি এখনো সমান আছো। ফেলে চলে যাচ্ছ যে? বলেছিলে না চিরদিনের মত ভার নেবে?'

চন্দ্রভূষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, তাই নিতে চাইছি! নিতে চাইছি সম্ভ্রম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, সম্মান দিয়ে। কিন্তু সেটা তোমার কাছে হাস্যকর হচ্ছে—'

চম্পার বড় বড় চোখ দুটো আরো গভীর আরো কালো দেখায়, 'যাকে যা দেওয়া যায় না, তাকে তা' দিতে যাওয়া তো হাস্যকরই গো! তার চেয়ে এই তো বেশ আছি, রোজ তোমায় দেখতে পাচ্ছি—'

'পাচ্ছ! তবে লোকে বলছে আমি খারাপ বাড়িতে আসছি।'

'সে তো বলবেই'—চম্পা হঠাৎ ওর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হেসে ওঠে, 'বলবে না? লোকের চোখে যার যা রং, যার যা নাম, লোকে তাইই বলবে। তুমি বাড়ির জেঠামশাই, বৌমাদের পূজনীয় ভাসুরঠাকুর, তুমি নিত্য এসে ধরনা দেবে তোমার পেয়ারের বোষ্টুমীর কাছে, আর লোকে কিছু বলবে না? না বাপু না, নিজেকে 'নির্দোষ' বলে চালাতে চেষ্টা করা চলবে না।'

চন্দ্রভূষণ জেদের গলায় বলেন, 'এতে কারুর কোনো ক্ষতি হচ্ছে?'

চম্পা আবার হেসে ওঠে। সেই হাসি।

সত্যিকার চম্পা! রাজশাহীর চম্পা!

বলে, 'সাধে কি আর বলে বুদ্ধির গোড়ায় বৌ না থাকলেই পুরুষের হতবুদ্ধি দশা। নাই বা কারুর কোনো ক্ষতি করলে, নিজের ক্ষতি করবার অধিকারও নেই তোমার। তুমি সমাজ সংসারের একটা মানুষ নও?'

চন্দ্রভূষণ সিঁড়ির রেলিংটা ধরে আস্তে বলেন, 'লাভ ক্ষতি বুঝি না চম্পা, জীবনের প্রারম্ভে বৌ হারিয়ে ফেলে বোকার মত সংসারের গোলকধাঁধায় ঘুরছি আর তার অভাব অনুভব করছি। হঠাৎ বিধাতা সেই হারানো বৌকে দিলেন খুঁজে—'

'ওটা বিধাতার ব্যঙ্গ চানুদা!' চম্পা আস্তে ওঁর গায়ে হাত রেখে শান্তগলায় বলে, 'বৌ যদি তোমার ভাগ্যে থাকতো, আর বৌয়ের থাকতো সেই ভাগ্য, জীবনের প্রারম্ভে হারিয়েই বা যাবে কেন? ওটা আর এ জন্মে হলো না তোমার। আসছে জন্মের জন্যে মুলতুবী থাক্।'

চন্দ্রভূষণ ওই শান্ত মুখের দিকে তাকান।

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'বিধাতার এই ব্যঙ্গের কি দরকার ছিল বল তো?'

'বোধকরি ওই কাঁটার মালাটার জন্যে!' চম্পা বলে, 'ওটাও পাওনা থাকে কিনা! নইলে কী দরকার ছিল বল তো, তাঁর একটা ষোলো বছরের সংসারবুদ্ধিহীন মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে আগুনে ফেলে দেবার?'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'বিধাতার ব্যঙ্গকে ব্যঙ্গ করা যায় না? জয়ী হওয়া যায় না তার উপর?'

'হয় না, যায় না!' চম্পা বলে, 'আমি তো বুঝি, তোমার মন সংসারী, তোমার মন সামাজিক, তুমি সব নিয়ে পূর্ণ। শুধু অশরীরী প্রেমের সম্বল নিয়ে নতুন জীবন গড়তে বসলে শুকিয়ে যাবে তুমি, শুকিয়ে যাবে তোমার প্রেম। তুমি বুঝতে পার না সেটা, আমি পারি। আমি তো দেখতে পাই, সংসারের কাছে আঘাত পেলে কতটা ভেঙে পড় তুমি, গল্প করতে বসলে ঘুরে ওদের কথাই এসে যায় তোমার—'

অস্বীকার করতে পারেন না চন্দ্রভূষণ।

সংসারটা তার কাছে পরম মূল্যবান।

জীবনের গভীরে যে শূন্যতা তাকে আরো গভীরে রেখে, ওই সংসারটাকে নিয়েই তো পূর্ণ হতে চেয়েছিলেন এতদিন! প্রথমে ছিল চম্পার 'বিশ্বাসঘাতকতা'র যন্ত্রণা, তারপর এল চম্পার প্রতি অবিচার করার যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার কোনো ওষুধ ছিল না। সংসারটাকেই সে ওষুধ বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ দেখতে পাচ্ছেন চন্দ্রভূষণ, তিনি সংসারটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেও, সংসার তাঁকে আঁকড়ে থাকতে আদৌ রাজী নয়, বরং তাঁর আঁকড়ানির বন্ধনে থাকতেও নারাজ।

সে কি শুধু আজ চন্দ্রভূষণ হঠাৎ 'চরিত্র খারাপ' করেছেন বলে?

তা' নয়—

বহু সন্ধ্যার গল্পের মধ্যে একথা বলেছে চম্পা, 'নারাজ তুমি খারাপ বলে নয়, তুমি উদার বলে, তুমি মহৎ বলে, তুমি ওদের মত নও বলে।'

'এ তুমি কী বলছো চম্পা?'

বিস্ময়াহত হয়েছিলেন চন্দ্রভূষণ।

চম্পা বলেছিল, 'ঠিকই বলছি। তুমি যদি ওদের সঙ্গে পাই পয়সার হিসেব নিয়ে চুল চিরতে বসতে, যদি ওদের মত তোমার স্বার্থের পুঁটলিটায় কড়া করে গিঁট দিতে জানতে, যদি ওদের ওই ক্ষুদ্রতার গণ্ডির মধ্যে নেমে এসে জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে পারতে, ওরা তোমায় সহ্য করতে পারতো। কিন্তু তা তো হয়নি, তুমি উদার হয়েছ, তুমি ওদের মর্যাদাকে আহত করে সমগ্র সংসারের দায়িত্ব নিয়েছ, তুমি ওদের থেকে উচ্চস্তরে বসে ওদের স্নেহ করেছ, এ ওরা কতদিন সইবে? উদারতার বোঝা সবচেয়ে বড় বোঝা, বইতে পারা বড় কঠিন। তুমি অবিরত দিয়ে চলেছ, ওরা অবিরত নিতে বাধ্য হয়েছে, এ কী সোজা শাস্তি নাকি? ওরা যদি ক্রমশঃ তোমাকে সহ্য করতে অপারগ হয়ে ওঠে, দোষ দেওয়া যায় না ওদের।'

চন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'কিন্তু আমি তো ভালবেসেই করি। আমি তো অহমিকা দেখাতে যাইনি—'

'তা' বললে কি হবে? ওদের অহমিকা তো ক্ষুণ্ন হয়ে চলেছে? দেওয়া সহজ, নেওয়া কঠিন! আমার মত বেহায়া না হলে আর—'

হেসে কথার শেষ করেছে চম্পা।

আবার একসময় চন্দ্রভূষণ রেগে উঠে বলেছেন, 'তুমি ওদের জানো না, এক পয়সা খরচ করতে হলে মরে—'

'জানি, জানবো না কেন?' চম্পা হাসে, 'তোমার যদি বৌ থাকতো, সংসার থাকতো, তুমিও তাই মরতে!'

চন্দ্রভূষণ চোখ তুলে চেয়েছেন, বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বলেছেন, 'আমার বৌ ওরকম হতো না।'

চম্পা হি হি করে হেসেছে, 'হতো না মানে? অবিকল ওই হতো। ঘর পাওয়া বর পাওয়া মেয়ের মেজাজই আলাদা, বুঝলে? ঘরের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে ভরে ফেললে ঘরের মাপের মত হতে হবে তো? মেয়েদের অত উদার হলে চলে না।'

ঘুরে ফিরে প্রায়ই এ কথা হয়েছে।

হ্যাঁ, ঘরসংসারের কথাই তো বেশী।

ভালবাসার কথা আর কতটুকু?

সে তো শুধু কথার টুকরোয়, কথার অলংকারে, আর দৃষ্টির ব্যঞ্জনায়।

চম্পার কাছে এসে সুখ দুঃখের কথাই বলেন চন্দ্রভূষণ। চম্পা ধরা দেয় না, তবু মামা মামীর শেষজীবনের দুঃখময় কাহিনীর কথা বলেন, বিয়ে করা নিয়ে মার আক্ষেপের কথা বলেন, আর ইদানীং যে তাঁদের সংসারের রং হঠাৎ হঠাৎ কেমন বদলে যাচ্ছে সে কথা বলেন।

হঠাৎ নিজেকে কেমন অপমানিত লাগে, হঠাৎ যেন অসহায় লাগে নিজেকে, অবয়বহীন একটা দুঃখ যেন ঘিরে ধরতে চায়, এসব কথা বলতে পাওয়াও পরম এক সুখ!

কাউকে মনের কথা বলতে পাওয়া যে এত সুখ, একথা কবে জেনেছেন চন্দ্রভূষণ? কারো কাছে সহানুভূতি পাওয়ায় যে এত পরিতৃপ্তি, পরামর্শ পাওয়ায় যে এত রোমাঞ্চ, একথা কবে অনুভব করেছেন?

এখন মনে পড়ছে, চন্দ্রভূষণই ওদের দিকে ষোলোআনা মনোযোগ দিয়েছেন, ওরা কোনোদিন চন্দ্রভূষণের দিকে মনোযোগ দেয়নি।

চন্দ্রভূষণ বরাবর ওদের সহানুভূতি করেছেন, ওরা কোনোদিন চন্দ্রভূষণকে সহানুভূতি করেনি। চন্দ্রভূষণ ওদের পরামর্শ দিতে গেছেন, ওরা কোনো দিন চন্দ্রভূষণকে পরামর্শ দিতে আসেনি।

ওবা ছোট?

তাতে কি?

ভালবাসার দাবিতে তো সব কিছু সহজ হয়ে যায়।

চম্পা তো দিল পরামর্শ।

বললো, 'সবসময় বোনেদের আনায় বৌরা যদি বেজার হয়, নাই বা আনলে! তোমাব যখন নিজের গিন্নী নেই, জোর কার ওপর? ইচ্ছে হলে বরং তুমি ওদের কাছে চলে যেও।'

'আমি ওদের কাছে?'

'হ্যাঁ, মন্দ কি? দেদার বাজারপত্র করে নিয়ে হাজির হলে একজনের বাড়ি, বললে, আজ তোর কাছে খাব, রাঁধ ভাল করে—'

চন্দ্রভূষণ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আমি খাবার জন্যে—?'

'আহা তা' কেন? ওদের জন্যেই। শুধু ওইভাবে বললেই শুনতে ভাল। এক বোনের বাড়িতে বা আর দুই বোনকে ডাকলে, তাতেও মজা!'

সে পরামর্শ নিয়েছিলেন চন্দ্রভূষণ, দেখেছেন সত্যি, তাতেও মজা। বেশ নতুন স্বাদ! বাড়ির সবাই ছিল না বটে, কিন্তু তাতে যেন একটা মুক্তির স্বাদ ছিল। ইদানীং যে সবসময় মনে হচ্ছে, ওরা বোধহয় এটা অপছন্দ করছে, সেটাব ভার আছে।

এ পরামর্শ আর কেউ কোনোদিন দেয়নি।

সেদিন তাই বারেবারে মনে হয়েছে, যদি এই আনন্দের মাঝখানে চম্পা ঘুরতো ফিরতো!

তা' চম্পা পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছে সব।

ঠিক যেমন করে একটি প্রৌঢ় দম্পতি অবসর সময়ে বসে সংসারের গল্প করে, তেমনি দেখিয়েছে ওদের।

হ্যাঁ, ঠিক তেমনিই দেখায় ওদের।

চম্পার পরনে শুধু একটা শাদা সেমিজ আর একখানা শাদা শাড়ি, লালপাড়ের শাড়ি, চন্দ্রভূষণের বেশবাসে দোকানী মানুষের শিথিলতা।

চন্দ্রভূষণ চৌকির উপর, চম্পা সামনে একটা টুলের উপর। বিন্দুভূষণের ছোটছেলেটার বুদ্ধিমত্তার কাহিনী বর্ণনা করতে করতেই হয়তো চন্দ্রভূষণের পুরো একটা সন্ধ্যা খরচ হয়ে যায়।

কিন্তু সেই খরচটাকে কি বাজে খরচ মনে করেন চন্দ্রভূষণ?

করেন না।

চম্পার ওই সুন্দর হাসিটা তো ওতেও ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে ওঠে, ওই বড় বড় চোখ দুটো তো ওতেও চঞ্চল হয়ে নাচে, চম্পার সুরেলা গলার মন্তব্য আর বিস্ময়ধ্বনি ওতেও তো মুহূর্তে মুহূর্তে সচকিত হয়ে ওঠে।

ওরা যে চম্পার চেনা জন নয়, তা' তো লেশমাত্রও বোঝা যায়না।

তবে লোকসান কোথায়?

চম্পার কাছে যে-কোনো কথা কয়েও যে অগাধ সুখ! কই মনে হয় না তো এ সুখ অবৈধ, এ সুখ অশুচি!

কোনো কোনো দিন দেবু নীচ থেকে দোকান বন্ধ করে উঠে আসে হিসেবপত্র মিলোতে।

চন্দ্রভূষণ তাকে বলেছেন, 'দোকানটা তোর, লাভ হলে তোর, লোকসান হলে তোর—', তবু দেবু সব দায়িত্ব নেয় না। তবু আসে হিসেব দিতে।

চম্পা কি চম্পা বলে ধরা দেয়?

দেয় না।

আজই প্রথম ধরা দিল চম্পা, তুচ্ছ একটা অসতর্ক কথায় হয়তো বা ইচ্ছে করেই দিল। সূক্ষ্ম সেই জালের আবরণটুকুও ভার লাগছিল ক্রমশঃ। তাই দিল।

দেবু এলে চম্পা বলে, 'এই যে তোমার দেবব্রতবাবু হিসেব দিতে এলেন। দিন তবে! বুঝুন মালিকে আর ম্যানেজারে, আমি আপনার খাবারটার ব্যবস্থা করিগে।'

হ্যাঁ দেবুকে চন্দ্রভূষণের 'পেয়ারের বোষ্টুমী' দেবব্রত বাবুই বলে। কোনোদিন তাকায়নি চোখাচোখি, কোনদিন খুলে ফেলেনি রহস্যের আবরণ।

অবশ্য দেবুও ছিল দ্বিধায়। দেবুও প্রথমে চন্দ্রভূষণকে পাগল বলেছিল।

প্রথম সেই দিনটার সব কিছু স্পষ্ট মনে আছে দেবুর। তখন সন্ধ্যা। অকালবার্দ্ধক্যে জীর্ণ, আর সারাদিন দোকান চালানোর ক্লান্ত দেহটা নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরের এই ঘরটায় উঠছিল দেবু আর ভাবছিল, আজ আর রান্নাবান্না নয়, স্রেফ চায়ের সঙ্গে দু'খানা পাঁউরুটি খেয়ে শুয়ে পড়া, ব্যস্।

হঠাৎ দেখল দোকানের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো।

ফিরে তাকালো, আর সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রভূষণের ডাক শুনতে পেল, 'দেবু!'

আর কিছু নয়, শুধু 'দেবু!'

তাও যেন গলাটা কাঁপা কাঁপা।

দেবু তাড়াতাড়ি নেমে এল আধাপথ থেকে, আর এসে থতমত খেল, গাড়ীর মধ্যে আবার বসে কে! এখানেই বা এল কেন!

দিন দুইয়ের জন্যে বাইরে যাচ্ছে চন্দ্রভূষণ, এই সে জানে। কাউকে আনতে যাচ্ছে এমন কথা তো শোনেনি, আর আনলে বাড়িতে না এনে—

ওঃ বোধহয় দেবুকে কিছু নির্দেশ দিতে ষ্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছে, ফিরে যাবে।

দেবু তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিল।

বলেছিল, 'ষ্টেশনে তোমার গাড়ী যায়নি?'

'নাঃ গাড়ী আর কি করে যাবে? আমি তো নিজেই চালাই। সে যাক্, দেবু তোকে আজ দোকানেই শুতে হবে।'

দেবু মনে মনে হোঁচট খেয়েছিল।

তবে তো যা ভাবা যাচ্ছে তা নয়?

ব্যাপার কি?

সবটাই যে অন্ধকার!

চন্দ্রভূষণ তাকে আলোয় আনেন নি।

শুধু বলেছিলেন, 'এক কাজ কর, ঘরের চাবিটা খুলে আলোটা জ্বালাগে যা। পরে বলছি।'

সাধারণ কথা, তুচ্ছ কথা, তবু যেন মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর উত্তেজিত চন্দ্রভূষণ। গলার স্বরে সেই উত্তেজনার কম্পন।

দেবু আবার ফিরে দাঁড়িয়েছিল, আর তখনই কানে এল তার, 'আমায় তো স্রেফ্ উড়িয়ে দিচ্ছ, এবার দেবুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে?' গলায় সেই উত্তেজনা।

দেবু সিঁড়িতে হোঁচট খাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

গেরুয়াপরা, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে দেবুর আবার কিসের যোগসূত্র?

ঘরের চাবি খুলে আর আলো জ্বেলেও আর এক অন্ধকারের মধ্যে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল দেবু।

তারপর ওরা উঠে এল। চন্দ্রভূষণ তাঁর সঙ্গিনীকে ঘর দেখিয়ে দিলেন, স্নানের ঘর দেখিয়ে দিলেন। তারপর দেবুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'একে কখনো কোথাও দেখেছিস দেবু?'

দেবু তাকিয়ে দেখল, দেখল বৈষ্ণবীর মুখে রহস্যের চাপা হাসি, দেবু যেন একটা অথই জলের মধ্যে পড়লো, হারিয়ে গেল। আচ্ছন্নের মত আস্তে মাথা নাড়লো।

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'আচ্ছা মনে পড়বে, আগে ওর ওই কিম্ভূত কিমাকার সাজটা বদলাক। ...কই যাও, হাত মুখ ধোও গে।'

বৈষ্ণবী নিজের পুঁটুলি থেকে একখানা গামছা বার করে নিয়ে স্নানের ঘর নামে অভিহিত পায়রার খাঁচাটুকুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেবু এবার মুখ খুললো, বললো, 'ব্যাপার কি চানু?'

'ব্যাপার?' চন্দ্রভূষণের মুখে রহস্যের হাসি, 'কেন তুই কিছু বুঝতে পারছিস না?'

'না তো!'

'দেখিসনি কখনো একে আগে?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না তো!'

'রাজশাহীর কথা একেবারে ভুলে গেছিস?'

'রাজশাহী!'

'হ্যাঁ রাজশাহী। রাজশাহীতে চম্পা বলে একটা মেয়ে থাকতো না? যাকে তুই—'

দেবু হঠাৎ প্রতিবাদ করে ওঠে, 'ও সে? না না, কি যে বলিস! অসম্ভব!'

চন্দ্রভূষণ জেরায় নামেন, 'কেন অসম্ভব কিসে?'

'অসম্ভব বলেই অসম্ভব!'

'ওটা একটা যুক্তিই নয়। অসম্ভবটা কিসে সেটা বোঝাতে হবে!'

'বাঃ চম্পা এভাবে—এই সাজে—'

'তা চম্পার এতদিনের জীবনযাত্রার ইতিহাস তুমি অবশ্যই জানো না। কাজেই এই ভাব অথবা এই সাজটা হতে পারে না ভাবছো কেন?'

'কিন্তু চেহারা—একেবারেই তো—'

'চেহারা তাই আছে! শুধু বয়সের পরিবর্তনে যা পরিবর্তন। তুমিও তখন যেমনটি দেখতে ছিলে তেমনটি নেই।'

এ যুক্তিকে অবশ্য অস্বীকার করতে পারে না দেবু। তবু অনমনীয়তাই থাকে। বলে, 'চম্পা অনেক ফর্সা ছিল। এ তো কালো।'

'ওর ওপর দিয়ে যা ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে এযাবৎ, সেটা হিসেব করে রঙের হিসেব করিস।'

'তা পেলে কোথায় ওকে?'

'রেলগাড়িতে! দেখলাম, চিনলাম, হিড় হিড় করে টেনে আনলাম, আবার কি?' বলে একটি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন চন্দ্রভূষণ।

'ও অমনি এক কথাতেই এল?' দেবুর কণ্ঠে অসন্তোষ।

'এ কথাতেই কি এল?' চন্দ্রভূষণের কণ্ঠে সন্তোষ। 'একশো কথা কইতে হয়েছে। তবে আমি নিশ্চিন্ত।'

'আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি না বাবা,—' দেবু বলে, 'সত্যি চম্পা হলে কখনো আসতো না। এ কোন বাজে মেয়েছেলের হাতে পড়েছ তুমি!'

'আঃ যা-তা কথা বলিস না দেবু!'

দেবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় আলোচনার বিষয়বস্তু স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে এসে আবির্ভূত হলেন।

চন্দ্রভূষণ ইসারায় বললেন, 'ভাল করে দেখ্।'

দেবু ইসারায় বললো, 'দেখেছি।'

'কি মনে হচ্ছে?'

'বাজে ধাপ্পা! ঠকিয়েছে তোমায়!'

ওই কথাই বলেছিল দেবু।

ঠকাতে আসবার পরিস্থিতিটা কি, সেটা অনুধাবন করে দেখেনি। কোনদিনই না। সমানেই বলে এসেছে, 'ঠকিয়েছে তোমায়।'

চন্দ্রভূষণ অবিরত ওর সন্দেহভঞ্জন করতে চেষ্টা করেছেন, দেবু অবিরত সন্দেহ করেছে। তারপর চন্দ্রভূষণ বিরত থেকেছেন। বলেছেন, 'ঠিক আছে, আমি ঠকবো, ব্যস্!'

কিন্তু দেবুরই বা দোষ কি?

ও তো কোনোদিন খোলাচোখে তাকিয়ে বলে ওঠেনি, 'যাই বল দেবুদা, তুমি দেখালে একখানা! এতদিন ধরে দেখেদেখেও চিনতে পারলে না?'

সেই আত্মপ্রকাশের মধ্যেই হয়তো সমস্ত সন্দেহের নিরসন হতো। চম্পা তা করেনি। চম্পা সমানেই বলেছে, 'দেবব্রতবাবু', বলেছে 'আপনি'। এখনও বলছে।

তবু দেবুই যে ওই অপরিচিতাকে ঘাড়ে করতে বাধ্য হয়েছে, তা'তে আর সন্দেহ কি!

দেবু দোকানে শোয়, এখানে খায়।

চন্দ্রভূষণ অবশ্য প্রথমটা তাঁর কুড়িয়ে পাওয়া ঐশ্বর্যের জন্য 'ভাল বাড়ী, ভাল বাড়ী' করে অস্থির হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেই সে আপত্তি করেছে। বলেছে, 'কেন এই তো বেশ! ছোট মানুষ, ছোট ঘর, তা ছাড়া অন্যত্র গেলে আগলাবারও তো একটা লোক চাই। এ তবু দেবব্রতবাবু নীচের তলায় থাকছেন।...

দেবব্রতবাবুর অসুবিধে?

ছাড়ুন ও কথা।

'ভারী একেবারে লাটসাহেব এসেছেন!'

তাছাড়া ঘরের দখল নিলে তো আবার সেই রেঁধে খাওয়ার ভাবনা।'

দেবুও বলেছে, 'সত্যি কী এত তালেবর যে, দোকান ঘরের মধ্যে শুতে পারব না? পেছনে জানলা দরজা রয়েছে, উঠোনে কল চৌবাচ্চা রয়েছে। এ বরং দোকানে তালা দেওয়ার দায় থেকে বেঁচেছি।'

বাঁচছে!

তা সকলেই বেঁচেছে, বাঁচছে।

দেবু বেঁচেছে রাঁধা-ভাত, কাচা-কাপড় পেয়ে। চন্দ্রভূষণ বেঁচেছেন মনের কথা কইবার লোক পেয়ে। আর আঘাটায় ঘুরে মরা চম্পা বেঁচেছে একটা বাঁধানো ঘাট পেয়ে।

কিন্তু চম্পা নিজেকে প্রকাশ করেনি কোনদিন। নিজেকে ঘিরে পরিচয় অপরিচয়ের একটি রহস্যজাল রচনা করে এদের মধ্যেই রয়ে গেছে।

তবু ক্রমশঃই যেন দেবুর সংশয় মোচন হচ্ছে।

ও যখন বলে, 'দেবব্রতবাবু, আপনার ভাত বাড়া হয়েছে—'

তখন যেন একটা চেনা সুর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

ও যখন বলে, 'দেবব্রতবাবু, ধোবা আপনার কাপড় দিয়ে গেছে—'

মনে হয় যেন ওই 'বাবু' শব্দটা কৌতুক আর ব্যঙ্গে মণ্ডিত হয়ে কানে এসে বিস্মৃত অতীতের একটা বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে গেল।...

তবু চন্দ্রভূষণ ইদানীং আর এ নিয়ে আলোচনা করেননি। যেন বাহুল্য বোধেই ত্যাগ করেছেন।

দেবব্রতবাবু!

সে তো চম্পা তখনও বলতো!

বলতো, 'এই যে দেবব্রতবাবু এলেন!'

বলতো, 'ওরে বাবা, দেবব্রতবাবু কি তাহলে রক্ষে রাখবেন?'

সেই ছন্দের সঙ্গে আজকের ছন্দের মিল আছে।

তবে দেবু যে প্রথম প্রথম বলতো, 'চেহারায় একটা সাদৃশ্য অনেক মানুষের মধ্যে থাকে!' ...বলতো, 'শেয অবধি দেখো, তোমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে বেশ কিছু বাগিয়ে নিয়ে চম্পট দেবে' তেমন আর বলে না। ক্রমশঃ দেবুও যেন চন্দ্রভূষণের ভাবে ভাবিত, আর চন্দ্রভূষণের রসে জারিত হয়ে গেছে।

কাজেই 'ও কে?' এ প্রশ্ন আর ওঠেনি।

অনেকদিন পরে আজ একবার উঠল।

চন্দ্রভূষণই ওঠালেন।

চম্পা উঠে গেলে চন্দ্রভূষণ বলেন, 'তোর আর কোনো সন্দেহ আছে দেবু?'

দেবু মাথা নেড়ে বলে, 'এখন আর নেই।'

'প্রথম প্রথম ছিল, কি বলিস?'

'তা' ছিল একটু একটু।'

'আমার ছিল না'—চন্দ্রভূষণ পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন, 'প্রথম দিনও না। তবু তো তখন গেরুয়া জড়ানো ছিল—'

'যাই বলিস তোর খুব সাহস—' দেবু বলে, 'যদি ভুল হতো, স্রেফ মার খেতিস গাড়িতে!'

'ভুল অমনি হলেই হলো?' চন্দ্রভূষণ আরো পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন, 'ভুল হয় না রে!'

তখন চম্পার কথাই সত্যি লাগে, বোকাবোকাই দেখায় চন্দ্রভূষণকে। আগেকার সেই ধারালো ছেলে চন্দ্রভূষণকে।

প্রেমের সঙ্গে বোকামির বোধকরি একটা নিকট সম্পর্ক আছে। অথবা এটাই সত্যি, বুদ্ধির গোড়ায় বৌ এসে জেঁকে না বসলে—

তা' সেটাও তো চম্পার কথা।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী চম্পার। যে চম্পা অনায়াসে বলে, 'তোমার মন সংসারী, তোমার মন সামাজিক, তুমি সবাইকে নিয়ে পূর্ণ হতে চাও, তুমি পারবে না শুধু এক অশরীরী প্রেমের সঞ্চয় নিয়ে নতুন করে জীবন গড়তে।'

চন্দ্রভূষণ অস্বীকার করতে পারেন না, চন্দ্রভূষণ অসহায়ের মত বলেন, 'তবে তুমিই বল কি করা উচিত আমার?'

চম্পা একবার ওই নেমে যাওয়া সিঁড়িটার দিকে তাকায়, একবার চন্দ্রভূষণের মুখের দিকে তাকায়, তারপর বলে, 'আমাকে একটা কাশীর টিকিট কিনে দেওয়া হচ্ছে প্রথম উচিত—'

'তোমাকে কাশীর টিকিট কিনে দেওয়া।'

যন্ত্রচালিতের মত উচ্চারণ করেন চন্দ্রভূষণ।

চম্পা অন্যদিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে সহজের মত করে বলে, 'হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় কি? এখন তো আর গেরুয়ার ভেক নেই যে, রেল কোম্পানি অমনি চড়াবে? এখন টিকিট চাই।'

'ওঃ তার মানে তুমি চলে যেতে চাইছ?'

ক্রুদ্ধ শোনায় চন্দ্রভূষণের গলা।

চম্পা কষ্টে হেসে বলে, 'তা' তুমি চলে যাওয়ার থেকে আমার চলে যাওয়াই বরং কম কষ্টের।'

'আমি চলে যাবো বলেছি?'

'বলনি? যাচ্ছিলে তো?'

'আমি আর এই একটা অদ্ভুত অবস্থায় কাটাতে পারছি না চম্পা! আমি তোমাকে এই অসম্মানের মধ্যে ফেলে রাখতে পারছি না।'

'অসম্মান নয় গো, এই আমার পরম সম্মান', চম্পা বলে, 'এতো পাবো, এই বা কবে ভেবেছি বল? কিন্তু ভাবছি আর বেশী পাওয়ার লোভ কি ভাল? তোমাকে এতদিন রোজ দেখলাম, তোমাকে হাতে করে খাওয়ালাম, তোমার কাছে বসে কথা কইলাম, এর বেশী আর কি চাইতে পারতাম? সারাজীবন ধরে তো শুধু এই স্বপ্নই দেখেছি—'

'বাজে কথা,' চন্দ্রভূষণ বলেন, 'আমি নাহয় তোমার' সন্ধান জানতাম না, তুমি তো আমার সন্ধান জানতে? কত চিঠির ঠিকানা লিখেছ! মামীর চিঠির ঠিকানা তো তুমিই—'

চম্পা মৃদু হেসে বলে, 'তোমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা জানতাম, 'তোমার, ঠিকানা জানতাম কি? এই পাপীয়সীর চিঠি হাতে পেলে সে চিঠি আগুনে ফেলে দিয়ে গঙ্গাজলে হাত ধোবে কি না নিশ্চয়তা ছিল কিছু?'

'ছিল বৈকি! শুধু তোমার সেটা অনুভব করবার মত অনুভূতি ছিল না।' চন্দ্রভূষণ বলে ওঠেন, 'না হয় তাই হতো। না হয় দিতাম ফেলে আগুনে। তবু একটা চিঠি দিলেও দিতে পারতে। দাওনি সেটা, তার মানে আমার ওপর বিশ্বাস ছিল না!'

'এখন ভাবছি তাই—' চম্পা বলে, 'এখন অস্বীকার করছি না। সত্যিই ছিল না অতটা বিশ্বাস! যাক্ যে দিনটা চলে গেছে, আর তো আসবে না? তবু যে দিনটা আসছে, তাকেই ম্যানেজ করতে হবে! কাশীর টিকিটটা ভুলো না।'

'মনে রাখতে আমার দায় পড়েছে—' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান চন্দ্রভূষণ।

রাগ রাগ করেই গাড়িতে গিয়ে ওঠেন, যে গাড়িটা নিজেই তিনি চালিয়ে আসেন।

রাগ রাগ করে ভাবতে থাকেন, কাশীর টিকিট! কাশী চলে যাবেন উনি! তার মানে, আবার সেই হাঁড়ির হাল, আবার সেই কষ্ট। মাঝখানে কিছুদিন হারিয়ে গিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে বলে সাপের পা দেখেছে? যা খুশি করবে? ওর ওপর আমার জোর নেই?...দেখি ও কেমন করে কাশী যায়!

কাশী যাবেন!

'কাশীর বুড়ী' হয়ে ভিক্ষে করে খাবেন! ওঃ ভারী একেবারে।

চিরদিন সকলের চিন্তা করে এসেছেন বলেই হয়তো চম্পার এই 'নিজ চিন্তাটা' গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে চন্দ্রভূষণের।

অথচ গায়ে জ্বালা ধরবার মত অবস্থার অভাব নেই ইহসংসারে।

পরদিন তেমনি এক জ্বালার মুখোমুখিই তো পড়তে হলো।

সকালে।

তবে একেবারে সকালে নয়, বাজার করতে যাবার সময়ও আগুনটা ছিটকে এসে চোখে মুখে লাগেনি—সুনন্দার ওই নতুন তোলা-উনুনটার গনগনে আগুন।

বাজার করতে যাবার সময় যথারীতিই গিয়েছিলেন। মন ভাল নেই বলে অভ্যস্ত কাজে অবহেলা করবেন এমন স্বভাব নয় চন্দ্রভূষণের। তা'ছাড়া সকালে উঠে মনটা তত ভারাক্রান্তও ছিল না। ঘুমন্ত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সংসারের 'আঘাত'গুলো অলীক মনে হচ্ছিল, আর চম্পাকে কিছুতেই কাশী যেতে দেবেন না স্থির করায় একটা নিশ্চিন্ততা এসেছিল।

গতরাত্রে ফিরে এসে দেখেছেন সিন্ধুর একটা চিঠি এসেছে, এবং সে চিঠিতে বাড়ি থেকে গিয়ে কি কি অসুবিধে হয়েছে সিন্ধুর, তারই বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

বড় ভাল লেগেছিল চিঠিটা, বুকপকেটে রেখে দিয়েছেন। আর মনে মনে হেসে ভেবেছেন, নির্ঘাৎ বাবু অফিস থেকে চিঠিটি লিখেছেন, নচেৎ এ চিঠি আমার ছোটবৌমার চোখে পড়লে আর ডাকবাক্সে উঠতে হতো না চিঠিকে!

সিন্ধু যে অফিস থেকেই লিখেছে, সেটা স্থির করে নিলেন, আর মনে হলো ওই ছোট ভাইটা যেন বৌকে লুকিয়ে চুপিচুপি তাঁর কাছে বসে দুঃখের কথা জানাচ্ছে।

সিন্ধুটার নাকি পেট ভাল থাকছে না, অথচ পাতিলেবু পাওয়া যায় না ওখানে। আশ্চর্য! পাতিলেবু পাওয়া যায় না, এমন দেশ! ডজন কতক পাতিলেবু পার্শেল করা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিনে ফেললেন বেছে বেছে বড় বড় তাজা তাজা একশো পাতিলেবু।

একশোই ভাল, হ্যাঙ্গামা করে পাঠানোই হচ্ছে যখন।

আলাদা করে নিলেন সেগুলো।

এসেই সেজবৌমার হাতে দিতে হবে, সে-ই গোছালো মেয়ে, জলে ভিজিয়ে ঠিক করে রাখবে। চন্দ্রভূষণ দুপুরের দিকে পার্শেলের ব্যবস্থা করবেন।

একশো নিয়েও মনে হচ্ছিল আরও বেশী কিছু নিলে হতো! পাওয়া যখন যায় না, তখন পাড়ায় দু'দশটা না বিলোলে কি হবে? তা' আবার একবার পাঠালেও মন্দ হবে না, টাটকা হবে।

এসে ডাকলেন, 'সেজবৌমা!'

সাড়া পেলেন না।

কী ব্যাপার, কাল বোনের বাড়ি থেকে ফেরেনি নাকি?

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন, আর সহসা একটা আগুনের আঁচের ধাক্কায় ঝলসে গেলেন। তবু ফোসকা পড়বার আগে পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারেন নি। পারলেন একটু পরে।

রান্নাঘরের একটা দেয়ালের ধারে খানকয়েক নতুন ইঁট দিয়ে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে তাব গণ্ডির মধ্যে নতুন তোলা-উনুন জ্বেলে সেজবৌমার মহোৎসাহে রান্না করতে বসার তাৎপর্য অনুভবে এল, অনেকটা সময় তাকিয়ে থেকে।

সেজবৌমার বাসনপত্র সব নতুন, ছোট হালকা হালকা কাচ, এলুমিনিয়ম, এনামেল। সাবেকী সংসারের বীরভদ্র কাঁসা পেতল নয়।

কাছে বসে কোলের ছেলেটা টিনের একটা কৌটো ঠুকছে ঠক-ঠকিয়ে।

চন্দ্রভূষণ কি নিজে কিছু বলেছিলেন?

না বলেননি। বলার অবস্থা ছিল না। তবু তাঁর স্খলিত স্বর থেকে ঝরে পড়েছিল 'সেজ-বৌমা এ কী?'

হয়তো ঝরেই পড়েছিল।

তাই তাতে না ছিল বিস্ময়, না ছিল তীব্রতা।

সেজবৌমা উত্তর দিলেন না।

সেজবৌমা সহসা 'মেজদি'র পদ্ধতিতে ভাসুর দেখে ঘোমটা দিলেন।

শুধু ছোট ছেলেটা ছুটে এসে চন্দ্রভূষণের হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'জানো জ্যাঠাবাবু, আজ কী মজা! আজ আমাদের আলাদা রান্নাঘরে রান্না হবে। মা ইঁট দিয়ে নতুন রান্নাঘর বানিয়েছে!'

চন্দ্রভূষণ চিরঅভ্যাসে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

চন্দ্রভূষণ কি এখন তাঁর সেজভাইকে ডেকে কৈফিয়ত চাইবেন, 'বাড়ির মধ্যে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটালে তোমরা, আমাকে একবার জানাবার প্রয়োজনও অনুভব করলে না কোন্ সাহসে?'

চন্দ্রভূষণ আগের চেয়ে বোকা হয়ে গেছেন বলে কি এতই বোকা হয়ে গেছেন?

চন্দ্রভূষণের সেজভাই কি তা'হলে এ উত্তর দেবে না, 'ঘটনাটাকে এত বড় করে দেখবার কি আছে তাও তো বুঝছি না দাদা! রান্নাঘরটা মেয়েদের ডিপার্টমেন্ট, সেখানের সুবিধে অসুবিধে মেয়েরাই বুঝবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

বলবেই।

এই ধরনের গাঝাড়া কথাই কইছে আজকাল ওরা।

এরপরও যদি কথা চালাতে হয় তো চন্দ্রভূষণকে বলতে হবে, 'আমার আনা বাজার তা'হলে আর তোমার রান্নাঘরে নেবে না?'

হ্যাঁ, এই প্রশ্নটাই তো ভারী হাতুড়ীর মত ভয়ংকর শব্দে ঘা মেরে চলেছে চন্দ্রভূষণের মাথায়, বুকে, হয়তো বা মেরুদণ্ডে!

চন্দ্রভূষণ সেই হাতুড়ির শব্দটাই শুনতে লাগলেন বসে বসে।

বিন্দুভূষণ দাড়ি কামাতে কামাতে, কাগজ পড়তে পড়তে, অনেকক্ষণ সচেতন আর সতর্ক হয়ে রইলো কৈফিয়তের মুখোমুখি পড়বে বলে, তারপর একটু আশ্চর্য্য হয়ে স্নান করতে চলে গেল।

দাদা কি টের পাননি?

দাদা কি ঠিক অনুধাবন করতে পাবেননি?

খাবার টেবিলে সিন্ধুর জায়গাটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল ক'দিন, আজ বিন্দুর জায়গাটাও খাঁ-খাঁ করতে লাগলো।

শুধু ইন্দুভূষণ একধারে নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে বসে খেয়ে উঠে গেল।

চন্দ্রভূষণ তাঁর নির্দিষ্ট আসনটায় এসে বসলেন না। বললেন না, 'কিছু না খাস্, মাছ দুখানা খা ভাল করে, কিসে পুষ্টি হবে?'

তা' পুষ্টি নিয়ে যে মাথা ঘামায় না ইন্দু, তার প্রমাণ পাওয়া গেল আর ক'টা দিন পরেই।

হঠাৎ একদিন বাড়িতে যাগযজ্ঞের আভাস পাওয়া গেল। পুজোর ঘরে নয়, ইন্দুভূষণের শোবার ঘরে যেন কিসের একটা আয়োজন চলছে।...ঝাঁকায় করে ফল এলো, প্যাকেটে মোড়া কাপড় এলো। বোধ করি হোমের কাঠও এলো।...আরো কত কি যেন এলো ভাঁড়ে করে, ঠোঙায় করে।

ইন্দুভূষণ যে বাজারের রাস্তা চেনে, এই প্রথম দেখতে পেলেন চন্দ্রভূষণ। অফিস কামাই করে বাজার ঘর করছে ইন্দু সকাল থেকে! কীসের আয়োজন? ছেলের পৈতের?

না, ইন্দুকে অতটা নীচ ভাবা উচিত হয়নি চন্দ্রভূষণের! বড় ভাইকে না জানিয়ে ছেলের পৈতে দেবে, এতই অসভ্য সে?

সে সব কিছু নয়, সস্ত্রীক দীক্ষা নিচ্ছে সে।

গুরু আসবেন—হোম হবে!

মহাপুরুষ গুরু, ভারী কঠোর তাঁর নিয়ম। ইন্দুভূষণের শ্বশুরকুলের সকলেই ওঁর কাছে বিক্রীত, দুই শালী, ভায়রা-ভাই সব। শেফালীই পেরে উঠছিল না ভাসুরের ভয়ে।

যে দীক্ষা নিলে নিরামিষ খেতে হয়, সে দীক্ষামন্ত্রকে চৌকাঠ ডিঙোতে দেবেন না চন্দ্রভূষণ, এমন আশঙ্কা ছিল। সহসা আশঙ্কাটা হাস্যকর হয়ে গেছে। কাকে ভয় করে মরছে শেফালী?

আর ভয়ই বা কেন?

ইহকাল আগে, না পরকাল আগে?

তা'ছাড়া এখন যে আর চন্দ্রভূষণ বড়গলায় বলে উঠবেন না, 'তুইও কি ক্ষেপলি নাকি ইন্দু? তোর ওই শ্বশুরবাড়ির 'বাবা'র ক্ষুরে মাথা মুড়োবি?' এ-কথা নিশ্চিত।

বলবেন না।

এতদিন সে ভয় ছিল।

নিরামিষ খেয়ে ধর্ম করতে হবে শুনলে রসাতল করবেন চন্দ্রভূষণ, এতে আর সন্দেহ ছিল না।

রাগ করবেন, বিদ্রূপ করবেন, অগ্রাহ্য করবেন, জোর করে পাতে মাছ তুলে দেবেন, এমন ভাবা যেত।

কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই।

এখন আর বলতে আসবেন না, 'আচ্ছা মেজবৌমা, তোমাকেও বলি, তোমার বাপের বাড়ির গুরু তুমি পূজা কর, ইন্দুটার সুদ্ধু পরকাল ঝরঝরে করছ কেন? মাছ নইলে ভাত মুখে করতে পারে না ও, মাংস মুরগীকেই সবচেয়ে ভজে, জানো না তুমি?'

অতএব এখন নিশ্চিন্তে মাথা মুড়নো যায়। বরকে আশ্বাস দিয়েছে, 'দেখো মনেও পড়বে না ওই সব ছাইপাঁশ খেতে ভালবাসতে! জামাইবাবুকে দেখলাম তো! যে মানুষ শাকপাতকে 'গরুর খাদ্য' বলে ঘেন্না দিতেন, সেই মানুষ চাঁদমুখ করে দিশী কুমড়োর ঘন্ট দিয়ে ভাত খেয়ে যাচ্ছেন!'

তবে আর একটা ঘটনা ঘটলো। মানে ওরাই ঘটালো।

শেফালী কর্তব্য ঠিক করতে পারেনি।

শেফালী ভাবছিল, হলেই বা গুরুজন, এতবড় একটা পুণ্যদিনে একজন অপবিত্র লোককে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবো?

কিন্তু শেফালীর মা নির্দেশ দিলেন।

মেয়ের দীক্ষা উপলক্ষ্যে সকালবেলাই এসেছেন। তিনিই বললেন, 'যার ধর্ম তার কাছে, তোমাব এই শ্বশুরকুলের উনিই একমাত্র গুরুজন। গুরুদীক্ষা নেবার আগে ওঁর পায়ের ধুলো নেওয়া কর্তব্য। দুজনেই নেবে। একত্রে গিয়ে প্রণাম করবে।'

কর্তব্য ঠিক হলো অতএব।

চন্দ্রভূষণ যখন স্নান সেরে তিনতলায় ঠাকুরঘরে উঠছেন সুষমার সেই ঠাকুরের সংসারের তদারক করতে, গরদের শাড়ি পরে দুজনে এসে প্রণাম করলো।

চন্দ্রভূষণ থতমত খেলেন।

চন্দ্রভূষণ এটা আশা করেননি।

চন্দ্রভূষণ ইতিমধ্যে এটুকু অনুমান করেছিলেন, ছেলের পৈতে নয়। ছেলেটার যে আট বছর পার হয়নি! এ কোনো ব্রতটতর ব্যাপার। কিন্তু সে ব্রতে যে চন্দ্রভূষণের এতখানি প্রাপ্য ছিল তা ভাবেননি।

থতমত খেয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

শেফালী ঘোমটাটা একটু টানলো। ইন্দুভূষণ বললো, 'ইয়ে আর কি, ভাবা গেল দীক্ষাটা নিয়েই ফেলা যাক, তাই আর কি। ইয়ে, গুরুদেব এসে গেছেন, তাই আগে একবার—'

চন্দ্রভূষণ 'গুরুদেব' বলে অবজ্ঞা করে উঠলেন না, চন্দ্রভূষণ বললেন না, 'দীক্ষা নিয়ে ওই আলোচাল কাঁচকলা ভজবি তাহলে?'

চন্দ্রভূষণ শুধু নিজেই হাত তুলে কাকে যেন একটু নমস্কার করে বললেন, 'তা' যা ঠাকুরঘরে, মার ঠাকুরকে একবার প্রণাম করে আয়।'

ওরা অবাক হয়, ওরা অপ্রতিভ হয়। হয় বৈকি, ওরা তো আর 'পাজী' নয়, ওরা শুধু সাধারণ মানুষ।

দীক্ষা উপলক্ষে লোকজনও খেল।

আর এই প্রথম চন্দ্রভূষণের বাজার করা ব্যতীতই যজ্ঞি হল বাড়ীতে।

এই সব ঘটনার মধ্যে কি বেলেঘাটায় এ ক'দিন যাননি চন্দ্রভূষণ?

দুঃখে লজ্জায় যাওয়াটা ছেড়ে দিয়েছেন?

নাকি চম্পার কাশীর টিকিট কেনা হয়ে গেছে?

দূর, কিছুই না!

যা হচ্ছিল, হচ্ছে। চন্দ্রভূষণ শুধু ওই বাজার করাটা ছেড়েছেন, আর সবই যথাপদ্ধতিতে চলছে। এমনকি সেদিনের সেই পাতিলেবুগুলোও যথাসময়ে পার্শেল করে এসেছিলেন।

অতএব রাস্তা থেকে উঠে যাওয়া সেই সিঁড়িটা ধরে উঠছেন নিত্য নিয়মেই।

প্রচণ্ড রৌদ্রের পথে গাছতলায় এসে বসার মত।

চম্পা বলে, 'সব কিছু নিয়েই এত কষ্ট পাও কেন বলতো? এসব তো সংসারের স্বাভাবিক ঘটনা!'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'তুমি ঠিক বুঝবে না চম্পা, যদি কোনদিন যেতে, তো বুঝতে পারতে খাবার দালানের ওই প্রকাণ্ড টেবিলটা শূন্য পড়ে থাকাটা কী ভয়ানক!'

চম্পা তবু হাসে।

হেসে হেসে বলে, 'তোমার দিকে তা'হলে কেউ নেই? তুমি একঘরে?'

'আছে—ইন্দুর ছোট মেয়ে তিনটে আছে। ওরা কিছুতেই নিরিমিষ খেতে চায় না। বড় দুটোকে রপ্ত করাচ্ছে। ওদেরও নাকি দীক্ষা দেবে।'

চম্পা বলে, 'ওদের? কত বয়েস ওদের?'

'ষোল আর চোদ্দ বোধহয়!'

তা' ভাল! সখীকুঞ্জের আখড়ার থেকে কিছু কম যায় না। তা' ভালই তো, বাড়িতে পুণ্যের চাষ হচ্ছে। খোল করতাল বাজে না?'

'এখনো শুনিনি।'

'শুনবে, শুনতে কতক্ষণ! রান্নাঘরে তা'হলে আরও একটা ইঁটের দেওয়াল উঠেছে?'

'জানি না। ওদিকে আর যাই না।'

একসময় আবার চম্পা সুর ফেরায়।

বলে, 'আমার জন্যেই তোমার এই দুর্গতি হলো! এসে কী চেহারা দেখলাম, আর এখন কী দেখছি!'

চন্দ্রভূষণ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'তা ঠিক নয় চম্পা, হয়তো এগুলো ঘটতোই। হয়তো আগে থেকে প্রস্তুতি চলছিল। আমার বাপ জ্যাঠারও তো দেখলাম! কোনখানে যে কে বসে সিঁদ কাটে বোঝা শক্ত। চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়ে প্রকাণ্ড এক গর্ত!...তবু ভাবি যাই ভাগ্যিস তুমি আছ!...কাউকে কিছু বলতে না পারাও তো সোজা কষ্ট নয়!'

. চম্পা আবহাওয়া হালকা করতে চায়, চম্পা হেসে হেসে বলে, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' কবে কোন্ জন্মে লক্ষ্মীছাড়া একটা মেয়ে ছিল, তার জন্যে জীবন নষ্ট! ছিঃ! সময়ে বিয়ে করলে এতদিনে একখানা দজ্জাল গিন্নী নিয়ে—'

মাঝে মাঝেই একথা বলে চম্পা।

আর কি বলবে?

কথা ছাড়া আর কি দেবে?

আর কী দেওয়া সম্ভব?

সংসার?

সন্তান?

আশ্রয়?

তাই কি সম্ভব আর এখন?

তবু আছে একটা জায়গা। সিন্ধু আছে। দূরে থেকে যে অবিরত লেখে, বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কত কষ্টে আছে। ওই লেখাটা কি একটা আর্ট?

চন্দ্রভূষণ ভাবেন না কোনোদিন সে কথা। চন্দ্রভূষণ ওর কষ্টগুলো নিয়ে ভাবেন।

আরো একবার পাতিলেবু পাঠালেন সিন্ধুকে, আর একবার পটল আর আনারস। তারপরই এই চিঠিখানা এল।

সিন্ধু লিখেছে, সে তো বাইরেই থাকছে, বাড়িতে তার অংশটা তো পড়েই আছে, দাদা যদি সেটার দখল নিয়ে ন্যায্য টাকাটা দেন সিন্ধুকে, সিন্ধু কোম্পানির একটা শেয়ার কিনতে পারে। বিরাট ভবিষ্যৎ তাতে!

উকিল ডেকে চুলচেরা হিসেব করতে সে চায় না, দাদার বিবেচনাই শিরোধার্য করে নেবে। তবে মনে হয়, বর্তমানে কলকাতায় জমির যা দাম, এবং বাড়িটার যা আয়তন, তাতে সব সমেত লাখ দুইয়ের কম হবে না। অতএব এক একজনের ভাগে হাজার পঞ্চাশ মত হবে। অবশ্য একসঙ্গে সবটা না দিলেও চলবে, হাজার চল্লিশ তার দরকার হচ্ছে এখন। শেষে একথাও লিখেছে, কলকাতায় গেলে দাদা তো আছেনই! বাড়ির ভাগ গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি?

এ চিঠিটাও বুকপকেটে রেখে দিলেন চন্দ্রভূষণ। একথাটুকু তো আছে, 'বাড়ির ভাগ থাকলেই বা কি গেলেই বা কি! কলকাতায় গেলে তুমি তো আছ!'

কিন্তু বুকের সেই অংশটায় কাঁটা ফুটতেই থাকলো খচখচ করে।

সিন্ধু কেন বললো না, 'দাদা এই টাকাটা আমায় যোগাড় করে দিতে হবে! ভীষণ ভাল চান্স পাচ্ছি, ভবিষ্যতে বিস্তর উন্নতির আশা।'

চন্দ্রভূষণ তা'হলে তাঁর ব্যবসা লাটে তুলেও সে টাকা দিতেন যোগাড় করে। চন্দ্রভূষণের বুকপকেটে রাখা ওই চিঠির নীচেটায় এমন করে কাঁটা ফুটতো না তা'হলে।

কিন্তু সিন্ধু তা বলেনি।

সিন্ধু দাদার বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেও বাড়িটার দাম কষেছে। সিন্ধু বাড়িতে নিজের অংশের কথা ভেবেছে।

চন্দ্রভূষণকেও তাই হঠাৎ ভেবে ফেলতে হচ্ছে, এতদিন রোজগার করছো, সংসারে তো এক পয়সা খরচ হয়নি, গেল কোথায় সে সব?...একবার দরকার পড়তেই ভিটে বেচতে ইচ্ছে করছে?

অথচ কিছুদিন আগেও চন্দ্রভূষণ এমন নীচ কথা কিছুতেই ভাবতে পারতেন না।

এ কি নীচ সংসর্গের ফল? চন্দ্রভূষণ নীচ সংসর্গ করছেন তাই?

চিঠিখানা রইলো পড়ে বুকপকেটে, দেখালেন না কাউকে, টাকার যোগাড় করে বেড়াতে লাগলেন।

চিরদিন দু'হাতে খরচ করেছেন, টাকা জমাতে হয় তা' ভাবেননি। হঠাৎ একটু দিশেহারা হলেন। তবু হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের সামান্য কটা টাকা বাদেও লাইফ-ইনসিওর থেকে ধার নিলে আর গাড়িখানা বেচে ফেললেই—

গাড়িখানা! গাড়িখানা বেচে ফেলবেন?

যেখানা চম্পার সিঁড়িকে সহজ করে রেখেছে! হোক! হোকগে! বাস ট্রাম তো আছেই! যদি চম্পা অনুযোগ করে, যদি বলে, 'গাড়িটা কি বলে বেচলে? আসতে এত কষ্ট—'

চন্দ্রভূষণ বলবেন, 'সেটাই তো ভালবাসার পরীক্ষা জানো না? বিল্বমঙ্গল সাপ বেয়ে চিন্তামণির ছাদে উঠেছিলেন!'

টাকা যোগাড় হলো। চুপিচুপি পাঠিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন মনে মনে। হঠাৎ দুই ভাই একসঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলো। ইন্দুভূষণ আর বিন্দুভূষণ।

চন্দ্রভূষণের ঘরে ওরা কদাচ আসে।

আসতো সিন্ধু। অনবরত আসতো।

দাদার শেভিং সেটটা, দাদার আরশিটা, দাদার জানলার আলোটা, দাদার সব কিছুই তার পছন্দ ছিল।

আর নয়তো বা বুঝতো, দাদা এতে কৃতার্থ হয়, তাই পছন্দর ভান করতো। দাদার ওপর তার মমতা ছিল। ইঁটটা ছুঁড়েছে, সেটা না বুঝে।

হয়তো বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে।

সে যাক্, এরা এলো।

একসঙ্গে এলো।

দেখে অবাক হলেন চন্দ্রভূষণ, ব্যস্তও হলেন। বিন্দু বসলো খাটের ধারে, ইন্দু দাঁড়িয়ে থাকলো। ইন্দু ম্লেচ্ছাচারের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলে। আর দাদা তো স্রেফ ম্লেচ্ছ! তবে কথা বললো ইন্দুই।

বললো, 'দাদা, সিন্ধুর কোনো চিঠি পাওনি?'

চন্দ্রভূষণ এই প্রশ্নের মধ্যে যেন কৈফিয়ত তলবের সুর পেলেন। তাই কেঁপে উঠলেন। এ সুর কেন!

আস্তে বললেন, 'পেয়েছি।'

'কবে?'

'ক'দিন হলো যেন।'

'আশ্চর্য্য! আমাদের বলনি তো কই? বলা উচিত ছিল!'

চন্দ্রভূষণ হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন।

খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, 'কেন? উচিত ছিল কেন? আমার কোনো চিঠি এলে তোমাদের বলা উচিত, হঠাৎ এ নিয়ম হলো কেন?'

চন্দ্রভূষণ কি এ ভাষায় কথা কয়েছেন কখনো?

কননি।

আজ কইলেন।

চন্দ্রভূষণের হঠাৎ মনে হলো, এ ঔদ্ধত্যের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আর এ ঔদ্ধত্যের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

তাই চন্দ্রভূষণ কঠিন হলেন আজ।

ইন্দুভূষণ ঈষৎ থতমত খেল। তারপর গম্ভীর হলো। গড়গড়িয়ে বলে গেল, 'এ চিঠিটায় সকলের স্বার্থ জড়িত বলেই বলছি। আমাদেরও চিঠি দিয়েছে। বাড়ির ব্যাপার নিয়ে লিখেছে, ওব শেয়ারটা ও বিক্রি করে দিতে চায়। ওভাবে একটা পোর্শন তো বাইরের লোক কিনবে না, তাই বলেছে আমরা যদি কেউ রাখি। তোমাকে নাকি লিখেছিল, তার জবাব পর্যন্ত পায়নি লিখেছে।'

ইন্দুর কথার ধরন চিরদিনই কাঠখোট্টা, ইদানীং 'দৈনিক হাজার জপ' করার সূত্রে, আর হয়তো বা কৃচ্ছ্রসাধনের সূত্রেও, চেহারাটাও কাঠখোট্টা হয়ে গেছে, তাই একটু যেন বেশী রুক্ষ শোনালো কথাগুলো।

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'জবাব দেবার কি আছে? টাকাটাই যোগাড় করা হচ্ছিল—'

'টাকাটা যোগাড়!'

ইন্দু বলে ওঠে, 'ওঃ! তার মানে ওর পোর্শনটা তুমিই রাখছ?'

চন্দ্রভূষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই রাখছি।'

'তা ভাল! তবে আমাদের জানালেও কোনো ক্ষতি ছিল না। তা'ছাড়া—' ইন্দু একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, 'না জানিয়ে তো আর ব্যাপারটা মিটবে না?'

চন্দ্রভূষণ এবার আর ততটা স্থির থাকতে পারেন না, বলেন, কেন? না জানালে মিটবে না কেন?

উকিল ডেকে ঠাকুর্দার ভিটেটা চার টুকরো করতে হবে?'

ইন্দুও উত্তেজিত হয় অতএব, বলে, 'তা করতে হবে বৈকি! তোমাদের দুজনের মধ্যেই তো চুক্তিপত্র সম্পাদন হয়ে যেতে পারে না? কী 'বেসিসে' টাকাটা দেবে তুমি ওকে?'

চন্দ্রভূষণ অবাক হয়ে ওই উত্তেজিত মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এত বেশী অবাক হন যে, বলতে ভুলে যান, 'যে 'বেসিসে' এযাবৎ চালিয়ে এলাম তোমাদের সংসার!'

বিন্দু এবার কথা বলে।

আস্তে বলে, 'চেঁচামেচি করবার কোনো কারণ নেই মেজদা, যা কিছু করা হবে, তা আইনসংগতভাবেই করতে হবে।'

না, বিন্দুভূষণ তার মেজদার সঙ্গে একসঙ্গে এঘরে ঢুকেছে বলেই যে তার দলের, তা' নয়।

সে তৃতীয় দল।

আর সে উত্তেজিতও হয় না, রূঢ়ও হয় না। শুধু বলে, 'যা করতে হবে, তা আইনসংগতভাবেই করতে হবে।'

কিন্তু চন্দ্রভূষণ ক্রমশঃ মেজাজ হারাচ্ছেন। কারণ চন্দ্রভূষণের স্নায়ু শিরার উপর অনেকদিন থেকে চাপ পড়েছে।

চন্দ্রভূষণ আপন পরিমণ্ডলে সুখে ছিলেন। চন্দ্রভূষণ ভেবেছিলেন, আপন উদারতা দিয়ে সেই সুখের দুর্গ চিরদিন খাড়া রাখবেন।

তা' হলো না।

চন্দ্রভূষণের দীর্ঘকালের সাধনা শুধু চন্দ্রভূষণকে ব্যঙ্গ করে শূন্যের সঞ্চয় দিয়ে বিদায় নিল।

চন্দ্রভূষণের জীবনের প্রারম্ভে যে বিদাবণ বেখা পড়েছিল, তা' হয়তো মুছে যেতো, যদি অপদার্থ দেবুটা হঠাৎ সত্যবাদী হয়ে না উঠতো!

কিন্তু দেবু সত্যবাদী হলো।

তাই চম্পা নামের সেই ছোট্ট মেয়েটা তার উপর ঢেলে দেওয়া কালি মুছে ফেলে পরিশুদ্ধ হয়ে জেগে রইলো এক আলোকমণ্ডলে।

সত্যি-চম্পাকে তরুণ চন্দ্রভূষণ যতখানি ভালবেসেছিল, তার চেয়ে অনেকখানি বেশী ভালবাসতে শুরু করলেন প্রৌঢ় চন্দ্রভূষণ স্মৃতির চম্পাকে।

চম্পা তার দুর্ভাগ্যের সম্বলে ক্রমশই অধিকার করে বসলো চন্দ্রভূষণের সমগ্র সত্তাকে। চম্পা যেন একটা ধ্রুব-তারার মত জ্বলতে থাকলো চন্দ্রভূষণের অলক্ষ্য আকাশে।

তারপর সেই চম্পা মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ালো।

চন্দ্রভূষণ ভাবলেন স্বর্গ এসে হাতের মুঠোয় ধরা দিল।

চন্দ্রভূষণ ভাবলেন, আপন হাতেগড়া স্বর্গের পবিমণ্ডলে বাস করবেন, আর সেই পূর্ণ হৃদয়েব আবেগ আর আনন্দ নিয়ে দণ্ড দুই এসে বসবেন হাতে আসা স্বর্গের দরজায়। আর কী চাইবার আছে?

আশ্চর্য!

চন্দ্রভূষণ নাকি একদা বুদ্ধিমান ছিলেন!

চন্দ্রভূষণ নাকি উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন!

চন্দ্রভূষণ নাকি জীবনের কর্ম শুরু করেছিলেন অধ্যাপনা দিয়ে।

অথচ চন্দ্রভূষণ অবিরত এক অবাস্তব বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে এলেন। চন্দ্রভূষণ ভাইদের মানুষ করতে আর বিধবা মাকে সান্ত্বনা দিতে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে দোকানী হতে এলেন সংস্কৃতির জীবন ত্যাগ করে। অতএব বোকা হয়ে গেলেন চন্দ্রভূষণ।

জীবনের একটা অবাস্তব নকশা এঁকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন।

তাই যখন তাঁর বিদ্যায় খাটো ছোট ভাই শান্ত স্থিরতায় ঘোষণা করলো 'যা করতে হবে তা

আইনসংগতভাবেই করতে হবে,' তখন উত্তেজিত হলেন। হারানো মেজাজে উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, 'না হবে না। ভিটে ভাগ করা হবে না। সিন্ধুর যা টাকার দরকার, তা' আমি পাঠিয়ে দেব, ব্যস।'

ইন্দু এবার অবহিত হয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

ইন্দু তাই আর একটু ধারাল ছুরি বার করে। বলে, 'ওঃ! ওর পাতিলেবু পাঠানোর মত হাজার পঞ্চাশ টাকাটাও তুমি নিজের ক্যাশ থেকেই পাঠিয়ে দেবে? উত্তম কথা! তা' আমাদের তো আর অতটা ভাগ্য হবে না, আমাদের ভাগের কী হবে?'

চন্দ্রভূষণের উত্তেজিত কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে, অথবা স্বামীদের পাঠিয়ে দিয়ে, শেফালী আর সুনন্দা এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

শেফালী ঘরের দরজায়, আর সুনন্দা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো এবার।

কারণ সুনন্দা অন্ততঃ আর তার স্বামীর উপর আস্থা রাখতে পারছে না। চিরদিনের জবরদস্ত ভাসুর জবরদস্তির জোরে কি না কি করে বসবেন কে জানে!

হয়তো বলে বসবেন, 'কারুর কোনো ভাগ নেই, বাড়ি একা আমার।'

বলতে পারেন জিদের মাথায়। দলিলটলিল তো চিরকাল ওঁরই কাছে। ভালমানুষ ভাইরা কোনোদিন বলেওনি 'দেখি একবার।'

তা' উনিও ভাল ছিলেন। কিন্তু এখন তো আর নেই! এখন তো মোহিনী মায়ার কবলে পড়ে কিম্ভূত হয়ে বসে আছেন। আগের সেই প্রকৃতির কী বিকৃতিই ঘটেছে! ছোট ছেলেগুলো ছিল প্রাণতুল্য, এখন যেন তাকিয়েও দেখেন না।

হাসিখুশির পাট নেই, সকাল থেকে বুঝভোম্বল হয়ে বসে আছেন, মুখে তালাচাবি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খাচ্ছেন, কাজে যাচ্ছেন, আর সন্ধ্যেটি হলেই সেই বাইজী বোষ্টুমীর মন্দিরে গিয়ে উঠছেন!

ছি ছি!

কী মানুষের কী পরিণতি!

তা' এই যখন অবস্থা, তখন আর ওঁকে বিশ্বাস কি? দলিল এই বেলা বার করে নেওয়াই সমীচীন।

আর সেই জন্যেই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা সমীচীন।

নতুন রান্নাঘরে রান্না করা ইস্তক সুনন্দাকে আর বড় বেশী দেখতে পাচ্ছিলেন না চন্দ্রভূষণ। আজ পেলেন। ঘরের মধ্যে এসে নিজেই কথা বললো সে, 'আমিও সেই কথা জানতে চাইছিলাম বড়দা, আমাদের কী হবে? ভেতরের বন্ধন যখন আলগা হয়ে গেছে, তখন আর বাইরে একত্র থাকার 'শো'তে লাভই বা কি?'

খুবই অবশ্য নরম করে প্রশ্নটা করলো সুনন্দা, তবু চন্দ্রভূষণ নিজেকে যেন আক্রমিত মনে করলেন। আর এ আক্রমণটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, আবার বসে পড়ে বললেন, 'তা'হলে আমাকে কি করতে বল তোমরা?'

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ, আর একটু পরেই দেবু দোকান বন্ধ করে খেতে আসবে, আজ আর এলেন না তা'হলে চন্দ্রভূষণ।

না, এত রাত করেন না কোনদিন।

একটু দেরি হয়ে গেলে, বৃষ্টিবাদল হলে, চম্পা হয়তো বলে, 'এত কষ্ট করে আজ আর না এলেই হতো—'

চন্দ্রভূষণ হেসে উঠে জবাব দেন, 'অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলছো?'

'কেন বলবো না? তোমার মত আমার অমন নেশাসক্তি নেই।'

চন্দ্রভূষণ বলেন 'অপমানিত হচ্ছি কিন্তু।'

'হ'লে তো বয়ে গেল! সত্যিকথা বলছি! অমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, কক্ষনো এইরকম বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রপাতের দিন শুধু মুখ দেখতে ছুটে আসতাম না। তোমার এটা স্রেফ নেশা!'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'শক্তি থাকলে তবে নেশাসক্তি, বুঝলে? দামী নেশা 'যে-সে' লোকের জন্যে নয়।'

চম্পা চা এনে জুৎ করে বসে।

চম্পার মুখের চারপাশ ঘিরে রুক্ষ চুল ওড়ে।

চন্দ্রভূষণ চৌকিতে বসে পা দোলাতে দোলাতে ঘরটায় চোখ বুলোন।

কী ছোট্ট ঘরটা চম্পার, কী ছোট ছোট জানলা দরজা!... মনে পড়ে যায় নিজের ঘরটার কথা।

সাবেক কালের চকমিলানো বাড়ি, তার ঠাটকাঠামোই আলাদা। কী উঁচু উঁচু দরজা, কত বড় বড় শার্সি খড়খড়িদার জানলা, দেড় হাত দু'হাত চওড়া কার্নিস! আর ঘরের মাপই বা কত বড!

দেয়ালের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে সত্যি, জানলা দরজা অনুজ্জ্বল, তবু মরা হাতী লাখ টাকা!

এ বাসা যেন পায়রার খোপ!

এখানে কি চম্পাকে মানায়?

কি করবেন, তখন তাড়াতাড়ি দেবুর ওই দোকান-ঘরটার ওপরই—আর শেষকালে সেটাই কায়েমী হল!

চন্দ্রভূষণ ভেবেছিলেন পরে ভাল দেখে বাসা খুঁজবেন, তা হয়নি। চম্পার এটাই পছন্দ।

চম্পা বলেছিল, 'ছোট মানুষের ছোট ঘরই ভাল। কেন, ঘরটা কি বিচ্ছিরী লাগে তোমার?'

চন্দ্রভূষণ তাই মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। এতটুকু ঘরে কেমন পরিপাটি করে সব গুছিয়ে রেখেছে চম্পা! দেখলে চোখ জুড়োয়! চন্দ্রভূষণের অতবড় ঘরটাতেও যেন কোনো শ্রী নেই। বিচ্ছিরি বললে সেটাকেই বলতে হয়।

চন্দ্রভূষণ হাসেন, 'বিচ্ছিরী?'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'একটা ঘরের মধ্যে সব রেখেও কেমন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছ চম্পা, আমার বাড়ির বৌমাদের দেখাতে ইচ্ছে করে।'

চম্পা হাসে। বলে, যারা জন্মাবধি অনেকখানি পাচ্ছে, তারা আর পাওয়ার মূল্য কী বুঝবে বল? ওরা গোড়া থেকেই অট্টালিকা পেয়েছে—'

চন্দ্রভূষণ সহসাই হয়তো প্রসঙ্গান্তরে চলে যান, বলেন, 'চম্পা, তুমি চুল বাঁধ না কেন?'

চম্পা বলে, 'সময় অত বাজে খরচ করতে ইচ্ছে করে না। কেন খুব খারাপ দেখায় বুঝি?'

'খারাপ?' চন্দ্রভূষণ বলেন, 'খারাপ দেখানো কথাটার মানে জানি না চম্পা, আমি শুধু তোমাকে দেখি, আর—'

চম্পা বলে, 'শুধু দেখো এটা তো বড় খাসা কথা গো, তারপরও 'আর' কি?'

'আর ভাবি বিধাতার এ এক অদ্ভুত অপচয়ের নমুনা!'

চম্পা মুখটা অন্যদিকে ফেরায়।

চম্পা বোধকরি চোখের জল বস্তুটাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে।

চন্দ্রভূষণ তারপরই হয়তো বলে বসেন, 'জানো চম্পা, আমি যখন কুচবেহার কলেজে পড়াতাম, তখন প্রতিদিন ভাবতাম হঠাৎ যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, কি কি ধিক্কার দেব তোমায়, কোন্ কোন্ কটু কথা বলবো।'

চম্পা বলে, 'ও হরি শুধু এই? শুধু কটু কথা? ছোরা নয়। বন্দুক নয়, নিদেন একটা থানইটও নয়, কেবল দুটো কটু কথা? কিন্তু কেন বল তো? নবদ্বীপের আখড়ার ছোট ললিতার ওপর এত রাগই বা কেন তোমার?'

তখনো যে চম্পা রহস্যের আবরণে থাকতে চাইতো।

তাই ও কথা বলতো।

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'তখন বুঝতে পারতাম না, এখন বুঝতে পারি, নিজের অক্ষমতাই নিজেকে অহরহ

পীড়ন করতো, আর সেটাই তোমার উপর উদ্যত হয়ে থাকতো।'

চম্পা বলে, 'ওসব কথা থাক্, তোমার মার কথা একটু শুনি বল।'

চন্দ্রভূষণের মার কথা!

চম্পার সে কথায় উৎসাহ কেন?

হয়তো চম্পা বুদ্ধিমতী বলে।

চম্পা জানে ওটাই চন্দ্রভূষণের প্রিয় প্রসঙ্গ।

চন্দ্রভূষণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন ওর কথায়। শুরু করেন, 'আগে বাবার আওতায় আচ্ছন্ন মাকে ঠিক ধরতে পারতাম না চম্পা, কত সময় তার জন্যে মায়ের উপর কত অবিচার করেছি। পরে দেখলাম—'

মায়ের গুণপনা, মায়ের বুদ্ধিমত্তা, মায়ের ধৈর্য, সহ্য, স্থৈর্য্য, বলতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন চন্দ্রভূষণ।

আর উদাহরণগুলো শুনে শুনে হাসে চম্পা।

অতি সাধারণ আর জোলো জোলো উদাহরণ।

চম্পা বোঝে এ মহিমা অনেকটাই আরোপিত।

যে পুরুষের 'সমীহর চোখ' ভাগ হয়ে যায়নি, মা তার কাছে ষড়ৈশ্বর্যবতী!

মার কথা থেকে বোনেদের কথা, ভাইদের কথা, সংসারের কথা।

বৃষ্টির শব্দে চম্পা ব্যস্ত হয়, বলে, 'ওঠো আর গল্প নয়, ভীষণ অবস্থা আকাশের—'

চন্দ্রভূষণ সহসা বদলে যান।

চন্দ্রভূষণ সহসা যুবকের গলায় বলে ওঠেন, 'আমারও আজ ভীষণ অবস্থা—'

'ওমা কেন?'

'ইচ্ছে হচ্ছে পাদমেকং ন গচ্ছামি—তোমার এই ছোট্ট ঘরটাই বৈকুণ্ঠ মনে হচ্ছে—'

চম্পা রেগে ওঠার ভঙ্গিতে বলে, 'বৈকুণ্ঠ কেন, বৃন্দাবন বল! যখন পাদমেকং ন গচ্ছামি। লোভ দেখিও না বলছি, ভাল হবে না।'

'লোভ? তোমার? হুঁঃ!'

চন্দ্রভূষণ উঠে পড়েন।

বলেন, 'এই জলে ঝড়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ তো?'

চম্পা অপলকে তাকিয়ে বলে, 'দিচ্ছি।'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'দেখো কাল আর আসব না।'

চম্পা বলে, 'দেখো কাল আসতে হয় কিনা।'

চম্পার কথাই ফলেছে, আসতে হয়েছে।

চন্দ্রভূষণের নেশা ছুটিয়ে এনেছে তাঁকে ভবানীপুর থেকে বেলেঘাটায়।

কিন্তু আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। আজ ওই সরু সিঁড়িটায় চন্দ্রভূষণের পা পড়লো না।

অসুখ?

তা'ছাড়া আর কি!

লোহার মত অটুট শরীর বলেই যে হঠাৎ কিছু হতে পারে না, তা' তো নয়। কী অসুখ? কে জানে খুব বেশী কি না!

চম্পা কি নেমে যাবে? দোকানে গিয়ে বলবে, 'শুনুন খবরটা একবার নিতে পারেন? রোজ আসেন ভদ্রলোক?

দেবুদা কী ভাববে?

দেবুদা যদি বলে, 'কী আশ্চর্য, একদিন মানুষের কাজ থাকতে পারে না?'

সত্যি, অসুখই বা ভাবছে কেন চম্পা, কাজ থাকতে পারে না মানুষের?

কিন্তু মনকে বাঁধা বড় শক্ত।

চম্পার ভাঙা ভাগ্যের মন অবিরত ভাঙতে থাকে চম্পাকে। চম্পা জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। আকাশে নক্ষত্রের মেলা...চম্পা ওইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দূর অতীতের একটা মেলার ভিড়ে হারিয়ে যায়।

কিসের মেলা?

জন্মাষ্টমীর বুঝি?

মাসী বলেছিল, 'আমার হাতটা একবারও ছাড়বিনা চম্পি, খুব সাবধান!'

চম্পি তবু হাত ছেড়ে দিয়েছিল।

চম্পি ইচ্ছে করে অসাবধান হয়েছিল।

কারণ মাসীর ছেলে আস্তে ওর কাঁধে একটা টোকা মেরে চুপি চুপি বলেছিল, 'এই শোন, জবর একটা খবর আছে—'

জবর খবর।

সেই খবরের উৎসাহে টুক করে মাসীর হাত ছেড়ে দিয়েছিল, মাসীর ছেলের সঙ্গে চলে এসেছিল। ওঃ তারপর সে কী ভয়, কী আগ্রহ!

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সব জানা যাবে। সে কী সোজা রোমাঞ্চ! মাসী মেসোর ভয় ভেসে গেল।...চম্পা নদীতে ভাসতে এলো।

কিন্তু চম্পা কি নদীতে ভাসলো?

ভাসলো না।

চম্পা মরুভূমির বালুতে আছাড় খেল। কোথা দিয়ে কারা সব যেন এলো, কেমন করে যেন একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে তাকে তুললো...কোথায় যেন নিয়ে গেল সেই বোকা মেয়েটাকে।

জ্ঞান হলে বলে উঠেছিল সে, 'জামিরদা, তুমি এই?'

জামির পিশাচের মুখে হেসে বলেছিল, 'এই না হলে তোমায় পাবার উপায় কি ছিল বল?'

কিন্তু ক'দিনের জন্যেই বা পাবার গরজ ছিল তার? চম্পাকে বেচে কিছু পয়সা যদি পাওয়া যায়, সেটা বরং তার লাভ।

তারপর কতবারই বেচাকেনা হলো চম্পাকে নিয়ে! নবদ্বীপের আখড়াধারী মহারাজও তো পয়সা দিয়ে কিনেছিলেন তাকে!

চম্পা ক্রুদ্ধ গলায় বলেছিল, 'আপনি তো দেখছি তেলককাটা বৈষ্ণব, আমি মুসলমানের উচ্ছিষ্ট তা' মনে রাখবেন।'

বাবাজী হেসে বলেছিলেন, 'নারী, স্বর্ণ আর ভূমি, এ কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না রে পাগলী!'

তখনো চম্পা ভবানীপুরের একটা জানা ঠিকানায় একটা চিঠি লিখতে পারেনি। অথচ সে ঠিকানা খোদাই করা ছিল তার বুকে। এখনো রয়েছে। এখনও পারে চম্পা সেই ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে।

দেবুদা কি টের পাবে?

একটা ট্যাক্সির গিয়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে? চম্পা মনে মনে এগোতে থাকে।

চম্পার সে বাড়ির চেহারাটা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

চম্পা তাদের দরজা দিয়ে ঢুকলো।

তারপর?

তারপর যাদের দেখতে পেল, তারা?

কিন্তু তাদের চেহারাই কি মুখস্থ হতে বাকি আছে? কে সুনন্দা, কে শেফালী, কে ইন্দু, আর কে বিন্দু, ঠিক বুঝে নেবে।...আচ্ছা বুঝে নেবার পর?

চম্পা মনকে খাড়া করে, কি আর? জিগ্যেস করবো, 'চন্দ্রভূষণবাবু কেমন আছেন?'

চম্পাকে কি মারবে?

চম্পাকে কি পুলিসে ধরিয়ে দেবে?

করবে না তো ওসব কিছু, তবে? তবে কিসের ভয়? বড়জোর বলবে, 'তুমি কে? তুমি কি সাহসে—'

তখন কী উত্তর দেবে চম্পা?

তার চাইতে চম্পা চিরতরে মুছে যাক্‌না!

চম্পাই তো সকল সমস্যার মূল!

তবে কেন চম্পা নিজেকে মুছে দেবে না?

হ্যাঁ, আজকের এই সুবর্ণ সুযোগে পালিয়ে যাবে চম্পা!

নিঃশব্দে নেমে গিয়ে একবার শেয়ালদা স্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারলেই তো নিশ্চিন্ত। না, বিশেষ কোনো জায়গার উদ্দেশে শেয়ালদা স্টেশনের কথা ভাবছে না চম্পা, ওটাই কাছাকাছি তাই! ট্রেনে একবার চড়ে পড়তে পারলে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, যেখানে হোক যাওয়া যাবেই। জংশনে নেমে বদল করে।

তা' ওতে চম্পা পাক্ত আছে।

পালানোটা তো আজকের নতুন নয়। বরং পালানোটাই পেশা। কতবারই পালালো!...

কখনো দিনের আলোয়, কখনো রাতের অন্ধকারে, কখনো পাশের লোকের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে।...

কিন্তু পালিয়ে গিয়ে খেয়া নৌকায় চড়ে বসতে পেরেছে কবে? স্রোতে ভেসে ভেসে একটু এগিয়েই হয়তো বালির চড়ায় আছাড় খেয়েছে, হয়তো কুমীরের দাঁতে পড়েছে।

আশ্চর্য্য, তবু মরতে পারেনি চম্পা।

কোন পরম প্রাপ্তির আশায় যে ওই পালানোর পেশা নিয়ে সাত ঘাটের জল খাচ্ছে কে জানে! মনে হয়েছিল নবদ্বীপের সখীকুঞ্জের ছোট ললিতা বুঝি টিকে গেল। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত ওই নামগান করতে করতেই চুলে পাক ধরবে, দেহে ভাঙন ধরবে, আর কোনো একদিন ওর উঠোনের তুলসীমঞ্চের নীচে শেষশয্যা বিছোবে।

তা' সেটা হলেই তো উদ্ধার হতিস চম্পা!

তোর সেই শেষশয্যাকে ঘিরে নিশ্চয়ই খোল করতালের সমারোহ বসতো, নিশ্চয়ই তোর প্রাণবায়ুটা উচ্চতানের ধাক্কায় ধাক্কায় উচ্চলোকে উঠে যেত!

কিন্তু অমন আকাঙ্ক্ষিত পরিণাম, যা নাকি মনুষ্যজন্মে দুর্লভ, তা তোর পছন্দ হল না, তুই তোর মালিককে ঠকিয়ে গেরুয়ার ভেক নিয়ে আবার কেটে পড়লি অকূলের উদ্দেশে।

কি হল এসে?

বল্‌ কি হল?

ছাইচাপা আগুনকে বাতাস দিয়ে উস্কে নিজে পুড়লি, আর একজনকে পোড়ালি! তোর এই বে-আইনি অনুপ্রবেশের ফলেই তো লোকটার সর্বস্ব গেল।

মান গেল, সম্ভ্রম গেল, সংসারের স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা সমীহ সব গেল, এখন কে জানে প্রাণটাও যায় কিনা!

এই তো নিত্য নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো!

কে বলতে পারে, হঠাৎ কোনো শক্ত অসুখ কিনা, রাস্তায় কোনো এ্যাকসিডেন্ট কিনা! না না, চম্পা আর ভাবতে পারে না। আর ভয়ঙ্কর কিছু শুনতেও পারবে না। এখানে এসে অনেক পেয়েছে চম্পা, সেই 'পাওয়া'র পূর্ণতাখানি নিয়ে, তার পেশামত কাজটাই করবে আবার।

সিঁড়িটায় বসে পড়লো।

পিছন দিকে ঘরের দরজার পানে তাকালো একবার। তারপর যেন নিজেকে নিজে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠলো।

গোছগাছ?

পালাবার আবার গোছগাছ কি?

কবে আবার গুছিয়ে গাছিয়ে পালিয়েছে চম্পা?

তবু এবার গুছিয়ে নিয়েছিল একটু।

ঠাকুরের ছবি, হরিনামের মালা, তিলকমাটি, গেরুয়া, গামছা! আবার কি সেইগুলো সম্বল করে পথে ভাসবে?

গেরুয়ার একটা সুবিধে।

গেরুয়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে বেড়ালে চারিদিকের সহস্র চক্ষু তেমন প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠে না। একটা গেরুয়া মোড়া জীব পথে পথে ঘুরবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

পথই তো ঘর ওদের!

ছোট সেই ঘরখানায় এসে দাঁড়ালো।

একখানি যুগলমূর্তির ছবি, একটা পেতলের ঘটি। একটা দড়ির আলনায় একপাশে পরিত্যক্ত হয়ে ঝুলে আছে সেই রক্ষাকবচের পোষাক।

পরে নিল স্বপ্নাচ্ছন্নের মত, প্রেতে পাওয়ার মত।

যেন চম্পা নয়, যেন আর কেউ।

যেন চুরি করতে এসে ভুলে ভুলে যাচ্ছে কি করতে এসেছে।

টাকা নিতে হবে।

টাকা ছাড়া পথে গতি নেই।

মনে মনে বললো, তোমার টাকা, তোমার বিশ্বাস, তোমার সুখ সব চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছি। তুমি আমায় ধিক্কার দেবে? ঘৃণা করবে? মন থেকে মুছে ফেলবে?

তাই ভাল!

তাই ভাল!

দেবুদা কাল দোকানের টাকা রেখে গেছে আমার কাছে, নিলাম সে টাকা। দেবুদা ব্যঙ্গের হাসি হাসবে। বলবে, 'হুঃ! জানতাম! পথের 'কুকুরকে মন্দিরে উঠতে দিলেই কি সে তার স্বভাব ছাড়ে?'

দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

সিঁড়িটার মাথাটায় দাঁড়িয়ে রাস্তাটার দিকে যতদূর চোখ চলে দেখল।

এখন রাত হয়ে গেছে। এসব রাস্তা এখন জনবিরল। যদি একটা বোষ্টুমী ভিখিরি যায়ই, বড়ো কাবো চোখে পড়বে না।

সিঁড়িতে নামতে গিয়ে একবার বসে পড়ল চম্পা, কে জানে কি ভেবে সিঁড়ির ধুলোতে একটু হাত ঠেকিয়ে মাথায় ঠেকালো। তারপর আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

রাস্তায় পড়লো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই আশ্চর্য দৃশ্যটা দেখতে পেল।

চন্দ্রভূষণ হতাশ গলায় বললেন, 'তা'হলে আমাকে কী করতে বল তোমরা?'

ওরা একটু ইতস্ততঃ করলো, তারপর কাঠখোট্টা ইন্দুই ভার নিল, 'করবার তো একটাই রাস্তা পড়ে আছে। এ বাড়িকে সেপারেট চারটে ভাগে ভাগ করা অসম্ভব। যেমন প্ল্যানের শ্রী, তেমনি ব্যবস্থা জমি 'ওয়েষ্ট' করবার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ। সে যাক্, বাড়ি ভাগ যখন সম্ভব নয়, তখন বিক্রি করে টাকাটা ভাগ করে নেওয়াই বেষ্ট।'

বিক্রি করে!

বাড়িটা বিক্রি করে!

সেই হাতুড়িটা যে এবার সমস্ত স্নায়ুর উপর দমাস দমাস করে ঘা মারছে।

সেই আঘাতে চন্দ্রভূষণের প্রশ্নটা শিথিল হয়ে গেল, 'কী? কী বললি?'

'ভয়ঙ্কর অদ্ভুত কিছু বলিনি দাদা! বাড়িটা বিক্রির কথা বলছি।'

চন্দ্রভূষণ আস্তে বলেন, 'এই বাড়িতে মা বাবার বিয়ে হয়েছিল ইন্দু, এ বাড়িতে আমরা সবাই জন্মেছি। এ বাড়িতে আমাদের মায়ের পুজোর ঠাকুর, লক্ষ্মীর কাঠা।'

ইন্দু এই ভাবপ্রবণতার দিকে ব্যঙ্গদৃষ্টি হেনে বলে, 'সাবেকী বাড়িতে ওসব থেকেই থাকে। খুব একটা অভাবনীয় কিছুই নয়। তবু বাড়ীবিক্রি বলে একটা কথাও আছে। বহু অসুবিধের মধ্যেই কাটাতে হচ্ছে আমাদের। ওসব সেন্টিমেন্ট ধুয়ে জল খেয়ে লাভ নেই।'

'অসুবিধের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে? এই বাড়িতে অসুবিধেয় কাটাতে হচ্ছে তোমাদের?' স্বর আরো শিথিল, আরো স্খলিত—

যেন চন্দ্রভূষণকেই অক্ষমতার অপবাদ দিয়েছে কেউ।

ইন্দু তার স্বভাবসিদ্ধ কাঠিন্যের সুরে বলে, 'তা' হচ্ছে বৈকি! তোমার আর কি! তোমার না আছে বৌ, না আছে ছেলে, তুমি কী বুঝবে?'

তা' যদি বৌ ছেলে না থাকলে বোঝা না যায়, নাচার। চন্দ্রভূষণ বুঝলেন না। চন্দ্রভূষণ বলেন, 'বেশ তো, যা যা অসুবিধে ঠিক করে নাও না? রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী, কি চাই বল।'

সুনন্দা ভয় পায়, শেফালী ভয় পায়। কে জানে হঠাৎ আবার কোন দানপত্রে সই পড়ে যায়। দাদার সামনে পড়লেই তো অন্যরকম হয়ে যান লক্ষ্মণভাইরা। তবু আজ তো একটু—

সুনন্দা বলে ওঠে, 'এই তিনপুরুষের ভাঙা পুরনো বাড়িকে ঠিক করে নেবার ইচ্ছে আর নেই বড়দা, বড়বাড়ির মোহ ঘুচে গেছে। সামান্য টাকায় ছোট্ট একটু বাড়ি করে অবস্থা অনুযায়ী চলতে চাই।'

অবস্থা অনুযায়ী চলতে চাই! নিজেরা নিজেদের চালাতে চাই!

এই ওদের ইচ্ছে।

এরপর আর কী বলবার আছে চন্দ্রভূষণের? আবারও কি বলবেন, 'বেশ তো তাই চল না, অসুবিধেয় পড়লে আমি আছি।'

তা' এটাই তো অভ্যস্ত কথা।

বরাবর তো এই কথাই বলে এসেছেন চন্দ্রভূষণ, 'ভাবছিস কেন, আমি তো আছি!' ছেলেদের অসুখে, চাকরির গোলমালে, সর্বদা ওই অভয়বাণী যুগিয়েছেন ছোট ভাইদের।

'ভাবছিস কেন, আমি তো আছি।'

সিন্ধু দূর থেকেও লিখেছে সেকথা, 'অসুবিধে কি, তুমি তো আছ।'

কিন্তু আজ এদের সামনে সেই অভ্যস্ত কথাটা বলতে পারলেন না চন্দ্রভূষণ। শুধু বললেন, 'নেহাৎ দুঃখের দশায় না পড়লে কেউ তিনপুরুষের ভিটে বেচে না সেজবৌমা!'

সেজবৌমা আরো নরম গলায় বলে, 'এটা একটা কুসংস্কার বড়দা! মানুষের জন্যেই বাড়ি, বাড়িব জন্যে মানুষ নয়। এ বাড়িটার দামই আছে, সৌন্দর্য সুবিধে কিছুই নেই। এর বিনিময়ে যদি অনেক ভালভাবে থাকা যায়, থাকব না কেন?'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'তার মানে এর মধ্যে ভাগ করে নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকাতেও তোমাদের আনন্দ নেই, কি বল? চিরকালের আশ্রয়কে রাস্তার একটা লোকের হাতে তুলে ধরে দিতে পারলেই তোমাদের শান্তি?...বিন্দু ইন্দু, তোদেরও তা'হলে তাই মত?'

ওরা দুজনেই বলে ওঠে, 'তা' সেটাই যখন সহজ ব্যবস্থা! ভাগ করতে গেলেও তো সুবিচার হয় না। কে দক্ষিণ নেবে, কে পশ্চিম নেবে? এই যে আমি বরাবর উত্তর ধারের ঘরে থাকি, অথচ বাড়িতে দক্ষিণখোলা ভাল ঘরও আছে।'

চন্দ্রভূষণ সহসা স্তব্ধ হয়ে যান।

চন্দ্রভূষণের চোখের সামনে তাঁর নিজের ঘরের বড় বড় দুটো জানলা যেন দক্ষিণের খোলা হাওয়ায় আছড়ে পড়ে।

বাড়ির মধ্যে সবসেরা ঘরটাই চন্দ্রভূষণের।

সুষমাই বড় ছেলেকে সবচেয়ে ভাল আর বড় ঘরটা দিয়ে রেখেছিলেন, ভারী ভারী পুরনো আসবাবপত্র সমেত। যেটা নাকি তাঁর নিজের ছিল। আর সব ভাইদের বিয়ে হয়েছে, নতুন খাট আলমারি আরশি হয়েছে, চন্দ্রভূষণ সেই সাবেকী গুলোর মধ্যেই নিমজ্জিত আছেন। তার মানে সব থেকে বেশী সুবিধে নিচ্ছেন। এর যে রদবদল সম্ভব ভাবেননি কখনো।

কী স্বার্থপরতা!

কী নির্লজ্জতা!

আর এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতার দিকে চিরদিন তাকিয়ে থেকেছে চন্দ্রভূষণের ছোটভাইরা।

চন্দ্রভূষণ আস্তে বলেন, 'বেশ, তোমরা যা ভাল বোঝ কর।'

'ঠিক আছে—' ইন্দুর কাঠখোট্টা গলাও কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল শোনায়। হয়তো ইন্দু ভাবেনি এত সহজে অনুমতি পাওয়া যাবে। 'জয়েণ্ট প্রপার্টির' জ্বালা যে অনেক। একজন আপত্তি তুললেই তো বিক্রী নাকচ।

আপত্তি রইলো না, ইন্দু তাই উৎফুল্ল গলায় বললো, ঠিক আছে। সিন্ধুকে তা'হলে সেটাই লিখে দিই? বলি একটা পার্টি ঠিক করে ফেলে তোমাকে খবর দিচ্ছি, যথাসময়ে চলে এসো এবং—'

চন্দ্রভূষণ বলেন, 'লিখতে পারো, তবে টাকাটা ওকে আজই পাঠাতে হবে, লিখেছে খুব তাড়াতাড়ি দরকার—'

বিন্দু হঠাৎ অনুচ্চ একটু হেসে ওঠে।

সেই হাসির সঙ্গে মৃদু ব্যঙ্গের একটু মন্তব্য, 'আপনিও যেমন, তাই ওই শেয়ার কেনার কথা বিশ্বাস করছেন! ওটা একটা প্যাঁচ! এ বুঝছেন না? হঠাৎ বাড়ি বেচার কথা বলতে ইয়ে হয়েছে।'

চন্দ্রভূষণ সেই 'প্যাঁচ' বুঝে ফেলা মুখটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ঈশ্বর যে আমায় বুদ্ধি কম দিয়েছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ!...যাক্ আরো প্রস্তাব তোমাদের আমি দিচ্ছিলাম—সিন্ধুর টাকাটা যখন যোগাড় করাই হয়ে গেছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমিও স্থির করছি—বিজনেস্ ছেড়ে দিয়ে সামান্যভাবে কোথাও গিয়ে থাকবো, কাজেই এ বাড়ির ভাগে আমার প্রয়োজন নেই। শুধু তোমরা দুই ভাই যদি থাকো, সুবিধে করে নিতে পারবে না? অবশ্য বিক্রি না করে!'

বিন্দু ভুরু কুঁচকে বলে, 'তার মানে তুমি স্বত্ব ত্যাগ করছো?'

'ধরে নাও তাই!'

যুগপৎ দুই দুই চার জোড়া চোখের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়, ওঃ বোঝা গেছে রহস্য! এইবার পাকাপাকিভাবে 'সেইটার' বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকবেন। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা—

বিন্দু হয়তো এটাতে খুব লোকসান মনে করছিল না, ইন্দুও না। কিন্তু সহসা ঘোমটার অন্তরাল থেকে একটি নীরব কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো, 'বট্‌ঠাকুরকে জানিয়ে দাও সেজঠাকুরপো, তা' হয় না। এটা হচ্ছে দান গ্রহণ! আমাদের গুরুদেবের শিক্ষার প্রধান নিষেধ 'দান গ্রহণ' না করা।'

বট্‌ঠাকুরকে অবশ্য আলাদা করে জানাতে হলো না। তিনি বললেন, 'ওঃ আচ্ছা! ঠিক আছে।'

বিন্দুর মনে হলো প্রস্তাবটার গোড়ায় বড় চট্ করে কোপ পড়লো। মেজগিন্নীর সর্দারীটা বড় বেশী। ধর্মের ধ্বজা একেবারে!...বললো, 'তা' তোমার এতে তো লাভ হচ্ছে না কিছু!'

চন্দ্রভূষণ বললেন, 'বড় টায়ার্ড লাগছে বিন্দু, আমি একটু বিশ্রাম করবো।'

অর্থাৎ চলে যাও ঘর থেকে।

আর কি!

বিন্দু এবং ইন্দু দুজনেই শেফালীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যায়। ভাবপ্রবণ দাদা ঝোঁকের মাথায় করে বসেছিলেন একটা বড় দানপত্রে সই, হলো না ওর সর্দারীর জন্যে! আড়ালে একটা পরামর্শ করবি তো?—

সুনন্দা অবশ্য ক্ষুব্ধ হয় না।

সুনন্দা আর এই পুরনো বাড়ির ভারী দেওয়ালের খাঁজে আটকে থাকতে চায় না।

আর এখানে থাকা মানেই তো সর্ববিধ ঠাট বজায় রাখা! সেই গৃহদেবতা, সেই লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা, মাকাল, উঃ! এর আওতা থেকে বেরিয়ে না পড়লে মুক্তি নেই।

আজকের এই ঘরভাঙা ঝড়ওঠা উত্তাল যুগে কে তার পিতামহীর মত সন্ধ্যাবেলায় গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে বসছে?...কে ভোরবেলা উঠে তার বালিকা কন্যাদের নিয়ে 'পুণ্যিপুকুর' ব্রতের পুণ্যি অর্জন করাতে যাচ্ছে? কে সেই সহস্র নীতি নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে থেকে আবহমানের ধারা রক্ষা করছে?

কেউ না।

হয় না তা'।

অথচ এইরকম সাবেকী বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সেই ধারা রক্ষার অনুশাসন নিঃশব্দ ভঙ্গিতে তর্জনী তুলে শাসাচ্ছে।

এই ইঁট কাঠের শাসন থেকে পালানো চাই।

পালানো চাই বড়ভাসুরের ভাবপ্রবণতার কবল থেকে। পুরনো ধারার নিজে তিনি হন্তারক, শুনতে পাওয়া যায় এ সংসারে যে সামান্যতম আধুনিকতা প্রবেশ করেছে, তা' তিনিই এনেছেন। অথচ তিনিই হঠাৎ হঠাৎ বলে বসবেন, 'আচ্ছা মেজবৌমা, আগে সেই মা যে 'অরন্ধন' না কি করতেন, সে তোমরা কর না আর?...আচ্ছা মেজবৌমা, এ বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হয় না কেন বল তো? আমাদের ছেলেবেলায় সত্যনারায়ণ পুজো রীতিমত একটা উৎসব ছিল। তোমাদের ছেলেমেয়েরা সেসব কিছুই দেখলো না!'

যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে আর কোনো আমোদ প্রমোদের আয়োজন নেই!

যেন ওরাও তোমাদের মত সত্যনারায়ণ পুজোকে একটা উৎসব ভাববে!

এই অবাস্তববুদ্ধি মানুষটির জন্যেই আরো—

বাস্তবিকই অবাস্তববুদ্ধি!

অথচ চন্দ্রভূষণ নিজে টের পান না সে খবর। চন্দ্রভূষণ একদিকে একান্নবর্তী সুখী পরিবাবের স্বপ্ন দেখেন, আর অপর একদিকে হারানো-প্রেমকে খুঁজে ফিরিয়ে পেয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন দেখেন।

চন্দ্রভূষণ ভাবেন, আমি যদি যথাসময়ে বিয়ে করতে পেতাম, চম্পা কি এ সংসারের 'একজন' হতো না?

এখনই বা তবে হবে না কেন?

যদি আমার বিবাহিতা স্ত্রীই ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ থাকতো? ফিরে এলে ফিরে নিতাম না?

বিবাহিতাই যদি বলি।

আকাশের চন্দ্র সূর্য সাক্ষী করে কি একদিন প্রতিজ্ঞা করিনি আমরা—তুমি আমি এক!

হতে পারে সে কৈশোরের উচ্ছ্বাস, তবু তা' সত্য!

আমার পিসির বিয়ে হয়েছিল ন' বছর বয়সে, দশ বছর না পুরতেই পিসি বিধবা হয়েছিল। সেই বৈধব্যকেই তো পিসি 'পরম সত্য' বলে আঁকড়ে থেকেছে উনষাট বছর বয়েস পর্যন্ত।

সে যে শুধুই সামাজিক শাসনে খাওয়া পরায় বঞ্চিত থাকা নয়, সে যে মনেপ্রাণে অনুভব করা—'আমার সব শেষ হয়ে গেছে, আমি একদা উৎসর্গীকৃত', তা' কি বোঝা যেত না?

কিসের এই হৃদয়ের বন্দীত্ব?

শুধু একটা অনুষ্ঠানের স্মৃতি, এই তো? আজীবন কৌমার্য নিয়েও পিসি জানতেন তিনি বিবাহিতা, জানতেন তিনি একজনের সম্পত্তি। মালিক তাঁকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে বলেই যে তিনি মুক্ত তা' নয়।

শুধু তাই নয়। পিসির শ্বশুরবাড়ির কি কি কুলপ্রথা, কি কি নীতি নিয়ম, তা' তাঁর জ্ঞাতিগোত্রকে জিগ্যেস করে করে জেনে নিয়ে, সেই প্রথা নিয়মের মধ্যে চলতেন পিসি।

জীবনে কখনো শ্বশুরবাড়ির ভাত খাননি, 'অপয়া' বলে তারা ঘরে নেয়নি, তবু পিসি যখন তখন বলতেন, 'আমার শ্বশুরবাড়ির এই নিয়ম।'

এ বন্ধন 'সত্যে'র মূল্যবোধের বন্ধন!

চন্দ্রভূষণও বাঁধা পড়ে আছেন সেই মূল্যবোধের বন্ধনে। চন্দ্রভূষণের ধারণা ছিল চম্পা নেই, চম্পা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। তবু চন্দ্রভূষণ আর বিয়ের কথা ভাবেননি, ভাবতে পারেননি।

এখন চন্দ্রভূষণ জানলেন, চম্পা আছে। আছে পতিত হয়ে, কলঙ্কিত হয়ে, অপবিত্র অশুচি হয়ে।

কিন্তু চন্দ্রভূষণ একথা বললেন না, 'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়'।

চন্দ্রভূষণ কৃতার্থ হলেন। চন্দ্রভূষণ ভাবলেন, ভাগ্য ওকে যেখানেই এনে ফেলুক, ও তো নিজে অশুচি নয়।

চন্দ্রভূষণ প্রগতিশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন—যে চন্দ্রভূষণ তাঁর ভাদ্র-বৌদের বলেন, 'তোমাদের মেয়েরা ভোরবেলা সেই ব্রতট্রত করে না মেজবৌমা? এসব আর তোমরা মানো না বুঝি?'

হ্যাঁ, এ প্রশ্নও করেন চন্দ্রভূষণ।

মেজবৌমা মায়ের আমলের বৌ, তাই মেজবৌমার কাছেই সব প্রশ্ন।

অথচ নিজেকে এ প্রশ্ন করেন না, 'তুমি এত সংস্কার-মুক্ত হলে কি করে হে বাপু?'

চন্দ্রভূষণ হয়তো একটা আশ্চর্য 'উল্টোপাল্টা'র সমষ্টি! চন্দ্রভূষণ তাই অনায়াসেই অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারেন।

যার ফলে চন্দ্রভূষণের বড় বড় ছোটভাইরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে, আর মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'জানতাম শেষ পর্যন্ত এইরকমই হবে।'

বলে, 'কত রাত অবধি তো বসেছিলেন, গেলেনই বা কখন? ছি ছি এত কদর্য নেশা! একটা দিন বন্ধ করতে পারেন না?'

চম্পা যখন দেবুর দোকানঘরের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছিল, দেবু তখন দোকান বন্ধ করবে বলে পিছন ফিরে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল, দেখতে পেল না চম্পাকে।

চম্পা একবার ডাকতে চেষ্টা করেছিল, গলাটা কেমন শুকনো শুকনো আর ক্ষীণ হয়ে গেল।

দেবুর কানে পৌঁছলো না।

চম্পা আর চেষ্টা করেনি।

চম্পা ভাবতে চেষ্টা করেছিল, এত উতলা হবার কোনো মানে হয় না।

সত্যিই তো কত কারণ থাকতে পারে। ওর অসুখ করেছে, ও অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটিয়েছে, এত সব ভাবতে বসছি কেন?

তারপরই ভাবলো, এই অবস্থাটা অবাস্তব। এরকম চলতে দেওয়া উচিত নয়। আমি চলে যাব।

আমি চলে যাব।

ওকে না জানিয়ে চলে যাব। আমি আমার দুর্ভাগ্যের পসরা নিয়ে ওর জীবনকে আর পীড়িত করবো না।

কিন্তু যাওয়া হল কই? সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটলো যে তখুনি!

চন্দ্রভূষণ আসছেন।

সহজ সুস্থ চন্দ্রভূষণ!

এর থেকে আর আশ্চর্যের কি হতে পারে?

চম্পা যে ক্ষণপূর্বে হরিরলুট মানত করেছিল, এ কি তার ফল? চম্পা যে চলে যাচ্ছিল, চম্পার যে পরনে সেই গেরুয়া, সেকথা ভুলে গেল চম্পা। শুধু ভাবল, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমি যে একটু আগে হরিরলুট মেনেছিলাম এ তারই ফল! তারপর ভাবলো...

কিন্তু পায়ে হেঁটে কেন?

চম্পা শুধু সেই প্রশ্নটাই করে বসে, 'গাড়ী কি হলো?'

চন্দ্রভূষণ হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, 'কেন, গাড়ীবিহীনকে আর ভালবাসবে না?'

হাসিটা যেন জোরকরা।

তারপরই হঠাৎ যেন ছিটকে উঠলেন, বললেন, 'এর মানে?'

'ওমা, অমন বিদ্যুৎ খাওয়ার মতো চমকে উঠলে কেন? হলো কি?'

আবার এই ন্যাকড়াটাকে পরেছ মানে?'

চম্পা কি সত্যি ভুলে গিয়েছিল, না ভুলে যাওয়ার ভান করলো? চম্পাই জানে সে কথা। অথবা চম্পাও জানে না। তাই চম্পা হঠাৎ মনে পড়ার মত বলে উঠলো, 'ওমা তাইতো! দেখে ফেললে তুমি? আমি তো আবার বৈরাগিনী হয়ে চলে যাচ্ছিলাম গো!'

চন্দ্রভূষণ সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, দেখ তোমার ধরনধারণ ভাল লাগছে না আমার। এখানা টেনে পরেছ কেন?'

চম্পা হঠাৎ ভারী শান্ত হয়ে যায়।

বদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, তারপর বলে, 'যদি বলি সত্যিই পালাচ্ছিলাম।'

'পালাচ্ছিলে! পালাচ্ছিলে তুমি? কার কাছ থেকে পালাচ্ছিলে?'

চন্দ্রভূষণের কণ্ঠস্বরে স্থিরতার অভাব।

চন্দ্রভূষণের পা দুটোতেও যেন সেই অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চরিত্রহীন চন্দ্রভূষণ কি তবে এবার—

অধঃপাতের শেষ ধাপে নামছেন?

মদ্যপও হচ্ছেন?

বেএক্তার হয়ে এসেছেন? না কি অসুস্থই?

চম্পা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়। তবু স্থির গলায় কথা বলে, 'যদি বলি নিজের কাছ থেকে?'

'নিজের কাছ থেকে পালাতে পারো, আমার কাছ থেকে কেমন পালাও দেখি!'

'সে ক্ষমতা নেই বলেই তো চোরের মতন চুপিচুপি—কিন্তু তুমি অমন টলছো কেন? স্বভাব খারাপ তো করেইছ, আবার মদও ধরছো নাকি?'

চন্দ্রভূষণ হঠাৎ খাপছাড়াভাবে হেসে ওঠেন।

বলেন, 'সন্দেহ হচ্ছে বুঝি? ধর তাই, হা হা হা! এখন দেখ, এরপরও এই হতভাগাকে ভালবাসতে পারবে কি না।'

চম্পা গম্ভীরভাবে বলে, 'বিবেচনা করে দেখতে হবে। এখন চল দিকি ওপরে। মনে হচ্ছে তো জ্বর এসেছে। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাক্যব্যয়ে কাজ নেই, চল চল।'

চন্দ্রভূষণ স্খলিত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন।

চম্পা দ্রুত পিছু পিছু এগোয়।

পথের মাঝখানে গায়ে হাত দিয়ে জ্বর হয়েছে কিনা দেখে না, শুধু তীব্র কণ্ঠে বলে, 'এমন অসুস্থ শরীর নিয়ে আসার কি দরকার ছিল?'

'দরকার?'

চন্দ্রভূষণ ফিরে দাঁড়ান, বলেন, 'একটা প্রকাণ্ড দরকার তো ছিলই দেখতে পাচ্ছো? অহঙ্কার করে চলে যাওয়া হচ্ছিল—'

'অহঙ্কার!'

চম্পা কপালে একটা চাপড় মারে, 'অহঙ্কার করবারই কপাল যে! গুরু রক্ষে করেছেন তাই সত্যি আরও দু'পা এগোইনি।...কিন্তু পায়ে হেঁটে কেন, সেটা তো বললে না? গাড়ীখানা বেচে খেয়েছ নাকি?'

'ঠিক ঠিক, তাই।' ঘরে ঢুকে চৌকীটার ওপর ধপ করে বসে পড়ে উত্তর দেন চন্দ্রভূষণ, 'গাড়ী বেচে খেয়েছি, বাড়িও বেচে খাব। টাকার দরকার, বাবুদের টাকার দরকার, বৌরা আর ওই পচা বাড়িতে থাকতে

রাজী নয় বুঝলে? দু'লাখ টাকার বাড়িখানা বেচে ফেলে টাকা ভাগ করে নিয়ে, আলাদা আলাদা ছোট ছোট পায়রার বাসা গড়ে বাস করবে। ...ভুলে যাবে ওই বাড়িতে আমাদের ঠাকুর্দার গায়ের রক্ত মিশে আছে, ওই বাড়িতে আমার মা কনে বৌ হয়ে এসে ঢুকেছিলেন, আবার ওই বাড়ি থেকেই বিদায় নিয়েছেন। ভুলে যাবে ওই বাড়িতে আমরা সবাই জন্মেছি। আমার কাকা-জ্যাঠার ছেলেরা কেউ বাড়ি বেচলো না, আমরা বেচবো! বরাবর যারা একসঙ্গে নিশ্বাস নিচ্ছিলাম, এক ছাতের নীচে ঘুমোচ্ছিলাম, তারা পরস্য পর হয়ে যাব, কেউ কাউকে চিনতে পারব না আর। ছেলেগুলোকে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, ভালই হয়েছে, তোমাতে আমাতে কাশী চলে যাব এবার। বাড়ি বেচার আগেই চলে যাব। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছিলে, মাথায় চেপে বসবো দেখো।...আমায় জব্দ করবে সবাই? আমি পারি না জব্দ করতে?'

চৌকীটার উপর শুয়ে পড়েন, আধখানা শরীর ঝুলিয়ে। চম্পা একহাতে ধরে ঠেকিয়ে রেখে গলা বাড়িয়ে উদ্বিগ্নগলায় চেঁচিয়ে বলে, 'দেবুদা! দেবুদা! শীগগির এসো, জ্বরে কাঠ ফাটছে চানুদার।'

দেবুদা!

দেবুদা, চানুদা!

উন্মোচিত হল সূক্ষ্ম জালের ওড়নাটুকু, বেরিয়ে এল ভিতরের মানুষটা।

দোকান বন্ধ করে উঠে এসে বাড়া খাবারের কাছে বসে পড়েছিল দেবু নিত্য নিয়মে, জানতেও পারেনি কি ঘটছিল এতক্ষণ। ভেবেছিল ছোট্ট কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে ছাতে উঠে গেছে হয়তো চম্পা। চানুটা তো দেখছি আসেনি আজ।

হঠাৎ আর্তনাদটা কানে এল, 'দেবুদা, দেবুদা! জ্বরে কাঠ ফাটছে চানুদার।'

'আজ আর তা'হলে রাত্রে ফিরলেন না—' ইন্দু ঘরটার দরজায় উঁকি মেরে বলে, 'এইরকমই হবে ক্রমশঃ জানতাম।'

বিন্দুও এসে দাঁড়ায়। বলে, 'গেলেনই বা কখন? অনেকক্ষণ পর্যন্ত তো শুয়েছিলেন—'

'গেছেন উঠে। দেখে গেছি ঘরে নেই। নেশাটা তো মদের নেশার চাইতে কিছু কম নয়! যাক্‌গে, সতীশকে বলে দাও গেটে তালা দিয়ে দিতে।'

নিজ নিজ শয়নকক্ষে ঢুকে যায় দুজনেই।

এবং নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে দাদার অধঃপতন সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকে, ঘৃণা লজ্জা আর আক্ষেপের সঙ্গে।

কিন্তু দাদাব অধঃপতনের কতটুকুই বা দেখেছে ওরা এ পর্যন্ত? দেখবার আবো কত তোলা ছিল তা' কি ভেবেছে ওই আক্ষেপের সময়? ঘুণাক্ষরেও ভেবেছে? ওরা জানে দাদা মোহিনী মায়ায় চরিত্র হাবিয়েছে—এই তো!

কিন্তু কে ভেবেছিল, দাদা সেই মোহিনীর কোলে মাথা রেখে গাড়ি চেপে ভোরবেলা এসে ওই বন্ধ গেটের চাবি খোলাবে? চাবি সতীশই খুলে দিয়েছে, ওরা শুধু পাথর হয়ে তাকিয়ে আছে।

শেষকালে কিনা মৃত্যু হল খারাপ জায়গায়!

কী মানুষের কী পরিণাম!

কিন্তু নামাচ্ছে না কেন গাড়ী থেকে?

এরা কি ছুটে এগিয়ে যাবে?

'দাদা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

ওই মেয়েমানুষটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে গেটের বাইরে বার করে দেবে? যে নাকি গাড়ী থেকে নেমে গেটে ঢুকছে?

বলবে, 'সর্বনাশী পিশাচী, জ্যান্ত থাকতে তো মানুষটাকে গ্রাস করেছিলি, মৃতদেহটাতেও অধিকার জানাতে এসেছিস্? তুই এলি কি বলে? বল্ কোন লজ্জায় এসে মুখ দেখাচ্ছিস?'

কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, অথচ বলে ফেলা যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে আরও ভয়ঙ্কর একটা তোলপাড়।

দাদা নেই!

দাদা মরে তাদের ওপর টেক্কা দিয়ে গেলেন!

দাদা কি তবে 'সেখানে' গিয়ে বিষ টিষ খেলেন? ভাইদের ওপর এতই মর্মাহত হলেন?

হঠাৎ দুচোখ জ্বালা করে জল আসে বিন্দুর। এতটা করবার ইচ্ছে ছিল না তার, শুধু সুনন্দার অসহিষ্ণুতাতেই—

স্ত্রীলোক মাত্রেই অকল্যাণরূপিনী তাতে আর সন্দেহ কি।

সময় সামান্যই।

হয়তো মিনিট দুই, তার মধ্যেই দু' সহস্র স্মৃতি উথলে ওঠে।

ইদানীং নষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আগের সেই দাদা? বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন।...

ওটা আবার কে নামছে গাড়ী থেকে?

দেবুদাটা না?

যেটা এসে জুটে দেবতাকে ভূত বানিয়ে ফেলেছে!

ওটা সঙ্গে এসেছে।

তা আসবেই তো। ওটাই তো দালাল! উচ্ছন্নে পাঠাবার গুরু! মৃত্যুর পরও অশুচি স্পর্শ! ছি ছি!

আর একবার ভাবলো, কী মানুষের কী পরিণাম! তারপর সেই পাজীটাকে উদ্দেশ করেই শুকনো গলায় বলে উঠলো ইন্দু, 'ব্যাপার কি দেবুদা? আমি তো কিছুই বুঝতে—'

সহসা বজ্রপতন হলো সামনে।

সেই নির্লজ্জ মেয়েমানুষটা কাছে এগিয়ে এসে সোজা সপ্রতিভ গলায় বলে উঠলো, 'যাক্ তবু একজনেরও বাক্যি ক্ষমতা আছে দেখছি। ভয় হচ্ছিল ভুল করে কোনো বোবার ইস্কুলে ঢুকে পড়লাম না তো! তা আপনিই বোধহয় মেজ ভাই? নীচের তলার ঘরে একটা বিছানা পাতিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন তো, বিছানা না পাতিয়ে নামানো যাবে না, প্রবল জ্বর আপনাদের দাদার।'

জ্বর!

মৃত্যু নয়, বিষটিষ কিছু নয়, শুধু জ্বর! বিন্দুর মুখ দেখে মনে হল কে যেন দারুণ ঠকিয়েছে তাকে! অনেকটা মূল্য দিয়ে কিনে, দেখছে জিনিসটা পচা।

আর ইন্দুভূষণ?

তার সামনে যেন ভয়ানক একটা পাপাচার ঘটছে, মুখে সেই অনুভূতির গভীর কুঞ্চন। ঘৃণা, ধিক্কার, বিস্ময়, সব কিছু ফুটে উঠেছে তার মুখে।

ওই মেয়েমানুষটাই তা'হলে?

কিন্তু কত বড় জাঁহাবাজ ও, তাই এমন করে বুক জোর করে এবাড়িতে এসে দাঁড়ায়? আর কত বড় শয়তান যে অমন গলা খুলে কথা বলে?

ব্যঙ্গ করলো!

বোবার ইস্কুলে ঢুকে পড়েছেন বলে ভয় হচ্ছিল!

চাবুক নেই বাড়িতে? চাবুক?

নিদেন পক্ষে ঝাঁটা?

কাকে দিয়ে মারানো যাবে? সতীশকে দিয়ে? নাকি পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে দেওয়া হবে? বলা যাবে, সহজ মানুষ রাত নটার সময় বেরিয়েছিল, এখন এই অবস্থায়—

কে বলতে পারে পানের সঙ্গে, কি চায়ের সঙ্গে, কিছু খাইয়ে দিয়েছে কিনা। বদ মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছু আছে নাকি?'

হ্যাঁ পুলিশেই দিতে হবে।

সেই সঙ্গে ওই দেবাটাকেও।

ওর সঙ্গ মুক্ত হলে হয়তো চন্দ্রভূষণ আবার শুধরে যেতে পারেন।

কিন্তু বিন্দু ইন্দুর স্ত্রীরা?

যারা নাকি এখন সেই চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে আছে।

তারাও বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল যেন!

এখন শিউলী ভাবলো, এইরে আবার কী গেরো দেখ!

ভাবছিলাম, মুড়ি গরম থাকতে থাকতেই খাওয়া হয়ে যাবে, তা নয় আবার সেই তপ্ত মুড়ি জুড়বে, তবে!

এখন তো উনি শয্যা নিলেন, কবে উঠবেন, আদৌ উঠবেন কিনা ঈশ্বর জানেন। বাড়ি বিক্রীর কথা অতএব মাথায় উঠলো এখন।

তারপর কে জানে ভিতরে ভিতরে কি ঘটেছে।

ওই বেহায়া মাগীটা যে রকম বুকের পাটা করে সঙ্গে এসে ঢুকছে, ওকেই যথাসর্বস্ব দানপত্র করে বসেননি তো! কিম্বা কে জানে, নীলামে তুলে বেনামী করে নিয়েছেন কিনা। তলে তলে এসব নাকি করা যায়। আর মেয়েমানুষের নামে বেনামী করা সম্পত্তিতে জ্ঞাতিবর্গের দাঁত ফোটাবার অধিকার থাকে না।

হয়েছে, নিশ্চয় তেমনি একটা কিছু হয়ে বসে আছে! নচেৎ ও কোন্ সাহসে—?

শেফালী আরও একটু ভাবে। তার বর দেওরের মতই ভাবে, ভগবান জানেন জ্বর না বিষটিষ কিছু দিয়েছে। বিষয় সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বিষ খাইয়ে মারার উদাহরণও তো আছে। হঠাৎ মরার বিষে সন্দেহ হবার সম্ভাবনা বলে হয়তো মৃদু কোনো বিষ! আছে, জগতে সবই আছে। কোনো একটা পাপিষ্ঠ ডাক্তারকে হাত করতে পারলে কি না কবা যায়? তিল তিল করে মারবার মত বিষ এরাই জোগান দিতে পারে।

তার মানে বট্‌ঠাকুর গত হবেন, আর ওঁর ওই 'ইয়ে'র সঙ্গে মামলা লড়তে হবে আমাদের!

গুরুদেব, তোমার মনে এই ছিল?

কোথায় নগদ পঞ্চাশ হাজার হাতে করে সপরিবারে তোমার আশ্রমে গিয়ে পড়বার স্বপ্ন দেখছিলাম, সে জায়গায় কি না এই বিপত্তি!

কিন্তু ওদের এই ভিতরের কথা বাইরের লোকের বোঝবার সাধ্য হয় না। সে তাই সরে এসে গায়ে পড়ে বলে ওঠে, 'নাঃ পাথরে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে না দেখছি। মানুষটা জ্বরে বেহুঁস হয়ে গাড়ীতে গুঁজে বসে আছে, তুলে এনে শোওয়াতে হবে তো? দেবুদা একলা পারবে না, আপনারা কেউ এসে হাত লাগান।'

বলা বাহুল্য হাত লাগাবার জন্যে উৎসাহ বোধ করে না কেউ। শুধু ইন্দুভূষণ এবার তীব্রস্বরে বলে ওঠে, 'উনি কোথায় কিভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তা না জানতে পারলে তো এখন বাড়িতে নেওয়া যাবে না!'

'বাড়িতে নেওয়া যাবে না?' অবাক গলায় বলে চম্পা।

'কি করে যাবে?' ইন্দু আরো তিক্ত গলায় বলে, 'ধরুন যদি মার্ডার কেস হয়?' তুমি বলতে গিয়েও আপনিটাই বেরিয়ে যায়।

চম্পা হতবাক গলায় বলে 'মার্ডার কেস?'

ইন্দু একটা হিংস্র আমোদ বোধ করে।

হয়েছে, ঘায়েল করা গিয়েছে।

এই পথেই তোমায় দেখাচ্ছি মজা।

তাই আরো কটু গলায় বলে, 'আশ্চর্য কি? জগতে এমন ঘটনা ঘটে না তা নয়। আপনি তো ঘরে তুলে দিয়ে সরে পড়বেন, তারপর? পুলিশ এসে আমাদের হাতে দড়ি পরাবে না?'

'এই কথা!'

চম্পার মুখে একটা অলৌকিক হাসি খেলে যায়। হাসির মত গলাতেই বলে, 'সে ভাবনা করবেন না। ফেলে পালাব না। ইহজীবনেও না! বরং এক কাজ করুন, আপনাদের পছন্দ মত একটা ডাক্তার ডেকে আনুন, দেখুন এসে তিনি কেস্‌টা কি? জানা ডাক্তার দেখবে বলেই সেখান থেকে এখানে ছুটে আসা।... তা কেউ যদি না ধরে, সতীশ তুইই বাবা একটু ধর। বড়বাবুর শোবার ঘর তো দোতলায়? সেখানে তুলতে গিয়ে কাজ নেই এখন, এইখানেই বৈঠকখানা ঘরে—যা বাবা আগে ছুটে বড়বাবুর ঘর থেকে একটা চাদর আর একটা মাথার বালিশ নিয়ে আয়।'

সতীশ!

তুই।

ফরমাস!

এ কী জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ?

আশ্চর্য যে সতীশটাও ওই হুকুমে ছুটলো। এবং মুহূর্তের মধ্যে আনলোও।

নির্লজ্জ মেয়েমানুষটা বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, এবার ধরাধরি করে নামা এসে। দেবুদা সাবধানে ধরবে, দেখো যেন হাঁটুটা না দুমড়ে যায়। না বাবা, আমিও ধরি গিয়ে। ...দেবুদা একটু থেমে। ...এই যে তুমিই বোধ হয় সেজ বৌ সুনন্দা? চাদর বালিশটা ঠিক করে দাও তো ততক্ষণ। তারপর কেউ ছুটে গিয়ে ডাক্তার আনুক একজন।'

হুকুম!

নির্দেশ!

অর্থাৎ পরিকল্পিত দুঃসাহস!

পুত্তলিকায় প্রাণ সঞ্চার হয়। তবে ফরাশে ফরসা চাদর পেতে দিতে নয়, তীব্র একটা প্রশ্নের মধ্যে ঠিকরে ওঠে সেই লক্ষণ, 'আপনি কে শুনতে পারি কি? উনি হঠাৎ আপনার কাছেই বা জ্বরে পড়তে গেলেন কেন? আর আপনিই বা কোন অধিকারে হঠাৎ এসে আমাকে 'তুমি' বলবার সাহস করছেন?'

'বলছি', মহিলাটি বলেন, 'আগে ওঁকে শোওয়াই।... দেবুদা ভাল করে ধর ভাই!... এই সতীশ যা তুইই ছুটে যা, বিছানাটা ঠিক করে দে। ...দেবুদা সাবধান!'

হয়তো চন্দ্রভূষণের বেহুঁশ অবস্থাটা দেখেই ইন্দ্রভূষণ একটু ইতস্ততঃ করছিল, গুছিয়ে শোওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে সে, তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে ওঠে, 'দেবুদার আড্ডাতেই বুঝি যাতায়াত হচ্ছিল আজকাল দাদার? তা' দেবুদা, ইনি খামোকা দাদার মালিক হলেন কি করে শুনতে পাই না?'

'ইনি' চন্দ্রভূষণের ঘাড়ের নীচে বালিশটা ভাল করে গুঁজে দিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ান। তারপর খোলা গলায় হেসে উঠে বলেন, 'জ্বরটা বেশী, মনটা ভাল নেই, তবু না হেসে থাকতে পারছি না ভাই। তুমিই বোধহয় মেজঠাকুরপো?

তোমাদের দাদার মালিক কি আমি হঠাৎ আজ হলাম? এ যে দু'যুগের। আমি রাজশাহীর চম্পা, তোমাদের বড় ভাজ। ডাকাতে লুঠ করে নিয়ে ভারী ভুগিয়েছে অনেকদিন। তোমাদের সঙ্গে তো চেনাজানাই হয়নি।'

চম্পা আস্তে চন্দ্রভূষণের গায়ের উপর একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দেয়।

সতীশের বিবেচনাপ্রসূত দুখানা চাদরের একটা।

পুরুষরা থতমত খায়।

রাজশাহীর চম্পা? যাকে নিয়ে দাদার বদনাম, একি তবে বেলেঘাটার সে নয়? এ আবার আর কেউ?

শুনেছিল, সে নাকি নাকে রসকলিকাটা বৈষ্ণবী, শুনেছিল, লক্ষ্ণৌয়ের নাচনা গাওনা বাঈজী, কিন্তু শোনার সঙ্গে দেখার মিল হচ্ছে না তো।

শুকনো মুখ, রুক্ষচুল, একেবারে তাদের মা কাকীমাদের ধরনে পরা যেমন তেমন সেমিজ শাড়ি। মুখের রেখায় উদ্বেগ আর ক্লান্তির ছাপ।

এই মুখ নিয়ে রোগীর বিছানায় চুপ করে বসে থাকলেই মানাতো, কিন্তু সেই মানানটা না করে বেমানান কাজ করছে ও।

কথা বলছে। তীক্ষ্ণ তীব্র আর অদ্ভুত আশ্চর্য একটা কথা বলছে।

আর বলছে একেবারে সহজ জোরের সঙ্গে। কী এটা?

পুরুষরা ভাবছে। রাজশাহী আর চম্পা শব্দটা তাদের নাড়া দিয়েছে। তাই তারা সহসা চুপ করে গেছে।

মেয়েরা চুপ করে থাকতে জানে না, মেয়েরা কথা বলে।

সুনন্দা তাই কথা বলে ওঠে।

সুনন্দা বলে, 'বিয়েটা বুঝি সকলের অজানাতেই হয়েছে? আমরা তো জীবনেও শুনিনি।'

চম্পা হেসে ওঠে।

বলে, 'ওমা, তোমরা তখন কোথায়? কখনো মামাশ্বশুরবাড়ি চক্ষেও দেখনি তো? তোমাদের মামাশ্বশুরবাড়িতেই তো আমার স্থিতি ছিল, শোনোনি বুঝি কখনো? উনি যে আমার মাসী ছিলেন। তাঁর কাছেই মানুষ, আর ইনিই তো সেইখানেই—' একটু হেসে থেমে গেল।

বিয়ের কথাটার অবশ্য ফয়সালা হলো না। কিন্তু সেটা ধরাও পড়লো না।

ইন্দু এবার কথা বললো।

ভুরু কুঁচকে বললো, 'বিয়ের কথাই হয়েছিল শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়াটা কেমন?'

চম্পা মৃদু হেসে বলে, 'কেমন' সেটা তো ভাই এই বেহুঁশ মানুষটার হুঁশ না হলে বোঝানো যাবে না!'

ইন্দু ক্রুদ্ধ অনমনীয় গলায় বলে, 'কেউ জানল না শুনল না, বিয়ে হয়ে গেল, একথা আর যে-কেউ মানুক, আমি মানতে রাজী নই।'

'না হলে নাচার। তুমি বিষয়ের ভাগ দেবার ভয়ে অরাজী হলেই তো আর ধর্মসাক্ষী করে বিয়েটা নাকচ হয়ে যাবে না। কিন্তু এখন কথা থাক ভাই, ডাক্তারের বিশেষ দরকার।'

ইন্দু অথবা বিন্দু কেউই অবশ্য ওই বিশেষ দরকারে উৎসাহ দেখায় না। তারা শুধু স্মৃতির সাগর তোলপাড় করে।

তবে কি বাড়িতে যে ঝড়টা উঠেছিল, সেটা বিয়ের অনুমতি প্রার্থনায় নয়? সংবাদ নিবেদনে? দু'যুগ পরে সেই বিয়ের বৌ এসে ঠেলে বাড়িতে উঠবে?

খুব ভুল হয়ে গেল, গেট বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। রুগী নিয়ে ফিরে যেতে হলে এতটা মুখসাপোট করতে পারতো না। ... দাদার জ্বর শুনে আমরাও কেমন 'ইয়ে' হয়ে গেলাম! শয়তান মহিলাটি বুদ্ধিমতী খুব! জানে একটা রুগীকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারলে সহজে কিছু করা যায় না তাকে।

যে রকম বুকের পাটা, একেবারে মিছে কথা নয় বোধ হয়। নিশ্চয় আমাদেব সেই ফিচেল মামীটা—ফিচেলই, তা নয়তো অমন গুণবান পুত্ররত্নের জননী হন? তা তিনি নির্ঘাৎ ভাগ্নেটাকে কোর্টে পেয়ে বোনঝিটাকে গলায় গেঁথে দিয়েছিলেন ভুলিয়ে ভালিয়ে।

তা সে যাই হোক, সহজে স্বীকার পাচ্ছিনা বাবা, বলবো কোথায় তার প্রমাণ? কে তার সাক্ষী? বিয়ে হয়েছিল বললেই বিয়ে প্রমাণ হয় না! ধর্ম সাক্ষী? আসুন তবে ধর্মঠাকুর সাক্ষীর কাঠগড়ায়! ...আশ্চর্য, দাদা একটা রামগঙ্গা কিছুই করছে না! সত্যি বেহুঁশ না সাজা বেহুঁশ ঈশ্বর জানেন! গায়ে হাত দিয়ে দেখতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে! ...ডাক্তার একটা আনছি, দেখি কি বলে সে।

এঘরে ফ্যান নেই।

চম্পা ইত্যবসরে ঘরের কোণে রাখা জলের কুঁজো থেকে জল নিয়ে রুগীর পকেটেরই রুমালটা ভিজিয়ে কপালে জলপটি দিয়ে, একখানা খবরের কাগজ পাট করে বাতাস দিতে বসেছিল, সতীশ কোথা থেকে একখানা রান্নাঘরের হলুদমাখা বাঁটভাঙা পাখা এনে হাজির করল।

'এনেছিস? লক্ষ্মী ছেলে!' বলে পাখাটা হাতে নেয় চম্পা। তারপর উপস্থিত সবাইকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ওকেই উদ্দেশ করে বলে, 'তুই তো পুরনো লোক, এদের ডাক্তারবাবুর বাড়ি চিনিস না?'

সতীশ সমবেতদের দিকে একবার অস্বস্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদু উচ্চারণে বলে, 'চিনবনা কেন?'

'চিনিস? তা তুই একবার যা বাবা! দেখছিস তো তোর বাবুদের সময় হবে না!'

এই ব্যাঙ্গোক্তিতে এবার শেফালী কথা ধরে।

কড়া গলায় বলে, 'আপনার সাহসটা বেশ জোরালো, সেটা স্বীকার করতেই হবে। তা' ধর্মসাক্ষীরই ব্যাপার যখন, সাড়া শব্দ ছিল না কেন এতদিন?'

'ওই তো বললাম ভাই, ডাকাতে লুঠ করে নিয়ে গিয়ে একেবারে নিঃসার করে দিয়েছিল।'

ভাই!

'ভাই' শব্দটা কানে ছুঁচের মত ফোটে।

তবু চট করে সে সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদও করতে পারে না শেফালী, বিরক্ত তিক্ত গলায় বলে, 'ওঃ, তা' হঠাৎ এখন যে?'

তা' ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই যদি দেখা যায় মাথার উপর একটা পাহাড় পড়েছে, কে না ঘাড়টা ঝাঁকায়? কে তাকে মাথার মণি বলে আহ্লাদে গ্রহণ করে?

এরাও করছে না।

বলছে, 'ওঃ তা' হঠাৎ এখন যে?'

তা' বেহায়াদের বোধকরি অভিমানও থাকে না, অপমান জ্ঞানও থাকে না।

তাই চম্পা স্বচ্ছন্দে বলে, 'হঠাৎ আর কি, দেখছোই তো 'কারে' পড়ে। নইলে তোমাদের ভাসুর তো নিয়ে আসবার জন্যে অস্থির। আমিই আসতে রাজী হইনি এতদিন! বলতাম, রোজ তো দেখা হচ্ছে সেই ঢের! জা দ্যাওরদের সঙ্গে চেনাজানা নেই—তা' ছাড়া—' আরো হেসে ওঠে, 'ডাকাতে লুঠে নিয়ে যাওয়া বলে যদি আবার তোমরা নাক উঁচু কর! ... তা' ভেবে দেখলাম কত লুঠের মাল তরে যাচ্ছে আজকাল, আমি কেন লোকটাকে আর কষ্ট দিয়ে মরি!'

হ্যাঁ, এই কথাই সত্য কথা। এ কথা সাময়িকের প্রয়োজনে বানানো কথা নয়। কালকের সেই আতঙ্কিত বিনিদ্র রাত্রি, একটা নতুন সত্যের দরজা খুলে দিয়েছে তার সামনে। চম্পার সংস্পর্শে এই মানুষটা অশুচি হয়ে যাবে কেন? চম্পা কি নিজে অশুচি? চম্পার উপর যদি একটা হিংস্র বাঘ তার থাবা বসাতো, চম্পা কি তার শুচিতা হারাতো? আর এই মানুষটার আজীবনের একনিষ্ঠ ভালবাসা? তার কোনো মূল্য নেই? এতই ক্ষমতাহীন সে? সে পারবে না চম্পার সব কলঙ্ক মুছে দিয়ে চম্পাকে এ বাড়ির বড়বৌ করে তুলতে? আনুষ্ঠানিক একটা বিয়ে হয়নি বলে সব ব্যর্থ? সারারাত্রি এই প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলে এসেছে চম্পা সকালে। দ্বিধাহীন গ্লানিহীন পরিশুদ্ধ মন নিয়ে।

ওরা তাদের দাদার অচৈতন্য মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। সাক্ষ্য মানবার উপায় নেই।

অতএব দেবু।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'তা' দেবুদাটি কোথা থেকে জুটলো?'

'ওমা! শোনো কথা, দেবুদা আমারও দাদা নয়? মাসীর ছেলে তো! ওই তো আমার একমাত্তর দাদা। উঃ কত মার খেয়েছি ওর কাছে। তোমাদের দাদাই তো রক্ষা করেছেন। যাক্, সব কথা পরে হবে, এখন যাও ভাই লক্ষ্মীটি, তোমাদের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দাও। তিনিই বুঝবেন ভাল। তাই ছুটেপুটে নিয়ে আসা! সতীশ সাহস পাচ্ছে না। ...বাড়ি বাড়ি' করে তো বেচারার জ্বরই এসে গেল!...

শুনলাম নাকি পৈত্রিক বাড়ি বেচে দিতে চাইছ তোমরা? ... আমি কিন্তু ভাই আপত্তি তুলবো তা' বলে রাখছি।'

যুগপৎ দুটো গলা থেকে শব্দ ওঠে, 'আপত্তি? আপনি আপত্তি তুলবেন?'

'তা' তুলবো। বলবো তোমাদের উকিলকে, আমি বাড়ির বড়বৌ, দাদা-শ্বশুরের এই বাড়ি বেচে দেওয়ায় আমার মত নেই। ... এই বাড়িতে আমার শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর লক্ষ্মী ষষ্ঠী মনসা মঙ্গলাচণ্ডী—সব। এ ভিটে কি নষ্ট করতে আছে? ...আর তোমরাই বা তা' করবে কেন ভাই? ...দেবুদা, একটু বরফ তো আনাতে হবে! ... কই ডাক্তারের কি হল গো? বিনা চিকিৎসায় মরবে নাকি তোমাদের বড় ভাই?'

বিন্দু তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, ইন্দু বোধকরি ডাক্তারকে খবর দিতেই রাস্তায় নামে।

—

শিকলি কাটা পাখি

'আমি তোমায় ষ্টাম্পো পেপারে লিখে দিতে পারি রাখালদা, ওই ছোঁড়াটা ছেলে নয়।'

সুধো তার কথায় গুরুত্ব আরোপ করতে চৌকির ওপর একটা ঘুসি বসায়।

রাখাল কিন্তু আদৌ ওর কথায় গুরুত্ব দেয় না। কেউই দেয়না কোনদিনই, সবাই জানে সুধো একটা 'বক্তার ছেলে'। ওর যে একটা ভবিষ্যযুক্ত আস্ত নাম আছে, সেটাও ভুলে গেছে সবাই, শুধু দলের খাতায় নামটা পুরো লেখা আছে, মাইনে নেবার সময় সেই নাম সই করে সুধো—শ্রীসুধাংশুমোহন ঘোষাল।

ব্যস্ ওই পর্যন্ত, বাকি সময় সে সুধো। তবে ঠিক অবহেলা নয়, অমনি একটা আলগাভাব আর কি। নচেৎ ছেলেটাকে ভালবাসে দলের সবাই।

অনেকেরই মধ্যে অনেক রেষারেষি আছে। কিন্তু সুধোর সঙ্গে কারুর সে সব কিছু নেই, সুধো অজাতশত্রু।

তার কারণ সুধো শুধু যে ছেলেটাই ভালো তা নয়, সুধোর রং কালো হলেও চেহারাখানি ভালো, কথাবার্তা আকর্ষণীয়। আর গানের গলাটি উত্তম।

তাছাড়া সে মুখে মুখে গান বাঁধতে ওস্তাদ।

সুধোর আর একটা মস্ত গুণ, সুধো ছুটি চায় না, বাড়ি যায় না।

দেশের বাড়িতে না কি মা বাপ আছে সুধোর, কিন্তু সে কথা তুললে সুধো অম্লান মুখে বলে, 'তারা আমায় খরচের খাতায় লিখে রেখেছে। আবার যাওয়া আসা করে জঞ্জাল বাড়াই কেন?'

ওর দেশের কাছাকাছি থাকে এমন একজন চুপিচুপি জানিয়েছিল ওর মা নাকি সৎমা, আর দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করে বাপ নাকি সৎ বাপের অধম হয়ে গেছে। সেই দুঃখেই ঘর ছেড়েছে সুধো।

কিন্তু সুধোর জীবন সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করলে সুধো বলে, 'শুধু কি দুঃখেই ঘর ছাড়ে মানুষ? সুখে ছাড়ে না? এই যে ভগবানের রাজ্য খানা? এটা দেখবার সুখে ঘর ছাড়ে না?'

তা' যে কারণেই হোক, সুধো ঘরছাড়া, আর ঘরছাড়াদের প্রতি মমতা মানুষের সহজাত, বিশেষ করে মনিবের।

রাখাল ওর মনিবও বটে বন্ধুও বটে।

দলের আর কেউ রাখাল দাসের সামনে এমন ফ্রী ভাবে কথা বলতে পারে না, যেমন সুধো পারে।

সে রাখালের সামনে ঘুসি মেরে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস করতে পারে।

অতএব রাখালদাস তার কর্মচারীর এই দুর্বিনয়ে বিরক্ত হলো না, বরং হ্যা হ্যা করে হেসে বলে উঠলো, 'ভালো কথাটাই বললি সুধো, বেড়ে! 'ছোঁড়াটা' ছেলে নয়। তবে কি? মেয়ে?'

'আলবাৎ মেয়ে। বলেছি তো স্ট্যাম্পো কাগজে লিখে দিতে পারি।'

একথা দলের আর কারো কাছে বললে তারা যে কি রসালো পরিহাস উক্তি করে বসতো কে জানে, কিন্তু রাখাল সেদিক দিয়ে গেল না। রাখাল সভ্য ভব্য। রাখালের আভিজাত্য আছে। তাছাড়া সুধো যে শুধুই 'রাখালদা' বলে ডাকে তা নয়, রাখালও দাদার মতো মনোভাব পোষণ করে।

রাখাল তাই শুধু বললো, 'অনুমানটা এমন অভ্রান্ত মনে হচ্ছে কেন সুধোচন্দর? বললো কে?'

'বললো ওর চলন বলন চেহারা, গলার স্বর।'

'অনেক বেটাছেলেরও ওরকম মেয়েলি স্বর হয় রে সুধো। বিধাতার সৃষ্টি এই মানুষ জাতটার হদিস্ পাওয়াই শক্ত। কতো মেয়েলি বেটাছেলে দেখলাম, কতো ছেলেলি মেয়ে মানুষ দেখলাম।'

'আচ্ছা' সুধো বলে, 'এবারের দেখায় তফাৎ আছে কি নেই বুঝো।'

'তা গলাটা কিন্তু ফাস্টক্লাশ মাইরী। গান বাঁধারও কায়দা আছে। আমার ধারণা ছিল আমার এই 'বসন্তবাহার কবির লড়াই' পার্টিতেই শুধু তোদের মতন কম বয়সীদের নিয়ে কাজ কারবার। ও ছোঁড়াকে মনে হলো তোর থেকেও অল্পবয়সী।'

'ছোঁড়া নয় মেয়ে।' সুধো গম্ভীরভাবে বলে, 'চোখের দিকে ভালো করে তাকালেই বুঝতে পারবে।'

'অমন বাহার করে কাজল পরলে এই রাখাল দাসের চোখেও বিদ্যুৎ ঝলসাবে সুধো! মেয়ে অমনি হলেই হলো? বাঘ ভালুকের খাঁচায় কেউ একটা হরিণ রাখে? অতোগুলো বাঘ ভালুক রয়েছে না দলে?'

'নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে এসেছে নিশ্চয়?'

'মাথায় ওই এক বৃথা চিন্তা ঢোকাসনি সুধো! ছদ্মবেশে এসেছে! বলি অতো-লোক রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে থাকছে তারা ধরে ফেলতো না? আর তুই আসরে বসে দুটো গানের লড়ালড়ি দিয়ে ছদ্মবেশ ধরে ফেললি? আসলকথা তোর ভেতরে ভয় ঢুকেছে।'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'হেরে যাবার ভয়। ছোঁড়াটা তো কাল তোকে প্রায় কাৎ করে এনেছিল।'

'অতো সোজা নয় রাখালদা—'

'তা' তো নয়ই। শেষ অবধি অবিশ্যি জোর রাখতে পারলো না।'

সুধা হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা রাখালদা, এই যে মল্লিকরা যারা পুজোয় আমাদের ডেকেছে, এদের আর কোনো শরীক টরীক আছে?'

'কে জানে। কেন?'

'না তাহলে আর একদিন বায়না পাওয়া যেতো।'

'দূর পুজো ফুরলে আর কে বায়না দেবে?'

'দেবে না কেন? কোজাগর পর্যন্ত ঘটা চলে। রাণাঘাটে গিয়ে কী হয়েছিল সেবার? আসতেই পাওয়া যায় না।'

'এদের তো শুনেছি এই দুই শরীকের পালার পুজো। ভাগ করে দুদিন দুদিন। বড়কর্তার সপ্তুমি-অষ্টমী, ছোট গিন্নীর নউমী-দশুমী।'

'কিন্তু রাখালদা, কালকের মতন ভীড় কি হবে? অষ্টমীর ভীড় আর নউমীর দিনের ভীড় এক নয় রাখালদা!'

'তা নয়, তাছাড়া দুই শরীকের অবস্থাও তো এক নয় সুধো। একদিকে শুধু বিধবা নিঃসন্তান, অপরদিকে কর্তা, গিন্নি, ছেলে-মেয়ে চাঁদের হাট বাজার। ভোগের পেসাদেও তফাৎ হবে। তবুতো সমান করে দুজনে কবির লড়াই, যাত্রা পালা দিচ্ছে।'

'তা দিচ্ছে। অহঙ্কারে খাটো হবে কেন?'

তা সত্যি। জমিদারী না থাকলেও জমিজমা আছে, এবং পালার পুজোও আছে। এই উজিরপুরে ওই একখানিই দুর্গা পুজো। ওই পালার পুজো।

প্রবল শরীক, জিতেন্দ্রভূষণ মল্লিকের দু'দিনের পুজোয় একদিন জনার্দন অপেরার যাত্রা ও একদিন 'নীলমণি মান্না' কবির লড়াইয়ের দলের লড়াই হয়ে গেছে। বাকি দুদিন দুর্বল শরীক মনোরমা মল্লিকের আহূত—এই বসন্তবাহারের কবির লড়াই! আর—

'রামকৃষ্ণ অপেরার লীলা খেলা।'

'এই 'রামকৃষ্ণ' কিন্তু অপেরা পার্টির কর্তার নামে নয়, সেই দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুরের ব্যাপার। তাঁর স্বপ্নাদেশেই নাকি এর পত্তন।'

সুধো 'বসন্তবাহারের' আসল বাহার।

একহাতে তালি বাজে না, তাই বসন্তবাহারে আর নীলমণি মান্নার দলে তালি বাজাবাজি।

আসর সেই মল্লিকদের ঠাকুর দালানের উঠোন।

উঠোনের মাঝখানের হাঁড়িকাঠটা বাদ দিয়ে আসর সাজানো হয়েছে। পাছে কারো পায়ে ঠেকে, তাই গোটাকতক বাখারির টুকরো এনে একটু বেড়া দেওয়া হয়েছে। তবে ভক্তজনের হাঁড়িকাঠের মাটি আহরণের ঠেলায় একদিনেই সে বেড়ার অনেকটা গেছে, আশা করা যাচ্ছে আজ বাকিটা যাবে।

যাক। নবমীর পাঁঠারা তো বেলা দশটার মধ্যেই খতম হয়ে গেছে। আর দরকার কী?

সুধো স্নানের আগে পুকুরপাড়ে বেশ যত্নের সঙ্গে পৈতে মাজছিল।

গুপী গামছা গায়ে জড়িয়ে এসে বসলো। বললো, 'পৈতে শাদা বামুন গাধা! পৈতে মাজছিস্ কেন রে ভাগ্নে?'

গুপীকে সুধো কী সুবাদে কে জানে মামা বলে, তাই গুপী ভাগ্নে বলে।

সুধো বলে, 'সুধো চিরকেলে গাধা মামা, নতুন করে আর কী হবে?'

'আহা তুই আমাদের দলের সাধা গাধা। তবে মাঝে মাঝে ধোপার গাধার মতন কথা বলে বসিস। মনিবের কাছে কী বলেছিস রে? তাই নিয়ে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেছে।'

রাখালদাসকে বেশীর ভাগ সবাই 'মনিব' বলেই সম্বোধন করে।

কী বলেছে সেটা বুঝতে দেরী হয় না সুধোর, তবু তাচ্ছিল্যের গলায় বলে! 'কী বলেছি?'

'যা বলেছিস মাইরী, বেশ মজার কথাই বলেছিস। তা' ভাগ্নে ওই ছেলেটা মেয়েছেলে তা তোকে কে খবর দিয়ে গেল?'

সুধো গম্ভীরভাবে বলে, 'ভগবানদত্ত চোখ দুটোই দিলো খবর।'

'আরে হাবা, চোখ তো সবাইকেই দিয়েছে ভগবান। কেউ বুঝলো না, আর তুই বুঝে ফেললি?'

সুধো কথায় হারে না, গম্ভীরভাবে বলে, 'সব চোখ যদি 'চোখ' হতো তা হলে তো ভাবনাই ছিল না মামা।'

'সব চোখ চোখ নয়? তোর চোখটাই চোখ?'

সুধো অম্লান বদনে বলে, 'তা'তে আর আশ্চর্য্য কী? গলা তো তোমাকেও দিয়েছে ভগবান, আর সুধাংশু ঘোষালকেও দিয়েছে, তবে একজনের গলায় ঢাক বাজে কেন, আর একজনের গলায় বাঁশী?'

গুপী কথাটা একটু অনুধাবন করে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'হুঁ। অহমিকা হয়েছে। অহমিকা! হবে নাই বা কেন? মনিব যে মাথাটি খাচ্ছে। তোকে যেমন 'লাই' দেয় তেমন আর কাকে দেয় বল?'

সুধো দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'দেবে না কেন? গুণ দেখে, তাই দেয়।'

তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, 'তা বলে হঠাৎ যদি সুধোর গলায় ক্যান্সার হয়, আর দেবে?'

'দুর্গা। দুর্গা। ছোঁড়ার মুখে কিছু আটকায় না।'

বলে গুপী জলে নামে।

সুধোও নামে।

আর গুন গুন করে গায়, 'আমি ডুব জলে নামিলাম সই তলিয়ে যাবার তরে।'

আগে সুধো নাইতে খেতে যখন তখন গলা ছেড়ে গান গাইতো, এখন গায় না। রাখাল বারণ করে দিয়েছে। বলে, 'যখন তখন গলা ছাড়িসনে সুধো, সস্তা হয়ে যাবি।'

সুধো এখন গুনগুনোয়।

একসময় সেটা থেমেও যায়।

সুধো গান করতে করতে সন্ধ্যার আসরটার কল্পনায় বিভোর হয়।

বিকেল থেকেই আসরে ভীড় জমেছে। জায়গা দখলের আশায় মেয়ে মহল বেলা দুপুরেই রাতের রান্না সেরে নিয়ে কোলে কাঁখে দুধের বাচ্চাদের নিয়ে এসে বসে আছেন।

পুরুষদের দিকটা এখনো ফাঁকা। ওঁরা অতো হ্যাংলা নন, ওঁরা ধীরে ধীরে আসবেন।

বেশ কয়েকটা 'পেট্রোম্যাক্স' মজুৎ করা হয়েছে, আর উঠোন থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি উঁচুতে ঠাকুর দালানের মধ্যে তখন থেকেই একটা জ্বেলে রাখা হয়েছে।

লড়াইকামী দুই দলের জায়গা রাখা হয়েছে দুদিকে, মধ্যবর্ত্তী খানিকটা অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। বোধ করি রণক্ষেত্র হিসেবে।

বসন্তবাহারের দল আগে এসে বসলো।

গায়ক বাদক কর্তা।

হারমোনিয়াম বাজায় সন্তোষ, সে আবার একটু বাবু প্যাটার্ণের, তাই হারমোনিয়ামটা বয়ে এনে ধুপ করে বসিয়ে দিল দোয়ার জগন্নাথ। হারমোনিয়ামের হ্যাণ্ডেলে একটা জবার মালা জড়ানো।

মূলগায়েনের গলায় রজনীগন্ধার মালা।

এরপর মান্না কোম্পানীর দল এসে বসলো।

ওদের সাজ সরঞ্জাম দামী, পোষাক আশাক দামী, এবং তরুণ গায়েনের মুখটাতেও সেই দাম সম্পর্কে চেতনার ছাপ।

ওর নাম বটেশ্বর।

নামটা বেশ সৃষ্টিছাড়া তাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ করে এমন একখানি সুকান্তি তরুণের অমন নাম!

শুনে পর্য্যন্ত লোকে বলাবলি করেছে নিশ্চয় বটেশ্বর শিবের দোর ধরা।

হয়তো তাই, তবে সাজসজ্জায় শিবের সরলতা বা শিবের অনাড়ম্বরতা নেই।

জরিপাড় কোঁচানো ধুতির ওপর চুড়িদার পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর উপর আবার বেগুনী ভেলভেটের জহরকোট। সেই গাঢ় বেগুনী রঙের উপর অনেকগুলো মেডেল ঝকমক করছে।

চোখে সরু সুর্মা টানা, চুল কোঁকড়া কোঁকড়া ঘাড়ে ঝাঁপানো।

বটেশ্বরের হাত দুটি যেন মোম দিয়ে মাজা। তবে সত্যি ফর্সা কিনা বোঝবার জো নেই, এরাও আজকাল যাত্রা থিয়েটারের অ্যাক্টারদের মতো পেন্ট করতে শিখেছে।

আজ মান্না কোম্পানীর অগ্রাধিকার সেই কথাই জানিয়ে মান্নাবাবু করজোড়ে সকলের কাছে নিবেদন করেন, বাবু ভদ্দরলোকেরা যেন দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করেন। তার দলের নবীন গায়েন বটেশ্বরের শিক্ষা থাকলেও, বয়স অল্প কাজেই—ইত্যাদি।

এরপর বটেশ্বর উঠে দাঁড়ালো।

প্রথমে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণ বন্দনা করা বিধি।

বটেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশের ভঙ্গীতে সভাস্থ সকলকে নমস্কার জানিয়ে দেবী দুর্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে হাঁটুগেড়ে বসে প্রণাম করে নেয়।

তারপর যেন ঘুম ভেঙে লাফিয়ে ওঠার মতো আসরের মাঝখানে সরে এসে বাঁশীর মতো সরুগলায় শুরু করে—

তেত্রিশ কোটি দেবদেবী—
সবার চরণ সেবি,
    বটেশ্বর মাগে বরাভয়,
সকলে প্রসন্ন মনে
আশীসো গে অভাজনে
    এই রণে যেন হয় জয়।

সরু বাঁশীর সুর আস্তে আস্তে চড়তে থাকে, বটেশ্বর দু'লাইনে তেত্রিশ কোটী সেরে নিয়ে দুর্গামণ্ডপের দিকে ফিরে সুর করে গান গায়।

জয় জয় জগন্মাতা দেবী ভগবতী—
অভাগারে দেহ মা গো
    এ চরণে মতি।
রণক্ষেত্রে দাঁড়ায়েছে অবোধ সন্তান,

কণ্ঠে সরস্বতী দিয়ে
রাখো তার মান।

কলের পুতুলের মতো চারিদিক মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে থাকে বটেশ্বর—

মরালবাহিনী সুশুভ্রবরণী
বাগদেবী বীণাপাণি,
ও রাঙা চরণে নিয়েছি স্মরণ
আর কারে নাহি জানি।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একটা ঠেটা-ছেলে টুক্ করে বলে ওঠে। 'তেত্রিশকোটীর সবাইকেই তো জানো গুরু।'

বটেশ্বরের কান এড়াল না, বটেশ্বর শুধু ওই ভীড়ের মধ্যে একবার দৃষ্টিপাত করলো, কিন্তু অচঞ্চল গলাতেই বন্দনা শেষ করলো—

তব কৃপা পেলে
জিনি অবহেলে
শত্রুরে সম্মুখ রণে
কৃত্তিবাস্ আদি—
সবারে সম্বোধি—
দীন বটেশ্বর ভনে।

ভীড়ের মধ্যেই সেই ইয়ার গলাটা আবার বলে উঠলো, 'ভনিতা ছেড়ে এবার লাগো প্রভু—'

ভীড়ের মধ্যে থেকেই একটা গোলমাল উঠলো, 'কে? কে রে অসভ্যতা করছে? আসর থেকে বার করে দাও, কান ধরে বার করে দাও। জুতো মেরে বার করে দাও।' অসভ্যতা নিবারণের জন্য বেশ খানিকটা অসভ্যতার পালা অভিনয় হয়ে গেল।

বটেশ্বর কিন্তু অচঞ্চল।

বটেশ্বরের কোঁকড়া চুলে ঘেরা মুখে যেন দিব্য জ্যোতি, যেন বরাভয়ের আশ্বাস।

বটেশ্বর এবার ভাবে গদগদ বন্দনা গান বন্ধ করে সুউচ্চ বাঁশীর সুরকে মাঝারি পর্দায় নামিয়ে এনে গেয়ে ওঠে—

'মরি আহারে!
শরৎকালে দেখিলাম 'বসন্ত বাহারে।'
এখন বলুন দেখি সুধাংশুদা—
আপনার নামের মানে কী?
আয়না ধরে দেখুন দাদা,
মনে হচ্ছে—পান্তাভাতে ঘী।'

'সুধাংশুদা' সম্বোধনেই আসরে একটা হাসির গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, শেষের লাইনটায় হাস্যরোল উঠলো।

কারণ সুধাংশু দেখতে সুঠাম সুশ্রী হলেও রং কালো।

তাছাড়া তার বুকেও মেডেলের মালা আছে বটে, কিন্তু সাজ সজ্জায় অতো জৌলুস নেই। সুধাংশু পেন্টও করে না।

এরপর আর সুধাংশু চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠে গলা ছাড়ে সুধাংশু—

'বটা তুই—
কাজল এঁকে চোখ করেছিস,

পেণ্টো করে রং
তোর চাল চলনে উঠছে ফুটে
মেয়ে-ছেলের ঢং
রূপ দেখিয়ে আসর মাতায়—
সুধো, এমন বান্দা নয়,
গুণের লড়াই হোক রে বটা—
দেখি কাহার জয়।'

সঙ্গে সঙ্গে বটেশ্বরের মুখে খই ফোটে,

'গুণের বড়াই দেখাতে চাও
ওহে গুণমণি—
বল দেখি গণেশবাবুর
মামা কেন শনি?'

শনি কী সুবাদে গণেশের মামা, কবির লড়াইয়ে এটা একটা কঠিন প্রশ্ন নয়, কিন্তু হঠাৎ সুধো যেন স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলে।

সুধো ওই প্রচলিত গল্পটা ভুলে যায়।

এক সেকেণ্ড, দু সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড। বিশ, ত্রিশ—

এইটুকুই যথেষ্ট।

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে, 'পারছে না পারছে না।'

রাখালদাসের মুখ শুকিয়ে আসে।

কী আশ্চর্য এই সামান্য কথাটার উত্তর দিতে পারছে না সুধো?

রাখাল দাসের মনে পড়ে যায় সুধোর কথাটা—'ওই বটেশ্বর? ও ছোঁড়া ছেলে নয়।'

ওই, ওই এক উৎকট ধারণা মাথায় ঢুকেই ছোঁড়া বেসামাল হয়ে গেছে।

এখন কী হবে?

আর একটা মিনিট পর্য্যন্ত—

তার পরই তো হাত তালি পড়বে।

ছিঃ ছিঃ হাত তালি!

কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে সুধো।

ওই প্রচলিত গল্পটা মনে না পড়লেও সুধো অন্য জাল বিস্তার করেছে—

'স্বর্গভূমে কে কার বাবা,
কে কার পিসেমশাই—
হিসেবটা তার ঠিক আছে তোর—
ওরে আমার বটাই?
মা দুগ্গার মাসতুতো বোন
তাঁর দিদিমার নাতি
তিনি শনি, মায়ের মামার
বংশে দিতে বাতি।
বুঝলি এখন?
শনি কেন গণপতির মামা?
না বুঝিস তো
সেলাম ঠুকে কবির লড়াই থামা।'

রাখাল দাসের বুঝতে বাকি থাকে না সুধো হেরে যেতে যেতে একটা চালাকি খেলে ডুবো নৌকোটা ভাসিয়ে তুলেছে। মান্না কোম্পানীও রাগে গরগরালো, কিন্তু শ্রোতার দল চট করে ধরতে পারেনা। তারা তখন 'মাসতুতো বোনের দিদিমার নাতি'র ধাঁধাঁয় ঘুরছে।

বটেশ্বর এই কুটিল চক্রান্তের একটা উচিত মতো উত্তর দেবার চেষ্টা ভাঁজছিল এই সময় হঠাৎ ড্যাডাং ড্যাডাং রবে ভোগারতির বাজনা বেজে উঠলো।

এটি মল্লিক বাড়ির বিশেষ প্রথা।

সন্ধ্যা আরতির পর যথারীতি বৈকালীর ভোগরাগ সমাধা হলেও রাত বারোটায় একটি বিশেষ ভোগ হয়, 'ক্ষীরভোগ।' এ আরতি তার।

এঁদের পূর্বতন কর্তা বলতেন, 'ছেলে-পুলে যেমন ঘুমের আগে দুধ খেয়ে শোয়, আমার মা বেটি তেমনি ক্ষীর খায়।'

ঢাক ঢোলের শব্দে কিছুক্ষণ লড়াই বন্ধ থাকলো।

ইত্যবসরে রাখাল চুপি চুপি বললো, 'সুধো তোর হলো কী? আরটু হলে যে ফেঁসে যাচ্ছিলি? যাই হোক খুব একখানা ম্যানেজ করে নিয়েছিস। আজ মা দুগ্‌গা তোর সহায়, কিন্তু এবার তুই একখানা মোক্ষম চাপান দে সুধো যাতে ও ছোঁড়া কাৎ হয়ে যায়।'

সুধো তৎক্ষণাৎ রাখালের কথার প্রুফ কারেকশান করে দেয় 'ছোঁড়া নয়, ছুঁড়ি।'

এরপর জমে উঠলো লড়াইয়ের উন্মাদনা। গালমন্দ, ব্যক্তিগত আক্রমণ। যারা লড়ছে, তাদের থেকে অনেক বেশী উত্তেজিত শ্রোতারা।

রাত প্রায় ভোর হয়ে আসে।

সুধো শেষ লড়া লড়ে 'জবাব' দেয়!

'এবার রংচঙানি ধুয়ে ফেলে—
বাড়ি যাও হে বটু—
হাটে হাঁড়ি ভাঙবোনা আর—
শুনতে হবে কটু।
সাঙ্গ হলো এবার তবে
উজিরপুরের পালা
যা বটেশ্বর গলায় পরে
টাটকা ঘুঁটের মালা।'

বটেশ্বরের যখন ঘুঁটের মালার বরাদ্দ, তখন ধরে নিতে হবে বটেশ্বরই পরাজিত।

হাততালিতে ফেটে পড়ল অক্লান্ত শ্রোতাদের আসর। সারারাত জেগে তাদেরও উৎসাহে ঘাটতি নেই।

আসর যদি ফাঁকা হয়ে যেতো, গায়েনদেরও অবশ্যই উৎসাহে ভাঁটা পড়তো। কিন্তু শ্রোতার দলই অফুরন্ত উৎসাহে 'আরো হোক, আরো চলুক'। করে জিনিসটাকে থাকতে দিচ্ছিল না।

কুচোকাঁচারা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে অভিভাবকদের কোলের গোড়ায় পায়ের তলায় হাঁটুর নীচে চটকে পড়ে আছে, সেদিকে অভিভাবকদের দৃষ্টি নেই। জানেন সকালে উঠে বাড়ি যাবার সময় খুঁজে পেতে কুড়িয়ে নিয়ে যাবো।

স্টেশনের ধারে সম্প্রতি একটা 'সিনেমা হল' হলেও এটা একটা আলাদা আকর্ষণ।

সারা বছরের প্রতীক্ষার বস্তু।

আবার আগামীকাল যাত্রা শুনবে রাত জেগে। গতকাল পর্যন্ত তো এই কাহিনী হয়েছে।

পুরুষরা দিনেরবেলা ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবে, মেয়েদের সে সুবিধে নেই, তারা সারাদিন হাই তুলবে আর কাজ সারবে।

মল্লিকরা বরাবর এখানে থাকে না বটে তবে দেশের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেনি। ছেলেবুড়ো সকলেরই উজিরপুরের ওপর খুব টান।

আর এই পুজোর ব্যাপারে মহোৎসাহ ওদের। কলকাতার অনেক কুটুম কাটুমও 'বাড়ির পুজো' দেখবে বলে সঙ্গে আসে। কলকাতায় তো বারোয়ারি ছাড়া পূজা বলতে কিছু চোখে পড়ে না। আর পড়লেও সেখানে কে নাক গলাতে দিচ্ছে?

এ আলাদা সুখ।

তাই এই পুজোর সময়টা উজিরপুরের পথঘাট, বাগান পুকুর গ্রামের এবং শহরের কলকণ্ঠে আর আনন্দ ধ্বনিতে ঝনঝনিয়ে ওঠে।

সুধো বাগানে এসে দাঁতন করছিল।

ফুলবাগান নয়, আম কাঁঠালের বাগান। এখন ফল নেই কিন্তু নিবিড় ছায়া আছে।

সুধো সেই ছায়ায় একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে দাঁতন করছিল।

সুধোর মন অন্যমনস্ক, মুখ শুকনো বিষণ্ণ।

সারারাত লড়ালড়ির পর সকালে অবশ্যই মুখ তাজা থাকবার কথা নয়, কিন্তু এ সে শুকনো নয়। এ আর কিছু।

গত রাত্রের বাকযুদ্ধে সুধোই শেষপর্যন্ত জিতেছে, কিন্তু এ জেতায় আত্মপ্রসাদ নেই। সুধোর বিবেক সুধোকে কাঁটা বিঁধোচ্ছে।

'কথার কারচুপিতে আমি জিতেছি ওকে হারিয়ে দিয়েছি—।' সুধো ভাবে, কিন্তু এই জেতা ন্যায্য জেতা নয়।

অনেকবারই শ্রোতাদের ধাঁধাঁয় ফেলে আসল উত্তর এড়িয়ে গিয়ে ওকে হতভম্ব করে দিয়েছি, জব্দ করে দিয়েছি। ফলে ও খেইহারা হয়ে অন্য খেই ধরতে গেছে। অবশ্যি মাঝে মাঝে ও খুব কাঁচামিও করেছে। তখন মজা লেগেছে।

তখন ওকে ঠিকই পেড়ে ফেলেছি।

ঘাম ছুটে গেছে ওর।

কিন্তু ঐ এক একবার?

সুধো বিবেককে ঘুম পাড়াতে পারছে না।

তাই সুধোর জিতেও পরাজিতের মুখ।

সেই গভীর সন্দেহটাই সুধোকে এতো পীড়া দিচ্ছে নচেৎ ছলে বলে কৌশলে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করাই তো খেলা।

ওই সন্দেহটা যদি না জাগতো, সুধো এত ধিক্কার বোধ করতো না। সমানে সমানে লড়াই হলে যে ভাবেই হোক পাঁচজনের সামনে দলের মান বজায় থাকে। নিজের মুখ বজায় রাখাটাই গৌরবের। কিন্তু এ যে তখন কেবলই মনে হয়েছে একটা মেয়ের কাছে হারবো?

আর এখন মনে হচ্ছে, একটা মেয়ের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে জিতলাম?

কিন্তু ওই 'মেয়ে' শব্দটা এমন করে পেয়ে বসেছে কেন সুধোকে?

রাখালদাস তো বারবার বলেছিল, 'বাজে চিন্তাটা ছাড় সুধো! শ্রোতার মনহরণ করবার জন্যে ছোঁড়াকে অমন নটবর করে সাজিয়েছে। দেখতে রসালো আছে কিনা।'

তবু সুধো ভাবছে সত্যিই কি তাই?

ওই মুখটা সুধোর কোন গভীর অতলে একখানা ছায়া ফেলেছিল নাকি? অনেক অনেক দিন আগে? ঢেউয়ের তোলপাড়ে ভেসে উঠলো, অতল থেকে উপরে এলো। অথচ নামগন্ধ কিছুই মনে পড়ছে না। একটা গানের সুর।

যেন কতোকাল আগে পাওয়া একটা সুরভি পুষ্পের সৌরভ স্পর্শ।

দাঁতনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল সুধো। আর সেই সময়ই সংকল্প করলো সুধো, আমি ওর সঙ্গে দেখা করবো।

হ্যাঁ দেখা করবো।

দেখা করে ক্ষমা চাইবো।

স্পষ্টাস্পষ্টিই বলবো, 'আমি তোমায় ফাঁকি দিয়ে হারিয়েছি।'

লোকসমাজে তো আর ও মেয়ে নয়?

দেখা করতে চাইলে লজ্জা কী?

তারপর সুধো চান করে নিতে জলে পড়লো।

তাই করে এরা।

সারারাত জেগে সকালে একেবারে চান করে উঠে বড়ো এক গ্লাস চিনির শরবৎ অথবা এক গ্লাস ডাবের জল খেয়ে টেনে লম্বা হয়।

সুধো ভাবলো এখন দেখা করতে গিয়ে লাভ নেই। বটেশ্বর নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে।

তবু ব্যাকুলতার জয় হলো।

সুধো স্নান করে ভাল ধুতি পাঞ্জাবী পরে জিতেনবাবুর বৈঠকখানা বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলো। এইখানেই মান্না কোম্পানীর থাকবার জায়গা হয়েছে।

সুধো গিয়ে দরজার কাছে কাকে একটা বললো, 'মান্না মশাইকে একবার ডেকে দাও তো ভাই।'

'মান্না মশাই?'

ছেলেটা অগ্রাহ্য ভরে বলে, 'তেনার এখন মাঝরাত্তির। ওখান থেকে ফিরেই তো লম্বা দিয়েছে।'

সুধো বলে, 'আচ্ছা দলের আর কে আছে?'

'আছে তো সবাই। চলে গেলে তো এই নটা দশের গাড়িতে চলে যাওয়া যেতো, কিন্তু সবাইতো ঘুমে ঘুমে কুমড়ো গড়াগড়ি।'

সুধো মৃদু হেসে বলে, 'কেউ জেগে নেই?

'আছে।'

ছেলেটা ঘাড় দুলিয়ে বলে 'বটেশ্বরদা আছে। তিনি তো চান করে এসে চা বানিয়ে খাচ্ছে।'

'আচ্ছা বটেশ্বর বাবুকেই একবার গিয়ে বল, তোমায় ডাকছে—।'

ছেলেটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'আপনিই কালকের গায়েন না? বসন্তবাহার কোম্পানীর?

সুধো হেসে বলে, 'হুঁ। তুমি তো দেখছি চিনে ফেলেছ?'

'আগে পারিনি, এখন পেরেছি। তা' কালকের লড়ালড়িতে কে জিতলো কে হারলো?

সুধো হাসিমুখে বলে, 'কেন, তুমি ছিলে না?'

'একটুক্ষণ ছিলাম। আমার আবার ঘুম বাতিক, তাই চলে এসেছিলাম।'

'ওঃ! লড়াইতে তিনি জিতলেন আমি হারলাম।'

'সত্যি?'

'সত্যিই তো।'

'তা এখন আবার বটেশ্বরদার সঙ্গে কী কাজ?'

সুধো গম্ভীরমুখ করে বলে, 'ওনার কাছে একটু শিক্ষা নিতে এসেছি। কিসে জেতা যায়।'

ছেলেটা দৃঢ়ভাবে বলে, 'উনি দেবে না। কেন দেবে? নিজের গুণ বিদ্যে কেউ অপরকে শিখিয়ে দেয়?'

'দেয় না? মাষ্টার মশাইদের কাজই তো তাই।'

'বটেশ্বরদা তো আর মাষ্টার মশাই নয়।'

'তা নয় বটে। তবে অপর দলের কেউ খোসামোদ করে শিখতে চাইছে শুনলে, 'না' করতে পারবে না।'

'আচ্ছা দিচ্ছি ডেকে।'

বলে চলে যায় ছেলেটা।

একটু পরে এসে দাঁড়ায় বটেশ্বর।

কালকের সেই সাজের সমারোহ এখন অন্তর্হিত। পেন্টের কোটিং ধুয়ে ফেলা হয়েছে। শুধু ফর্সামতো একটি ছেলে বলে মনে হচ্ছে।

সুধো একটু থমকে যায়।

যে দুদিনই দেখেছে বটেশ্বরকে, ওই রংচঙে চেহারা। তাতে যেন মোহিনীমূর্তির আভাস।

সুধো একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'ক্ষমা?'

বটেশ্বর রীতিমতো অবাক হয়।

'হঠাৎ ক্ষমা চাইতে?'

'দেখুন একটু বসতে পেলে ভালো হতো।'

বটেশ্বর বলে, 'বসুন।'

'আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।'

বললো সুধো।

আর পরমুহূর্তেই বটেশ্বর তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, 'কেন, ঘুঁটের মালা একগাছা নিয়ে এসেছেন বুঝি?'

সুধো মাথা নীচু করে বলে, 'দেখুন, ওসব তো বাইরের ব্যাপার। বলতে গেলে, এ তো খেলাই।'

বটেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'তা এখন আবার আপনার বক্তব্য কী?'

সুধো মাথা নীচু করে বলে, 'বললামতো 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'ক্ষমা? সেটা আবাব কী?

বটেশ্বর হেসে ওঠে।

যে হাসি একমাত্র মেয়ে মানুষেই হাসতে পারে, ব্যঙ্গ আর তিক্ততায় ভরা।

সুধো কি তাহলে নিঃসন্দেহ হবে?

সুধো কি এখনই বলে বসবে, 'আচ্ছা আপনি কখনো 'কানসোনাপুরে ছিলেন? কানসোনাপুর? যেখানে তিন চুড়ো মদনমোহনের মন্দির আছে?'

কিন্তু না এখুনি ও কথা বলে বসা যায় না।

সুধো আস্তে আস্তে বলে, 'আমি কাল আপনাকে অন্যায় করে পরাজিত করেছি। তাই সেই পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

বটেশ্বর ভুরু কুঁচকে বলে 'অন্যায় কিসের? ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিধনই তো যুদ্ধের নীতি।'

'নাঃ।' সুধো বলে, 'দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ভীমসেনের চিরকলঙ্ক। হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেল, ভীমের সে কলঙ্ক ধুয়ে মুছে গেল না।'

বটেশ্বর মৃদু হেসে বলে, 'সেটা সে যুগের বলে। এ যুগে ওসব নীতি ফিতি অচল।'

'তা নয়। নীতি সব যুগেই সমান।'

সুধো বলে, 'আমি নিজে তো টের পাচ্ছি, আমি অন্যায় করে জিতেছি। যে চাপানের উত্তর দিতে পারিনি, সেটা জগাখিচুড়ি করে জিতেছি।'

বটেশ্বর এবার একটু কৌতুকের হাসি হাসে, 'তাই সকাল বেলাই বিবেকের দংশনে ছুটে এসেছেন?'

সুধো বলে, 'তাই।'

'তা বেশ, তাহলে একটু চা খেয়ে যান।' বলে একটু হাসির হিল্লোল তুলে ভিতরে ঢুকে যায় বটেশ্বর, এবং একটু পরেই একটা কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস চা নিয়ে এসে বলে, 'শুধু চা কিন্তু—'

'তাতে কি? তাতে কি?'

সুধো চায়ে চুমুক দিয়ে একটা আরামের শব্দ করে বলে, 'আচ্ছা আপনাকে একটা কথা শুধোই। এই বয়সে এমন শিক্ষাটা করলেন কবে? গুরু কে? কোথায় শিক্ষা?'

বটেশ্বর আস্তে আস্তে বলে, 'একে একে বলতে হয় তা'হলে। এই বয়সে? আমার বয়সটা আপনি জানেন?'

'নাই বা জানলাম। দেখে তো মালুম হচ্ছে।'

বটেশ্বর আবার তেমনি একটু হেসে বলে, 'আপনাকে দেখেও তো নেহাৎ বড়ো বলে মনে হচ্ছে না? আপনাকেও তো ওকথা জিজ্ঞেস করা যায়?'

'তা আমারটার আগে উত্তর দিন, তারপর ওটা হবে।'

বটেশ্বর বলে, যাক দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে 'এমন শিক্ষা।' তা' সেটাই বা কী এমন? হেরে ভূত হলাম তো।'

'দেখুন ওকথা বলবেন না। ভূত আপনি হননি।'

'ঠিক আছে, ভূত হইনি। বটেশ্বর বলে ওঠে, 'তবে আমি জানি আমি ভূত হয়ে গেছি।'

সুধো সাবধানে বলে, 'তাহলে তো আর না জিগ্যেস করে পারছি না। কানসোনাপুরে গেছেন কখনো?'

'কানসোনাপুর?'

বটেশ্বর হঠাৎ দারুণ থমকে যায়।

বলে, 'কানসোনাপুর?' সে আবার পৃথিবীর কোনখানে? বিলেতে না আমেরিকায়?'

সুধো হঠাৎ গাঢ় স্বরে বলে, 'আমি যদি বলি সেটা কোথায় তুমি ভালই জানো। আর সেখানে তুমি বটেশ্বরে নামে ঘুরে বেড়াতে না। ঘুরে বেড়াতে পুতুল নামের ছোট্ট একটি মেয়ে হয়ে। ভোর না হতেই শিউলি ফুল তুলতে ছুটতে—'

'কী আবোল তাবোল বকছেন?'

বটেশ্ববের সুরেলা গলা হঠাৎ কড়া হয়ে ওঠে। 'সকাল বেলাই নেশাভাঙ করে এসেছেন না কি? যান বাড়ি যান।'

সুধো মৃদু হেসে বলে, 'আমার উত্তর পেয়ে গেছি। চলি—'

বটেশ্বরের মুখটা লাল দেখায়। সে কড়া অথচ চাপা গলায় বলে, 'কাল অতো অপমান করেও আশা মেটেনি? আরো করতে চান?'

'কালকে?' সুধো বলে 'আমি যদি ইচ্ছে করে হেরে যেতাম তাহলেই কি তোমার মানটা বাড়তো পুতুল? তাতে তোমার—'

বটেশ্বর ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আবার আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছেন? মনে রাখবেন, এখানে খেলনা পুতুল বলে কিছু নেই। আপনি নীলমণি মান্নার দলের কবিয়াল বটেশ্বর সরকাবের সঙ্গে কথা বলছেন?

'পুতুল' আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি। তোমার ওই রাগের মুখই তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে—'

'তাহলে যান, সবাইকে বলে বেড়ানগে—' বটেশ্বর রুদ্ধ গলায় বলে, 'অনেক দুঃখের স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে একটা কূল পেয়েছি, সেটা ঘুচিয়ে দিন। মহৎ ব্যক্তি, মহত্ত্বের পরিচয় দিন আরো একবার।'

সুধো হাতের চায়ের গেলাশটা নামিয়ে রেখে বলে, 'কোনমতেই মাপ করা যায় না?'

'না?' বটেশ্বর এবার অগ্নিমূর্তি হয়।

বলে, 'দেখুন এবার কিন্তু আমি এদের ডেকে বলে দিতে বাধ্য হবো, ওই বসন্তবাহারের গায়েন সকাল বেলা নেশা করে এসে মাতলামি শুরু করেছে।'

সুধো উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'আচ্ছা চলে যাচ্ছি। কিন্তু, মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলে, 'আর আমি যদি ছদ্মবেশের কথাটা প্রকাশ করে দিই?'

বটেশ্বর কয়েক সেকেণ্ড স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, 'শুধু প্রকাশ করলেই তো চলবে না, তাহলে দুঃশাসনের পার্টটাও আপনাকেই নিতে হবে।

'ছি ছি! তোমার মুখে কিছু বাধেনা দেখছি।'

'মুখে বাধবে?'

বটেশ্বর তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'পেশা তো তের্জা লড়া, তাতে মুখ কি বাবু ভাইয়ের মতো সভ্য থাকে সুধাংশুবাবু?'

'তা বটে! আমাদের দেবদেবী বন্দনা, কি দেহতত্ত্বের গান, ওগুলো লোকের আপদ বালাই লাগে। দেখি তো? সভার মধ্যে যতো গালাগালের স্রোত বওয়াবো, যতো ছোটলোকের মতো ইতর ভাষা বিষ্টি করবো, ততোই বাবু ভাইয়েদের মনোরঞ্জন হবে।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না অনেক চোখ এদিকে সেদিক থেকে দেখছে, আপনি যান।'

'যাচ্ছি পুতুল, যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা বলি, তোমায় তো কেউ "মেয়েছেলে" বলে জানেনা, দেখলই বা?'

'ওঃ! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি থামবেন? আপনি কি আমার সর্বনাশ করতে চান?'

সুধো আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে যায়, আর কিছু বলে না।

সুধোর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে বটেশ্বর।

ভগবান একী খেলা তোমার!

যে সম্পদের জন্যে হাহাকার করে বেড়ায় মানুষ, হয়তো সেই সম্পদটুকুই এমন সময় দাও যে তাকে বিপদ বলে মনে হয়।

যে ছেলেটা সুধোকে বসিয়েছিল, সে বলে, 'ও তোমার চেনা না কি বটেশ্বর দা?

বটেশ্বর সংক্ষেপে বলে, 'হ্যাঁ আমার মাসির মায়ের কুটুম'।

ওখানে ওদিকে—'সুধো সুধো' রবে হৈ চৈ উঠে গেছে।

কে দেখেছে ওকে শেষ?

কে আবার দেখেছে? কেউই দেখেনি। নাইতে গিয়েছিল সেইটাই দেখেছে সবাই।

ও এসে দাঁড়াতেই রাখাল দাস প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে ওঠে "কোথায় ছিলে যাদু? সবাই বলছে নাইতে গিয়ে আর ফেরেনি।" .

সুধো বসে পড়ে বলে, 'তাই বুঝি? তা' কান্নাকাটি পড়ে যায়নি কেন?'

'পড়বো পড়বো করছিলো' গুপী বলে ওঠে। ভাবছি এই মিছরির সরবৎটুকু গালে দিয়েই—'ওরে আমার ভাগ্নে রে!' বলে মড়া কান্না কাঁদতে বসবো।'

এই ওদের রসিকতা।

রাখাল বলে, 'নে শরবৎটা খা।'

'নাঃ আর শরবৎ খাবো না, 'এই মাত্তর চা খেয়ে এলাম।'

'চা?' গুপী শোবার জোগাড় করছিলো—

ছিট্‌কে উঠে বলে, 'চা? সক্কাল বেলা আবার চা তোমায় কোন কোম্পানী দিলো ভাগ্নে?'

সুধো গম্ভীরভাবে বলে, 'মান্না কোম্পানী।'

'মান্না কোম্পানী? তোকে চা খাওয়ালো?'

গুপী আবার শুয়ে পড়ে বলে, 'মনিব! যা বলেছি তাই।'

রাখালের আগেই সুধো বলে ওঠে, 'কী বলেছো শুনি'?

'বলছিলাম নাইতে নেমে জলে পড়ে গেছলো সুধো, কেউ জাল ফেলে তুলে নিয়ে গেছে। ওই ওরাই নিয়ে গেছলো—'

রাখাল দাস ধমক দিয়ে ওঠে, 'তুই থাম্‌তো গুপী। আমি প্রকিত কথাটা শুনি। মান্না কোম্পানী তোকে

সকালবেলা ডেকে নিয়ে চা খাওয়ালো? আর তুই তাই খেলি?'

'তা খাবোনা কেন?

রাখাল আতঙ্কের গলায় বলে, 'তোর একবার সন্দেহ হলোনা এর কারণটা কী?'

'এই দেখো রাখালদা, এক গেলাস চা দিচ্ছে, তাতে সন্দেহের কী থাকবে? বিষ মিশিয়ে দেবে?'

রাখাল ব্যাকুলভাবে বলে, 'তাতেই বা ঠাট্টার কী আছে সুধো? এই পৃথিবীতে ঘটে না এসব? বলি তুই ওদের দলের শত্রু কি না? কালকের পরাজয়ে মরীয়া হয়ে বদমতলব আঁটতে পারে না? প্রাণে না মারুক, তুকতাক করে গলাটা খারাপ করে দিতে পারে, মাথাটা খারাপ করে দিতে পারে।'

'আমি তো দেখছি রাখালদা, তার আগে তোমার মাথাটাই কেউ খারাপ করে দিয়েছে।'

'ওরা ডেকেও নিয়ে যায়নি। আর একা আমায় মন্ত্রপূত চাও খাওয়ায় নি। স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম।' সুধো অবহেলায় বলে,

'ওরা খাচ্ছিলো, সেই থেকে—'

'স্বেচ্ছায় গিয়েছিলি? তা এমন স্বেচ্ছাটা হলো কেন?'

'দেখো রাখালদা', সুধো গাঢ় স্বরে বলে, 'সকাল থেকে মনের মধ্যে কাঁটা ফুটছিলো, মনে হচ্ছিল আমি সত্যি জিততে পারিনি, ছলে কৌশলে জিতেছি। তাই মাপ চাইতে গিয়েছিলাম।'

'মাপ চাইতে গিয়েছিলি? কার কাছে?'

'আর কার কাছে? স্বয়ং বটেশ্বরের কাছে?'

'ওরে আমার যাদুরে, ওরে আমার মানিকরে—বটেশ্বরের কাছে মাপ চাইতে গিয়েছিলি তুই!'

রাখাল কখনো যা না করে, তাই করে। প্রায় ধাক্কা দিয়ে বলে, 'এতো বিবেকবান পুরুষ তুমি? শুনে যে আমি হাঁ হয়ে যাচ্ছি।'

গুপী আবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে 'মালিক, ব্যাপার মনে হচ্ছে গুরুচরণ! ওই বটেশ্বরটা আসলে বটেশ্বরী কিনা সেই খবরটা নেবার জন্যে ভাগ্নে আমাদের সকলের অগোচরে—খি খি খি খি!'

'ভালো হবে না বলছি মামা!'

'এ দেখো ফোঁস করেছে!'

গুপী একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে রাখাল দাসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় কবে দুই হাত উল্টে হতাশার ভান করে।

সুধোও একখানা শতরঞ্চ পেতে, চাদর চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলছে, মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। তবু সারা রাত্তিরের জাগরণ ক্লিষ্ট চোখদুটো বুজে আসে।

শরীর হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কালেক্টর। যেখানে যা বাকিবকেয়া পাওনা থাকে, আদায় করে ছাড়ে সে।

*　　　*　　　*　　　*

সুধো আস্তে আস্তে ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটা বটগাছ, একটা ডিঙ্গিনৌকো আর একটা ছোট ছেলে।

ছেলেটা সেই বটগাছের তলায় বসে কোঁচার খুঁটে মুড়ি মুড়কি নিয়ে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে দুটো চারটে করে মুড়ি নিয়ে দীঘির জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে।

ছেলেটার দৃষ্টি উদাস উদাস।

ওই ডিঙি নৌকোটা চড়ে যদি অনেক অনেক দূরে চলে যাওয়া যেতো! তাহলে ও সেই অনেক 'দূরের দেশে' গিয়ে বসবাস করতো। যা ইচ্ছে করবে, যা জুটবে খাবে, আর গান গেয়ে গেয়ে বেড়াবে। যেমন অন্ধ ভিখিরীরা গায়।

সেই ঘাটের ধারে একটি মহিলা এলেন ছোট্ট একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে।

মহিলাটি নিজে চান করবার আগে সেই বছর চারেকের ছোট্ট শিশুমেয়েটাকে বেশ পরিপাটি করে চান করিয়ে ছেলেটার কাছে এনে একটু মিষ্টি হেসে হেসে বললেন, 'মেয়েটাকে একটু দেখবে বাবা, যেন জলের ধারে না যায়। আমি চানটা করে নেব।'

ছেলেটা আড়ষ্ট হয়ে তাকালো।

মেয়েটাও মহিলাটির আঁচল চেপে ধরলো।

মহিলাটি হেসে বললেন, 'ভয় কি? দাদা হয়। বোসো দাদার কাছে বোসো। তোমার নামটি কী বাবা?'

নাম শুনে বলেন, 'তা' এখানে একা যে?'

ছেলেটা কোনো উত্তর দেয় না। শুধু মেয়েটার হাত ধরে সামলাবার চেষ্টা করে।

মহিলাটি আবার বলেন, 'তোমার সঙ্গে কেউ নেই?'

'না।'

'কেন বলতো? বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটা হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'বাড়ি নেই।'

'বাড়ি নেই! ওমা সে কী? রাগ করে পালিয়ে আসোনি তো বাবা?'

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'হ্যাঁ এসেছি। কী করবে তুমি? আবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে? ঠিকানা বলবোই না।'

মহিলাটি একটু হেসে ওর হাত ধরে বলেন, 'তা কেন? আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো। আমার কাছে রাখবো। এর একটিও দাদা দিদি নেই, তুমি ওর দাদা হবে। ওকে নিযে খেলা দেবে, একসঙ্গে খাবে।'

একসঙ্গে খাবে!

কথাটা কী অদ্ভুত সুন্দর!

ছেলেটার চোখে জল আসে।

কতোদিন ওই 'খাওয়া' শব্দটা ভুলে গেছে সে।

ঘুরতে ঘুরতে একটা মুড়ি বাতাসার দোকানের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো, তারা চারটি মুড়ি মুড়কি দিয়েছে।

এই একটা ধুতি আর কোট, এই পরে কতোদিন যেন রয়েছে।

'যাবে তো আমার সঙ্গে?'

ছেলেটা ঘাড় কাৎ করে।

এমন স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি সে বুঝি কখনো দেখেনি।

মহিলাটি বলেন, 'তবে বোনটিকে ধরো? আমি চান করে নিই কেমন?'

ছেলেটা সেই ফুটফুটে মেয়েটাকে ধরে রাখবার জন্যে আত্মনিয়োগ করে।

তারপর?

তারপর একখানি ছোট্ট সুন্দর একতলা বাড়ি। মেটে উঠোন, উঠোনে ফুল গাছ। তুলসী মঞ্চ, ঘরের মধ্যে চৌকিতে ধবধবে বিছানা পাতা। রান্নাঘরে ঝকঝকে কাঁসার বাসন সাজানো।

এই বাড়িতে আশ্রয় পেলো ছেলেটা।

ঝকঝকে কাঁসার থালায় পরিপাটি করে বাড়া ভাত, ছোট ছোট বাটিতে ডাল তরকারি।

দেখে চোখে জল আসতো তার।

এতো আদর কবে পেয়েছে সে?

এমন যত্ন?

দুদিনে হৃদয় উজাড় হয়ে যায়।

বুঝি দু' পক্ষেরই।

'বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলি কেন রে?'

'এমনি।'
'এমনি? এমনি কেউ বাড়ি ছাড়ে? মা নেই বুঝি?'
'আছে।'
'মা আছে, তবু তুই বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি? কী নিষ্ঠুর রে তুই?'
'বাঃ! ও কি আমার নিজের মা? ও তো টুনুর মা।'
'টুনু কে?'
'আমার বোন।'
'বুঝেছি! সৎমা। তা' তোকে খুব মারতো বুঝি?'
'মারতো না বেশী। ভয় দেখাতো।'
'ভয় দেখাতো? কিসের ভয়?'
'ভূতের, একানড়ের, বেম্মদত্যির।'
'তা' তোর বাবা ভালবাসতো না?'
'বাবা তো কেবল মারতো। শুধু শুধু মারতো। একদিন না এমন মারলো আমার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে গেল।'
'ষাট ষাট! বাছারে। শুধু শুধু এমন করে মারলো?'
ছেলেটা একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে, 'সেদিন শুধু শুধু নয়—'
'সেদিন বুঝি দুষ্টুমি করেছিলি?'
'হুঁ। বলেছিলাম, আমি অন্ধ ভিখিরি হবো, তাই চোখে মায়ের মাথার কাঁটা ফোটাচ্ছিলাম।'
'ওরে বাবারে। কী সর্বনেশে ছেলেরে তুই।'
ছেলেটা অনুভব কবলো তিনি যেন কেঁপে উঠলেন। তারপর ওর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এতো দেশ থাকতে অন্ধভিখিবি হবার ইচ্ছে হলো কেন রে তোর?'
'অন্ধ ভিখিরিরা যে ভালো গান গাইতে পারে।'
'কে বলেছে তোকে একথা?'
'নন্দকাকা।'
'নন্দকাকা কে?'
'ও এমনি! মাছ ধরে।'
'হুঁঃ। তা' শুধু অন্ধরাই গান গাইতে পাবে?'
'কি জানি।'
'আচ্ছা জানাই তোকে আয়।'
বলে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন।
আস্তে আস্তে একটু সুর ভেঁজে গান ধরলেন। তারপর? গানের পর গান। পর্দার পর পর্দা, বাঁশীব মতো গলা।
ছেলেটা যেন পাথর হয়ে গেছে।
চেতনা নেই। চেতনা হতে হতে ভাবতে শুরু করলো এ যে তার ঠিক ধ্রুবর মতো হলো।
ধ্রুবকে ধ্রুবর বাবা কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলো, আর সৎমা বকেছিল বলেই না ধ্রুব তারপর ভগবান পেয়েছিল, স্বর্গ পেয়েছিল!
এই গানের মানুষের কাছে থাকতে পাচ্ছে ছেলেটা, তাঁর হাতের রান্না খাচ্ছে, তাঁর কাছে শুচ্ছে। এ স্বর্গ ছাড়া আর কী?
'গান তুই খুব ভালবাসিস নারে সুধা?'
'হু।'

'পুতুলও গান বলে লাগল। যখন এতোটুকু বাচ্চা, কেঁদে আকুল হচ্ছে, গান শুনে চুপ।'

'তুমি এতো ভাল গান কী করে শিখলে?'

'গুরু শিখিয়েছেন।'

'কোথায় গুরু।'

'নেই। মারা গেছেন।'

'তোমার সবাই মরে যায় কেন? পুতুলের বাবা মরে গেলো, গুরু মরে গেলো—'

'আমার কপাল রে—'

'যদি আমরাও মরে যাই? পুতুল আর আমি?'

'ষাট্ ষাট্! জয় গুরু! এমন কথা বলতে নেই বাবা! বরং আমি মরে যাবো, তুমি পুতুলকে দেখবে।'

'না তুমি কক্ষণো মরে যাবে না।'

'আচ্ছা মরে যাবো না।'

'তুমি আমায় গান শিখিয়ে দেবে মা?'

হ্যাঁ, পুতুলের দেখাদেখি 'মা'।

'শিখতে চাস। আচ্ছা।'

তারপব থেকে দুটো শিশু ছাত্রকে নিয়ে বসলো গানের ক্লাশ।

পুতুলের গলা মিষ্টত্বে ওর মাকে ছাড়ায়।

ছেলেটাও চেষ্টা করে শেখে। ভালই শেখে।

'মা, রোজ তুমি ফর্সা কাপড় পড়ে চাদর গায়ে দিয়ে কোথায় যাও!'

'চাকরী করতে যাই বাবা!'

'ধ্যেৎ মেয়েমানুষে বুঝি চাকরী করে?'

'যাদের বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই, তাদের টাকা আসবে কোথা থেকে তাই বল? তুই যখন বড়ো হবি, চাকরী করবি, তখন আর আমি চাকরী করবো না। শুধু বাড়ি বসে গান গাইবো।'

* * *

কিন্তু পুতুল বলতো, 'মা, বড় হলে তুমি আমি আর সুধা তোমার চাকরীর মতন 'কবিগান' করবো, তাই না?'

মেয়ে মহলে 'কবিগান' গাইবার চাকরী ছিল পুতুলের মার। দলের মালিকও মেয়েমানুষ।

জমিদার গিন্নীরা আব্রুর মধ্যে শুনবেন।

যেদিন বাইরে গানের আসর না থাকতো, পুতুলের মা বাড়িতে আসর বসাতো। পাড়ায় মহিলারা শুনতে আসতেন, দু'চারটি পয়সাও দিয়ে যেতেন।

পুতুলের মা বলতো, 'দেখ সুধা, তোর সাধ আমার ওপর মিটছে। আমি অন্ধভিখিরি হয়ে গান গাইছি।'

মা বলতো সুধা, মেয়েটাও বলতো 'সুধা'।

কিছুতেই দাদা বলতে চাইতো না।

সুধার রং কালো, পুতুল ডলি পুতুলের মতো।

পাড়ার লোকে বলতো, 'তোমার ঘরে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত পুতুলের মা! দেখো ভগবান নিজে মিলিয়ে দিয়েছেন। যত্ন করে পালন করো, সময় পেলেই শুভ কাজটি করে নিও। তোমাদের বোষ্টমের ঘরে তো সকাল সকাল বে হয়।'

পুতুলের মা আস্তে বলতো, 'আমি যে ভাই ওকে 'দাদা' বলতে শেখাচ্ছি।'

শেখাচ্ছিল সত্যিই, কিন্তু বেয়াড়া মেয়েটা মায়ের দেখাদেখি 'সুধা'-ই বলবে শুধু। সুধাদাও নয়।

ক্রমশ মাও আর তেমন জোর করে না।

পড়শীনীরাও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেয়, 'ও তুমি যতোই দাদা শেখাও ভাই, সত্যি তো আর সহোদর

না? ডাগরটি হলেই বয়েসের ধর্ম দেখা দেবে। তখন তুমি ওই পাতানো ভাই বোন সামলাবে কী করে? বলে সদ্য মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো জ্যাঠতুতো নিয়েই লোকে আতঙ্কে দিন কাটায়। যে দিনকাল পড়েছে!'

অতএব পুতুলের মা মনে মনে পুতুল খেলার স্বপ্ন দেখতো।

নিজের সব খেলাই তো স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে।

কতোবড়ো বয়েস পর্যন্ত কোলে একটা সন্তান আসেনি। ঠাকুর দেবতার মানত করে ওই মেয়ে। পুতুলের মতো মেয়ে। ভাল নাম ব্রজবালা, ডাক নাম পুতুল।

পুতুল জন্মালো আর বছর যেতে না যেতেই সেই মানুষটা চলে গেলো।

ভাগ্যিস সে মানুষটা নিজে কাছে বসিয়ে গান শিখিয়েছিলো তাকে! কীর্তন গান, পালা গান। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গিয়ে এক একটা 'ঘর' করে দিয়েছিল।

বলতো, 'ধর্মপথে থেকে রোজগার করায় দোষ নেই রাসু, দুজনে না খাটলে একালের এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে সংসার চালানো দায়।'

তা যাই ভাগ্যিস এ পথ চিনিয়ে দিয়েছিল তাই না রাসুকে মেয়েটার হাত ধরে ভিক্ষেয় বেরোতে হয়নি। বরং ভালই চলে যাচ্ছে। তবু তো ওর মধ্যেই আবার একটা পথ থেকে ছেলে কুড়িয়ে এনে পুষতে লেগেছে।

বাসু বা রাসেশ্বরীর এক প্রিয় সখী বলেছিল, 'সই, আর একটা পেট বাড়ালি?'

রাসু বলেছিল, 'আমি কি খাওয়াবার মালিক সই? যাঁর ব্যবস্থা তিনিই করবেন।'

'রাসু' বলবার লোক সই ছাড়া আর নেই। সবাই বলে 'পুতুলের মা।'

'পুতুলের মা, পূর্ণিমার দিন 'রাইরাজা'টা শোনাবে গিয়ে।'....'পুতুলের মা তোমার 'দূতী সংবাদ'টা অনেকদিন শোনা হয়নি।'

পুতুলের মা 'আমার মা এসেছেন, তোমার 'অক্রূর সংবাদ'টি একবার শোনাতে হবে আমার মাকে।'

পুতুলের মার প্রতি সকলেই সদয়।

যাঁরা ডাকতেন তাঁরা তো টাকাটা সিধেটা গামছাটা কাপড়টা দিতেনই, যাঁরা তাঁদের কুটুম কাটুম তাঁবাও দিতেন এটা সেটা।

পুতুলের মার স্বভাবেই সকলে সন্তুষ্ট। যেমন শান্ত তেমনি সভ্য, নবম সবম।

কিন্তু পুতুলটি মার বিপরীত।

পুতুল রাগলে কুরুক্ষেত্র করে, পুতুল জেদের রাজা, পুতুল প্রখরা এবং ওই বয়েসেই মুখরা।

পাকামীতেও কম যেতো না পুতুল।

যদিও যা বলতো, বুঝে বলতো না, শোনাবুলি বলতো, তবু বলতো, 'আমরা যেন রাধাকেষ্ট না রে সুধা? তুই কেষ্ট আমি রাধা। তুই কালো আমি শাদা! দেখলি তো কেমন মিলিয়ে দিলাম।'

সুধা বলতো, 'সত্যি, তুই তো তাহলে চেষ্টা করলেই ছড়া বানাতে পারিস।'

'পারিই তো। শুনবি?'

পুতুল মহোৎসাহে তার তাবেব বাজনার মতো গলায় বলে উঠলো—

'জলে মাছ গাছে ফুল
মাঠে ঘাস মাথায় চুল।'

পুতুলের তখন কতো বয়েস?

বছর ছয়।

তার থেকে বছর তিনেকের সিনিয়ার সুধা বললো, 'এমা ভগবানের জিনিসের সঙ্গে মানুষের জিনিস মিলোলি?'

তার হয়তো মনের ধারণায় ছিলো 'প্রকৃতির জিনিসের সঙ্গে' কিন্তু বললো ভগবান।

পুতুল অতএব সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো, 'কোনটা ভগবানের, কোনটা মানুষের রে?'

'কেন জলের মাছ, গাছের ফুল, মাঠের ঘাস, তিনটেই ভগবানের তৈরী। তা'র সঙ্গে তুই মানুষের মাথার চুলকে—'

ছ'বছরের পুতুল সুধার দিব্যদৃষ্টি খুলে দিয়ে বলে উঠলো, 'আর মানুষ বুঝি ভগবানের তৈরী নয়? চুলগুলো তোর নিজের তৈরী?'

'অকাট্য যুক্তি।

সুধা বললো 'আচ্ছা ঠিক আছে, 'তুই ওই পাখিটা নিয়ে ছড়া করতে পারিস?'

'কোন পাখিটা?'

'ওই যে উড়ে গেল—'

'ওতো উড়েই গেল।'

'তাতে কি? উড়ে যাওয়া নিয়েই কর—'

পুতুল একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকিয়ে কতোই যেন ভাবছে। এই ভাবে বললো,

'পাখি গেল উড়ে,
বাড়ি গেল পুড়ে।'

'এমা শুধু এইটুকু?' সুধা বলে।

'পুতুল বললো, বলছিরে বাবা আরো বলছি—'

'মা করেনি রান্না
আমরা করি কান্না।'

সুধা চমৎকৃত হচ্ছে। অথচ সুধা মনে মনে নিজেকে খাটো ভেবে ফেলেছে। অতএব সুধা ছল চায়, 'পাখি উড়ে গেছে তা' বাড়ি পুড়ে যাবে কেন?'

'আচ্ছা বাড়িটাই আগে পুড়ে গেছে—' খুব রাগের গলায় বলে পুতুল, 'সেইজন্যেই পাখিটা উড়ে গেল। বাড়ির ছাতে বসেছিল তো? গরম লাগলে উড়ে যাবে না? বোকা কোথাকার। কিছু বোঝে না।'

সুধা অপমানে খান খান হয়ে চলে যেতো। বলতো, 'যা যা আমার সঙ্গে খেলতে আসিসনে। আমি বোকা, আমি বুদ্ধু, আমি আবার চলে যাবো দেখিস।'

আবার চলে যাবো!

জোঁকের মুখে নুন।

পুতুল শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি খোসামোদ করতে বসে।

পুতুল কোনোদিন মায়ের স্নেহের ভাগীদার বলে সুধাকে হিংসে করেনি, চলে যাবার নামে ভয় পেতো।

সে তুলনায় সুধা নিষ্ঠুর ছিলো।

পুতুলের ওই দুর্বলতাটুকু বুঝে ফেলে সুধা যেন ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছিল।

পুতুলকে দাবিয়ে রাখবার ওই একমাত্র দাওয়াই। 'চলে যাবো।'

এই আশ্বিন মাসে শিউলি ফুলের ঘটা।

অন্ধকার ভোর থেকে পুতুল এসে সুধাকে ডাকাডাকি করতো, 'এই সুধা ওঠ্ না। ফুল তুলতে যাবি না?'

সুধা একটু ঘুমকাতুরে। সুধা বলতো, 'এক্ষুণি কি যাবো?'

'না গেলে সব ফুল তো, বাসু, পরমেশ, বিম্‌লি, সরস্বতী নিয়ে নেবে।'

'তারা এখনো ঘুমোচ্ছে—'

'ইস। তারা তোর মতন ঘুমবুড়ো কিনা। তারা কখন বেরিয়েছে!'

'সাপে কামড়ে দেবে, দেখবে মজা।'

'বাঃ ওরা তো হারিকেন নিয়ে বেরিয়েছে।'

'বাবা বাবাঃ। একটু ঘুমোতে দেবে না। শিউলী ফুল দিয়ে তো তোর কাপড় ছোপানো হবে, আমার কী?'

ব্যস হয়ে যেতো।

পুতুল সদর্পে বলতো, 'বেশ যাসনি তুই। আমি একলাই যাবো।'

সুধা চীৎকার করে উঠতো, 'মা, পুতুল একলা শিউলি ফুল তুলতে যাচ্ছে।'

পুতুলের মা রাসু তখন হয়তো বিছানায় শুয়ে শুয়েই অষ্টোত্তর শতনাম, কি অপরাধ-ভঞ্জন স্তোত্র আওড়াচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বলতো, 'ওই এক গোঁয়ার মেয়ে। তুই একটু যা বাবা সঙ্গে।'

যেতেই হতো।

প্রথমটা পুতুল দৃকপাত করতো না, গটগট করে এগোতো। তারপর কখন যেন সন্ধি হয়ে যেতো। শুধু মাটিতে পড়ে থাকা শিউলী ফুলই নয়, গাছে ফুটে থাকা অন্য ফুলও নিতে ছাড়তো না পুতুল লোকের বাড়ি থেকে। সেই নেওয়ার সাহায্যকারী অবশ্যই সুধা।

ফুল সম্পর্কে পুতুলের মন পরিষ্কার, কিন্তু পরের গাছের ফলের ব্যাপারে পুতুলের বিবেক টনটনে।

'এমা তুই ওদের বাগানের পেয়ারা নিয়ে এলি? তাহলে তুই চোর হলি।'

'আর তুই যে ফুল নিস?'

'আহা ফুল কি আমরা খাই? ঠাকুরকে দেওয়া হয় তো।'

'ঠাকুরকে দেবার জন্যে তাহলে ফল চুরিতেও দোষ নেই?'

পুতুল প্রথমটা বিপন্ন বোধ করতো, তারপরেই বলে উঠতো, 'ফুল তো আর ঠাকুর খায় না। শেষ অবধি তো আমরাই খাই। ফুল কি তাই?'

সব সময় পুতুলের যুক্তি প্রখর পরিষ্কার অকাট্য।

ওই বয়সে পুতুল জানতো অনেক।

'তুলসীগাছের ডাল ভাঙিসনে সুধা, তাহলে কেষ্ট ঠাকুরের আঙুল মচকে যায়। ...জবা ফুল নিয়ে কী হবে রে বোকা? জবা ফুল দিয়ে কি গোপাল পুজো হয়?' ...ছি ছি সুধা, তুই গোপালের ভোগেব আগে মুড়কি খেয়ে ফেললি? তোর নরকেও ঠাঁই হবে না।'

আস্তে আস্তে বয়েস বাড়ছে, আর কথার চটকও বাড়ছে।

পাড়ার লোক বলে, 'কী মিষ্টি মেয়ে। কথা কয়না তো, যেন ময়না পাখি বোল কাটে।'

কিন্তু ওই বোল কাটার মধ্যেই কাটাকাটি।

যতো ভাব ততো আড়ি।

সেই একদিনের কথা—

আর একটু বড়ো হয়েছে তখন।

পাড়ার কাদের বাড়িতে যেন বিয়ে। নেমন্তন্নে যাচ্ছে সুধা আর পুতুল। পুতুল বায়না ধরে বসলো, 'আমি সুধার মতন ধুতি কোট পরবো।'

'পরবো! পরবো! কোট পরবো! ধুতি পরবো!'

সুর চড়তে থাকে।

মা ভোলাতে পারে না কিছুতেই।

ওর সেই এক কথা।

'সুধা কেন পববে?'

'ও তো বেটাছেলে।'

পুতুল ঘোষণা করে বসলো, 'আমিও বেটাছেলে হবো।'

পুতুলের ধারণা ওই পোষাকটাই বেটাছেলের পরিচয়পত্র।

পুতুল কি ছেলেবেলার সেই প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্যই বটেশ্বর হয়েছে?

রাসু অনেক চেষ্টা করলো বোঝাতে, 'ভগবান যাকে যা করে পাঠিয়েছেন সে তাই থাকে।'

পুতুল বুঝ মানে না।

তার সেই এক বুলি, 'আমি ফ্রক পরবো না, সুধার মতন জামা পরবো। আমি বেটাছেলে হবো।'

ওদিকে নেমন্তন্ন বাড়ির লুচি ভাজার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, এদিকে কিনা এই বিঘ্ন।

সুধা হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠে, 'সাতজন্ম ধুতি পরলেও তুই মেয়েই থাকবি, বুঝলি? বেটাছেলে হওয়া এতো সোজা? ভগবান যাদের ভালোবাসে তাদের বেটাছেলে করে পাঠায়, যাদের দেখতে পারে না তাদের মেয়ে করে পাঠায়।'

ব্যস।

হয়ে গেল।

পুতুল ফ্রকটাকে উঠোনে ধুলোয় ফেলে দিয়ে বলে উঠলো, 'আমি নেমন্তন্নে যাবো না।'

সুধার তো মাথায় হাত।

পুতুলেরই বন্ধুর দিদির বিয়ে, সেখানে একা সুধা যায় কোন সুবাদে?

কতো খোসামোদ করতে হয়েছিল সেদিন সুধার পুতুলকে।

রাসু বলেছিল, 'বাবা, রাতদিন গলাগলি রাতদিন চুলোচুলি। সারাজীবন যে কী করবি তোরা!'

তখন পুতুলের মা ওদের 'সারাজীবনে'র সম্পর্কের স্বপ্ন দেখছে।

অথচ সুধা নামের ছেলেটা?

অকৃতজ্ঞ বেইমান, নেমকহারাম।

সে বড় হয়ে চাকরি করার প্রতিশ্রুতি পালন করলো না। পুতুলকে দেখার অঙ্গীকার পালন করলো না। আবার একদিন সেই আধমরা মানুষটার বুকে হাতুড়ি মেরে কেটে পড়লো।

লোভ দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো তার।

একদিন একটা যাত্রার দলের সঙ্গে পালালো।

কোথায় মাঠে বসে গলা ছেড়ে গান গাইছিলো, যাত্রার দলের কর্তা শুনে ছুটে এসে বললো, 'যাবি আমার সঙ্গে? আসরে গান গাইতে পাবি, খেতে পরতে পাবি, আর মাইনে পাবি।'

এতোগুলো পাওয়ার লোভ সামলানো বড়ো শক্ত হলো ছেলেটার পক্ষে।

কিন্তু শুধুই কি তাই?

কান সোনাপুরের ওই স্তিমিত জীবনের শান্ত ছন্দ তাকে যেন ধরে রাখতে পারছিল না, বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

মা বলতো, 'আমি মরে গেলে তুই আমার গোপালের সেবার ভার নিবি তো সুধা?'

সুধা স্বচ্ছন্দে বলতো, 'আমি কী করে নেব? আমি তো বেটাছেলে! পুতুল পারে না!'

'বেটাছেলে পুজো করে না?'

'করে না।' এমন কথা বলা যায় না।

কিন্তু তার জন্যে অন্য মানুষ আছে, সুধা কেন? সুধার ওসব শুনলেই ভয় করে।

শেকড় ছেঁড়া একটা উদোমাদা ছেলেকে এতো বাকদত্ত করিয়ে নেবার চেষ্টাটা ঠিক হয়নি হয়তো রাসুর। যেটা অজান্তে হতো, সেটা জেনে ফেলে ভয় ঢুকলো।

রাসুর ঘরবাড়ি, গোপাল, ফুলগাছ, তুলসীমঞ্চ, আর সবের ওপর পুতুল, এতোগুলো ভার নিতে হবে সুধাকে? বাব্বা!

সুধার মন পালাই পালাই করছিলো, ওই লোভের আকর্ষণ তাকে কার্যকরী করে তুললো।

সুধা চলে এলো।

কিন্তু সুধার পিছু পিছু যেন পুতুলের মার গানের সুরটা ধাওয়া করতে লাগলো।

'আমার গোপাল কেন মথুরা গেলো—
আমার কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হলো।
সেখানে কি ওর মা-যশোদা আছে?
খিদে পেলে গোপাল খাবে কার কাছে?
সে যে আমার শুধু ননী খেয়ে থাকে,
একথা সেখানে কে জানে বলো?'

এসব গান পুতুলের বাবার বাঁধা।

পুতুলের মা গাইতো যখন তখন। তখন থেকেই কি সন্দেহ হয়েছিল তার গোপাল নিষ্ঠুর হবে, বেইমান হবে?

সুধার আরো একটা কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে পড়ে বুক ফেটে যেতো।

পুতুল বলেছিল, 'কাঁঠাল তলায় আমরা একটা পুকুর কাটি আয় সুধা! তুই খুঁড়ে দে, আমি মাটি দিয়ে ঘাট বাঁধিয়ে নেবো। তারপর জল ঢেলে ভরে আমার কচি পুতুলগুলোকে চান করাবো, চুল ঝাড়াবো।'

বার বার বলেছে, 'চল নারে সুধা এখন তো রোদ পড়ে গেছে।'

যদি সেই পুকুরটাও অন্তত কেটে দিয়ে আসতো সুধাংশু নামের হৃদয়হীন ছেলেটা!

তা হয়তো পুকুর একটা কেটে দিয়ে এসেছিল সুধা অন্য কোনো ভূমিতে। তাতে জল ঢেলে জল ভরবার কাজটা নিয়েছিল পুতুল আর পুতুলের মা।

কতোবার ভেবেছে সুধা, কতোদিন পর্যন্ত, একবার চলে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

তখন তো ছোট একটা ছেলে, এগারো কি বারো বছর বয়েস, কেমন করে রেলগাড়ি করে যেতে হয়, কোন দিকেই বা সেই দেশটা কিছু জানে না।

যখন বাবার কাছে মার খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল, তখন তো কোনো লক্ষ্য না নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরছিল। কিন্তু এটা আলাদা।

তাছাড়া পয়সাই বা কোথায়?

একদিন বলেছিল বলরাম আঢ্যকে। 'তুমি যে বলেছিলে মাইনে দেবে।'

বলরাম বলেছিল, 'ও বাবা! বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর। এক্ষুণি মাইনে? আগে গোঁফ গজাক দিকি ছোড়া, তারপর মাইনের কথা মুখে আনিস।'

তা' গোঁফ গজাবার আগেই বলরাম আঢ্যির কবল মুক্ত হয়ে সরে পড়েছিল সুধা, অথবা সুধো। আর কে কবে তাকে সুধা নামে ডাকলো?

'সুধা' শব্দটা নিয়ে হাসাহাসি করেছে সবাই। অতএব সুধোই স্থায়ী নাম।

কিন্তু পরে তো মাইনে হয়েছিল সুধোর।

কেমন করে রেলগাড়ি চড়তে হয়, সে জ্ঞানও জন্মেছিল।

তবে?

তখন আর এক বাধা!

লজ্জার বাধা!

দারুন লজ্জা! কতোখানি স্নেহ ভালবাসার কী অপমান করেছিল সেই সুধা নামের অবোধ ছেলেটা, বোধ সম্পন্ন সুধোর তো সেটা ধারণায় এসেছিল?

অতোবড়ো অপরাধীর মুখ নিয়ে কেমন করে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে?

ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে গেছে সে দিকটা।

ক্রমশঃই তারা এখনো ঠিক সেইখানেই আছে, বেঁচে আছে, এ বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়েছিল। কাজের ভীড়ে মনে থাকতো না। শুধু নিঃসঙ্গ কোনো মুহূর্তে প্রাণটা ছটফটিয়ে উঠতো।

হঠাৎ ওই বটেশ্বর নামের তরুণ কবিয়ালকে দেখে কোথা থেকে এলো ঢেউ। ধুয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল বিস্মৃতির ধুলো।

ও আর কেউ নয়।

ও পুতুল। নির্ঘাৎ পুতুল। যতোই উড়িয়ে দিতে চাক।

মুখের ঢাকা চাদরটা খুলে ফেলে উঠে বসলো সুধো।

দেখলো কেউ নেই।

কে কখন ঘুম ভেঙে উঠে চলে গেছে।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সুধো গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঙা শিব মন্দিরের চাতালে এসে বসলো।

আশ্বিনের চড়া রোদ। কিন্তু এখানটায় মন্দিরের ছায়া।

আজই চলে যাবার কথা।

মল্লিক বাড়ি থেকে হুকুম হয়েছে বিসর্জনের পর মিষ্টি মুখ হিসেবে রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে যেতে হবে।

'রামকৃষ্ণ অপেরা' আর এক বায়নায় গত রাত্রেই চলে গেছে, এরা থাকবে।

অতএব আজকেব দিনটা ছুটির দিন।

আজকের দিনটা হাতে পেয়ে গেছে সুধো।

যদি মান্না কোম্পানী অন্য বায়নায় আজ সক্কাল থেকে চলে যেতো! ভগবান!

ভগবান তুমি সুধোর সহায়।

সুধো সকালের কথাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবতে থাকে।

উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, ধরা দিয়ে ফেলেছে পুতুল।

কিন্তু সুধো কি ওই 'ধরা দেওয়া'কে আবার হারিয়ে ফেলবে।

'মান্না কোম্পানী' তাদের তরুণ কবিয়াল বটেশ্বরকে নিয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে চলে যাবে তাদের আরো সব আজে বাজে লোকের জঞ্জালের সঙ্গে?

আচ্ছা ওরা কি সত্যিই ধরতে পারেনি?

না কি এটা ওদের সমবেত ষড়যন্ত্র?

মেয়ে গায়েনকে সভায় আনতে লজ্জা আছে, তাই এই ভেক?

পুতুলের মুখে যে সেই তেজ, সেই দর্প, সেই ঔজ্জ্বল্য! যে তেজে একদিন জেদ ধরেছিল—'হ্যাঁ আমি বেটাছেলে হবো। হবো হবো হবো।'

কিন্তু এতোদিন পুতুল কোথায় কাটালো? কীভাবে কাটালো? মা কি বেঁচে আছেন এখনো? মেয়েকে একদল পুরুষের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন?

না কি পুতুলের জীবনে যা অধঃপতন হবার তা হয়ে গেছে?

সুধো শিউরে উঠলো।

সুধোর মনটা হঠাৎ একবার বিরূপ হয়ে গেল। সুধোর মান্না কোম্পানীর দলেব লোকগুলোব চেহারার কথা মনে পড়ে গেল।

ওই বিচ্ছিরি লোকগুলোর সঙ্গে দিন-রাত্রি বাস করে একটা রূপসী মেয়ে ভালো থাকতে পারে? ছেলে সেজে ক'দিন চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

সুধো হতাশ অবসন্ন হয়ে বসে থাকলো।

ও মেয়ের বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু যেই মনে হচ্ছে এতোক্ষণে মান্না কোম্পানীর গোছগাছ হয়ে গেল, আর ঘণ্টা কয়েক পরেই পুতুলকে নিয়ে চলে যাবে ওরা, সেই 'আর আমার কিছু করার নেই' বলে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

ঘরছাড়া সুধো এমনিতে বড়ো সুখেই ছিল, যেন হঠাৎ অতীতের এক খাতক এসে দু'হাত মেলে তার প্রাপ্য পাওনা চাইলে সুধো বলতে পারছে না, সরে পড়ো হে, আমি তোমার কিছু ধারিটারি না।

সুধোর কানসোনাপুরের দীঘীর পারের সেই বটগাছটা মনে পড়ছে, সেই ছোট্ট একতলা বাড়িটি মনে পড়ছে, আর মনে পড়ছে একখানি ব্যাকুল মাতৃকণ্ঠ, 'সুধা, আমি মরে গেলে তুই আমার এই ঘরবাড়ি, এই রাধাগোবিন্দ, এই ফুল তুলসী সবকিছুর ভার নিবি তো বাবা? আর আমার পুতুল। ওকে তো তোর হাতেই তুলে দেব।...দশ বছরে পা দিলেই—'

ছ সাত বছরের মেয়ের দশ বছরে পা দেবার অপেক্ষায় দিন গুণছিল পুতুলের মা।

বেইমান ছেলেটা ওই দিন-গোণার মধ্যেই পিটটান দিলো। হয়তো জ্ঞানবুদ্ধির বালাই জন্মায়নি বলেই—

কিন্তু এখন?

এখন আর কোনো বোধ না জন্মাক, কর্তব্যবোধটা কিছু কিঞ্চিৎ জন্মেছে?

এখনও পিটটান দেবে ও কর্তব্যের সামনে থেকে?

সুধো এই 'বসন্তবাহারের' চাটিবাটির সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে দেখবে মান্না কোম্পানী গরুর গাড়িতে জান্তে অজান্তে সব মালমোট চাপিয়ে ষ্টেশনের দিকে এগোলো, গরুর গাড়ির চাকার চাপে ধুলো উড়ে দৃশ্যটা ঢেকে দিলো।

ঠিক এমন করে পরিষ্কার ভাবতে না পারলেও ওই ছবিগুলো চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

ওই ধুলোটা যেন শুধু গরুর গাড়ির দৃশ্যটাই নয়, সুধোর ভবিষ্যতের সব রং সব ছবি ঢেকে দিচ্ছে—

সুধো ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লো।

সুধো মান্না কোম্পানীর আড্ডার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'তিনটে ঘরে তালা ঝুলছে, দু'একটা ঘরে তালা নেই বটে, তবে ভিতর থেকে বন্ধ।

আজ আর কাজ নেই, তাই আহ্লাদের মেজাজে ঘুরছে সবাই। বাড়ির পিছনে কাঁচা উঠোনে দুটো গর্ত কাটা উনুনের পাশে দু' বোঝা কাঠ রাখা হয়েছে, বোধহয় ভারপ্রাপ্তরা বেড়িয়ে ফিরে এসে দাউ দাউ করে কাঠ জ্বেলে দিয়ে চালেডালে রেঁধে সেরে নেবে। এরাও তাই করে। বসন্তবাহারের দল। বাবুদের বাড়ি থেকে যা সিধে আসে, তাতে বড়িটি থেকে পোস্তটি পর্যন্ত না এলে এরা অভিযোগ করে। কিন্তু রান্নার বেলায় ওই এক পাকে।

যাদের ওপর রান্নার ভার নেই, তারা সারাদিন ইচ্ছেমত বেড়াবে, হাটে যাবে। হয়তো বা এখন থেকেই কেউ কেউ নদীর ধারের জায়গা রিজার্ভ করে রেখে আসতে গেছে, যাতে প্রতিমা বিসর্জন দেখবার সুবিধাটা বেশী হয়।

সুধো কখনো প্রতিমা বিসর্জন দেখতে পারে না।

সুধো ভেবে পায় না কোন প্রাণে মানুষ প্রতিমা বিসর্জন দেখবার জন্যে এমন উৎসাহিত হয়। যাকে নিয়ে তিন চার দিন ধরে এতো উৎসব, এতো আহ্লাদ, তার জ্বলজ্বলাট মূর্তিখানা অমন করে জলে ফেলে দেওয়া, এটাই তো একটা অদ্ভুত প্রথা।

তা, সেই প্রথাটা না হয় অনেক ভেবে চিন্তে।

কিন্তু দেখতে যাওয়াটা?

চিতা জ্বালা দেখতে যেতে উৎসাহ বোধ করো তুমি? শ্মশানের চিতা?

তবে?

এতে এতো উৎসাহ কেন?

সুধোর মনে হয়, এই উৎসাহটা মানুষের সহজাত হিংস্রতা, মজ্জাগত বর্বরতা।

সুধো প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যাবে না।

কিন্তু সুধোর মনের জগতের সেই প্রতিমাটির?

তার বিসর্জনের ভার তো সুধোর নিজেরই হাতে। রাখো, ফেলো, যা ইচ্ছে।

সুধো গলা ঝাড়া দিলো।

কেউ সাড়া দিলো না।

সুধোর গলা দিয়ে উচ্চ ডাক বেরোচ্ছে না তাই সুধো দরজার কড়া নাড়া দিলো।

এবার ভিতর থেকে সাড়া এলো, 'কে?'

এবং তারপরই একটা ঘরের দরজা খুলে যে বেরিয়ে এলো তার জন্যেই সুধোর এই আকুলতা। আবার তার সম্পর্কেই সুধোর মন আশা ছাড়া ছিলো।

বটেশ্বর দরজা খুলতে আসবে, এ ভাবেনি সুধো।

দরজা খুলেই সে ভুরু কুঁচকে বললো, 'আবার কী মনে করে?'

সুধো বললো, 'বসতে দেবে না?'

'কী দরকার বসবার?'

'দুটো কথা বলতাম।'

'আমার সঙ্গে কারুর কোনো কথা নেই।'

'পুতুল, তোমায় শুনতেই হবে।'

'আর এতো এক ভালো জ্বালা হলো!' বটেশ্বর বললো, 'এমন হ্যাংলা লোকও তো দেখিনি কখনো। দেখছে কেউ আমল দিচ্ছে না, তবু—'

'হ্যাঁ পুতুল, তবু এসেছি আমি। আবারও আসবো। তুমি যতোক্ষণ না আমার কথাটা শুনবে, ততোক্ষণ আসবো।'

'ও! তাই বুঝি? তা এই উজিরপুরে বুঝি শেকড় গাড়া হচ্ছে? মানে—দু'পক্ষেরই? নইলে তো বারবার আসা যাওয়া হচ্ছে কী করে?'

'পুতুল, তোমাদের কর্তা ঠিক জানে তুমি কী?'

বটেশ্বর গভীরভাবে বলে, 'আমি কী, সে সন্ধান না নিয়ে আপনি নিজে কী, তাই ভাবুনগে বসে বসে সুধাংশুবাবু! তবে আমি বুঝে নিয়েছি আপনি কী।'

'কী বুঝে নিলে?'

'সে যা বোঝবার বুঝেছি।'

'অবশ্যই খুব মন্দ খুব পাজী বদমাইস? কেমন?' সুধো দৃঢ়ভাবে বলে, 'তা তাই যখন ভেবে নিয়েছো, তো তেমনি ব্যবহারই করবো। মান্নাবাবুকে জানিয়ে দেব তুমি 'কী'।'

'জানিয়ে দেবে?'

বটেশ্বর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে সুধোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বটেশ্বরের বোধকরি খেয়াল হয় না এর আগে পর্যন্ত লোকটাকে 'আপনি' করে কথা বলেছে সে।

সেকেণ্ড কয়েক পরে কথাটা আবার উচ্চারণ করে সে, 'জানিয়ে দেবে? ঠিক আছে, দিও। দেখো আমার কতোটা ক্ষতি করতে পারো।'

বটেশ্বর তার গায়ে জড়ানো জরিপাড় বাহারি উড়ুনির কোণটা উড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এতোক্ষণে লক্ষ্য পড়লো সুধোর 'বটেশ্বর' সাজা পুতুলের গায়ে একখানা উড়ুনি ছিলো।

অবশ্য এতে সন্দেহ উদ্রেকের কিছু নেই। ওর সাজের সবটাই তো সৌখিন। মিহি শান্তিপুরী ধুতির ফুল কোঁচা আগা, চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবীর গিলে করা হাতা, থাক দেওয়া বাবরি চুলের মাঝখানে টেরী সিঁথি সবটাই মিলিয়ে বেশ যে একখানা নটবর ভাব, এরসঙ্গে উড়ুনি বেমানান নয়।

সুধো কি ওই বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়ে আবার বলবে, 'পুতুল, তুমি আমায় অবিশ্বাস কোরো না। আমি তোমার ক্ষতি করতে চাইবো কেন? একদা যদি কোনো ক্ষতি করে থাকি, তা সে অবোধে করেছি। অবোধ হনুমান স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করেছিল জানো তো?'

ভাবলো, সাহস হলো না।

পুতুলের ভাব অনমনীয়।

হতেই পারে।

কী ব্যবহার করে এসেছিল সুধো?

দুটো মেয়েমানুষের প্রাণভরা ভালবাসা মাটিতে ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে চলে গিয়েছিল না?

তা' দুটো মেয়েমানুষই তো?

পরে সুধো দিনে দিনে তিলে তিলে ভেবে ভেবে অনুভব করেছে সেই ছোট্ট মেয়েটার মধ্যেও সুধোর জন্যে অনেক ভালবাসা ছিলো বলেই তার অতো দাপট ছিলো সুধোর ওপর।

যেখানে নিশ্চিন্ত দাপট, নিশ্চিত দাবি, সেখানে হঠাৎ অবহেলা তাচ্ছিল্য দেখলে, মনের অবস্থা কী হয়? কী হওয়া সম্ভব? সেও তো দিনে দিনে তিলে তিলে ভেবেছে? ভেবে ভেবে বড়ো হয়েছে!

পুতুল যদি এই সুধো নামের হতচ্ছাড়া হতভাগাটাকে ঘৃণা করে তো বেশ করে।

কিন্তু তাই বলে ওই পুতুলকে আবার এই পৃথিবীর লোকারণ্যে হারিয়ে ফেলবে সুধো?

সুধো কর্তব্য স্থির করতে করতে সেই বন্ধ দরজাটার সামনে থেকে সরে এলো।

সুধো পথ হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে মান্নাবাবুর সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে বললো—

'মান্নাবাবু আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো—'

'কেন? আমার সঙ্গে আবার আপনার কী কথা?'

'আপনার ওই বটেশ্বর সম্পর্কে আমি কিছু খবর জানি, সেটাই আপনাকে জানাতাম।'

'আমার লোকের সম্পর্কে আপনার এতো মাথা ব্যথা কেন শুনতে পারি?'

'আমি ওকে অনেকদিন থেকে'—থামলো সুধো।

ওটা ঠিক হবে না।

ঠিক আছে—'আমি ওকে আগে জানতাম!'

'শুনে ধন্য হ'লাম। আপনার জানা নিয়ে আপনি থাকেন গে মশাই, আমার আপনার কাছ থেকে কিছু জানার দরকার নেই।'

'কিন্তু সেটা বিশেষ দরকারী কথা—'

'বাজে বকবকানি রাখুন মশাই। আপনার বাহারি কথাগুলো ওই আপনার 'বসন্তবাহাবেব' রাখাল দাসকে বলুন গে।'

'ঠিক আছে তাই বলবো। বলবো মান্নাবাবুর বটেশ্বব সরকার আসলে বটেশ্বরও নয়, সরকারও নয। আদৌ বেটাছেলেই নয—'

'অ্যাঁ! অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। ও মেয়েছেলে। ওর আসল নাম পুতুল দাস। এতোটুকুন বেলা থেকে ওকে দেখেছি 'আমি—'

'সুধাংশুবাবু, একথা ফাঁস করে দেবেন না দোহাই আপনার—'

'কিন্তু আমি তো আর এখন ওকে এইভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে দেব না।'

'ও আপনার আত্মীয়?'

'আমার পরমাত্মীয়।'

ভাবতে ভাবতে নিজেদের আস্তানায় এসে গেলো।

পডবি তো পড রাখাল দাসেরই সামনে!

'সুধা? এই রোদে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? মুখ চোখ বসে গেছে, চেহারায় কালি মেড়ে দিযেছে—'

'কবে আর সুধোর চেহারায় গোলাপ ফুল মাড়া থাকে রাখালদা?'

'আয়নার সামনে দাঁড়াগে যা, নিজের কথার উত্তুর পাবি। শবীর ভালো আছে?'

'কেন থাকবে না?'

'ঠিক আছে, ভালো থাকলেই ভালো।'

সকালবেলা অতো বেলা অবধি ঘুমোলি, কিছু না খেয়ে বেরিয়ে গেলি—এখন কেমন ভূতে পাওয়াব মতন কী যেন বিড়বিড় করতে করতে এলি!

সকালে ওই মান্নাদের ওখানে যাওয়াটা বাপু আমি পছন্দ করিনি। বলি পেটের মধ্যে পাকটাক দিচ্ছে না তো?'

'না বাবা, না।'

'তবু বলছিলাম কি, ক'ফোঁটা যোয়ানের আরক খেয়ে নিলে ভালো হতো না?'

'আঃ কী মুস্কিল, বলছি কিছু হয়নি, তবু ওষুধ খেতে হবে? সেই চা-টা দেখছি তোমার পেটের মধ্যেই পাক দিচ্ছে।'

'তা দিচ্ছে।'

রাখাল দাস গম্ভীরভাবে বলে, 'মিথ্যে বলবো না, সেই সকাল থেকে মনে সুখ নেই।

তার ওপর আবার কেমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। ঘরে এসে বরং একটু শুলে পারতিস সুধো!'

'যখন রান্নাবান্না হবে তখন—'

সুধো রাখাল দাসের ওই উদ্বেগকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে,

'পেটে বিষ পড়লে শোওয়াই খারাপ রাখালদা! ঘুরে বেড়ানোই ভালো।'

'কে, কে বলেছে একথা? কে বলেছে বিষ পড়েছে? ...'থাক্ ওসব কথা বেশী বলতে হবে না।'

বলে রাখাল দাস সুধোকে একটু দেখে নিয়ে চলে যায়।

বারে বারে সুধোর কপালে কি এই দুঃখই দিয়েছিলে ঠাকুর!

ভালোবাসার লোকের প্রাণেই আঘাত দিতে হবে সুধোকে?

সুধো অনেক বড়ো হয়ে ওঠার পর বুঝতে পেরেছিল সে তার বাপকেও মনে কম আঘাত দেয়নি।

গোঁয়ার স্বভাবের লোকেরা ছেলে ঠেঙিয়েই থাকে, তাছাড়া তার বাবার আবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর রক্তচক্ষু, তাই বাবা স্ত্রী ওপর রাগ করেই ছেলেকে অমন মার-ধোর করেছে।

কিন্তু সুধো চলে আসার পর নিশ্চয়ই অনুতাপে জ্বলেপুড়ে মরেছে বাবা।

আর তার পরের ঘটনার তো কথাই নেই। বুঝি সে আঘাতের সীমা পরিসীমা নেই।

আবার এই রাখাল দাসের স্নেহবন্ধন কেটে বেরিয়ে যেতে হবে।

হবেই।

উপায় নেই।

পুতুলকে আর ছেড়ে দিতে পারবে না সে।

পুতুল যদি কিছুতেই তার নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে না দেয় সুধোকে, সুধোকেই মান্নাবাবুর কাছে ধর্ণা দিয়ে ওদের দলে গিয়ে জুটতে হবে।

মান্না যদি বলে, 'দুটো গায়েন পোষবার মতো পয়সা আমার নেই'

—সুধোকে বলতে হবে, 'মাইনের দরকার নেই আমার।'

রাখাল দাস বলবে, 'নেমকহারাম বিশ্বাসঘাতক বেইমান, ইতর ছোটলোক!'

বলবে।

হয়তো রাখাল দাস তার এই সন্দেহটাতেই নিশ্চিত হবে, মান্না চায়ের সঙ্গে তুকতাকের ওষুধ খাইয়ে তুক করেছে সুধোকে।

মান্নার আজ বটেশ্বরের ওপর মেজাজ প্রসন্ন ছিল না।

'বসন্তবাহারের' লোক তার দলের লোকের জন্যে ঘুঁটের মালার অর্ডার দিয়ে গেল!

অথচ ওই বটনা সর্বত্রই রূপোর মেডেল নিয়ে আসে। রূপোর গায়ে সোনার কাজ করা মেডেলও আছে ক'খানা, কিন্তু এখানে প্রথম দিনের সভা থেকেই যেন ছোঁড়ার আলগা ভঙ্গী।

সভায় ঢুকে যেন উদাস উদাস মনমরা ভাব।

কেন রে বাবা!

কোনো সুন্দরী মেয়েফেয়ে চোখে পড়েছিলো নাকি? কই মান্নার তো পড়েনি।

তবু প্রথম দিনটা ভালোয় মন্দে গেছে।

শেষটা ওই সুধাংশু ছোঁড়া একহাত নিলেও প্রথম দিকে খুব হাততালি কুড়িয়েছে বটেশ্বর। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে বটেশ্বর যতোই তোড়জোড় করে লম্ফ দিয়ে আসরে নামুক, ভেতর থেকে জোর ছিল না বোঝা যাচ্ছিল।

অথচ অসুখ বিসুখও করেনি।

অকারণ এতোবড়ো একটা নামকরা জায়গায় বাবুদের সামনে, কী অপমান।

মান্না মুখখানা বেজার করে বাক্স গোছাতে গোছাতে হেঁকে বলে, 'মেডেলগুলো দে বটা, রাখি।'

বটেশ্বর পাশের ঘরে ছিলো, নিঃশব্দে এসে দিয়ে গেল সবগুলো।

এটাও আশ্চর্য! সাধারণতঃ দু'একটা সর্বদা বুকে ঝুলিয়ে রাখতে চায় বটেশ্বর, খুব সৌখিন আছে তো! বলে, 'থাক্ না আমার কাছে।'

আজ সবগুলোই দিয়ে দিলো।

মান্না গম্ভীর বেজার মুখে বললো, 'এ যাত্রায় তো ভাগ্যে জুটলো ঘুঁটের মালা।'

'হুঁ।'

বটেশ্বর সোজা দাঁড়িয়ে, যাকে বলে নিজস্ব গলায় বলে, 'তাই ভাবছি রিজাইন দেবো।'

'কী দিবি? কী দিবি বললি?'

'রিজাইন। নাম যখন ভেস্তে গেল, তখন আর—'

মান্না প্রমাদ গণে।

মান্না বোঝে তার এই বেজার ভাবটা দেখানো ঠিক হয়নি। যতোই হোক গুণী শিল্পী, তাদের অভিমান বেশী! দৈবাৎ এক আধবারও হারবে না, এই কি হয়? হারজিত নিয়েই জগৎ।

মান্নারই বরং ওকে কাছে ডেকে সহানুভূতি দেখিয়ে ওই কথাগুলো বলা উচিত ছিলো। তা নয় মান্না মেজাজ দেখাতে গেল।

ছোঁড়া বিগড়ে বসে আছে।

এমনিতেই তো মেজাজি।

কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই, সর্বদা অহংকারে মটমট। চেহারাখানি অমন সরেস, সাজসজ্জাতেও বেশ আছে। কিন্তু কথাবার্তায় যদি এক ফোঁটা রস আছে। একেবারে কাঠখোট্টা। একটু তোয়াজ করে কথা বলতে গেলেও বলবে, 'ওসব কথা রাখুন, আসলে কী বলবেন বলুন।' মনে হয় বড়ো ঘরের ছেলে। খেয়ালের মাথায় চলে এসেছে। সেই ঘরের অহঙ্কার আছে। দলের আর সবাইকে তো মশামাছি সমান জ্ঞান করে, কারুর সঙ্গে ভাব নেই।...

অবিশ্যি মান্নাবাবুকে সমীহ ভাব দেখায়, তবে সুবিধেও কম আদায় করে নেয় না। উনি বাবু কারুর সঙ্গে একঘরে শুতে পারেন না, কারুর তেল গামছা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, কারো সঙ্গে এক থালায় খেতে পারেন না। বায়নাক্কা ঢের।

নচেৎ তবলী, দোয়ার, হারমোনিয়াম বাজিয়ে, ফ্লুট বাঁশী বাজিয়ে—এরাও তো কম দরকারি নয়? তবু ওরা সবাই ঘরের মেঝেয় ঢালাও শতরঞ্চি বিছিয়ে গড়া-গড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে, একখানা থালায় ভাত ঢেলে তিন চার জনে ঘিরে বসে সাঁটে।

সে যাক, হীরোকে হীরোর মর্যাদা দিতেই হবে।

মান্না তাড়াতাড়ি বলে, 'ছেলেমানুষী করিস না। তুই ঠাট্টা করে বলছিস, পাঁচজনে তাই নিয়ে গুলতানি করবে।'

'ঠাট্টা করে তো বলছি না।'

'তবে কি সত্যি করে বলছিস?'

'হুঁ।'

'দেখ বটা জগতে হারজিত আছেই। একদিন একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে বলেই দল ছাড়বি?'
'শুধু দল ছাড়ব না, এই কাজই ছেড়ে দেবো।'
'এই কাজই ছেড়ে দিবি? এই কবিগান?'
'হ্যাঁ মান্নাবাবু! এ থেকে আমার মন চলে গেছে, আমি আজই চলে যাবো। এই দিনের বেলাই।'
মান্না আগুন হয়ে ওঠে।
'আজই এক্ষুণি!
এ কী ছেলের হাতের মোয়া?
না কি মামদোবাজি?
চলে যাবো বললেই চলে যাবো?
মান্না তবু কষ্ট করে আগুন চেপে রেখে বলে 'তা যাবো বললেই তো যাওয়া হয় না বটেশ্বর! চাকরীর কিছু আইন কানুন থাকে—'
'আমার ব্যাপারে নেই—'
'তোমার ব্যাপারে নেই? কেন? তুমি কি নবাব সিরাজউদ্দৌলা?'
মান্না ধাপে ধাপে চড়ে, 'আমিও যেমন তোমায় এককথায় ছাড়াতে পারি না, তুমিও তেমনি অসময়ে—'
বটেশ্বর দৃঢ় গলায় বলে, 'আপনিও আমায় এককথায় ছাড়াতে পারেন, আমিও আপনাকে এককথায় ছাড়তে পারি। আমাদের সেইভাবেই কনট্রাক্ট করা আছে।'
'সেইভাবেই কনট্রাক্ট করা আছে?'
মান্নাবাবুর বুকটা ধড়াস করে ওঠে।
মনে পড়ে যায়, এই রকমই কী একটা ব্যাপার আছে।
বটেশ্বর বলছিল, 'আমার একটি শর্ত রাখতে হবে আপনাকে, তবেই আমি আপনার দলে ঢুকবো।'
'শর্তটা কী?'
'শর্তটা হচ্ছে কোনো পক্ষেই বাধ্য বাধকতা থাকবে না।'
বটেশ্বরের না পোষালে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যেতে পারবে। মান্না কোম্পানীর না পোষালে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়ে দিতে পারবে।
শর্তটায় আপত্তির জোর ছিলো না, কারণ দু দিকেরই দরজা খোলা রাখা হচ্ছে।
তাছাড়া—
তখন মান্না বটেশ্বরকে নেবার জন্য পাগল।
কোন এক অখ্যাত গ্রামের থেকে আসা এই ছোঁড়াটা চাকরীর জন্য দরবার করেছিল। সত্যি বলতে গ্রাহ্য করার কথা না, নেহাৎ মান্না ওর লাবণ্যযুক্ত চেহারাখানা দেখেই এতটা গ্রাহ্য দিয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা গা দিকিনি একখানা গান।'
ব্যস!
গলা শুনে মান্না নেই।
আর গানের তাল লয় মানও।
গলা না হয় ভগবানদত্ত, কিন্তু তাল লয় মান? গুরু কে?
'গুরু আমার মা!'
'মা! কী নাম? কোথায় থাকেন?'
স্বর্গে গেছেন, নাম নিয়ে লাভ নেই।...বলুন এই শর্তে যদি রাজী থাকেন...'
কাটখোট্টা ভঙ্গী!
অমন লাবণ্যময় চেহারা, অমন বাঁশীর মতো গলা, কিন্তু কথা যেন ছুঁড়ে মারে।
তা' মারুক। শুধু গলা নয়, কবির গান বাঁধে, একাই দু'পক্ষ হয়ে লড়াই চালায়। এ এক আশ্চর্য্য

প্রতিভা! একে কি আবার মানুষ তুচ্ছ একটু শর্তের কচকচি নিয়ে ছাড়ে? শর্তে রাজী হয়ে গিয়েছিল মান্না।

নিজস্ব একটা ঘর চাই ওর।

তা নিক।

একখানা মাত্র ঘর থাকলে সেইখানাই ও নেবে, আর সবাই উঠোনে শোবে।

অতএব শর্ত মঞ্জুর।

দলের লোকেরা বলাবলি করে, 'নির্ঘাৎ ওই গোলাপী আভা রংটা ওর নিজের নয়। পেন্ট করা। তাই নির্জনের দরকার। ওই ভুরু-টুরু সবই মেকআপ! বড়মানুষের ঘরের ছেলে মনে হয় পালিয়ে এসেছে বোধহয়। পরণ পরিচ্ছেদ দেখেছিস?"

তা ওই পরণ পরিচ্ছেদই।

খাওয়া দাওয়ায় বড়মানুষী নেই বটেশ্বরের। নুনভাত দাও, নুনভাত খাবে। দলের অন্যদের মতো কখনো বলবে না—'আজ খাওয়া খারাপ হলো।'

থাকতে থাকতে ওর নিজস্ব ধরন সকলের সহ্য হয়ে গেছে। আর ওর সেই শর্তও ভুলে গেছে মান্না। আজ মনে পড়িয়ে দিলো বটেশ্বর।

বললো, 'আছে কিনা আপনিই মনে করুন।'

মান্না বললো, 'তা হলেও, এই দণ্ডে যাবো মানে কী? কারুর সঙ্গে অসরস হয় নি, বিরোধ হয় নি...'

'না কারুর সঙ্গে হয়নি। নিজের সঙ্গেই হয়েছে।'

'নিজের সঙ্গে? এটা আবার কেমন কথা বটু?'

'মানে আর কাজে মন লাগছে না।'

'ছি ছি এ তোমার নেহাৎ ছেলেমানুষী বটেশ্বর! একদিন একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে বলে নিজের এমন গৌরবের জীবনটা ত্যাগ করবে? বরং মনের জোর করে আরো ইয়ে হ', যাতে ভবিষ্যতে ওই বসন্তবাহারের সুধাংশুর গলায় ছেঁড়াচটির মালা ঝোলাতে পারিস।'

'না আমার আর মন নেই।'

ব্যস!

ওই এক কথা, 'আমার আর মন নেই!'

সবাই মিলে মাথা খুঁড়লো, তবু সেই এক কথা।

'রাতে খাওয়াটা—অন্তত হোক? নচেৎ মানিকবাবুরা মনে করবেন কী?'

'বলবেন ও খাবে না, শরীর খারাপ।'

'বটু, তুই আমায় এইভাবে জব্দ করবি? তোর সঙ্গে আমার পূর্বজন্মের কোনো শত্রুতা ছিল কী?'

'থাকতে পারে।'

'ওঃ বটে!' এবার মান্না নিজমূর্তি ধরে। 'আসল কথা বসন্তবাহার ভাঙচি দিয়েছে। অধিক মাইনের লোভ দেখিয়েছে।

ওদের ওই ছোঁড়াটা সকালে এসেছিল শুনেই আমার মনে হয়েছিল এরকম কিছু ঘটবে। সকাল বেলা ছোঁড়া কোন মতলবে?

এখন বুঝিছি কোন মতলবে।

আচ্ছা আমিও নীলমণি মান্না, দেখি বসন্তবাহার কেমন করে আমার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। আমি যদি তোর ঠ্যাঙ ভেঙে এখানে শুইয়ে রেখে দিই, পারবি যেতে?'

'মেলা বাজে কথা বলবেন না মান্নাবাবু! মাইনে দিতে ইচ্ছে হয় দেন, না দেন ঝগড়া করবো না। মোটকথা আমি এক্ষুণি চলে যাবো!'

'বুঝেছি। আর বলতে হবে না।'

রাখাল কোম্পানী সবে খেয়ে উঠেছে, হঠাৎ অগ্নিমূর্তি নীলমণি মান্নার নাটকীয় প্রবেশ।

'রাখালবাবু, অতি দর্পে হতা লঙ্কা, তা জানেন তো?'

'কী ব্যাপার? হয়েছে কী?

'হয়েছে কী? জানেন না? পয়সা কিছু বেশী হয়েছে বলে অহংকারে ধরাকে সরা দেখছেন। কিন্তু আমার লোককে ভাঙিয়ে নিলে আপনার ললাটে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্ছি।'

রাখাল দাস মাথা গরম করে না।

বোঝে কোথাও কিছু ভুল হয়েছে।

সে আস্তে আস্তে বলে, 'অন্যের লোক ভাঙিয়ে নিলে ললাটে দুঃখু থাকে বৈকি। তার ল্যাজ মোটা হয়। মনে করে আমার মতন গুণী বুঝি আর ত্রিভুবনে নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে তেমন কোনো দুষ্কর্ম তো আমি করিনি মান্নামশাই!'

'করেন নি? করেননি কিছু? ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানেন না যে দেখছি। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবেন না রাখালবাবু! আমার বটেশ্বরকে আপনি অধিক টাকার লোভ দেখান নি? বলি কতো বেশী দেবেন তাকে যা নীলমণি মান্না দিতে পারে না?'

গোলমালের মতন আকর্ষণীয় ব্যাপার জগতে আর কী আছে? আকৃষ্ট হয়ে সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল, সুধোও ছিল।

বটেশ্বর শব্দটায় সচকিত হলো সে এবং যা শুনলো তাতে ধারণা হওয়া উচিত এরা ওদের বটেশ্বরকে অর্থাৎ আসল হীরোকে বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে টেনে আনছে। এই দুষ্কর্মের শাস্তি দিতে মান্না যতদূর যেতে হয় যাবে।

সুধো যেন বুঝতে পারে আসলে কী ঘটেছে।

সুধো শান্তভাবে বলে। 'বটেশ্বরবাবু বলেছেন আমরা তাঁকে বেশী মাইনের অফার দিয়েছি?'

'আহা রে আমার নাবালক এলেন। এ সব কথা বুঝি লোকে নিজমুখে বলে বেড়ায়? ব্যবহারেই মালুম হয়। আপনি সকালবেলা দালাল হয়ে গেলেন, দু'ঘণ্টা পরেই বাছাধন আমার শিঙ বাঁকালেন—এক্ষুনি চলে যাবো...এর স্বরূপ কচি ছেলেটাও বুঝতে পারে।'

রাখালদাস বিপন্ন বিব্রত হয়ে বলে, 'কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মান্নামশাই, আমি এব বিন্দু বিসর্গও জানিনা। এ নিশ্চয় অন্য চক্রান্ত।'

'অন্য চক্রান্ত তো, আপনার ওই সুধাংশু সকালে গিয়েছিল কেন?'

'আপনি বিশ্বাস করুন মান্নামশাই, আমি জানতামও না। ও নিজেই গিয়েছিল নাকি।'

'ইস! এই ভোর রাত্রে যাকে ঘুঁটের মালা পরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে অকারণ গলাগলি করতে গেলেন উনি, এই কথা মানবো আমি?'

'আচ্ছা আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি, এই সুধো?...আরে কোথায় সুধো? এই তো ছিল। সুধো সুধো!'

কিন্তু কোথায় সুধো?

সুধো যেন হাওয়া হয়ে গেল।

স্টেশন নেহাৎ কাছে নয়।

সাইকেল রিক্সা ভিন্ন গতি নেই। কিন্তু সে গতির দিকে লক্ষ্য না রেখে মান্না কোম্পানীর বটেশ্বর হনহনিয়ে হেঁটে চলেছিল স্টেশনের দিকে।

রোদে খাঁ খাঁ রাস্তা, তবু বটেশ্বর হাঁটা পথই বা ধরেছে কেন?

কেন কে জানে!

ধরেছে তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য সাইকেল রিক্সা যে গ্রামে প্রচুর আছে তা নয়, যে ক'খানি আছে সে ক'খানিকে হয়তো আপাতত মল্লিক বাবুরাই দখল করে রেখেছেন।

বটেশ্বর বোধকরি ভেবেছে, এগোই তো, পথে পাই নিয়ে নেবো। কাউকে *সে জানিয়ে বেরোয় নি* তা বোঝা যাচ্ছে। বটেশ্বরের হাতে বেশ ভারী একটা সুটকেস, সেটা বওয়া বেশ সুখসাধ্য নয়।

হঠাৎ পিছন থেকে সুটকেসে একটা টান পড়লো।

চমকে উঠলো বটেশ্বর।

মান্নাবাবু কি গুণ্ডা পাঠিয়ে মাঝপথে সর্বস্ব লুঠ করিয়ে জব্দ করতে চান?

ফিরে তাকালো।

আর পাথর হয়ে গেল।

'ওটা আমার হাতে থাক, ভারী আছে।'

বটেশ্বর কড়া গলায় বলে, "চাকরী খেয়েও আশা মেটেনি? সুটকেসটাও দখল করতে চান?"

'তা চাই। সুটকেসটাই নয়, তার মালিকটিকেও।'

'নাটক নভেলের কথা রাখুন, পথ ছাড়ুন।'

'পথ তো আগলাইনি, শুধু পায়ে পায়ে পথ চলতে এসেছি।'

বটেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'আচ্ছা আপনি কেন এতকাল পরে আমার শনি হয়ে এলেন?'

'আমার ভাগ্য! বারে বারেই তোমার শনি হবো, রাহু হবো, এই কপাল আমার।'

'সুধা, তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে আমার জীবনে চলতে দাও। আমাকে এভাবে জব্দ কোরো না।'

'পুতুল!'

পুতুল উত্তর দেয় না, অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

'পুতুল, যে জীবনে এতোদিন ছিলে, সে জীবন তো পুরনো কাপড়ের মতো ফেলে চলে এসেছো—'

'পৃথিবীতে তো একটা মাত্রই পথ নেই? আবার অন্য পথের চেষ্টা করবো, অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে যাবো—'

'এইটাই কি চিবকালের জীবন হতে পারে পুতুল? বেটাছেলে সেজে আসর মাৎ করে—'

'মাৎ আর করতে পারলাম কই?'

এতোক্ষণে একটু হাসে পুতুল, 'কাৎই তো হয়ে গেলাম।'

'পুতুল, তুমি কি সেই অভিমানে—?'

'আরে দূর!'

'তবে তুমি হঠাৎ কেন এভাবে—'

'আচ্ছা তুমি কি গোয়েন্দা? আমার ওপর চোখ রাখতে কেউ তোমায় লাগিয়েছে?'

পুতুল রেগে বলে, 'নইলে তুমি জানলে কী করে যে একটা সহায় সম্বলহীন মেয়ে তার শেষ সহায় ছদ্মবেশ টুকুকে হঠাৎ হারিয়ে ফেলে ভয়ে পালাচ্ছে!'

'তোমার এই পালানোটাই তো সারা উজিরপুরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে পুতুল!'

'কী? তার মানে?'

'মানে এই—মান্নাবাবু গিয়ে রাখাল দাসকে এই মারে সেই মারে। তোমাকে উনি ওঁর দল থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নাকি আমায় দালাল পাঠিয়েছিলেন, আর তুমি ওর মুখের ওপর চাকরী ছেড়ে দিয়েছো।'

'যাঃ!'

'কথাটা অবিশ্বাসের, তবু সত্যি। তুমুল চেঁচামেচি। আমি সেই গোলমালের মধ্যে থেকে সরে এলাম।'

'বেশ দেখা হয়েছে তো? এখন যেতে পারেন।'

'আবার 'আপনিই' বলে রাগ করে।

সুধো তাতে কান দেয় না।

সুধো মৃদু হেসে বলে, 'যাবার উপায় কোথা? তল্পী বইতে হবে না?'

'ওঃ বইতেই হবে? তল্পী বইবার চাকরীটা কে দিলে শুনি?'

'সব চাকরী কি দিতে হয়? কিছু কিছু চাকরী নিতেও হয়।'

'আমার খুব রাগ হচ্ছে সুধা! তুমি কেন আবার ধূমকেতুর মতন আমার জীবনের মধ্যে এলে?'

'ধূমকেতুর স্বধর্ম!'

পায়ে পায়ে এগোচ্ছে।

পুতুল যেন নিরুপায় হয়েই ওই সুটকেসটার ভারটা ছেড়ে দিয়ে চলতে চলতে বলে, 'আচ্ছা তুমি যে আমার সঙ্গে যাচ্ছো, এর উদ্দেশ্য কী?'

উদ্দেশ্য? হয়তো প্রায়শ্চিত্ত।'

হুঁ! এসব মহৎ চিন্তা-টিন্তাগুলো বোধহয় আজকালই গজিয়েছে?'

'অস্বীকার করবো না। সুধো বলে, 'সত্যিই হঠাৎ তোমায় দেখে, যেন সারাজীবনের বোকামী আর লোকসানের ওজন দেখে প্রাণটা হায় হায় করে উঠলো।...মার কি খবর পুতুল?'

'মা? ও বাবা! এ যে একেবারে অনুতাপের আগুনে ঝলসানো! মার কথা তোমার মনে আছে?'

'আছে পুতুল। সবই আছে, সবই থাকে। কোনো কিছুই হারিয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায় না। শুধু কুগ্রহরাই যা খুশী করায়। এখন মায়ের নাম মুখে আনা আমার ধাষ্টামো। তবু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—'

'মা নেই সুধো।'

সুধো চমকালো না।

সুধো যেন এই কথাটাই শোনবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো।

আস্তে বললো, 'বুঝতে পারছিলাম। মা থাকলে কি আর তুমি—?'

'দরকারও হতো না! মা যে কোথা থেকে কি করতেন!'

'কিন্তু একটা কথা বলি,—জগৎ সংসারে এতো রকম কাজ থাকতে, হঠাৎ বেটাছেলে সেজে কবিগান করার ইচ্ছে হলো কেন?'

'কেন?'

পুতুল একটু বিষণ্ণ হাসি হাসে।

'সব 'কেন'র মানে বলা যায় না।'

'কাঁঠালতলার সেই পুকুরটা কেটে নিয়েছিলি পুতুল? যাতে কচি পুতুলকে চান করাবি বলেছিলি?'

'নিয়েছিলাম বৈকি!'

পুতুল একটু হাসে, 'সেই পুকুরে চান করতে করতেই তো কচি পুতুলটা এতো বড়ো হলো।'

'মা আমায় কী বলতেন পুতুল?'

'কী মনে হয়?'

'মনে তো অনেক কিছুই হয়। মনে হয় বলেছেন—বেইমান নেমকহারাম অকৃতজ্ঞ ছোটলোক।'

'ওইসব কথাগুলোর সঙ্গে মার মুখটা মিলোতে পেরেছো?'

'না পুতুল, তা' পারছি না। কিন্তু ওইগুলোই তো বলা উচিত।'

পুতুল চড়া গলায় বলে, 'উচিত কাজটা মার হয়ে আমি করেছি। শুধু ওই নয়, আরো অনেক কিছু বলেছি। আজো বলি।'

'বলেছিস? আজো বলিস? তুই আমায় বাঁচালি পুতুল। মনে হচ্ছে...কিন্তু, মা তা'হলে কী বলেছেন?'

পুতুল একটু দাঁড়িয়ে পড়ে আস্তে বলে, 'মা বলতো, শিকলিকাটা পাখি।' কেঁদে কেঁদে বলতো, 'জানতাম! জানতাম ও খাঁচা ভেঙে পালাবে।'

'কতোদিন হলো পুতুল?'

পুতুল প্রশ্নটা বুঝে নেয়।

বলে, 'এই আশ্বিনে সাত বছর।'

'সাত বছর। এই সাত বছর তুই একা আছিস পুতুল?'

'একা কেন? ভগবান আছেন সঙ্গে সঙ্গে?'

কিছুক্ষণ আর কথা বললো না সুধো।

তারপর আবার স্তব্ধতা ভেঙে বললে, 'কী হয়েছিল?'

'জ্বর। শুধু জ্বর। সে জ্বর আর ছাড়লো না।'

'আর মা আমায় ছেলের মতো করে—'

থেমে যায়, তারপর সামলে নিয়ে বলে, 'কিন্তু তোর তো তখন বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছিল পুতুল! বিয়ে করিসনি কেন? তাহলেতো—'

পুতুলের গলা ধারালো শোনায়, 'বিয়ের বয়স হলেই বিয়ে করতে হয়? তোমারও তো বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে কোনকালে।'

'আমার কথা বাদ দে। আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলে। তাছাড়া বেটাছেলে।'

'তাতেই মাথা কিনেছো?'

'না' মানে, বেটাছেলের তো অন্য ভয় নেই। মেয়েছেলের পদে পদে ভয়।'

'সে জ্ঞান আছে তাহলে?'

'ছিল না জ্ঞান পুতুল, ধীরে ধীরে হয়েছে। যতো নিজের ছোটলোকমীর কথা ভেবেছি ততোই জ্ঞান জন্মেছে। কিন্তু জানতাম না তো তুই কোথায় কী অবস্থায় আছিস। মনে ভাবতাম রূপের জোরে খুব একখানা বড়লোকে বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, সোনার খাটে গা আর রূপোর খাটে পা মেলে শুয়ে আছিস—'

'ভাবতে এইসব?'

'ভাববো না? বড়লোকের বৌ হবার মতোই তো রূপখানা তোর!'

'হুঁ। তাই মান্নাবাবুর দাসত্ব করছি।'

'সে তোর সখের কাজল পরা পুতুল! আর মারও অন্যমনস্কতা। মা যদি সময়ে—'

'দেখো সুধা, মার নামে কথা বলো না।'

'না না ছিঃ। কথা বলবো কেন? মানে ইয়ে—'

'জানি বুঝেছি। মা বলতেন, 'যার হাতে মনে মনে তোকে সঁপে দিয়ে রেখেছিলাম তাকে ছাডা আর কারুর হাতে দিতে মন সায় দেয়না পুতুল! আমি মরে গেলে তোর যা মনে হয় করিস।'

'পুতুল!'

'কী?'

'কার হাতে?'

পুতুল কড়া গলায় বলে, 'বুঝতে পারছো না? সে হচ্ছে আমার যম।'

দুর থেকে টিনের বেড়া দেওয়া এক ফোঁট্টা স্টেশনটা দেখা গেল।

সুধো সুটকেসটা হাত বদল করলো।

'এখন গাড়ি আছে?'

'পাঁচটার সময় আছে।'

'কোন ট্রেন? কোথা থেকে আসে?'

'জানিনা। একদিন আমাদের দলের নিতাই বলেছিল পাঁচটার গাড়িতে ওর শালা আসবে। দাও এবার আমার তলপীটা দাও।'

'উঁহু, না তো। বরাবরের চাকরী নিলাম যে।'

'সুধা, তুমি বুঝতে পারছো না—'

'পারছি।'

'ওরা তোমায় খুঁজবে না?'

'তা খুঁজবে।'

'তারপর? যখন দেখবে তুমি আমি দু'জনে একই সঙ্গে নিরুদ্দেশ, তখন কী বলবে?'

'কি আবার বলবে? কিছুই বলবে না। দুটো 'ছেলে'ই একসঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, শুধু এই বলবে।'

পুতুলের যেন নতুন করে খেয়াল হলো তার বহিরঙ্গে সাজটা কী? এতক্ষণ সে আস্তে আস্তে বটেশ্বর থেকে পুতুল হয়ে গিয়েছিল।

'এই এই দাঁড়া—'

একখানা সাইকেল রিক্সা স্টেশনের শেডের নীচে থেকে আস্তে আস্তে বেরোচ্ছিল। সুধো তাকে দাঁড় করালো।

'এখন এটা কী হবে?'

পুতুল অবাক হয়। 'কোন কাজে লাগাবে এখন এটাকে?'

'দেখোনা, ওঠো।'

'তোমার মতলবটা কী?'

'মতলব খারাপ। তোমায় নিয়ে ভেগে পড়া।'

'তা সেটা তো হচ্ছিলই। এখন এই ট্রেন এসে পড়ার সময় কোথায় যাবে?'

'ট্রেনে উঠবো না পুতুল। ট্রেন ছাড়বার আগেই পালাবো।'

'কী ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝবার আগে পালাই।'

'এই রিক্সাওলা, এখানে কোথায় বিবিগঞ্জের হাট বসে? সেখানে নিয়ে চল।'

'হাট তো বাবু পর্শু।'

'ওঃ তাই নাকি?'

'তা' বিবিগঞ্জ তো আছে? সেখানেই চল।'

সুধো পুতুলকে প্রায় ঠেলে তুলে দিয়ে সুটকেশটা নিয়ে চড়ে বসে।

পুতুল উঠে বসে, কিন্তু ব্যাকুলভাবে ট্রেন আসার সম্ভাবিত দিকটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার অভিসন্ধিটা দয়া করে খুলে বলবে আমায়?'

'অভিসন্ধি তো খুলেই বললাম। আরো একটা কথা শুনে নাও। মনে করো না মান্নাবাবু আর রাখালদা নিজেদের জলজ্যান্ত মাল দুটোকে হারিয়ে যেতে দেবে। যেই টের পাবে পাখি হাওয়া, সেই রিক্সা করে ছুটে চলে আসবে ইষ্টিশানে। জানে তো—আমাদের শেষ গতি রেলগাড়ি। এসে হুল্লোড় তুলে গাড়িখানাকে চলে যাইয়ে ছাড়বে।

পুতুল এদিকটা ভেবে দেখেনি।

পুতুল ভাবছিলো কোনমতে একবার রেলগাড়িতে চড়ে বসে তারপর ভাববে কোন দিকে যাবে, কোথায় নেমে পড়বে, এরপর কী করবে।

হঠাৎ যেন নিশিতে পাওয়ার মতো ছুটে চলে আসছিলো, এখন সব অদ্ভুত অন্যরকম লাগছে।

যে শত্রুর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে আসছিলো, তার সঙ্গে এক রিক্সা গাড়িতে এগিয়ে চলছে, নিজেকে প্রায় ছেড়ে দিয়ে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আর ভাবছে না। এখন তো সব ভাবনা ওই শত্রুটার।

'এখন আমরা বিবিগঞ্জে পৌঁছে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবো। ওরা এদিকে নিশ্চয় আসবে না।'

'আর তোমার জিনিসপত্র?'

'দূর ভারী তো জিনিস! দ্বিতীয় একটা বস্ত্রের দরকার হতে পারে। তা' তোমার কাছেই তো মিলবে।'

হঠাৎ দু'জনে হেসে ওঠে।

সম্পূর্ণ কৌতুকের হাসি।

যেন দু'জনে বরাবরই এমনি এক রিক্সায় গায়ে গা ঠেকিয়ে বেড়াতে যায়, এমনি হাসি গল্প করে।

'যেতে যেতে একটা পানের দোকান পেলে পান খাবো।'

'ওঃ একাই খাবে?'

'তাই কি খায় কেউ?'

'আচ্ছা তোমার খুব অদ্ভুত লাগছে না?'

'লাগছে, আবার লাগছে না।' পুতুল আস্তে বলে, 'যেই মাত্র তোমায় দেখতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিলো, এইবার বুঝি সব ওলোট পালোট হয়ে যাবে। যা কিছু সাজানো, সব ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাবে।'

'তুমি আমায় দেখেই চিনতে পেরেছিলে?'

'তোমায় দেখে? তোমার ছায়া দেখে।'

পুতুল এবার অভিযোগের গলায় বলে, 'তুমি কিন্তু আমায় প্রথমে চিনতে পারনি।'

'তা পারিনি, স্বীকার করেছি। তোমার যে সাজ অন্য। তবু জানো পুতুল, দেখামাত্র কী যে হতে লাগলো মনের মধ্যে! তাই না অমন করে রাগিয়ে দিয়ে দেখছিলাম, খোলসটা ভাঙুক, দেখি।'

ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছে রিক্সাখানা, অনেকক্ষণ আর কথা বলছে না ওরা। যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

যেন উপলব্ধিতে আনছে, সত্যিই এখন ওরা একসঙ্গে চলছে কিনা।

কিন্তু সেই কানসোনাপুরে ওদের যা বয়েস ছিল সে কি প্রেমে পড়ার বয়েস?

নয় নিশ্চয়ই, তবু কোথায় যেন কী একটা বন্ধন দুজনকে অলক্ষ্যে বেঁধে রেখেছিল। হয়তো একজনের মাতৃহৃদয়ের একান্ত ইচ্ছার নির্দেশ, আর একজনের অপরাধ বোধের ব্যাকুলতা তিল তিল করে হয়ে উঠেছিলো ভালবাসা। তাই একমুহূর্তে দূরত্ব গেল ঘুচে। শৈশবের চেনা, সেও বুঝি এক আলাদা জিনিস।

একসময় সুধো বলে ওঠে, 'মা থাকলে ফিরে গিয়ে বলতাম, 'মা, তোমার শিকলি কাটা পাখি আবার এসে খাঁচায় ধরা দিলো।'

পুতুল একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু বিষণ্ন ধবনের হাসি হেসে বলে, 'আর এক খাঁচার শিকল কাটলো!'

সুধো চুপ করে রইলো।

রাখাল দাসের মুখটা মনে পড়লো। সুধোর জন্যে উদ্বেগটা মনে পড়লো।

একটা নিঃশ্বাস ধানক্ষেতের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

যবনিকা

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রে অজিতা দেবীও একটা খুন করে বসলেন। যে রাত্রির প্রভাত ভয়ঙ্কর একটা উত্তেজনার স্নায়ু থরথরিয়ে অপেক্ষা করছিল, অজিতা দেবী কী করেন। অজিতা দেবী কী করবেন!

অজিতা দেবীই তো এই এতদিন ধরে ছিলেন সকলের লক্ষ্যবস্তু। শুধু যে সমগ্র পরিবারই তা' নয়, আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু, শত্রু, পরিচিত-অপরিচিত, বলতে গেলে দেশশুদ্ধ সবাই এ পর্যন্ত অজিতা দেবীর দিকেই তীব্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে, কী করেন উনি! কী করবেন!

কিন্তু কেন?

প্রৌঢ়া বিধবা অজিতা দেবী হঠাৎ এতখানি গুরুত্ব লাভ করলেন কী সূত্রে? দেশসুদ্ধ লোকই বা তাঁর নাম জানলো কী জন্যে? তিনি তো তাঁর দেব-দ্বিজ, আচার-নিষ্ঠা, ব্রত-পার্বণ নিয়ে প্রায় পুজোর ঘরের এলাকাতেই নির্বাসিত ছিলেন, অথবা স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন সে নির্বাসন। সে যাই হোক, সেই নির্বাসিতা অজিতা দেবী একেবারে মঞ্চের মধ্যস্থলে এসে অবতীর্ণ হলেন কেন?

যেন ভয়ঙ্কর যে নাটকখানার অভিনয় দেখবার জন্যে রোমাঞ্চিত কলেবর দর্শককুল অপেক্ষা করছে, তার নায়িকার 'রোল'টা দেওয়া হয়েছে অজিতা দেবীকে।

কী এর কারণ?

কারণ সেই আগের খুনটা।

উদ্দাম একটা ঝড়ের রাতে অজিতা দেবীর বাড়িতেই যে খুনটা হয়ে গিয়েছিল। বিগত কয়েক মাস ধরে যার 'কেস' চলছিল নির্লজ্জ নগ্ন কঠোর একটা হিংস্রতার রূপ নিয়ে। অজিতা দেবীই হচ্ছেন সেই 'কেস'-এর প্রধান সাক্ষী।

কারণ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি নাকি প্রধান। সম্পর্ক হিসেবেও।

তাই পরামর্শদাতা-আত্মীয় আর উকিল ব্যারিস্টারবর্গ তাঁকে প্রস্তুত করছিল সত্য সাক্ষ্য দেবার জন্যে। হ্যাঁ সত্য সাক্ষ্য দেবার জন্যেও 'প্রস্তুত' করতে হয় বৈকি। বলবার পদ্ধতির একটু এদিক-ওদিকেও যে 'কেস' একেবারে ঘুরে যেতে পারে।

আশ্চর্য!

অজিতা দেবীর বাড়িতে একটা খুনের ঘটনা ঘটলো! এত সাধাসিধে গেরস্থালী বাড়িতে এমন শান্ত-ছন্দ সংসারে এমন ঘটনা যে কী করে ঘটতে পারে, তাই ভেবে পায়নি অজিতা দেবী আর অজিতা দেবীর ছেলের পরিচিত সমাজ।

অজিতা দেবীর মেয়ের বাড়িটা অবশ্য বড়লোকের বাড়ি, মানে জামাই কলকাতার এক নামকরা বনেদী বাড়ির ছেলে, কিন্তু অজিতা দেবীর ছেলে তো সাধারণ একজন কেরাণীমাত্র।

বাপের তৈরি বাড়িটা রয়েছে, স্ত্রী গোছালো মেয়ে, মা প্রায় সংসার নির্লিপ্ত, কাজেই অজিতা দেবীর ছেলে পার্থসারথির জীবনছন্দে কোথাও কোনোখানে জটিলতা ছিল না।

পার্থসারথির স্ত্রী নন্দিতার বাপের বাড়িটাও ততোধিক গেরস্থ। মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে, পুজোয় মেয়ে জামাইয়ের শাড়ি ধুতি, জামাইষষ্ঠীতে জামাইয়ের ধুতি চাদর এইটুকু করতেই তাদের সামর্থ্য ফুরোয়, মেয়েকে কদাচ নিয়ে যায়, এদানীং তো বহুকাল নিয়ে যায়ও নি। নন্দিতা মাঝে মাঝে মা বাপের সঙ্গে

দেখা করে আসে রিষড়েয় গিয়ে, অজিতা দেবী হয়তো সেদিন পুজোর ঘর থেকে নেমে একটু বেশীক্ষণ সংসারচক্রে ঘোরেন, নন্দিতা ফিরলেই তাঁর ছুটি।

অজিতা দেবীর মেয়ে ভারতীও মা ভাইয়ের বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসতে পায়, কারণ ওর বনেদী শ্বশুরবাড়ির নিয়ম নয় বৌরা বেশী বাপের বাড়ি যায় অথবা নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সেখানে রাত্রিবাস করে।

বড্ড মন-কেমন করে, যাও বেড়িয়ে এসো। তাই আসে ভারতী। তবে যখন আসে, মা ভাই ভাজ ভাই-ঝি সকলের জন্যে আলাদা আলাদা করে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে আসে। খাবার-দাবার খেলনা-পাতি কাপড়-চোপড়।

পার্থ বোনকে 'এত বাড়াবাড়ি' করার জন্যে অনুযোগ করলেও ভারতী শোনে না সে কথা। অমায়িক হেসে বলে, 'এ আর কী দাদা, সামান্যই তো!' বনেদী বাড়ির আবহাওয়ায় সে-ও ক্রমশঃ ওদের ছাঁচে হয়ে উঠেছে, ওদের মত 'কারুকার্যময় বিনয়' শিখেছে। যেমন আছে তার বর রাজেন্দ্রভূষণের।

কিন্তু 'আছে' শব্দটা কি এখনো ব্যবহার করা চলে?

কি জানি।

তবে ও শব্দটা মুলতুবী রেখে বলা যায় রাজেন্দ্রভূষণ ছেলে খারাপ নয়। স্বভাব চরিত্রের নিন্দে কোনোদিন শোনা যায় নি। বৌকে অযত্ন করে না, নিজে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়। হয়তো একটু বোকা চালিয়াৎ, হয়তো একটু অহঙ্কারী, তা' সে এমন কিছু নয়। বনেদী বড়লোকের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিলে ওটুকু মেনেই নিতে হয়। অজিতা দেবীদের মত গেরস্থ বাড়ির মেয়েরতো ও-বাড়িতে পড়বারই কথা নয়, নেহাৎ ভারতীর রূপের জোরেই—

হ্যাঁ রূপের জোরেই ওদের বাড়িতে পড়েছিল ভারতী মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে। কোথায় কোন বিয়ে-বাড়িতে ফুটফুটে মেয়েটাকে দেখেই ওদের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তোড়জোড় করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের হারেমে পুরে ফেলেছিল।

তখন অজিতা দেবীর স্বামী অভিলাষ সেন জীবিত ছিলেন। আর সত্যি বলতে, তিনি স্ত্রী পুত্রের আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রায় জোর করেই মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেলেছিলেন। বড়লোকের ওপর মোহ ছিল তাঁর, মোহ ছিল 'বনেদী' শব্দটার ওপর। নইলে অজিতা দেবীর একান্ত অনিচ্ছে ছিল লেখাপড়ায় ইতি টেনে স্কুলের মেয়েটা ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়ি যায়।

পার্থরও তো বটেই।

পার্থ বলেছি, 'একজনের লোভের যূপকাষ্ঠে একটা কচি মেষ বলি হল!'

বলেছিল—

কিন্তু এ সব তো অতীত কথা। এ কথা তো এ কাহিনীতে অবান্তর।

ভারতী যে পড়তে পায়নি, সে আক্ষেপ ভারতীর মধ্যে তো এখন আর তিলমাত্রও অবশিষ্ট নেই। ভারতী তো ওর শ্বশুরবাড়ির মহিমায় বিগলিত। ভারতী কেরাণী-টেরাণীদের, ওর স্বামীর মতই ঈষৎ কৃপার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

অবশ্য ডিগ্রীধারী কেরাণীরাও আবার ওদের প্রতি সেই দৃষ্টি ফেলে। ওদের ওই সর্বদা পান-জর্দা গালে ভরে থাকা, ওঁদের ওই গহনা কাপড়, মোটর গাড়ির প্রসঙ্গ ব্যতীত গল্পের আর অন্য প্রসঙ্গ না থাকা, ওদের ওই 'সদাই' সুখী' মুখ, আর ভারী-ভারী গড়ন, সবই এদের কাছে কৌতুকের।

কিন্তু তার বেশী কিছু নয়!

তা' ছাড়া কিছু নয়।

মোটের মাথায় অজিতা দেবীর এই নিতান্ত সাধারণ পরিমণ্ডলটি একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকা হবার উপযুক্ত নয়।

অথচ ঘটে গেছে সেই ঘটনা।

আবার নাকি শোনা যাচ্ছে—আকস্মিকও নয়। ইচ্ছাকৃত। আছে সে প্রমাণ। তাই তিন মাস ধরে হাজতে পড়ে আছে রাজেন্দ্রভূষণ রায়! আর ভারতী রায় কোমর বেঁধে লড়ছে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে। তাছাড়া রাজেন্দ্রভূষণের দুই দাদা ব্রজেন্দ্রভূষণ আর তেজেন্দ্রভূষণ, যাদের সঙ্গে নাকি মুখ দেখাদেখি ছিল না রাজেন্দ্রর, তারাও বিরোধ ভুলে এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে মরীয়া হয়ে লড়ছে।

কাগজে কাগজে এই তিন মাস ধরে এই লোমহর্ষক হত্যাকাহিনীর ইতিবৃত্ত ছাপা হচ্ছে, এবং সবাই অপেক্ষা করছে, কি হয়? কি হয়?

অনেকের সাক্ষ্য হয়ে গেছে, অনেকের হয়তো পরে হবে, সেগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে অজিতা দেবী কী বলেন? নিহত হতভাগ্য হচ্ছে তাঁর একমাত্র পুত্র আর হত্যাকারী তাঁর একমাত্র কন্যার স্বামী—অজিতা দেবীর জামাতা।

অজিতা দেবী কি সেই জামাইকে ফাঁসিতে লট্‌কে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবেন? পুত্রহত্যার রক্তে স্নান করে পুত্রশোকের জ্বালা জুড়োবেন? না কি তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, ন্যায় ধর্ম, সত্য ধর্ম, সব কিছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে, ধর্মাধিকরণের সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করে মিথ্যা কথা উচ্চারণ করবেন?

এই প্রশ্নে—

এই প্রশ্নে আন্দোলিত হচ্ছে সবাই।

আর ভয়ানক ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে এ নাটকের আর এক নায়িকা নন্দিতা। সে এ প্রশ্নে আন্দোলিত হচ্ছে, উত্তেজিত হচ্ছে বিদীর্ণ হচ্ছে, জর্জরিত হচ্ছে। কখনো বিশ্বাসে, কখনো সন্দেহে, শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখছে সে।

বুঝতে পারছে না।

অজিতা দেবীর মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায়ও নেই। মুখটা যেন পাথর হয়ে গেছে সেদিন থেকে।

অজিতা দেবী যদি পুত্রশোকে আকুল হয়ে কাঁদতেন, নন্দিতা কিছুটা আশা রাখতে পারতো। হত্যাকারীর 'উচিত শাস্তি'তে হয়তো তার জ্বলেপুড়ে যাওয়া প্রাণটা কিছুটা শান্তিলাভ করতো। কিন্তু অজিতা দেবী এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি, একবার ডুকরে ওঠেননি। এমন কি সেই ঘটনাস্থলে একবার আছড়েও পড়েননি।

'তার মানে তোর শাশুড়ীর তখনই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটার পরিণাম চিন্তা এসে গেছে—' নন্দিতার দাদা বিশ্বনাথ ঘৃণার গলায় বলেছে, 'তখনই মনে পড়েছে, সর্বনাশ। জামাইটা যে ফাঁসিতে ঝুলবে। তাই অত শক্ত আছেন। দেখো এখন জামাইয়ের বদলে আর কাউকে না ফাঁসান।'

নন্দিতার বাবা একবার বলেছিলেন, 'তাই কি হয়, পুত্রশোকের জ্বালা বলে কথা। যতই হোক জামাই পরের ছেলে—'

কথা শেষ করতে পারেননি, নন্দিতার মা ডুকরে উঠেছিলেন, 'ওগো পরের ছেলে যে নিজের ছেলের বাড়া হয় গো—'

তখন আবার নন্দিতার দাদা কটু গলায় বলেছিল, 'সবাই হয় না মা। খুনে ডাকাত, শয়তান, এদেরও কি সেই পর্যায়ে ফেলবে তুমি?'

তা' বটে!

তা' ফেলা যায় না বটে।

সেই কথাই ভাবে সবাই।

সেই ঝড়ের রাত্তিরের আগের বেলাটা পর্যন্ত যে সেই পর্যায়েই ছিল লোকটা, তা কারুর মনে পড়ে না।

নন্দিতার দিদি বলে, 'ওই জামাইকে উনি জামাই-আদর করতেন। আশ্চর্য!'

বাপের বাড়ির লোকেই এখন ঘিরে থাকছে নন্দিতাকে। মা আসছেন, বাপ ভাই আসছেন, দিদি জামাইবাবু আসছেন। মাসী পিসীও এসে গেছেন এক আধবার। আর হাজার হাজার কথার ঝড়ে নন্দিতার শোকের সমুদ্রটা যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠছে।

কথা, কথা, অজস্র কথা।

হবেই তো।

এ মৃত্যু তো স্বাভাবিক নিয়মে ভগবানের হাত থেকে আসেনি যে, শোক ওই অশ্রুজলে ধুয়ে যাবে, 'ভগবানের মার মানুষের বার।' কিন্তু এ মৃত্যু তো আকস্মিক একটা দৈব দুর্ঘটনারও ফল নয়, যাকে 'অবধারিত নিয়তি' বলে কপালে করাঘাত করে সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

এ যে মানুষের হিংস্রতা থেকে এসেছে।

এসেছে অকল্পিত ভয়ঙ্করতা থেকে।

এ শোক কি করে স্তব্ধতায় পবিত্র হবে? হবে নিঃশব্দে নম্র?

এ শোক কড়া মদের মত উগ্র উত্তেজনাময়। এ শোক আগুনে ঝলসে যাওয়া দাহের মত। এ শোক তাই পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাক করছে নন্দিতাকে। পুড়িয়ে দিচ্ছে নন্দিতার সমস্ত মানবিকতা, সমস্ত চিত্তবৃত্তি। নন্দিতার চেহারাটা একটা ক্ষ্যাপা জন্তুর মত হয়ে গেছে, নন্দিতার ভিতরটা অহরহ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

আর নন্দিতার হিতৈষীরা মাঝেমাঝেই সেই আগুনে কাঠ জোগান দিচ্ছে।

প্রথমটা আছড়ে-পরা বিস্ময়।

এ কী!

এ কী অবিশ্বাস্য।

এ কী সাংঘাতিক!

এ কী করে সম্ভব হলো?

লোকে কি স্বপ্ন দেখছে? লোকে যে বুঝতে পারছে না? বিস্ময় প্রশ্নের যত রকম পদ্ধতি আছে, তার কোনোটাই হয়তো বাদ গেল না।

তারপর সুরু হলো—আর এক প্রশ্ন।

কারণটা কী?

কোন পরিস্থিতিতে হতে পারলো এমন অসম্ভব ঘটনা। এ কী আকস্মিক কোনো কলহের উত্তেজনার ফল? এ আগুন কি আগে থেকে ধোঁয়াচ্ছিল? এর পিছনে কি কোনো 'নারী ঘটিত' কাণ্ড আছে?

কিন্তু সেটাই বা কি করে হবে? ব্যাপারটা যদি উল্টো হতো, আজকের ওই হত্যাকারীই যদি নিহত হতো, অঙ্কটা একমিনিটে কষা হয়ে যেতো। স্ত্রী ঘটিত সন্দেহে কেরাণীর রক্তও টগবগিয়ে ফুটে উঠতে পারে, আর সেই ফুটন্ত রক্তের জ্ঞান থাকে না, তার ভাজ বিধবা হচ্ছে কি বোন বিধবা হচ্ছে। এটা একেবারে জলের মত সোজা।

কিন্তু এক্ষেত্রে সে-সন্দেহ সন্দেহ করা চলে না।

পার্থর মত নির্মল পবিত্র আর ভদ্র সভ্য ছেলের সঙ্গে কোনো সন্দেহই জোড়া চলে না। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারও এখানে অনুপস্থিত। যে বিষে আচ্ছন্ন হলে কাকা ভাইপোকে খুন করে, ছেলে বাপকে খুন করে।

হত্যাকাণ্ডের রীতি পদ্ধতিও যেমন অশেষ অনন্ত, তার কারণও তেমনি সংখ্যাতীত। আবার তার 'চরিত্রের'ও ঠিক ঠিকানা নেই। জগতে যে কত অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড ঘটে, তার কিছুটা সাক্ষী হয়তো বিচারশালার দপ্তর।

তবু সরকারী দপ্তরের সেই পার্থসারথি সেন নামের মাঝারি কেরাণীটির হত্যাকাণ্ডটা যেন লোককে বিস্ময়ের চরম সীমায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

তাই তার স্ত্রী নন্দিতা সেনকে ঘিরে দিন-রাত্তির মানুষের জটলা। দিন-রাত্রির জটিলতা সৃষ্টির আকিঞ্চন।

নন্দিতা যেন ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছে, সে একদা একটা শান্তছন্দ সংসারের 'লক্ষ্মী প্রতিমা' বৌ ছিল। ভুলে যাচ্ছে, সভ্যতা আর শালীনতার জন্যে তার খ্যাতি ছিল। ভুলে যাচ্ছে একদা স্নেহময় প্রেমময় শান্তিময় একটি স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করেছে সে।

নন্দিতার শুধু মনে রয়েছে, তার হৃৎপিণ্ডটা যেমন একজন নখে করে ছিঁড়ে উপড়ে নিয়েছে, আর

একজনের হৃৎপিণ্ডটাও তেমনিভাবে ছিঁড়ে নিতে হবে তাকে। সেইটাই নন্দিতার কাছে এখন পরম পবিত্র কর্তব্য।

'অপঘাত মৃত্যু'র অপরাধে যে প্রেতটার যথোচিত শ্রাদ্ধ হল না, তার তৃষিত আত্মাকে তৃপ্তি দিতে হবে বৈকি! আর সে কর্তব্য তো নন্দিতারই। নিজেই তাই নন্দিতা শ্মশানের প্রেতিনীর মত দুই চোখে ধক্‌ধক্ করা নারকীয় আগুন জ্বেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

তাছাড়া বড় একটা জটলায় যে রাতদিন ঘিরে আছে তাকে। কখন সে নিঃসঙ্গ চিত্তের ভয়ঙ্কর শূন্যতাকে বুকে নিয়ে স্মৃতির পাথারে ডুবে যাবে? কখন সে ভাবতে চেষ্টা করবে প্রথম শুভদৃষ্টির সময় পার্থ কেমন করে তাকিয়েছিল তার দিকে? প্রথম ভালবাসার মালাখানি কেমন করে দুলিয়ে দিয়েছিল তার বুকে? আর নিজে সে দিনে দিনে তিলে তিলে কেমন করে উন্মীলিত হয়েছিল সেই আলোয় ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে?

না! কেউ নন্দিতাকে একবারও সেই পাথারে ডুবতে দিতে চায় না। কেউ একবারও ওকে একলা থাকতে দেয় না।

ডাক্তারে নাকি বারণ করেছে।

একা থাকলেই ও নাকি সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির ঘটনা স্মরণ করবে, আর তাতে শিউরে উঠবে, চেঁচিয়ে উঠবে, পাগল হয়ে যাবে।

অজিতা দেবীর বিষয় কিছু বলেনি ডাক্তার।

বলবার প্রয়োজনও অনুভব করেনি।

যিনি অতবড় 'দুর্ঘটনার পরও লোকসঙ্গ'র জন্যে আকুল না হয়ে যথারীতি তাঁর সেই তিনতলার পুজোর ঘরে আসন স্থাপন করে একা বসে থাকছেন, বসে থাকতে পারছেন, ছুটে বেরিয়ে আসছেন না, বেরিয়ে এসে মাথায় ঘটি ঘটি জল থাবড়াচ্ছেন না, এমন কি তীক্ষ্ণ করুণ কান্নায় আকাশ বিদীর্ণ করে ফেলছেন না। তাঁর জন্যে ভাবনার কি থাকতে পারে?

তিনি শক্ত। তিনি পাথর। তিনি ভয়ঙ্কর একটা সন্দেহের বস্তুও।

কে জানে কেমন করে হঠাৎ তাঁর পরিচয়টা যেন নন্দিতার শত্রুপক্ষের দলে পড়ে গেছে। নতুন কোনো ঘটনাই ঘটেনি, তবু যেন মনে করা যাচ্ছে, নন্দিতার সুখ দুঃখ সম্পর্কে তিনি উদাসীন, নন্দিতার ভয়ঙ্কর দাহর সম্পর্কে তিনি নির্বিকার, তাঁর সেই আদরের মেয়ের সিঁথির শূন্যতা পূর্ণতা নিয়েই ভাবছেন তিনি।

অন্ততঃ নন্দিতার পিতৃগোষ্ঠীর এই ধারণা। সংক্রামক ব্যাধির মত নন্দিতারও বুঝি ক্রমশঃ সেই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে।

অজিতা দেবী পুজোর ঘরে বাসা বেঁধেছেন, এ বদনামটা বোধকরি কতকটা সত্যি, কতকটা মিথ্যে। অজিতা দেবীর প্রাণটা হয়তো সেখানেই বাসা বেঁধে রেখেছে, কিন্তু অজিতা দেবীর দেহটাকে নীচের তলায় নামিয়ে আনা হচ্ছে।

কারণ অজিতারও পিতৃকুল আছে।

আছে শ্বশুরকুলের আত্মীয়।

দ্যাওরপো ভাসুরপো ভাগ্নে ননদাই। তারা কি চিরদিনের আত্মমগ্ন অজিতা দেবীকে হাতে পাবার এত সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেবে? তারা তাঁর পিঠে হাত বুলোতে আসবে না? বুদ্ধি দিতে আসবে না? উকিল ব্যারিস্টার নিয়ে আসবে না?

তাছাড়া তারা তো সত্যিই মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছে। পার্থকে ভালবাসতো না এমন কে আছে তার পরিচিত সমাজে?...

বরং অহঙ্কারী রাজেন্দ্রভূষণ সম্পর্কে সকলের মনোভাব সমান অনুকূল ছিল না, সে শুধু অহঙ্কারী বলেই নয়, বড়লোক বলেও।

তাই সকলে মিলে অজিতা দেবীকে সতর্ক করে দিচ্ছে—'মায়ায় পড়ে যেন সত্যভ্রষ্ট হয়ো না। আদালতে

দাঁড়িয়ে যেন নার্ভাস হয়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা বলে বসো না।...তোমার ওই পাজী মেয়ে ভারতীর মুখটা চিন্তা করে ফেলো না তখন। তুমি শুধু তোমার পার্থর সেই মৃত্যু-মলিন মুখ মনে কোরো, সেই অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিস্ফারিত হয়ে ওঠা চোখ দুটো মনে কোরো।'

হ্যাঁ, অজিতা দেবীকে ধরে ধরে উপদেশ দিচ্ছে সবাই, 'সেটা মনে কোরো।'

অথচ অজিতা দেবী চীৎকার করে উঠেছেন না। বলছেন না, 'বেরিয়ে যাও তোমরা, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।'

অজিতা দেবী তখন হঠাৎ হয়তো তাঁর দ্যাওরপোকে জিগ্যেস করে বসছেন, 'তোর ছেলে-মেয়ে কেমন আছে?'...হয়তো তাঁর ভাগ্নেকে জিগ্যেস করে বসছেন, 'মেয়ের বিয়ের কিছু করছিস নাকি? বেশ তো বড় হল।'...হয়তো তাঁর ননদাইকে জিগ্যেস করে বসছেন, 'আপনার নূতন চিকিৎসায় কিছু ফল পেলেন?'...হয়তো বা নিজের কাকা—কি মামাকে বলছেন, 'রোদে এসেছো, একটু শরবৎ দিতে বলি।'

আর উকিলকে?

তাকে তো হরদম অর্থহীন অবান্তর আর অপ্রয়োজনীয় সব প্রশ্ন করছেন।

ভাড়াটেরা যদি দুর্ব্যবহার করে, বাড়িওলার কেন তাকে উঠিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে না, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হবার পর সত্যিই দলে দলে মেয়ে বিচ্ছেদ করতে ছুটেছে কিনা, কাউকে টাকা ধার দিয়ে শোধ দিতে না পারলে যে 'তামাদি' হয়ে যাওয়া বলে সেটার মেয়াদ ক'বছর, এইসব জরুরী তথ্যগুলো যেন তদ্দণ্ডেই না পেলে নয় অজিতা দেবীর।

উকিল পর্যন্ত অবাক হয়ে যাচ্ছে।

আড়ালে এসে নাকি আর সবাইকে প্রশ্ন করছে, 'উনি প্রকৃত মা তো? না বিমাতা?...উনি কি ছেলেকে দেখতে পারতেন না? ছেলের সঙ্গে কি ওঁর মুখ দেখাদেখি ছিল না? উনি কি বরাবরই এরকম অপ্রকৃতিস্থ বা অস্বাভাবিক ধরনের?'

প্রশ্নের সীমা নেই।

নন্দিতাকে ঘিরে এক ঝাঁক মৃদু মৌমাছি।

অজিতাকে ঘিরে এক ঝাঁক ভীমরুল।

কারণ নন্দিতার ওপর সকলেরই সহানুভূতি। নন্দিতার দীর্ঘ জীবনটা পড়ে আছে, আর নন্দিতার সেই জীবনটা—একটা মানুষের নৃশংসতায় ধ্বংস হয়ে গেছে। নন্দিতা রিক্ত সর্বস্বান্ত।

অজিতার কি?

অজিতার কতটুকুই বা গেছে?

অজিতার তো ছেলের সঙ্গে যোগাযোগই ছিল না। দিনান্তে একবার দেখা হতো কি না হতো। যেদিন সকালবেলা তাঁর পুজোর প্রথম পর্ব সেরে একটু তাড়াতাড়ি নীচে নামতেন, হয়তো দেখতেন ছেলে খেতে বসেছে, হয়তো দেখতেন জামা জুতো পরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কথার বিনিময় হতো কি না হতো।

ছেলের জন্যে অস্থির হয়ে বা ত্রুটির লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে পরদিন যে তাড়াতাড়ি কথা বলবেন নেমে এসে, সেটুকু সৌজন্যও তো দেখা যেত না।

তবে? তবে কি করে বলা যায় ছেলে তাঁর 'প্রাণ' ছিল?

তবে কি করে বলা যায় নন্দিতার মতন হাহাকারে গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছেন তিনি?

হচ্ছেন না। তাঁর প্রাণ ওই ঠাকুরঘরের পাথরের পুতুলে বিভোর।

অজিতা দেবীর নিজের বোনই তো আড়ালে এসে বলেছে, 'কি জানি বাবা ওঁর ঠাকুর ওঁকে কী শক্তি দিয়েছেন! ঠাকুর ভজে যদি মানুষ পাথরের পুতুল বনে যায়, হৃদয়বৃত্তি বলে কিছু না থাকে, তা'হলে ঠাকুর না ভজাই ভাল। ঠাকুর! ঠাকুর! এখনো চন্দন ঘষছেন, তুলসী দিচ্ছেন। আশ্চর্য, ঠাকুর ওঁর কত ভাল করলেন? ...ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর ঠাকুরকে তাঁর সিংহাসন সুদ্ধু টান মেরে ছাত ডিঙিয়ে ফেলে দিই!'

বলছে, সকলেই প্রায় ওই ধরনের কথা বলছে। আর শেষ পর্যন্ত অজিতার ঠাকুরকেই দোষী বানিয়ে

ছাড়ছে। মানুষের কোর্টে বিচার হচ্ছে তাঁর।

বলা হচ্ছে, 'যে মানুষটা এতদিন ধরে তোমায় ভজলো, তুমি তার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। তার এই সর্বনাশটা করেও দিব্যি চুড়ো বাঁশী নিয়ে বসে আছো।'

কিন্তু শুধু কি ওরাই বলছে?

অজিতা দেবী নিজে বলছেন না?

ধিক্কারে ধিক্কারে জরাজীর্ণ করে ফেলছেন না তাঁর ঠাকুরকে। বলেছেন না, কী নির্লজ্জ তুমি, কী নির্লজ্জ! নিজের হাতে খেলাঘর সাজিয়ে দিয়ে, নিজের পায়ে ভেঙে দাও তুমি সে ঘর!...মানুষের থেকেও হৃদয়হীন তুমি, মানুষের থেকেও পাষণ্ড!

বলছেন।

তবু হযতো বা কেবলমাত্র অভ্যাসের বশেই চন্দন ঘষছেন, তুলসী দিচ্ছেন। অভ্যাসের বশেও নয়, ধিক্কার দিতেই। যেন, দেখো তুমি যত নির্লজ্জই হও, যত দুর্ব্যবহারই করো, আমি তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করে চলবো। আমি তোমায় বুঝিয়ে ছাড়বো তোমার থেকে মানুষ ভালো।

কিন্তু এসব ঘরে বসে।

যখন নীচের তলায় নেমে আসেন?

তখনও কি মানুষ সম্পর্কে ধারণা একই থাকে অজিতা দেবীর? যখন তাঁরা অজিতা দেবীকে পাখীপড়া করতে থাকে, 'তোমার ছেলের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিস্ফারিত চোখ দুটো খুব করে মনে রাখবে।'

যখন তারা বলতে বসে, 'দয়া মায়া স্নেহ মমতা, সব একদিকে আর একদিকে হচ্ছে ধর্ম! সত্য ধর্ম। সেই সত্য ধর্মের মুখ চেয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে বলতে হবে, 'হ্যাঁ আমি নিজের চক্ষে দেখেছি! দেখেছি সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড! আমার চোখের সামনেই মুহূর্তে ঘটে গেছে সে ঘটনা! কারণ তখন আমি—।'

হ্যাঁ তখন যে অজিতা দেবী উপস্থিত ছিলেন, অজিতা দেবীর চোখের সামনেই ঘটে গিয়েছিল ঘটনাটা তার প্রমাণ আছে। কারণ তখনই অজিতা দেবী তীব্র একটা চীৎকার করে উঠে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। পাড়ার লোকেরা যখন নন্দিতার চীৎকারে, নন্দিতার চার বছরের মেয়েটার চীৎকারে, ভারতীর চীৎকারে আর বছর বারোর বাচ্চা চাকরটার চীৎকারে বিহ্বল হয়ে নিজেদের বিপদের চিন্তা না করেই ছুটে এসেছিল, তখন দেখছেন ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত কলেবর ছেলের পায়ের কাছে অজিতা দেবী পড়ে রয়েছেন জ্ঞান হারিয়ে।

আর অজিতা দেবীর জামাই গাড়ি হাঁকিয়ে পালাবার তাল করছে।

অবশ্য সে তাল তার সফল হয়নি।

ভগবানের বিচার।

অনেকক্ষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে থাকার জন্যে গাড়িটা স্টার্ট নিতে দেরী করছিল, ততক্ষণে পুলিশ এসে পড়েছিল। অতএব রাজেন্দ্রভূষণের আর নিজের গাড়ি চড়ে বাড়ি ফেরা হয়নি, পুলিশের গাড়ি চড়ে হাজতে যেতে হয়েছিল, আজও সেখানে আছে।

পাড়ার লোকেরা অবশ্য ভাবেনি, যুগপৎ যে ওই চীৎকারটা উঠেছে ওদের বাড়ি থেকে, তার কারণটা এমন একটা অদ্ভুত হতে পারে।

ওরা ভেবেছিল 'ভগবানের মার।'

অকস্মাৎ কেউ ভগবানের শিকার হয়েছে।

বিনা আয়োজনে, বিনা নোটিশে এমন শিকার তো করেই থাকেন তিনি হরদম!

তাই ভেবেই এসেছিল। এমন দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে, সে সন্দেহ থাকলে কিছুতেই আসতো না। কানে তুলো দিয়ে বসে থেকে রাত কাটিয়ে, পরদিন সকালে শিশুর সারল্য নিয়ে বলতো, 'কী আশ্চর্য! কিচ্ছু টের পাইনি তো!'

কিন্তু সে সারল্য দেখাবার সুযোগ তাদের হয়নি। তাই পুলিশকে খবর দিতে বাধ্য হয় তারা।

অতএব পুলিশ এসেও দেখেছে অজিতা দেবীকে ঘটনাস্থলে।

তবে?

'দেখিনি জানিনা' বললে তো ছাড়ান নেই তাঁর। তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন, তিনিই সব আগে দেখেছেন।

কিন্তু তিনি সত্য ধর্মের মুখ চাইবেন কিনা, সেটাই হচ্ছে ভাবনার কথা!

হতে পারে 'ঠাকুর ঠাকুর' করেন, কিন্তু সে করা কি এতখানি আছাড়ের ধোপে টিঁকবে? তিনি তো ভাবতেই পারেন, ছেলে তো গেছেই, আবার মেয়েটার কেন সর্বস্ব ঘোচাই। কোন মতে বানিয়ে-টানিয়ে কিছু বলতে পারলেই যদি জামাইটা উদ্ধার পায়।

এই সন্দেহ সকলের।

সন্দেহ আরো ঘনীভূত হচ্ছে, ওঁর নীরবতায়। একবারও উনি বলছেন না ঠিক কী দেখেছিলেন, ঠিক কোন্ মুহূর্তে ঘরে ঢুকছিলেন, ঘরের মানুষগুলো কে কোথায় কোন্ পজিশনে বসেছিল। এইগুলোর সঠিক নির্ভুল হিসেব পেয়ে গেলে উকিল-টুকিলরা তো দৃশ্যটাকে ছবির মত সাজিয়ে ফেলতে পারে।

তা' নয় অজিতা দেবী শুধু কেবল বলছেন, 'কিছু মনে করতে পারছি না। মাথার মধ্যেটা সমস্ত গুলিয়ে গেছে।'

তা মানছি—গেছে গুলিয়ে। এমন অবস্থায় যেতেই পারে। কিন্তু তুমি যখন পাগল হয়ে যাওনি, তুমি যখন নিয়মমাফিক স্নান করছো, পুজো করছো, কথা বলছো, খাচ্ছ-দাচ্ছও, তখন সেই গুলিয়ে যাওয়া মাথাটাকে ঠিক করে নিতে হবে বৈ কি! ভেবে ভেবে বলতে হবে বৈ কি!

সেটা না নিলেই বলতে হবে, তুমি ইচ্ছে করে সুযোগ নিচ্ছো।

এঘরে, নন্দিতার ঘরেও সেই আলোচনাই চলছে।

উনি ইচ্ছে করে সুযোগ নিচ্ছেন।

নন্দিতা এখানেই আছে। নন্দিতার মা বুঝি একবার নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উকিলরা নাকি বারণ করেছে। বলেছে সেই অনুপস্থিতির সুযোগে মেয়ে এসে ওঁকে 'হাত' করে ফেলতে পারে।

অতএব অজিতার বাড়িতে বসেই অজিতার সমালোচনা চলছে।

'উনি ইচ্ছে করে সুযোগ নিচ্ছেন।'

'তাছাড়া দেখছো না' নন্দিতার মা বলেন, 'বৌয়ের প্রতি কী ভাব? একবার এ মুখো হচ্ছেন? একবার 'বৌমা' বলে ডেকে এক গেলাস শরবৎ হাতে ধরে দিচ্ছেন? ওর ভেতরটা কী খাক হয়ে যাচ্ছে, তা অনুভব করতে চেষ্টা করছেন? এমন উদাসীন হয়ে আছেন, যেন নন্দিতাই কোন পাপের পাপী! মিঠুকে আমি নিয়ে চলে গেছি, তাই মেয়েটা বেঁচে গেছে। কই উনি একবার হাঁ হাঁ করে বলেছেন, 'ও আমার পার্থর স্মৃতি, আমার কাছে থাকুক। বলেন নি। কঠোর কঠিন কাঠ প্রাণ!'

নন্দিতার মায়ের কথায় সায় দিচ্ছে অজিতা দেবীর পক্ষের লোকও। অজিতা দেবীর ভাগ্নে ভাসুরপো ননদ ননদাই। তাঁরা তো দুঘরেই ঢুকছেন কিনা। তাঁরা এ ঘরের তথ্য সংগ্রহ করে ও ঘরে পরিবেশন করছেন। আর বলছেন, 'আশ্চয্যি শক্ত প্রাণ! কোথায় ওই অভাগা বৌটাকে বুকে নিয়ে পড়ে থাকবেন, তা না বৌটার ঘরেই ঢুকছেন না। বলতে গেলাম, 'তোমার তো তবু ইহকালের পালা চুকে এসেছে, আর পরকালের চিন্তা তো আজীবনই করছে, বৌমার দিকে চাওয়া যায় না। বলা হলো কি না 'তোমার শান্তি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে? কবে বাচ্চা হবে ওর?'...অবাক বাবা অবাক! বললাম বৌমাকে তোমার একটু দেখা উচিত, বললো কিনা, 'সবাই তো দেখছে। বৌমার মা রোজ আসছেন।'

অথচ পার্থ থাকতে, কী 'বৌমা' বৌমাই ছিল। যেন বৌমায় বিগলিত। যেন বৌমা সর্বেসর্বা মাথার মণি! আর কিছুই নয়, ছেলেকে দেখানো! ছেলের সুয়ো হওয়া! আর সংসারটি বৌয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্দি হওয়া। ...ঠাকুর-ভজা লোকরা ওইরকম ধূর্তই হয়। সুবিধেবাদীর রাজা। জামাইয়ের শাস্তি হবার

ভয়ে অতবড় যে পুত্রশোক তা পর্যন্ত গিলে ফেললো।

তা ঠাকুর ভজা অজিতা দেবী অন্য এক স্বার্থের খাতিরে শোক গিলে ফেলতে পারলেও, নন্দিতার মা বাপ তো মেয়ের বৈধব্যশোক ভুলতে পারেন না, তাঁরাই লড়ছেন জোর তলবে। গহনা বেচেও চালাবেন। দোষীকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায়! তাছাড়া খুনের কেস তো তুলে নেওয়া যায় না। তোমার ক্ষমতা না থাকলে সরকার পক্ষই চালাবে।

তবে কথা হচ্ছে—ঘুষের কথা।

কে জানে ও পক্ষ ঘুষ দিয়ে পার পেয়ে যাবে কিনা। ঘুষেরই রাজত্ব, ঘুষেরই পৃথিবী। ভগবান পর্যন্ত ঘুষে নরম, তো মানুষ কোন ছার। হয়তো ওই গালফুলো রাজেন্দ্রভূষণ, হাজতের ভাত খেয়ে গালটা অবশ্য শুকিয়ে গেছে এখন, ওটা প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। হয়তো পার্থসারথির মৃত্যুটা আত্মহত্যা বলে গোঁজামিল করে চালিয়ে দেওয়া হবে। বিচারের প্রহসনে কী হয় আর কী না হয়।

হয়তো তাই।

জগতে এমন সব ঘটনা ঘটে, যা লিখতে গেলে পাঠক বলবে 'অসম্ভব, অসম্ভব, অতি নাটকীয়।'

অথচ তা ঘটে।

তবু এরকম ঘটনা বুঝি আর কখনো ঘটেনি। এই পটভূমিকায়, আর একরকম পাত্র-পাত্রীর পরিবেশে।

সেদিন সকালেও তো ওদের পৃথিবী নিত্যছন্দে আবর্তিত হচ্ছিল। রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ চেতনার উপর নিত্যকার মতই অজিতা দেবীর ঠাকুরঘরে 'মঙ্গলারতি'র মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হয়েছিল।... সকাল-বেলা মিঠু ঠিক প্রতিদিনের মতই বাবাকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ও বাবা আর কত ঘুমোবে। তুমি কি কুম্ভকর্ণ?'

এটি মিঠুর মায়ের শিক্ষা।

এই ভাব, ভাষা, তাড়না।

পার্থ বলেছিলো, 'চমৎকার শিক্ষা। এই তো চাই। ঘরে ঘরে মায়েরা যদি ছেলেমেয়েদের এইভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারে, কিছু দিনের মধ্যেই দেশ মাতৃতান্ত্রিক হয়ে যাবে।...বাবারা ওই কুম্ভকর্ণ বনেই পড়ে থাকবে।'

নন্দিতা হেসে বলেছিল, 'তা তাইতো চাও তোমরা! কী দেখো আজকাল তোমরা সংসারের?'

পার্থ বলেছিলো, 'সংসারের সারাৎসারকে দেখি।'

নন্দিতা 'আহা!' বলে মুখের একটা ভঙ্গী করে মেয়েটাকে নিয়ে স্কুলের জন্যে তৈরি করাতে নিয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, সেদিন সকালেও মিঠুকে তার সেই 'শিশু মন্দিব বিদ্যায়তনে' নিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা, আলনার ওপর ওই যে নীল শাড়িখানা এখনো ঝুলছে, ওইটা পরে। শাড়িটা যেমন তেমনই রয়েছে। ওকে যে নন্দিতা আর পরলো না, আর কখনো পরবে না, সে নিয়ে ওর কোনো দুঃখ নেই।

মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই ঝিকে প্রশ্ন করেছিল নন্দিতা, 'হারুর মা, উনুন ধরিয়েছিস?'

স্কুল থেকে ফিরেই তাড়াতাড়ি রান্না চাপানো কাজ নন্দিতার। চায়ের জল গরম করে নিয়ে ভাত চড়িয়ে দিয়ে চা ছাঁকে, বরকে দেয়, নিজে খায়।

অজিতা দেবীকে দেবার প্রশ্ন নেই।

অজিতা দেবী তো সেই ছেলের ভাত খাবার সময় পূজোর ঘর থেকে নামেন। নন্দিতা হুটোপাটি করে রান্না করে, কুটনো কোটে, মাছ কোটে।

হয়তো অজিতা দেবীর এটা অমানবিকতা, হয়তো তাঁর উচিত বৌকে কিছুটা সাহায্য করা, কিন্তু তিনি সেই উচিত কাজটি করেন না।

এ ধরনের প্রশ্ন কেউ ওঠালে উনি নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'বৌমা তো খুব পটু। সবই পারে, আমি বুড়ি গিয়ে পড়ে আর ঝঞ্ঝাট বাড়াই কেন? কাজের বদলে অকাজই করে বসবো হয়তো।'

'আশ্চর্য! ছেলেকে একদিন নিজের হাতে করে রেঁধে খাওয়াতেও ইচ্ছে করে না?' একথা বলেন নন্দিতার মা।

আর নন্দিতা হেসে হেসে বলে, 'অথচ জামাই মেয়ে আসুক দিব্যি খাটবেন। বলবেন, এলাম বৌমা তোমার একটু সাহায্য করতে।'

তার মানে ছেলের চেয়ে জামাইয়ের ওপর টান বেশী।

হবেই তো, ছেলে গরীব, জামাই বড়লোক।

এসব সমালোচনা চলতো। জোর তলবেই চলতো।

তবে সিঁড়ি বেয়ে অজিতা দেবীর ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকতো কি না, তা জানা যেত না।

অজিতা দেবী নীচে নামতেন প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে।

সেদিনও তাই নেমেছিলেন।

ছেলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তখন।

অজিতা দেবী তার যাত্রাকালে যথারীতি 'গোবিন্দ' নাম স্মরণ করেছিলেন।

কিন্তু 'গোবিন্দ' নাম তো বিফল হয়নি?

পার্থ তো নিরাপদে ফিরে এসেছিল বাড়িতে সন্ধ্যায় অফিসের পর। তারপর—

হ্যাঁ, তারপর!

ঠিক তারপর এসে হাজির হয়েছিল ভারতী। স্বামীকে নিয়ে, গাড়ি-ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে। আর গল্প করে, খাওয়া-দাওয়া করে, যখন উঠি-উঠি করছে তখন উঠেছিল সেই ঝড।

ভয়ঙ্কর এলোমেলো ঝড়।

তারপর উদ্দাম বৃষ্টি।

পার্থ তার বোন ভগ্নিপতিকে বলেছিল, 'পাগল হয়েছো, এই আবহাওয়ায় বেরোবে কি? থেকে যাও রাতটা।'

ওরা বলেছিল, 'বাড়িতে ভাববে।'

'কে ভাববে? বাড়িতে তোমার আছে কে? শুধু চাকর-বাকর ছাড়া?' নন্দিতাও সায় দিয়েছিল সে কথায়।

কথাটা সত্যি, তখন তো আর রাজেন্দ্রভূষণ হাজতে যায়নি, অতএব তার দুই দাদা তার জন্যে সহানুভূতিতে বিগলিত হয়নি। তারা বাড়ির মাঝখানে মাঝখানে দেয়াল তুলে যে ব্যবধান রচনা করে নিয়েছিল তার অন্তরালেই ছিল তখন।

তাই পার্থ বলেছিল 'কে ভাববে শুনি? বাড়িতে কে আছে?'

ওরা তখন বলেছিল, 'তোমাদের তো আর গ্যারেজ নেই, গাড়িটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবে।'

পার্থরা বলেছিল, 'তোমাদের ভেজার থেকে গাড়ি ভেজাটা কম লোকসান।'

তবু ওরা বেরোতে চেষ্টা করছিল, পার্থ তখন বলেছিল। বলেছিল, 'তার মানে গরীবের ঘরে একটা রাতও কাটাতে পারবে না তোমরা, এই তো?'

তার মানে নিজের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করেছিল পার্থসারথি। নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ গড়েছিল।...

আর সে কাজে সাহায্য করেছিল তার মা বৌ!

অজিতা দেবী বলেছিলেন, 'এই দুর্যোগে মানুষ রাস্তা থেকে দরজা ঠেলে অচেনা বাড়িতে ঢুকেও আশ্রয় নেয়, আর তুই বাড়ির মেয়ে, চলে যাবি?'

ভারতী বলেছিল, 'আমি তো বলিনি, ও বলছে।'

'ও' বলেছিল, 'আপনাদের অসুবিধের জন্যেই, হঠাৎ আমরা দু-দুটো মানুষ শুতে চাইবো, ছোট্ট বাড়ি—'

'তা' সেটাই কথা।' নন্দিতা বলে উঠেছিল, 'ছোট বাড়ি বলেই থাকা সম্ভব হবে না আপনাদের।'
রাজেন্দ্রভূষণ বলেছিল, 'তবে নাচার! রয়েই গেলাম।'
অর্থাৎ অদৃশ্যলোকের অন্ধকার থেকে যে জাল ফেলা হচ্ছিল, সে জালে সবাই পড়েছিল।
আর বেশ আনন্দ চিত্তেই পড়েছিল।
বৃষ্টিতে যখন পৃথিবী ভেসে যাচ্ছিল, ওরা চারজনে তখন তাস খেলছিল।
অনেক রাত পর্যন্ত খেলেছিল।
অজিতা দেবী সেই সময়টায় মেয়ে জামাইয়ের জন্যে বিছানা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করছিলেন, ছোট চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে।
তাঁর নিজের ঘরেই শুতে দেবেন ওদের।
একদা যে সেকেলে ধরণের ভারী পায়া, জোড়া খাটটায় তাঁর নিজের জীবনের যুগল-শয্যা রচিত হতো, আর এখন সারা বাড়ির বাড়তি বিছানা লেপ কম্বলের আশ্রয় হয়েছে, সেইটাকেই ভারমুক্ত করে ওদের জন্য বিছানা বানালেন।
না, স্বামী মারা যাবার পর তিনি আর কোনদিন খাটে শোননি। তাই হঠাৎ এই খাটটায় ফরসা বিছানা পেতে ঘরটাকে কেমন অদ্ভুত দেখতে লাগলো অজিতা দেবীর। জঞ্জালের স্তূপ হয়েই পড়ে থাকে ঘরটা, তিনি অধিক রাত্রে এসে মাটিতে একটা বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন।
বড়লোকের বাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে এমনই অধিকারচ্যুত হয়ে আছেন যে সাহস করে একদিন বলতে পারতেন না 'তোরা একদিন থাক্ না। একটা রাত এ বাড়িতে রাত্রিবাস কর না।'
বলতে পারেন না।
অধিকারচ্যুত বলে।
বলতে পারেন না, তাঁর কোনো সাধ প্রকাশ করবেন না বলে।
তাঁর সম্পূর্ণ আপত্তির ওপর জোর করে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কাল থেকেই তীব্র একটা অভিমানে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন অজিতা দেবী, তারপর সেই মেয়ের তিলে তিলে রূপ পরিবর্তনে যেন ক্রমশঃই সে কাঠিন্য অচল-অনড় হয়ে উঠেছে।
স্বামীর সঙ্গে হৃদয়ের যোগও ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।
তারপর স্বামী মারা গেলেন।
সেই অভিমান কেমন একটা অপরাধবোধের অনুভূতিতে নির্লিপ্ত করে দিল অজিতা দেবীকে।
সাধারণ সাংসারিক সুখ দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না, এমনি একটা মূর্তিতেই তিনতলার ছাতের ওই ঠাকুরঘর আঁকড়ে পড়ে থাকলেন। ছেলের বিয়ের পর সাংসারিক কর্তব্যের দায় থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন।
শুধু মেয়ে জামাই এলে? তখন একটু দেখেন। নন্দিতা পাছে বলে ওঠে, 'একা আর কত সামলাবো?' ছেলে পাছে মনে ভাবে, 'মার এটি অন্যায়—', তাই হয়তো!
সেদিনও ওদের আটকে ফেলে ওদের শোবার ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন ওই ভেবে।
কিন্তু ঘরটা সাফ করিয়ে রাজ্যের লেপ তোষক চাপিয়ে পুরু করে বিছানা পাতিয়ে ফর্সা ওয়াড় পরিয়ে ঘরটার চেহারা ফিরিয়ে ফেলে, হঠাৎ যেন কেমন অনুশোচনা এল অজিতা দেবীর।
সত্যি, এতই বা নির্লিপ্ত থাকি কেন?
এমন করে সব ছেড়ে দিয়েছি কেন?
আমি যে ভারতীর কুটুম নয়, মা। এটা যে ভারতী সব সময় মনে রাখতে পারে না, তার জন্যে আমিই দায়ী!
আমি যদি বলতে পারতাম, 'হোক আমার গরীবের কুঁড়ে, তা বলে মেয়ে জামাই রাত্রিবাস করবে না কোনদিন? তোদের কষ্ট হবে? হোক। কষ্ট করেই আমার সাধ মেটা।' তাহলে ওরাও কাছে আসতো।

এমন করে উপঢৌকনের পসরা বয়ে এনে কদাচ কোনোদিন কুটুম বাড়ি বেড়াতে আসার মত বেড়িয়ে যেত না।

আমি কি এবার থেকে সহজ হবো।

ভাবলেন অজিতা দেবী।

আমি সেই সহজ হওয়ার মধ্যে ছোট ছোট মিষ্টি সুখ আহরণ করে নেব?

পুরনো রংচটা টেবিলটায় একটা টেবিল-ঢাকা পাতলেন, স্বামীর ব্যবহৃত একটা সৌখিন এ্যাশট্রে ড্রয়ার থেকে বার করে রাখলেন তার ওপর।...

ভাবলেন, আগে থেকে ব্যবস্থা থাকলে একটু ফুল আনিয়ে ফুলদানীতে রাখতাম। যেমন সেই ভারতীর বিয়ের পর প্রথমবার জামাইষষ্ঠীর দিন—সেই একটা রাত এ বাড়িতে ছিল ওরা। আর আজ এই।

কর্তার মারা যাবার সময়ও হয়নি সে ঘটনা। ওরা তখন ভারতদর্শনে বেরিয়েছে।

বৃষ্টির জন্য জানলা-টানলা সব বন্ধ।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তার একটা চাপা গর্জন যেন জানালার ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

অজিতা দেবী বসলেন একটু।

পাতা বিছানায় নয়, কাছের চেয়ারটায়।

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও নন্দিতার উছলে-পড়া হাসির শব্দ ভেসে এল। তাস নিয়ে হৈ-চৈ করছে! ভারতীর হাসির গলাও পাওয়া যাচ্ছে।...ভারতীর ধারণার মধ্যেও নেই, তার মার প্রাণে এখন সাধ হচ্ছিল ভারতী তাঁর কাছে এসে বসুক একটু।

ভারতী জানে মায়ের সেই সব ইচ্ছে বাসনার উর্ধ্বে। তাই ভারতী বেড়াতে এসে সোজা তিনতলায় উঠে গিয়ে সন্দেশের বাক্স নামিয়ে দিয়ে বলে, 'এই রাখছি তোমার ঠাকুরের মিষ্টি। ধোওয়া হাতে নিয়ে এসেছি। তোমায় তো আর ঠাকুরঘরে প্রণাম করা চলবে না। নমস্কারই করি।

হয়তো অজিতা দেবী সন্দেশের বাক্সর মাপ দেখে বলে, 'এত কেন?'

ভারতী বলে, 'ওমা, ও আবার এত কি! সামান্য।'

তারপর ভারতী নীচে নেমে আসে।

ভাই ভাজের সঙ্গে গল্পে উচ্ছ্বসিত হয়। বরটি অবশ্য থাকে তার মধ্যমণি। অজিতা দেবীর সঙ্গে দেখা হয় বটে খাওয়া-দাওয়ার সময়, তা সে এমনিই গল্পে উন্মত্ত থাকে, চেয়েও দেখে না। আবার সেই চলে যাবার সময়। তখন পায়ের ধুলো নেয়। বলে, 'এই এলাম, আবার কবে আসা হয়!'

আসা হয় না।

সময়ের অভাব।

তবু তো বাঁজা-মানুষ।

অজিতা কিন্তু কোন মন্তব্য করেন না। শুধু আশীর্বাদ করেন।

আজও যথারীতি ঠাকুর ঘরে মিষ্টি দিয়ে এসে, ভেসে গিয়েছিল এদের মধ্যে। আকাশটা হঠাৎ মাথামুড়ো খুঁড়ে কেঁদে ভাসিয়ে একাকার কাণ্ড করতে সুরু করলো বলেই দিনের চেহারাটা বদলে গেল। রাতটা দেখতে পেলো ভারতী এ বাড়িতে।'

ওর কি আর মনে আছে—অজিতা দেবী ভাবলেন, ও একদা এই ঘরটিতে শুতো। ওই খাটটাতেই দুজনের মাঝখানে।

মনে নেই।

ঐশ্বর্য ওকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে।

কি জানি আজ রাত্রে বিছানায় শুয়ে ওই পুরনো দেওয়ালগুলো দেখতে দেখতে মনে পড়ে যাবে কি না!

এই সব ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ সময় কেটে গিয়েছিল। অজিতা দেবী ভাবছিলেন, কী রকম বেআন্দাজী রাত করছে ওরা। এবার তো খেলা বন্ধ করতে হয়।

হ্যাঁ, হঠাৎ এই গভীর অর্থবহ অপয়া কথাটা ভেবে বসেছিলেন অজিতা দেবী! খেলা যেন ফুরোচ্ছে না। এবার তো খেলা বন্ধ করা উচিত। তা নয়, এখনো ঝলকে ঝলকে হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

পার্থর তো কাল অফিস আছে।

বুঝছে না কেন?

তারপর রাত যখন বারোটা বাজে, ভাবলেন মিঠুটা এত রাত পর্যন্ত ওই কোণের দিকের ঘরে একলা পড়ে আছে। অতএব ওর ঘরে গিয়ে বসলেন। দেওয়ালের ঘড়িতে দেখলেন ঠিক বারোটা।

তারপর—

রাত যখন সাড়ে বারোটা—

ভয়ঙ্কর সেই বাজটা পড়লো। কাগজে যার খবর বেরিয়েছিল। অনেক নাকি ক্ষতি হয়েছিল বাজটা থেকে।

শব্দটা থামলে ভারতী হাই তুলে বললো, 'আর ভাল লাগছে না বাবা। শুয়ে পড়িগে—'

ভারতীর এমনিও ভাল লাগছিল না। হলেও বাপের বাড়ি, বেড়াতে বেরিয়ে রাত্তিরে আর বাড়িতে না ফিরতে পাওয়া খারাপ লাগছিল তার। তাছাড়া ওর বড়লোক বরের উপযুক্ত আরামের শয্যা তো এ বাড়িতে জুটবে না। হয়তো বর তাই নিয়ে আগামীকাল হাসবে। হয়তো বললে 'আমার ঘুম হয়নি।' বলবে 'উঃ কী মশা।'

পান থেকে চুন খসলে চলে না তো ওদের।

ওদের বাড়ির প্যাটার্ণ-ই এই।

সামান্য ত্রুটিতে রসাতল!

ভারতী তাই এখনো পর্যন্ত ভাবছিল, যদি বৃষ্টি থামে তো চলে যাই। নিজেই তো গাড়ি চালাবে ও। ভয় কি! তাছাড়া বড় লোকদের কায়দামাফিক সন্ধ্যার দিকে তো 'সুরক্ষিত' হয়েই বেরোয় রাজেন্দ্রভূষণ!...

লাইসেন্স আছে।

বড়লোকদের সব কিছুরই লাইসেন্স থাকে।

বড়লোকেরা অনেক কিছুই অপ্রয়োজনেও মজুত রাখে।

তাই ভেবেছিল ভারতী, হোক না রাত, ভয় কি?

ভারতীর মা ভারতীদের জন্যে যুগ্মশয্যা পেতে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন, আর ভারতীর মনে হচ্ছিল, বৃষ্টি একটু কমলেই কেটে পড়ি বাবা!

ভারতীর একেবারে ভালো লাগছিল না এইখানে এইভাবে থেকে যাওয়াটা।

ভারতীর অদৃষ্ট দেবতা কি ভারতীকে 'জানান' দিয়েছিল? তাই ভারতীর প্রাণটা পালাই পালাই করছিল।

যদি বৃষ্টিটা একটু কমতো, তাহলে ভারতীর আজকের পৃথিবীর রং এমন বদলে যেত না। নন্দিতা সর্বহারা হয়েছে। কিন্তু ভারতীরই বা সর্বস্ব বজায় থাকার আশ্বাস কোথায়? ভারতী মরীয়া হয়ে লড়ছে, কিন্তু ভারতীর প্রাণের মধ্যে ভয় বাসা বেঁধে বসে আছে।

ভারতী জানে না রাজেন্দ্রভূষণ ফাঁসিতে ঝুলবে, না বেকসুর খালাস হয়ে ফিরবে! ভারতীর মেজ ভাসুর ভারতীকে ওইটাই বুঝিয়েছেন। বলছেন, 'লড়ছি আমরা প্রাণপণে, লড়বোও। কিন্তু তুমি শক্ত হও। জেনো এসব কেস্ হয় একেবারে ফেঁসে যায়, নয় চরমে ওঠে।

ভারতী সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল ওর মেজ ভাসুরের দিকে।

ইনি কি সত্যি হিতৈষী? না বিপক্ষের টাকা খেয়ে কেস্ খারাপ করে দেবার তালে সব কাগজপত্র হাত করছেন?

কিন্তু ইনিই তো খাটছেন প্রাণপণে।

কি জানি! মেয়েমানুষ, অত বুঝিও না।

বোঝে না, তাই ওর ওপর নজর রাখতে বড় জায়ের ভাইয়ের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ চালাচ্ছে।

বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়ে, বিষয় বিষের প্রভাবে 'বিশ্বাস' শব্দটা যেন ভুলে গেছে ভারতী। ও জানে, সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। তাই ও ওর মাকেও সন্দেহ করে আসছে এই দুর্ঘটনার পর থেকে।

বিশ্বাস কি, পুত্রশোকের জ্বালায় প্রতিহিংসার বশে মা জামাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বসবে কিনা। বলা যায় না, হয়তো তাই দেবে। পাথর পুজো করে করে মনটাও তো পাথর করে রেখেছেন। ওই ঠাকুরপুজোদের বিশ্বাস নেই। ওঁদের মনের মধ্যে মায়া মমতা স্নেহ দয়া এসব দাঁড়াতেই পায় না। তাছাড়া মার সঙ্গে তো একবার নিভৃতে দেখা করতে পাবারও সুযোগ মিলছে না। দু'দিকে কড়া পাহারা। দেখা করতে পারলেও বা একবার পায়ে পড়ে বলতে পারতাম, 'মা তোমার ভারতীর মুখ চাইবে না?'

কিন্তু বললেই কি কিছু হবে?

উনি হয়তো বলে বসবেন, 'আমি সত্যকেই সার জানি। যা সত্য তাই বলবো।'

তার মানে জামাইয়ের ফাঁসি কাঠটি শক্ত করে পুঁতবেন। তাই-ই করবেন। 'মমতা বস্তুটা তো মন থেকে ধুয়ে বার করে দিয়েছেন।' ভারতী ভাবে, নইলে এই যে আমি যাই, একবার কি বলেন, 'আয়, আমার কাছটায় একটু বোস।'

বলেন না।

সে কোমলতা নেই।

ওই দেখে শুধু একটু সৌজন্যের হাসি হাসলেন, 'ভারতী? এসেছিস? ভাল আছিস তো? জামাই? আচ্ছা বোস্'গে।'

ব্যস্! হয়ে গেল মাতৃস্নেহ! আমি বেচারী এঘর ওঘর ঘুরে ভাই ভাজের সঙ্গে হল্লা করে, ভাইঝিকে একটু নাচিয়ে সময়টুকু কাটিয়ে দিই। ও যে বলে, 'বাপের বাড়ি যাব যাব করে নাচা কেন? তোমার মা তো বলতে গেলে তাকিয়ে দেখেন না।' সেটা মিথ্যে বলে না।...কিন্তু ও বুঝি আর কখনো বলবে না ওসব।

ও রাগের মাথায় একটা কাণ্ড করে বসে নিজের প্রাণটাও—

ভাবতে গেলেই হু হু করে কেঁদে ওঠে ভারতী। এ কথা আর ভাবতে পারে না, ও কখ্খনো খুন করতে পারে না। কি করে ভাববে? ঘটনা যে পরিষ্কার ছবির মত!

সেটা তো আর দুবার ফিরে উল্টে দেখতে হয় না।

তাছাড়া ও কক্খনো এ কাজ করতে পারে না, এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা কোথায়? বিশ্বাসের মূলই তো ভারতীর আলগা। ভারতীর বিয়ের পরই ভারতীর এক খুড়শ্বশুর একটা চাকরকে মেরে 'শেষ' করে ফেলেননি? মারতে মারতে ঠাকুর দালানের উঁচু সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে?

টাকার জোরে গায়েব হয়ে গেল।

ডাক্তার বলে গেল, 'উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ফলেই—'

পুলিশ অতএব সই করে দিয়ে চলে গেল।

তাছাড়া বাহাদুর? রাজেনের মেজদার সেই কুকুরটা?

সে-ও তো টাকার জোরেই—

ভারতীও তাই টাকার জোরের ভরসাই করছে। শুধু ওই একটা গোলমেলে অংশ, মা! ওখানে যে টাকার জোর খাটবে না। ভারতী একেবারে হৈ-চৈ করে কোথায় ড্রাইভারের সঙ্গে ঘুরে আসে, কাকে না কাকে টাকার জোরে মুঠোয় আনবার চেষ্টা করে, তারপর বাড়ি ফিরে কপালে করাঘাত করে, 'ভগবান, আমি কেন সেদিন ওখানে গিয়াছিলাম!...আমার তো যাবার কোনো দরকার ছিল না, আমার মা ভাই তো বলেনি, 'ভারতী, তুই অনেকদিন আসিস্নি, একবার আয়।'

বলেনি। বলেও না কোনোদিন।

আমি মরতে মরতে যাই এক একদিন। আমার এত ঐশ্বর্য, আমার সংসারের এত বাড়-বাড়ন্ত এ তো ওদের দেখাতে পাই না, তাই যাই।

নেমন্তন্ন করলে দাদা তো সাত জন্মেও আসে না, বৌদিকে গাড়ি পাঠালে আসে, তাও বেশীক্ষণ বসতে চায় না, তাই আমার ঐশ্বর্যের ভাগ নিয়ে যাই।

কিন্তু মরতে কেন সেদিন গেলাম!

ভারতী ভাবে আর হু-হু করে কেঁদে ওঠে, যদি না যেতাম আমার তো সবই ঠিকঠাক বজায় থাকতো।...আমার দাদা...উঃ ভাবতে পারি না।...তবু দাদাকে আমার পরম শত্রু মনে হয় এখন।

দাদা যদি অত জোর না করতো থেকে যাবার জন্যে! দাদা যদি ওকে তাসের নেশায় আটকে না ফেলতো!

তাহলে তো ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত সব তুচ্ছ করে চলে আসতো ও।

দাদা আমার মহাশত্রু। দাদা ওকে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে আটকে রেখে শত্রুতা করলো, দাদা মরে আমার চরম শত্রুতা করে গেল।

কিন্তু আমি যদি সেদিন না যেতাম, এ সবের কিছুই হতো না!

সেদিন ওখানে বেরোনোর আগে পর্যন্তও তো আমার পৃথিবী ঠিক ছিল। আমার সোনা রঙের পৃথিবী। সেদিন সকালেও অমূল্য স্যাক্‌রা এসেছিল, আমার বারোমেসে চুড়ি জোড়াটা হাতে ছোট হয়ে গেছে বলে আর একজোড়া চওড়া প্যাটার্ণ করে গড়তে দিলাম।

দুপুর বেলা শশী এসে বললো, 'হঠাৎ বাজারে গঙ্গার ইলিশ এসেছে ছোট বৌদি, দিন তো টাকা--।'

তখন খাওয়া হয়নি কারুর।

আমি তাড়াতাড়ি টাকা দিলাম।

শশী বললো, 'এতে হবে না। মাছ কি কখনো আপনারা একা খেয়েছেন? আমরাও খাবো তো—।'

রেগে বললাম, 'তিরিশ টাকা দিলাম, তাতেও হবে না?'

ও বললো, 'কি করে হবে? ষোলো টাকা কিলো। অন্ততঃ সের আড়াই না হলে কি করে হবে? ছোট দাদাবাবু তো একাই এক কিলো মেরে দেবে—'

পুরনো লোক, ভালও বাসে, বলেও যা খুশি।

আরো দুখানা নোট ফেলে দিলাম ওর দিকে। ও হাসতে হাসতে চলে গেল। আর চমৎকার টাটকা গঙ্গার ইলিশ নিয়ে এল।

কী খুসিই হলো ও খেতে বসে! গঙ্গার ইলিশ তো পাওয়াই যায় না আজকাল। তা শশী মিথ্যে বলেনি, সেরখানেক মাছ একাই খেয়ে ফেললো ও। আমার তো ভয়ই করছিল পাছে ওর অসুখ করে।

ভগবান, ওর কেন অসুখ করলো না?

খুব অসুখ। ডাক্তার ডাকাডাকি কাণ্ড!

তাহলে তো আমি বাপের বাড়ি যেতে চাইতাম না। তা'হলে তো আমি ওকে এমন করে হারাতে বসতাম না। ওর অসুখ ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যেতো।...এ যে ভাল হবার নয় গো!

তা তখনও তো আমি যাবার কথা স্পষ্ট করে ভাবিনি। 'কাল' করলো মুক্ত তাঁতিনী। মুক্ত যদি সেদিন না আসতো, আমি আমার সেই দু জোড়া হাতীপাড় শাড়ির সঙ্গে বৌদির জন্যেও দু'খানা টাঙাইল শাড়ি নিয়ে ফেলতাম না।

নিয়ে ফেললাম বলেই না তখনই নিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো। তাই তো ওকে বললাম, 'চল না।'

কী 'কাল' শাড়িই দিয়ে গেল মুক্ত। ও কি আর ইহজীবনে আমার অঙ্গে উঠবে? আর বৌদির তো—

ভাবতে পারি না।

ভাবতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করে আসে। আমার উকিলও আমায় পাখি পড়াল—'না আপনার দাদার সেই রক্তাক্ত মৃত দেহটার কথা একবারও চিন্তা করবেন না। ওটা আপনি সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন। মনে করতে গেলেই সে দৃশ্য আপনার মন দুর্বল করে দেবে। আপনি নার্ভাস হয়ে পড়বেন। ...যতই হোক সহোদর ভাই।

তাছাড়া আপনি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের মন স্বভাবতই কোমল। তাছাড়া আপনি তো আরোই—কিন্তু মনে রাখবেন শ্রীমতী ভারতী দেবী, স্বামীর বড়ো বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু নেই, স্বামীর বড়ো আপনজনও জগতে আর কেউ নেই।

আপনি যদি আপনার মৃত ভ্রাতার মুখ মনে করে মন দুর্বল করে বসেন তো—সেটা হবে আপনার নিজের স্বামীর মৃত্যুবাণ রচনা করা।

...মনে ভাবতে চেষ্টা করুন, আপনার কোনোদিন কোনো ভাই ছিল না। ভাবতে চেষ্টা করুন, আপনার আর কেউ নেই পৃথিবীতে শুধু আপনি আছেন আর আপনার স্বামী আছেন।

সেই স্বামী—মনে ভাবতে চেষ্টা করুন ভারতী দেবী, সেই স্বামী হাজতে বসে ফাঁসির দিন গুনছেন।...

তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা আপনি। আপনার মুখ চেয়ে বসে আছেন তিনি।

আবার এই পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করবার অধিকার একমাত্র আপনিই তাঁকে দিতে পারেন।...

...কি করে? সে কথা তো বলেইছি।

আপনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে একেবারে বদ্ধমূল করুন আপনার স্বামী মিথ্যা দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন, আপনার ভাই আত্মহত্যা করেছেন। আপনার ভাইয়ের স্ত্রী আপনার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ এই কেস সাজিয়েছেন।...

ঈর্ষা শুনে অবাক!

কী আশ্চর্য, এটা তো একটা স্বাভাবিক কথা। আপনার প্রতি তাঁর ঈর্ষা তো একেবারে দুই আর দুইয়ে চার।

আপনি তাঁর স্বামীর সহোদরা, অথচ আপনি কত সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে রয়েছেন, অথচ তিনি? তিনি নিতান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে কাটাচ্ছেন।...তবু যাই হোক তাঁর স্বামী ছিলেন। সাধারণ সুখী জীবন ছিল।

কিন্তু এখন?

এখন তিনি হলেন দুঃখিনী অভাগিনী—বিধবা। পৃথিবীর সর্বসুখ বঞ্চিতা।

আর আপনি?

যা ছিলেন তাই।

অতএব আপনার প্রতি ঈর্ষায় তাঁর প্রাণ ফেটে গেল। আপনিও যাতে তাঁর মত অভাগিনী হয়ে যান, সেই মতলবে একটা খুনের কেস্ সাজালেন।...এটা সুবিধে হলো—দৈবক্রমে সেই রাত্রে আপনারা ওই বাড়িতে থেকে যাওয়ায়।

আপনার ভাই যে সেদিন অত অনুরোধ করেছিলেন থাকবার জন্যে সেটাও সেই কারণেই। ...বুঝতে পারছেন? মৃত্যুর আগে যাতে স্নেহের ছোট বোনটিকে কিছুক্ষণ দেখতে পান। আর... আত্মহত্যার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণও।...তিনি তো জানেন তাঁর ভগ্নিপতি ওটা সর্বদা কাছে রাখেন।

...এখন বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা?

...কিন্তু এ প্রশ্ন উঠবে—আপনার দাদা শিক্ষিত শান্ত একটি ভদ্রলোক তিনি হঠাৎ আত্মহত্যার প্রেরণা অনুভব করলেন কেন?

...এ কারণ-ও আপনাকে জানাতে হবে—স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সন্তুষ্ট কি, দারুণ অশান্তিতেই ছিলেন।...

আপনার মা সেই কারণেই—অর্থাৎ পুত্রবধূর ওপর ঘৃণায় সংসার থেকে প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে আছেন। তার হাতের রান্না পর্যন্ত খান না। নিজে যা পারেন তাই খান।

আহা বৃদ্ধা মহিলা!...এখন তাঁর এই পুত্রশোক! আপনি ভাবুন আপনার ভাইয়ের স্ত্রীই এই সমস্তর মূল।

...না, একথা মনে করবেন না এসব কথা আমি আপনাকে বলেছি। মনে বদ্ধমূল করে রাখুন, এই সবই ঘটেছে। আপনার ভ্রাতৃবধূর চরিত্র দূষিত, সেই ঘৃণায় আপনার ভাই আত্মহত্যা করেছেন। এবং আপনার সেই নীচ চরিত্র ভ্রাতৃবধূ আপনার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ আপনার স্বামীকে খুনী সাজিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেষ্টা করছেন।'

এইভাবে আমাকে পাখি পড়াচ্ছেন উকিলবাবু।

ক্রমশঃই যেন আমিও সত্যিই তাই ভাবতে সুরু করছি।...আমার ভাজ বরাবর আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, আমার সুখ তার সহ্য হয় না।

...আমার দাদা আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েই সেদিন আমাদের ওখানে থাকবার জন্যে অত অনুরোধ জানিয়েছিল।

কারণ ও জানতো রাতের দিকে বেরোলেই রাজেন পকেটে রিভলভার নিয়ে বেরোয়।

অতএব থাকবেই নিশ্চিত পকেটে। ওটা রাখাইতো অনেকখানি আভিজাত্য।

তাই দাদা ভেবেছিল, ওকে বলে কয়ে রাত্রে থাকতে রাজী করে ফেলতে পারলেই অস্ত্রটা বাগাতে পারবো।

এইসব কথা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করেছি আমি। এই কথার ওপরই জোর দেবো আমি আদালতে।

কিন্তু আমার ভাজের চরিত্রে কলঙ্ক? সেটা আমি কি করে দেবো?

উকিলবাবু বলছেন, 'আপনার স্বামীর জীবনের কাছে কি আপনার ভাজের সুনাম দুর্নাম বেশী হলো?

আমাদের কাছে তো জগতের যত 'ইয়ে'র হিসেব। আপনি যদি দেখতে চান তো এমন ফাইল বস্তা বস্তা দেখিয়ে দেব, যাতে স্বামী তার সতী সাধ্বী স্ত্রীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে মামলা সাজিয়ে বিপদ থেকে পার পেয়েছে।

আমিও অতএব মন শক্ত করছি।

আমি পড়াপাখির মত সব মুখস্থ করছি।

তার সঙ্গে দেখে বেড়াচ্ছি টাকা দিয়ে কি কি করা যায়, কাকে কাকে হাত করা যায়।

তবু প্রাণের মধ্যে রাতদিন হাহাকার, কেন আমি সেদিন ওখানে গিয়েছিলাম? গিয়েও যদি ছিলাম, ঝড় উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি চলে আসিনি কেন? কেন ঝড় থামার অপেক্ষা করেছিলাম।

সে ঝড় যখন থামল না, আমার জীবনের সব সুখ উড়িয়ে ঝড়িয়ে ভাসিয়ে দেবার জন্যে যখন প্রলয়ের বৃষ্টি নামলো, আমি কেন ওকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম না। কেন তাস খেলতে বসলাম।

আর সব শেষ কথা হচ্ছে কেন আমি ওকে ফেলে 'ঘুমোতে যাই', বলে চলে এলাম অন্য ঘরে।

আমি যদি থাকতাম, এমন ঘটনা কি ঘটতে পারতো? কত বচসা হতো ওর আমার দাদার সঙ্গে? কতখানি অপমান করতে পারতো দাদা ওকে আমার সামনে?

অপমান তো নিশ্চয়, নইলে হঠাৎ ও শুধু শুধু এত উত্তেজিত হতে পারে কি করে? যাতে ওর খুন চেপে যায় মাথায়?

উকিল আমায় যতই পাখি পড়াক, আমি তো জানি ঘটনাটা কি।

আমি 'ঘুম পেয়েছে' বলে এঘরে চলে এসে শুধু বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, তারপর একবার যেন বৌদির বেহায়া হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

পুরুষ দেখলে বড্ড বাচাল হয়ে ওঠে বৌদি। তা আমি অবিশ্যি তাতে দোষ ধরিনি, ননদাই তো! তাছাড়া দাদা রয়েছে সামনে।

তারপর—

তার একটু পর আমি একটা উত্তেজিত কথা কাটাকাটির শব্দ পেলাম, দাদার আর ওর।

আমি ভাবলাম ওরা আবার তাস রেখে পলিটিকস্ নামিয়েছে। তাতে দাদার সঙ্গে কিছুতেই মতের মিল হয় না ওর!

আজও বোধহয়...উঃ তারপরই আমি সেই দ্বিতীয় বাজের শব্দটা শুনতে পেলাম।

যে বাজটা আমার বুকটা গুঁড়িয়ে দিল, আমার ভবিষ্যৎটা গুঁড়িয়ে দিল আর আমার বৌদির মন প্রাণ জীবন ভবিষ্যৎ...না না, একথা আমি ভাবতে বসছি কেন? আমার বৌদির ওপর মমতা আনলে তো চলবে না আমার।

আমার দাদা আত্মহত্যা করেছে।

করেছে আমার বৌদির চরিত্রে সন্দেহ করে। তা' সত্ত্বেও বৌদি চীৎকার করে উঠেছিল, আমি ছুটে গিয়ে দেখেছিলাম দাদা গুলি খেয়ে পড়ে আছে, 'খুন খুন... মেরে ফেললো, শেষ করে ফেললো'—বলে আর্তনাদ করছে।'

আর আমার স্বামী বোকার মত ফ্যাল্‌ফেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে হঠাৎ কাজটা করে ফেলে ওর মাথার নার্ভ বিকল হয়ে গেছল তখন।

আমি পরিস্থিতি দেখে ওকে চাপা গলায় বলে উঠলাম 'পালাও, শীগগির পালাও।'

ও বোকামি করলো, তক্ষুনি পালাল না।

ও তখন নিজেও চেঁচাতে লাগলো।

অর্থাৎ তখন ওর মাথার মধ্যে চেতনাটা ফিরে এল তাই পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলো, 'কী হলো? কী বলছেন?....বৌদি... দাদা?'

আমার দাদা মারা গেল, তবু আমি মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে আবার বলে ঠেলে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তখন 'টু লেট্'। তখন পাড়ার লোক এসে গেছে, পুলিশ এসে গেছে। আমার স্বামীর ফাঁসির পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই পথ আমায় বন্ধ করতে হবে। আমি তাই জলের মত টাকা খরচ করছি।

ভগবান, পুলিশের লোক যদি•না দেখতো?

তাহলে আমি আমার স্বামীর লুকোনা পেয়ারের মেয়েমানুষটার বাড়ি গিয়েও টাকা ঢালতাম। তাকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াতাম সেই রাত্রে আমার স্বামী ওর বাড়িতে ছিল।

সে রকম সাক্ষীতে নাকি খুনের কেসও ঘুরে যায়।

আমার উকিলবাবু বলেছে সে কথা।

কিন্তু ও মুখ্যুমি করেছিল, তক্ষুনি ছুটে পালায়নি। পালালে বৃষ্টির মধ্যে কে দেখতো? ... আমি তো ওকে বলেওছিলাম, 'বাড়ি, নয়, অন্য কোথাও পালাও।'

ও ভাবতো আমি কিছু জানি না, ওর সেই আর একজায়গার সংসারের কথা টের পাই না। কিন্তু আমি সবই জানতাম। তার ঠিকানা টিকানা সব। কিন্তু কোনোদিন সে কথা নিয়ে কথা তুলিনি। তুললেই ওর ভয় ভেঙ্গে যেতো, ও বে-হেড্ হয়ে যেতো। যেমন আমার শ্বশুর ছিলেন শুনতে পাই।...বাড়িতে বসে যা খুশি করতেন। কিন্তু ও লুকোয়, মাঝে মাঝে এটা-ওটা ছুতো করে রাত করে, দু' একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি বলে ডুব মারে। তার মানে আমায় ভয় করে। সেইটুকুই আমার লাভ।

আমার বাবার লোভের প্রতিফল আমি পাচ্ছি। তবু সেটাকেই আমার ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছি। সেই ভাগ্যকেই ভালবেসেছি।

ও আমায় ভয় করে বলেই ওকে এত ভালবাসি। ও আমায় অগ্রাহ্য করে না বলেই আমি সুখে আছি।

কিন্তু সেই মেয়েটার কাছে কি আমি যাবো? কিছু টাকা দিয়ে আসবো? মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে নয়, তার খরচ চালাতে। আমার স্বামীকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতে যাই তো, মনে হয় যেন কী 'বলি-বলি' করছে। লজ্জায় ভয়ে বলতে পারে না।

ওর হয়তো দিন শেষ হয়ে আসছে, কেন আর ওকে মনোকষ্টে রাখি। মেয়েটাকে কিছু টাকা দিয়ে এসে জানাবো দিয়ে এসেছি তোমার 'তাকে'।

রায় বেরোবাব দিন এগিয়ে আসছে... আমার হাত পা কাঁপছে।

হ্যাঁ, সেই একটা মেয়ে আছে।

রাজেন্দ্রভূষণের অনুগৃহীতা।

রাজেন্দ্রভূষণের রক্তধারা জানে এরকম এক-আধটা না থাকাটা অগৌরব। রাজেন্দ্রভূষণের রক্তধারা

কিছুতেই শুধু স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার করার মধ্যে উন্মাদনা পায় না। ওদের আরো কিছু চাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে ভালোবাসে। তাই লুকোচুরি।

ভারতী সে লুকোচুরির একটা দরজা খুলে দিল। মেয়েটার কাছে নিজে টাকা পৌঁছে দিয়ে গেল। বললো, 'তা তোমারও তা খেতে পরতে লাগবে। যে জোগাতো, সে তো এখন—'

মেয়েটা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বলে, 'আপনি এসেছেন এখানে? আপনি নিজে? আমায় টাকা দিচ্ছেন।'

ভারতী বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, 'কি করবো? না খেয়ে মরবে?'

'আমার মত তুচ্ছ প্রাণীর মরা-বাঁচায় পৃথিবীর কী এসে যায় দিদি?'

'পৃথিবীর কী এসে যায় না যায় জানি না, আমার স্বামীর তো এসে যাবে?'

ভারতী আবার ম্লান হাসি হাসে, 'যদি ভগবান সুদিন দেন, যদি আবার ফিরে আসেন, তখন? এসে দেখবেন খাঁচার পাখি ছাতুর অভাবে মরে পড়ে আছে? আর নয়তো খাঁচা ভেঙে উড়ে পালিয়েছে বনের ফলের চেষ্টায়।'

মেয়েটা ভারতীয় পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, 'দিদি আপনি এত মহৎ।'

ভারতী বলে, 'মহৎ-টহৎ কিছু নয় বাবা, কিন্তু কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে।'

ভারতী গাড়িতে উঠে যায়।

মেয়েটা নিষ্পলক দাঁড়িয়ে থাকে।

নিজেকে ভারী ছোট মনে হয় তার। ভারী অপরাধিনী রাজেন্দ্রভূষণের মত একটা অসার লোককে এত ভালবাসতে পারেন উনি! আশ্চর্য!

অসার ছাড়া কি?

সে নিজে তো জানে সে কথা।

কিন্তু তাদের আর বাছ-বিচার। একজন যদি খাইয়ে পরিয়ে আশ্রয় দিয়ে রাখে সেটাই শান্তি। সেই শান্তিটুকুই লাভ।...কিন্তু আজ বড় ধিক্কার আসছে ওর।

রাজেন্দ্রভূষণের খবর ও জানে। ও উৎকণ্ঠিত প্রাণ নিয়ে খোঁজ করে, কি হল?...ও কাগজ উলটে দেখে আইন আদালতের কলমে।

কিন্তু ভেবে পায় না সেই বাজে চাল-সর্বস্ব 'বোকা-চালাক' লোকটা খুনের দায়ে পড়লো কি করে? তাও যে-সে খুন নয় নিকট আত্মীয়। ও কেন খুন করতে যাবে তাঁকে? ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কি কোন লুকোনো সম্পর্ক ছিল রাজেনের? ধরা পড়ে গিয়ে মান বাঁচাতে—

যে যার নিজের মত করে ভাবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। কেউ কাউকে ঠিক বুঝতে পারে না, কেউ কারুর সঠিক চেহারা জানে না।

রাজেন্দ্রভূষণই কি কোনোদিন কল্পনা করতে পারতো, ভারতী সেই মেছোবাজারে গলির মধ্যে ঢুকে তার স্বামীর অনুগৃহীতাকে টাকা দিয়ে আসতে পারে—পাছে মানুষটা কষ্টে পড়ে ভেবে?

রাজেন্দ্রভূষণ জানতো ভারতী ওই মেছোবাজারের খবর টের পেলে কাঁদবে কাটবে রসাতল করবে, হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। তাই রাজেন্দ্রভূষণ সযত্নে গোপন রেখেছিল খবরটা। কিন্তু রাজেন্দ্রভূষণ সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে টের পেলো কোনো খবরই গোপন থাকে না।

কিন্তু শুধুই কি রাজেন্দ্রভূষণ টের পেলো?

সেই কথাই ভাবে রাজেন্দ্র হাজতে বসে। কিন্তু কতকগুলো নোংরা কুৎসিত লোকের সঙ্গে পড়ে থাকতে সে বুঝি সব ভুলে যাচ্ছে। তাই সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটার কথা যতবার স্মরণে আনতে চেষ্টা করে, তত বারই যেন গুলিয়ে যায়।

যতক্ষণ তাস খেলা হচ্ছিল, স্পষ্ট পরিষ্কার। এমন কি কে কতবার জিতেছে হেরেছে তাও হয়তো ভাবলে মনে করতে পারবে। এমন কি ভয়ঙ্কর সেই বাজ পড়ার শব্দটা এবং তারপর ভারতীর হাই তুলে শুতে যাওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু তার পর কি হলো?

তারপর?

ওঃ! তারপর তো তাসের ম্যাজিক দেখতে চাইলো পার্থর বৌ। আমি দেখালাম। ও খুব হাসাহাসি করলো, তাস নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগালো, কিন্তু তারপর?

তারপর সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেন?

এতদিন ধরে কতকগুলো নোংরা বদমাইস লোকের সঙ্গে থেকে আমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু এই নোংরাগুলোর সঙ্গে আমি কেন?

আমি না সুরেন্দ্রভূষণ রায়ের ছেলে রাজেন্দ্রভূষণ রায়। স্প্রীঙের গদিতে ছাড়া কখনো শুইনি আমি, এখন ডানলোপিলো ছাড়া।... আমার বাবা কাকা চন্দ্রকোণার ধুতি ছাড়া পরতেন না, আমি বাজারের সেরা দামী ডেক্রন টেরিলিন। আমার বাড়িতে শুনলে দশটা লোকজন, আমার বাড়ির বাথরুমের মেজেয় মুখ দেখা যায়। ...অথচ আমি এদের সঙ্গে পড়ে আছি, নোংরা খাদ্য খাচ্ছি, নোংরা জামা পডছি।...কারণ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা কাজ করেছি।

আমি খুন করেছি।

কিন্তু কেন করেছি? কোন্ পরিস্থিতিতে?

কিছুতেই মনে পড়ছে না সেটা।•

পার্থর স্ত্রীর চীৎকারে যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। হঠাৎ যেই ঘুম ভাঙা চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম, ভারতী ছুটে আসছে, ভারতীর মা ছুটে আসছেন। আর ভারতীর দাদা?

আমি আবার চোখ বুজে ফেলেছিলাম।

আমিও চেঁচিয়েছিলাম।

কী বলে চেঁচিয়েছিলাম? তা মনে নেই।

তারপরই তো কি যেন গোলমাল হয়ে গেল। আমাকে ধরে নিয়ে এল পার্থকে খুন কবেছি বলে।

কিন্তু আমার হাতে রক্তের দাগ কই?

আমার হাতে রিভলভারের ঠাণ্ডা-টাণ্ডা স্পর্শটা কই?

যে স্পর্শটা কত দিন পর্যন্ত লেগেছিল আমার মেজদার পোষা কুকুর বাহাদুরকে গুলি করে মেরে ফেলার পর। বাহাদুরকে মেরে ও যে আমার হাতে কতদিন ধরে রক্ত লেগেছিল। আমি হাতে করে ভাত খেতে পারতাম না, চামচে করে খেতাম।

বাহাদুরকে আমি মেরে ফেলেছিলাম। মেজদার সঙ্গে শত্রুতা করে মেরে ফেলেছিলাম। কিন্তু যখন বাহাদুরটা গুলি খেয়ে লটকে পড়লো, তখন তার দিকে তাকাতে পারিনি আমি। আর বাহাদুরের সেই চোখ দুটো ঘুমের মধ্যে তাড়া করে বেড়িয়েছিল আমায়। হঠাৎ এই একটা অভাবিত বিশ্বাসঘাতকতায় যে চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠেছিল, তারপর পৃথিবীর আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে বুজে এসেছিল।

আমি তাকাতে পারিনি, তবু চকিতের সেই দৃশ্যটাই আমাকে তাডা কবে বেডিয়েছে। এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই যেন। কিন্তু পার্থর ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে কেন?

বাহাদুরকে গুলি করেছিলাম মেজদার ওপর আক্রোশে, কিন্তু পার্থ। আমার স্ত্রীর দাদা। বয়সে ছোট হলেও আমি যাকে দাদা বলে এসেছি বরাবর। তার ওপব কিসের আক্রোশ ছিল আমার?

ভারতীর ওপর আক্রোশে।

কিন্তু কেন?

ভারতী তো কোন দোষ করেনি।

ভারতী তো কোনোদিন আমার জীবনের চোরাকুঠুরিতে উঁকি দিতে যায়নি? ভারতী তো চিরকালের

হিন্দু মেয়ের মত স্বামীকেই দেবতা জ্ঞানে—...ও মনে পড়েছে ভারতীর ওই দাদা সেই চোরাকুঠরীর দরজায় উঁকি দিয়েছিল।

ভারতীর দাদা বলেছিল,—'সরযূকে চেনো?' কিন্তু তাই বলে আমি ওকে বাহাদুরের মত গুলি করলাম? অত ভালবাসতাম ওকে!

তা বাহাদুরকেও তো ভালোবাসতাম আমি। যখন আমাদের বাড়ির মাঝখানে মাঝখানে পাঁচিল পড়েনি, তখন তো বাহাদুর সব ঘরেই ঘুরে বেড়াতো। তখন আমি ওকে কত আদর করেছি, কত বিস্কিট খাইয়েছি।

পাঁচিল পড়ার পর ক্ষেপে গেলাম আমি। আর আমার ওই মেজদাটাকে ভয়ানক কোনো যন্ত্রণা দেবার বাসনায় বাহাদুরকে হঠাৎ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গুলি করলাম।

মেজদা আমার নামে থানায় ডায়েরী করে এল। আমার নামে কেস করলো, বাহাদুর ওর পুত্রতুল্য, অতএব বাহাদুর হত্যাকারীকে ওর পুত্রঘাতীর তুল্য শাস্তি দেবার জন্যে আবেদন করলো।

এই মেজদা।

যে আমার শাস্তি মুকুব করবার জন্যে প্রাণপণে লড়ছে, হাজার হাজার টাকা খরচ করছে।

আশ্চর্য মানুষের মন! ওযে কখন কি করে বসে! নইলে আমিই কি কখনো ভেবেছিলাম বাহাদুরকে গুলি করতে পারি?

আমি 'বাহাদুর হত্যার' কেস্ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলাম আমাদের দারোয়ানকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে।

দারোয়ান সাক্ষী দিয়েছিল বাহাদুর আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জামার কলার চেপে ধরেছিল, দারোয়ানও টেনে ছাড়াতে পারেনি। বাধ্য হয়েই তাই আমি অনেক কষ্টে ওকে এক হাতে ঠেকিয়ে এক হাতে রিভলবার বার করেছিলাম ।

অতএব আমার ফাইন্ হলো না। আমার রিভল্‌ভারের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হলো না। বরং আমিই পরে উল্টে 'চার্জ' করেছিলাম চিরদিনের বিশ্বস্ত, আর সকলের প্রিয় কুকুরটা যে হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেটা কেন? নিশ্চয় তার প্রভুর প্ররোচনায়।

সেই কেসও চলেছিল কিছুদিন।

তারপর ডিসমিস হয়ে গেল।

কিন্তু তখনও আমি চামচে করে ভাত খাচ্ছি।

আর ভারতী?

ভারতী তখনও থেকে থেকে বলছে, 'বাহাদুরকে গুলি করলে তুমি? তুমি তো তা হলে মানুষ খুন করতেও পারো।'

আমি অবশ্য নি[illegible]র লজ্জা ঢাকতে বলেছিলাম, 'তুমি তো ছাগল ভেড়ার মাংস খাও, মানুষের মাংসও খেতে পারো তা[illegible]লে?'

কিন্তু ওটা যুক্তি নয়।

মনে মনে আমি হেরে গিয়েছিলাম। ভারতীর সামনে চড়াগলায় কথা কইতে পারিনি কতদিন।

আর এখন?

এখন আমি ভারতীর সামনে প্রমাণ করলাম। আমি মানুষ খুন করতেও পারি।

...কিন্তু অবাক হয়ে দেখছি—ভারতী আমায় ধিক্কার দিচ্ছে না, ভারতী বলছে না—'জানতাম, তখনই জানতাম এ কাজ তুমি করতে পারো।'...ভারতী মরমে মরে গিয়ে বলছে না—'তা বলে তুমি দাদাকে—?'

ভারতী আমাকে দেখা হলেই আশ্বাস দিচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। বলছে 'মা কালীর কাছে মানত করেছি, কাশীর বিশ্বনাথের কাছে মানত করেছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে মানত করেছি আমার সিঁথের সিঁদুর যেন বজায় থাকে।'

ভারতীর ওই আশ্বাস দিয়েই কি আমার হাতের রক্তের দাগ মুছে গেছে?

তাই আমি টের পাচ্ছি না ওটা কখন লেগেছিল।

আমি আরো অবাক হচ্ছি আমার দাদাদের ব্যবহারে। বড়দা বলে গেছে, 'তুই কিছু ভাবিস না—সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত আপীল করবো আমরা।'

মেজদা বলেছে—'সুযোগ করে ওপক্ষের উকিলকে ঘুষ দিয়ে কেস ঘুরিয়ে নেব দেখিস। ওদের কতই বা পয়সা? পুঁটি মাছের প্রাণ! নেহাৎ খুনের কেস্ বলেই এতদিন পর্যন্ত টানছে।'

কিন্তু কবে করবে ওসব?

না কি করছে ভেতরে ভেতরে? বেশী কিছু ভাবি না আর। আমি শুধু ভাবছি সরযূটার কী হচ্ছে? কি জানি এতদিন অন্য কারো কাছে চলে গেল কি না। তা যদি যায় তো ভালো। নইলে বেচারা কষ্ট পাবে।...পুলিশ বোধহয় ওর সন্ধান পায়নি, নইলে ওকেও কোর্টে এনে হাজির করতো। ভাগ্যিস পায়নি। তা'হলে আর ভারতীর কাছে মুখ দেখানো যেত না।

কিন্তু পুলিশ যার সন্ধান পায়নি, ও তার সন্ধান পেলো কি করে?

ওই হতভাগ্য লোকটা?

বাহাদুরের মত গুলি খেয়ে লটকে পড়লো যে? বাহাদুরের চোখে তাকালো?

কিন্তু ভারতীর কাছে মুখ দেখাবার ভাবনাটা আর ক'দিন? যে যতই আশ্বাস দিক, আমি জানি আমার ফাঁসি হবেই। কারণ আমার সেই শ্যালাজ, নিহতের স্ত্রী নন্দিতা দেবী, সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে আমায় ফাঁসি দিয়ে ছাড়বেই।

আশ্চর্য!

ও আমায় কত যত্ন করে খাইয়েছে।

কত হাসি গল্প করেছে!

আচ্ছা, আমি ফাঁসিতে ঝুললেই কি পার্থ নামের সেই মানুষটা বেঁচে উঠবে?... কি জানি। সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মানুষ জীবটা কি? ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না, পার্থকে আমি বাহাদুরের মতন গুলি করলাম কি করে? কিন্তু কখন করলাম? আমার স্মৃতিশক্তি সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।...কোনো কিছুর মানে পাচ্ছি না।

আমি কি তবে সব ছেড়ে দিয়ে শুধু মানুষের মানে খুঁজবো?

রাজেন্দ্রভূষণ নামের লোকটা বোকা, তাই মানুষের মানে খুঁজতে চাইছে। কিন্তু মানুষের কি সত্যিই কোনো মানে আছে?

নন্দিতা নামের ওই মেয়েটা, যে নাকি শ্মশানের ডাকিনী যোগিনীর মত মূর্তি করে রাজেন নামের লোকটাকে ফাঁসিতে ঝোলাবেই, তার কি মানে?

মানে নেই। তাই মানুষেরও মানে নেই।

তাই ও ওর উকিলের কাছে সমানেই বলে চলেছে, 'তারপর—আমার ননদ উঠে যাবার পর আমি বললাম, 'খেলা চলুক না আর একটু?'

আমার স্বামী হেসে বললেন, 'তিনজনে কি খেলা জমে? কে কার পার্টনার হবে?'

নন্দিতার ভিতরটা কাঠ হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয়, স্বামীর নাম করতে, স্বামীর হাসির কথা উল্লেখ করতেও গলা একটু কেঁপে যাচ্ছে না। সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

'তারপর আমি বললাম তবে তাসের ম্যাজিক দেখাও।

...আমার ননদাই, ওই হত্যাকারী শয়তান অনেক রকম ছলনা জানতো, মানুষের মন ভোলাবার অনেক কৌশল। তাসের ম্যাজিক তার মধ্যে একটি।

কিছুক্ষণ তাসের ম্যাজিক দেখিয়েছিল ও। বেশ হাসাহাসি হচ্ছিল। তারপর আমার স্বামীর দুর্মতি হলো, তিনি ওকে প্রশ্ন করলে—হ্যাঁ দুর্মতি ছাড়া আর কী? তাঁর তো ভাবা উচিত ছিল সাপের ল্যাজে পা দিলে কী হয়, শয়তানের মুখোশ খুলে দিলে কী হয়।...তা' ভাবেননি, প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা রাজেন সরযূ নামের একটি মেয়েকে তুমি জানো?'

নন্দিতা যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড।

একই কথা অজস্রবার অজস্রলোকের কাছে বলে চলেছে, একেবারে নির্ভুল। কমা সেমিকোলনের এদিক ওদিক হচ্ছে না। তার মানে সেই গোড়ার দিন থেকে বলতে শুরু করেছে, আর এই চার মাস ধরে বলেই চলেছে। যে আসছে, যে যেখানে আছে সবাইকে বলছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সরযূ নামের একটি মেয়েকে জানো?'

হত্যাকারী উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো, 'সরযূ? কে সরযূ? আপনার—একথা বলার মানে?'...

আমার স্বামী অবাক হয়ে বললেন, 'তা' তুমি অত রাগ করছো কেন? জানো কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।'

রাজেন বললো, 'না সরযূ-টরযূ কাউকে চিনি না আমি। আর কখনো এভাবে কথা বলবেন না।'

আমার স্বামী আরো অবাক হলেন।

বললেন, 'কথাটায় দোষের কি আছে? আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেছিল, সে নাকি মেছোবাজারের কোন একটা গলিতে সরযূ নামের একটা মেয়েকে চিকিৎসা করতে গিয়েছিল, তার ঘরে তোমার আর তার একত্রে ছবি দেখেছে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি, বললাম কাকে দেখতে কাকে দেখেছো। সে জোর দিয়ে বললো, তোমার ভগ্নিপতিকে আমি অনেকবার দেখেছি। পাড়াটা কিন্তু খারাপ মতো—

তখন ওই শয়তান লজ্জায় মাথা হেঁট না করে বলে উঠলো কি, 'বাঃ দাদা বেড়ে। খাশা বন্ধু জুটিয়েছেন তো। তা' সে সব পাড়ায় কি আর বন্ধু একা যায়? আপনাকেও নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে যায়। প্রাণের বন্ধু যখন।'

আমার স্বামী বলে উঠলেন, 'শাট আপ্।'

সঙ্গে সঙ্গে ওই শয়তান ট্রাউজার্সের পকেট থেকে রিভলবার বার করে—ওঃ আর আমি বলতে পারবো না। আমার মাথার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'—

কিছুক্ষণ চুপ করে মাথার শিরাকে শান্ত করে নন্দিতা আবার বলে, 'ওই শয়তানের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি মরেও স্বস্তি পাবো না। ওর শাস্তিই আমার স্বামীর পারলৌকিক কাজ।'

বলে বলে এ কথাগুলোও মুখস্থ হয়ে গেছে নন্দিতার।...

তাছাড়া আরো মুখস্থ করাচ্ছেন তার দাদা, তার উকিল।

'মহামান্য জজ বাহাদুর, আপনি ভেবে দেখুন, আমি একটি সাধারণ হিন্দুঘরের বৌ, আমার স্বামী আর কন্যা নিয়ে সুখে সংসার করছিলাম। আমাদের ঐশ্বর্য না থাক, সুখ ছিল। যেমন সুখে পাখিরা থাকে ছোট্ট বাসায়।... কিন্তু ওই লোকটা ঐশ্বর্যের অহংকারে মদমত্ত। মুহূর্তের রাগে নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো আমার সেই বাসাটুকু ভেঙে দিল। আমি এখন রাস্তার ভিখারিণীরও অধম।... আমার সংসারে বৃদ্ধা শাশুড়ি, শিশুকন্যা, অথচ কোনো উপার্জনশীল লোক নেই।

আরো কত যেন কথা।

মন ভেজাবার মতো, প্রাণ গলাবার মতো, যত কথা মজুত থাকে ওই সব আইনজীবীদের কণ্ঠে, তারা সে সব কণ্ঠান্তরিত করছে দিনে দিনে, তিলে তিলে।

স্বামীশোকে উন্মাদিনী নন্দিতা পাছে ভুল-ভাল কিছু বলে বসে কোর্টে।

এইবার শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে। বাইরের লোকের, পাড়াপ্রতিবেশীর চাকরের, কচি বাচ্চাটার, ডাক্তারের, সব সাক্ষ্য শেষ হয়েছে, এইবার মায়ের, বোনের, স্ত্রীর।

প্রথম নম্বর একবার হয়ে গেছে হয়ে গেছে পুলিশ অফিসারের কাছে, এখন, কোর্টে। দেখা যাক, একটি লাইনেরও এদিক-ওদিক হয় কিনা।

নন্দিতার দাদা আসে। একজন পাড়ার দাদাও আসে, তার নাকি এক উকিল বন্ধু আছে, সে আইনের মার-প্যাঁচ অনেক জানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে সে, শোকে সান্ত্বনা দেয় হতাশায় আশা। ,

নন্দিতার চোখ দুটো তখনই শুধু একটু শান্ত দেখায়, তখনই যেন মনে হয় ভিতরের আগুনে আর কয়লা দেওয়া হচ্ছে না এখন।

নন্দিতা তাকেই শুধু বলে, 'এতক্ষণ বসে রইলে মুকুলদা, একটু চা-ও খাবে না?'

মুকুল মৃদু হাসে, 'এখন না। এখন খাবো না। এরপরে যখন তোমার সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে, তখন খাবো।'

'তখন? তখন হয়তো আমি আর বেঁচেও থাকবো না মুকুলদা।

'বেঁচে? বলা বড়ো শক্ত নন্দিতা। হয়তো তখনই ভালো করে বেঁচে উঠবে, নতুন করে জ্বলে উঠবে।'

'আমার মনে হয় আমি ফুরিয়ে গেছি।'

'মানুষ কখনোই ফুরিয়ে যায় না নন্দিতা। একমাত্র মৃত্যুই পারে মানুষকে ফুরিয়ে দিতে, আর কেউ নয়—রোগ নয়, শোক নয়, দুঃখ, দৈন্য কিছুই নয়। মানুষ হল 'অমর বৃক্ষ।'

নন্দিতা নিশ্বাস ফেলে।

নন্দিতা রুক্ষ চুলের গোছা পিছনে ঠেলে দেয়। পার্থর মৃত্যুর পর থেকে নন্দিতা আর চুল বাঁধেনি, চুলে তেল দেয়নি। ওর যেন দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা।

নন্দিতা সেই রুক্ষ গোছা পিছনে ফেলে বলে, 'ভাবলে তোমার অবাক লাগে না মুকুলদা? কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল?'

মুকুল সাবধানে বলে, 'লাগে।' তখন ভাবি, মানুষের 'ভাগ্যবিধাতাই তো চিরদিন কোনো দিকে 'ভাঙন' দেন, কোনো দিকে 'পলি' পড়ান! কিন্তু তোমার ওই ননদের বরের ব্যাপারটা অদ্ভুত। বরাবর তোমার কাছে শুনে এসেছি লোকটা বোকা অহঙ্কারী বাজে চালিয়াৎ। এমন ভয়ঙ্কর নৃশংস চরিত্র, তা' তো জানতাম না।'

'জানা যায় না।' নন্দিতা গম্ভীরভাবে বলে, 'মানুষ যে কি, তাকে যথার্থ সময় ভিন্ন বোঝা যায় না। ওই বোকা চালিয়াতের খোলস এঁটে সংসারে ঘুরে বেড়াতো সে তার ভয়ঙ্করত্ব ঢেকে।...এক মিনিটে খুলে গেল খোলস, বেরিয়ে এল নৃশংস রাক্ষস।'

মুকুল একটু চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, 'আমাকেও হয়তো তুমি নৃশংস পাষণ্ড ভাববে, যদি এখন থেকে 'আমার আবেদন জানিয়ে রাখতে চাই। তবু সে আবেদন আমি রাখবো নন্দিতা।...মাঝখানে এই পাঁচটা বছর ভুলে যেতে হবে তোমাকে। যে জীবনের ছক্ একদা কেটেছিলাম আমরা—'

নন্দিতা ক্লান্ত গলায় বলে, 'মুকুলদা, এখন থাক্।'

নন্দিতার মা বলেন, 'মুকুল এত আসে কেন রে?'

নন্দিতা বলে, 'আর বোলো না! ওর উকিল বন্ধুর বুদ্ধিমন্ত পরামর্শ শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেলাম আমি।'

নন্দিতার মা বিরক্ত গলায় বলেন, 'বারণ করতে পারিস না? বলতে পারিস না, উকিল ব্যারিষ্টার কি নেই আমার?'

'বলতে যাই মা, মুখে বাধে। যতই হোক একটা সদিচ্ছা নিয়েই তো আসে!

'তা আসুক—' মা ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'এ সময় পরের ছেলের অত না আসাই ভালো! লোকে নিন্দে করতে পারে।'

নন্দিতা মুহূর্তে কঠিন হয়। বলে, নিন্দে করলে তোমরাই করবে মা! আর কে আসে?'

মা অগত্যা চুপ করে যান।

কিন্তু মার যেন ক্রমশঃই মেজাজ বদলাচ্ছে। মা এখন মাঝে মাঝে বেয়ানের ঘরে গিয়েও বসেন, আর হঠাৎ বলে বসেন, 'ওঁর জামাইয়ের প্রাণের বদলে কি আমার জামাইয়ের প্রাণটা ফিরে পাবো?'

এই মামলায়, এ চেষ্টায়, ওঁর যেন আর তেমন সায় নেই।

তার মানে অভাগিনী নন্দিতার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু মা-ও ক্রমশ বিমুখ হয়ে পড়ছে।

তাই হয়।

অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়। নন্দিতা যখন সুখী সৌভাগ্যবতী ছিল, তখন মার স্নেহ ছিল, সহানুভূতি ছিল। এখন আর থাকছে না।

তখন বাপের বাড়ি বেড়াতে গেলে মা নিজে যেচে বলেছেন 'ওরে, নন্দিতা, একবার মুকুলদের বাড়ি ঘুরে যাস্। মুকুলের মা বড্ড 'ইয়ে' করে।' আর এখন মা মুকুলের ছায়ায় 'লোকনিন্দে' দেখছেন।

তখনও দেখছিলেন। সেই আগে।

যখন মার বাড়িতে একটা সদ্য তরুণী মেয়ে ছিল, যখন সে তার প্রাণের পাপড়িগুলি মেলে দিয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছিল। তখন মা লোকনিন্দে দেখছিলেন, তাই নিজের মেয়ের প্রাণটাকে মুঠোয় চেপে পিষে ফেলে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়েছিলেন।

তবু—সেটাই তো আমি মেনে নিয়েছিলাম। 'ভাগ্যের পরিহাস বলে সুখী হবারও চেষ্টা করছিলাম। হয়তো আস্তে আস্তে সুখী হয়েও যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার জীবনের উপর সেই ঝড়ের রাতটা কেন এল!..কেন এল তছ্নছ্ করে দেওয়া একটা সর্বনাশা প্রলয়!...

আমি তবে এখন আর কি করবো?

আমি কি চিরদিন ওই নিহত নায়কের বিধবার ভূমিকা নিয়ে ওই ভিটেয় পড়ে থেকে ওর মেয়েকে মানুষ করবো, আর ওর ওই কঠোর কঠিন মায়ের সেবা করবো? আমার আর কিছু থাকবে না? সুখ নয়, আশা নয়, ভবিষ্যৎ নয়, জীবন নয়?

তবে আমার এত যুদ্ধে কী দরকার?

তবে ওই রাজেন নামের লোকটাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবার কি দরকার? 'ভাগ্যে যা ঘটেছে তাই নিয়েই থাকি' বলে চুপ করে বসে থাকলেই হয়।

না।

এত সহজে হার মানবো না আমি। আমি যে যুদ্ধে মেনেছি, সেই যুদ্ধ শেষ করবো। তারপর দেখবো আর কি যুদ্ধ আছে।

মা চলে গেলে এই রকম অনেক কথা ভাবে নন্দিতা!

ক্রমশঃই লোকের ভীড় পাতলা হয়ে আসছে, এখন যেন নাটকের 'ইন্টারভ্যাল্!' দর্শকেরা এদিকে ওদিকে সরে গেছে, আলোচনা করছে, গল্প করছে,...পর্দা উঠলে আবার এসে বসবে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করবে।

এখন তাই প্রেক্ষাগৃহ হাল্কা।

এখন নন্দিতা জানলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে সময় পায় মাঝে মাঝে। তাই ভাবে, মুকুলের কথাই কী ঠিক? মরে গেলেই ফুরিয়ে যায় মানুষ!

আর তারা কিছু দেখতে পায় না, কিছু শুনতে পায় না, কিছু বুঝতে পারে না! তাদের সুখ দুঃখ, ক্রোধ বিস্ময়, কোনো কিছুরই অনুভূতি থাকে না আর!

তাই, তাছাড়া আবার কি!

তা যদি না হতো, তাহ'লে এই পৃথিবী এই আকাশ কি টিকে থাকতে পারতো? অফুরন্ত অনুভূতির ভারে ভারাক্রান্ত আকাশ ভেঙে পড়তো না পৃথিবীর ওপর?

কিছু থাকে না।

মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না। বিধাতার গড়া যন্ত্রটা একবার ফেল করলেই সব শেষ।"

থাকে বরং মানুষের হাতে গড়া যন্ত্রের কারসাজি। মরে গেলেও কিছু রেখে দেয় সে।

ওর গাওয়া কোনো গান যদি রেকর্ড করা থাকতো, সেটা থাকতো, থাকতো ওর বলা কথা।

...নন্দিতা ভাবতে ভাবতে চমকে ওঠে।

সেদিন, সেই ঝড়ের রাতে তেমন একটা যন্ত্র যদি বসানো থাকতো ওঘরে? সে তাহলে সব কথা গড়গড়িয়ে বলে যেতো?

নন্দিতা যেমন করে বলে।

তারপর?

তারপর সেই শেষ আর্তনাদটা লেগে থাকতো যন্ত্রটায়।...

নন্দিতা জানলাটা বন্ধ করে দেয়।

নন্দিতা বিছানায় পড়ে নিজের কান দুটো চেপে ধরে!

না! নন্দিতার এখন আর কিছু করার নেই। আর ফেরার পথ নেই। নন্দিতা যদি নরকের দিকে পা বাড়িয়ে থাকে তো তার শেষটা দেখবে।

নন্দিতা কাল বলবে, 'মুকুলদা তোমার আবেদন পত্রটা রাখলাম, মঞ্জুরী স্বাক্ষরটা বসিয়ে দেব।'

কিন্তু সত্যিই যদি তেমন একটা যন্ত্র বসানো থাকতো সেদিন সেই ঘরটায়, সেই শুধু পারতো নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে। ভগবানও নাকি ঘুষ খেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বসতে পারেন। মানুষ তো ছার কথা। কিন্তু যন্ত্র কখনো ঘুষ খায় না!

সেই যন্ত্রের সাক্ষ্যে একটা খণ্ড বিচ্ছিন্ন কাহিনী সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারতো!

কিন্তু সে ঘরে কোন যন্ত্র ছিল না, ছিল শুধু দেওয়াল। যাদের কান আছে, কিন্তু মুখ নেই।

আচ্ছা, দেওয়ালের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা কি থাকে কারুর কারুর?

তারা তাই সেই অদৃশ্য অক্ষরে ছাপ পড়ে যাওয়া দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে? যেমন থাকছেন অজিতা দেবী।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে।

লোকে বলে উনি নাকি দেওয়ালের গায়ে রক্তের ছিটে খোঁজেন।

...হয়তো তা নয়, হয়তো উনি আস্তে আস্তে সেই লেখার পাঠোদ্ধার করেন।...

'মানুষটা বোধহয় আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছে—'

অজিতা দেবীর আত্মীয়েরা আড়ালে বলে।

বলে, পাগল হয়ে 'যাবেই তো! চেঁচিয়ে কাঁদলে বুক হালকা হয়। অতবড় শোক বুকে চেপে—তার ওপর আরো একটা শোক মজুত রয়েছে।'

আর নন্দিতার আত্মীয়রা বলে, 'কই, ওঁর ঠাকুর আর কাজে লাগছে না কেন? ঠাকুর ঘর ছেড়ে আজকাল এ ঘরে বসে থাকেন কেন উনি?'—

অথচ কথাটি ঠিক আছে।

কেউ যদি এসে বলে, 'কেমন আছেন?'

উনি বেশ সহজেই বলেন, 'ভালই আছি। রাঁধছি খাচ্ছি, হজমও করছি।'

কেউ যদি বলে, 'মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে দিচ্ছে না আপনাকে?'

উনি বলেন 'আমি তো যাইনি দেখা করতে!'

ঈশ্বর জানেন কী দিয়ে গড়েছেন ওঁকে। এমন নিঃসঙ্গ হয়ে বসে থাকতে ভালোও লাগে?

কিন্তু আজ হঠাৎ ইনি এঘরে এলেন। নন্দিতার ঘরে। সেই ঝড়ের দিন থেকে যে ঘরে আর ঢোকেননি।

যখন সেই প্রথম বাজটা পড়েছিল, ভয়ঙ্কর শব্দ করে? তখন অজিতা দেবী মিঠু একা ঘুমোচ্ছে ভেবে এঘরে চলে এসেছিলেন।...তারপর একটা উঁচু গলার হাসি শুনলেন, তারপর একটা উত্তেজিত আলোচনা শুনে উঠে গিয়েছিলেন। একে জামাই অভিমানী, তায় আবার কখনো থাকে না, তাই ভয় হয়েছিল তাঁর, কী হল হঠাৎ চড়া চড়া কথা বলছে কেন?...উঠে গিয়ে শার্সির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।...

সেই এঘর থেকে উঠে যাওয়া!

এতদিন পরে এঘরে এলেন।

নন্দিতা একা ছিল।

নন্দিতা বিছানায় শুয়েছিল। সে বিছানায় অজিতা দেবীর ছেলেও শুতো একদা। মিঠুর ছোটো খাটটা

তার পাশে জোড়া। মিঠু দিদিমার কাছে আছে বলে সেটাও শূন্য।

অজিতা দেবীকে ঘরে ঢুকতে দেখে নন্দিতা অবাক হলো, উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে মনকে শক্ত করে নিলো।...

জানে অজিতা দেবীকে বসতে বললেও এ ঘরে বসবেন না। আগেও বসতেন না। এঘরের বিছানাপত্র ছোঁয়া যাবার ভয়ে মা ঘরে ঢুকলে পার্থ চাদর পর্দা গুটিয়ে দিতো।

আজও বসলেন না।

নন্দিতা তাই দাঁড়িয়ে রইল।

নন্দিতা মনকে খুব শক্ত রাখতে চেষ্টা করলো।

আর কিছুই নয়, বৌয়ের কাছে মেয়ের সিঁদুরটা ভিক্ষে করতে এসেছেন। যে বৌয়ের সিঁথিটা ধুয়ে মুছে ফর্সা হয়ে গেছে। নন্দিতা মনে মনে জপ করতে লাগল, 'আর ফর্সাটা করেছে তোমারই ওই মেয়ের বর। অতএব আমি তোমার শত মিনতিতেও টলবো না।'

কিন্তু অজিতা দেবী কী মিনতি করতে এসেছেন?

অজিতা দেবী তো প্রথমে একটা সম্পূর্ণ অবান্তর কথা বললেন। 'মিঠু কী ওখানেই থাকবে?'

নন্দিতা শক্ত আছে, শক্তই থাকলো।

বললো, 'এখানে আনলে ওকে কে দেখবে?'

'তা বটে।' বললেন অজিতা দেবী।

কারণ নন্দিতার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুর। যে সুর নন্দিতার চির অভ্যাসগত।

তারপর অজিতা দেবী শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদের কোর্টে যেতে হবে শুনেছো বোধহয়?'

নন্দিতা তো শান্ত কণ্ঠই শুনতে অভ্যস্ত, তবু নন্দিতা চমকে উঠলে কেন? তারপব নন্দিতা সামলে নিল। জ্বালাভরা গলায় বললো 'শুনেছি।'

'সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।'

অজিতা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নন্দিতা বিস্ময়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু এই কথাটুকু বলতে এসেছিলেন উনি? আব কিছু নয়? আমাদেরও যে কোর্টে যেতে হবে এটা কি একটা নতুন কথা? যেতে হবার প্রস্তুতিই তো চলছে এতদিন ধরে।

নাঃ, অন্য মতলবেই এসেছিলেন, শুধু নন্দিতার কঠোর ভাব দেখেই সেটা বলতে পারলেন না।

কিন্তু ওঁর দৃষ্টি অমন তীক্ষ্ণ আর অন্তর্ভেদী দেখালো কেন? উনি কী নন্দিতার ভিতরটা পর্যন্ত পড়ে ফেলতে চান?..নন্দিতা যে একটু আগে মুকুল নামের একটা লোককে বিনা সম্বোধনে আর বিনা নামসইয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা কি উনি টের পেয়ে গেছেন? উনি কি বুঝতে পারছেন আমি আর ওঁর বাড়ির বৌযের পরিচয়ে এ বাড়িতে থাকবো না?...

আর একবার কেমন বুকটা কেঁপে উঠলো নন্দিতার।

তারপর নন্দিতা ভাবলো, আর ওঁকে আমার কিসের ভয়? ওঁর ছেলের মুখ চেয়ে একটু সমীহ করতাম, আর এখন একপাশে পড়ে আছেন—আমাকে ঘাঁটাতে আসেন না বলেই সয়ে আছি। কিন্তু ভয় করতে যাবো না কেন?

দাঁড়িয়ে ভাবছিল, ওর দাদা এলো।

বললো, 'বুড়ি এঘর থেকে চলে গেল মনে হল। এসেছিল নাকি?'

'হুঁ।'

'হঠাৎ? 'মতলব কি?

নন্দিতা খাটেব উপর বসে পড়ল। নন্দিতার রুক্ষ চুলগুলো সাপিনীর মতো দুলে উঠলো। নন্দিতার চোখ দুটি ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠলো। বললো, মতলব ভালো বলে মনে হলো না।'

'কেন? কেন?'

নন্দিতা তার দাদাকে বললো, 'ভেবেছিলাম বুঝি কাকুতি-মিনতি করতে এসেছেন, ঠিক তার উল্টো। যেন শাসিয়ে গেলেন।'

'শাসিয়ে গেলেন?'

'মানে ভঙ্গীটা তাই। বললেন, আমাদের কোর্টে যেতে হবে সেটা মনে করিয়ে দিতে এলাম।'

'তাই নাকি?' ওর দাদা চিন্তিতভাবে বলে, 'আজ পর্যন্ত বুড়ির ভাব বোঝা গেল না। আমার মন নিচ্ছে ও পক্ষ যা বলছে, উনি সেই কথাতেই সায় দেবেন। বলবেন—আত্মহত্যা।

নন্দিতা জ্বলে উঠলো।

'তার মানে ওঁর জামাই দিব্যি বেরিয়ে আসবে হাজত থেকে?'

'মানেটা তাই দাঁড়ায়। মায়ের সাক্ষী বড়ো জবর জিনিস।

ছেলের খুনীকে মা বাঁচাতে চেষ্টা করছে, এমন ঘটনা তো বড় ঘটে না। ঘটলে সমস্ত পৃথিবী ছি ছি করবে।'

'উনি পৃথিবীর ছি ছি-কারে ভয় করেন না।'

'আমার মনে হয়—' নন্দিতার দাদা বলে, 'তোর একবার এ বিষয়ে ফয়সালা করে নেওয়া উচিত। তুইও শাসিয়ে আয়, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার চেষ্টাটি যেন না করেন।'

নন্দিতাও তাই ভাবছিল।

ওঁর ভঙ্গী দেখে মনে হল যেন শাসিয়ে গেলেন। তার মানে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিলেন।

ঠিক আছে আমিও যাচ্ছি।

ঘরে পার্থর একটা ফটো ছিল, নন্দিতা সে ছবিটার মুখ উল্টে রেখেছিল।

নন্দিতা বলতো, 'আমার দেখতে কষ্ট হয়।'

আজ নন্দিতা হঠাৎ ছবিটার মুখ ঘুরিয়ে দিল। যেন কড়া গলায় বলে উঠলো, 'আমিও মানুষ, বুঝলে?'

তারপর এঘবে এলো।

সে ঘরের এককোণে একটা বেতের মোড়ায় চুপ কবে বসেছিলেন অজিতা দেবী দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে।

নন্দিতা ঘরে ঢুকেই উদ্ধত গলায় বলে উঠলো, 'আপনি তখন হঠাৎ ওভাবে চলে এলেন যে?'

অজিতা দেবী এই অকারণ ঔদ্ধত্যের দিকে তাকালেন। অজিতা দেবী আজকাল নন্দিতার এযাবৎকালেব সমস্ত অকারণ ঔদ্ধত্য, সমস্ত অভিযোগ, আর সমস্ত আচরণ অসন্তোষের মানে বুঝতে পারেন।

কাবণ অজিতা দেবী মুকুলকে দেখেছেন।

অজিতা দেবী স্থির গলায় বললেন, 'তোমার ঘরে তো আমি বসতে যাইনি বৌমা। শুধু ওই কথাটুকুই মনে কবিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।'

মনে করিয়ে দিতে?

নন্দিতা ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়, 'ওটা বোধহয় ভুলে যাবার কথা নয়!'

'না কথাটা ভুলে যাবার নয়—' অজিতা দেবী চুপ করে যান।

নন্দিতা এ ঘরটায় সহজে আসে না।

মিঠুকেও এ বাড়ি থেকে ভাগিয়েছে, আরো এই ঘবটার জন্যেই।

নন্দিতা দেয়ালটার দিকে তাকায় না।

নন্দিতা তীব্র রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে, 'আপনি কোর্টে কী বলবেন শুনি?'

অজিতা দেবী শান্ত গলায় বলেন, 'তুমি কী বলতে বলো?'

'আমি? আমি যা বলতে বলবো, তাই আপনি বলবেন?'

অজিতা ঠিক তেমনি স্থির গলায় বলেন, 'তা সত্যি কথাটা যখন বলা যাবে না, তখন যা হোক একটা

কিছু তো বানিয়ে বলতেই হবে।'

'ও বানিয়ে?' নন্দিতা যেন চণ্ডীমূর্তি ধরে, 'সত্যি কথাটা বলা যাবে না? চমৎকার! এই আপনার সাধন-ভজন, গুরু ইষ্ট? এই আপনার চিরদিনের সত্য ধর্ম? সত্যি কথাটা বলা যাবে না?'

অজিতা নিষ্পলক ওর ওই সাপের ফণার মতো রুক্ষ চুলের জটায় ঘেরা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি কী বলো? বলা সম্ভব?'

'তা' আপনার পক্ষে অসম্ভব বৈকি!' নন্দিতা ওর দৃষ্টি দেখেনি, নন্দিতা ওই রক্তের ছিটে লাগা দেওয়ালটায় চোখ পড়বার ভয়ে জানলার দিকে তাকিয়েছিল, এবার ওর চোখের দিকে তাকালো। ভয়ানক একটা অস্বস্তি অনুভব করলো।

অমন করে তাকাচ্ছেন কেন উনি? ভয়ের ভাব নেই, লজ্জার ভাব নেই, যেন ঘৃণা ধিক্কার আর ব্যঙ্গের ভাব।

...কেন? কেন?

ওঁর মেয়ে একবার সিঁথি শাদা হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার তাতে রঙের প্রলেপ দেবে না, এ বিশ্বাস আছে বলে...ইস্ এত বিশ্বাস!

বড়লোকের বাড়িতেই তো বড় বড় কেলেঙ্কারি ঘটে। লোহার গরাদের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে তারা বলে সেই কেলেঙ্কারীর শিকড় পাতালের নীচে আশ্রয় নেয়।

নন্দিতা আবার শক্ত হল, রূঢ় হলো।

'অসম্ভব হবে না? তা'তে যে আপনার নিজের মেয়ের স্বার্থহানির ভয়। সেই স্নেহে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপনার সত্য ধর্ম আর কাজে লাগছে না, কেমন?...আপনার ছেলের মুখটাও কি মনে পড়ছে না, আপনার ছেলের বৌয়ের শাদা সিঁথিটা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার এতদিনের ন্যায়ধর্ম সত্যধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে আপনার মেয়ের সিঁদুরটি কিনবেন, তাই না?'

নন্দিতা ঠোঁটটা কামড়ায়, 'আর তারপরে হয়তো আবার এই বাড়িতেই এই ঘরেই আপনার সেই আদরের জামাইকে ডেকে এনে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খাওয়াবেন!

'...অথচ—' নন্দিতা আরও একবার ঠোঁটটা কামড়ায়।

'অথচ আমাদের বাড়ির সবাই বলছে, 'ওঁকে আর উকিলে তৈরী করতে পারবে না। যে যাই বলুক, উনি ওঁর সত্যকেই আঁকড়ে বসে থাকবেন। উনি ছেলে হারিয়েছেন, আবার জামাইকে হারাবেন।' আর আপনি?'

ব্যঙ্গে ঠোঁটটা বেঁকে যায় নন্দিতার, 'আর আপনি স্বচ্ছন্দে বলছেন' সত্যি কথাটা তো বলা যাবে না। বানিয়ে কিছু বলতে হবে। চমৎকার! কিন্তু মনে জানবেন আপনার বানানো কথা কোনো কাজে লাগবে না, যা সত্য তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই।'

'তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই?' অজিতা দেবীর দৃষ্টি যেন তীব্র একটা সার্চলাইটের মত জ্বলে ওঠে, 'সেটাই তোমার ধারণা?'

নন্দিতার চুলগুলো আর এখন দুলে ওঠে না, নন্দিতার বুকটাই যেন দুলে ওঠে। তবু নন্দিতা হার মানে না। বলে, 'ধারণা বলে কিছু নেই, যা ঘটেছে সেটাই প্রমাণিত হবে।'

অজিতা দেবী গম্ভীরভাবে বলেন, 'তোমার অনেক বাচালতা সহ্য করেছি বৌমা, আর পারছি না। এবার থামো।'

'থামবো? ঠিক আছে থামছি—'

নন্দিতা ঠিকরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হচ্ছিল, অজিতা দেবী ডাকলেন, বললেন, 'বৌমা শোনো, আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, বেশী হৈ চৈ করতে যেও না। ওরা যা বলছে, সেটাই মেনে নাও। আমিও জানবো সে আত্মহত্যাই করেছে।'

নন্দিতা থমকে দাঁড়ায়।

নন্দিতা যেন ঢাল হাতে করে নতুন করে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে, 'ওঃ,। উপদেশ! বলতে হবে আত্মহত্যা! তার মানে তখন আমায় নিয়ে টানাটানি পড়বে! একটা সহজ সাধারণ লোক যদি আত্মহত্যা করে, তার মাকে কেউ কিছু বলতে আসে না, স্ত্রীকে নিয়ে দায়ী করতে বসে জানেন বলেই, এই উপদেশ কেমন? তার মানে আপনার মেয়ে জামাই, মান সম্মান, সবই বজায় থাকলো, শুধু আমারই—'

অজিতা দেবী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

তীব্র গলায় বললেন, 'বৌমা একবার বলছি, আবারও বলেছি তোমার অনেক বাচালতা সহ্য করেছি, আর নয়। ঠিক আছে তুমি যখন হঠাৎ এত 'সত্যের ভক্ত' হয়ে উঠেছো তো আদালতে দাঁড়িয়ে আমি সত্যি কথাই বলবো...আর সেই সত্যিটা কি তা' তুমিও জানো, আমিও জানি। জ্ঞান হারাবার আগে, আমার জ্ঞান চেতনা সবই ছিল।'

অজিতা দেবী চলে গেলেন।

কিন্তু নন্দিতা? নন্দিতা যে চলে যেতে পারছে না। নন্দিতাকে কে এখানে পুঁতে রেখে গেল? অজিতা দেবী? তাঁর সাধন শক্তির বলে।

না কী ওই দেওয়ালগুলো!

ওরা কি হঠাৎ বাক্‌শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। তাই নন্দিতাকে চেপে ধরে বসিয়ে শোনাতে চাইছে ওদের রেকর্ড করে নেওয়া কথা আর শব্দ।

ওরা তাহলে বলছে—'আরে শোনো নন্দিতা, শোনো! তাহলে সেই প্রথম বাজের শব্দটা থেকেই শোনো।...শুনতে পেলে? আহা ও কি এখনি কান চেপো না, তা হলে বাকিগুলো শুনবে কি করে।

বাজের শব্দের পর ভারতী নামের সেই মেয়েটা বললো না, আমার ভালো লাগছে না, শুতে যাই বাবা।' বললো—চলে গেল। ওর বরেরও ইচ্ছে করছিলো ওর পিছু পিছু যেতে। তার চোখে সে বাসনা ফুটে উঠেছিল, কিন্তু তুমিই তাতে বাদী হলে। তুমি বাচাল হাসি হেসে বলে উঠলে, 'থাক্ মশাই, এখুনি আর গিন্নির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে না। আর একটু খেলা চলুক।'

তার মানে সে রাত্রির সেই ঝোড়ো হাওয়ার আর গভীর রাত্রির স্বাদ তোমাকে উত্তাল করে তুলেছিল, তোমাকে মাতাল করে তুলেছিল। সেই উত্তাল মাতাল মন নিয়ে তোমার ইচ্ছে করছিল না সেই তোমার আকর্ষণহীন, আর অভ্যাস-মলিন নিত্যশয্যায় গিয়ে গোয়ালার দুধের মত বিস্বাদ আর জোলো একটা বাহুপাশে ধরা দিতে।...ওই জোলো বিস্বাদের স্বাদ তোমার মনকে ক্রমশঃই বুঝি ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু করে তুলছিল। তাই সে রাত্রের সেই বৈচিত্র্যের মাদকতা তোমাকে বিহ্বল করেছিল।

হোক বোকা, হোক বাজে, তবু তো একটা অন্য পুরুষ, যার সামনে নিজেকে বিকশিত করতে পারছে নন্দিতা, নিজেকে আকর্ষণীয় রূপ দিতে পারছে। ওই তো মোটা-গোটা পান গালে দেওয়া বৌ ওর। ও অন্ততঃ দেখুক নন্দিতাও কম নয়। নন্দিতা শুধু রান্না আর ঘরকন্নার মধ্যেই বিক্রীত নয়। নন্দিতার শ্বাশুড়ীর উপস্থিতিতেই তোমরা নন্দিতাকে দেখো, এমন উল্লাসময়ী রূপটা তো দেখতেই পাও না।...

এই রকমই একটা ভাবনা তোমাকে তখনও সেখানে আটকে রেখেছিল, তাই নয় কি!

তাই তুমি বললে, 'আর একটু খেলা চলুক।'

কিন্তু তোমার সেই জোলো দুধের মত স্বামী? সে তোমার ওই উল্লাসময়ী রূপকে গ্রহণ করতে পারলো না! মুগ্ধ হলো না— পুলকিত হলো না, চেয়ারের পিঠে পিঠ হেলিয়ে আলগা গলায় বললো; 'তিনজনে কি খেলা হয়? কে কার পার্টনার হবে? খেললে গোলাম চোর—'

'ঠিক আছে, তুমিও তোমার বোনের মত ঘুমোওগে—।'—নন্দিতা তুমি ঝল্‌সে উঠেছিলে ওই দুঃসাহসিক কথাটা বলে, 'আমবা তাসের ম্যাজিক করি।'

কিন্তু তোমার বর শুতে যায়নি।

তোমার বর সেই চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসেছিল অলস ভঙ্গীতে। তার মানে তোমার বর তোমায় বিশ্বাস করতো না। অথবা তার সেই জমিদারের রক্তধারাবাহী ভগ্নিপতিকে।...বলা শক্ত কার প্রতি অবিশ্বাসের

বশে সে বসেই থাকলো। নইলে তুমি তো আরও একবার বলেছিলে, 'বসে বসে হাই তুলে আর কি হবে? যাও না, নাক ডাকাও গে না?'

তারপর?

তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে নন্দিতা, রাজেন নামের লোকটা দিব্যি ম্যাজিক করতে লাগলো তাস নিয়ে।... মনে ভাবা তাস বলে দিল, তুলে নেওয়া তাস না দেখে বলে দিল, তারপর আরও একটা অদ্ভুতকাণ্ড করলো, তোমার হাতের একখানা তাস দু'খানা করে দিল।

তুমি তখন বেহায়া হলে, বাচ্চা মেয়েদের মত হেসে গড়িয়ে পড়ে হৈ চৈ করে বললে, 'নিশ্চয় তুমি আর একখানা হরতনের বিবি পকেটে লুকিয়ে রেখেছিলে, এখন হাত সাফাই করে—'

রাজেন পান খাওয়া মুখে ছ্যাব্‌লা হাসি হেসে বললো, 'বিবিকে কি আর পকেটে পুরে রাখা যায় বৌদি? তাও আবার 'হার্ট' এর! ...কী বলেন দাদা? আপনার কী মত? যায় রাখা?'

এই সস্তা রসিকতাটুকু করেই সে বোধহয় আর একটা খেলার জন্যে তাস গোছাতো, কিন্তু তুমি? নন্দিতা তুমি কি করলে? বেহায়াপনার একটা সুযোগ পেয়ে 'দেখি তো কেমন যায় না? রক্ত মাংসের বিবিকে না যাক, তাসের বিবিদের নিশ্চয়ই যায়—' বলে হাসিতে ভ্রুকুটিতে বিশেষ একটি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে ওর ট্রাউজার্সের পকেট হাতড়াতে গেলে! তোমার শালীনতা সভ্যতায় বাধলো না।... বাধলো না, কারণ তোমার নিয়তি তখন তোমাকে নিয়ে তাসের বিবির মত ম্যাজিক করছে।...

তাই তুমি চমকে শিউরে সেই ভারী-ভারী ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা অস্ত্রটা ওর পকেট থেকে বার করে ফেলে বললে, 'এর মানে?'

তোমার ওটা হাতে করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দুটো লোকই 'হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, একথা নিশ্চয়ই মনে আছে নন্দিতা?

রাজেন বলে উঠেছিল, 'আরে আরে রাখুন রাখুন—'

আর পার্থ বলে উঠেছিল, 'এই নামাও নামাও, টেবিলে নামিয়ে রাখো।'

যেন তুমি হাতে করে একটা জ্বলন্ত আগুনের টুকরো ধরেছ, যেন তোমার হাতটা পুড়ে যাবার ভয়ে ওরা—

কিন্তু তুমি ওদের কথা শুনলে না।

তুমি জিনিসটাকে বেশ বাগিয়ে ধরে হাতেই রেখে বললে, 'রাখবার আগে এর মানেটা জানতে চাই।'

রাজেন কিছু বলার আগে পার্থ বলেছিল, 'মানে আর কি, রাজা রাজড়াই চাল! কেন, তুমি জানো না ওর ওই রাজাই শখটি? কথায় কথায় কোষ থেকে তলওয়ার বার করার রক্ত আর কি। ...কিন্তু তুমি ওটা টেবিলে রাখো নন্দিতা, খুব সম্ভব 'লোড্' করাই আছে।'

এই—এই পর্যন্ত কী মধুর সুন্দর আর কৌতুকময় পারিবারিক আবহাওয়া বইছিল সেখানে, ভেবে দেখো নন্দিতা। ... তুমি যদি তখন ওদের কথা শুনতে, যদি ওটা নামিয়ে রাখতে, আবার জিনিসটা রাজেন নামের লোকটার ট্রাউজার্সের পকেটে ঢুকে যেতো।

ব্যস, সব ঠিকঠাক থাকতো।

কিন্তু নন্দিতা, আমরা দেওয়ালেরা তাকিয়ে দেখছিলাম একটা কিছু বেঠিক করে বসবার জন্যেই যেন তোমার রক্তে মাতলামির বান ডেকেছিল। তাই যখন রাজেন বললো, 'লোড্ করা নয়তো কি আর ফাঁকা? সঙ্গে রাখবো না? দেখুন না কেন, আমার এই হীরের আংটি, হীরের বোতাম, আর ঘড়িটা মিলিয়ে চাব পাঁচ হাজারের কম নয়, আর আপনার বোনের গায়ে তো কথাই নেই। জানি না হাজার দশেক কিনা। হঠাৎ যদি রাত-বিরেতে গুণ্ডাতে গাড়ি ঘেরাও করে?'

'করলে তুমি তাদের গুলি করবে?'

নন্দিতা ঠিকরে উঠেছিল।

রাজেন অহঙ্কারের তেলালো মুখ নিয়ে বলেছিল, 'করবো না? গুলি করতে করতে যাব।'

'বাঃ বাঃ। ঠিক ডিটেক্‌টিভ গল্পের হিরোর মত।' নন্দিতা, তুমি বলে উঠেছিলে, 'তুমি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি। মানুষ খুন করতে পারো। থাক্ এটা তাহলে আমার কাছে। কি জানি, মাঝরাত্রে শ্বশুরবাড়ির বিছানায় ছারপোকার কামড় খেয়ে মাথায় খুন চেপে যাবে কিনা তোমার।'

নন্দিতা, এ পর্যন্তও বেশ ছিল, এখন যদিও একটু বাধ্য হতে, হয়তো তুমি চিরটা দিন একটি সৎ মিষ্টি লক্ষ্মী বৌ হয়ে কাটিয়ে দিতে পারতে। কিন্তু তখনও তুমি অবাধ্যতা করলে, রাখলে না। তার কারণ ওই নিষিদ্ধ বস্তুটার স্পর্শস্বাদ তোমায় রোমাঞ্চিত করছিল, তোমায় মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিল। তাই তুমি বললে, 'থাক্ আমার কাছে, কাল সকালে যাবার সময় ফেরত দেব।'

রাজেন তখন হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠলো। সেকথাটা বোধহয় ভুলে যাওনি নন্দিতা? রাগ রাগ লাল লাল মুখে সে বললো, 'আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন?'

পার্থ বললো, 'কী ছেলেমানুষী সুরু করলে তোমরা দু'জনে? জিনিসটা কাড়াকাড়ি করবার জিনিস নয়, তাই তোমায় অনুরোধ করছি নন্দিতা ওটা হাত থেকে নামিয়ে রাখো।'

তখন? তখন তুমি কী বললে মনে আছে?

তুমিও রাগ রাগ মুখ করে বললে, 'আমিও তবে ঠাকুর জামাইয়ের কথাটাই বলি—তুমি কি আমায় সন্দেহ করছো?'

'চমৎকার। ভালো এক জিনিস বার করলে রাজেনের পকেট হাতড়ে—'পার্থ বলে, 'রাজেন দেখছো—?'

রাজেন গম্ভীর ভাবে বললো, 'দেখছি।'

তার মানে রাজেনের তখন সন্দেহ হচ্ছে নন্দিতা ওকে সন্দেহ করেছে। নীরেটদের যা হয় আর কি!

তখন বোধকরি আবহাওয়া হালকা করতেই পার্থ হেসে বললো, 'তোমার বৌদিকে 'এন. সি. সি.'তে ভর্তি করে দেওয়া হোক এবার, কি বল, রাজেন? বেশ বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনা দেখাচ্ছে, তাই না?'

রাজেন বললো, 'হুঁ।'

তারপর হঠাৎ বোধকরি পার্থরই ঘাড়ে তার নিয়তির ভূত চাপলো। সে হঠাৎ বলে উঠলো, 'আচ্ছা রাজেন' তুমি 'সরযূ' বলে কোনো মেয়েকে চেনো? রাজেন চমকে উঠলো, রাজেনের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

রাজেন আগে থেকেই একটু গুম হয়ে গিয়েছিল, তাই সেই ভাবেই বললো, 'আপনার একথার মানে?'

তোমার স্বামীর মুখে হঠাৎ একটা অজানা মেয়ের নাম শুনে তুমিও চমকে উঠলে নন্দিতা, সেটা হয়তো তুমি টের পাওনি। কিন্তু গিয়েছিলে! উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলে পরবর্তী কথাটা শোনবার জন্যে।

পার্থ বলেছিল, 'কী আশ্চর্য, তুমি এতে রেগে যাচ্ছো কেন? আমার একজন ডাক্তার বন্ধু বলছিল—'

'কী বলছিল আপনার বন্ধু? আমি সরযূ টরযূ-কাউকে চিনি না।'

রাজেন চেঁচিয়ে উঠলো।

পার্থ অবাক হলো, বললো, 'এত উত্তেজিত হবার কী আছে?'

এটা কিন্তু পার্থর একটা ছলনা হয়েছিল। প্রশ্নটায় যে উত্তেজনাকর কিছু ছিল, তা' সে একেবারে বুঝতে পারেনি তা নয়। পার্থ বিশ্বস্ত ছিল, তাই নিশ্চিন্ত ছিল। অতএব পার্থ একটু সরলতার ভান করে বলেছিল, 'উত্তেজিত হবার কী আছে? বন্ধু বলছিল, সে নাকি একটা সরযূ নামের রোগিণীকে দেখতে গিয়ে তার ঘরে তোমার ছবি দেখেছিল। আর পাড়াটা নাকি ভালো নয়। আমি তো বিশ্বাস করিনি, কি দেখতে কি দেখেছে কে জানে।... ও অবশ্য খুব জোর দিয়ে বলছিল, 'তোমার ভগ্নিপতিকে আমি চিনি। কতবার দেখেছি।'

পার্থ হয়তো ভেবেছিল, এই ভাবেই তার ছোট বোনের বরকে একটু সাবধান করে দেবে। তাই পার্থ কৈফিয়ৎ তলবের ভঙ্গীতে না বলে, এই রকম অলসভাবে বলেছিল।

রাজেন কিন্তু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কারণ রাজেনের মনে পাপ ছিল। তাই সে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, 'বাঃ বাঃ চমৎকার দাদা। বেশ বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছেন তো? তা' বন্ধুটি নিশ্চয় ওসব পাড়ায় একা যান না, আপনাকেও সঙ্গী করেন? প্রাণের বন্ধু যখন।'

বড়লোকের দুর্বিনীত ছেলে, এই রকমই কথাবার্তা ওর। নিজের সহোদর ভাইকেই ও রাতদিন বলে—'শালা হারামজাদা।'

কিন্তু পার্থরা এতে অভ্যস্ত নয়।

আর পার্থ হঠাৎ এ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই পার্থ যেন চাবুক খাওয়ার মত ঠিকরে উঠেছিল চেয়ার থেকে। তার আর একটু পরেই সেই চেয়ারটার উপর ঢলে পড়েছিল সে।

কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

আর বলে উঠেছিল, 'শাট্ আপ।'

কিন্তু তুমি নন্দিতা, তুমি তো এই আবহাওয়াটা ভাল করে তুলতে পারতে? তুমিও তো বুদ্ধিমতীর মত বলতে পারতে 'দুজনে মিলে কী ছেলেমানুষী সুরু করলে তোমরা।'

তা' নয়, তুমি ধিক্কারের গলায় বলে উঠলে,—'বাঃ ঠাকুর জামাই। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হয়?' এখন ধরা পড়ে চোখ রাঙানো। বলে দেব ভারতীকে। ছিঃ ছি। তুমি না একজন বিবাহিত লোক। তোমাতে সমর্পিত প্রাণ সেই স্ত্রীকে লুকিয়ে তুমি অন্য মেয়েকে ছবি উপহার দিতে চাও। তাও খারাপ পাড়ার মেয়ে। ছিঃ।'

হাতের সেই অস্ত্রটা, যেটাকে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে লোফালুফি করছিলে তুমি, সেটার জোরেই কি তোমার এত সাহস বেড়ে উঠেছিল নন্দিতা? তাই রাজেনের মত একটা গোঁয়ার লোককে অমন কথা বলতে সাহস করেছিলে।

রাজেন তোমাকেও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

হয়তো খুব অপমানজনক কিছু!

তাই হয়তো তোমার স্বামী তোমার সম্মান বাঁচাতে গেল। তাই হঠাৎ প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে তোমার দিকে ফিরে বসলো।...পার্থর মুখটা তখন কেমন একরকম ব্যঙ্গে যেন বেঁকে গেল। আর সেই বাঁকা মুখে বাঁকা মত হাসি হেসে বলে উঠলো সে, 'বিবাহিত লোকের একরকম অধঃপতন দেখে তুমিও অবাক হচ্ছো নাকি নন্দিতা কিন্তু তোমার তো অবাক হবার কথা নয়?'

পার্থর মুখে এমন হাসি কি তুমি এর আগে কখনো দেখেছিলে নন্দিতা? দেখনি। তার মানে সে রাত্রে তোমার বাচালতা আর অবাধ্যতা পার্থকে ধৈর্যচ্যুত করে তুলেছিল। তাই পার্থ ওই পোজ্‌টা নিয়েছিল।

তুমি তখন ওই রাজেনটার মতই ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বললে 'তার মানে?'

'মানে অতি প্রাঞ্জল—' পার্থ অবহেলার গলায় বললো, 'তুমিও অবশ্যই একটি বিবাহিত 'ব্যক্তি'। অথচ তুমিও আর একটি ব্যক্তিকে শুধু ছবিই নয়, রাশি রাশি চিঠিও উপহার দিয়ে থাকো। ... ও কি ওটাকে নিয়ে অত নাড়াচাড়া করছো কেন? দাও তো আমায়—দাও দাও আ—আঃ।'

কি হলো নন্দিতা, দু'হাতে কান ঢাকছো কেন? সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা শুনতে পেলে বুঝি? কিন্তু কান চোখ দুটো জিনিস ঢাকবে কি করে? ওঃ চোখ বুজছো? কিন্তু চোখ বুজেও কি তুমি সেই ছায়াটা এড়াতে পারবে? সেটা তোমার মাথার মধ্যে, তোমার চেতনার মধ্যে এঁটে বসে নেই? পার্থ নামের সেই নিয়তির শিকারটাব চেয়ারে এলিয়ে পড়ার দৃশ্যটা?

জিনিসটা কি ও কেড়ে নিয়েছিল?

না চেয়েছিল বলে তুমিই উপহার দিয়ে বসেছিলে?...

কি? তুমি নিজেই জানো না সেটা?

কিন্তু আমাদের কেন মনে হয় বলো তো, তুমি বুঝি জানো।... কি জানি, আমাদের তো চোখ নেই, শুধু অনুভব আছে। সেই অনুভবের বশেই আমরা বিস্ময়ে আর কুল পাইনি যখন নিজে তুমি 'খুন খুন,

খুন করলো! শেষ করে ফেললো—' বলে দাপাদাপি করে বেরিয়েছিলে ঘরে থেকে দালানে।...

মনে পড়ছে না তোমার নন্দিতা সেটা?

তোমার শাশুড়ী শ্রীমতী অজিতা দেবী যে তখন সিঁড়ির ওই মাঝখানের জানলা থেকে নেমে ছুটে এসে বৌমা বলে চীৎকার করে উঠে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেটা মনে নেই? তবু তুমি আজ তাঁকে শাসাচ্ছিলে! কারণ তুমি বিশ্বাস করো একটা 'হ্যাঁ' কে লক্ষবার 'না' বললে, সেটা না হয়ে যায়।

কান থেকে হাত খোলো নন্দিতা। নইলে তুমি সেই রাজেনের চীৎকারটাও যে শুনতে পাবে না। একটা বিস্ময়ের চাবুক খাওয়া আর্তস্বর।...

তারপর অনেক চীৎকার, অনেক স্বর হয়তো গুলিয়ে ফেলতে পারো তুমি। কিন্তু তার আগে যখন ঘরে তোমরা তিনজন মাত্র ছিলে, তখনকার ঘটনা তো গুলিয়ে ফেলবার কথা নয়?

যদিও রাজেন হতভাগা গুলিয়ে ফেলছে। সে ভাবছে—সেই 'শাট্ আপ'-এর পরই তাহলে ঘটনাটা ঘটে গেছে। তাই সে কপালে করাঘাত করে ফাঁসির দিন গুনছে।

তবু হচ্ছিল তো যাহোক!

জগতের লক্ষ লক্ষ আত্মহত্যার ঘটনার সঙ্গে পার্থর ঘটনাটাও না হয় যোগ হতো। তুমি আরো নিশ্চিন্ত হতে চাইলে কেন? ...তোমার বুঝি ভয় হলো, রাজেনের মাথাটা চিরদিন ঘুলিয়ে থাকবে না। তোমার খেয়াল হলো, রাজেন দেওয়াল নয়, তাই না? তাই তুমি দ্রৌপদীর মত সেদিন থেকে আর চুল বাঁধলে না, ওই রুক্ষ চুলগুলিকে সাপের ফণার মত করে তুলে, আর দু'চোখে আগুনের ঢেলা জ্বেলে 'পাপীর উচিত শাস্তির' জন্যে যুদ্ধে নামলে। ভাবলে সেটা ঘটিয়ে তুলতে পারলেই তোমার শান্তি।

কিন্তু আজ টের পেলে তো, দেওয়ালও কখনো কখনো কথা বলে।

আর সেদিনও বুঝেছিলে, কোনো গোপনতাই গোপন থাকে না। একটুকরো চিঠিও একটা মশাল হয়ে উঠে ঘর পোড়াতে পারে। অথচ তার আগে পর্যন্ত তুমি ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলে গোপন জিনিস গোপনই থাকে।

নন্দিতা আমরা তুচ্ছ দেওয়াল, তবু জানি, তারপর তুমি একদিন তোমার স্বামীর ছবিটার কাছে গিয়ে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলে, 'তা' হলে তুমিই বা কেমন মহাপুরুষ? জেনে শুনে অসতী স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করছিলে? পাকা অভিনেতার মত সুখী সন্তুষ্ট স্বামীর ভূমিকা প্লে করছিলে। আমিও তা'হলে তাই করেছি। অভিনয় করেছি। বেশ করেছি।'

তারপর ছবিখানা তুমি দেওয়ালের দিকে মুখ করে ঘুরিয়ে দিয়েছিলে। তোমার বোন এসেছিল, ভেবেছিল ঝড়ে উল্টে গেছে, 'আহ' বলে উল্টে দিচ্ছিল, তুমি বললে, 'থাক, দেখতে পারি না, কষ্ট হয়।'

আমি জানি কষ্ট নয়, ভয় হয়।

অথচ নামিয়ে দিতেও সাহস হয় না। সর্বদা এই আতঙ্কের মধ্যে থাকতে থাকতেই তুমি 'পালাই পালাই' করছো, তুমি তোমার বাল্যবন্ধুর দিকে হাত বাড়াচ্ছো।

আর তোমার যে এত বুকের পাটা, সে ওই ভয় থেকেই। ...ভয়ই সাহসের জন্মদাতা এই হচ্ছে সার কথা।

বুঝতে পারছি নন্দিতা, তুমিও নিয়তির শিকার, তুমিও ভাগ্যের হাতের পুতুল। সে রাত্রে যদি ওই ঘটনাগুলো না ঘটতো, এসব কিছুই হতো না। নিশ্চয়ই তোমার এই ঘরে তুমি আগ্নেয়াস্ত্র খুঁজে বেড়াতে না, তুমি চায়ের পেয়ালায় বিষ মেশাবার কথাও চিন্তা করতে বসতে না। তুমি হয়তো শুধু দিন দিন আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে, দিন দিন আরো মেজাজি।

এর বেশী কিছু নয়।

ছবি, চিঠি, সবই ক্রমশঃ ছেলেমানুষী হয়ে আসতো তোমার কাছে, কাজেই সাধ্বী স্ত্রীর তালিকা থেকে তোমার নাম খারিজ হয়ে যেতো না।

কিন্তু তুমি নিয়তির শিকার হলে।

কারণ সেই রাত্রে একটা তছ্‌নছ্‌ করা ঝড় উঠলো।

তবু বলি নন্দিতা, রাজেন নামের ওই হতভাগ্য লোকটাকে তুমি বাঁচাতে পারতে, নিতান্ত অসার হয়েও যে লোকটা দু' দুটো মেয়ের জপমন্ত্র। কিন্তু তুমি তাকে বাঁচাচ্ছো না, সে চেষ্টাও করছো না, তুমি একটা গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ে তাকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেবার জন্যে তোমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করছো।

আগামীকাল এ নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

তারপর যবনিকা পড়বে।

আগামীকাল বোঝা যাবে ওই নৃশংস হত্যার নায়ক রাজেন্দ্রভূষণ সেই মৃত্যুর গহ্বরেই তলিয়ে যাবে, না অন্য এক মৃত্যুর অন্ধকার পুরীতে বসে আয়ুর দেনা শুধতে শুধতে ক্রমশঃ মানুষ নাম থেকে খারিজ হয়ে জন্তু হয়ে যাবে।

আগামীকাল জানতে পারা যাবে সে খবর।

'আগামীকাল জানতে পারা যাবে এ খবর—' আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন অজিতা দেবী, এ বাড়িতে আরও একটা খুনের ঘটনা ঘটছে এই রাত্রে।'

উচ্চারণ করলেন তাঁর চুড়োবাঁশীধারী 'মুরলীধরের' সামনে।

খুব আস্তে আর কঠিন গলায় বললেন, 'সংসার থেকে পালিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম এই আশ্রয়কেই সত্য করে তুলবো। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো দেবে সে আশ্রয়, কিন্তু—তুমি সে বিশ্বাস ভেঙে চুরমার করে দিয়েছো।

হ্যাঁ, তোমার ওপর থেকে আমার রুচি চলে গেছে, তাই আমার পাপ পুণ্যের হিসেবও হারিয়ে গেছে। তাই আমিও একটা হত্যাকাণ্ডতে আর ভয় পাচ্ছি না।

যদি এটা না করি, তাহলে আমাকে কাল আদালতে দাঁড়িয়ে আমার পার্থর মৃত্যুর ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খ করে আঁকতে হবে। কারণ আমার বৌ, যাকে আমি একদিন বরণ করে ঘরে তুলেছিলাম, সে আমাকে শাসিয়ে গেছে 'সত্যি' কথা বলতে হবে।

অথচ সত্যিকার সত্যি বলবার উপায় নেই আমার।

অজিতা দেবী উঠে দাঁড়ালেন, ছোট্ট ঘরটা থেকে ছটফটিয়ে বেরিয়ে এলেন খোলা ছাদে। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেন অবাক হয়ে গেলেন। আশ্চর্য, আশ্চর্য বিধিলিপি আমার! আমার জানিত, আমার পরিচিত, আমার সমাজের আর কারুর জীবনে কখনো এমন ঘটনা ঘটেছে?

সুদূর অতীতের দিকে চোখ ফেললেন অজিতা দেবী।

কোথাও কোনোখানে না।

ভয়াবহ মৃত্যুশোক দেখছেন, অকস্মাৎ এ্যাকসিডেন্টে এক মুহূর্তে ফুরিয়ে যেতে দেখেছেন, দাঙ্গার সময় গুণ্ডার ছুরিতে শেষ হয়ে যাওয়া তাঁর পিসতুতো ভাইকে দেখেছেন, কিন্তু এমন ঘটনা দেখেননি। অজিতা দেবীর জীবনটা তা'হলে একটা বিস্ময়? একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর নাটক?

অথচ আমি আমার মত আর সকলের মতই, ছেলেবেলায় 'পুণ্যিপুকুর' করেছি, 'হরিরচরণ' করেছি, কল্যাণী বধূর মূর্তিতে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাদীপ দিয়েছি, তুলসী গাছে জল দিয়েছি। আমি রেঁধেছি বেড়েছি—-স্বামীর ঘর করেছি, স্বামীকে যে ভাল না বাসাও চলে, তা' জানতাম না বলে ভালও বেসেছি, আমার কেন 'মৃতবৎসা' রোগ হয়েছিল, সে কথা চিন্তা করিনি। কেন জানি না সেই রোগের নিষ্ঠুরতার ভিতর থেকে হঠাৎ করে ঈশ্বরের করুণার মত দুটি সন্তানকে আমি এই পৃথিবীর উপস্বত্ব ভোগ করতে দিতে পেরেছিলাম।

আমার পার্থ আব ভারতী।

ওরা কি করে বাঁচলো, কি করে সুস্থ স্বাস্থ্যে ভরা জীবন পেলো, সে কথা আমি বুঝিনি, ঈশ্বরের দয়া ভেবেই কৃতজ্ঞ হয়েছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কেন অমন অলৌকিক ঘটনাটা ঘটেছিল তখন।

ওরা ঘোরালো করে মরবে বলে।

ওদের মৃতবৎসা মার অনেকগুলো সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবার আগে অন্ধকারে তলিয়ে গেছে বলে তাঁর বড় আক্ষেপ ছিল, ওরা সেই আক্ষেপ ঘোচাবে বলে আলো দেখলো, পৃথিবীর বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো, কিছুদিন তার উপস্বত্ব ভোগ করলো, তারপর প্রস্তুত হলো হাজার হাজার লোক জানিয়ে সমারোহ করে মরতে।

তাদের মায়ের আক্ষেপ ঘোচাতেই তাহলে! না হলে এমন অর্থহীন ঘটনার কোনো অর্থ করা যায়?

পার্থ তার কাজ সেরে ফেলেছে, ভারতীও এগোচ্ছে। ভারতী সে কথা লিখেছে—'এমন একটা মেয়েমানুষকে তুমি এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে দেখছো মা, যার স্বামীর ফাঁসি হয়ে গেছে?'

হ্যাঁ, ভারতীর চিঠিটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। পোষ্টে পাঠায়নি, পাছে মারা যায়। এ বাড়ির লেটারবক্সের চাবি তো তার পরম শত্রুর হাতে।

লোক দিয়ে চুপিচুপি পাঠিয়েছে চিঠিটা।

হ্যাঁ, লোক দিয়েই পাঠিয়েছে ভারতী, চিঠিটা চুপি চুপি। ওর ওই হিতৈষী ভাসুরদেরও জানায়নি। কারণ ভারতী এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না ওঁরা সত্যি হিতৈষী কিনা!

না, শেষ রায় বেরোনোর আগে পর্যন্ত ভারতী কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না।

রাজেনের দাদারা যখন রাজেনের জন্যে ছুটোছুটি করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, আর পায়ের রক্ত মাথায় তুলছে, ভারতী তখন, তাদের সেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তোলার দৃশ্যটা মনে করছে।

আর নিজের নীচতায় লজ্জিত বোধ করলে নিশ্বাস ফেলে ভাবছে, ও যদি আমার দাদার বুকে গুলি বিঁধে দিতে পারে, তা'হলে 'বিশ্বাস' কথাটা আমি রাখবো কি করে? তাই ভারতী কাঁটা হয়ে আছে, কি জানি কোর্টে দাঁড়িয়ে ওরা এতদিনের শত্রুতার শোধ নিয়ে বসবে কিনা। বলে বসবে কিনা, 'জানি আমরা, আমাদের এই ভাইটি বরাবরই হিংস্র প্রকৃতির। কাজেই তার পক্ষে—'

ভারতী তার মাকেও বিশ্বাস করছে না, তবু ভারতী মার মন গলাতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে চিঠি লিখেছে। লিখেছে... 'মা তুমি কি শুধুই তোমার 'সত্য ধর্মের' মুখ চাইবে! তোমার দুর্ভাগিনী মেয়েটার মুখ চাইবে না? তোমার সেই মেয়ে, তোমার ভারতী তোমার কাছে তার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের লোহাটুকু ভিক্ষে চাইছে। মা গো, মা হয়ে সেটুকু কি তুমি দেবে না? তোমার কথায় তোমার মেয়ের হয়তো সব বজায় থেকে যায়। সেই মিথ্যে কথাটুকুতে কী হবে তোমার? নরকে যাবে? কিন্তু যখন তুমি দেখবে তোমার সেই নরকের ভয়টুকুর জন্যে একটা প্রাণ শেষ হয়ে গেল, (আর একটা প্রাণও থাকবে না! এমন একটাও মেয়েমানুষকে কি তুমি এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছো মা যার স্বামীর ফাঁসি হয়ে গেছে!) তখন? নরক যন্ত্রণার হাত এড়াতে পারবে তুমি? আমার মনে কি হয় জানো মা? আমার কোটি জন্ম নরকবাসের বিনিময়ে যদি ওর প্রাণটা রক্ষা করা যেতো তো, এক মিনিটও ভাবতাম না আমি। সে নরক মাথায় করে নিতাম।...

মা, তবু পৃথিবীর সমস্ত মায়ের দোহাই, আর সমস্ত মেয়ের দোহাই, তুমি তোমার মেয়ের সেই প্রাণটার কথা একবার ভালো করে ভাবো।...

বুঝতে পারছি এ কথা বলাটা আমায় ধৃষ্টতা, তুমি যদি প্রশ্ন করো, 'কি রে তোর দাদার মুখটা তোর একবারও মনে পড়ছে না?' তার উত্তর দেবার মুখ আমার নেই। কিন্তু দাদার মুখকে আমি মনে আসতে দিচ্ছি না মা, আমি স্বার্থে পিশাচী হয়ে গেছি। ...মা তবুও বলি—ওর ফাঁসি হলে তো তোমার ছেলেকে তুমি ফিরে পাবে না! শুধু তোমার আর যে একটা সন্তান এখনো রয়েছে পৃথিবীতে, তাকেও হারাবে।... শোকের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ, কিন্তু লজ্জা? অপমান? কলঙ্ক?' আরো কত কথা যেন লিখেছে ভারতী ইনিয়ে বিনিয়ে।

ছেলেবেলায় বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, পড়ে ছিল একটা নিরেট বাড়িতে, লেখাপড়া এগোবার সুযোগ পায়নি, তাই ওর ভাষায় নেই বুদ্ধির ছাপ, ভঙ্গিমায় নেই মার্জিত চেহারা।...

কিন্তু সেই ভঙ্গীতেই তো ও নিজের প্রাণটাকে বিছিয়ে ধরতে পেরেছে। ওর মার নেই সে ক্ষমতা। ওর মা ইহজীবনে কারো কাছে তার মনকে খুলে ধরতে পারেনি।

আজও ওই মেয়ের কাছেও খুলে বলতে পারবে না যে, 'তোর সিঁথির সিঁদুর আমায় মিথ্যে কথা দিয়ে কিনতে হতো না ভারতী, সত্যের মধ্যেই তার ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকতে পারতো!

কিন্তু সে সত্য বলবার উপায় আমার নেই। পরমতম মিথ্যার চেয়েও অবিশ্বাস্য সেই 'চরমতম সত্য।'...

হ্যাঁ—

অজিতা দেবী যদি সে সত্য উচ্চারণ করতে যান, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হেসে উঠবে। 'ছি ছি' করে গায়ে ধুলো দেবে, বলবে কী নির্লজ্জ কী নির্লজ্জ! কী নীচ মিথ্যাবাদী।'

হঠাৎ একটা অদ্ভুত উপলব্ধিতে যেন তাঁর নিজের কথাটা ভুলে গেলেন অজিতা দেবী, ভুলে গেলেন তাঁর মেয়ের চিঠি, মেয়ের আবেদন, সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বসে হঠাৎ যেন অনুভব করলেন, কী অদ্ভুত মিথ্যা দিয়ে গড়া এই পৃথিবী।

সত্য!

শব্দটা যেন একটুকরো সোনালী রাংতা। সেই রাংতায় মুড়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে সমস্ত মিথ্যার বেসাতি। নেই, কোথাও নেই সত্যকার সত্য।

গলার জোর যার যত প্রবল, সে তত 'সত্যভাষী'। সেই জোরের জোরে কত কাঁচ 'হীরে' হয়ে যাচ্ছে, কত হীরে কাঁচ হচ্ছে!

পৃথিবী জুড়ে চলছে একটা 'মুখোস অভিনয়।' প্রত্যেকে সেই মুখোসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে, তাই যদি কেউ কখনো একবার মুখোস খুলে দাঁড়াতে চায় কৌতূহলী পৃথিবী তাকিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত করে নেবে এ আর একটা নতুন ধরনের মুখোস!

কারণ কোনো মুখই মুখ নয়, কোনো সত্যই সত্য নয়, এটাই হচ্ছে এ পৃথিবীর শেষ কথা! সেই শেষ কথার পর আর কি করে সুরু করা যাবে নতুন কথা?

কি করে অজিতা দেবী জনারণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলবেন, 'ধর্মাবতার শুনুন, ওই হতভাগ্য আসামীর সত্যিই যদি কোনো দোষ থাকে তো, সে দোষ হচ্ছে—ওই মারণাস্ত্রটা ছিল ওর নিজের। ও সেটা পকেটে করে বেড়াতো। তাছাড়া আর কিছু নয়।

আমি জানি, ধর্মাবতার, আমি সব জানি। আমি ওই দেড়তলা ঘরটার উঁচুতে যে কাঁচের জানলাটা রয়েছে সেটা থেকে সব কিছু দেখেছি আধখানা সিঁড়ি উঠে।'

না, এসব বলা চলবে না।

বলে হাস্যাস্পদ হবেন, অবিশ্বাসী হবেন। মিথ্যায় গড়া পৃথিবী বলে উঠবে, 'দেখো, মেয়ের স্বার্থে মানুষটা কি নির্লজ্জ মিথ্যা কথাই বানাচ্ছে। ছেলের থেকে বড়ো হলো ওঁর মেয়ে।'

বলুক, বলেও যদি চোখের দৃষ্টি একটু খোলা রাখতো! চোখ খোলে না পৃথিবী। সে পরের চোখে দেখে, পরের কানে শোনে। তাই সে পড়ে আছে মতলববাজদের মুঠোর মধ্যে।

যারা শুধু ভালবাসার মন নিয়ে, শুধু বিশ্বাসের মন নিয়ে এখানে একটু জায়গা পেতে চাও, তারা 'হটো', তারা পাগলা-গারদে চলে যাও।

রাত্রের আকাশ অনেক কথা বলে, অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দেয়।

রাত্রের আকাশের দিকে না তাকানোই ভালো। যারা এই মিথ্যার রঙে রঙিন পৃথিবী থেকেই রং নিতে চাও, রস নিতে চাও, আনন্দ নিতে চাও তারা কেউ কোনোদিন রাত্রের আকাশের দিকে তাকিও না। তারা সকালের সোনালী আলোর আকাশকে দেখো, দুপুরের ঝক্‌ঝকে রূপোলী আকাশকে দেখো, গোধূলির লাল আকাশকে দেখো।

কিন্তু যদি সেই রূপ রস রঙের লোভ আর না থাকে তোমার, তবে উঠে এসো ছাদে, নেমে এসো ঘাসের মাঠে। তাকাও ওই সত্যভাষী রাত্রির আকাশের দিকে। সে তোমায় সব জানিয়ে দেবে।

'আমি জানতাম, তবু এমন করে বুঝি জানিনি কোনোদিন।'

মনে মনে বললেন অজিতা দেবী, 'এখন বুঝতে পারছি—এই আমাদের ছোট ছোট সংসারের মধ্যেও সেই একই রহস্য।....

আমি তো আশৈশবই ভেবে এসেছি আমি খাঁটি, আমি ঠিক। কিন্তু কী ভুলই সেই ভাবনাটা ছিল। আজকের ওই রাত্রির আকাশ আজকের আমার এই হত্যার সংকল্পে দৃঢ় মন, আমাকেই প্রশ্ন করছে কোথায় তোমার সেই খাঁটিত্ব? শৈশবে তুমি যখন 'লক্ষ্মীমেয়ে'র মূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছ, সে কি তুমি সত্যি 'লক্ষ্মী' বলে? না তুমি প্রশংসা পাবে বলে? তোমার পরিজনেরা সুখী হবে বলে?

বল সে কথা?

জোর করে বলতে পারবে? আজ উত্তর, স্পষ্ট নির্ভুল?

না নেই। হয়তো বড় জোর বলতে পারবো, 'কিন্তু খারাপই বা কী এমন ছিলাম?'

ওই। ওইরকম গোঁজামিলের উত্তর।

ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করছে, 'তুমি কি তোমার স্বামীকে সত্যি ভালবাসতে?'

আমার কাছে উত্তর নেই। আমাকে মাথা হেঁট করে অমনি একটা গোঁজামিলের উত্তর খুঁজতে হবে। ...অথচ আমি সেই স্বামীর সঙ্গে সুখে দুঃখে এক হয়ে ছাব্বিশ বছর ঘর করেছি দ্বন্দ্বহীন শান্তিতে।

তার মানে অভিনয় করেছি। নন্দিতা নামের মেয়েটার মতই। অথচ আমি টের পাইনি আমি অভিনয় করছি। অথচ নন্দিতার ওই অভিনয়ের খোলোস আঁটা রূপটাকে চিনে ফেলেছিলাম আমি।

সে যে তার স্বামীকে ভালবাসে না, তার যে প্রাণ পড়ে আছে অন্য এক পুরুষে, অথচ সে নিত্যকারের চাকায় নিজেকে বেঁধে ফেলে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে, এটা দেখেছি, আর ঘৃণায় মন বিষিয়ে গেছে আমার।..

আমি কতদিন ভেবেছি, খুলে দেব ওর অভিনয়ের ওড়না, বলে দেব পার্থকে, 'দেখ্ দেখ্, কী মেকি মালাটি তুই গলায় পরে বসে আছিস—'বলতে পারিনি। আমার পার্থর ওপর মায়া হয়েছে, আমার এই সাজানো খেলাঘর ভেঙে যাবার ভয় হয়েছে। তাই আমি পার্থর সামনে অবোধ সেজে বেড়িয়েছি। তা'হলে পার্থর সামনে আমি অভিনয় করেছি। অবোধের অভিনয়।

আর পার্থ?

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি সেদিন। স্তব্ধ হয়ে গিয়ে পার্থর মুখটা দেখেছিলাম—সেই তার ঘৃণায় আর ব্যঙ্গে বেঁকে যাওয়া মুখ। যে মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'অবাক হয়ে যাচ্ছো তুমি একটি বিবাহিত ব্যক্তির অধঃপতন দেখে? কিন্তু তোমার তো এতে অবাক হওয়া উচিত নয় নন্দিতা—'

বড় বেশী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

তাই হঠাৎ তখনই টের পাইনি, এতদিন ধরে পার্থ নামের ওই সরল সাধাসিধে চেহারার লোকটাও অভিনয় করেই এসেছে।

যে স্ত্রীকে ও ঘৃণা করেছে, তার সঙ্গে—'ভালবাসার ঘর', 'ভালবাসার ঘর' খেলা করেছে। যাকে অবিশ্বাস করেছে, তাকেই সবচেয়ে বিশ্বাসের ভান করে যথাসর্বস্ব দিয়ে রেখেছে তার হাতে।

ওই ঠোঁটকে এর আগে কোনোদিন বাঁকাতে দেয়নি, শুধু সেদিন—

শুধু সেদিনই হয়তো এই রাত্রির আকাশের কারসাজিতে—

কিন্তু সেদিন আমি ওর ওই বাঁকানো ঠোট দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। 'আমার মমতা' ওর কোনো কাজে লাগেনি দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

তাই সহসা খেয়াল করতে পারিনি—আমার তখুনি ছুটে নেমে আসা উচিত ছিল। আমার ওই সর্বনাশা মেয়েটার হাত চেপে ধরা উচিত ছিল।

কিন্তু শুধুই কি খেয়াল করিনি?

এ আত্ম-অভিমানও কি ছিল না, ছুটে গেলে ওরা বুঝে ফেলবে আমি ওদের জানলায় চোখ ফেলে আড়ি পাতছি।

হ্যাঁ, সেই আড়িপাতার গ্লানিবোধ নিয়েই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমার মেজাজি আর খেয়ালী জামাইটা হঠাৎ বচসা করে কোনো বিচ্ছেদের ব্যাপার ঘটিয়ে না বসে এই ভয় ছিল আমার।

এই—

এই ভয় নিয়েই সংসার করে চলেছি চিরকাল। পাছে কিছু বিকল হয়ে যায়, পাছে সব তছনছ হয়ে যায়। আশ্চর্য! কোথাও নেই নিশ্চিন্ততার শিকড়ও, তবু সেই গাছে জল দিয়ে চলেছি ফুল ফুটবে ভেবে।

অথচ সৃষ্টিকর্তা যে মুহূর্তে ইচ্ছা করলেন সব তছনছ হয়ে যাক, সেই মুহূর্তেই হয়ে গেল সেটা। এক নিমেষও দেরী হল না।

এই জিনিস সামলে চলেছি, ঠুনকো কাঁচের এই জিনিস।

তখনও সামলাচ্ছিলাম, যখন দেখলাম—হ্যাঁ—যখন আর একটা রুক্ষ প্রশ্ন শুনলাম—'তার মানে?' তখনও।

কিন্তু তখনও যে আমি ওই বাজের শব্দটার কথা ভাবতে পারিনি তাই আমার সেই আধতলার জানলা থেকে ছুটে নেমে যাইনি।

যখন গেলাম, তখন তো তচ্‌নচ্‌ হয়েই গেছে।

'তচনচ করে বসাই নাকি শিশু ভোলানাথের পেশা।' কিন্তু আমার জীবনটা বড় বেশী অদ্ভুত নয় কি?

এও বোধকরি সেই অদৃশ্য শিল্পীর একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা?

কিন্তু আমি ওকে আর শিল্পী বলে মানতে রাজী নই।

আমি বুঝেছি একটা আনাড়ি লোক, হাতে খানিকটা ক্ষমতা পেয়ে যা-তা করছে। এইটাই এই মানেহীন পৃথিবীর মানে।

পার্থকে কি আর কোনোভাবেই নেওয়া চলতো না তার? যাতে শুধু শোক থাকতো—লজ্জা থাকতো না—কলঙ্ক থাকতো না।

আচ্ছা, পার্থকে কি আমি ভুলে যাচ্ছি?

পার্থর ভালো মুখ? পার্থর ভয়ানক মুখ?

কই তেমন স্পষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না কেন? সব কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কেন? ভয়ানক শোকও তবে এইরকম আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যায়!

না না, আমি ইচ্ছে করে ঝাপসা করে ফেলেছি। মুঠো মুঠো ধুলো-বালি ছড়িয়ে সেই ধুলোর স্তরের নীচে চাপ দিয়ে দিয়ে চালাচ্ছি।

কারণ তখনও আমি হত্যার সংকল্পে দৃঢ় হইনি। তাই ভেবেছিলাম—আবার তো ওদের নিয়েই থাকতে হবে।

তাই—

আজ সকাল পর্যন্তও আমি জানতাম আবার ওদের নিয়েই থাকতে হবে আমায়। যেমন করে থেকেছি এতদিন, ঠাকুর আঁকড়ে থাকার ভান করে।

কিন্তু আজ তো আমি ওই মিথ্যে পুতুলটাকে মুচড়ে ভেঙে ফেলে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই ওপর তলায় উঠে এসেছি।

ওকে আর রেখে দিয়ে কি হবে?

অনেকদিন ধরে পুজো পেয়েছে ও, সেই সম্মানটুকু বজায় রাখতেই ফেলে রেখে না দিয়ে ফেলে দেব ছুঁড়ে টান মেরে।

এতদিন ধরে যে নাটক চলছে, আগামী কাল তার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য অভিনীত হবার কথা। তারপর যবনিকা।

আমি সেটা পিছিয়ে দিচ্ছি।

আমি সেটার আর একটা নতুন দৃশ্য লিখছি। তাতে আমার ভূমিকাটা বদলে যাবে। সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে আসামীর কাঠগড়ায়।...নিশ্চয় একটা চাঞ্চল্য উঠবে, মঞ্চের চেহারা বদলে যাবে, দর্শকরা একটু চমকে উঠবে।...তারপর আবার চলবে সব যথাযথ।

ছাত থেকে নেমে এলেন অজিতা দেবী।

নিজের শোবার ঘরটায় ঢুকলেন। ভারী গড়নের সেকেলে একটা দেরাজ আছে, সেটা খুললেন।

এটা ওটা ছোটখাটো কাগজ-পত্র, চিঠি, হিসেব, ক্যাশমেমো, মুঠো করে চেপে সব টেনে বার করলেন, ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে আস্তে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলেন।

সেই আগুনে ভারতীর চিঠিখানা।

বেচারী ভারতী!

সে হয়তো চিঠিখানা পাঠিয়ে পর্যন্ত ঘণ্টা গুনছে। ওকি স্বপ্নেও ভাবছে না তার চিঠিটা দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলেছে! কিন্তু পুড়িয়ে ফেলাই ভালো। ও চিঠিতে ভারতী তার মাকে অনুরোধ করেছে মিথ্যা সাক্ষী দেবার। আস্তে আস্তে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

'নন্দিতা সেটা বুঝে ফেলেছে—'

ভাবলেন অজিতা দেবী। একবার নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারলে আর ভয় নেই, আর দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। তাই নন্দিতা এমন উঠে পড়ে লেগে—। কিন্তু তবু অজিতা দেবীর ভুল হয়েছিল।

উনি ভেবেছিলেন মাঝ রাত্রে সবাই ঘুমোয়।

কিন্তু উনি যখন ভাবছিলেন, 'আজ আবার এ বাড়িতে একটা খুনের ঘটনা ঘটবে—' তখন নন্দিতা নামের মানুষটা জেগে উঠলো।

হয়তো কাগজ পোড়া গন্ধে।

হয়তো বা দুঃস্বপ্নে।

পার্থর ফটোটা দেয়ালমুখো করে রেখেছে বলেই কি দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে?

প্রথম প্রথম অনেকে ঘিরে থাকতো তাকে। এই ঘরটায় মানুষ ধরতো না। নন্দিতার মা, দিদিরা, পিসি। ঘরের বাইরে দালানে ক্যাম্পখাট পেতে কতদিন যেন দাদাও।

কিন্তু কতদিন আর মানুষ একটা এলোমেলো হয়ে যাওয়া জীবনের জন্যে নিজেদের জীবনযাত্রাকে এলোমেলো করতে থাকবে?

দিদিরা কতদিন পারবে তাদের স্বামী পুত্র ছেড়ে সদ্য বিধবা বোনকে সান্ত্বনা জোগাতে আসতে?

পিসির নিজেরই শরীর খারাপ, বাতের শরীর, যেমন তেমন করে শুলে গায়ে ব্যথা হয়।

...নন্দিতার বাবার ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে, নন্দিতার মা কতদিন তাঁকে একা রেখে অন্যত্র রাত কাটাবেন? তাছাড়া মিঠু! তাকে তো দেখছেন তিনি? তাকে সকালবেলা স্কুলে পাঠাতে হয়, তার আয়োজন আছে।

নন্দিতার দাদাকে অফিস যেতে হয়, খাওয়া শোওয়ার এত অনিয়ম দীর্ঘদিন বরদাস্ত হবে কেন?

নন্দিতা অতএব একলা থাকতে শিখুক।

ভগবান যখন চির-নিঃসঙ্গ করেই দিলেন।

ওরা এই রকমই ভেবেছে।

ওদের সাধারণ চিন্তাধারায়।...

তবু ওরা সারা সন্ধ্যা থাকে বৈ কি! কেউ না কেউ অন্ততঃ।... আজও যখন সেই রক্তের ছিটে লাগা দেওয়াল দেড়তলার ঘরটায় কানে হাত চাপা দিয়ে বসেছিল নন্দিতা, তখন ওর মেজদি এসেছিল।

দিদি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

বললো, 'অনবরত এই ঘরে একা বসে থেকে থেকে তুই কি মাথাটা খারাপ করে ফেলবি?'

মেজদি জানতো না, নন্দিতা সেই রাতের পর এঘরে আর একা বসে থাকেনি কোনো দিন। এসেছে পুলিশের লোকের সঙ্গে।

সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সময় ঠিক কে কোনখানে বসেছিল অথবা দাঁড়িয়েছিল, আর কোনখানে দাঁড়িয়ে কোন ভঙ্গীতে রিভলভারটা চালিয়েছিল নৃশংস রাজেন সেটা পুলিশের লোককে দেখাবার জন্যে।

মেজদি তা জানতো না।

মেজদি দূরে থাকে, কম আসে।

আজ এসেছিল।

আগামী কালকের জন্যে সাহস জোগাতে, শক্তি যোগাতে। বলেছিল, 'হেলিস দুলিস না, এক বলতে আর এক বলিস না।'

অথচ ওরাই নন্দিতার আড়ালে, নন্দিতার দুই দিদি আর মা, নন্দিতার সমালোচনা করেছে।

বলেছে, 'মেয়েমানুষ হয়ে এত প্রতিহিংসাপরায়ণ কেন বাবা! কাঠ কবুল প্রতিজ্ঞা ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবোই!...ছিঃ নিজের যে অবস্থা ঘটেছে, যে জ্বালায় জ্বলছিস্, আর একটা মেয়েমানুষ সেই জ্বালায় জ্বলুক, এই চাইছিস তুই?...তোর নিজের ননদ! শাশুড়ীর মেয়ে! বুড়ির অবস্থা ভাবছিস না একবার? মেয়েমানুষ না তুই?'

তবে যা বলে আড়ালে।

ওকে উপদেশ দিতে আসবার সাহস কারো নেই।

দিতে এলেই ফোঁস করে উঠবে। বলবে 'পরের কথা কেউ বোঝে না! চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?'

তাই ওর মেজদি ওর হাত ধরে টেনে আনতে আনতে দরদী গলায় বলে—'এ ঘরে একা বসে থেকে থেকে কি পাগল হয়ে যাবি?'

মেজদি অনেক সান্ত্বনা দিয়ে চলে যাবার পর দাদা এসেছিল উকিল নিয়ে। শেষ পালিশ দিয়ে গিয়েছিল।

আর তারপর—

ওরা চলে যাবার পর মুকুল। অনেকদিন পর।

নন্দিতা বলেছিল, 'আবার তুমি এলে যে? বারণ করেছিলাম না?'

মুকুল বললো 'অনেকদিন তো মানলাম বারণ!'

'তা হোক্ আরো কিছুদিন মানো। চারিদিকে শত্রু, হঠাৎ কে কোন দিক থেকে নিহতের স্ত্রীর চরিত্রের বদনাম দিয়ে কেস ঘুরিয়ে দিয়ে বসতে পারে। ওরা তো বলেছেই সুইসাইড। এমন কি ওরা নাকি একটা মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে ধরে এনে সাক্ষী দিইয়েছে।

তিনি নাকি বলেছেন, 'এরকম হয়। কোন পূর্ব সংকল্প না থাকলেও হঠাৎ একটা ধারালো ছুরি কি একটা বন্দুক দেখলে মানুষের অকস্মাৎ খুন চাপতে পারে, আত্মহত্যার বাসনা জেগে উঠতে পারে।'

...নন্দিতা অন্যদিকে মুখ করে বলে, 'আমার চরিত্রে দোষ দিতে পারলে, [illegible] একটা অবচেতন কারণও আবিষ্কার করতে পারে তাদের সাইকোলোজিষ্ট।'

মুকুল কিন্তু এমন একটা অভাবিত কথা শুনেও তার সম্পর্কে কোনো ব্যঙ্গ মন্তব্য না করে বলেছিল একটা সম্পূর্ণ অন্য কথা। যে কথা নন্দিতার অনুকূলও নয়।

খপ করে বলে উঠেছিল, 'আচ্ছা নন্দিতা, তোমার কি মনে হয় না লোকটার ফাঁসির হুকুমের বদলে যাবজ্জীবন জেল বা দ্বীপান্তর-টিপান্তর গোছের কিছু হলে ভাল হয়?'

নন্দিতা ওর কথার ঠিক মানেটা চট করে ধরতে পারেনি। নন্দিতা ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। দেখে নিয়ে বলেছিল, 'হঠাৎ এ রকম মনে হল কেন তোমার?'

'না অন্য কিছু নয়!' মুকুল কেমন যেন উদাস ভাবে বলেছিল, 'ভাবছি—একটা খুন, আর একটা ফাঁসির উপর ভিত গেড়ে আমাদের নতুন জীবন সুরু হবে?'

নন্দিতা কেঁপে উঠেছিল।

নন্দিতার মনে হয়েছিল ওর সেই নতুন জীবনের ভিতটাও বোধহয় কেঁপে গেছে। হয়তো কোথাও

ফাটল ধরেছে, আস্তে আস্তে সেখান থেকে চোরা জল উঠবে। বাড়ি বানানো হবে না।

তাই নন্দিতার সামলে নিতে সময় লেগেছিল।

তারপর নন্দিতা ভারী মুখে বলেছিল, 'তা' আমাদের পছন্দ অনুযায়ী তো আর 'হুকুম' বেরোবে না?'

মুকুল অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, 'না তা নয়।' তবে মনে হচ্ছিল।

মুকুলের মনে হচ্ছিল।

কিন্তু নন্দিতার কি সত্যিই 'মন' বলে একটা বস্তু নেই? নন্দিতা কি ভারতীর ভাবী চেহারাটা কল্পনা করে শিউরে উঠছে না?

কিন্তু নন্দিতার উপায় নেই সেই মনকে প্রশ্রয় দেবার। কারণ নন্দিতা নরকের পথে অনেকদূর এগিয়েছে, এখন আর সে পথ থেকে ফেরা যাবে না।

তাই নন্দিতার সেই মন স্বপ্নের মধ্যে নন্দিতার উপর প্রতিশোধ নেয়। নন্দিতা জেগে ওঠে, ঘেমে যায়, বাকি রাতটা বসে থেকে সকালের প্রতীক্ষা করে।

আজও নন্দিতা জেগে উঠেছিল।

নন্দিতা জেগে উঠে কাগজ পোড়া গন্ধ পেয়েছিল।

নন্দিতার ভয় হয়েছিল। উঠে যেতে সাহস হয়নি।

ওর মনে হয়েছিল ঘর থেকে বেরোলেই বুঝি দেখতে পাবে একটা দীর্ঘছায়া প্রেত, রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে ঘুবে সব কিছুতে আগুন লাগিয়ে বেডাচ্ছে।

সে আগুন চিঠি কাগজ ছবি থেকে ছডাতে ছডাতে নন্দিতার নতুন জীবনকে গ্রাস করবে।

নন্দিতার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

তাবপর আস্তে আস্তে সাহস সঞ্চয় করেছিল নন্দিতা, ছোট চাকরটা রান্না ঘরের উনুনটা নিভোতে ভুলে যায়নি তো? সেখানে কোনো কিছু ছিল না তো?

নন্দিতা ঘর থেকে বেবিয়ে এল।

দালানের সুইচে হাত দেবার আগেই অজিতার ঘরের দরজার ফাটল থেকে একটা আগুনের আভা দেখতে পেলো।

নন্দিতা স্তব্ধ হযে ভাবলো এক মিনিট।

ঘটনাটা কী ঘটছে!

কিন্তু না, কাপড পোডা গন্ধ নয়, চুল পোডা, চামডা পোডা কিচ্ছু নয়, স্রেফ কাগজ পোডা।

তার মানে কোনো গোপন কাগজ-পত্র।

কী হতে পারে সেটা? যেটা টিকে থাকলে নন্দিতার অনুকূল, ভস্ম হলে অজিতাব অনুকূল?

সবসময় এখন নন্দিতা অজিতাকে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

নন্দিতা ভাবলো. এই গোপন কাজের সাক্ষী থাকা আবশ্যক। কখন কোনটা দরকার হয় বলা যায় না।

এখন নন্দিতার দু'চোখ খোলা, তাই সেই দুঃস্বপ্নেব ছায়াগুলো সরে সরে যাচ্ছে।

নন্দিতা ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঋজু হয়ে দাঁড়ালো।

বললো, 'মাঝ রাত্রে এসব কী হচ্ছে?'

অজিতা দেবী চমকে মুখ তুলে তাকালেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতেই হবে?'

নন্দিতা ক্রুদ্ধ গলায় বললো, 'কৈফিয়ৎ দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছে। তবে মনে রাখবেন, যেটা আপনি লুকিয়ে করছিলেন, তার একজন সাক্ষী রইল।

অজিতা নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'কোনো কাজই লুকোনো থাকে না। কোথাও কোথাও তার সাক্ষী থাকে।'

'ওঃ ভগবানের কথা বলছেন?' নন্দিতা বুঝি পায়ের তলার মাটি খুঁজতে তাড়াতাড়ি ভগবানের নাম টেনে আনে, 'এখনো আপনি আপনার ভগবানকে ভক্তি করেন?'

অজিতা দেবী একথার উত্তর দিলেন না।

অজিতা দেবী কি নন্দিতাকে হঠাৎ জেগে উঠতে দেখে ভয় পেলেন? ভাবলেন, যেটা নিঃশব্দে আর সহজে হতে পারবে ভেবেছিলাম, সেটা বুঝি আর হল না?

কি জানি!

অজিতা দেবী শুধু সেই ঘুমন্ত আগুনটায় একটা জ্বালানি ঠেলে দিলেন। একখানা আবাঁধা ফটো। অজিতা দেবীর নিজের বিয়ের আগের ফটো, যেটা দেখিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ওঁর! ঝাপসা হয়ে গেছে, ঘোলাটে হয়ে গেছে। তবু যত্ন করে তোলা ছিল কুমারীবেলার সেই ফটো।

সেই ছবিখানাকে পুড়িয়ে ফেলছেন কেন অজিতা দেবী?

সমস্ত ভালবাসার আর সমস্ত সেন্টিমেন্টের জিনিসগুলি কি তা'হলে নিজের হাতে পোড়াতে সাধ তাঁব? তাঁর ভগবানের ওপর আক্রোশে?

নাও নাও, সব নাও।

নিজের হাতে যে আগুন জ্বেলেছো, তাতে আহুতি নাও।

আর ভাবতে দাও আমায়, আমার এই অতি সাধারণ জীবনের ছক্-এর ওপর তোমার ওই অদ্ভুত সর্বনাশা খেলার ঘুঁটিগুলো সাজাতে বসলে কেন?

নন্দিতা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে দেখলো। মতলবটা কি মানুষটার? নন্দিতাকে কি খুন কবে ফেলবে? আগে থেকে তাই তার প্রমাণ পত্র-টত্র সরিয়ে ফেলছে? কিন্তু এঘরের সঙ্গে কবে কোনদিন যোগ ছিল নন্দিতাব? তবে কি বিষ-টিষ?

ওই আগুনের ধারে বসে থাকা মানুষটার চোখের মধ্যে যেন কী এক সংকল্পের আগুন। নন্দিতা তো ওর হাতে খায় না, বিষ-টিষ কোনো কাজে লাগবে না।

তবে? আগুনে পুড়িয়ে মারবেন নাকি নন্দিতাকে?

নন্দিতার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে। নন্দিতা কি চেঁচিয়ে উঠবে? চেঁচিয়ে পাড়াব লোক জড়ো করবে?...তারপর বলবে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে—

কিন্তু মাঝরাতে চীৎকার শুনে আর কি কেউ ছুটে আসবে? অনেক শিক্ষা হয়েছে তাদের। অনেক হয়রানি হয়েছে পুলিশের হাতে।

আর তখনই—গলার জোর ফিরে পায় নন্দিতা।

বলে, 'তখন তো খুব শাসিয়ে গেলেন। কোন সত্যি কথাটা বলবেন শুনি?'

অজিতা দেবী ওর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। বললেন, তুমি একটা ভদ্র ঘরের মেয়ে ছিলে নন্দিতা, একটা ভদ্র ঘরের বৌ হয়েছিলে। কুগ্রহের ফেরে—' একটু থামলেন অজিতা দেবী, তারপর বললেন, কিন্তু এমন করে নিজেকে ধ্বংস কোরো না তুমি।'

নন্দিতার ভিতরটা যখনই কেঁপে ওঠে, নন্দিতা তখনই বাইরের খোলসটাকে শক্ত করে নেয়।

তাই নন্দিতা বিদ্রূপের গলায় বলে, 'ওঃ! আবার উপদেশ! কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, এখন এতদিন পরে আপনার কোনো নতুন সত্যি কথা কাজে লাগবে না। লোকে অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠবে। লোকে আপনাকে পাগল বলবে। নয়তো বলবে—স্বার্থের জন্যে কতদূর নামতে পারে মানুষ। বুঝলেন? আপনার সত্যি কথা কোনো কাজে লাগবে না। নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি বললেও না।'

অজিতা দেবী খুব শান্তভাবে একটু হাসলেন। বললেন, 'জানি।'

'জানলেই ভালো। আর শুনুন, আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখছি, মিঠু আর এ বাড়িতে আসবে না। আমি আর এ বাড়িতে থাকবো না।'

'তাও জানি।'

সেই হাসিটাই আবার দেখা গেল অজিতার মুখে।

'ওঃ সবই জানেন! তা ভালো। শুধু আমি জানতে পারলাম না মাঝরাতে উঠে অগ্নিকাণ্ড করছেন কেন?'

অজিতা বললেন, 'পাগলের খেয়াল আব কি! না করলেও ক্ষতি ছিল না।'

'আচ্ছা জানা যাবেই—'

নন্দিতা ঠিকরে চলে যায়।

কারণ নন্দিতা কিছুতেই নিজেকে তার নিজের হাতে বাঁধা চড়া তার থেকে নামাতে চায় না।

নন্দিতার ভয় হচ্ছে, নন্দিতার আর নিজের ওপর বিশ্বাস থাকছে না। ওর মনে হচ্ছে ও হয়তো শেষ রক্ষা করতে পারবে না।

ওর কাছে যে সত্যকথা লুকোনো আছে, যেটা লুকিয়ে রাখবার জন্যে সহস্র জাল ফেলে চলেছে সে এতদিন ধরে, সেটা বুঝি আর লুকিয়ে রাখতে পারবে না। বুঝি হঠাৎ ফেটে বেরিয়ে পডবে।

তাই নিজেকে অবিরত শক্তির মন্ত্র জপাচ্ছে।

তাই সে 'আচ্ছা জানা যাবে' বলে ঠিকরে চলে যায়।

তারপর জানা যায় সেই খবর। পরদিন সকালে।

কেন অজিতা দেবী নিশাচরের মত মাঝরাত্রে উঠে অগ্নিযজ্ঞ করছিলেন, কেন তাঁর ক্ষুদ্রতম ভালবাসার জিনিসগুলি সেই আগুনে আহুতি দিয়েছিলেন।

মাঝরাত্রে একটা হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করতে এই অগ্নিযজ্ঞ অজিতা দেবীর। এটা বোধহয় বোধন।

নন্দিতা উঠেছিল, জেগেছিল, তবু নন্দিতা মুহূর্তের জন্যেও এ সন্দেহ করেনি।

নন্দিতা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গিয়েছিল। চিরদিনের একটা 'ধর্মপুণ্যি' মানুষ যে এমন একটা কাজের জন্য মতলব ভাঁজছিলেন, তা তার ধারণার মধ্যে আসবে কি করে?

নিঃশঙ্ক মানুষটা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল, তারপর অনেক দুঃস্বপ্নের ছায়া পার হয়ে শেষ. বাতেব দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কেমন করে জানবে সে, সেই ঘুমের অবকাশে আর একটা মৃত্যু নামছে এ বাড়িতে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে।

সকাল বেলা একা নন্দিতাই নয়, সকলেই জানলো।

আর, আরও একবার এই নিতান্ত সাধারণ বাড়িটা অসাধারণ হয়ে উঠলো। লোকে বাড়ি ভবে গেল। আর ধর্মাধিকরণের পাইকরাও এল। এজাহার নিলো যাদের যাদের নেওয়া সম্ভব।

ঝি, চাকর, গোয়ালা। যারা প্রথম সকালের সাক্ষী।

তাবপর নন্দিতার।

নন্দিতা সেই একই কথা বলে চললো, আমি কি করে জানবো? উনি অত ধর্মবিশ্বাসী পাপপুণ্য বিলাসী মানুষ, উনি এমন কাজ করবেন—'

প্রথমটা কে দেখলো?

ওঃ সে ওই বাচ্চা চাকরটা।

সে বলেছিল, 'ঠাকুমা এখনো উঠলো না কেন মা?'

নন্দিতা বলেছিল, 'আমি কি জানি?'

নন্দিতা ভেবেছিল, অনেক রাত পর্যন্ত কি সব করে এখন ঘুমোচ্ছেন আর কি!

তারপর সন্দেহজনক বেলা হলো। ছেলেটা বহুবার দুম্ দুম্ করে জোরে দরজা ঠেলে বিফল হয়ে, বারান্দা ঘুরে কার্নিশে নেমে দেখতে গিয়ে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে এসে আছড়ে পড়লো। তারপর তো পুলিশ।

পাড়ার লোক বলাবলি করতে লাগলো, 'বাড়িটা কার পাপে কোন কুগ্রহের অভিশাপে পড়ে গেছে! আশ্চর্য! অথচ এই সেদিনও কী সুন্দর সুখের সংসারই ছিল!

এই ভাবেই তো মানুষের সুখের হিসেব।

বইয়ের মলাট দেখে সমালোচনা।

তবু একথা মানতেই হবে বৈকি, কোনো কোনো অভিশপ্ত মুহূর্ত হঠাৎ যদি সে মলাট ছিঁড়ে না ফেলে, হয়তো চিরদিনই সেই সমালোচনা থেকে যায়।

ঝড় বড় ভয়ঙ্কর জিনিস, বড় ভয়ঙ্কর রাত্রির আকাশ!—

নন্দিতার পিসি বললেন, 'আশ্চয্যি দেখালো বুড়ি। তখন করলি না টাটকা টাটকি, এখন এতদিন পরে—

নন্দিতার মা মেয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, 'তিলে তিলেই অভাব ধরা পড়ে। একদিনে শূন্যতা বোঝা যায় না।'

নন্দিতার দাদা বললে, কেস্‌টা সম্পূর্ণ গুছিয়ে আনা হয়েছিল, একেবারে খাবাপ হয়ে গেল।'

নন্দিতার দিদিরাও এক একবার এলো, কিন্তু নন্দিতা যেন সকলের সহানুভূতি হারাচ্ছে। যেন সকলে ভাবতে সুরু করেছে, এটা তোমার করলেই বেশী মানাতো।

বলছে না, কিন্তু ওদের অব্যক্ত ভঙ্গীটাই বলে ফেলছে।

হয়তো এই নিয়ম পৃথিবীর। সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে জমে মৃতের উপর। যেন সে একটা উচ্চাসন পেয়ে গেছে, যেন সংসারের সকলের কাছে জিতে গেছে।

জীবিতরা পরাজিতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই বিজয়ীর দিকে।

জনে জনে সবাই এলো, এলো না কেবল নন্দিতার বাল্যবন্ধু।

নন্দিতা জানে ও আর আসবে না।

এতগুলো ভয়ঙ্করের ওপর ভিত গড়ে নতুন জীবন গড়বার সাধ ওর নেই।

কিন্তু নন্দিতারই কি আর?

যারা নিয়তির শিকার হয়েছিল, তারা মরলো। নন্দিতা তার জন্য দায়ী নয়, তবু নন্দিতা হঠাৎ তাকিয়ে দেখছে তার সামনের সেই লক্ষ্যটা, তীব্র চেষ্টায় সার্চ লাইট জ্বেলে চারিদিকে অগ্রসর হচ্ছিল নন্দিতা, সেই লক্ষ্যটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

নন্দিতা ভাবতে চেষ্টা করছে, তার মনের ওপরকার খোলসটাকে শক্ত করে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে, 'এতো ভালই হলো।—কোথাও আর কোনো দুশ্চিন্তা রইল না। একজোড়া চোখ অহরহ আমার জীবনের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে নিঃশব্দে আর চেয়ে থাকবে না।

কিন্তু ভাবতে পারছে না।

অনবরতই মনে হচ্ছে বরাবরের মত এই শেষবারেও অজিতা দেবীই জিতে গেলেন। সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনতলার উঁচুতে ঠাকুর ঘরে উঠে গিয়ে যেমন চিবদিন জিতে এসেছেন আজও তেমনি।

অজিতা দেবীর উপর ভয়ানক একটা হিংসে হতে থাকে নন্দিতার। যেন যে টিকিটটার জোরে নন্দিতাই অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারতো নন্দিতার অন্যমনস্কতায় সেই টিকিটটা অজিতা দেবীই হস্তগত করে ফেলে উঁচুতে উঠে গেলেন।

সোনার কৌটো

খবরটা জবর বটে।

কানাকানি করবার মতই।

ফুলপুরের পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল খবরটা বেশ একখানি বিস্ময়ের বাহন হয়ে।

চাটুয্যে বাড়ির শশীতারা শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছেন!

একজনের মুখ থেকে অনেক জনের কানে। আর কান থেকেই কানাকানি।

ব্যাপারটা কী?

হঠাৎ শ্বশুর বাড়ি?

শ্বশুর বাড়ি মানেটাই বা কী?

শশীতারার যে একটা শ্বশুর বাড়ি ছিল, তাই তো ভুলে গিয়েছিল লোকে। কম বয়সীরা তো জানেই না শশীতারার কোনো দিন বিয়ে হয়েছিল। নেহাৎ বুড়োরা ছাড়া ফুলপুরের সব্বাই এই একই মূর্তিতে দেখছে শশীতারাকে! বুড়িটুড়িরা বলে শশীতারার নাকি কাঁচা সোনার মতো রং ছিল, একতাল মেঘের মত চুল ছিল। তা' চুলগুলো কবে যেন প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন শশীতারা। আর রংটাকে বিসর্জন দিয়েছেন, আচার আমসত্ব, বড়ি আমসি, আর ডাহা ডাহা নির্জলা উপোসের বিচিত্র সঙ্গমে।

দীর্ঘকালাবধি যে মূর্তি সবাই দেখেছে, সে হচ্ছে ঠকঠকে চ্যাঙা গড়নের চেহারা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, রোদে জ্বলা তামাটে রং, আর তীক্ষ্ণধার একখানি মুখ। ওই ধারালো ভঙ্গীটা শুধু মুখের কাটুনিতেই নয়, মুখের ভাষাতেও।

চাটুয্যে বাড়ির বড়কর্তার বড় মেয়ে এই শশীতারাকে এখন আর দিদি ঠাকরুণ বলবার লোকও নেই, সবাই বলে শশীঠাকরুণ। ওতে সম্পর্কের হিসেব কসাটা বাঁচে। বয়স্করা কেউ কেউ সামনা সামনি কথা বলতে পিসিমা বলে, কিন্তু আড়ালে ওই শশীঠাকরুণ।

শশীঠাকরুণকে কেউ নাকি মটকা তসর গরদ ছাড়া সুতি থান পরতে দেখেনি। উদয়াস্ত ওই তাঁর সাজ। তা'ছাড়া গামছা আছে। রাত্রে যে ঘণ্টা কয়েক তিনি বিছানায় দেহ পাতেন, সে নাকি নিজেকে ওই গামছার আবরণেই মুড়ে।

বিধবা হলেই যে একেবারে সর্বহারা মূর্তিতে সংসারে চরে বেড়াতে হবে, এমন ব্যবস্থা এ যুগে আর নেই, কিন্তু শশীতারার বৈধব্যের আমলে ছিল। কারণ সেই আমলটা ছিল ষাট বছর আগে।

বিয়েটাও সেই একই সনে।

ন'বছর বয়সেই বিয়ে এবং বৈধব্য দুই সেরে শশীতারা তাঁর জন্মভিটেয় সেই যে শেকড় গেড়ে বসেছিলেন, তীর্থটীর্থ ব্যতীত আর কোথাও নড়েননি।

শশীতারার সেই বিয়ে এবং বৈধব্যের কালে তাঁর ঠাকুর্দা অঘোর চাটুয্যে বেঁচে ছিলেন, যাঁর প্রতাপে প্রজাবর্গ নাকি বাপের নাম ভুলে যেত। আর যাঁর দাপটে নাকি সেই বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল যাওয়ার প্রবাদটা সর্বদা উল্লেখ করা হতো।

প্রথম পৌত্রী শশীতারাকে ন' বছরেই কায়দা করে ফেলেছিলেন অঘোর চাটুয্যে, যাতে মেয়েটা কোনো ক্রমেই না চৌদ্দপুরুষকে নরকস্থ করে বসে।

তা' মেয়েটা উল্টো দিকে ক্ষমতা দেখালো।

বিয়ের বছর না ঘুরতেই বরটাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলো। তখনো শশীতারা ফুলপুরেই খোসমেজাজে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঠাকুমার কুলের আচার চুরি করে এনে বান্ধবীদের বিলোচ্ছে, সাঁতরে দীঘির এপার ওপার করছে। আর গিন্নীদের কাছে বকুনি খাচ্ছে, এতো দস্যি মেয়ে! পরের ঘরে গিয়ে কী হবে তোমার?

শশীতারা গাছে চড়ে কাঁচা আম ঠেঙাচ্ছিল, সেই সময় নাকি খবরটা এসেছিল। কিম্বদন্তী আছে—শশীতারার পিসী শশীতারাকে ঠেঙিয়ে গাছ থেকে পেড়ে আনতে অক্ষম হয়েছিলেন। পিসী তাকে নামিয়ে তার কপাল এবং নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ঘাটে গিয়ে পড়ে যখন ভাইঝির বৈধব্যকৃত্য সম্পাদন করছিলেন, তখন নাকি শশীতারা পিসিকে বেশ জোর গলায় বলেছিল, বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, পরের ঘরে গিয়ে তোর কী দশা হবে রে—বলে খিঁচোতে এসো এবার? আর তো যেতে হবে না পরের ঘরে! লবডঙ্কা!

তা' শশীতারার সেই শৈশবটা তো এখন ইতিহাসের কোঠায়। এ কিম্বদন্তীও তো শোনা যায়, শশীতারার উনত্রিশ বছরের বাবা অভয় চাটুয্যে জামাইয়ের মৃত্যু সংবাদে এতো বিচলিত হয়ে গিয়েছিল যে বলে বসেছিল, ও বিয়ে বিয়েই নয়, আমি তো সম্প্রদান পর্যন্ত করিনি। শশীর আবার বিয়ে দেব।

অঘোর চাটুয্যে বলেছিলেন, আর কটা দিন অপেক্ষা করো, আমি মরলে একেবারে দুটি পাত্র দেখো। একটি মেয়ের জন্যে। আর একটি গর্ভধারিণীর জন্যে। বিধবা বিয়েটা এই ফুলপুরে রেওয়াজ করিযে দিয়ে কীর্তিরাখা কাজ কোরো।

এসব অবশ্য সবই শোনা কথা, এখন যারা আছে, তারা শশীঠাকরুণকে ওই একই অবস্থায় দেখেছে। ঠাকুর্দার মতই প্রতাপ, ঠাকুর্দার মতোই দাপট। জ্ঞাতি গোত্রে পল্লবে বিরাট চাটুয্যে গোষ্ঠীর তিনিই গার্জেন।

শুধু তাই বা কেন, সমগ্র ফুলপুরেই গার্জেন তিনি।

সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, রোগে শোকে, সবাই ছুটে আসে শশীঠাকরুণের কাছে। তিনিও ছুটে যান সবাইয়ের কাছে। ফেরার পথে একটা ডুব দেবার ওয়াস্তা বৈ তো নয়।

শশীতারা ফুলপুরের হৃদ্‌যন্ত্র।

এই শশীতারা কিনা হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করছেন।

যুগীগিন্নী ননীবালা কেঁদে এসে পড়লো, আমার নাতনীটা এই এখন তখন, আর এই সময় তুমি গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছো ঠাকরুণ?

শশীতারা বললেন, আমি তো বাপু ডাক্তার বদ্যি নই। তোর নাতনীর যদি পরমায়ু ফুবিয়ে থাকে, স্বয়ং ভগবান মাথাব শেওরে বসে থাকলেও রাখতে পারবে না, আর যদি পরমায়ু থাকে, যমের বাবা এসেও নিয়ে যেতে পারবে না। তবে রোগে ব্যাধিতে টাকাকড়ির দরকার, এটা রাখ।

আলগোছে ননীবালার হাতে তিনখানা দশটাকার নোট ফেলে দিলেন শশীতারা। ও প্রণাম কবে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

আবার ঘোষালদের সত্যচরণও চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল, শশীতারা সত্যচরণের নাতির বিয়ের সময়টাতেই চলে যাবেন বলে।

আপনিই আমার বলবুদ্ধি ভরসা পিসিমা, আর এই মোক্ষম সময় আপনি—

শশীতারা ওর নাতনীর আইবুড়ো ভাতের জন্যে একখানা ডুরে শাড়ি, আর আশীর্বাদী হিসেবে একজোড়া হালকা কান ফুল ধরে দিয়ে বললেন, মানুষ আবার কিসের বলবুদ্ধি ভরসা রে? ভগবানকে ধরে বসে থাক্, নির্বিঘ্নে কন্যে দায়ে উদ্ধার হয়ে যাবি।

শোভার মা ছুটতে ছুটতে এলো এক বাটি তেল নিয়ে, মা গো, এই তেল পড়াটা করে দে' যাও, কে জানে আপনির অবর্তমানে মেজ খোকাটার কখন পেট গুলোয়।

শশীতারা হেসে বললেন, তোরা এমন করছিস, আমি যেন চিরকালের জন্যে মরছি। তোর তেল পড়াটা হরিদাসীকে দিয়ে করিয়ে নে না। ওর অনেক ক্ষ্যামতা আছে। নানান তন্ত্র মন্ত্র শিখেছে। আমি তো শুধু ইষ্ট নাম স্মরণ করে ফুঁপাড়ি।

শোভার মা আকুল ভাবে বলে, আপনার থেকে কেউ নয় মা। হরিদাসী পিসিকে আমার মন লাগে না।

অগত্যাই তেলটা পড়ে দিতে হয় শশীতারাকে। বৃন্দাবনের ভাইপোটার জন্যেও একটা টোটকা দিয়ে গেলেন শশীতারা তার মাথা ঘুরুণীর ব্যামোর জন্যে। কি দিয়ে কি করতে হয় সেটা উচ্চারণ করলে না কি ফল পাওয়া যায় না, তাই নিজে হাতেই ওটা করে দেন শশীতারা।

চাটুয্যে গুষ্ঠির দায় অদায়, করণ কারণ, ঘর সংসারের ব্যবস্থা সুব্যবস্থা, সেও চলছে আজ পাঁচ সাত দিন ধরে।

গিন্নী গিন্নী ভাইপো বৌদের কচুকাটা করে শিক্ষা দিতে থাকেন শশীতারা, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর, এটি করো না বাছারা! আমি যেমনটি করি, ঠিক তেমনটি করবে। মা সিদ্ধেশ্বরীর শনি মঙ্গলবারে ভোগটি যেন ঠিকমত পাঠানো হয়। এসে যেন শুনি না কিছু ক্রটি হয়েছিল। আমার ছেলেদের পাত থেকে মাছের মুড়ো উড়ে গিয়ে যেন তোমাদের ছেলেদের পাতে গিয়ে না পড়ে, এই বলে দিচ্ছি। দই পাততে ভুলে বসো না, ছেলেপেলেগুলোর চিরেতার জল আর আদা ছোলা যেন ভুল না হয়। জায়ে জায়ে অজ্ঞান হয়ে গাল গল্প না করে সংসারের চারদিক তাকিয়ে দেখবে। আচার আমসত্বগুলো রোদে দেবে, খবরদার অনাচার কাপড়ে ভাঁড়ারে ঢুকবে না। তুলসীতলায় পিদিপ দিতে ভর সন্ধ্যেটি না উৎরে যায়। বিকেলবেলা থাকতেই শাঁখে ফুঁ দিয়ে যেন সন্ধ্যে জ্বালা সেরে চায়ের গেলাসটি নিয়ে বসো না।...

চলতে ফিরতে উঠতে বসতে উপদেশ—তোলা বিছানা মাদুরগুলো যেন ছাতা পড়িয়ে রেখো না, রোদ বেরোলেই টেনে বার করে দিও।.. বছরের মুগকড়াই কেনা আছে জালায় জালায়, এসে যেন দেখি না সব ঢন ঢনিয়ে রেখেছো।...চিঁড়েগুলো কুটিয়ে রেখে যেতে পারলাম না—একটু শুকনো খরা হলেই জগুরমাকে ডেকে কুটিয়ে নিও। তোমাদের নিজের নিজের শরীর স্বাস্থ্যগুলোও দেখো, রোগে পড়ে আমার ছেলেদের ভুগিও না। পরীর যে সম্বন্ধটা এসেছিল, তাদের সঙ্গে পত্রালাপটা যেন ঠিক মতো চলে। অঘ্রাণের আগে তো বিয়ে হচ্ছে না। মেয়েটাকে রোদে রোদে ঘুরতে দিও না, মেঘ ভাঙা রোদে রংটা কালো ঝুল না হয়ে যায়।

ভাইপোর ছেলের বৌ দুটোকেও অনেক উপদেশ পরামর্শ দেন।

কচির মা, তোমরা সেই রাত দুপুরে আর বেলা তিনটেয় ভাত খেওনা বাছা। আসলে কুড়ের রাজ তো সব, ছেলের কন্না করতেই বেলা পুইয়ে যায়। বুড়ি বিদেয় হলো, বালাই গেলো, বলে যেন কেষ্টধনের তেল মাখাটা বন্ধ করে দিও না।

এমনি অজস্র উপদেশ।

অজস্র বাক্যবাণ।

ছোট নাতবৌ একবার হেসে বলেছিল, এতো কথা বলছেন কেন ঠাকুমা? কতোদিনের জন্যে যাচ্ছেন শুনি? এ যে সেই সেকালের তীর্থ যাত্রার মতো। শুনেছি সেকালে নাকি তীর্থে যাবার সময় উইল করে তবে যেতো।

শশীতারাও ঠাট্টা তামাশার কম যান না, ভাইপো বৌদের কাছে তিনি দেবী চামুণ্ডা সদৃশ হলেও ভাইপোদের ছেলেদের বৌয়েদের কাছে হাস্যবদনী। বকেন ঝকেন, উপদেশ দেন ঠিকই, তবে হেসে মেতে।

এখনও হাসলেন, বললেন, তা তীর্থেই তো যাচ্ছিরে। মহাতীর্থ পতিতীর্থ!

নাতবৌ বললো, আহা, তবু যদি পতিকে একবারও চোখে দেখতেন। শুভ দৃষ্টিই তো হয়নি।

কথাটা সত্যি।

এ গল্প শশীতারা নিজেই নাত বৌদের কাছে করেছেন।

শুভদৃষ্টির সময় না একদম একটা ছেলেমানুষী জেদের বশে চোখটা খোলেননি, বুজে বসেছিলেন। সবাই মিলে যতো বলছে, চোখ তাকা, চোখ তাকা—শশীতারার ততোই একটা উটকো জেদ চেপে গেছে, তাকাব না। দেখি তোমরা আমায় কেমন জোর করে চোখ খোলাতে পারো।

ঠাকুর্দা অঘোর চাটুয্যের ধমকেও কাজ হলো না।

আর কী উপায়?

পাঁড়ি ঘোরানো অবস্থায় তো আর মেয়েকে চড় বসানো যায় না?

শশীতারা সেই কথার উল্লেখে হেসে উঠলেন, চোখে না দেখি তবু ভগবানের গড়া শরীর তো? না দেখে খেলেও কি আর সাপের বিষে মৃত্যু ঘটে না?

আহারে, ঠাকুমার কি তুলনার বাহার! সাপের বিষ!

তা তাই!

শশীতারা বলেন, সেই ছোবলের ঘায়েই আজন্ম ভুগছি। মনে হয় যেন বিধবা হয়েই জন্মেছিলাম।

আচ্ছা ঠাকুমা, আপনার বাবা নাকি আপনার আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন? আপনার ঠাকুর্দা মত দেননি।

শশীতারা ঠোঁট উল্টে বলেন, আর ঠাকুর্দা মত দিলেই আমি করতাম যে?

আহা আপনি তো তখন মোটে ন বছরের।

তা সে য বছরেরই, হিঁদুর মেয়ে তো? নাকি বেম্ম খিস্টান?

ওসব বুদ্ধি তখন হয়েছিল আপনার?

শোনো কথা! মানুষ বুঝি খানিকটা বুদ্ধিসুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না?

তার মানে আপনি এই বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছিলেন, আপনি হিঁদুর মেয়ে?

কি করেছিলাম না করেছিলাম জানি না বাবা! তবে বাবা তো দূর স্থান—বাবার বাবা চেষ্টা করলেও ওকাজ করতে পারতো না শশী বামনীকে দিয়ে। তারপর শশীতারা হেসে বলেছিলেন, পচা কথা ছাড় দিকি। ঠাকুমার কবে ন বছর বয়েস ছিল, তাই নিয়ে চিন্তা। সে কি আর এ জন্ম? আমার তো মনে হয় আর জন্ম।...গোলমাল করে আসল কথাটা চাপা দেওয়া হচ্ছে কেমন? ছেলের যত্ন করবি, শ্বশুরদেরও দেখবি। আমি দৃষ্টি না দিলেই ওরা পেট না ভরতেই উঠে পড়ে।

ঠাকুমা, আপনার মত আমরা কি ওঁদের পেটে এক ছটাকের জায়গায় এক সের মাল ঢোকাতে পারবো?

শশীতারা বলেন, শিখবি! এ নইলে আর মেয়েমানুষ কি! পুরুষ ছেলেরা তো কেবল খাওয়াব ফাঁকি দেওয়ার তালে থাকে।

শশীতারার নাতবৌয়েরা অবশ্য শশীতারার এই মতবাদ বিশ্বাস করে না, সংসারের কেউই করে কি না সন্দেহ, কারণ তার বিপরীতটাই বরং দেখে আসছে তারা। তবু এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করে না। শুধু মনে মনে হাসে।

শশীতারার যাওয়ার খবরে গ্রামসুদ্ধু লোকের একই প্রশ্ন, কতো দিনের জন্যে যাবেন? কবে আসবেন?

কারণ শশীতারা এই ফুলপুর গ্রামের এক দীর্ঘদিনের নায়িকা। ভগবানের শশীতারা বিহনে রাতের আকাশও যেমন নিষ্প্রভ, এই শশীতারা বিহনেও ফুলপুর গ্রাম তেমনি নিষ্প্রভ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

শশীতারা না থাকলে শেষরাত্রে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে রাস্তায় হাততালির আওয়াজ করতে করতে পুকুরের জলে পড়বে কে?

গ্রামে টিউবকল হয়ে পর্যন্ত ভদ্রলোকদের অনেকেরই পুকুর ভীতি হয়ে গেছে। চাটুয্যে বাড়ির কেউই আর পুকুরে চান করে না, এক এই শশীতারা ব্যতীত। তবে শুধু ওই ভোরের বেলাটি। ওই আসল স্নানটি অবগাহন না হলে তৃপ্তি হয় না তাঁর। তাছাড়া যতবার চান করেন (সেটা অনেক বারই করেন) উঠোনের টিউব ওয়েলেই সারেন।

রাখাল ছোঁড়াটাকে ডেকে বলেন, এই, একটু খ্যাচার খ্যাচার করে দে দিকি, কি জানি পথে কি মাড়িয়ে মলাম!

পথে অহরহই বেরোনো চাই শশীতারার, আর যে কোনো সন্দেহে মাথাটা ভিজিয়ে নেওয়া চাই। কেচে কেচে মটকা তসর সব পয়লট্ট। আগে প্রত্যেকবারই পুকুরে প[illegible]তেন, টিপকল হয়ে সেটা বন্ধ হয়েছে।

তা সে যাই হোক—শশীতারার মতো অতো ভোরে গিয়ে কেউ পড়ে না। হাততালি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তখনও যদি কীট পতঙ্গ সাপ খোপরা পথে থেকে থাকে, শব্দ শুনে সরে যাবে।

অতএব বলা যায় শশীতারা ঘুমন্ত গ্রামটাকে সোনার কাঠি ছোঁয়ান।

শশীতারা না থাকলে স্নান সেরে আবছা ভোরে কে পাড়া চষে ফুল তুলে বেড়াবে? আর পাড়ার ফুলচোর ছোঁড়াগুলোকে শাসন করবে? এই কাকভোরে উঠে ফুল চুরি করতে বেরিয়েছিস হাভাতেরা? বলি মা বাপের কি একটু শাসন নেই? গাছে চড়ছিস? পড়ে হাত পা ভাঙবি? নেমে আয় বলছি।

ছেলেগুলো বলে, বা রে ঠাকুমা, তুমিও তো ফুল নিচ্ছো?

চুরিটা আর উচ্চারণ করতে সাহস করে না। আড়ালে বলে, নিজের বেলায় আঁটিসুটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি।

সামনে বলার সাহস নেই।

শশীতারা জোরালো গলায় বলেন, আমি তোদের মতন ফুল নষ্ট করতে নিচ্ছি কেমন?

আমরা কি নষ্ট করছি?

তবে কী করছিস?

এই যদি কেউ পুজো টুজো করে। তুমি তো চাঁপা গাছে উঠতে পারো না, নেবে ঠাকুমা চাঁপা ফুল?

শশীতারা হাসি মেশা গলায় বলেন, তোরা যে দিতে চাইলি এতেই আমি সাতপুরুষে বর্তে গেলাম বাবা ধনেরা। তোদের ওই অ্যাডাবাসি পেণ্টুল পরে তোলা ফুল নিয়ে আর সগগে যেতে চাই না বাবা। তারপর তেজালো গলায় বলেন, ভোরের বেলা এসে গাছে ছাইভস্ম হাত দিবি না বলে দিচ্ছি। ফের যদি দেখি তো দেখাবো মজা।

ছেলেগুলো পালায়।

অতঃপর শশীতারা কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আওড়াতে বাকি ফুল তুলসী সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরেন। শশীতারা না থাকলে এই সাড়াটি জাগাবে কে?

শশীতারা বলেন, ঠাকুরের নাম গান স্তব স্তোত্র উচ্চৈস্বরে কবতে হয়। ওতে ত্রিজগতের উপকার করা হয়। বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ জলস্থল আকাশ বাতাস ওদের তো নাম করার ক্ষমতা নেই, তবু শ্রবণে উদ্ধার হয়।

এইসব বলেন বটে, তবে একথা মনে করার হেতু নেই শশীতারা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর।

এসব কথা শশীতারা লোক শিক্ষার্থে ব্যবহাব করেন। জনগণের তো শিক্ষার দবকার?

তা শশীতারা ছাড়া কে এই সব দরকার বোঝে? কে বুঝবে?

তাছাড়া শশীতারা না থাকলে রোজ সকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাইয়ের তত্ত্বতল্লাশ নেবে কে?

সকালবেলা পুজো আহ্নিক সেরে চরণামৃতটুকু মাত্র গলায় ঢেলে শশীতারা ওই তত্ত্বতল্লাশে বেরোন। পথেই যাদের সঙ্গে দেখা হয়, প্রায় সকলেই চাষাভুষো সক্কাল বেলাই না বেরোলে নয় তাদের।

নচেৎ গ্রামের বা মফস্বলের লোক সাধারণতঃ একটু অলস আয়েসী হয়। শহরেব মতো তারা ভোরে থেকেই ছুটোছুটি করে না। তারা ঘুম থেকে ওঠে বেলায়, দাঁতন করে একঘণ্টা। সকালে চায়ের অভ্যাসটি থাকলেও তাদের সেটা শহুরেদের মতো শুধু দুখানা বিস্কিট কি একটা টোস্ট দিয়ে সারা হয় না, তার সঙ্গে মুড়ি ফুলুরি, ছোলা মটর সেদ্ধ, এসব থাকেই প্রায়। কাজেই প্রাতরাশেও দেবী।

অতএব দোকানী দোকানের ঝাঁপ খোলে বেলা আটটা নটায়, গোয়ালা দশটার আগে দুধ দেয় না, বাসন মাজা ঝি আসে বেলা চড়চড়িয়ে।

প্রাইমারী স্কুলের ছেলেগুলোকে যেতে হয় বটে সক্কাল বেলা, প্রায়ই তারা ঘুম থেকে উঠে বাসিমুখ ধোয়া কি না ধোয়া করে বাসি রুটি পরোটা আর গুড খেয়ে ছোটে। আর দুপুরের ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলো প্রায়শঃ ফেনভাত খেয়ে রওনা দেয়। একান্নবর্তী পরিবার এখনো এরকম সব জায়গায় কিছু পাওয়া যায়, কাজেই বাড়ির দু'তিনটি বৌয়ের মধ্যে একজন বৌ হয়তো চান না করেই রান্না ঘরের বাইরে দাওয়ায়

গর্ত কাটা উনুনে দুটো কাঠকুটো জ্বেলে ওই ভাতে ভাতটা চড়িয়ে দেয়। ইদানীং অনেক বাড়িতে ওই কাঠকুটোর জায়গাটা জনতা ষ্টোভ দখল করেছে, কিন্তু সেটা হিসেবী বাড়িতে নয়, বে-হিসেবী বাড়িতে। গাঁয়ে ঘরে কাঠকুটো অমনি অমনি মেলে, কেরোসিন অমনি মেলে না।

তবে যাদের বাড়িতে ডেলি প্যাসেঞ্জারীর ব্যাপার আছে তাদের বাড়ির পদ্ধতি আলাদা। যেমন ওই চাটুয্যে বাড়িতেই। শশীতারার উকিল ভাইপো অবশ্য সদরে বাসা ভাড়া করে আছে, কিন্তু বৌকে নিয়ে, নয়তো পুরনো চাকর দামোদরকে নিয়ে। ছুটির আগের দিন চলে আসে। আর কোর্টে তো ছুটিছাটা লেগেই আছে।

আর দুই ভাইপো এবং ভাইপোর ছেলেরা ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে। বড় ভাইপো কিছুদিন হলো অবসর নিয়েছে। নচেৎ সেও যেতো।

অতএব চাটুয্যে বাড়িতে ভোর থেকেই কর্মচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যায়।

তবে ওই ডেলি প্যাসেঞ্জারীর প্রয়োজন না থাকলেও শশীতারা কি কাউকে স্বস্তি দিতেন? ছোট ভাইপোবৌ বলে, পাগল! কাজ না থাকলেও উনি অন্ধকার থাকতে লাগ ঝমাঝম লাগিয়ে দিতেন।

তা এতো কাজই আছে।

এই যে বেরোন শশীতারা, সে কি বাড়ির মোহড়া না মিটিয়ে? নিজে হাতে পায়ে কিছু এ সময় না করলেও মুখের জোরেই চাকাকে ঘুরিয়ে চালু করে দিয়ে তবে যান। ওরা কেউ আটটা, কেউ সাড়ে আটটার গাড়িতে বেরোয়, শশীতারা তার মধ্যেই টহল সেরে বাড়ি ফেরেন। এ সময় তো কারুর বাড়ির মধ্যে ঢোকেন না, বাইরে থেকেই ডাক দেন, কিরে সাধন, এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিস না কি? বলি দোকানের ঝাঁপ তুলবি কি তিনপো'র বেলায়? ওতে লক্ষ্মী ছেড়ে যান সাধন! ভোরের বেলা কাচা কাপড়ে গিয়ে দোকানে ধুনো গঙ্গাজল দিবি, ঠাকুরের নাম স্মরণ করে ঝাঁপ খুলে বসবি। তবে না মা লক্ষ্মী ফিরে তাকাবেন। তা নয়—বেলা দুপুরে ঘুম থেকে উঠছে।

বকতে বকতে ততক্ষণে আর একটা বাড়িতে এসে পৌঁছে গেছেন। অনাথ, উঠেছো নাকি? ও অনাথ? উঠেছো? তবু ভালো, আমি ভাবছি তোমারও হয়তো ওই সাধন নগেন ভজুর মতন এখনও ঘুম ভাঙেনি। মাস্টারী করে খাও, তোমার তো বাপু আয়েস করা চলবে না। চলা উচিত নয়। কথায় আছে আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে! নিজেই যদি দিষ্টান্ত না হবে তো ছাত্তররা শিখবে কোথা থেকে?

অনাথ মাষ্টার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, পিসিমা, চান আহ্নিক হোয়ে গেছে এরই মধ্যে?

প্রশ্নটা বাহুল্য।

এই সময় ওটা হবে না শশীতারার এমন হয় না। তবু শশীতারাকে এ হেন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। কারণ—এই সব লোকেরা কথায় বৈচিত্র আনতে জানে না। একই কথা রোজ কয়।

শশীতারাও হয়তো একই কথা বলেন, কিন্তু একই ভাষায় নয়। শশীতারা আজ যদি বলেন, তোমার এক কথা অনাথ মাষ্টার! বেলা কি বসে আছে?

তাহলে কাল বলবেন, হ্যাঁ বাবা, লোক জাগরণের আগেই ও পাট চুকিয়ে ফেলা ভাল। সংসার জাগলেই বিঘ্ন।

অথচ নিজেই তিনি নির্বিঘ্নে বসে ভগবানের নাম করার বদলে সংসারকে জাগিয়ে বেড়ান। তা সে কথা বলার সাহস তো দূরস্থান, বলার কথা মনেই আসে না কারুর!

অনাথ মাষ্টার সম্ভ্রমে বলে, পিসিমার পুণ্যের শরীর।

অনাথ এদেশের ছেলে নয়, তবে আছে অনেক বছর, মাস্টারী করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলল। তাহলেও পিসিমাই বলে। নচেৎ অনাথ মাষ্টারের বয়সী অনেকেই ঠাকুমাও বলে, বাপ কাকা 'পিসি' বলে ডাকে।

শশীঠাকুরুণ নাড়ু বোসের উঠোনের ধারে দাঁড়ান, বৌ উঠেছিস নাকি?

বোসের বৌ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।

আলগোছে একটা প্রণাম করে বলে, ঠাকরুণ।

আহা থাক্ থাক্, রোজ পেন্নাম কিসের লা?

নাড়ু বোসের বৌ বড় ভক্তিমতী, সে বলে, আপনাকে চারবেলা পেন্নাম করতে পেলেও মানুষ ধন্যি ঠাকরুণ!

দূর বাবা, যতো আলাত পালাত কথা! নাড়ু উঠেছে?

বৌ সভয়ে একবার শোবার ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে মাথা নাড়ে।

জানি। ওই আয়েসেই ওর মাথাটা খেয়েছে। নচেৎ একবার চাকরী গেলে আর চাকরী হয় না মানুষের? সেই কোন জন্মে চাকরী খুইয়ে সংসারের হাড়ির হাল করে বসে আছে। ছেলেটা ইস্কুলে যায় নিয়ম করে?

নাড়ুর বৌ বলে, হ্যাঁ।

অনাথ মাষ্টারকে বলে শশীঠাকরুণ নাড়ুর ছেলেটাকে ফ্রী করে দিয়েছেন, আর ভাইপোদের বলে নিজের বাড়ির দু তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্যে নাড়ুকে প্রাইভেট টিউটার রাখিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য ভাইপোদের ওই আলসে কুড়ে নাড়ুটার ওপর তেমন ছেদ্দা ভক্তি ছিল না, কিন্তু পিসির কথার ওপর তো কথা চলে না?

শশী ঠাকরুণ বলেছিলেন, তোমরা যদি তোমাদের আপিস কাচারীতে ছোঁড়ার একটা কাজ কম্ম করে দিতে পারতে, তাহলে এ প্রস্তাব আমি করতাম না। পড়াবে যে কতো তা জানতে বাকি নেই আমার, খানিক আটকে রাখবে এই মাত্তর। তবে ও বুদ্ধিহীন বলে ওর বৌটা ছেলেটা ভেসে যাবে, এটা তো ন্যায্য নীতি নয় বাবা? মানুষের সমাজে যখন বাস কবছো, তখন মানুষের পবিচয়টা তো রাখতে হবে। তোমরা যদি মাসে মাসে ওকে সাহায্য না করো, তাহলে ওকে ভিকিবিতে পরিণত করা হবে। ওকে একটা কাজ দিয়ে উভয় পক্ষের মান রাখো।

তা নাড়ু বোস ওব ওই শিক্ষকতা রূপ চাকরীটির মাইনে যাই হোক, জিনিসটাকে খুব দামী ভাবে। সসম্ভ্রমে এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজটা করে।

নাড়ুর বৌও কিছু কিছু রোজগার করে।

যেমন কেউ এক গামলা ডাল ভিজিয়ে খবর দিয়ে গেল, ও চরণের মা, চারটি বডি দিয়ে দেবে"

নাড়ুর বৌ ঘাড নেড়ে সায় দেয়। তারপরে সেই ডালেব কাঁড়ি বেটে বডি নিযে আসে। তাবা 'তোমার চরণকে মিষ্টি কিনে দিও' বলে টাকাটা আধুলিটা দেয়। তা এমন অফার প্রায়ই পায় নাড়ুর বৌ। এছাড়া আবার আমসত্বও করে দেয় মাঝে মাঝে।

শশীঠাকরুণ বলেন, ছোট লোকের মেয়েরাই প্রকৃত সুখী। তাদের কোনো কাজে মান অপমান নেই। লোকের বাসন মাজুক, ক্ষার কাচুক, গোয়ালে গোবর দিক, নিন্দে নেই। ভদ্দব লোকেব মেয়েদেরই হাত পা বাঁধা, স্বামীর পয়সা থাকলো তো সুখ করো, না থাকলো তো হাডে দুব্বো গজাও। এই তোর হযেছে সেই জ্বালা।

তা' কার হাডে যে দুব্বো গজাচ্ছে, সেটা শশীঠাকরুণ কেমন এক দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পান। কারুর নজরে পড়ে না—ওঁর নজরে পডে যায়।

নাড়ুব বৌকে নির্দেশ দিয়ে যান শশীঠাকরুণ, দুপুরবেলা একটা বাটি হাতে যাস দিকিন, চরণের জন্য একটু দুধ আমসত্ত্ব মাখা ভাত দেব। ছেলেটা বড ভালবাসে।

এটাও অবশ্য সাহায্যেরই আর এক রকম ফের। কোনোদিন চরণের নাম করে দুধ আমসত্ব, কোনোদিন চরণের মার নাম করে ওদের আমিষ ঘর থেকে একটু মাছের ল্যাজা, আর সেই ছুতোয় এক কাঁসি ভাত, কোনো দিন বা চরণের বাপের নাম করে মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, যাতে ওদের কিছু খানিকটা সাশ্রয় হয়।

গ্রামে ওরকম অনুগত পরিবার শশীঠাকরুণের বেশ কিছু আছে।

ওদের ওখান থেকে শশীঠাকরুণ বিপিন কোবরেজের বাড়ির দরজায় আসেন। বিপিন কোবরেজ হয়তো তখন বাইরের দাওয়ায় বসে দাঁতন করছে।

শশীঠাকরুণ বলেন, আয়ুর্বেদও একটা বেদ বুঝলি রে বিপিন! শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে সদরে দাঁতন করছিস? মা লক্ষ্মী ঢুকবেন কোন দরজা দিয়ে?

বিপিন নিমের কাঠি দাঁতে চেপেই বলে, মা লক্ষ্মী আর এবাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে আসছেন না পিসি, ভয় নেই।

আসবেন আর কোথা থেকে, যতো সব লক্ষ্মীছাড়ার আচরণ। তা মা কেমন আছে?

ওই একরকম! কেমন আর থাকা থাকি!

বলি ও আবার কেমন কথা বিপিন?

শশীঠাকরুণ রেগে ওঠেন, গর্ভধারিণী মাকে হেলাফেলা করলে কোনো মাই দোর মাড়াবেন না বিপিন! বদ্যির বেটা হয়ে মায়ের ওই সামান্য আমাশাটা ভালো করতে পারছিস না?

রোগটা সামান্য নয় পিসি!

তোকে বলেছে। একটি টোটকায় এক্ষুনি তোর মাকে বিছানা থেকে ওঠাতে পারা যায় বিপিন! তবে তুই কোবরেজ ব্যাটা থাকতে তোর মা টোটকায় সারবে এটা দিষ্টান্ত খারাপ, তাই দিই না।

বিপিন বলে, তা দেবেন তো দিন না পিসি! তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ও, আপত্তি নেই! খুব যে বড়ো বড়ো কথা! বলি তোর আপত্তির ধার কে ধারছে রে? আপত্তি আমারই। তাতে তোর যেটুকু বা পসার আছে, ঘুচবে। ভাল দেখে ওষুধ দে।

বিপিন কোবরেজ তথাপি অনমনীয় গলায় বলে, এ বয়সে আর ভাল ওষুধ!

শশীঠাকরুণ জ্বলে যান, বলেন বয়েস তোরও একদিন হবে বিপিন! বয়েস দেখিয়ে অবহেলা করিসনে। তোর মা আমার থেকে বয়সে কম করে সাত আট মাসের ছোটো।

তা' আপনার মতন তো আর স্বাস্থ্যটি বজায় রাখতে পারেননি?

শশীঠাকরুণ কিন্তু নিজের এই পারগতার উল্লেখে হৃষ্ট হন না। ববং রুষ্ট হয়ে বলেন, আমার কথা বাদ দে বিপিন! বড়ো মানুষের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, চিরটাকাল ঘী দুধে আছি। তোর মার তাই? না না, মাকে অবহেলা করবি না, নরকেও ঠাঁই হবে না।

এইভাবেই প্রাতঃভ্রমণটা চালিয়ে যান শশীঠাকরুণ।

পুরুত ভট্টাচার্য থেকে দিনু গোয়ালা পর্যন্ত সব বাড়ির তত্ত্ব নেওয়া চাই।

তবে ওই চাষীভূষোদের প্রতিই যেন বেশী কৃপাময়ী শশীঠাকরুণ। পথে চলতে চলতে বলেন, মাখন তোলা ঘীটা দিয়ে এলি দিনু, দাম নিতে যাবার ফুরসৎ নেই? কী এমন নবাব সিরাজউদ্দৌলা হয়েছিল রে? যাবি, আজই যাবি।

আবার বলেন, হারাণ, এবার বিষ্টির গতিক কেমন মনে হচ্ছে? ধান ভাল উঠবে? .তোর চাক আজ ক'দিন বন্ধ কেন বে, পঞ্চু? কুমোবেব চাক, কামারের হাপর, তাঁতির তাঁত, এসব বন্ধ দিতে নেই বুঝলি? আমার ঠাকুরর্দা বলতেন, ওতে ওদের উপোস লাগে! আর উপোস লাগলেই নিশ্বাস পড়ে। একবাব করে ছুঁতেও হয়। আব কাজই লক্ষ্মী—বুঝলি পঞ্চু। তুই যতো খাটবি, মা লক্ষ্মী ততো সদয় হবেন। কাল বিস্যুদবার আছে। আমার দুখানা লক্ষ্মীর সরা দিয়ে আসিস দিকিন। এও সাহায্য। তবু যদি পঞ্চু ওতে একটু চাঙ্গা হয়। কাজকর্ম নেই বলেই না—

এতো কাণ্ড করেও কিন্তু শশীঠাকরুণ ভাইপো আর নাতিদের টাইমের ভাতের সময় এসে হাজির হন।

সকলের আপ্রাণ প্রার্থনাতেও রদ হয় না এটি।

প্রার্থনা এই জন্যে, পুরুষ ছেলেদের ফাঁকি দেওয়ার তাল জেনে ফেলা শশীতারা তাদের এক ছটাক মাপের পাকস্থলীর মধ্যে একসের মাল চালান দেবার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা রীতিমত কষ্টদায়ক।

কারণ প্রথমেই এসে বলে বসেন, রাত্তিরে যে আনাজ তরকারিগুলো কুটে মলাম বড় বৌমা, সে কি ভূত ভোজন করাতে? কই—এঁচড়ের ডালনা কই? মোচার ঘণ্ট কই? মাছই বা মোটে একখানা

কেন? সকাল থেকে ওই সামান্য রান্নাও হয়ে ওঠেনি? তা না যদি হয়ে থাকে, দুখানা পুরের ভাজা করে দিতে পারতে। আসল মানুষদের খাওয়াতেই অবহেলা।

আসল মানুষরা এতে মরমে মরে গিয়ে হাঁ হা করে বলে, না-না, ওসব রান্না টান্না বোধহয় হয়ে গেছে। আমরাই বারণ করেছি।

কেন, বারণ করেছো কেন? বাহাদুরী দেখানো, না বৌদের কুলোবে না এই ভয়ে? সংসারে অভাব?

এ অপবাদে ছেলেরা ঘাড় হেঁট করে, বিবাহিত নাতিরা বলে, আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি উকিল হলে না কেন? অপর পক্ষকে কোনঠাসা করতে তোমার তো দেখি জুড়ি নেই। এই সক্কাল বেলা এতো খাওয়া যায়?

বলি এতো দিনেও অভ্যেস হলো না? চিরকাল যখন এই কর্মই করতে হবে তো খাবি কবে তবে?

কেউ খায় না বাবা এতো।

খায় না, তেমনি তাদের চল্লিশের আগেই চালসে ধরে, পঞ্চাশে শিরদাঁড়ায় ঘুণ ধরে। খাওয়ার জোরেই বল শক্তি। খাবি না তো সারাটা দিন যুঝবি কিসের জোবে? বড় বৌমা, রাতের তৈরী ক্ষীর নেই? তাই দাওতো একটু। মাছ খানা শুধু কাঁটা বাছা করে ফেলে দিল। ওরা খেতে চায়না বলে তোমরাও ওদের গোড়ে গোড় দেবে? মাছ না খেলে চোখের জ্যোতি থাকে?

মেজ নাতিটা দুষ্টু হেসে বলে, তোমায় দেখে তো সেকথা বিশ্বাস করা যায় না ঠাকুমা! তোমার যা চোখের জ্যোতি, এখনো একশো বছর আমাদের পাহারা দিয়ে বেড়াতে পারবে।

শশীঠাকরুণ রাগ করেন না, বলেন, তা সেটা মন্দ কি? চোখ কান খুইয়ে হাত পা পড়ে দলা পাকিয়ে বসে থাকাই বুঝি ভাল?

কথা কথা!

অজস্র কথা।

শশী ঠাকরুণের কথার ভাঁড়ারে যেন অনবরত খই ভাজার খোলা চড়ানই আছে। সবাই ভাবে এতো জীবনী শক্তি কোথা থেকে সংগ্রহ কবলেন শশীঠাকরুণ?

শশীঠাকরুণের কথায় কেউ রেগে ওঠে না, এই এক আশ্চর্য।

বৌদের কি কম হ্যানস্থা করে কথা বলেন? বুড়ো বুড়ো ছেলেদের কম শাসন করেন? কেউ চোপা করার কথা ভাবতেই পারে না।

শশীঠাকরুণ শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। এ খবর তাই অনেকের কাছেই দুর্ভাবনার। ফুলপুরের পেবাণ পুতুলটি নে যাচ্ছো পিসি ঠাকরুণ! ফিরতে দেরী কোরোনি। যুগীবৌ বলে।

শশীতারা বলেন, কেন রে আমায় কি মবতে হবে না? ফুলপুরের পেরাণ বললে চলবে কেন?

না চললে কি করবো বলেন? যা হক কথা তাই বলছি। তুমি সেবার ছিক্ষেত্তর গেলে মাত্তর সাতটি দিনের জন্যে, তাতেই গেরাম সুদ্ধু লোক হেঁপিয়ে মরছিল। ফিরে এলে বাঁচা গেল।

শশীঠাকরুণ হাসেন। অতো ভক্তি তুচ্ছ একটা মানুষকে না করে ভগবানকে কর যুগী বৌ।

ওসব জানিনে বাবা! তুমিই আমাদের ভগবান। কবে আসবে বলে যাও।

এই রে বাবা, যাই আগে।

আরো অনেকেই কথাটা যাচাই করে নিতে চাইছে।

কবে আসবেন? কবে আসবেন? আপনি না থাকলে ফুলপুর অন্ধকার।

হয়তো যতটা ভাবে, বলে তার থেকে বেশী, সেটাই সৌজন্য। আর ভাবে না, তাও নয়। সবাই বলে শশীঠাকরুণ আছেন না পর্বতের আড়ালে আছি। বলে, দেশসুদ্ধু লোকের উনি গার্জেন। উনি গত হলেই দেখবে সব বেচাল হয়ে উঠবে। ঝি বৌ ওনার ভয়ে টিট্।

শশীঠাকরুণ বলেন, নাঃ আমাকে দেখছি মরে আবার পেত্নী হয়েই এই ফুলপুরেই এসে বাঁশ বনে টনে আশ্রয় নিতে হবে।

এই শশীঠাকরুণ শ্বশুরবাড়ি চললেন।

সাইকেল রিকশয়—স্টেশনে যেতে হবে।

মদন রিক্‌শাওলা এসে বলে যায়, ঠিক সময় আসবো ঠাকরুণ। সেজবাবু বলে রেখেছে। সেজ ভাইপো সঙ্গে যাবে।

সাইকেল রিকশ নিয়ে চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে মদন প্রশ্ন করে, কবে ফিরছেন ঠাকরুণ?

শশীঠাকরুণ জানেন দিন সাতেকের বেশী থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এই সাতটা দিন মরে পিটে থাকতেই হবে। যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, তাতে ওর কমে হবে না। তবে পষ্ট করে তারিখটা কাউকে বলেন না। যদি গিয়ে না টিকতে পারেন? যদি পরদিনই পালিয়ে আসতে হয়? তাই বলেন, মন হলেই চলে আসবো।

কিন্তু কেন যাচ্ছেন?

তার উত্তর দিয়েছেন, কেন, শ্বশুরবাড়িতে একবার যেতে নেই? ধরে নে তীর্থ দর্শনে যাচ্ছি।

যদিচ সারাজীবনে কেউ কোনদিন শশীতারার এই তীর্থ ভক্তির পরিচয় পায়নি।

তবে যাওয়ার আসল কারণটি জানে শশীতারার সেজ ভাইপো অজিত চাটুয্যে। সে উকিল বলেই জানে অথবা ঠিক বলতে গেলে সেই শশীতারাকে জানিয়েছে।

শশীতারার শ্বশুরবাড়ি বীরনগরে তাদের গুষ্ঠির আর কে কোথায় আছে জানা না থাকলেও—শশীতারার সৎ শাশুড়ী বুড়ি যে আকন্দরডাল মুড়ি দিয়ে এ যাবৎ ইহ সংসারে টিঁকে ছিল, ওটা অজিতই শশীতারাকে জানিয়েছিল এবং এও জানিয়েছিল জমি জমা যা আছে তা নেহাৎ কম নয়। এখন বীরনগর প্রায় টাউন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন ওখানের জমি বিঘের দামে কাঠা। বুড়ি তো এযাবৎ সব ভোগ করেছে, সে থাকতে উকি মারতে যাওয়াও অসম্ভব তা জানা ছিল। সম্প্রতি সেই বুড়ি গত হয়েছে, এখন অজিত চুপি চুপি প্ররোচনা পরামর্শ দিচ্ছে, এসময় গিয়ে পড়া দরকার। সৎ শাশুড়ীর ছেলে পিলে যাই থাকুক, শশীতারার তো অর্ধেক হিস্যা?

অতএব?

অতএব ভিটে বাড়ির ভাগ না হোক—বিশ বাইশ বিঘে জমিও অন্ততঃ শশীতারা আইনসঙ্গত ভাবেই পাবেন। যার অর্থ হচ্ছে, বেচলে এখনই বিশ বাইশ হাজার টাকা আর ফেলে রাখলে তো আরো বাড়বার আশা।

ভাইপোর মুখে খবরটা জেনে শশীঠাকরুণ মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলেও, মুখে গাম্ভীর্য রেখে সৎ শাশুড়ীর মরণ স্মরণ করে সবস্ত্রে ডুব দিয়ে এলেন।

পরদিন নোখ কেটে চান করে ভুজ্যিদান করলেন। আর কিছু করার নেই। মরেছেন তিনি মাস দুই আগে।

রেল গাড়িতে যেতে যেতে অজিত হিতকথা শেখাতে থাকে, জ্ঞাতি গুষ্ঠিই তো খাচ্ছে। তারা হঠাৎ তোমায় দেখে পাত্তা দিতে চাইবে বলে মনে হয় না। তুমি কিন্তু শক্ত থেকো পিসি!

শশীতারা বলেন, তুই থাম্ অজা, তোকে আর আমায় বুদ্ধি দিতে হবে না। নেহাৎ শ্বশুরবাড়ি বলে কথা, তাই তোকে সঙ্গে নিচ্ছি। তা'ছাড়া বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ফেরেববাজি করতে হবে, নচেৎ শশীতারা বামনী তোর তক্কা রাখতো নাকি?

তবু অজিত ভুলে ভুলে আর একবার বললো, কেউ যদি খোসামোদ করে মন ভেজাতে আসে, তাহলে ভিজো না।

শশীতারা বললেন, তুই বলবি, তবে আমি ভিজবোনা? নচেৎ ভিজবো?

উকিলের প্যাঁচ নিয়ে অজিত বললো, কেউ তো তোমার যাওয়াটা সুচক্ষা দেখবে না? জ্ঞাতি ট্যাঁতিরা কিছু খেতে দিতে এলে খেও না। কি জানি কোন মতলবে—

শশীতারা বললেন, তুই কি এই মাত্র মায়ের পেট থেকে পড়লি নাকি অজা? কবে কোন জন্মে আমি

কারুর কাছে খেয়েছি? বলে—কখনো কোনো বাড়িতে মা দুগ্‌গার ভোগের পেসাদই গ্রহণ করি না, মাথায় ঠেকাই, মুখে ঢোকাই না। আমায় এলো সাবধান করতে—খেও না! লোকের বাড়ি খেও না! হুঃ।

তদবধি ভাইপো মুখে তালা চাবি এঁটেছে।

শশীতারা যখন বীরনগরে পৌঁছলেন, তখন বেলা দুটো। বুঝে সুজে একাদশীর দিন বেরিয়েছেন, যাতে সেদিনটায় নিশ্চিন্দি।

সঙ্গে আছে নিজের মতো সামান্য কিছু বিছানা বাসন অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস পত্র এবং কাপড় চাদর, আর অতি আবশ্যকীয় বস্তুটি বেশ মোটা অঙ্কে। অভয় চাটুয্যে মেয়ের নামে একটা বড় জমি লিখে গিয়েছিলেন, তার আদায় উসুল থেকে শশীতারার হাত খরচাটা হয়, তীর্থ ধর্ম হয়।

এও তো তীর্থেই এসেছেন।

অজিত ভাত খেয়ে এসেছে, সন্ধ্যের গাড়িতে ফিরে যাবে। স্টেশনে চা জল খাবার খেয়ে নেবে।

অজিত আগে এসে লুকিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে গিয়েছিল, তাই সাইকেল রিকশকে বাড়ি চেনাতে অসুবিধে হলো না।

শশীতারা নেমে পড়লেন, অজিত বললো, আমি আসছি। সেটেলমেণ্ট অফিসটা একবার ঘুরে আসি। তুমি কিছু ঘাবড়াবে না, নিজের ডাঁটে ঢুকবে।

শশীতারা বললেন, তোর বাকবিন্যেস দেখে মনে হচ্ছে অজা, তুই যেন একটা খুকীকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছতে এসেছিস।

অজিত হেসে চলে গেল।

পিসিব ওপর তার যথেষ্টই আস্থা, তবু বলা স্বভাব তা'ই বলছে।

শশীতারা তাকিয়ে দেখলেন, বাইরের অংশটা প্রায় পড়েই গেছে। ইট পাটকেল ঠেলে ঢুকতে হয়। ভিতরের উঠানের দরজাটা বন্ধ।

কিন্তু বেশীক্ষণ বন্ধ থাকলো না, সাইকেল রিকশর শব্দ শুনেই দুটো ছোট ছেলে মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখেই ছুটে ভিতরে চলে গেল।

একটু পরেই গায়ে মাথায় কাপড় টেনে এক প্রৌঢ়া এসে দাঁড়ালেন।

চোখে অসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা।

শশীতারা তাকিয়ে দেখে অনুমানে নির্ভর করে বলে উঠলেন, যিনি মারা গেলেন সম্প্রতি, তাঁর বেটার বৌ বোধ হয়?

প্রৌঢ়া মাথাটা উঁচু নীচু করে বললেন, আপনি? আপনাকে তো—

না কখনো দেখনি। দেখবে কোথা থেকে? সম্পর্ক রাখলে তো? আমি ওনার সতীন-পো বৌ।

মহিলাটিব মুখখানি যদি এতে পাংশুবর্ণ হয়ে যায়, দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে।

তাঁরও প্রায় ষাটের কাছে বয়েস, তবু এযাবৎকাল দজ্জাল শাশুড়ীর বৌ হয়েই কাটিয়ে আসতে হয়েছে। এতোদিনে যদি বা ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, হঠাৎ একী দুর্গ্রহের আবির্ভাব?

ওনার সতীন-পো বৌ!

তার মানে একজন ভাগের ভাগীদার।

শাশুডী মরার খবর পেয়েই কামড়া কামড়ি কবতে ছুটে এসেছেন। বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে জিনিসপত্র নিয়ে বসবাস করতে এলেন। অথচ জন্মেও দেখা সাক্ষাৎ নেই।

বিনা বাক্যে পাথর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি, একটা যে প্রণাম করা উচিত, তাও ভুলে গিয়ে।

শশীতারা অবশ্য অবস্থাটা বোঝেন।

মনে মনে বেশ একটি দিব্য কৌতুক অনুভব করে বলেন, সম্পর্কে গুরুজন হই গো, পেন্নাম একটা করলে জাত যেতো না। যাক্ তা যেচে মান কেঁদে সোহাগ দরকার নেই আমার। এখন কর্তব্য কর্ম্মটুকু করো দিকি। রিকশওলাকে নিয়ে গিয়ে একটু পরিষ্কার দেখে জায়গা দেখিয়ে দাও, জিনিসটা নামিয়ে আসুক।

ও তো আর দাঁড়িয়ে থাকতে আসেনি।

এও একটি বাক্যবাণ।

মহিলাটি দাঁড়িয়েই আছেন।

এতোক্ষণে তিনি একটি প্রণামের ভঙ্গী করে অস্ফুটে বলেন, আপনি ভেতরে যাবেন না?

শোনো কথা। যাবো না তো কি ধূলো পায়ে বিদেয় হবো? দেখতেই তো পাচ্ছো ধুলো পায়ে বিদেয় হতে আসিনি। বাক্স বিছানা নিয়ে এসেছি। ও আগে মালগুলো পার করে আসুক, ভাড়া মিটিয়ে বিদেয় করে তবে ঢুকছি। শাশুড়ী মলেন, তা' একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই! বলি হলেও সৎ শাশুড়ী, খোদ শ্বশুরের পরিবার তো? মরলে হবিষ্যি করতে হয় না? ওমা, সম্পর্কটা স্বীকার পর্যন্ত করা নেই। পাছে দেশের লোক জেনে ফেলে, বুড়ির আরও একটা বৌ আছে। ভাগের ভাগীদার আছে।

মহিলাটি অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, তা আমার বলছেন কেন? আমি তো আপনাকে চোখেই দেখিনি। জানিও না—

দেখনি ঠিকই—শশীতারা তেমনি মনে মনে দিব্য কৌতুকের হাসি হেসে বলেন, তবে জানো না একথা হতেই পারে না। নাও যাও, লোকটা যে সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি তো দেখছি পেল্লায়, ঘরদোর ঢের, বাড়ি ভর্তি লোক আছে এমন তো মনে হচ্ছে না। জায়গায় অকুলোন হবে না।

শশীতারা আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললেন, আর হলেও নাচার। এসেছি যখন যুগ যুগান্তর পরে, পত্রপাঠ বিদের হবো এ মনে কোরো না।

বাঃ তা কেন মনে করতে যাবো।

কেন যাবে? শোনো কথা! এই মাত্তর পৃথিবীতে পড়লে নাকি? ভাগের ভাগীদারকে দেখলে আর কার মনে হয়, ওকে আমার বুকের মধ্যে ভরি। আসলে আমি তোমার শত্রুই, বুঝলে গো?

মহিলাটি এবার পরিষ্কার গলায় বলেন, কেন শত্রুই বা হতে যাবেন কেন?

তা যা বলো না, হলে উত্তম। এখন বলো বাড়িতে আর আছে কে? যে রকম ভোঁ ভাঁ দেখছি, বেশী কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তা' আমার দ্যাওর কোথায়? দেখি সেই বেআক্কলে মানুষটিকে।

প্রৌঢ়ার ভুরুটা কুঁচকে উঠলো, কোনো উত্তর না দিয়ে রিকশওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

শশীতারা অধস্তনকে হুকুম করার ভঙ্গীতে ডেকে বলেন, মেজেটা একটু মুছে তবে নামিও।

প্রৌঢ়া চলে গেলে শশীতারা বাইরে থেকেই মুখ উঁচু করে দেখেন। দোতলার ছাতের কার্নিশটা যেন ঝুলে রয়েছে। সর্বনাশ! যে কোনো সময় তো হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। সেকালের বাড়ি, কার্নিশেই কতো ইট। ওই ভেঙে পড় পড় অবস্থার কারণও সামনেই দেদীপ্যমান। একটা পুষ্ট অশ্বত্থগাছ সতেজ বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে সেই ফাটলের খাঁজে।

বাড়িতে কী কুচোকাঁচা কিছু নেই?

তাই বুড়ো বুড়ির ভয় নেই প্রাণে?

কিন্তু কচিকাঁচা নেই তা বলা যায় কী করে? প্রথমে তো দুটো ছোট ছেলে মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ...ওই বুড়ির ছেলে মেয়ে বলে মনে হয় না। বোধহয় ওই গিন্নীর দ্যাওরপো হবে। ওর তো বয়স হয়েছে। এতোটুকু ছেলে মেয়ে হবার কথা নয়। তা—এই একটি গিন্নীকেই তো দেখছি। আর কেউ আছে না নেই?

রিকশাওলা ফিরে আসে।

তাকে পাওনার অতিরিক্ত বখশীস দিয়ে বিদেয় করেন শশীতারা।

প্রৌঢ়াও ফিরে এসেছিলেন আবার। শশীতারা বলেন, নাও এখন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। কে কাকে পথ দেখায়। এ বাড়িতে আগে ঢুকেছিল কে?

মহিলাটি বলেন, হাত মুখ ধোবেন তো?

হবে! হবে! মুখ হাত ধুয়ে তো আর আজ জলখাবারের থালা নিয়ে বসবো না।

মহিলাটির মনে পড়লো, ও আজ একাদশী। সত্যি বলতে তিনি যেন একটু স্বস্তিই পেলেন। এক্ষুনি আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা নিয়ে বসতে হবে না!

শশীতারার তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টির কাছে ব্যাপারটা ধরা না পড়ে পারে না। শশীতারা ভারী একটা মজা অনুভব করেন। মনে করেন, তা বাপু হঠাৎ এমন জুড়ে বসবার তাল করে উড়ে আসছি আমি। ভাল লাগবে কেন? মুখে বলেন, আমার খাবার জন্যে ভাববার কিছু নেই। সব আমার আছে।

মহিলাটি একটু বোধহয় চমকান। বলেন, কি আছে?

সবই আছে। এখানে কে আছে কেমন ধারা লোক তার কিছুই যখন জানি না, তখন নিজের ব্যবস্থা তো করে আসতে হবে। তা ছাড়া—শশীতারা ভিতরে কৌতুকের হাসি চেপে বলেন, তাছাড়া আমার ভাইপো বলে দিয়েছে, যেখানে সেখানে কেউ কিছু বললেই যেন খেয়ো টেয়ো না পিসি। সম্পর্ক তো ভালো নয়। কার মনে কি আছে!

মহিলাটির শুধু ভুরুই নয়, মুখ চোখ সবই কুঁচকে ওঠে।

তাঁর বোধকরি বুঝতে বাকী থাকে না, কেমন সাংঘাতিক একখানি চীজ এসে ঢুকলেন।

তবু তিনি বেজায় গলায় বলেন, আপনার ভাইপো খুব বুদ্ধিমান দেখছি।

তা বুদ্ধিমান বৈকি। উকিল তো! বলে মহিলাকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ভিতরে যান ওর পিছনে পিছনে। আর ঢুকে এসে যেন অবাকই হয়ে যান।

আশ্চর্য তো! মনে হচ্ছে বাড়িটা যেন কতো চেনা, কতোবার দেখেছেন। অথচ সেই তো কোন পূর্বজন্মে বিয়ে নামক ঠাট্টার নাটকটায় অষ্টমঙ্গলার আটদিন মাত্র। তা সে তো ঘোমটার মধ্যেই কেটেছে। তবু যেন কতো পরিচিত।

কী অদ্ভুত।

কী অদ্ভুত।

নিজেকে প্রায় জাতিস্মর মনে হচ্ছে শশীতারার।

তা পূর্বজন্ম ছাড়া আর কী? দেখবামাত্র মনে হচ্ছে আমি এখানেব চিরকালের।

এতোকালের মধ্যে এরা বাড়ির কোনো পরিবর্তন সাধন করেনি। এও এক আশ্চর্য। ফুলপুরের চাটুয্যে বাড়ির ইমারতখানা এই শশীতারা কতো রং বদল কবালো, কতো রূপ বদল করালো।

কতো জানলা ভেঙ্গে দরজা, কতো দরজা বুজিয়ে জানলা করা হযেছে সেখানে। উঠানে ঘব উঠেছে দেয়াল ফেলে। রান্নাঘরের কতো ছিরি ফেরানো হয়েছে। আর বীবনগবের এই বাডিখানা যেন যাদুঘবের তাকে বসে আছে অবিকল প্রাচীন চেহারা নিয়ে।

যেমন উঠোনের চারধার ঘিরে ঘর ছিল, তার একপাশের ঘরগুলো রান্নাঘর—ভাঁডাব ঘর, খাবার ঘব ইত্যাদি, বাকি তিন পাশেরগুলো শোবার। সব আছে। কতো লোক ছিল তখন?

শশীতারার মনে হলো তিনি যেন দেখতে পেলেন, সমস্ত বাড়িটা মানুষে ঠাসা। তখন সে বাড়িটা বিয়ে বাড়ি ছিল, আর সেই জন্যেই অতো লোক ছিল, সেটা মনে পড়লো না শশীতাবার।

শশীতারা যেন সেই মানুষগুলোর জন্যে হাহাকার অনুভব করলেন। কিন্তু এই সব যে শশীতাবাব মনে ছিল, সেটাই তো শশীতারা নিজে জানতেন না।

অথচ এখন দেখছেন, কী অবাক কাণ্ড, যা দেখেছিলাম অবিকল তাই রয়েছে। সেই—উঠোনের ওই পাশের একটু সরু প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে গেলেই খিড়কি দরজা, সেই দালানের ওপরকার দবজাটার দু'পাশে আধা থামের মতো বাহার। দরজার পাল্লা দুখানা পিতলের গুলো মারা।

সব ঠিক আছে, শুধু সেই সাবেক কালের ঝকঝকে আঁটসাঁট চেহারাটা ঝুলে পডেছে, দেওয়ালের বালি ঝরে পড়ে ইঁট বেরিয়ে গেছে। আর দেয়াল বেয়ে শ্যাওলার দরানি গড়াচ্ছে।

কিন্তু তবু সেই দরজা, সেই জানলা সেই সিঁড়ি, সেই ঘর দালান।

শশীতারার কোন স্মৃতির সিন্ধুকে জমা ছিল এরা? শশীতারা তো সম্পূর্ণ এক অজানা অচেনা জায়গায়

আসছেন এমন মনোভাব নিয়েই এসেছিলেন। সত্যি বলতে, বাড়িটা সম্পর্কে কোনো ধারণাও ছিল না। মনের জগতে ছিল অনেকখানি জমি। যা নাকি এখন বিঘের দামে কাঠা। আর সেই অনেকখানির অর্ধেকটার মালিক হচ্ছেন শশীতারা দেবী।

এখানে এসে জমিটা কেমন ধূসর হয়ে গেল। বাড়িটাই প্রবল বেগে মনের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে।

এটা হলো বোধহয় স্টেশন থেকে গ্রামে ঢোকার পথটার অনেক বদল দেখে। ঢোকার সময় অজিতকে সেকথা বলেছেন, জানিস অজিত, মনে অবিশ্যি বেশী কিছু নেই, তবু মনে পড়ছে, সেই যে থাড়ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে গ্রামে ঢুকেছিলাম, তখন যেন চারিদিকে ঝোপ জঙ্গল, বুনো বুনো গন্ধ। কিন্তু এ তো দেখছি দিব্যি শহর বাজার। আবার ইষ্টিশনের ধারে বাইসকোপ।

অজিত বলেছিল, হাল চাল বদলে গেছে পিসি। এখন এখানকার ছেলেরাও চোঙা প্যান্ট পরে, দেয়ালে ধুয়ো লেখে। তোমার শ্বশুর বাড়ির দেশটা অনেক প্রগতিশীল হয়ে গেছে।

দেশটা প্রগতিশীল হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় দেশের মধ্যে কার সেই প্রাণ ভোমরাটুকু একেবারে পুরণো চেহারাখানা নিয়ে বসে আছে এটা অপ্রত্যাশিত লাগলো। আর যা অপ্রত্যাশিত তাই তো আহ্লাদের।

শশীতারা উর্দ্ধমুখে তাকিয়ে দেখে বললেন, পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে বোধহয় বাড়িতে মিস্তিরি মজুর লাগেনি?

কথাটা ফট্ করে গায়ে লাগলো প্রৌঢ়া মহিলাটির।

তিনি বেজার গলায় বললেন, লাগাবার মতো আছে কে, যে লাগাবে?

শশীতারা অবশ্য ওর ওই বেজারে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। বললেন, যারা ভোগ করছে তারা ছাড়া আর কে করতে আসবে? জমি জলা বাগান পুকুর বিষয় আশয় তো কম ছিল না আমাদের শ্বশুর ঠাকুরের!

এই—আমাদের শ্বশুর ঠাকুরের শব্দটি উচ্চারণ করায় রীতিমত পলিটিকস আছে। প্রৌঢ়া যাতে জ্বলে যান।

তা তিনি গেলেনও। ভাবলেন, তার মানে ইনি কোমর বেঁধেই এসেছেন। ইনিও যে সমান অংশীদাব তা শোনালেন। একে উচ্ছেদ করতে না পারলে ওই আলসের অশ্বত্থের চারার মতই হবে।

মহিলা বেজার গলায় বললেন, সেই আশাতেই বোধহয় ছুটে এসেছেন শাশুড়ী যেতে না যেতে। তবে যে মানুষ চিরজন্ম ভুগে মলো, তার সঙ্গে যে-মানুষ কোনো কালে তাকিয়ে দেখলো না, তার তুলনা চলেনা।

ওমা, এ বৌটা তো দেখছি আচ্ছা কুঁদুলী। শশীতারা অবলীলায় বলেন, তা আমার অবিশ্যি কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে। তবে দ্যাওরের আমার পরিবার ভাগ্যি ভালো নয় মনে হচ্ছে। মানুষকে যে আদর আপ্যায়ন করতে হয়, সে জ্ঞানও নেই। তা কর্তাটি কোথায়? যা বলবার তাকেই বলবো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না আমি। তবে শিক্ষা সহবত তোমার ভালো নয়, একথা একশোবার বলবো। মরুক্ গে, যার যা বুদ্ধি! ওই যে ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখলাম, ওরা কে?

মহিলাটি দেওয়ালের দিকে মুখ করে ভারী গলায় বলেন, আমার নাতি নাত্নি।

ছেলের ঘরের?

না। অনিচ্ছুক কণ্ঠ ঘোষণা করে, মেয়ের ঘরের। জামাই নেই।

হায় কপাল। এই দ্যাখো, ফোঁকটে অন্যের সম্পত্তি নেবো খাবো বললেই কি আর ভগবান রাজী হন? অমনি অন্য ভার চাপান। তা মেয়ে কটি?

ওই একটিই। বলে মহিলাটি উঠানের তারে শুকোতে দেওয়া কাপড় চোপড়গুলি তুলতে নেমে যান।

শশীতারা বলেন, কপাল আর কি! এক তরকারি আলুনি! আর ছেলে কটি?

মহিলা যত বেজারই হোন—কথার উত্তরগুলো দিতে বাধ্য হন। ছেলে যেটের দুটি।

ওমা! তবে তো তুমি রাজা গো! একটা ছেলে বিনেই তো সব শূন্য। ছেলেরা কই?

ছেলেরা এখানে থাকে না। কলকাতায় কাজ করে।

ও! তা মেয়ে?

মহিলাটি সংক্ষেপে বলেন, আছে ঘরে। এসেছেন যখন দেখতেই পাবেন।

শশীতারা গম্ভীর হন। বলেন, সেতো সত্যি! দেখতেই তো এসেছি। তবে জন্ম বিধবার সামনে মুখ দেখাতে লজ্জার কিছু ছিল না মেয়ের। আর সদ্য জ্যেঠিই হই যখন। দেখা সাক্ষাৎ নেই বলে তো আর সম্পর্কটা মুছে যায়নি। তা তোমার নাম কি?

মহিলাটি আরো বেজার গলায় বলেন, আমার আবার নাম!

তা মা বাপ তো দিয়েছিল একটা—

সে কবেকার কথা ভুলে গেছি।

তবে আর কি। ছোট বৌই ভাল। নাকি মেজ? কয় ভাই এরা? মানে সৎশাশুড়ীর ছেলে কটি?

ওই একজনই—

শশীতারা বলেন, হায় কপাল। তা তিনি কই?

ইস্কুলে পড়ায়, চারটেয় ফিরবে।

শশীতারা চোখ কপালে তুলে বলেন, ও কপাল! বুড়োকে এখনো ছেলে ঠেঙিয়ে খেতে হচ্ছে? কেন তোমাদের ছেলেরা টাকা পাঠায় না?

ছোট বৌ গম্ভীর ভাবে বলেন, একদণ্ডেই কি সব জেনে ফেলা ভালো দিদি?

শশীতারা এ অপমান গায়ে মাখেন না। অম্লান বদনে বলেন, তা অ, আ, ক, খ না চিনলে কি বই পড়া যায়? তোমাদের নাম পরিচয় আচার আচরণ কিছুই তো জানি না, সেগুলো জানবো, তবে তো আপন বলে বুঝবো। এই জানাটাই অ, আ, ক, খ। মনে থাকার মধ্যে মনে আছে, সেই বৌ বেলায় সৎশাশুড়ীর একটা সোন্দর ফুটফুটে ছেলে দেখেছিলাম, আমার বয়সী। তোমার কর্তা যে সেইটিই কি না তাও তা জানি না। নামও ভুলে গেছি। ছেলে তো ওই একটি শাশুড়ীর মেয়ে?

চার ননদ ছিল, সবই মরে হেজে গেছে।

পুণ্যির বংশ। তা আগের আর কেউ ছিল টিল?

আমার নিজের শাশুড়ীর আর ছিল না। আগের শাশুড়ীর শুধু একটি ছেলে—তা' তিনিই তো।

তা আর আমায় বোঝাতে হবে না ছোট গিন্নী! আগের শাশুড়ীর সে ছেলের জাজ্জল্যমান সাক্ষী তো এই সামনেই। তা বাড়িতে টিপকল আছে না কুয়ো?

ছোট গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, কিছুই না। পুকুর ভরসা। কুয়ো ছিল পড়ে গেছে।

শশীতারা গালে হাত দেন। বলেন, ওমা আমি কোথা যাবো! একালে এমন গেঁয়ো ভূত হয়ে থাকে নাকি কেউ? তাও তো তোমাদের এখানটা দিব্যি শহর বাজার। বলি খাবার জল?

পাশের বাড়ির টিউবওয়েল থেকে আসে।

ছোট গিন্নীর মনে হচ্ছিল, বুড়ির কোনো কথার উত্তর দেবে না। কিন্তু এমন আশ্চর্য, না দিয়েও পারছে না। বুড়ি যেন মনিবের মতো প্রশ্ন করছে।

শশীতারা ওর মনের ভাব হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, আর মনে মনে হাসছেন।

এখনই হয়েছে কি? যখন বিষয়ের অর্ধেক অংশ চাইবো, তখন কী করবে দেখা যাক্।

ছোটলোকের মতন হালচাল!

কেন, দু'বিঘে জমি বেচে সব সামলে নেনা! বাড়িটা মেরামত কর, টিপকল বসা, নাইবার ঘর বানা। তা নয়, ধান চাল খাচ্ছেন আর বসে আছেন। ছেলেদের গুণেও বলিহারী! কলকাতায় গিয়ে বসে আছিস, দেখছিস না বুড়ো মা বাপ কোনদিন ছাত চাপা পড়ে মরে। তার ওপর আবার একটা বিধবা বোন। গুচ্ছের অপোগণ্ড ভাগনা ভাগনী? একটা কেউ পুকুরে ডুবে মরলে?

তা এতো সব আর বললেন না এখন। শুধু বললেন, তবে এইবেলা রোদে রোদে পুকুর থেকেই

চানটা সেরে আসি।

ছোটগিন্নী আবারও কথা বলেই ফেলেন, এই অবহেলায় চান করবেন?

ওমা, চান করবো না তো কি রেলগাড়ির শরীরে থাকবো? তা কাছে পিঠে কোথায় একটা কালী মন্দির ছিল না?

আশ্চর্য, এটাও মনে পড়ে গেল শশীতারার। নতুন বর-কনেকে নিয়ে মন্দির ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ছোটগিন্নী বলেন, কালী মন্দির নয়, সিংহবাহিনীর মন্দির।

তা হবে! আছে তো?

মন্দির আর কোথায় যাবে? চিরকালের জিনিস ছিল আছে।

বাঃ ছোটগিন্নীর কথা কী মিষ্টি! যেন ঢিল ছুঁড়ে মারছে। দ্যাওরের আমার ভাগ্যি ভালো।

শশীতারা গামছা নিয়ে পুকুরের উদ্দেশে যান।

অসুবিধে অনেক হবে।

তবু চেপে বসে থাকতে হবে।

ভাগের জমিটা দখল করে নিয়ে বেচবার খদ্দের জোগাড় করা, সময় লাগবে। সহজে কি দেবে?

রাজবালা ছটফট করছিলেন। রাজবালা শশীতারাকে চানের ঘাট দেখিয়ে দিয়েই ঘরে এসে ছোট নাতিকে ইস্কুলে পাঠালেন, যা ছুটে গিয়ে দাদুকে ডেকে আনগে। বলবি ফুলপুর থেকে তোমার বৌদি এসেছে।

মেয়ে ঘরে আছে বললেও, আসলে নেই।

মেয়ের ঘরে মন টেঁকে না, ও কেবল পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়।

ভবেশ বাঁড়ুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের অবদান রমেশ সত্যিই একদা ফুটফুটে ছেলে ছিলো, কিন্তু এখন তাকে দেখলে মনে হবে যেন একটা আটফাটা হ্যারিকেনের চিমনি।

যেন ভিতরে যে প্রাণ শিখাটুকু জ্বলছে, তার আলোটা ধোঁয়ায় আড়ালে অদৃশ্য।

তামাটে রং, পাকসিটে গড়ন, ঝুলে পড়া মুখ, চুলগুলো সাদা ধবধবে।

খবরটা শুনে প্রথমটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন রমেশ মাষ্টার।

আমার বৌদি এসেছেন! কোথা থেকে?

ফুলপুর থেকে।

রমেশের হাত পা কেঁপে উঠলো। আর সন্দেহের কিছু নেই। ভাগীদার ভাগ নিতে এসেছেন। অথচ এই ভয়ে তিনি মা মরতে একটা খবরও দেননি। অবিশ্যি একবার ছোট্ট করে তুলেছিলেন কথাটা কর্তব্যবোধে, কিন্তু যে ছেলেরা দেশের এই জমিজমাকে জিনিস বলে মনেই করে না, সেই ছেলেরাই আপত্তি তুলে বললো, কোনো দরকার নেই। এলেই দেখবেন শুনবেন, বিষয়ের ভাগ চাইবেন। জীবনে তো কখনো দেখলাম না।

তা আমিও তো বলিনি। তোদের বিয়ে টিয়েব সময় বললে আসতেন কিনা কে জানে।

বাঃ শুনেছি তো তোমার বিয়ের সময় কে যেন নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল, ওনার বাবা না ঠাকুর্দা তাকে বাইরে থেকেই ভাগিয়ে দিয়েছিলো।

হ্যাঁ, ওই রকমই একটা ঘটেছিল বটে।

তবে আবার কী? ওসব কর্তব্যের আর দরকার নেই।

রাজবালাও বলেছিলেন, খাল কেটে কুমীর আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বুদ্ধিহীনের কাজ।

অতএব বুদ্ধিমানই হয়ে বসে ছিলেন রমেশ মাষ্টার।

খবরটা শুনে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে থেকেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রমেশ মাষ্টার।

রাজবালা দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রমেশ ইসারায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

চান করে এসে লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকেছেন।

এটাও প্রায় ইসারাতেই বললেন রাজবালা।

রমেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে বললেন তা কি রকম দেখলে?

কি করে বোঝাবো?

না, মানে আগের মতই আছেন কি না?

আগে তো আমি দেখিনি।

তা বটে।

রমেশ নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে জানলা দিয়ে বরাবর লক্ষ্মীর ঘরের দরজার দিকে চোবা চাহনি নিক্ষেপ করেন। আর মনে মনে চোটপাট করবার শক্তি-সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন।

রাজবালা কাছাকাছি বসে বলেন, আমার তো মনে হলো একখানি জাঁহাবাজ মেয়ে মানুষ।

তাই নাকি?

রমেশ মাষ্টারের মুখটা শুকিয়ে যায়। বলেন, কি করে বুঝলে?

কথাবার্তা ধরনধারণ দেখলাম তো সবই। যেন মনিব গিন্নী এসেছেন প্রজার বাড়ি, এমনি ভাব।

রমেশ বলে, কেন? কেন? তেমন ভাব হবার কারণ?

কারণ তুমিই বুঝো। আমি যা দেখলাম তাই বলছি।

কি বললেন টললেন?

অতো কথা বলবার এখন সময় নেই। তবে যা বললেন, তাতে মনে হলো আমাকে মশা মাছির মতন জ্ঞান করছেন।

রমেশ থতমত খেয়ে বলেন, তার মানে?

ওই তো বলছি—মানে, কারণ, সে সব তুমি বোঝ এবার।

বাঃ যত দোষ, নন্দ ঘোষ! আমি কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি। আমি নেমতন্ন করে নিয়ে এসেছি?

কে এনেছে কে জানে। বিছানা বালিশ বাক্স বাসন গুছিয়ে এসে তো বসলেন।

রমেশ মাষ্টার হাতপাখা নিয়ে নাডছিলেন, সেটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে ভীত গলায় বলেন, হঠাৎ কি ভেবে, তাই ভাবছি।

কি ভেবে সেটা আর বুঝতে পারছো না?

রাজবালা মুখ বাঁকান, মা গেছেন শুনে টনক নডেছে। নাও এখন বিষয়েব চুল চেরো, সমান হিস্যেব ভাগীদার তো।

রমেশ দুর্বল গলায় বলেন, বাঃ ওঁর তো ছেলেপুলে নেই।

নেই বলে যে ভাগ ছাড়বেন তা মনে হয় না।

রমেশ ভীতভাবে বলেন, বললেন না কি সে কথা?

বলবেন। আসল লোকের কাছে বলবেন। কেঁচো কেন্নোর সঙ্গে বলবেন না। বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান ছোটগিন্নি।

এবার তাঁর ছুটি।

এখন বুঝুক দ্যাওর ভাজে।

লক্ষ্মীর ঘর থেকে বেরিয়েই মুখোমুখি! কাবণ রমেশ ততক্ষণে ছটফটিয়ে ওই দরজা পর্যন্তই গিযে পডেছেন।

দুজনেই চমকে বললেন, কে?

রমেশ আস্তে একটা প্রণাম করে বললেন, আমি বড়বৌ!

শশীতারা আশীর্বাদ করে বললেন, ঠাকুরপো!

তারপরই প্রথম কথা বললেন, তোমার সেই রংটা কোথায় গেল ঠাকুরপো?

রমেশ চমকে বলেন, কোন রংটা?

শশীতারা হেসে উঠে বলেন, ওমা অমন চমকে উঠলে কেন? বলছি সেই যে বৌ হয়ে এসে দেখেছিলাম ছোট্ট ফুটফুটে চাঁদের মতো একটি ছেলে—সে তো শুনছি তুমিই। আর যখন ভাই নেই। তাই বলছি সেই রংটা কোথায় গেল?

এবার রমেশ হেসে ওঠেন। হা হা করে হাসি।

পাশের ঘর থেকে ছোট গিন্নীও চমকে ওঠেন।

এরকম হাসি রমেশ কতোকাল আগে হাসতেন।

হাসি থামিয়ে রমেশ বললেন, সেই ফুটফুটে ছেলেটাকে এখন খুঁজছো বড় বৌ? তাহলে আমিও বলি—সেই রূপকথার রাজকন্যের মতো রূপসী বৌটিকে কোথায় ফেলে রেখে এলে বড়বৌ? আমরা ছোটরা চুপি চুপি যার নাম দিয়েছিলাম পরীবৌ।

শশীতারা হঠাৎ কেমন অবসন্নতা বোধ করেন।

একাদশী বলেই কী? কিন্তু উপোস আবার কবে শশীতারাকে কাবু করতে পেরেছে?

শশীতারা তবু জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেন, আহা! আর কিছু না?

রমেশ কেমন অন্যমনস্কের মতো খোলা দরজা দিয়ে উঠোনের মাঝখানটায় তাকিয়ে বলেন, সত্যিই বড়বৌ! সেদিন সকাল থেকে ওই উঠোনে আলপনা আঁকা হয়েছে, কনে বৌ এসে দাঁড়াবে। আমরা ছোট ছেলেরা কী দারুণ উত্তেজনা নিয়েই ঘুরছি, হঠাৎ এক সময় শাঁখ বেজে উঠলো। ছুটে চলে এলাম। আর দেখে সত্যি বলছি যেন হাঁ হয়ে গেলাম।

যেন সত্যিই রূপকথার গল্পের কুঁচবরণ কন্যে মেঘবরণ চুল! মাথায় শোলার মুকুট, তবু তাতেই কী শোভা! যেন মহারাণী!

বীরনগর হাই স্কুলের ঝুলে পড়া হেড্ পণ্ডিত রমেশ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের গলায় বলেন, আর মাথা ছাড়া আগাগোড়াই তো সোনা দিয়ে মোড়া।...পরে তোমার কাছ ঘেসে আমি আর আমার ছোট বোন পুনি দুজনে চুপিচুপি গহণাগুলোর নাম জিগ্যেস করেছিলাম। মনে আছে তোমার?

শশীতারা হেসে ফেলে বলেন, তা অবিশ্যি মনে নেই, তবে ছেলেটাকে মনে পড়ছে। কাঁচের মতন চকচকে চোখ, পশমের মতন চুল।

রমেশ তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলেন, আমার একটা নাম মনে আছে। একটাকে বলেছিলে বাজুবন্ধ। আর একটা বোধহয় সাতনরী।

পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রাজবালা মুখ কোঁচকায়, দ্যাওর ভাজে খুব যে রসের কথা হচ্ছে। গোড়াতেই অমন আদিখ্যেতা করতে বসলে আর তুমি শক্ত হতে পারবে? হঠাৎ বৌদিকে দেখে ভাব উথলে উঠলো দেখছি। পেটের মেয়েটা দুঃখী হয়ে এসে পড়ে আছে, তার সঙ্গে তো একবার ভাল মুখে কথা কইতে শুনি না। কেবল শাসন, কোথায় গিয়েছিলি? এতো এতো পাড়া বেড়াস কেন? তাসের আড্ডায় বসার দরকার কি? ভগবান যেমন কপাল করে দিয়েছে তেমনি থাকো—

এই সব!

আর এখন ভাজ দেখে মিষ্টি কথা ফুটছে! বাবাঃ উনি যে কী ঘুঘু তা আমি বুঝে নিয়েছি। মনে কোরো না মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে ফেলবে ওঁকে। কানটা আবার চেপে ধরেন রাজবালা।

শুনতে পান রমেশ মাষ্টার বিহ্বল গলায় বলছেন, বৌ এসে দুধে আলতার পাথরে দাঁড়ালো। আমরা ছোটরা বলাবলি করে ঠিক করে নিলাম আমরা ওঁকে পরীবৌ বলে ডাকবো।...মানুষের কতোবারই জন্মান্তর ঘটে বড়বৌ। আজ কে বলবে তুমিই সেই মানুষ। সেই পরীবৌ!

রাজবালা জানলার গোড়ায় চলে আসেন, দেখেন বড় গিন্নী এসে দাওয়ার সিঁড়িতে বসলেন, তাঁর দ্যাওরও। টানা টানা বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে তবে উঠোনে নামতে হয়। শশীতারাও বিহ্বলের মতো দাওয়ায় সিঁড়িতে বসে পড়ে তাকিয়ে দেখেন সেই উঠোন। যেন আলপনার রেশগুলো খোঁজেন। খোঁজেন তার উপর বসানো দুধে আলতার পাথরটা।

যার উপরে টোপর পরা বরের পিছু পিছু এসে দাঁড়াবে এক রূপকথার রাজকন্যে।

যার গলায় সাতনরী হার, কপালে ঝাঁপটা, হাতে বাউটি বালা বাজুবন্ধ তাবিজ। আঙুলে আঙুলে আংটি বসানো রতনচূড়, পায়ে চরণ পদ্ম।

এইখানে এই উঠোনের ইতিহাসে সেই অলৌকিক লাবণ্যেব টুকরোটুকু সংরক্ষিত। আর সংরক্ষিত আছে ওই ফাটা ভাঙা মানুষটার মধ্যে।

* * *

শশীতারা বহুদিনের ভুলে যাওয়া হারানো একটা সম্পত্তির সন্ধানে এসেছিলেন, সেটাই পেয়ে গেলেন নাকি?

তা নইলে শশীতারার মুখের চেহারায় অমন উজ্জ্বল গভীর প্রশান্তি কিসের?

শশীতারা রমেশ মাষ্টারের পেশীবহুল শীর্ণ মুখটার দিকে তাকিয়ে বলেন, সে জন্মের কথা এখন আর কেউ মনে রাখেনি, কি বল?

রমেশ মাষ্টার বললেন, নাঃ। সবাই জানে রমেশ মাষ্টারও এমনি আটফাটা। যেমন তার বাড়ির ছিরি তেমনি তার নিজের ছিরি।

শশীতারার মনে হলো, রমেশ যেন শশীতারার বলবার কথাটাই বলে নিলো।

শশীতারা অন্যমনস্ক গলায় বলেন, সত্যি, বাড়িখানারও আমাদেরই মতন অবস্থা হয়েছে। বলে চুপ কবে যান।

কথার জাহাজ শশীতারাব এই মৌনতা বিস্ময়কর। আর শশীতারা নিজেই নিজের মনোভাবে বিস্মিত হন।

বাড়িখানার এই অবস্থার জন্যে তিনি যেন বেশ একটু বেদনা অনুভব করছেন, আর যেন অপরাধ বোধও।

কিন্তু কেন?

তাঁর কিসের অপরাধ?

তাঁর কেন বেদনাবোধ?

শশীতারা এ বাড়ীর কে?

ওই আটফাটা চেহারা ইস্কুল মাষ্টারটার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 'আমাদের' বললেন কী করে?

* * *

তাসের আসর থেকে হাতের তাস ফেলে উঠে এলো অম্ন।

পিছন দরজা দিয়ে আস্তে ঢুকে মার সন্ধানে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখলো মা চৌকিতে শুয়ে আছে চুপ করে। কাছে গিয়ে বললো, মা কী ব্যাপার? কি ঘটনা শুনছি?

রাজবালা পাশ ফিরে বললেন, ভালই ব্যাপার, ভালই ঘটনা। এ বাড়ির বড় গিন্নী। এক রাজা গেলেন আর এক রাজা এলেন! দাসী বাঁদী দাসী বাঁদীই রয়ে গেল।

অম্ন মুখ বাঁকিয়ে বললো, ইল্লি! অমনি তিনি এসে রাজা হবেন? তাঁর কি রাইট শুনি?

রাইট তো সমান সমান।

তা বেশ—মামলা মোকদ্দমা করে আদায় করতে পারেন তখন বোঝা যাবে। তা তুমি এখন শুয়ে?

রাজবালা এই আসন্ন সন্ধ্যায় বিছানায় পড়ে থাকারূপ গর্হিত কর্ম করেও অনুতপ্ত না হয়ে বললেন, মাথায় বাড়ি পড়লেই মানুষ শুয়ে পড়ে। মামলা মোকদ্দমার আর ফাঁক নেই অনি! তোর বাপ একেবারে

এক মিনিটেই বড় বৌয়ের পাদপদ্মে ফুল চন্দন দিয়ে বসে আছেন।

তার মানে?

তার মানে সেই কোন জন্মের পুরনো কাহিনী, একজনের বয়েস যখন সাত আর অন্য জনের নয় কি আট। তখনকার গল্পে মসগুল একেবারে।

তাতে কি?

কি তা বুঝবি ক্রমশঃ। ও লোক আর মামলার দিকে গেছে! অথচ তিনি উকিল ভাইপো সঙ্গে করে এসেছেন।

উকিল!

তবে আর বলছি কি। দেখলেই বুঝবে কি বস্তু।

আমার দায় পড়ছে দেখতে যেতে।

তোমার পড়েনি, তোমার বাপের পড়েছে। তিনবার খবর নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্ন ফিরেছে কিনা।

তা তিনি কি থাকবেন নাকি?

থাকবেন বলেই তো এসেছেন। একেবারে বাক্স বিছানা নিয়ে।

অন্নর ভারী বিরক্তি লাগে।

এ কী গেরো রে বাবা।

একে তো আজন্ম পাহাড়ে মেয়ে মানুষ ঠাকুমার জ্বালায় মাথা তোলবার উপায় ছিল না বেচারী মার। আবার হঠাৎ একী উৎপাত!

অন্ন বলে, ওসব মতলব ফলবে না। এই বেলা উৎখাত করে বিদেয় করো।

তুই পারিস কর। তোদের বাপ যদি ওঁর দলে হয়ে বসেন?

ধ্যেৎ! কী যে বাজে কথা বল। তাই কখনো হয়? যতোই হোক বাবার চিরকাল একটু চক্ষুলজ্জা বেশী জানো তো? তা দাদা ছোড়দাকে খবর দিলে হয় না?

দেখা যাক। রাজবালা বিরক্ত গলায় বলেন, তাঁরাই বা আমায় কী ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করছেন। এখানের জমি জমাকে তো তাঁরা জিনিস বলে গণ্যই করেন না।

অন্ন বিজ্ঞের গলায় বলে বসে, ঠাকুমার দুর্বুদ্ধিতে। যে বলতো, এক ছটাক জমিও বেচা চলবে না। না বেচলে আর ওই ইষ্টিশানের ধারের গরু চরার মাঠটার কী মূল্য বলো। এইবার ঠাকুমা গেছে, আর ভয়টা কাকে? বেচলে—

ভয় এনাকে।

রাজবালা বলেন, ইনি যদি এখন ভাগ ভেন্নর ধুয়ো তোলেন, বলেন বেচাকেনা চলবে না? তার মানে আমার জীবদ্দশা শেষ।

তোর বাপের থেকে বোধহয় দু বছরের বড়ো। অবিশ্যি দেখলে তা বোঝায় না। তাঁকেই ছোট দেখায়, এঁকেই বুড়ো! বড়লোকের মেয়ে, যত্ন আত্মির শরীর।

তা এখন তাহলে এই গরীব শ্বশুর বাড়িতে আসা কেন বাবা? অন্ন বেজার মুখে বলে, গরীবের অন্নে ভাগ বসাতে?

তা বললে কী হবে? উকিল ভাইপো বোধহয় বুঝিয়েছে হকের ধন মদনমোহন।

অন্নর ছেলে মেয়ে দুটো খিদে পেয়েছে, খিদে পেয়েছে করে ঘুরছিলো। সেই সময় রমেশ মাষ্টার ঢুকলেন হাতে এক হাঁড়ি ছানার জিলিপি নিয়ে।

উৎসাহিত গলায় বললেন, তোদের বড় দিদিমা আনালেন তোদের জন্যে। খা।

রাজবালা উঠে বসলেন। বললেন, এসেই হাত করার ফন্দীটি বার করেছেন ভাল। খা ভাই খা, বড় মানুষ বড়দিদিমার দয়ার দান বড় বড় মিষ্টি খা। গরীব দিদিমার কাছে তো বোঁদে রসমুণ্ডির ওপর ওঠে না।

রমেশ মাষ্টার বললেন, ছোট ছেলেপুলের সামনে মনের বিষ ওগরাচ্ছো কেন? দেখইনা মানুষটা কেমন?

অন্ন মা'র হয়ে বলে, কেমন, তা তো ওঁর আসার ব্যবস্থা দেখেই বোঝা গেছে বাবা। একটা চিঠিতে জানান না দিয়ে একেবারে থাকবো বলে চলে আসা—

রমেশ অপ্রতিভ ভাবে বলেন, হয়তো হঠাৎ মন হয়েছে।

এতোকালে মন হলো না, এখন যেই ঠাকুমা মারা গেলেন অমনি মন হলো।

অন্নর যুক্তি অকাট্য।

তবু রমেশের যেন মনে হয়, বাড়িতে একটা মানুষের মত মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। যেন রমেশ তার কাছে একটা আশ্রয় পাবে। এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত মায়ের আওতায় থেকে অভ্যস্ত রমেশ মাষ্টার কি মাথা তুলে মুক্তির নিশ্বাস না ফেলে আর একটা আওতার আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে চায়।

আপন স্ত্রী পুত্রের কাছে যে নির্ভরতা, সে জিনিস রমেশ কখনো পাননি। শাশুড়ীর তাঁবে পিষে থাকা স্ত্রী চিরদিনই আড়ালে ফুঁসেছে আর রমেশের ভীরুতাকে দায়ী করেছে।

বুড়ো মা আর কার না থাকে?

তা বলে বুড়ো ছেলে তাঁর খোকা হয়ে থাকবে?

অন্ন বললো, তা তিনি কই?

রমেশ বললেন, এই তো আমার সঙ্গে সিংহবাহিনীর মন্দিরে গেলেন। সন্ধ্যে আরতি দেখবেন বলে বসে রইলেন। আমাকে বললেন মিষ্টিটা কিনে নিয়ে ছেলেপুলেদের দিতে। আমি বললাম দশ টাকার মিষ্টি খাবে কে? শুনলেন না। তবু আমি বলেছি, বেশ আজ পাঁচ টাকার নিয়ে যাই, কাল পাঁচ টাকার নিযে যাবো।

টাকা ছড়াচ্ছেন!

রাজবালা বলেন, জলে জল বাঁধাবেন।

রমেশ মাষ্টার বিষণ্ণ হন।

প্রথম থেকেই রাজবালা অমন শত্রুপক্ষের মত না করলেও পারতো। সত্যি, তাঁরও তো অধিকার আছে। তিনিও তো এবাড়ির বৌ। এতোদিন কিছু নেননি বলে, একবারও কিছু নেবেন না, এমন প্রত্যাশাই বা কেন?

ওনাকে তা'হলে আবার আনতে যেতে হবে। অন্ন বলে।

রমেশ মাষ্টার গম্ভীর গলায় বলেন, ওনাকে না বলে জ্যেঠিমাকে বল অন্ন! সেটাই সভ্যতা। নিজের আচরণ নিজেকেই ছোট করে, বড় করে!...আনতে যেতে উনি বারণ করছিলেন, বললেন, একবার যে বাস্তা দিয়ে এসেছি, সে রাস্তা ভুলবো না, তোমার আর কষ্ট করে আসতে হবে না! তা আমি তো সেই কথা মেনে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাকতে পারি না। যাবো, আরতির ঘণ্টা বাজাতে শুনলেই যাবো।

* * *

ফেরার সময় গল্প করতে করতে আসেন শশীতারা।

আশ্চর্য দেখো ভাই, কখনো আসিনি, বসিনি, তবু মনে হলো যেন কতো কতোবারই ওই চাতালে বসে আরতি দেখেছি। মায়ের মুখও যেন চেনা। আসলে শিশুকালের স্মৃতি পাথরে কেটে বসে। সেই বৌ বেলায় জোড়ে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন, আরতির ঘণ্টা কাঁসর বাজছিল। মনের মধ্যে এখনই যেন সেই ঘণ্টা কাঁসরই বাজছিল।

রমেশ অভিভূত হচ্ছিলেন।

এই ধরনের কথা বড় একটা শুনতে পান না তিনি। বাড়িতে মেয়ে বৌয়ের কথা টথা অন্য ধরণের। কেমন ভোঁতা ভোঁতা সাদা মাঠা।

কিন্তু শশীঠাকরুণের কথায় ভঙ্গীটাও কি হঠাৎ এই বীরনগরে এসে বদলে যাচ্ছে না? তিনিই বা কবে এমন স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় কথা বলেন? তাঁর ভাষাতো মারকাটারি।

একেই বলে আপন জন!

রমেশ মাষ্টার বলেন, এই এতোকাল তুমিই বা কোথায় ছিলে, আর আমিই বা কোথায় ছিলাম। অথচ দেখো, যেই এসে দাঁড়ালে, মনে হলো চিরকালের আপনার লোক।

শশীতারা সকৌতুকে বলেন, সে তুমি ভাল মানুষ বলে। নচেৎ অন্য লোক হলে পত্র পাঠ বিদেয় করে দিতো।

বিদেয় করে দিতো?

দিতো না? ভাগের ভাগীদারকে কোন বুদ্ধিমান আবার আসন পেতে বসায়?

হেসে ওঠেন দু'জনেই।

খোলা গলায়।

পথচলতি দু'একজন তাকিয়ে দেখে। রমেশ মাষ্টার তাদের একজনকে ডেকে বলেন, ওহে রজনী শোনো সুখবর। এই আমার বড়ভাজ এসেছেন। বাড়ির বড়গিন্নী। আমার যে দাদা সেই অল্প বয়সে—

হ্যাঁ জানি, আপনার একজন বৈমাত্র দাদা ছিলেন শুনেছি।

সেই আর কি! ফুলপুরের চাটুয্যেদের মেয়ে। জানো তো? যাঁদের মস্ত নাম ডাক। তা সেখানেই থেকেছেন বরাবর। এখন একবার দেখাশুনা করতে এলেন।

রজনী হেঁট হয়ে প্রণাম করে বললো, তা বেশ বেশ! থাকবেন তো আজ্ঞে।

শশীঠাকরুণ বলেন, দেখি, তোমরা থাকতে দেবে কিনা। বীরনগরের বীর পুরুষদের কি ব্যবস্থা!

সে কি ঠাকুমা। আপনার শ্বশুরের ভিটে। আমরা থাকতে দেবার কে?

রজনী বলে, আচ্ছা মাষ্টার কাকা, কাল যাবো একবার আপনাদের বৌমাকে নিয়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।

পথে এমন অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়।

অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত।

কৌতূহলাক্রান্ত আরো এই জন্যে—

বিনা নোটিশে হঠাৎ এসে পড়া এই বড় গিন্নির সঙ্গে দ্যাওরের এমন সম্প্রীতি হলো কখন? রাস্তায় হাসি গল্প করতে করতে যাবার মতন?

তাহলে মাষ্টারই কি বলে কয়ে আনিয়েছেন? মা বিহনে গিন্নী হতে? পরিবার তো অকর্মার ঢেঁকি। না আছে ব্যবস্থা, না আছে ছিরিছাঁদ।

তাই সম্ভব।

নিজেই চুপি চুপি গিয়ে নিয়ে এসেছেন।

ওদিকে মায়ে ঝিয়ে ছটফট করছে। আরতি থেমে গেছে কখন তার ঠিক নেই। এখনো ফেরবার নামটি নেই কেন? ওই চালাক মেয়েমানুষটি, যার ভাইপো উকিল, ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাকুর বাড়ীতে বসে কিছুতে সই করিয়ে নিচ্ছে না তো?

হঠাৎ সিংহবাহিনী দেখবার জন্যেই বা এতো উতলা কেন? হয়তো সেই ভাইপোটা সেখানে বসে ছিল কাগজ পত্র নিয়ে।

হে ভগবান! হঠাৎ এ কি বিপদ!

ভালমানুষ লোকটাকে ঠকিয়ে মকিয়ে কি লিখিয়ে নেবে কে জানে।

অনেক ভাবনা, আর মায়ে ঝিয়ে অনেক মন্তব্যের পর এক সময় দেখা গেল ঢুকলেন দুজনে।

অন্ন চট করে সরে গেল।

কিন্তু শশীঠাকরুণের চোখকে ফাঁকি দেবে তুচ্ছ ওই অন্নপূর্ণা?

শশীঠাকরুণ নিজস্ব ভঙ্গিতে ডাক দিলেন, জ্যেঠিকে দেখেই সরে গেলে কেন গো মেয়ে? নামও ত জানি না ছাই। দাও দিকি, পা ধোবার একটু জল দাও। একদিনের অতিথি তো নই, থাকতে এসেছি যখন, সামনে না বেরোলে চলবে?

অগত্যাই অন্ন একঘটি জল এনে পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে একটা প্রণাম করে।

শশীঠাকরুণ 'থাক্ থাক্ রাজার মা হও' বলে আশীর্বাদ করে ঘটিটা নিয়ে পা ধুতে ধুতে বলেন, যাই বলো ঠাকুরপো, তোমার পরিবার ভাগ্যি তেঁতুল গোলা। নিজেরও শিক্ষা সহবতের অভাব, মেয়েকেও শেখাতে পারেনি। এমন একটু শিক্ষা হয়নি ভাই যে, মেয়েকে বলবে, জ্যেঠির পাটা ধুইয়ে দে। আমার নিজের জন্যে বলছি না মা! মনে কিছু করো না, তোমাদের উচিত শিক্ষার জন্যেই বলছি। তা নাম কি মা?

অন্ন নতমুখে বলে, অন্নপূর্ণা।

আহা এমন রাজরাজেশ্বরী চেহারা, এমন নাম, ভাগ্যি দ্যাখো! ভগবানের কি খেলা! মেয়ে তোমার মতনই হয়েছে মনে হয় কি বল ঠাকুরপো। ছেলেরা কেমন? মায়ের মতন না তোমার মতন?

রমেশ বলেন, ওই মিলিয়ে মিশিয়ে।

শশীঠাকরুণ এবার আসল কথায় আসেন। বলেন, তা মা অন্ন, জ্যেঠি হই, একটা সৎ উপদেশ দিতে পারি, সে অধিকার আছে। রাগ করিস নে। এই বয়স, এই রূপ, আর এমন অভাগা ভাগ্য, বেশী পাড়া বেড়িয়ে বেড়ানো ভাল নয়।

মেয়ের তথ্য শশীঠাকরুণ তখনই জেনে বুঝে গেছেন।

বিধবার পোড়ামুখ দেখাবার ভয়ে ঘরে লুকিয়ে নেই সে, পাড়ায় গিয়েছে সে তাস খেলতে।

শশীতারার এই কঠোর বাণীতে অন্ন তো ছিটকে উঠতে পারতো। অন্ন তো ভেবেই রেখেছিল গ্রাহ্য করবে না। গোড়া থেকেই অবহেলা করবে। কিছু বলতে এলে শুনিয়ে দেবে।

কিন্তু হঠাৎ যেন মূক হয়ে গেল সে।

শশীঠাকরুণের ব্যক্তিত্বের প্রভাব?

রমেশ মাষ্টার মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে হঠাৎ সাহসে উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, তাই বল তো বড়বৌ! আমিও তো সেই কথা বলি। যাক্ এবার তুমি এসেছো, আমি নিশ্চিন্ত। এখন থেকে তুমিই দেখবে শুনবে, শাসন করবে, চালাবে। নিশ্বাস ফেলেন রমেশ মাষ্টার।

যেন একটা ক্লান্ত মাঝি তার হাতের হালটা আর এক মাঝির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্বাস ফেললো।

শশীঠাকরুণের হাসিটা বড় সুন্দর।

ফুলপুরের সবাই বলে, কে বলবে বয়েস হয়েছে। আড়াল থেকে শুনলে মনে হবে ঝি বৌ হাসছে। প্রাণ খোলা হাসি।

শশীঠাকরুণ সেই হাসিটি হেসে বলেন, বাঃ চমৎকার! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ঠাকুরপো, আমি যেন মৌরুসী পাট্টা করে এখানে এসে বসেছি। আসার আগে তো সেখানের গ্রামসুদ্ধু ঝুড়তে লাগলো, কেন যাচ্ছো? কবে আসবে?

রমেশ মাষ্টার কৃতার্থমন্যের গলায় বলেন, দয়া করে যখন একবার পায়ের ধুলো দিয়েছো, সহজে ছাড়ছিনে। তারা তো অনেক কাল ভোগ করেছে বাবা।

যেন শশীঠাকরুণ একটা সম্পত্তি।

রাজবালা জ্বলতে থাকেন, কিন্তু কিছুতেই ফট করে অসভ্যের মতো কিছু একটা বলে উঠতে পারেন না।

শুধু আড়ালে গিয়ে মেয়ের কাছে গজরান, তোর বাপের ভঙ্গিমা দেখছিস? কিরকম আদেখলে হ্যাঙলার মতন করছে। যেন বর্তে গেছে। জানি না বাবা গুণ তুক জানেন কিনা উনি। ওই ঠাকুর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে এতোক্ষণ দেরী করায় আমার রীতিমত সন্দেহ হচ্ছে।

তা রাজবালার সন্দেহকে উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

রমেশ মাষ্টার নামের মানুষটাকে কে যেন হঠাৎ বশীকরণ মন্ত্রেই অভিভূত করে ফেলেছে।

রমেশ মাষ্টারের আর সেই রুক্ষ শুকনো মেজাজ নেই। রমেশ মাষ্টার ইস্কুল থেকে ফিরে বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠ দেখার পরিবর্তে সারা সন্ধ্যে দস্তুর মতো হাসি গল্প করেন।

আবার এমনি মজা, এই আড্ডায় আস্তে আস্তে দু'চারজন লোকও জুটছে।

তারা বলে, সত্যি, বাঁড়ুয্যে বাড়ির বড়গিন্নী একখানা মানুষের মতন মানুষ বটে।

কিন্তু তাদের গিন্নীরা সে কথা বলে না। গিন্নীরা সকলেই প্রায় রাজবালার দুদলে।

কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে মানুষটাকে যেন গ্রাস করে নিয়েছে। না হয় বয়েস হয়েছে, তবু আছে কিছু মোহিনী মায়া। নচেৎ অতো বশ হয় লোকটা?

অথচ মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

কী যে করতে চায় কে জানে।

ভাগ ভেন্নর কথা তো মুখেও আনছে না।

কেবল পাড়ার খবর নেওয়া, দেশের খবর নেওয়া। আর চাষীবাসীদের দুঃখ ধান্ধার বার্তা শোনা।

রাজবালা তো আড়ালই পায় না যে, স্বামীকে গঞ্জনা দেবে।

সকাল থেকেই 'বড়বৌ বড়বৌ'।

বড়বৌ, আজ কি রাঁধছো, বড়বৌ, আজ লক্ষ্মীকান্তর মন্দিরে যাবে তো বল, সকাল সকাল ইস্কুল থেকে চলে আসবো।...বড়বৌ, নাতি দুটোকে একটু শাসন কোরো, লেখা পড়ায় মোটে মন নেই।

আর বড়বৌ বলেন, কী রাঁধবো? তুমি কী খাবে তাই বল? নিরামিষ ঘরের তরকারি তুমি ভালোবাসো এতো আমার হাতের ভাগ্যি গো! তবু শ্বশুরের বংশের একজনকেও হাতের রান্না খাওয়াতে পেলাম দু'দিন।

আবার বলেন, আজ আর মন্দিরে যাবো না ভাই, পূর্ণিমের দিন বরং সকালের দিকে উপোস করে যাবো। তোমার ছুটি পড়ছে।

আবার বলেন, নাতিদের শাসন করতে আছে? তাহলে ঠ্যাঙা নিয়ে তেড়ে আসবে না? হবে হবে, মাষ্টার দাদামশাইয়ের নাতি কি আর মুখ্যু হবে? ভয় নেই, সৎ আছে।

কেমন সাবলীল কথা।

রাজবালা শোনে আর রাগে তার গা জ্বলে যায়।

শশীঠাকরুণ যখন পূজোয় বসেন, সেইটুকুই অবকাশ, তা সে সময়টা তো রমেশ মাষ্টার নিজের নাওয়া টাওয়া, ইস্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই থাকেন। আর খাওয়ার সময় শশীঠাকরুণ এসে সামনে বসেন এবং সোহাগের বন্যা বইয়ে 'আরো খাও! ওকি খাওয়া হলো? ওই খাওয়ায় কি শরীর টেকে?' এই সব করতে থাকেন।

তা আজ ওই পূজোর অবকাশটায় গিয়ে স্বামীকে চেপে ধরে রাজবালা, বলি তোমার হলোটা কী? মানুষটা কী তোমায় গুণ তুক করলো?

রমেশ মাষ্টার ওই কুটিল মুখটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, করেছে! হলো?

দেখো, ওসব অগ্রাহ্যর কথা চলবে না। সব সময় কিসের তোমাদের এতো পরামর্শ তাই আমি জানতে চাই, কেবল ফুসফুস গুজ গুজ। আমায় দেখলেই চুপ হয়ে যাওয়া, এর মানে?

রমেশ মাষ্টার কৌটোতে নস্যি ভরতে ভরতে বলেন, মানে এই—তোমার কানে একটা কথা উঠলে পাড়াসুদ্ধ লোক জেনে যাবে।

তা লোককে না জানিয়ে কী করা হচ্ছে সেটাই জানতে চাই।

হলে দেখতে পাবে।

আমি কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে আসবো ওই উনি এসে গুণ তুক করে চুপি চুপি তোমার কাছ থেকে বিষয় সম্পত্তি সব লিখিয়ে নিচ্ছেন।

রটিয়ে এসো। বলে রমেশ গট গটিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে আসনে বসে বলেন, ভাতটা দেবে? না ঝগড়া করবে?

আশ্চর্য, রমেশ মাষ্টারের বসার ভঙ্গীও যেন বদলে গেছে। মেয়ে এসে ঘাড়ে পড়া পর্যন্ত তো তুঁষ হয়ে গিয়েছিল। নইলে নয় ছাড়া কথাই বলতো না। তাও ক্লান্ত ভাবে। এখন যেন টগবগ করে।

আর ওই পরামর্শ।

কান পেতেও বোঝা যায় না। কী যে বলাবলি করে?

তা ছাড়া দুজনে এক সঙ্গে পথে বেরোনোও তো আছে। ঠাকুর দেবতাটা ছুতো, ওই হাসি গল্প পরামর্শই আসল। যেন দুটো বয়েস কালের দ্যাওর ভাজ। তা বয়েস কালের হলে তো অন্য মানে খুঁজে পাওয়া যেতো। এটা কী?

রাজবালার সন্দেহটা একেবারে অমূলক বলা যায় না।

জীবনের সমস্ত বয়েস পার করে আসা এই দুটো বুড়োবুড়ি দিব্যি এক ছেলেমানুষী খেলায় মেতেছে। সেই তামাদি হয়ে যাওয়া কালে প্রায় সমবয়সী দুটো বালক বালিকা বড়দের চোখ ছাড়িয়ে ছাতের কোণে ইঁটের খেলাঘর পেতে কাঁঠাল পাতার লুচি ভেজে খেয়ে যে আহ্লাদ অনুভব করতে পারতো, এখন যেন সেই আহ্লাদটাই অনুভব করছে ওরা। যেন কোথাও একটা খেলাঘরই পেতেছে এই সব বডদের চোখ এড়িয়ে।

তাই সব পরামর্শ চুপিচাপি।

বৌ মেয়ে এলেই অন্য কথা।

অন্ন এদিক ওদিক কান পেতে বাবার গলা সদ্য শুনতে পেলো, 'নগদ তো দেবে, কিন্তু অতোগুলো টাকা নিয়ে তুমি একা আসবে?'

কিন্তু যেই অন্ন ঘরে ঢুকলো, অন্নর বাবা বলে উঠলো, তাহলে ওই কথাই থাকলো বডবৌ। সামনেব অমাবস্যায় তুমি মা সিংহবাহিনীর ভোগ চড়াবে। কি ভোগ দিতে চাও? ময়দা না খিচুড়ী ভোগ?

শশীঠাকরুণ বলেন, নামটা করছো কেন বাপু, চালে ডালে বলতে হয়।

আবার অন্ন সরে গেলেই শশীতারা গলা নামিয়ে বলেন. তখন যেন কাক পক্ষীতেও জানতে না পাবে। ভাঙচি দেওয়ার লোকের অভাব নেই দেশে। আসল কাজটা হয়ে যাক আগে, তারপর ঢাক পিটিও। পিটোতে তো হবেই। ছাত পিটান মানেই ঢাক পিটোনো।

আসল কাজটা আর কিছুই নয়, বিঘে দশেক জমি বেচা। স্টেশনের ধারে যে গরু চবার মাঠটা বয়েছে ওটা যে রমেশদেব, তা এতদিন অনেকেই জানত না। কিন্তু শশীঠাকরুণ যে কেমন কবে এই কদিনেই সব জেনে ফেলেছেন কে জানে?

জেনে ফেলেই ধরে বসলেন।

আর শশীঠাকরুণের ধরা এবং কাঁকড়া বিছের ধরায় তো বিশেষ প্রভেদ নেই। ধরেছেন যখন, না করে ছাড়বেন না।

চব্বিশ বিঘে জমি তোমাদের, আর তোমাদের এই হাড়ির হাল?

শশীঠাকরুণ বলেছেন, এ হাল ঘোচাতে হবে। মা লক্ষ্মীকে পুঁতে রেখে কোনো লাভ নেই, খেলাতে হয় তাঁকে। হাটে বাজারে নিয়ে গিয়ে খেলাতে হয়।

রমেশ মাষ্টারের বুকে এতো বল ছিল না যে, ওই রকম দুরূহ একটা কাজে হাত দেবেন। রমেশ মাষ্টার ওই চব্বিশ বিঘে জমিই বুকে নিয়েই মরতেন, ওর খানিকটা বেচে দিয়ে হাড়ির হাল ঘোচানো যায়, তা ভাবতেই পারতেন না।

রাজবালা?

তাঁর কোনো বুদ্ধির বালাই-ই নেই।

স্বামীকে সুপরামর্শ দিয়ে, সাহস দিয়ে, দশের একজন হবাব যোগ্যতা অর্জন করবার শক্তি এনে দেবেন

এমন মহিলা নন তিনি! সব কিছুতেই তার সন্দেহ। রমেশ কিছু করতে গেলেই রাজবালা বলেন, ডুববে! এইবার ডুববে তুমি!

কিন্তু শশীঠাকরুণের প্রাবল্য রমেশ মাষ্টারকে সাহস এনে দেয়, শক্তি এনে দেয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে খদ্দের ঠিক করে ফেলেন রমেশ।

শশীতারা বলেছেন, আমার তো কিছু ভাগ ছিল ভাই, তা সেইটাই ধর বেচছি। আপোসে ভাগ করে নিয়ে এমন করা যায়। ফুলপুরে যতো ভাগ ভেন্নর পরামর্শদাতা তো ছিলাম এই আমি। বিনা মামলায় কাজ মেটাতাম। আমি তোমায় লেখাপড়া করে দেবো—আমার আর কোনো দাবি দাওয়া রইল না। এই দশ বিঘা জমির মূল্য বাবদ দশহাজার টাকা আমার শ্বশুরের ভিটে সংস্কারের কাজে লাগানো হবে। আর এইজন্যই আসা আমার এতোদিন পরে।

রমেশ মাষ্টার বলেছিলেন, কিন্তু বড়বৌ, তোমার সবটা দিয়ে বাড়ি সারাবে, তুমি কি এখানে বাস করতে আসবে?

শশীতারা হেসে বলেছেন, তা কী বলা যায়? বলে মানুষের মন না মতি। তা বাস কবতে চাইলে তুমি থাকতে দেবে না?

কী বলছো বড়বৌ! তুমি এসেছো, যেন মাথার ওপর ছাতা পেয়েছি। যেন পর্বতের আড়াল পেয়েছি।

কিন্তু তোমার বৌ রেগে রেগে মরছে।

ওর কথা বাদ দাও। ওই স্বভাব ওর। মায়ের কাছে একটু বেশীক্ষণ বসলে রেগে মরতো। বল্‌তো. চিরটা কাল খোকা হয়েই থাকলে! সংসারে যেন কাজের কথা নেই।

তা কাজের কথায় মধ্যে তো ছেলেদের আচরণের নিন্দে, আর বৌদের গালাগালি দেওয়া। ও আমার ভাল লাগে না। এই যে তোমার সঙ্গে গল্প করি, কতো আলাত পালাত গল্প, তবু যেন প্রাণে শান্তি আসে।

তবে পৃথিবী কি চায় কারো প্রাণে শান্তি আসুক? চায় না। পৃথিবী সেই শান্তিটা ভঙ্গ কববাব জন্যে তোড়জোড় করে।

কিন্তু আপাতত ঝুনো শশীতারা আর পাগলা রমেশ মাষ্টার একই জগতে আছেন। নিজেদের গডা একটা স্বপ্নের জগতে।

শশীতারা বলেন, বাড়ির চেহারাটা ঠায় ঠিকই থাক্‌ বুঝলে ঠাকুরপো, বদলে কাজ নেই। কর্তারা যেমন গড়েছেন, তেমনি থাকুক। শুধু বালিব্র চাপড়া খসিয়ে ভাল করে বালি কাজ ধরাও। জানলা দরজাগুলো অবিশ্যি বদল টদল করতে হবে, কাঠ একেবারে খেয়ে গেছে। আচ্ছা বাড়ির রংটা কেমন হবে?

রমেশ বলেন, সে কথার আমি কি জানি? তোমার যা পছন্দ।

না না, সেটা ঠিক নয়। বৌ মেয়ের সঙ্গে একবার পবামর্শ করে রায় দাও।

ওরা আবার পরামর্শ দেবে। হুঁঃ!

তা হোক। আমার ভাইপোদেরও আমি বলি, তোরা কোনো কাজে হ্যাঁ বলে বসবার আগে, একবার পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিস বাপু! শেষকালে বৌ যেন না বলতে পারে আমায় একবার জানালোও না।

রমেশের কাছে শশীঠাকরুণের এই ভাইপোদের গল্পও কম আকর্ষণীয় নয়। রমেশের সঙ্গে রমেশের মা ব্যতীত আর কোন মেয়েমানুষ কখনো এমন কাছে বসে গল্প করেনি।

তা মায়ের গল্পের মধ্যে তো অন্য কোন জগৎ ছিল না, মায়ের জগৎ রমেশেরই জানা জগৎ। হাড় হদ্দ জেনে যাওয়া পচা জগৎ। শশীতারা রমেশের সামনে অন্য এক জগতের দরজা খুলে ধরেন। রমেশ মন দিয়ে শোনেন আর বুদ্ধি দিয়ে বোঝেন, সেখানে সেই বড মানুষদের ঘরে শশীতারার কতো প্রতিপত্তি! শুধু ভাইপোদের ঘরেই নয়, সারা ফুলপুর গ্রামটাতেই কতো প্রতিপত্তি শশীতারার বুঝতে পারেন রমেশ মাষ্টার।

সেই মানুষ এইখানে এইভাবে পড়ে আছেন।

রমেশ মাষ্টার বিগলিত হবেন না? রমেশ মাষ্টার কৃতকৃতার্থ হবেন না?

শুধুই কি পড়ে থাকা?

রমেশের হিতের জন্যেই পড়ে থাকা।

রমেশের এমন শুভানুধ্যায়িণী আর কে আছে?

জমি বেচা হচ্ছে, এ খবর চাপা থাকে না। যতোই চুপিচুপি হোক প্রকাশ হয়েই পড়ে।

রাজবালা বোঝেন বানের জল ঘরের উঠোনে এসে গেছে। রাজবালা বোঝেন আগুন ঘরের মটকায় লেগেছে। সর্বনাশের আর বাকি নেই কিছু।

রাজবালা আর থাকতে পারেন না, অম্লকে দিয়ে ছেলেদের চিঠি লেখান। তা এসে যায়, বড ছেলে এসেও যায়। ব্যাপারটা তো যা তা নয়।

তখন রমেশও নেই শশীতারাও নেই, ওঁরা গেছেন কেষ্টনগরে। বীরনগর বাদকুল্লার লোকের তো কোটকাছারী করতে ওই কেষ্টনগর ছাড়া গতি নেই।

বড় ছেলে জীবেশ গুম্ হয়ে বসে থেকে বলে, তোমার স্থির বিশ্বাস ওই সব তুকটুক করেছে?

তা ছাড়া? তা নইলে এইসব ঘটনা সম্ভব? যে জমি তোদের ঠাকুর্দার বাপের আমল থেকে পড়ে আছে, কেউ একদিনের জন্যে তাতে নোখ ডোবাবার কথা ভাবেনি, সেই জমি উনি এলেন আর বেচলেন? আমিও তো বরাবর শুনেছি, ওটা গোচারণ ভূমি। ওটা কর্তারা পুণ্যির জমি বলে ছেড়ে রেখেছিলেন। সেকালে এসব করত। জলাশয় করে দেওয়া, গোচারণের মাঠ ছেড়ে রেখে দেওয়া। তা বাপ-ঠাকুর্দাব স্বর্গবাসের সেই টিকিটখানি তুমি বংশধর হয়ে ছিঁড়ে ফেলছ?

জীবেশ অবশ্য মায়ের এ যুক্তি মানে না।

জমিটা বেচা হচ্ছে এটা মন্দ নয়। এ সুমতি যে হয়েছে এতোদিনে রমেশ মাষ্টারের এটা ভাল। কিন্তু জমি বেচা টাকাটা অন্য একজন এসে নিয়ে যাবে, এটা তো সহ্যের বস্তু নয়।

জীবেশ বলল, আচ্ছা আসুন ফিরে দেখছি, আমি। একটা অশিক্ষিত বুড়ি মেয়েমানুষ তাকে এতো ভয়!

আহা বেচারী জীবেশ!

মানুষ যে না বুঝে কতো প্রতিজ্ঞাই করে বসে।

জীবেশ তো জিভ শানিয়ে বসেছিল।

কিন্তু হলোটা কী?

হলো এই, ষ্টেশনের পথ থেকে সাইকেল রিকশয় আসতে আসতেই জীবেশের আসার খবরটা পাওয়া হযে গেল। রিক্সওলাই দিল। বললো, এই তো তিনটের গাড়িতে বড়দাদা বাবু এলো কলকাতা থেকে।

অতএব শশীঠাকরুণ বাড়িতে পা দিয়েই ডাক. পাড়লেন, কই গো নবাবের জামাই, দেখি একবার মূর্তিখানা। এতোদিন এসেছি ছেলেদের দেখে চক্ষু সার্থক তো হয়নি। বলি শনিবারে একবার বাড়ি আসতে হয় না?

রমেশ মাষ্টারের এখন পৃষ্টবল রয়েছে তাই তিনি বলে ওঠেন, বাড়িকে বাড়ি ভাবলে তো।

শশীঠাকরুণ সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষে, তাই তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, তা দোষও দিতে পারিনে বাপু ছেলেদের। বাড়ির যা ছিরিছাঁদ আর যা অসুবিধে, এতে কি আর আসতে মন যায়? কলকাতার সুখ সুবিধে আরাম আয়েস রপ্ত হয়ে গেছে। এরপর আসে কিনা দেখো। আকর্ষণ হতেই হবে।

কার পর? জীবেশ জানে না সে কথা।

জীবেশ যা কিছু বলবে বলে ভেবে রেখেছিল, সবই কেমন গুব্‌লেট হয়ে গেল। এই অভিজাত চেহাবার দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল।

শশীঠাকরুণ কোর্ট কাছারি করতে গিয়েছিলেন। তাই পরণে পাট ভাঙা গরদের থান, গায়ে গরদেব চাদর জড়ানো, কাটাছাঁটা মুখের রেখায় একটি দৃপ্ত এবং বিশ্বনস্যাৎ ভাব।

এই মুখের সামনে চট করে কিছু বলা যায় না। যা করা যায় শুধু তাই করলো সে। হেঁট হয়ে একটা প্রণাম করে গুজ গুজ করে বললো, সময় টময় হয় না।

শশীঠাকরুণ বললেন, তা অবিশ্যি। গরমেন্টের ঘরে মোটা মাইনের চাকরী করছো, বৌ ছেলে আছে, সময়ের অভাব। তবে এটুকু না বলে পারছি না বাবা, মানুষ হওয়ার মূল্যটা কী, যদি না দেশে ঘরে দেশের একজন হয়ে বংশ পরিচয় দিতে পারলে! সেখানে তুমি যতই রাজার হালে থাকো, তোমার জ্ঞাতি গোত্তর তো দেখতে যাচ্ছে না? আর শহর বাজারে রাজার ওপর বাদশা আছে। তোমার মতন রাজা গড়াগড়ি যাচ্ছে। অথচ দেশে গাঁয়ে তুমি বনগাঁয় শেয়াল রাজা। তা ছাড়া বাপ ঠাকুর্দার ভিটেখানা যে হুড়মুড়িয়ে তোমার বাপের মাথার ওপর এসে পড়ছে, ওটাও তো দেখবে?

একসঙ্গে এতোগুলি কথা বলে শশীঠাকরুণ দ্বিতীয় হাঁক পাড়েন, অন্ন, ঘর থেকে একটা বাসন আন, খাবারটা ধর। দাদাকে দে, ছেলেপুলেকে দে। কেষ্টনগরেব সরপুরিয়া। অবিশ্যি এখন আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। শুধু নামটুকু আছে। তা ওই নামটুকু খা।

একখানা রিকশয় দ্যাওর ভাজের ঠাসাঠাসি করে আসা দেখে রাজবালার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল, আরো জ্বলে গেল ছেলের চুপ করে থাকা দেখে। অথচ এই একটু আগেও বলছিল, বাবা তাঁর ভক্তি সৌজন্য নিয়ে থাকুন, আমি কটাকট শুনিয়ে দেব। সোজা বলবো, জমি বেচতে গেলেন আপনি কোন অধিকারে? আগে ভাগের মামলা করে বিষয় নিজের করে নিন, তারপরে যা হয় হবে। বাবাকে ভাল মানুষ পেয়েছেন, কিন্তু আমরা ভাল মানুষ নই।

তা হতভাগা ছেলে এতো কথার একটা বললো না। দিব্যি সরপুরিয়া খেতে বসলো? ওই সর্বনেশে মেয়ে মানুষের চোখের দৃষ্টিতেই তুক্ আছে।

রাজবালার আর সহ্য হয় না। রাজবালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, কইরে জীবু, কী যেন বলবি বলছিলি?

জীবেশ অপ্রতিভ ভাবে বলে, হবে হবে। আজই তো চলে যাচ্ছি না।

কবে আর হবে? আজ না হোক, তুমি তো কাল সকালেই লম্বা দেবে বাবা! যা বলবার জন্যে কলকাতা থেকে ধাওয়া করে এলে—

জীবেশ বোঝে, সত্যিই তার কর্তব্য কর্মে ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। অতএব বাপের দিকে তাকিয়ে বলে বসে, হ্যাঁ বলবার জন্যেই যখন আসতে হয়েছে, বলতেই হবে বাবা! কথাটা হচ্ছে—শুনলাম নাকি ষ্টেশনের ধারে জমি বেচা হচ্ছে।

হচ্ছে কী, হয়ে গেছে তো! এই তো, সেই সব করে কর্ম্মেই তো কেষ্টনগর থেকে এলাম। বললেন শশীতারা অগ্রাহ্য ভরে।

ওঃ। কিন্তু বাবাকেই বলি, আমাদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করবারও দরকার বিবেচনা করলে না?

রমেশ সভয়ে একবার ছেলের ও একবার শশীতারার মুখের দিকে তাকান।

শশীতারার আর অবস্থাটা বুঝতে বাকি থাকে না। শশীতারা হাল ধরেন। বেশ মাজা চড়া গলায় বলেন, পরামর্শর উপযুক্ত বেটা হলে অবিশ্যিই করতো। তবে কি না তা যখন নয়, তখন আর তোমার মুখে কথাটা শোভা পেলো না বাবা! যে ছেলে বছরে একদিন মা বাপকে দেখতে আসবার সময় পায় না, তার যে আবার বিষয় আশয় নিয়ে পরামর্শ করবার সময় হবে, বাপ তা জানবে কেমন করে, তা হল? আর জমি যা বেচা হয়েছে, তা আমার। বোধহয় এটুকু জানো, আমি এবাড়ির বৌ। আমার অবিশ্যিই দাবি দাওয়া কিছু আছে? চব্বিশ বিঘে জমির ভাগ অবিশ্যিই আমার প্রাপ্য হতে পারে। পারে কি না? সেইটুকুই আমার ইচ্ছে, মত করেছি। ইচ্ছে হয় ক্ষ্যামতায় কুলোয়—নালিশ ঠুকে দাও গে বাপ জ্যেঠির নামে।

সমস্ত পরিবেশটার ওপর এই হাতুড়িটি বসিয়ে আর সমস্ত আলোচনার ওপর যবনিকা পাত করে দিয়ে চান করতে পুকুরে চলে যান শশীতারা।

রাজবালা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন, জীবেশও উঠে পাশের ঘরে চলে যায়, অন্ন আর দুখানা সরপুরিয়া নিয়ে চুপিচুপি ছেলেদের ডাকতে যায়। শূন্য দালানটায় বসে থাকেন রমেশ। কিন্তু আশ্চর্য রমেশের কোন ভয় করছে না। আগে হলে তো ছেলেকে দেখেই ভয় করত।

কদিন পরে শশীঠাকরুণের উকিল ভাইপোকে দেখা গেল বীরনগরের বাঁড়ুয্যেদের দালানে।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে উঠোনের ওপাশে, সদরে বেরোবার একধারে টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছে, মিস্ত্রীদের কণ্ঠে একটা উদ্দাম অবোধ্য শব্দ যেন গানের মতো তালে তালে ধ্বনিত হচ্ছে।

সেই দিকে তাকিয়ে মুখ কালো করে ভাইপো বলল, এইটাই যদি তোমার মনের মতলব ছিল পিসি, তো আমায় অমন নাচালে কেন?

শশীতারা তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, নাচাতে আমি যাইনি অজা, তুই নিজেই নেচেছিলি। তুই তোড়জোড় করলি, তাই ভাবলাম, দেখি তো বলছে যখন তবে যাই একবার। দাবি দাওয়া তো আছে একটা, উড়িয়ে দিতে পারবে না। এই যে চারকাল ধরে মাসে দুটো একাদশী করে মরছি, ন্যাড়াহাত নাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছি, সমাজে যমের অরুচি হয়ে বসে আছি, এ কিসের জন্যে? ওই সম্পর্কটুকুর জন্যেই তো? তা সেই ভেবেই আসা। এসে দেখছি শ্বশুরের ভিটেখানা যেন ক্ষয়কাশের রুগীর মতন মরণের দিন গুনছে বসে বসে, তার মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি কখনো। তা চোখে দেখে তো আর মুমূর্ষু রুগীটাকে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না? ডাক্তার বদ্যি ডেকে এনে দুফোঁটা ওষুধ দিতে হয়। তবু তো গাঁটের কড়ি খরচা করে নয়। সেই যে বলে না, তোর ধন তোকে খাওলাম শ্বশুরের জমি বেচেই শ্বশুরের বাড়ী মেরামত!

অজিত প্রায় ক্ষেপে উঠে বলে, চুণ বালির পাহাড় এসে পড়েছে তো দেখে এলাম, টিউবওয়েলও বসছে দেখতে পাচ্ছি, জমির দরুণ দশ বারো হাজার টাকা তাহলে এদের ভাঙাবাড়ির গহ্বরেই ঢালছ।

শশীতারা এবার গম্ভীর হন। গম্ভীর গম্ভীর গলায় বলেন, এদের বাড়ি বলছিস কেন রে অজা? আমার শ্বশুরের ভিটে নয়? ভাঙা বাড়িটা এদের, আর ডাঙা জমিটা আমার, এমন হিসেব তো ন্যায্য নয়।

অজিত গুম্ হয়ে গিয়ে বলে, ঠিক আছে, তোমার জিনিস তুমি বুঝবে। তবে ইনিই বা ভিটে বাড়িকে এমন মুমূর্ষু করে তুলেছেন কেন? বাপের জমি বেচেই বাপের ভিটে সারাতে পারেননি?

শশীতারা অবহেলায় বলেন, পারবে কোথা থেকে? এতোদিন যে কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল ছিলো। তাঁর ইচ্ছেয় কর্ম। ও বেচারী নোখ ডোবাতে পেরেছে এযাবৎ? তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন, জমিগুলো সঙ্গে নিয়ে সগ্‌গে যেতে পারবেন। আর এ হতভাগার দেখছো তো? ছেলেদুটো স্বার্থপর, মেয়েটা গলায় পড়া। স্বাস্থ্য শরীরও ভাল নয়। যা করবার আমাকেই করতে হবে।

তবে আর বলবার কি আছে? দাদা বলে দিয়েছিল পরীর বিয়ের কথাটা এগোচ্ছে, তুমি না গেলে তো পাকাপাকি কিছু হতে পারে না। যাবে তো? না কি?

শশীঠাকরুণ ঈষৎ চঞ্চল ভাবে বলেন, আহা যাবো না বলেছি। তবে এদিকে মস্ত একটা দায়িত্বের কাজ ফেঁদে বসে আছি, একটু না সামলে তো যেতে পারিনে। তোর বাপ কাকা মা খুড়ি, সবাই রয়েছিস, ক' পাকা কথা। পিসি কি চিরকালের?

অজি চলে গেল।

রাজবালা কপালে করাঘাত করে পাড়ায় বলতে বেরোলো, ভাইপো নিতে এসেছিল, সাধ্য সাধনা করলো, ইনি গেলেন না। দ্যাওরের সর্বস্ব খেয়ে তবে যাবেন।

জমি বেচার কথা সকলেই জেনে গেছে, আর রমেশ মাষ্টারের নির্বুদ্ধিতাকে ছি ছি করছে। এই বয়সে মেয়েমানুষের মোহিনী মায়ায় পড়লো! কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আজ্ঞাবাহী চাকরের মতো ওঠ বোস করাচ্ছে তোমায় ওই সর্বনেশে মেয়েমানুষটি! স্ত্রী পুত্র পরিবার কারুর কথায় কান নেই, ওনার চরণে পুষ্প অর্ঘ? ছ্যা ছ্যা!

তা ওদের কথা একেবারে মিথ্যেও নয়। সত্যিই কারো কথার কান নেই রমেশের। শশীতারা সে

কানে মন্তর ঝেড়ে চলেছেন, টিপকল বসিয়েছো বলেই যে কুয়োটা ফেলে দিতে হবে, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। ওটাও সংস্কার করিয়ে ফেলতে হবে। তা ছাড়া কলের জলও আনতে হবে ভবিষ্যতে। রাস্তায় যখন এসেছে।...ও তোমার এই টানেই ইলেকট্রিক লাইটটা এনে ফেলা! ভালো ঠাকুরপো! টাকায় না কুলোয় আমি আছি।...এই বাড়ি যখন আগাগোড়া রং হবে, আর সেবাড়ি লাইটের আলোয় ভাসবে, কেমন শোভাটি হবে ভাব? আমি তো চোখ বুঝলেই দেখতে পাই।...

রমেশও বুঝি ক্রমশঃ এই স্বপ্নলোকের বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তিনিও বলেন, তুমি হুকুম করে চলো, আমি সব করে তুলবো। কী বলবো বড়বৌ, তোমার সাহসে আমার যেন শরীরে মনে একশো হাতীর বল এসেছে। জানলা দরজার যে পাল্লাগুলো খেয়ে গেছে, তার মাপ দিয়ে অর্ডার দিয়ে এলাম। বলেছি, নাঃ ওই কেটে কুটে তালি দিয়ে আবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া নয়, একেবারে নতুনই হোক।...আবার বলেন, বিলিতি মাটির ব্যবস্থা হয়ে গেল বড়বৌ। ব্ল্যাকে ছাড়া তো এ অঞ্চলে ওসব জিনিস মেলা শক্ত, তবু আমায় একজন ন্যায্য দামে সাপ্লাই করবে বলেছে। আমারই ছাত্তর ছিল এক সময়ে। বড় ভালো ছেলে।

তারপর দুজনে মিলে বসে নতুন নতুন পরিকল্পনায় বিভোর থাকেন।

উঠোনটার খোয়া খাপরা ভাঙাচোরা সব উপড়ে ফেলে নতুন বিলিতি মাটির মেঝে করতে হবে। লাল টুকটুকে। তার ধারে সবুজ বর্ডার। আর ঠিক মাঝখানটায় যেখানে বিয়ে টিয়ের 'বৌ' ছত্র আলপনা আঁকা হয়, ছাঁদনাতলা বানানো হয়, সেখানে বিরাট করে শিঙ্খলতা প্যাটার্নের আলপনার মতো ছবি আঁকানো হবে। ভবিষ্যতে আর আলপনার জন্যে ভাবতে হবে না—বলেন শশীঠাকরুণ নতুন বৌ এসে দাঁড়াবে একেবারে পাকা আলপনার ওপর।

রান্নাঘরের দেওয়ালে দুটো দেওয়াল-আলমারী করাতে হবে বুঝলে ঠাকুরপো, রাঁধুনীকে তাহলে চোদ্দবার ভাঁড়ারের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। আট দশ দিনের মতো জিনিস নিয়ে গিয়ে রেখে দিলেই হবে। ফুলপুরের এই রকমটা করিয়ে দিয়েছিলাম সেবাব। বৌরা দু'বেলা ধন্যবাদ দেয়।

রমেশ মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বলে, এখানে সেটি পাবে না। শত সুবিধে পেলেও ধন্যবাদ দেবে না।

তা জানি! শশীঠাকরুণও মুখ টিপে হাসেন, ওর হয়েছে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।

হ্যাঁ বোঝেন বৈকি শশীঠাকরুণ, রাজবালার চিরকালের অন্যমনস্ক, সংসারের ব্যাপারে উদাসীন, অলস চিত্ত স্বামীব হঠাৎ কর্মোৎসাহ দেখে রাজবালা সুখী হওয়া তো দূরে থাক, জ্বলে মরছে, তা বুঝতে বাকি নেই শশীঠাকরুণের। তবে ওসব তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর মতে কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

তিনি বলেন, যখন দেয়ালে হাত টিপে আলো জ্বালাতে পাবে তোমাব বৌ, আর ঘেরা নাইবার ঘরে কল টিপে জল বার করতে পাবে, তখন মনে মনে শশীবামনীকে পেন্নাম করবে।...তুমি লেখা লিখিটার তোড়জোড় করো।

মিস্ত্রী খাটানোর নেশা, একটি বড় নেশা। মানুষ বিশেষে মদের নেশার মতই তীব্র। শশীঠাকরুণ চিরদিন এই নেশার বশ! ফুলপুরে শুধু চাটুয্যে বাড়িতেই নয়, যাদের যখন বাড়িতে মিস্ত্রী লাগে, শশীঠাকরুণ দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করেন। তারাও বাঁচে, বলে, দিদি ঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছেন। পিসিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। যাক নিশ্চিন্ত। আর ব্যাটারা এক মিনিট ফাঁকি দিতে পারবে না।

সময়ের ফাঁকি এবং কাজের উৎকর্ষে ফাঁকি, কোনোটাই শশীঠাকরুণের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।

সেই চির অভ্যস্ত কাজের নেশায় আর এক নতুন মাদকতার যোগ হয়েছে।

এইটাতে শশীঠাকরুণ যেন 'আমার' শব্দটায় স্বাদ পাচ্ছেন। এ স্বাদ তো কই ফুলপুরের চাটুয্যেদের কাজে কখনো পাননি শশীঠাকরুণ?

এই জন্যেই বুঝি বলে, মেয়ে সন্তান পরভূমির মাটিতে গড়া। তারা জন্মপর।

তা নইলে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ফুলপুরের চাটুয্যে বাড়িতে সাম্রাজ্ঞীর আসনে বসে কাটিয়ে এসেও

আজ বীরনগরের ভবেশ বাঁড়ুয্যের ভাঙা ভিটেয় এসে শশীঠাকরুণ 'আমার' শব্দটার স্বাদ উপলব্ধি করছেন? আর সেই উপলব্ধির মধ্যে একটা উত্তেজনাময় মাদকতার স্বাদ পাচ্ছেন।

কথাটা শুনে ফুলপুরের সবাই গালে হাত দিল।

পরীর বিয়ের দিনস্থির হলে, তবে নাকি দিন চার পাঁচের জন্য আসতে পারবেন শশীঠাকরুণ।

মানুষ বদলে টদলে যায় ঠিকই, আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে বদলায়, অভাবে স্বভাব নষ্ট হলে বদলায়, কিন্তু শশীঠাকরুণের মতন মানুষের এ হেন শোচনীয় পরিবর্তন?

এ যে অভাবিত, অসম্ভব!

তা ছাড়া কিসে বদলালেন তিনি? অভাবও ঘটেনি, হঠাৎ কিছু ঐশ্বর্যও জোটেনি। তবে?

ওই তবেটার উত্তরটা কারুর বুদ্ধিতে আসছে না।

তবে লোকে দেখলো পরীর বিয়েতে শশীঠাকরুণ সত্যিই প্রায় নেমন্তন্নীর মতো এলেন।

সকলের অভিমানবাণী, অভিযোগবাণী, ও হৈ চৈ এর উত্তরে হাসলেন, দুটো রঙ্গ কথা বললেন, কনের গহনা কাপড় কি কি হয়েছে তা এক নজর দেখলেন, ভাইপোর কাছে বসে দেনা পাওনার বিবরণটা শুনলেন, এই পর্যন্ত। অবিশ্যি কাজের সময় খাওয়াদাওয়ার তদ্‌বির, গ্রামের সবাই এসেছে কিনা তাঁর খোঁজ খবর নেওয়া, সবই করলেন, তবু যেন কেমন ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা। যেন শেকড় থেকে শক্ত হয়ে বসে নয়।

যখন যুগী বৌ কেঁদে পড়ে বললো, তুমি যে চেরকালের মতন গাঁ ছাড়বে তা তো বলে গেলে না? আমার যে এতোদিন কী হাডির হাল, তা আর তোমায় কী বলবো? তখন এমন আশ্বাস দিলেন না, ওরে চিরকালের জন্য নয়, আবার আসবো আমি।

যখন নাড়ুবোসের বাড়িতে গিয়ে উঁকি মারলেন, তখন আর বোধহয় তেমন করে মনে পড়লো না শশীঠাকরুণের এদের দাঁড় করিয়ে রাখা আমারই দায়িত্ব!

শশীঠাকরুণ শুধু অপ্রতিভ মুখে এক মুঠো করে টাকা ধরে দিলেন ওদের হাতে। আর শ্বশুরের ভিটেটায় সংস্কারে হাত দিয়ে বসে কী পরিমাণ আটকে গেছেন সেটাই বোঝাতে চেষ্টা করলেন। শশীঠাককণের মুখে কৈফিয়ৎ দেওয়া! এটাও নতুন ঘটনা।

শশীঠাকরুণের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে ফুলপুরের মনোজগতে অনেক ঢেউয়ের ওঠা পড়া হয়েছে।

অধিকাংশটা এই—এখনকার বৌ ঝিরা আর তেমন নয়, গুরুজনের মান মর্যেদা রাখে না, নির্ঘাৎই তলে তলে অনেকদিন থেকেই অতিষ্ঠ হচ্ছিলেন শশীঠাকরুণ, তবে মানী মানুষ, লোক হাসিয়ে ঝগড়াঝাঁটি না করে একটা ছুতো দেখিয়ে চলে গেলেন।

আরো একটা দলের অভিমত—স্বর্গত অঘোর চাটুয্যে তো হাঘরের ঘরে নাতনীকে দেননি? সমৃদ্ধ ঘরেই দিয়েছিলেন, নাতনীর ভাগ্যে ভোগ নেই তিনি কি করবেন? তা এতোদিনে বোধ হয় শশীঠাকরুণের চেতনা হয়েছে, তাঁরও কিছু সেখানে ভাগ আছে বিষয় আশয়ে, তাই দেখতে গেছেন কী আছে না আছে।

শেষের দলের কথা ক্রমশঃই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল শশীঠাকরুণের ফিরে না আসায়, শুধু দেখতেই যদি গেছেন, তো আর ফিরে আসবেন না?

অতএব?

অতএব ওই আগের দলের হিসেবই বলবৎ।

মনের ঘেন্নায় দেশ ছেড়েছেন শশীঠাকরুণ।

নির্ঘাৎ ভাইপো বৌরা এখন গিন্নী হতে চায়।

নাতবৌরা পোঁছে না, অগ্রাহ্য করে।

তার সাক্ষী শশীঠাকরুণ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাটুয্যে বাড়ির ব্যবহার।

আর কি গাঁ সুদ্ধ সবাই আমাদের আপন জায়গা, আমাদের আশ্রয় স্থল, ভেবে যখন তখন এতে বসতে সাহস পাচ্ছে?

এসে বসলে তেমন আদর আপ্যায়ন পাচ্ছে?

একদিন নন্দ ছুতোরের মা এসে বসে দুটো পান চেয়েছিল, পেতে দেরী হয়েছিল। সেই অপরাধে শশীঠাকরুণ ভাইপো বৌদের চোখের জল বার করে ছেড়েছিলেন। অতিথি যে নারায়ণ তুল্য সে কথা যাতে আর না ভুল হয়, তার জন্যেই অমন দাওয়াই।

সেই বাড়িতে এখন এসে দাঁড়ালে কেউ তাকিয়ে দেখে না।

সকলেরই আশা ছিল, পরীর বিয়ে উপলক্ষে এসে যাবেন পিসিমা, আবার নিজ সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড হাতে নেবেন। কিন্তু এ কি সংবাদ? মাত্র চারদিনের জন্যে আসছেন তিনি, সেখানে নাকি তার জরুরী দরকার, থাকবার জো নেই।

সংবাদে সবাই বিস্মিত হলো। এ কিরে বাবা? জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলছে, ডান? এখন তোমার সেই অদেখা অজানা পচা শ্বশুরবাড়ির দেশে এমন টান হলো যে ফুলপুরের মাটিকে ভুলেই গেলে? ভুলে গেলে সেখানের মানুষদের? যারা তোমার মুখোপেক্ষী ছিল, যারা তোমার স্নেহাশ্রিত ছিল?

এতো পরিবর্তন শশীঠাকরুণেরও কি সম্ভব?

তা নিজের পরিবর্তনে নিজেও মনে মনে অদ্ভুত একটা বিস্ময় অনুভব করছেন শশীতারা। হয়তো বিস্ময়টা ঈষৎ বিষণ্ণও।

যে সংসারটা নিয়ে এতোবড়ো জীবনটা কাটিয়ে এলেন শশীঠাকরুণ, যে সংসারের একটা ভাঙা পাথরবাটিও শশীঠাকরুণ বাঘিনীর মতো আগলেছেন, যার পান থেকে চুণ খসলেও রসাতল করেছেন, সে সংসারটা সম্পর্কে আর কোনো মূল্যবোধের সাড়া পাচ্ছেন না কেন?

কই একবাবও তো মনে হচ্ছে না, ইস আমার হাতে গড়া সংসারটা এরা কী যা তা করেই চালাচ্ছে! কী নষ্ট হচ্ছে, কী অপচয় হচ্ছে!

অথচ চোখে যে পড়ছে না তা নয়। চির অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক নজরেই ধরা পড়েছে কোথায় কী বিশৃঙ্খলা, কোথায় কী অপচয়, কোথায় কী অবহেলা।

বাড়িতে বিয়ে এসে গেছে, বাড়ির বাইরে একটা কলিও ফেরানো হয়েছে, কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের কড়িবরগায় ঝুল ঝুলছে, রান্নাঘরের তাক ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে।

গলি থেকে বালিশ বিছানাগুলো নামানো হয়েছে। কিন্তু তাদের গায়ে ওয়াড় পরানো হয়নি। অনাবৃত বালিশগুলোই ব্যবহার হচ্ছে তেলতেলে মাথায়।

শশীঠাকরুণ কি ভাবতে পারতেন এটা হতে দেওয়া যায়?

বিয়ে বাড়ির এখানে সেখানে একটা থালায়, একটা রেকাবিতে, একটা বাটিতে, কতকগুলো করে মিষ্টি পড়ে রয়েছে। পিঁপড়ে ধরছে।

এক একবার ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, এটা কী?

কিন্তু ভেতর থেকে তেমন প্রেরণা পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে, মরুকগে, ওরা তো এই রকম করেই সংসার করবে। আমি আর দু'দিনের জন্যে এসে বলে মন্দ হই কেন? চিরদিনের ফুলপুর যেন এই ক'মাসেই ঝাপসা হয়ে গেছে শশীঠাকরুণের কাছে।

এ পরিবর্তন অনুভব করছে বৈকি শশীতারা। তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন মন তাঁর। আর ভাবছেন, নতুন বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে এলে কি এই রকমই হয় মেয়েগুলোর? বোধহয় হয়।

বিয়ে হয়ে অষ্টমঙ্গলার ক'দিন ঘুরে আসার পরেই ভাইঝিগুলোর ভাবান্তর চোখে পড়তো শশীঠাকরুণের। যেন আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব, যেন যেটা করতে বলবে শুধু সেটাই করবে। যেন শেকড় নেই কোথাও। দেখে রেগে জ্বলে গিয়েছেন শশীঠাকরুণ।

আজ নিজেকে নিজেই কৌতুক করছেন, কি, তোরও কি ওই ছুঁড়িগুলোর মতন দশা হলো নাকি? তুইও তো এই আজীবনের জায়গায় আর তেমন শেকড় খুঁজে পাচ্ছিস না।

শশীঠাকরুণের চিত্ত যেন উৎকর্ণ হয়ে আছে বৈঠকখানা বাড়ী থেকে একটা খবর আসার অপেক্ষায়।

মেয়ের বিয়েতে শশীঠাকরুণকে আনতে যাবার সময় বড় ভাইপো সৌজন্য করে রমেশ মাষ্টারকেও নেমন্তন্নর চিঠি দিয়ে বলে এসেছিল, আপনিও দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন। চিরকালের কুটুম্ব ঘর, কিন্তু আসা যাওয়া তো নেই, তাই এযাবৎ আসতেও ভরসা পাইনি। এখন যখন পিসীমা দরজা খুলে দিয়েছেন—

সেই সৌজন্যের বাণীটুকুর সূত্রধরে শশীঠাকরুণ সদরের খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছেন, লোকটা এলো কি না। এসে পড়লে আদর আপ্যায়নের ঘাটতিতে আহত হয়ে ফিরে না যায়। চেনেনা তো কেউ। হয়তো বসতে বলবে না, হয়তো ডেকে কথা কইবে না।

তাই ছোটমোট ছেলেপুলেকে বারবার বাইরে পাঠাচ্ছেন। দেখ্ তো বীরনগর থেকে কেউ এসেছে কিনা?

কানে যে কারুর যাচ্ছে না তাও নয়।

নাতবৌরা শুনতে পেয়ে নিজেরা হাসাহাসি করছে। শ্বশুর বাড়ির লোকের জন্যে ঠাকুমার মন ছটফট করছে, না জানি তোমাদের ঠাকুর্দা থাকলে কি হতো।

ভাইপোবৌরা আতঙ্কে আতঙ্কে ছিলেন, আবার এসে সিংহাসনের দাবি করে কিনা। অথচ ওঁর এই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাব দেখে বিরক্ত না হয়েও ছাড়ছে না।

উনি আবার আমাদের জিজ্ঞেস করে কাজ করছেন! যেন কুটুম এসেছেন। মরণকালে জ্বরচ্ছেদ। আবার সতাতো দ্যাওরের জন্যে হামলাচ্ছেন। এতো লোকজন এসেছে, কারুর দিকেই যেন লক্ষ্য নেই। বীরনগরের কেউ এসেছে কিনা তাই নিয়েই অস্থির।

সত্যি, কারই বা ভাল লাগে এমন অকৃতজ্ঞতা?

ভাইপোদেরও ভালো লাগছে না।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে পিসীমার মন পড়ে আছে সেই বীরনগরের মজুর মিস্ত্রীর ওপর। এর থেকে অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

এখানটা হয়তো শশীঠাকরুণ তাঁর তীব্র অনুভূতি দিয়েও বুঝতে পারছেন না। শশীঠাকরুণ মনে করছেন, জন্মে আসে না এমন কুটুম যদি তোদের মেয়ের বিয়েতে এসে আদর অভ্যর্থনা না পায়, তবে তো তোদেরই লজ্জা। শশীতারা সেই লজ্জাটার ভয়েই—

ইত্যবসরে যে আরও একটা খবর কানাঘুষোয় এই ফুলপুরে এসে পৌঁছেছে, সেটা জানা নেই শশীতারার। এমনিতে কখনো কোনো খবরই আসতো না, কিন্তু কথাতেই আছে, আগুন আর কলঙ্কের কথা বাতাসের আগে ছোটে।

যদিও কথাটা হাস্যকর রকমের অবিশ্বাস্য, কিন্তু ভাব ভঙ্গীটাও যে রীতিমত বিরক্তিকর। বাধ্য হয়েই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। বীরনগরের রমেশ মাষ্টার বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্নে এলো কিনা, এটার জন্যে যদি শশীঠাকরুণ নব অনুরাগিনী রাধার মতো উতলা হন, তাহলে তাঁর বাহাত্তর বছর বয়স হতে চললো বলেই কি ছেড়ে দেবে লোকে?

আর বীরনগরেও যখন ওই নিয়ে কানাঘুষো চলছে। সতাতো জা নাকি ওঁদের হাসিগল্প মস্করা মাখামাখি দেখে গলায় দড়ি দেবে কি বিষ খাবে তাই চিন্তা করছে।

তা প্রমাণ হাতে হাতেই মিললো।

বীরনগরের রমেশ মাষ্টার এসেছেন নেমন্তন্নে, ওই শুনে যে ভাবে ছুটলেন শশীঠাকরুণ তা দেখবার মতো।

একথা কেউই ভেবে দেখলো না, আজন্ম একদুয়োরি শশীঠাকরুণ এই মরণ কালেও আর একটা খোলা দরজার বাতাসে একটা অনাস্বাদিত মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন, তাই তাঁর আচরণে এমন চাঞ্চল্য।

কেউ ভেবে দেখছে, না ইহজীবনে শশীঠাকরুণের নিজস্ব কোন জগৎ ছিল না, ছিল না একান্ত ভাবে নিজের কোন আপনজন, হঠাৎ সেইটা পেয়ে গেছেন শশীঠাকরুণ। মেয়েদের জীবন দুটো পরিবারের ওপর

ভর দিয়ে গড়ে ওঠে, শশীঠাকরুণ ইহজীবনে সেই গড়নটা পাননি। অথচ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তার জন্যে ছিল চির পিপাসা, যার খবর শশীঠাকরুণ নিজেও কোনদিন টের পাননি।

ওরা জানে না, অজিত যখন বীরনগরে গিয়েছিল, শশীতারা রমেশ মাষ্টারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, তোমায় তো ভাই একবার গণেশ ময়রার দোকানে যেতে হচ্ছে। কুটুম এসেছে যখন। তোমাদের দেশের সেরা সেরা মিষ্টি টিষ্টি নিয়ে আসবে, বুঝলে? চট করে। বলেছিলেন, আমি বললে ভাল দেখাবে না, তুমি নিজে একবার বল ভাল করে, ওকে আজকের রাত্তিরটা থেকে যেতে।

অজিত অবিশ্যি থাকেনি, কিন্তু বলেছিলেন রমেশ মাষ্টার।

এখনো সেই মনোভঙ্গীই কাজ করছে।

শুধু এরা সেটা বুঝতে পারে না।

জগতের সবাই যদি সবাইকে বুঝতে পারত, অন্ততঃ বুঝতে চাইত, তাহলে তো পৃথিবীতে সমস্যা বলে কিছু থাকতই না। সংসারটা স্বর্গ তুল্য হতো।

কিন্তু কেউ কাউকে বুঝতে চেষ্টা করে না, হয়ত বা বুঝতে রাজীই হয় না। বরং অদ্ভুত অসম্ভব অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাস করবে, তবু তলিয়ে বুঝতে চাইবে না আর কি হতে পারে।

অন্য কিছু হতে পারে কিনা।

অতএব শশীঠাকরুণের চিরভক্ত ফুলপুর যখন দেখল শশীঠাকরুণ ভাইপোদের অনুরোধ ঠেলে আর দুটো দিনও থেকে না গিয়ে সেখানে জরুরি দরকারের ছুতো দেখিয়ে এই ক'দিনের চেনা লোকটার সঙ্গে বোঁ বোঁ করে ছুট্ মারলেন, একটা রিকশয় গায়ে গা দিয়ে বসে, তখন ছি ছিক্কার করে উঠল।

এতোদিনের সমস্ত ছেদ্দা ভক্তি ভালবাসা সমীহ সব জলাঞ্জলি দিয়ে বলতে লাগল, এই জন্যেই বলে, পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই। তা নইলে শশীঠাকরুণ কিনা চারকাল পার করে এসে এখন সতাতো দ্যাওরের সঙ্গে—ছি ছি! দুর্গা দুর্গা! সন্ধ্যেবেলায় আস্তাকুড় মাড়ানো আর কাকে বলে?

শশীঠাকরুণের কানে অবশ্য এসব পৌঁছয় না।

পৌঁছলেই কি তিনি কেয়ার করতেন নাকি?

ট্রেন ছাড়ো ছাড়ো সময় ষ্টেশনে এসে পৌঁছন হয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে ওঠা। রেলগাড়িটা ছেড়ে দিতেই শশীঠাককরুণ একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, যেন খুব কৌশলে একটা জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছেন।

আলো আলো মুখে বললেন, আমি চলে আসার পর আর মিস্ত্রীর কাজ হয়েছিল নাকি?

রমেশ মাষ্টার বললেন, পাগল, কে দেখবে?

কেন বাপু, তুমি বুড়ো মন্দ একটু দেখতে পারো না?

আমার দায়!

শশীতারা জানলা থেকে এসে পড়া বোদ থেকে মুখটা বাঁচিয়ে সরে এসে বলেন, হুঁ যত দায় আমার! ইলেকট্রিক কোম্পানীর চিঠির উত্তর এসেছে?

গাড়িটার কোথায় একটা ধাক্কা লাগে, শব্দ ওঠে, উত্তরটা শোনা যায় না। কিন্তু না যাক, শশীতারার মুখে সেই না-আসা বিদ্যুতের আলোর দীপ্তি।

হয়ত শশীতারা সম্পর্কে অপবাদটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও নয়, এই বয়সে প্রেমেই পড়ে গেছেন শশীতারা। যে জীবনটার স্বাদ তাঁর জানা ছিল না, অথচ তার সাধটা কোন গভীর অলক্ষ্যে একটি সোনার কৌটায় লুকনো ছিল, হঠাৎ পেয়ে গিয়ে সেই জীবনটারই প্রেমে পড়ে গেছেন তিনি!

দ্বিতীয় পর্ব

ওরা চারজনে তাস খেলছিল।

সুখেন, ননী, রাজেন আর জগাই।

স্থান কাল পাত্র, স্রেফ সোনায় সোহাগার মতই। সমস্ত পরিবেশটা দেখলেই মনে হবে, ঠিক! এদের এইখানেই মানায়। এদের এখানে ছাড়া কোথায় মানায় না।

স্থানটা করণপুর রেলওয়ে স্টেশনের ধারের একটা চা-বিস্কুটের চালা।

চালার সামনে দুটো নড়বড়ে কালো কালো বেঞ্চি পড়ে আছে বাঁকাচোরা হয়ে, সামনেব বাঁশের খুঁটি দুটোর গায়ে খানিকটা করে নারকেল দড়ি বাঁধা। ওই দড়ি দুটোর বাঁধনের গিঁঠের যে আগাদুটো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, একটু আগেও তার মুখে আগুন জ্বলছিল। এখন শেষ ট্রেন চলে গেছে, এখন আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোকানটা ননীর।

এবং ননীই ওদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ।

এরা ননীব দোকানের কর্মচারী অবশ্য নয়, তবে সকালে যখন পর পর দু তিন খানা ট্রেন আসে, ননীর দোকানে খদ্দের ধরে না, তখন খদ্দেররা এদের কাউকে না কাউকে দেখতে পায়। ননীকে সাহায্য করতে আসে এরা। নইলে ওদের তিনজনেরই ওই রেলেরই খাঁজে খোঁজে কোথাও একটু চাকরী আছে। সে চাকরীর ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে এরা ননীর দোকানে ডিউটি দিয়ে যায়।

পয়সাকড়ির সম্পর্ক নেই, এক গেলাস চা আর দুখানা লেড়ো বিস্কুট, মাত্তর এই, তবু তার বিনিময়েই এরা এসে পড়ে, জোরে জোরে পাখা নেড়ে উনুন ধরিয়ে দেয়। ডেকচিতে ফুটন্ত জলের মধ্যে ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে গুঁড়ো চা বেঁধে ছেড়ে দেয়, তার মধ্যেই দুধ চিনি ঢেলে দিয়ে হাতায় নেড়ে নেড়ে কাঁচের গ্লাসে গ্লাসে সাপ্লাই করে। চোখে-কানে দেখতে পায় না, হিমসিম খেয়ে যায়।

ননী শুধু বিস্কুট দেয়, আর পয়সার লেনদেনের হিসেব করে। ফাঁকে ফাঁকে চালার কোণের দিকে কোথায় যেন একটা মাটিব কলসী আছে তার মধ্যে ফেলে ফেলে আসে।

ননীর মা বলত, 'ঘটই হচ্ছে মা লক্ষ্মীর আধার। সকল দেবতারই ঘটেই অধিষ্ঠান, খদ্দেরের পয়সাকড়ি ঘটের মধ্যে থুবি ননী! রাত হলে তখন ঘরে এনে বাক্সয় তুলবি।'

মা-র কথাটা শুনেছে ননী।

তাতে সুবিধেও।

বাক্সর ডালা তোলা, ডালা নামানো, সময়-সাপেক্ষ।

বিকেলের দিকেও ট্রেন আসে।

পাঁচটা পঞ্চান্ন, সাতটা চল্লিশ, আর ন'টা বত্রিশে। এটাই শেষ।

তবে বিকেলের দিকে এত হিমসিম ভাব হয় না। তখন খদ্দেরও কম থাকে, আর কাজও খানিক এগোনো থাকে। সকালের হৈ চৈ মিটলেই ননী ওই ডেকচিতে এক ডেকচি চা তৈরি করে উনুনে গুঁড়োকয়লা দিয়ে বসিয়ে রাখে, সেটাই সাপ্লাই দেয়। দুধটা মিশিয়ে রাখে না কালো হয়ে যাবার ভয়ে, সেটা শুধু পরে মিশোয়।

বিকেলে ননী মাঝখানে পাতা ওই বেঞ্চিতে একটু বসতে পায়, মাঝে মাঝে বিড়ি টানতে টানতে কোন পরিচিত খদ্দেরের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাও কইতে পায়।

অনেকেই বলে ননীকে, 'তোমার এই দোকানে যদি সকালের দিকে অন্তত আলুর চপ আর পেঁয়াজি রাখো ননী, পড়তে পাবে না। দেখবে ওই তেলেভাজার দৌলতেই তোমার টালিঘরখানি কোঠাঘর হয়ে যাবে—'

ননী এসব সুপরামর্শ কানে নেয় না।

বলে, 'না দাদা, যা আছে তাই ভালো। চা চিনি আর গুঁড়ো দুধ, এসব তো মজুতই থাকে, বিস্কুটও মজুত রাখি টিন বোঝাই করে, আর ওই বিড়ি। ব্যস্ হয়ে গেল! ওই সব গরম মাল যোগান দিতে গেলেই ভেস্তে যাবো! হাতছাড়া আম হয়ে সুখ নেই।'

তারপর হয়তো তেমন পরিচিত জন কেউ হলেই উদাস উদাস গলায় বলে, 'আর অধিকে দরকারই বা কী দাদা? কার জন্যে কী!'

বছর কয়েক হল ননীর বৌটা মারা গেছে রেল হাসপাতালে, মেটার্নিটি ওয়ার্ডে। জ্বলজ্যান্ত বৌটা গেল আর মরে গেল। তদবধি ননীর কণ্ঠে এই বৈরাগ্যের সুর।

তবু হিতৈষীরা বলে, 'কেন ননী, তোমার যখন পুষ্যি রয়েছে ঘরে, নিজের দুটো মা-মরা গুঁড়োও রয়েছে, তখন সবই প্রয়োজন।

ননী সংক্ষেপে বলে, 'সব শালা বেইমানের ঝাড়। কারুর জন্যে করার মন নেই দাদা! খেতে পরতে দেওয়াটা ডিউটি, সেটা দিয়ে যাচ্ছি ব্যস্।'

অবিশ্যি ননীর 'পুষ্যি'দের মধ্যে যার মুখটা বেশী সে এমন কথা শুনলে বলে, 'ওই গরবেই গেল মামা। দিচ্ছে অবিশ্যি যোগান, তবে কেমন ভাত কেমন কাপড় সেটাই হচ্ছে কথা।'

ওই মুখটাকে ননী একটু ভয় করে, আর কিছু না। তবে কেউ যদি ননীকে সহযোগিতা না করে, ননীই বা কার? কারো নয়।

ননী ওই চা-বিস্কুট সাপ্লাই করেই যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট, আর সন্তুষ্ট তার বন্ধু-বান্ধবদের সুব্যবহারে। সুখেন, রাজেন, জগাই এরা তার কে? কেউ না। বাংলা মুলুক ছেড়ে যখন, কে জানে কার জুতোর ঠোক্কর খেতে খেতে, ছিটকে এসে বেহারের এই রেল স্টেশনের ধারে এসে পড়েছিল, তখন না জানত হিন্দী, না চিনত একটা লোককে।

ঢের লোকই হিন্দী জানে না, তবু হিঁয়াসে হুঁয়াসে করে চালিয়ে নিতে পারে, ননী পারত না। সেই দুরবস্থার সময় কোথা না কোথা থেকে এই তিনটে স্বজাতির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তারা হিন্দীতে চৌকস, আবার বাংলা কথা বলে প্রাণ কান জুড়িয়ে দেয়।

ননী তাদের আঁকড়ে ধরেছিল।

সেই বন্ধন এখনো অটুট আছে।

ননী ছাড়েনি, ওরাও বেইমানি করেনি। যেটা করেছিল ননীর নিজেব সহোদর ভাই ফণী।

নিজে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে গ্রামে গিয়ে অগাবগা ভাইটাকে নিয়ে এসেছিল ননী, তার সঙ্গে ভাত রাঁধতে বিধবা দিদি পদ্মকে।

পদ্মকে আনার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল।

ঘরে একটা মেয়েছেলে না থাকলে, বিয়ের কথা কে তুলবে? নিজে নিজে দুম করে একটা বিয়ে করে বসলে, তাতে কখনো বিয়ে বিয়ে স্বাদ আসে? আর সত্যি বলতে, ভাল ঘর থেকে তেমন সম্বন্ধও আসে না। শুধু একটা চায়ের দোকানদার? সন্দেহের চোখে তাকায়।

এ বাবা বিধবা দিদি আছে সংসারে, ছোট ভাই আছে যাকে বলে একটা গেরস্থ! লোকে মেয়ে দিতে এগিয়ে আসবে।

তা অবিশ্যি ক্যালকুলেশনে ভুল হয়নি ননীর, ভাল ঘরের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল তার। আর

তারা ওই দিদি পদ্মকে দেখেই আশ্বস্ত হয়ে বিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে। কনক ওই দিদিরই দূর সম্পর্কের ভাসুরঝি না দেওরঝি।

গুণের তুলনা ছিল না কনকের।

ননীর ভাগ্যে সইল না। বাচ্চা দুটো ছেলেমেয়ে রেখে হুট্ করে মরে গেল। দিদি অনেক বলেছিল, 'এই বয়সে কে আবার বৌয়ের জন্যে সন্নিসী হয়? আর একটা বে কর।'

ননী দুই হাত তুলে দুটো কান মলেছে।

না, আর নয়।

বড় দাগা বেজেছে প্রাণে।

ননী দিদিকে জ্ঞানের কথাও শুনিয়েছে—'কপালে সুখ থাকলে ওই বৌই টিঁকে থাকত! যাবেই বা কেন? সুখ কপালে নেই বলেই—

আবার বিয়ে করলে সে বৌও যে মরবে না তার গ্যারান্টি আছে? তাছাড়া সে তোমায় কাকী বলে মানতো, দ্বিতীয় পক্ষ এসে যদি ধিঙ্গী অবতার হয়, যদি তোমায় না মানে?'

পদ্ম বলেছে, 'সেটা তোমার হাতে। তুমি পুরুষ ছেলে যদি পরিবারকে টাট্ করতে না পারো, তাহলে তোমাকেই ধিক।'

ননী উদাস গলায় বলেছে, 'একটা অপর বাড়ির মেয়েকে ডেকেডুকে নিয়ে এসে তাকে টাট্ করতে বসবার আমাব দরকার কি? ইচ্ছেও নেই, শক্তিও নেই।'

দিদি শেষ চেষ্টা হিসেবে বলেছে, 'আমি কি চিরকাল তোমার মা-মরা ছেলে-মেয়ের কন্না করব?'

ননী আরো উদাসভাবে বলেছে, 'করতে বেজার ধরলে কোর না। অনাথ আশ্রমে চালান করে দেব দুটোকে।'

'বাপ থাকতে ওদের অনাথ বলবি?'

'বলতে কী? তোমরাই তো বল মা মরলে বাপ তালুই। তা সেই সম্পর্কই বলব।'

দিদি বলেছে, 'তোকে বিয়ের কথা বলতে আসা আমার ঝকমারি।'

'আর ততোধিক ঝকমারি বৌ মরলে আবার বৌ আনা।' ননী বলেছে, 'বেদে পুরাণে শুনেছ কখনো সৎমা এসে কন্না করেছে?'

'শুনব না কেন, ঢের শুনেছি—'

তর্কের খাতিরে জোর দিয়েছে পদ্ম।

ননী বলেছে, 'তোমার কপাল ভাল। তাই তেমন দেবীদর্শন হয়েছে। আমার সঙ্গে তো পরিচয় ধ্রুবর বাপ রাজা উত্তানপাদের দ্বিতীয় পক্ষ সুরুচি রাণীর, পরিচয় মহারাণী কৈকেয়ীর, আর রূপকথার সুয়োরাণীদের। ওনাদের তো দূরে থেকে নমস্কার! হ্যাঁ তোমার কষ্ট, তা তোমার আয়েসের কপাল হলে ফণী রাস্কেলটা এমনটা করত না। আজ তার বিয়ে দিয়েই তো ঘরে বৌ এনে আয়েস করতে পারতে।'

তা ফণীকে রাস্কেল বলা যায়।

সবে যখন ননীর দোকানটি জাঁকিয়ে উঠেছে, এবং ফণীও জোয়ান হয়ে উঠেছে, ননী স্বপ্ন দেখছে ফণী তার ডানহাত হয়ে উঠবে এইবার, হঠাৎ একদিন ফণী হাওয়া। আর তার সঙ্গে হাওয়া ননীর বাক্সেব টাকা, আর নতুন বৌয়ের গহনা ক'টা।

বেশী না হোক, তবু ছিল কিছু।

হারটা, বালাটা, কানফুলটা।

পদ্ম তার জ্ঞাতি দেওরকে মোচড় দিয়ে বাগিয়েছিল। তার এক কুচিও রেখে যায়নি।

ননী বাঘের মত গর্জন করে বলেছিল, 'ওই হতভাগাকে আমি জেলে দিয়ে ছাড়ব। যাচ্ছি থানায় ডায়েরী করতে—'

নতুন বৌ হাত ধরে মিনতি করে বলেছিল, 'দোহাই তোমার, ঘরের কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে লোকের

কাছে মুখ হাসিও না।'

এবার ননী কেঁদে ফেলেছিল, 'তোমার সর্বস্ব নিয়ে গেল, আমার কী ক্ষ্যামতা আছে যে আবার গড়িয়ে দেব?'

'থাক্ আমার গয়নার দরকার নেই!' বৌ নরম চোখ দুটি তুলে বলেছিল, 'মেয়েমানুষের স্বামীই সর্বস্ব, গয়না কাপড় নয়। তুমি আমায় শহরের দোকান থেকে কেমিকাল সোনার গয়না কিনে দিও।'

'সোনা হারিয়ে কেমিকেল্ পরবে কনক?'

কনক অম্লানবদনে বলে, 'তাতে কি? ও বরং চোরে নেবে না, অথচ পরতে বাহার! আমাদের বর্ধমানে কত কত বড়মানুষের বৌরাও পরে। দু'খানা সোনার সঙ্গে পাঁচখানা কেমিকেল সোনা।' কেউ কিছু বলতে যায়?'

ননী মৃদু হেসেছিল, 'বড়লোকের বৌকে কেউ কিছু বলতে যাবে না। কিন্তু ননী দাসের বৌকে বলবে।'

'বলুক, গায়ে ফোসকা পড়বে না।'

বাইরের চোরে নিলে শুধু লোকসান, লজ্জা অপমান নেই, ঘরের চোরে নেওয়ায় লোকসানের সঙ্গে সেটাও থাকে। সেই জ্বালায় জ্বলে ননী প্রতিজ্ঞা করল, 'ও ফিরে আসুক, আমি যদি আবার ওকে বাড়ি ঢুকতে দিই তোমরা আমার নামে কুকুর পুষো।'

তা ননীর নামে কুকুর পোষা আর হল না কারুর ভাগ্যে। ফণী আর এল না। ননী আরও একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেটা মনে মনে। সেটা হচ্ছে, 'বৌকে আবার ওই সব গয়না আমি গড়িয়ে দেবই দেব। যতদিনে পারি।' কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাও পালন হল না। যতদিনে পেরে উঠতে পারত ননী, ততগুলো দিন তো দিল না বৌ।

তবে আর ননী কোন উৎসাহে চায়ের দোকানে আলুরচপ আমদানী করে লাল হয়ে ওঠার প্রেরণা পাবে?

তাব থেকে সারাদিনের ঝামেলা মিটিয়ে রাত্তিরবেলা এই ভাঙা চৌকির উপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে বসে ময়লা তাসের জোড়া ভেজে ভেজে টৈয়েনটিনাইন খেলা ঢের ভাল।

ইস্টিশনের ওদিকে চারদিকে আলোর ছড়াছড়ি, কিন্তু ননীর দোকানে সেই আদি ও অকৃত্রিম হ্যারিকেন লণ্ঠন। চালার বাতায় একটা বাঁকানো শিক গুঁজে রেখেছে ননী, তাতে ওই লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে দেয়, আর বলে, 'কেন' বিজলীবাতির থেকে আলোটা কী কম হচ্ছে বল? চিমনীর কাঁচটা কেমন সাফ রাখি!'

তা হয়তো রাখে সাফ, তবু দোদুল্যমান আলোর নীচে বসে যারা খেলে, তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে বলেই পারে, নতুন কেউ এলে পারত না।

তুলসী তো এলেই বলে, 'ইলেকট্রিক না আনতে পার, একটা হ্যাজাক কিনতে পার না ননীদা? দোকানটা এমন ভুতুড়ে দেখায় না।'

একমাত্র ননীকেই তুলসী 'দাদা' বলে আর সবাইকে স্রেফ নাম ধরে ডাকে।

ননী বলে, 'এক তুইই ভুতুড়ে বলিস, আর তো কেউ বলে না?'

'বলে না, তারা সবাই ভুতুড়ে বলে।'

তুলসী যে কোন অধিকারে যাকে যা ইচ্ছে বলে ভগবানই জানে, অথচ বলে দিব্যি পার পায়। অথচ তুলসীর বদনামের শেষ নেই। তুলসী পিছন ফিরলেই সমালোচনা শুরু হয়ে যায়, আর আসছে দেখলেই লোকে গলা নামিয়ে বলে, 'ওই যে আসছেন। ঢলানি, বাচাল!' আরো যা বলে, সেটা অনুচ্চারিত থাকে, তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না কারুর!

তবু ওই রেলওয়ে কলোনির মধ্যে যতগুলো বাঙালী বাড়ি আছে সব বাড়িতেই তুলসীর গতিবিধি আছে, এবং মজা এই সমাদরও আছে। গেলেই মহিলারা তাকে 'বোস বোস' করে চা খাওয়ান, পান জর্দা খাওয়ান এবং এ বাড়ি ও বাড়ির গল্প ফাঁদেন।

তুলসীর কাছে অনেক খবর।

তুলসীর আদি ইতিহাস কি তা কেউ জানে না, ওকে প্রথম যখন এই করণপুরে দেখা যায় তখন ওর বছর দশেক বয়েস।

পরনে একটা বোতামবিহীন সস্তা ছিটের খাটো ফ্রক, মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ধুলি ধূসরিত হাত-পা।

তবু স্বাস্থ্যটি একেবারে টাইট।

কচিডাবের মতো চাঁচাছোলা মুখ, থোড়ের মত হাত-পা, রং না ফর্সা না ময়লা। যত্নে থাকলে হয়তো ফরসার দিকেই পাল্লা ঝুঁকত? তবু স্বাস্থ্যটি আছে। জিগ্যেস করলে কিছু বলতে চাইত না তুলসী, তবু যাদের খোঁচানো অভ্যেস, তাদের খোঁচানির ফলে এইটুকু জানা গেছে, কোন বাবুরা ফাই-ফরমাশ খাটাবার জন্যে তাকে গ্রামের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, এবং খরচ-পত্তর করে নিয়ে এসেছিল বলেই সেটা উসুল করবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তার সঙ্গে বকুনিটা ছিল ফাউ।

নিরুপায় মেয়েটা খেটেছে, বকুনি খেয়েছে, গ্রামের কথা ভেবে ভেবে কেঁদেছে, গ্রামের সেই কাকা-কাকী যারা তুলসীকে এদের হাতে তুলে দিয়েছিল, মনে মনে তাদের শাপশাপান্ত করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাদেব যত পেরেছে জ্বালাতন করতে ধরেছে।

বোঝা গিয়েছে নিরুপায় হলেও অসহায় নয় তুলসী নামের মেয়েটা। সহায় তার ওই বুদ্ধিটি।..একদিন ইচ্ছে করে হাত থেকে ফেলে গিন্নীর সদ্য-কেনা একটা দামী টী-সেট ভেঙে যখন তুলসী ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছিল, 'মারছেন কেন? অসাবধানে হাত থেকে পড়ে যায় না মানুষের? আপনারও যেতে পারত?'—তখনই সেইখানেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল।

'বেরো, বেরো আমার বাড়ি থেকে' বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল গিন্নী। বলেছিল 'পয়লা নম্বরের বিচ্ছু তুমি, ইচ্ছে করে ভেঙেছ।'

তবু ভাবেনি হয়তো মেয়েটা সত্যিই সেই অন্ধকারে হাওয়া হয়ে যাবে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে যাবে কোথায়?

কিন্তু হারিয়ে যাবাব ইচ্ছে থাকলে কি হারিয়ে যাবার জায়গার অভাব হয়? লাইনের এপাবে আব ওপারে দু'দিকে কলোনি ইস্ট—ওয়েস্ট। সেখানে এঞ্জিনের ধোঁয়ায় মলিন বিবর্ণ ইঁটের পরে ইঁট গাঁথা জুতোর দোকানের জুতোর বাক্সর মত যে কোয়ার্টারের সারি, তার মধ্যে কোন একটা খোঁজে কোন একটা মানুষকীট যদি গুঁজে গিয়ে ঢুকে থাকে, কে তাকে খুঁজে বার করবে?

তাছাড়া খোঁজায় তো অসুবিধাও আছে।

যতই মেয়েটার পাজীমো বদমাইসি বিচ্ছুমির কাহিনী ফলাও করে বল, মেয়েটার বয়েস শুনলেই লোকের সহানুভূতির ঢল্ তার দিকেই নামে।

মুখের ওপরই বলে, 'গাঁ-ঘরের মেয়ে আপনার জন ছেড়ে এসেছে, মন টেকেনি আর কী। হয়তো দেশে ফিরে যাবার চেষ্টাতেই পালিয়েছে।'

মুখের রেখায় যেটা বলে, সেটা হচ্ছে, নিষ্ঠুরের মতন অত্যাচার করেছ, তা নইলে ওইটুকু মেয়ে সাহস করে পালায়? মরীয়া হয়েই পালিয়েছে।...লোকে ভাংচি দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়েছে তাই বা কি করে বলা যায়? তোমাদের সঙ্গে ছাড়া একা তো যেতে দিতে না কোথাও।'

এসব কথা লোকে একদিনে জানেনি, দিনে দিনে কথায় কথায় জেনেছে। কেউ যখন জিগ্যেস করেছে, 'পালাবার জন্যে জ্বালাতন করেছিস? তুই তো খুব সাংঘাতিক মেয়ে!' তুলসী হেসে হেসে বলেছে, 'হ্যাঁ দেশে কাকী বলত 'ধানিলঙ্কা।'

সেই ধানিলঙ্কা তুলসী দশবছর বয়েস থেকেই পুরো স্বাধীন। নিজেই নিজের মালিক। লোকের বাড়ি চাকরী করেছে নিজে মাইনে ঠিক করে, কাজ ঠিক করে। একটুকরো কাজ বেশী করবে না। বরং অন্যের বাড়িতে গিয়ে অমনি কাজ কবে দিয়ে আসবে, তবু নিজের মনিব-বাড়ি এতটুকু বেশী নয়।

অতএব এই ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানের এক জায়গায় বেশী দিন আশ্রয় জোটেনি। কিন্তু তুলসী

হেসে হেসে বলেছে, 'ভালই তো! বেশ নিত্যি নিত্যি নতুন নতুন গিন্নী-কর্তা দেখছি, নতুন নতুন দাদাবাবু-দিদিমণি দেখছি।'

সে সব অবিশ্যি তামাদি কালের কথা। সেই দশবছরের মেয়েটা এখন কোন্ না আটাশ-তিরিশের হয়ে উঠেছে। গড়ন আরো টাইট, মুখ তেমনি ডাবের মত চাঁচাছোলা, শুধু চুল তেল-জবজবে, হাত-পা মাখন-বুলানো।

তুলসী আর লোকের বাড়ি কাজ করে বেড়ায় না, রেল হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে আয়ার কাজ করে। নিজের চেষ্টায় শিখেছে তুলসী; নিজের চেষ্টায় কাজ জুটিয়েছে।

তুলসীর কাজের গুণে, একটা বেলাও বসে থাকতে পায় না তুলসী। যাদের আয়া রাখবার ক্ষমতা নেই, তারাও লোভে পড়ে পাঁচটা ছ'টা দিন তুলসীর হাতের সেবা খেয়ে নেয়।

এখন তুলসীর এই করণপুরে রীতিমত প্রতিষ্ঠা।

'তুলসীর বিয়ে হল না', 'ঘর সংসার হল না', একথা কেউ কোনদিন ভাবেনি। তুলসী যেন ধাপে ধাপে সিঁড়ি পেরিয়ে দোতলায় উঠে গেছে, সেটার জন্যেই তুলসী মহিমান্বিতা।

কেউ বলতে পারবে না কেউ কোনদিন তুলসীর সাহায্যের জন্যে একটি আঙুল নেড়েছে। চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেবার ইতিহাসই ঘরে ঘরে।

তবে রেল কোয়ার্টাসের বাসিন্দারা চিরস্থায়ী নয়। কেউ বদলি হয়ে যায়, কেউ রিটায়ার হয়ে যায়, নতুন যারা আসে তারা তুলসীকে এই মূর্তিতেই দেখে। ওর আদি ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায় না।

অতটুকু বয়েস থেকে নিজে নিজের জীবনের মালিক হওয়ার মধ্যে দুঃখ যদিও বা কিছু থাকে, সুখটা অনেক বেশী। তুলসী সেই সুখের স্বাদ পেযে গেছে বলেই হয়তো আর মাথার ওপব ছাতার অভাব অনুভব করেনি।

ছাতা মানেই তো শাসনকর্তা।

ছাতা মানেই মাথা। মালিক।

দরকারটা কি? আহার আছে, আশ্রয় আছে, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি আছে, আর কি চাই?

বিয়ে করলে, সংসার হলে, এমন সচ্ছন্দ বিচরণের সুখ পেতো তুলসী?

একটা শাসনের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে যে জীবনটাকে সে নিজে গড়ে নিয়েছে, সেটাকে এমন তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবার সুখটা পেতো? লোকে তার চলন-বলন ধরন-ধারন ঠাঁট-ঠমকের সমালোচনা করে, আর কিছু বলুক দিকি গলা তুলে? তা বলতে হয় না। ওটুকু লোক-নিন্দে তুলসী গায়ে মাখে না, পায়ের তলায় মাড়ায়।

লোক-নিন্দের ভয় থাকলে আর তুলসী রাত দশটায় এই চায়ের দোকানের তাসের আড্ডায় এসে হাজির হত না।

অনেক ভোল পাল্টাতে পাল্টাতে তুলসী এখন বাবুদের বাড়ির বৌ-ঝিদের ভোল ধরেছে। তুলসীর গায়ে কাট-ছাঁটের রঙিন ব্লাউজ, তার সঙ্গে শৌখিন ধাঁচে পরা হালকা ছাপা ছিটের শাড়ি, পায়ে চটি। হাতে চুড়ি ফুড়ির পাট নেই, একগাছা করে সরু বালা। আগে হাত-ভর্তি কাঁচের চুড়ি পরত, আয়ার কাজের অসুবিধে হয় বলেও সব ছেড়েছে। তুলসীর মাথার চুল টান করে খোঁপা বাঁধা, তেল-চকচকে, তবু কপালের ওপরকার চুলগুলো ঠিক ঝুরো হয়ে উড়ছে। যেমন সেই ছোটবেলায় রুক্ষুমাথায় উড়ত। যা দেখে লোকের তার ওপর কেমন যেন একটা মায়া এসে যেত, দুষ্টু জেনেও।

রাস্তাব ওপর কোথা থেকে যেন কিছু আলো এসে পড়েছে, তুলসীকে দূর থেকেই দেখা গেল। যারা তাসে নিমগ্ন, তাদের হয়তো দেখতে পাবার কথা নয়, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সুখেন অন্যের তাস দেবার অবসরে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলছিল, 'রাত কত হল? বেশী দেরী হলে বাড়িতে গ্যাজগ্যাজানি শুনতে হবে।'

বাড়ি বলতে সুখেনের অকালবুড়ো বাপ আর হাড়-জ্বালানো পিসি। কিন্তু সুখেনই বেশী ব্যস্ত হয়।

কথাটা বলেই সুখেন গলা নামিয়ে বলে, 'ঢঙিনী আসছেন!'

সবাই চকিত হয়ে তাকাল।

রাজেন নীচু গলায় বলল, 'আজ আর নাইট ডিউটি নেই বুঝি?'

'নেই বোধহয়।'

'খেলাটা মাটি করতে এলো', বলল জগু, এবং ননীও একটা বিরক্তি-সূচক আঃ করল। অথচ আশ্চর্য, সকলেরই মনের মধ্যে যেন একটা ভাল লাগা ভাল লাগা ভাব খেলে গেল।

মন জিনিসটা এমনি অদ্ভুতই বটে!

ভাল লাগা আর ভাল না লাগাটা একাধারে এসে বসে!

তবু ওরা না দেখার ভান করল।

নিজের তালে তাস কুড়োতে লাগল।

তুলসী সামনে পাতা বেঞ্চি দুটোর পাশ কাটিয়ে দোকানে উঠে এসে মাজা ঘষা গলায় বলে উঠল, 'সেই টোয়েনটিনাইনই চালাচ্ছিস তো? না, তোরা আর সাবালক হলি না কোন কালে।'

সুখেনের সঙ্গেই লাগে বেশী। সুখেন বলে, 'তা তোর কী নির্দেশ? জুয়ো খেলতে হবে?'

'ও ছাড়া আবার কেউ খেলে নাকি?'

'ওসব বাবু ভদ্দরলোকদের খেলা—' রাজেন বলে, 'আমাদের জুয়োর বাজি ধরবার পয়সা কোথায়?

'ও থেকেই পয়সা আসে, তুলসী চৌকিটাব একধারে বসে পড়ে বলে, 'চা সব ফুবিয়ে ফেলেছিস? কি গো ননীদা?'

'তা, তুই আসছিস আমি জানতাম?'

'জানা উচিত ছিল।'

'হাত গুণতে তো জানি না।'

'তাও জানতে হয়।'

তুলসী হাত বাড়িয়ে বলে, 'কার পকেটে সিগ্রেট আছে একটা ছাড দিকিন।' প্যান্ট-শার্টই এখন জাতীয় পোশাক, অতএব সুখেন, বাজেন, জগাই তিনজনেই প্যাণ্টের পকেটে হাত পুবে একটা কবে বিডি বার করে এগিয়ে ধরল। ননীর পরনে ধুতি গেঞ্জি, ওর পকেট নেই।

'বিড়ি?'

নাক কোঁচকালো তুলসী, 'মানুষের মতন হবার যদি কোন বাসনা থাকে তোদের। যা শিখেছিস তাই।'

তুলসী নিজের হাতে ঝুলানো ব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বাব করে তা থেকে তিনটে সিগারেট বার করে তিন জনের দিকে এগিয়ে ধরে বলে, 'নে খা! ভাল জিনিস কাকে বলে দেখ্।'

সাগ্রহে লুফে নিয়েও ওরা ঠোকা দেওয়া গলায় বলে উঠল, 'তুই এখন পয়সাওলা মানুষ। ভাল জিনিস কাকে বলে দেখাবি বৈকি।'

তুলসী ততক্ষণে নিজে একটা ধরিয়ে টান দিয়ে প্যাকেটটা ননীর দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'ননীদা চলবে?'

ননী নেয় না, গম্ভীর গলায় বলে, 'ভাল জিনিস গরীবের পেটে সয় না। যাব খাবার সে খাক। মেয়েছেলেব ধোঁয়া খাওয়া আমার দু চক্ষের বিষ।'

তুলসী স্বচ্ছন্দে সেই বিষাক্ত দৃশ্যটা ননীর সামনে দৃশ্যমান করে আরামের ধোঁয়া ছড়িয়ে বলে, 'তুমি তাহলে এখনো আমায় মেয়েছেলে বলে মনে রেখেছ ননীদা? আমি নিজে ভুলে গেছি।'

'সেটা খুব বাহাদুরী নয়।'

বলে ননী নিজে একটা বিড়ি ধরায় তাক থেকে পেড়ে এনে!

'বিড়ির গন্ধে আমার মাথা ধরে।' তুলসী বলে।

সুখেন বলে, 'এখন তা ধরবে বৈকি। এখন যে দামী মাথা। একদা আধখানা পোডা বিডির জন্য ঘুর ঘুর করেছিস। সে সব দিন তোর মনে না থাকলেও আমরা ভুলিনি রে তুলসী।'

কথাটা মিথ্যা নয়।

তুলসীর বাল্য-কৈশোরের প্রধান সঙ্গীই ছিল এই ছেলে তিনটে। আরও একজন ছিল—ফণী। একদিন তুলসী ফণীর হাত কামড়ে রক্ত বার করে দিয়ে ফণীর সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল।

সুখেন রাজেন জগাই ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, 'বল তো কী করতে এসেছিল, শালাকে খতম করে দিই।'

তুলসী গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমার ব্যাপার নিয়ে কারুর মাথা ঘামাতে হবে না। যা করতে এসেছিল তা তোরাও যে-কোন টাইমে করে বসতে পারিস। তোদের জাতকে বিশ্বাস আছে?'

নিতান্ত কৈশোরকালের দুর্মতিতে ওই মুখ্যু লক্ষ্মীছাড়া, বলতে গেলে 'রাস্তার ছেলে' তিনটে মাথার ওপর দায়হীন পাড়াবেড়ানী মেয়েটার সঙ্গে একটু অধিক ঘনিষ্ঠতার আশায় যে ঘুর ঘুর করেনি তা নয়, তবে সুবিধে হয় নি। তুলসীকে ভয়ও করে এসেছে বরাবর।

তুলসীকে ধোঁয়ার নেশা ধরিয়েছে ওরাই। সুখেনটাই বেশী সাহসী ছিল, সে-ই ওকে ডেকে ডেকে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'খেয়ে দ্যাখ না, দেখবি কী মজা!'

কিন্তু তার বদলে সুখেন যদি নিজে কিছু মজার প্রত্যাশা করেছে, ঠাস করে তার গালে এক চড় বসিয়ে পোড়া বিড়িটা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে এসেছে তুলসী।

অতঃপর আবার সুখেনের খোসামোদের পালা, মা-কালীর দিব্যি গালা।

তুলসী চড়া গলায় বলেছে, 'মনে থাকে যেন। যতক্ষণ বন্ধু আছিস ঠিক আছি, 'শত্রু' হতে আসিস তো খুন করে ফেলব।'

ননী অবিশ্যি ওভাবে ওদের দলে ঘুরে বেড়ায়নি কখনো, বয়েসে ক'বছরেব বড় বলেও বটে, আর সংসারের ধান্দাতেও বটে। দোকান দিয়েছে তো আজ নয়, কোন ছোটবেলাতে।

তখন তুলসী তার দোকানে কাজ করে দিয়েছে ঢের।

ঘর-জ্বালানী পর-ভোলানী তুলসী সেই বোতাম-খোলা পিঠ-হাঁ হাঁ-করা ফ্রক পরেই এসে এসে উদয় হয়েছে। উনানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, চায়ের গেলাস ধুয়ে দিয়েছে।

ফণীও তার সঙ্গে সঙ্গে লেগে কাজ করেছে তখন। ...ক্রমে ক্রমে কখন বড় হয়ে শাড়ি ধরেছে, কেউ লক্ষ্য করেনি তুলসী বড় হয়েছে।

একদিন ননীই বারণ করল।

বলল, 'কাল থেকে তুই আর আসিস না তুলসী!'

তুলসী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে, সংক্ষেপে বলল, 'আচ্ছা।'

'রাগ দুঃখু করিস না।'

এটা যদি না বলত ননী, তুলসী হয়তো নিঃশব্দেই বিদায় নিত, কিন্তু এই পিঠে-হাত-বুলানো কথায় ক্ষেপে গেল। তবে চেঁচাল না কড়া গলায় বলল, 'সে ভয় করতে হবে না ননীদা, চাকরী থেকে বরখাস্ত হওয়া আমার এই নতুন নয়।'

'চাকরী! আমার এখানে তুই চাকরী করতিস? আমি তোকে কোন দিন মাইনে দিয়েছি?'

'বিনি মাইনেতেই তো দূর হ বের হ, মাইনে দিলে আরও কী করতে কে জানে।'

'তোর ভালর জন্যেই বলেছি—'

'তা জানি।'

বলে তুলসী চলে গেছে।

তারপর আবার ননী নিজে গিয়ে যেচে ডেকে এনেছে ওর বিয়ের সময়।

'দিদি একা, বিয়ের কাজ কে তোলে?'

ননী বলেছিল, 'তুই আমার ছোট বোনের মতন, দিদিতে তোতে কাজ ঠেলতে হবে।'

অনুরোধ রেখেছিল তুলসী।

গতরও তো অসীম।

সেই সময় বোধহয় ওই ফণী-ঘটিত ঘটনাটা ঘটেছিল। কিছুদিন পরে ফণী পালাল।

তারপর তো গঙ্গায় কত জল গড়াল।

তুলসী লোকের বাড়ির ছেলে-ধরুনীর চাকরী ছেড়ে হাসপাতালে আয়ার কাজে ট্রেনিং নিতে গেল। তাতে পাশ করে চাকরী ধরল, নিজে আলাদা বাসা করল, দামীলোক হয়ে গেল তুলসী।

এদিকে ননীর ভাই পালালো, বৌ মলো, এবং দোকানের জন্যে কোন মাথা না খাটিয়েও আয় বাড়তে লাগল।

বাড়বেই!

যে যেখানে যে ব্যবসাই খুলে বসুক, তার আয়বৃদ্ধি হবেই। কারণটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি। প্রত্যেকটি জায়গাতেই চাহিদার ভীড়, এই ভীড়ের চাপেই ফাটা-চটা কাঁচের গ্লাসের চা আর তার লেড়ো বিস্কুটের অনুপানও পড়তে পায় না!

শুধু আয়-বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই চাকুরে লোকদের। তাদের মাসে বছরে হিসেব করে অঙ্ক কষে মাইনে বাড়ে। সুখেন রাজেন জগাই তিনজনেই এই রেল ইষ্টিশানের ধারে কাছে এটা ওটা একটা কাজ যোগাড় করে নিয়েছে, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে যৎসামান্য মজুরী।

যার মার্জিত নাম মাইনে।

ওদের পক্ষে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখাও পাগলামি। অথচ একদা ওরা প্রত্যেকেই সে স্বপ্ন দেখেছে। আর হাসির কথা এই, লজ্জার কথাও, প্রত্যেকেই সে স্বপ্ন দেখেছে একটি মূর্তিকে কেন্দ্র করে।

যে মূর্তিটা এক অদ্ভুত রহস্যময়ীর।

যার চোখে প্রশ্রয়, বাহুতে প্রতিরোধ, ভঙ্গীতে আমন্ত্রণ, কণ্ঠে বিষবাণ।

হয়তো এমন রহস্যময়ী বলেই এমন আকর্ষণীয়া। আর প্রত্যেকেরই কেমন মনের মধ্যে একটা আশ্বাস ছিল, তার কাছে বুঝি দুর্লভ নয়।

তাই তাকে ঘিরে ঘিরে স্বপ্নের জাল রচনা।

এটা একদার।

এখন আর সে স্বপ্নের মোহ নেই।

এখন ওরা জেনে গেছে মূর্তিটা তাদের নাগালের বাইরের বস্তু।

'তখন যদি এই সামান্য চাকরীটুকুও জুটত,—আলাদা আলাদা করে ভেবেছে সুখেন, রাজেন, জগাই, হয়তো ও হাতছাড়া হয়ে যেত না। এখন সে দূর আকাশের তারা।

তবে আর কী করা?

যে যেমন পারে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করা, এই তো? তা এমনি কপাল ওদের, যেমন-তেমনও পাচ্ছে না। রাস্তায় রাস্তায় আড্ডা দিয়ে বেড়ানো এই বখাটে ছেলে ক'টাকে যে সবাই চেনে এখানকাব। দেখে জামাই করবার ইচ্ছে কারো জাগে নি।

ওদের মতই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে দু'একটা হ্যাংলার মত ওদের পিছু নিয়েছিল, পাত্তা না পেযে খসে পড়েছে। পুরুষ নিজে হ্যাংলামী করতে পারে, কিন্তু হ্যাংলা মেয়ে তাদের অসহ্য।

অথচ বিয়ের বাসনাটা একেবারে বিসর্জনও দেয়নি কেউ, মনের মধ্যে আশা, ভবিষ্যতে কিছু একটা হবে। যেন সেই অদৃশ্য ভবিষ্যৎ তাদের জন্যে কী একটা উপহার হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ দিয়ে দেবে একদিন। আবাল্য একসঙ্গে একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই ছেলে তিনটের মানসিকতাও যেন একই। ননী ওদের সঙ্গে তাস খেলে, ননী ওদের হিতৈষী বন্ধু, কিন্তু মনের সঙ্গী নয়।

ননীর কাছে কোনদিন বলে বসতে পারবে না সুখেন, 'শালার বিয়ে ফিয়ে একটা না হলে আব চলছে না। কোন দিন হয়তো স্বভাব খারাপ কবে বসব।'

না, ননীর কাছে বলতে পারে না, অথচ জগাইয়ের কাছে অনায়াসে বলতে পারে, বলতে পাবে রাজেনের কাছে।

সুখেনেরই চাঞ্চল্যটা বেশী, কাজেই ইচ্ছেটাও বেশী। কিন্তু হলে কি হবে? ইচ্ছের গাছে ফুল ফুটছে না। তাই ওদের আর 'জীবন' বলে কিছু নেই, আছে 'দিনরাত্রি।'

অতএব ওদের সেই দিনরাত্রিটাই কাটছে। জীবন অদৃশ্য। সেটাও যে কেটে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না।

তবু রাজেন আর জগাই সুখেনের মত নয়। ওদের বোধহয় চাঞ্চল্যটা কম। ওরা শুধু আশা করে মাইনেটা আর একটু বাড়লে তবে কিছু একটা করবে। বিয়ে, অথবা 'স্বভাব খারাপ'।

সুখেনের তবু একটা পিসি আছে ভাত রেঁধে দিতে, একটা বাপ আছে, 'কিরে তোর আজ এতো দেরী হলো যে?' বলে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়াতে। ওদের তো বলতে গেলে কেউই নেই।

রাজেন ছেলেবেলায় তার জ্যাঠতুতো বোন-ভগ্নিপতির বাড়িতে থাকত। সম্পর্কটা শুনলেই বোঝা শক্ত নয়, স্রেফ 'গলায় পড়া'র পোস্টেই থাকত। কোন একদিন কোন বচসা অথবা অবজ্ঞার নির্লজ্জ প্রকাশে সে আশ্রয় থেকে খসে পড়েছে রাজেন। আর জগাই? এই কিছুকাল আগেও তার একটা দূর-সম্পর্কের বুড়ো মামা ছিল, রেল কোম্পানীর কোন চাকুরে রিটায়ার করে এখানেই থেকে গিয়েছিল। জগাই তার পোষ্য ছিল। প্রথম জীবনে সে জগাইকে রেঁধে খাওয়াত, শেষজীবনে জগাই তাকে। তারপর তো মরেই গেল বুড়ো। তার দরুন ঘরটাতেই রয়ে গেছে জগাই, তারই অকিঞ্চিৎকর জিনিসপত্রকে পবম পদার্থ ভেবে।

জগাইয়ের এই বাসাটাতেই রাজেন শোয়, আর যেখানে যেমন পারে খেয়ে নেয়। সস্তার হোটেলও যে একেবারে নেই তা নয়।

তবু আশ্চর্য, এই করণপুর রেলস্টেশনের ধারে-কাছেই রয়ে গেছে এরা। ভাগ্য-অন্বেষণে এদিকে সেদিকে চলে যায়নি। অথচ সেই যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এ রকম বন্ধনহীনেরাই তো ভবঘুরে হয়ে যায়, বৈবাগী হয়ে যায়, বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়ায়।

কিসের বন্ধনে যে এই খুঁটিটাতে বাঁধা পড়ে আছে তিনটে ছেলে, বলা বড় শক্ত। ননীর তবু এখানে আটকে থাকার পিছনে একটা যুক্তি আছে, তার দোকান! তার সংসার! বিধবা দিদি, মা-মরা ছেলেমেয়ে, এটা সোজা বন্ধন নয়।

এরা বেকুব। এরা বোধহীন।

বাইরে ছিটকে বেরিয়ে পড়লে এই বৃহৎ বিশ্বে তারা হয়তো ছড়িয়ে পড়ে নিজেরাও বৃহৎ হতে পারত, কিন্তু সে বুদ্ধি মাথায় আসেনি ওদের। ওরা জানে এই করণপুর রেলস্টেশনের আশপাশটাই পৃথিবী, আর এই ননীর দোকানের তাসের আড্ডাটাই তাদের সুখকেন্দ্র।

ওর বেশী সুখের প্রত্যাশা ওদের কাছে ধূসর হয়ে গেছে।

শুধু যেদিন ওই মগডালের ফুলটা হঠাৎ এই ভাঙা চৌকির ওপরে পাতা ছেঁড়া মাদুরটার ওপর আপনা থেকেই এসে টুপ করে পড়ে, সেদিন যেন সেই ধূসরতার ওপর একটা আলো-আলো আভা ঝলসে ওঠে।

অথচ চলে গেলে কেউ ছেড়ে কথা কয় না, সবাই সমালোচনায় তৎপর হয়ে ওঠে। সেটা কী আশাভঙ্গে? না, হীনমন্যতায়?

আচ্ছা ওকে নিজেদের থেকে অত উঁচুই বা মনে হয় কেন এদের? পরিচয়ের মধ্যে তো রেল হাসপাতালের আয়া। প্রয়োজনের সময় হাতে-পায়ে ধরে ডাকলেও ভদ্রলোকেরা তো ওকে নীচু ভেবে ঘেন্না করে। ও বাড়িতে এলে যদি এক পেয়ালা চা দেয় তো দেখে-শুনে ফাটা গেলাসে, যেটা ফেলে দিলে চলবে। তুলসী যদি মাদুরে-বসে তো, তুলসী চলে গেলে গিন্নীরা সেটা কেচে ফেলেন।

তবু রাজেন, সুখেন আর জগাই তুলসীর থেকে নিজেদের নীচু ভেবে জ্বালা পায়। সেই জ্বালাতেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে ঠোকা দিয়ে বলে, 'তুই ভুলে যেতে পারিস সে-সব কথা, আমবা ভুলিনি।'

আর 'তুই' বলে কথা বলতে সমীহ আসে বলেই, জোর করে বলে সেটা। তুলসী ধোঁয়া ওড়াতে

ওড়াতেই বলে, 'তা' ভুলবি কী করে! গোয়ালের গরুর মতন এক খোঁটাতেই বাঁধা রইলি চিরজীবন!'

সুখেন বলে, 'তুই বা কোন আকাশে উড়লি?'

'মেয়েমানুষের কথা বাদ দে। ডানা-ভাঙা পাখি। তোদের চেষ্টা থাকলে মানুষ গৎরে যেতে পারতিস।'

'এখনো কিছু খারাপ নেই'—বলল রাজেন।

'পাঁকের ব্যাঙও ভাবে এমন কিছু খারাপ নেই, বেশ আছি। যাক গে, সুখেন তোর বিয়ে না?'

সুখেন গম্ভীরভাবে বলে, 'হুঁ।'

'কবে?'

'যবে হবে তুই অন্তত একপাত নেমন্তন্ন পাবি। কিছু না হোক পাইস হোটেলেও নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেব।'

তুলসী দুহাত উল্টে বলে, 'কি জানি বাবা! তোর পিসি তো বলছিল—'

'পিসি অমন অনেক দিবাস্বপ্ন দেখে।'

ননী বলে, 'এই, এ দানটা খেলা হবে, না তাস ভেস্তে গেছে?'

'না না, ভেস্তাবে কেন?

তাস কুড়িয়ে নেয় সুখেন, রাজেন আর জগাই।

আর ওর মধ্যেই তুলসী ফস্ করে ননীব কোলের সামনের তাসের গোছাটা টেনে তুলে নিয়ে অম্লান বদনে বলে, 'আমি দু দান খেলে দিচ্ছি ননীদা, তুমি খেয়ে এসো।'

'তুই তো এই নাবালকের খেলা খেলিস না।'

'খেলি একটু। বালকের দলে যখন এসেই পড়েছি। যাও খাওগে। দিদি ফায়ার, হচ্ছে তো বসে বসে।'

'ফায়ার হতে এখনও ঢের দেরী। এই তো সবে কলির সন্ধ্যে।'

'তবে তোমার তাস ধরো।'

'না না, তুই খেল না, আমি একটু দেখি।'

খানিকক্ষণ খেলা চলে, মাঝে মাঝেই উৎসাহবাণী শোনা যায়, এবং বাকি তিন জনের মুখ দেখে মনে হয় এর আগে ওরা শুকনো খড় চিবোচ্ছিল, এতোক্ষণে জিভে রস এলো।

'তা হলে তোরা বে-থা কেউ করছিস না?'

পিঠ কুড়োতে কুড়োতে বলে ওঠে তুলসী।

'কাকে বলছিস?'

'সবাইকেই।'

সুখেন সব সময় প্রধান বক্তা, সুখেন বলে ওঠে, 'আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। হুঁ। বিয়ে! তা হঠাৎ আমাদের ভাবনায় মাথা ঘামাচ্ছিস যে?'

'পুরনো কালের বন্ধু, তাই আর কি। নে খেল। আগে কে ডেকেছে?'

বিয়ে শব্দটাই মুখরোচক।

কথাটা প্রত্যেকের মনেই একটু না একটু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

তাই খানিকটা খেলতে খেলতে রাজেন হাসির মত স্বরে যেন আপনমনে বলছে এই ভাবে বলে ওঠে, 'তুলসী কি আজ কাল আয়াগিরির সঙ্গে সঙ্গে ঘটকালিগিরিও ধরেছিস?'

'ধরলে খারাপ কী?'

'না খারাপ কিছু না। তা সন্ধানে পাত্রী আছে নাকি?'

'আছে।'

'কোথায়? কোথায়?'

'বলে লাভ? তোরা তো আর বে করছিস না!'

'করতে কী আর অসাধ রে তুলসী!' বোকা জগাই চট করে বলে বসে, 'একটা বৌ বিহনে তো

জগৎ শূন্য। কিন্তু আমাদের মতন হতভাগাকে মেয়ে দিচ্ছে কে?'

'তা' ইহ পৃথিবীতে যেমন রাজার জন্যে রাণী আছে, তেমনি কানার জন্যে কানী আছে। তোদের উপযুক্ত পাত্রীই হত।...এই দেখো, কথায় কথায় ভুল চাল দিয়ে বসলাম। ...কই ননীদা, খেতে গেলে না?'

ননী গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি থাকায় তোর কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

'আমার? আমার আবার কী অসুবিধে হবে! এইটুকুর মধ্যেই পদ্মদি বার তিনেক দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে গেছে।'

'তার কারণ অন্য।'

'তাই বুঝি? পদ্মদির এখনো বেশ এনার্জি আছে বলতে হবে।'

বেশ জোর জোর গলাতেই বলে তুলসী।

বাইরের জগতে কাজ করে করে তুলসী অনেক কথা শিখেছে।

নিজের ব্যাপারেও প্রয়োগ করতে ছাড়ে না সে-সব। এখন আর খেটেখুটে এসে বলে না 'দুব্বল লাগছে,' বলে 'ভারী, টায়ার্ড্ লাগছে।' 'এতে আমার ঝোঁক নেই' না বলে, 'ওতে আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই।' 'সারারাত্তির' না বলে তুলসী বলে 'হোল নাইট।' সারাদিনকে 'হোল্ ডে।' হয়তো ওই ডে নাইট ডিউটি দিতে দিতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

'তুলসী, তোর রাত হয়ে যাচ্ছে না?'

ননী বলে।

ননীর দিদি যে এই মেয়েটাকে দু'চক্ষের বিষ দেখে, এবং এরকম রাত-দুপুরে হঠাৎ হঠাৎ এসে ক'টা দস্যি ছোঁড়ার তাসের আড্ডায় বসে পড়ে তাস খেলে আর সিগারেট খায়, এতে দিদি রাগের চোটে জলে পড়ে কী আগুনে পড়ে, এটা ননীর জানা। তাই হয়ত ননী বাঁধ দিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ওটুকু তো সমুদ্রে বালির বাঁধ।

ননীর এই ভয়ে তুলসী বরং যেন মজা পায়। তুলসী বেশ জোরালো গলায় বলে, 'হুঁঃ। ভুতের আবার জন্মদিন! তুলসীর আবার রাত!..এই করণপুরের যত ভূত টুত রাক্ষস খোক্কস, সবাই আমার চেনা ননীদা। রাত্তিরে ফিরতে হলে বাড়ি ফেরার সময় ওদের সঙ্গেই গল্প করতে করতে যাই।'

সুখেন ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'তোর যাবার পথে ওরা ওৎ পেতে বসে থাকে বুঝি?'

'তা তো থাকতেই পারে। হাঁউ মাঁউ খাঁউ মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ।'

'আজ তোর নাইট ডিউটি নেই?'

'আছে। রাত বারোটার পর থেকে। অপারেশন হবে--'

'তা' তুই তো আর নার্স নয়?

তুলসী মুখে-চোখে একটি অহঙ্কারের বিদ্যুৎ ঝলসে বলে, 'ডাক্তারবাবুরা পাশকরা নার্সদের থেকে আমার ওপর বেশী বিশ্বাস রাখে।'

'তা' রাখবে বৈ কি!'

রাজেনও বিদ্রূপে গলা শানাতে ছাড়ে না, 'ইয়াং ডাক্তাররা বোধহয়?'

'ইয়াং! তুই আর হাসাসনে রাজেন—'

হাসাতে বারণ করেও লহরে লহরে হেসে ওঠে তুলসী, 'যত পাপে পাপী বুঝি 'ইয়াংরা'? বরং ওরাই সভ্য। আসল পাজী হচ্ছে বুড়ো বজ্জাতরা।'

'হু! সেটা তা হলে জানা হয়ে গেছে?' সুখেন হাতের তাস অসময়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, 'নাইট ডিউটি তাহলে শুধু রুগীর ঘরেই দিতে হয় না।'

'ছোটলোকের মতন কথা বলিসনে সুখেন। এক এক সময় তোর কথা শুনলে ইচ্ছে হয় খুন করে ফাঁসি যাই। হাতের তাস ফেললি যে?'

'আর ভাল লাগছে না—'

'লাগবে, আর একটু ধোঁয়া খা। এই সেরেছে, সিগ্রেট তো ফর্সা!...দে তোদের ওই বিড়ির একটা দে?'

ননী নড়ে চড়ে বসে বলে, 'তোর তো বিড়ির গন্ধে মাথা ধরে।'

'ধরে তো। তবে সুখেন পাজীটার কথা শুনে আগেই ধরে উঠেছে চড়াৎ করে। এখন বিষে বিষক্ষয় হোক।'

চার চারটে পুরুষের সঙ্গে বসে বসে অবলীলায় বিড়ি টানতে থাকে তুলসী! ওর ভাব দেখে মনে হয়, ও-ও বুঝি সুখেন-রাজেনদেরই একজন।

'খেলাটা তা'হলে আর হচ্ছে না?' ননী ছড়ানো তাসগুলো কুড়োতে কুড়োতে বলে, 'তখনই জানি।'

'কখন?'

'যখন শনির উদয় হয়েছে।'

'শনির উদয় তো আর তোমাদের জীবনে আজ হয়নি ননীদা! চিরকালই আছে।'

'তা, তুই এসে বসলেই জমাটি খেলাটা নষ্ট হয়ে যায় কিনা?'

'সেটা আমার দোষ নয়। আমার যেদিন ছুটিছাটা থাকে, পুরনো বন্ধুদের জন্যে মনটা একটু টানে। তাই চলে আসি। এদিকে তোমরা মনে গেঁথেই রেখেছ তুলসী একটা মেয়েমানুষ।'

'যা সত্যি, তা আর গেঁথে রাখার কী আছে রে তুলসী? ভগবানের নিয়ম উল্টে দিবি?'

'ভগবানের নিয়ম?'

তুলসী উদাস গলায় বলে, 'তা হবে। ভগবান লোকটা যে কেমন, কী তার নিয়ম, জীবনে তো দেখতে পাইনি। চিরজীবন শুধু ভূত-প্রেত দত্যি-দানোই দেখেছি।'

বলে উঠে দাঁড়ায় তুলসী।

আর ঠিক এই সময়ই পদ্মর ভারী ভারী গলার স্বর শোনা যায়, 'খাওয়া-দাওয়া কি আজ আর হবে না ননী?'

তুলসীর মুখে একটু বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়। তুলসী গলা তুলে বলে, 'এতক্ষণে কোনকালে তাসটাস উঠে যেতো পদ্মদি, এই আমিই এসে পড়ে দেরী করিয়ে দিলাম। এবার যাচ্ছি।'

পদ্ম বোধকরি মনে মনে বলে, 'যাও! আমি বাঁচি।' তবে মুখে তো অন্য কথা বলতেই হবে। তুলসীকে আর আগের মত কটুকথা বলা চলে না। তুলসীর এখন একটা পোজিশন হয়েছে। তাই সৌজন্যের গলা করে বলে ওঠে পদ্ম, 'ওমা সে কী! এক্ষুনি যাচ্ছিস বা কেন? পুরনো ইয়ারবন্ধুর সঙ্গে একটু খেলাধুলো করতে এসেছিস—'

'সেই সঙ্গে তোমার পায়ের ধুলোও একটু নিতে এসেছিলাম পদ্মদি।'

বলে তুলসী এগিয়ে যায়।

পদ্মর শুচিবাইয়ের কথা সর্বজনবিদিত, তাই তুলসীর মুখে-চোখে কৌতুকের ছটা।

'থাক্ থাক। আর আমার পায়ের ধুলো নিতে হবে না,' বলে পদ্ম টপ করে মাঝখানের দরজাটাই বন্ধ করে দেয়। যেটার আড়াল থেকে চোদ্দবার উঁকি মারছিল।

দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তুলসী হি হি করে হেসে ওঠে।

আর ওই হাসিটা শুনে মনেই হয় না তুলসী আটাশ বছরে গিয়ে পৌঁছেছে।

তুলসীর যখন আট বছর বয়েস, তখন ওই রকম হাসত তুলসী তার কাকীমার মাকে ছুঁয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে।

সে-ও এক শুচিবাই বুড়ি ছিল।

জামাই-বাড়িতে থাকতো বুড়ি, আর জামাইয়ের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতো গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে। কারণ একা তুলসীই নয়, কাকার ছেলে বৃন্দাবনও তুলসীর সঙ্গে থাকতো। ইচ্ছে করে আঁস্তাকুঁড়ে নেমে বুড়িকে ছুঁতে যাওয়া তাদের একটি প্রিয় খেলা ছিল।

যদিও কাকী তুলসীকেই বলতো, 'নাটের গুরু।' বলতো, 'বেন্দা কক্ষণো এতো পাজী হয়ে উঠতো না, যদি ওই হারামজাদী মা-বাপ খেয়ে আমার সংসারে এসে না ঢুকতো।'

কিন্তু তুলসী কী দুঃসাহসী! তুলসী তার সেই অসহায় অবস্থাতেও অনায়াসে বলে উঠতো, 'ইস! ওনার সংসার! এটা যেন আমাদের বাড়ি নয়? বাড়ি কাকার, বেন্দার, আমার, আর পুঁটুর। তুমি তো অন্যবাড়ির মেয়ে।'

কে যে চিরকাল তুলসীকে এতো দুঃসাহসের যোগান দিয়ে আসছে।

কাকীমা গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে আসতো, আর তুলসী হি হি করে হেসে হেসে বলতো, 'ও দিদিমা, দেখো তোমার মেয়ে আমায় ছুঁতে আসছে। এক্ষুনি তোমার রান্নাঘরে ঢুকবে—আমি আঁস্তাকুড় মাড়িয়েছি।

শাপ-শাপান্ত?

গালি-গালাজ?

সে সবে কিছু এসে যেত না তুলসীর। শেষ পর্যন্ত তুলসীকে ওরা চালান করে দিলো গ্রামের ঘোষালগিন্নীর মেয়ে-জামায়ের সঙ্গে। জামাই এই করণপুরের রেলবাবু ছিল।

তারপরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

চালান করে দেবার আগে একদিন তার কাকা কাকীর চোখের আড়ালে তুলসীকে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিল,—'এতে তোর ভালই হবে মা! এখানে তো অশেষ বিশেষ কষ্টের মধ্যেই আছিস! খাওয়া পরার কষ্ট—'

তুলসী কেমন একটা দুরন্ত অভিমানে নীরব হয়ে গিয়েছিল। যদিও ঘোষাল-গিন্নীর মেয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে স্বর্গের ছবি এঁকে ধরেছিল তার সামনে। এমন কি তদ্দণ্ডেই একটা সস্তা ছিটের ফ্রক কিনে এনে তুলসীর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'এইটা পরে পরশু রেলগাড়িতে চাপবি। এরকম আরো অনেক জামা দেবো।'

সেই ফ্রকটাই পিঠের বোতাম হারিয়ে শেষ অবধি তুলসীব গায়ে থেকেছে।

তুলসীর মধ্যেকার যেমন একটা বোবা অভিমান তাকে মূক করে রেখেছিল, তেমনি আবাব একটা অজানা জগৎ সম্পর্কে ধীরে ধীরে কৌতূহলীও করে তুলেছিল। রেলগাড়ি...অনেক অনেক দূরের দেশ...বেল কোয়ার্টাবের বাড়ি যার ছাত থেকে রেলগাডি যাওয়া দেখতে পাওয়া যায়, এঞ্জিনের বাঁশী শোনা যায়, সে সব কোন জগতের? আর এঞ্জিনের বাঁশী?

ওই বাঁশীর ডাকটা কোন দূর থেকে যেন কানে আসছিল। তাই তুলসী চলে এসেছিল।

না এলে কাকীর কী সাধ্য ছিল তুলসী নামের মেয়েটাকে ঘোষালগিন্নীর মেয়েব হাতে সঁপে দেবার। আট বছর বয়স হলে কি হবে, তুলসী তখন অবলীলায় সাঁতরে দীঘিব এপার ওপর হতে পারতো, অনায়াসে উঁচু গাছের মগডালে চড়ে বসতে পারতো, দুপাঁচ মাইল হেঁটে অন্য গাঁয়ে পৌঁছে যেতে পারতো।

ইচ্ছে করে ধরা না দিলে তুলসীকে ধরে খাঁচায় পোরার সাধ্য ছিল না ওদের। তুলসী অভিমানেই হোক, আর অন্য এক জগতের পিপাসাতেই হোক, স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল।

করণপুরে আসার পর ঘোষালগিন্নীর মেয়ে যখন তার বাপের বাড়ির চিঠি এলে ডেকে ডেকে বলতো, অ তুলসী এই দ্যাখ্ কেষ্টপুরের চিঠি এসেছে—আমার ভাজ লিখেছে তোর কাকা-কাকী ভাল আছে, পুঁটু বিন্দাবন ভাল আছে, তোকে বলতে বলেছে।'

তুলসী অম্লানবদনে ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলতো, 'শুনে আমার কী সগ্‌গো লাভ হবে?'

'সর্বনেশে মেয়ে!'

বলতো ঘোষালগিন্নীর জামাই, 'জেনে-শুনে বাপের বাড়ি থেকে একটি বিচ্ছু ধরে নিয়ে এলে পুষতে?'

তুলসী আড়াল থেকে শুনে ভেংচি কাটতো।

তুলসীর এই বুকের পাটাটা কী দিয়ে তৈরী করেছিল তার সৃষ্টিকর্তা কে জানে! লোহা! পাথব? ইস্পাত?

তুলসীর ওই হাসিটা যেন বাইরের অন্ধকারটাকে খান খান করে কাটে।

ননী বলে, 'দিদিকে ক্ষেপিয়ে তোর কী সুখ হয় বলতো তুলসী?

তুলসী আরো হেসে বলে, 'কী জানি। শুধু দিদিকে কেন, যাকে পাই তাকেই। ক্ষেপানোতেই আমার সুখ।'

খেলা ভেঙে গিয়েছিল, সবাই রাস্তায় নেমে পড়েছে।

সুখেন বলে উঠল, 'অন্ধকারে অত তড়বড়িয়ে হাঁটিসনে তুলসী, একটু আস্তে পা চালা। আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি, পৌঁছে দেব বাড়ি অবধি।'

সুখেনদের বাসা তুলসীর বাড়ির রাস্তায়, আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই দিতে পারে পৌঁছে। রাজেন জগাই চলে উল্টোমুখো রাস্তায়।

'পৌঁছে দিবি?'

তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'দিলে তিনজনে মিলে দিবি—'

'তিনজনে! ওদের বাসা কোথায় আর তোর বাসা কোথায়!'

'তবে থাক। একাই যাচ্ছি, কাউকে পৌঁছতে আসতে হবে না।'

'কেন? হঠাৎ রাগের কারণটা কী?'

'রাগ? মোটেই না।'

তুলসী অনুচ্চ একটু হেসে বলে, 'অবিশ্বাস।'

'অবিশ্বাস!'

'তবে আবার কী! তোদের জাতটাই অবিশ্বাসী। পৌঁছতে এসে হয়তো হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইবি।'

'কবে এ রকমটা হয়েছে রে তুলসী?'

'হবার সুযোগ দিলেই হতো। হয়নি তাই। এই রাজেন জগাই, এদিকে আয় চটপট।'

'ওদিকে কেন?'

'আমায় পৌঁছে দিবি।'

'সুখেন যে বললে দেবে—'

'একা ওর সঙ্গে যেতে ভয় কাটছে না। দলে ভারী থাকলে সাহস আসে।'

যদিও রাত হয়েছে, যদিও এখন আর অতটা হাঁটার ইচ্ছে নেই, তবু এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করাও শক্ত।

ওরা দুজনে এমুখো ফিরে আসে।

'ঠিক আছে, তোরাই যা।'

বলে সুখেন হন হন করে এগিয়ে যায়।

রাজেন অবাক হয়ে বলে, 'এইটুকুর মধ্যে হঠাৎ কী হল রে তুলসী?'

'কিছু না, একটু ক্ষ্যাপালাম।...যারা ক্ষ্যাপালেই ক্ষ্যাপে তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে আমার।'

কিন্তু যারা নিজেরাই ক্ষেপে বসে আছে?

তাদের দেখলে? এমন রাতবিরেতে?

না, তাদের দেখলে মজা লাগে না তুলসীর। তাদের দেখলে ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

রাজেন আর জগাই তুলসীকে তার কাঠের গেট ঠেলে বাসার উঠোনে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। একখানা ঘর হলেও বাসাটি ভাল যোগাড় করেছে তুলসী। তবে কতটুকুই বা থাকতে পায় বাসায়? দিনের পর দিন, অথবা রাতের পর রাত ওই দরজাটায় তো তালাই ঝোলে। তুলসী ডিউটিতে থাকে।

তবু এটা তার নিজস্ব আস্তানা।

এখানে এসে সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পায়। এবং যত সংক্ষেপেই হোক, নিজের হাতের রান্নাটা খেয়ে নিতে পারে।

অন্য আয়ারা চায় খাওয়া সমেত কাজ। তার জন্যে মাইনেটা সামান্য কম হয় বটে কিন্তু পুষিয়ে যায় বেশী। তুলসী সেটা চায় না। ওরা বলে, 'তুলসী কম খায় কিনা, তাই পুরো মাইনেটা হাতে নেয়।'

রাজেন বলতে বলতে আসছিল, 'তোকে কি আবার এখন রাঁধতে হবে?'

'কেন? কোন যমের জন্যে?'

তুলসী হেসে রাস্তা সচকিত করেছে, 'সকালের ভাতে জল ঢেলে রেখেছি, গাছে লেবুপাতা আছে।'

'শুধু ওই দিয়ে খাবি?'

'তা নইলে কি পোলাও-কালিয়া রাঁধতে বসবো নিজের জন্যে?'

বোকা জগাই বলেছে, 'তাহলে আর এতো খেটে মরিস কেন তুলসী? খাওয়ার জন্যেই তো টাকা।'

তুলসী তখন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছে, 'না। খাবার জন্যেই টাকা নয়। মানুষের মতন করে থাকার জন্যে।'

তারপর এসে ঢুকেছে।

দরজায় একটা কুকুর শুয়েছিল তাকে হেই হেই করে তাড়িয়ে দিয়ে গেছে রাজেন। কিন্তু আরো একটা ওই জীব যে তুলসীর দাওয়ার ওপর উঠে বসেছিল, সেটা তো দেখে যায়নি তারা।

দেখতে পায়নি।

তুলসী যখন ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তা সচকিত করে আসছিল, তখন সে দাওযার খুঁটির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওরা চলে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ালো।

অন্ধকারে হলেও অবয়বটা চিনতে ভুল হয় না।

তুলসী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'একী? এর মানে?'

অন্ধকার মূর্তির কণ্ঠ থেকে একটি মৃদু সাবধানী স্বর বার হয়, 'চুপ! আস্তে! খবর নিলাম আজ তোমার নাইট ডিউটি নেই—।'

'তাই আপনি! ছি ছি! মান অপমান বলে কি কিছু নেই আপনাদের,...ঠিক আছে, ওরা এখনো বেশীদূর যায়নি, ডাকছি ওদের।'

তুলসী দাওয়া থেকে নামতে যায়। পিছন থেকে কেউ হাতটা টেনে ধবে, সেই চাপাকণ্ঠ গর্জনের মত বলে ওঠে, 'কী? তোমার ওই বডিগার্ডদের? ওই লোফার ছোটলোক পাজীগুলোকে? ওদের তোমার এত পছন্দ?'

তুলসীর হাতটা একজনের বজ্রমুষ্টীর মধ্যে। তুলসী টানাটানি করে না। আশ্চর্য শান্ত ভাবে বলে, 'সত্যিই তাই ডাক্তার বাবু! আমি নিজেও তাই কিনা! ছোটলোক পাজী। তাই ওদের কাছে নির্ভয়ে আর শান্তিতে থাকি, ভদ্দরলোক দেখলেই আমার গা গুলোয়।'

'বটে! খুব যে কথা! আমি তোর চাকরি খেয়ে দিতে পারি জানিস!'

'জানি বৈকি ডাক্তারবাবু! মাথাটাই খেয়ে দেবার ক্ষ্যামতা রাখেন, আর চাকরীটা পারবেন না? তবে তাতে আর আপনার কী গৌরব বাড়বে?'

অন্ধকার প্রেতমূর্তি হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে কথা বলে, 'তা, একটু বসতেও তো দিবি? এতোটা পথ কষ্ট করে এলাম।'

'কষ্টটা তো আপনার ইচ্ছে করে করা, কী করবো বলুন?'

গলার স্বর খাদে নামে, 'আচ্ছা তুলসী, তোরই বা এতো ডাঁট কেন? নে, ঘর খোল বসি একটু।'

'না।'

'না? অমনি না?' রাগচাপা একটা হিংস্র গলার স্বরে লোভের কাকুতি যেন এই বৈশাখ রাত্রির উদার নির্মল বাতাস, ওই তারা ঝিকমিক আকাশ, সব কিছুকে ক্লেদাক্ত করে তোলে...'তোকে তো বাবা বলেছি, তোকেই হেড় আয়া করে দেব, ওই বুড়ি হাবড়িরা সব তোর আণ্ডারে থাকবে। বুঝলি তো?'

'হুঁ বুঝলাম। শুধু তার বদলে আমাকে আপনার আণ্ডারে থাকতে হবে, কেমন? এই তো?'

চাপারাগের গলা আরো গর্জন করে ওঠে, 'তাতে তুই সগ্‌গে যাবি, বুঝলি?'

'বুঝলাম বৈকি ডাক্তারবাবু। তবে সবাইয়ের আবার সগ্‌গো সয় না।'

'তা সইবে কেন? ওই নরকের পোকাগুলোর সঙ্গে আড্ডা ইয়ার্কি সয়। রুচিকেও বাহবা দিই তোর তুলসী। ঘরের দরজাটা একটু খোল বাবা!

একটু না বসে আর থাকতে পাচ্ছি না। ঘর খোল্, আলোটা জ্বাল। মানুষের সঙ্গে কথা কইছি না পেত্নির সঙ্গে কথা কইছি বুঝতে পারি।'

তুলসী হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে। হাসে বেশ গলা ছেড়ে, 'ডাক্তারবাবু ঠিকই ধরেছেন। পেত্নীই। সরে পড়ুন, নচেৎ—'

'তা অত গলা ছেড়ে হাসছিস কেন?'...সেই চাপাগলার খোসামোদ। 'মতলবটা কী তোর? তুই কি আমায় লোকের সামনে অপদস্থ করতে চাস? প্রাণে বাপু মায়া মমতা নেই তোর! মানসম্মান খুইয়ে তোর কাছে দুদণ্ড বসতে এলাম, আর তুই—ওকী, ওখানে কী হাতড়াচ্ছিস? চাবি পড়ে গেল?'

'না, না। চাবি-তালা ঠিক আছে,' তুলসী খুব অনায়াসে বলে, 'হাতের কাছে থানইট জড়ো করা আছে আমার, কুকুর টুকুর মারতে, দেখেননি সেদিন? দেখেছেন বৈকি। সেই একখানা হাতে তুলে মজুত রাখছি পাছে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে—'

'এই কি হচ্ছে? সত্যি সত্যি আমায় থানইট ছুঁড়ে মারবি নাকি?'

ভয়ার্ত প্রৌঢ়ের শিথিল কণ্ঠের উচ্চারণ যেন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায়, 'ইট নামা বলছি।'

তুলসী স্থিরগলায় বলে, 'ভয় পাচ্ছেন কেন ডাক্তারবাবু, আপনাকে মারতে যাবো কেন? কুকুর মারবার জন্যে জড়ো করে রেখেছি। কুকুর দেখলে মারবো।'

'বটে!'

অন্ধকারে সত্যিই যেন একটা শ্বাপদের নিশ্বাস শোনা যায়। 'আচ্ছা, আমিও দেখছি। এই করণপুরে তুই কেমন করে 'করে খাস' আমি দেখবো। ছোটলোক কোথাকার!'

দাওয়া থেকে নামতে দেখা যায় ছায়ামূর্তিটাকে।

আর সেই হিংস্র শ্বাপদের নিশ্বাসটা মানুষের ভাষায় কথা বলতে বলতে চলে যায়, 'অহঙ্কার দেখাতে এসেছে! নষ্ট মেয়েমানুষ! গা দিয়ে এখনো বিড়ির গন্ধ বেরোচ্ছে!...সাধে কি আর বলে—'

কী বলে তা আর শোনা যায় না।

'এই নিয়ে চার দিন হলো।'

হাতের ইঁট খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে পড়ে তুলসী।

রাগের মাথায় তুলসীকে বাসায় পৌঁছে দেবার ভারটা রাজেন জগাইয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে হনহনিয়ে নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আরো রাগে জ্বলছে সুখেন।

এখন রাগটা কার ওপর তা জানে না।

তুলসীর ওপরই কী?

এমন হাড়-জ্বালানো কথা বলে তুলসী! কিন্তু অন্যায় বলে কী? একা তুলসীর সঙ্গে এতখানি পথ যেতে যেতে তুলসীকে একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করতো না সুখেনের? করতো, করেছিল একদিন। অনেকদিন আগের সেই কথাটা নিয়ে খোঁটা দিল তুলসী।

আচ্ছা এতো কিসের অহঙ্কার?

সুখেনের মাথায় আগুন জ্বলছে।

পশ্চাত্তাপের আগুন।

তখন সুখেন ভাবতে চেষ্টা করে, এখনো ও 'ভালো' আছে নাকি? হুঁঃ হাসপাতাল বলে জায়গা! আর যত বুড়ো ভামের আড্ডা। ওখানে থেকে তুই ধোওয়া তুলসীপাতাটি আছিস এই বিশ্বাস করবো

আমি? রাজেন জগাইয়ের সামনে আমায় ওই ভাবে অপদস্থ করলি তুই! আচ্ছা!

আজ আর বাপও জেগে নেই, পিসিও জেগে থাকতে পারেনি। সুখেন দেখলো দেয়ালের ধারে লোহার ঢাকা চাপা দেওয়া খাবার রয়েছে তার। লোহার ঢাকাটা একবার তুললো, দেখলো একটা কলাইকরা থালার পাশে খানিকটা কিসের যেন তরকারি, আর এক গোছা রুটি। আর কিছু না। এক চিলতে আচার পর্যন্ত নয়।

অপ্রবৃত্তি এলো, ঢাকাটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলো।

সামান্য একটু শব্দ।

তবু পিসির সতর্ক কান। বলে ওঠে, 'সুখেন এলি নাকি? এতো রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস?'

সুখেনের গা জ্বলে যায়।

সুখেন বলে, 'যমের বাড়ি।'

ওই কালো শুঁটকো দাঁতফোকলা আর কটুভাষিণী বুড়িটি না থাকলে যে সুখেনের কী দশা হতো, সে কথা ভাবে না সুখেন, বাড়ি ঢুকেই ওই মূর্তিটি আর তার কর্কশ কণ্ঠের সম্ভাষণ, সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়ায়।

রেলের কুলিগুলোরও ঘরে একটা বৌ আছে।

দাঁতে দাঁত পিষে এই কথাটা উচ্চারণ করে সুখেন। সুখেনের ধারণা ওই বাপটি আর পিসিটি মিলে ষড়যন্ত্র করে তার কিছু হতে দিল না। কেন, সুখেনের মত চাকরীতে যারা আছে, তারা বিয়ে টিয়ে করে ঘর-সংসার করছে না?

আচ্ছা! আমিও এবার দেখাচ্ছি, অস্ফুট ঘোষণায় বিদ্রোহী হয় সুখেন, 'স্বভাব খারাপ করে ছাড়ছি।' যেন ভয়ানক একটা বাহাদুরী করবে।

এটা অবশ্য হাসিরই কথা যে, ওই তুচ্ছ কাজটা করবার জন্যে সুখেনকে এমন তাল ঠুকে ঘোষণা করতে হয়! হাসির কথা, এ যাবৎ পেরে ওঠেনি ওটা! এই রেলস্টেশনের ধারে-কাছে কুলি মজুর বাবু ভদ্রলোক মাস্টার বেকার যেটা অবলীলায় করে ফেলে।

সুখেনের যেন কোথায় একটা অলক্ষ্য ভয়, একটা অদৃশ্য বন্ধন। স্বভাব-চরিত্র খারাপ করে বসলে কার কাছে যেন জবাবদিহি করতে হবে সুখেনকে। দোষণীয় কিছু করে বসলে সেখানে যেন মুখ দেখাতে পারবে না সুখেন।

কেন কে জানে ছোট থেকে সুখেনের কেমন যেন একটা বিশ্বাস ছিল, তুলসী সুখেনের সম্পত্তি। তুলসী ননীর দোকানে বিনি পয়সায় খেটেই আসুক, আর রেল কলোনীর কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে চাকরীই কবে বেড়াক, অথবা জগু বাজেনের সঙ্গে হি হি করে আড্ডাই দিক, আসল দাবি সুখেনের। সময়কালে সুখেন তাব সেই দাবির হাতটি প্রসারিত করে, নিয়ে নেবে ওকে। শুধু সুখেনেব বড হওয়াব ওয়াস্তা, শুধু একটা চাকবী পাওয়ার ওয়াস্তা।

কিন্তু সুখেনের পোড়া কপালে সুখেন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলসীও বড হয়ে গেল, আরো অনেক বড। তুলসী যে কেমন করে ওই ট্রেনিংটায় ভর্তি হবার চিন্তা মাথায় আনলো, কেমন করেই বা অতো তাডাতাডি ট্রেনিং সেরে চাকরী বাগিয়ে ফেলল। সুখেন দেখলো কোন ফাঁকে তুলসী তার হাতের বাইরে চলে গেছে।

কিন্তু এ অনুভূতি কি একা সুখেনেরই?

রাজেন আর জগাই?

তাদের নয়?

তাবাও তো নিয়ত সঙ্গী ছিল সুখেনের। আর সকলেরই একটা আহ্লাদের জিনিস ছিল ওই তুলসী। গেরস্তবাড়ি কাজ করেও তুলসী দিব্যি সময় বার করে ফেলে খেলতে আসতো। একটা খেলা ছিল ওদের রেলগাড়ির খালি কামরায় গদিতে উঠে বসে পা দোলানো, আপার বার্থে চড়ে পড়া, মুখে আঙুল পুরে এঞ্জিনের সিটির অনুকরণে সিটি মেরে অচল গাড়িখানাকে সচলের ভূমিকায় রূপ দেওয়া।

আর একটা খেলা, ফাঁকা গাড়ির এদিকের দরজা থেকে উঠে, ও দরজা দিয়ে নামা।

তখন নেহাৎ বাচ্চা নয় কেউই, তবু ওদের তেমন নয়—তুলসীকেই বেমানান লাগতো এই সব খেলায়। চারটেতেই প্রায় সমবয়সী, বরং হয়তো তুলসীই বয়সে কিছু ছোট, কিন্তু মেয়ের বাড় আর ছেলের বাড়? মেয়ের বাড়কে গ্রামে ঘরে কলাগাছের বাড়ের সঙ্গে তুলনা করে।

স্বাস্থ্যবতী তুলসীর সর্বাঙ্গে যেন সেই বাড়ন্ত কলাগাছের লাবণ্য। ওর ওই টান টান করে পরা খাটো ফ্রক' আঁটা স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ শরীরটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে সবাই! অবশ্য যারা ওই দৃষ্টিতেই তাকায়।

যাদের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করতো তারা, তাকাতো ঈর্ষার দৃষ্টিতে। কী খেয়ে মেয়েটার অমন স্বাস্থ্য, অমন গতর! আমাদের ঘরে তো এতো যত্নে-আদরেও ছেলেমেয়েগুলো পাঁকাটি।

খেলার সময় তুলসী প্রায় প্রায়ই পক্ষ বদলাতো। কখনো সুখেনের কখনো জগুর কখনো রাজেনের পক্ষ হয়ে অনায়াসেই বলতো, 'আয় ভাই আমরা আলাদা খেলি, ওদের সঙ্গে আড়ি।'

অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই সুখস্বপ্ন দেখার বাধা ছিল না, ছিল না অধিকার বোধের অনুভূতিতে ডুবে যাওয়ার বাধা।

অবিশ্যি তুলসী হাসপাতালে চাকরী পেয়ে চলে যাবার পর প্রত্যেকেরই মনোভঙ্গ, তবু তুলসী যে তাদের ভোলেনি এটা ঠিক। এইটা দেখে খুশী। হঠাৎ হঠাৎ তুলসীর ওদের তাসের আড্ডায় চলে আসা দেখে বোঝা যায় টানটা যায়নি তুলসীর।

আর এখনো পর্যন্ত তো বিয়ে না করেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাই তুলসীকে দেখলেই যেন সেই মুড়িয়ে যাওয়া আশাতরুতে হঠাৎ একটা নতুন পাতার শিহরণ জাগে। হয়তো বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হয়ে পড়তে পারলে এ মোহ কেটে যেত। তখন সহসা রাস্তায় দেখা হলে শুধু একটু সৌজন্যের হাসি হেসে বলতো, 'কী তুলসী, কী খবর?'

হঠাৎ একটা সম্ভাবনায় যেন গায়ে আগুনের হাওয়া বহে গেল সুখেনের। জগু আর রাজেনটা পৌঁছে দিতে গিয়ে এখনো হয়তো ওর সেই দাওয়ায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। লোক ভয় তো নেই তুলসীর।

সুখেন হতভাগা মান দেখাতে গিয়ে—

সুখেন নিজের গালে ঠাস করে একটা চড় মারলো।

পিসি কোণ থেকে বললো, 'মশা মারতে গালে চড খাচ্ছিস সুখেন? কই মশা তো নেই তেমন? হ্যাঁ, মশা ছিল তোদের চাঁপতায়। ঘরের মানুষকে বাইরে টেনে নিয়ে যেত। তা দেশভুঁই আর দেখলি কবে? সেই যে রেলের চাকরী নিয়ে চলে এলো তোর বাবা আর তো ও-মুখো হল না। তোর মা—'

অসহ্য! অসহ্য!

সুখেন হঠাৎ ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিযে রাস্তায় পডে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে।

রাজেন আর জগু ফেরার সময় বোধকরি ভয় কাটাতেই খোলা গলায় গল্প করতে করতে ফিরছিল। ভূতের ভয় নয়, চোর-টোরের ভয়।

অথচ ভাল করে ভেবে দেখলে ও ভয় পাওয়ায় হেসেই উঠতে পারতো।

কী নেবে তাদের কাছ থেকে চোর?

একটা কানাকড়িও তো সঙ্গে নেই।

পরনের প্যান্ট শার্টটা ছাড়া কিছু বলতে কিছু না।

তবু ভয়।

ভয় জিনিসটা সহজাত। ভয়ের জন্যেই ভয়।

অথচ ওই তুলসী নামের মেয়েটার প্রাণে ভয় নেই। সেই কথাটাই বলতে বলতে আসে ওরা!

'বুকের পাটাটা বটে। একা মেয়েছেলে, একটা আলাদা বাসা করে থাকে।'

'আমি একবার বলেছিলাম হাসপাতালের আর কোন মেয়েছেলের সঙ্গে ভাব করে দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারিস। তারও সুবিধে, তোরও সুবিধে—' তা উত্তর দিয়েছিল—'তার সুবিধে হতে পারে, আমার সুবিধে ঘোড়ার ডিম, একত্রে থাকলেই একত্রে খাওয়া দাওয়া। আমি যা খাই-দাই তাতে তার পোষাবে

না, তাই নিয়ে মনোমালিন্য হবে। তাছাড়া কার মনে কী আছে, কী কেলেঙ্কারি করে বসবে না বসবে, দরকার কী বাবা সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবার?'

কিন্তু তুলসীকে ওরা যত নির্ভয় ভাবে, সত্যিই কি আর এখন নির্ভয় আছে তুলসী? যুদ্ধ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না কি?

রেল কলোনির এধারে নতুন কোয়ার্টারের সারি তৈরী হচ্ছে। সেই জুতোর দোকানের র‍্যাকে সাজানো জুতোর বাক্সর মত বোদা বোদা বাড়ির সারি। এত আছে তবু কুলোচ্ছে না, কুলোচ্ছে না।

পৃথিবীর বুকে যেখানে যত কুমারী ভূমি অনাহত অক্ষত হয়ে পড়ে থেকেছে এ-যাবৎ-কাল, সর্বত্র ঘা পড়েছে কোদাল-কুড়ুলের। গভীর গহ্বর কেটে কেটে ভিত খোঁড়া হচ্ছে। প্রাসাদ উঠছে আকাশ ফুঁড়ে, ছাদে উঠে নিচে তাকালে মাথা ঘোরে এমন অট্টালিকার মধ্যেও ঢুকে পড়ছে মানুষ। আবার এই জুতোর বাক্স, দেশলাই বাক্স, তাসের ঘরেও এসে নিচ্ছে আশ্রয়।

আশ্রয়টা চাই।

আর সেটা যতই বাড়িয়ে চলা হোক কুলোচ্ছে না। মানুষ নামক কীটটা মুহূর্তে বিস্তার করে চলেছে বংশ, রক্তবীজ হার মানছে, অতএব ইঁটের পর ইঁট সাজানোর বিরাম নেই।

সকালবেলা হাসপাতালে যাবার পথে কেন কে জানে এই দিকটা দিয়ে যাবার ইচ্ছে হল তুলসীর। যেখানে এই নতুন ব্লকগুলো তৈরী হচ্ছে।

তুলসীর মনটা কেমন যেন উদাস উদাস লাগছে। আবার গুচ্ছির মানুষ এসে ঢুকবে দেশটায়, রাস্তাঘাট দোকান-পশার কিলবিলিয়ে ছেয়ে যাবে নতুন পুরোনোর ভীড়ে।

তুলসী দেশটার কত পরিবর্তন দেখলো!

কতো ফাঁকা ছিল চারিদিক, কতো গাছগাছালি।

ওই নতুনগুলো যেখানে উঠছে, সেখানে বিরাট বিরাট ক'টা গাছ ছিল। তাতে ফলও ছিল না ফুলও ছিল না—শুধু ছায়া। তবু তার আকর্ষণেই চলে আসতো ওরা।

সুখেনই আগে-ভাগে টেনে আনত ওকে। বলতো, এই তুলসী, গাছে উঠতে যাবি?

হ্যাঁ, এইটাই তাদের স্পেশাল খেলা ছিল। গাছের ডালে উঠে পা দোলানো। তুলসীর অবশ্য ইস্কুলের বালাই ছিল না, কিন্তু ওদের তা ছিল। রেল কোম্পানীর বদান্যতার ফল বিনি মাইনের ইস্কুল। কিন্তু ক'দিন বা নিয়ম করে ইস্কুলে পড়তে যেতো ওই লক্ষ্মীছাড়া ছেলে তিনটে?

কিন্তু তিনটের মধ্যে এতো মিলের কারণ কি?

কারণটা হয়তো—প্রধান একটা জায়গায় একটা বিশেষ মিল ছিল বলে। তিনটেরই মা ছিল না। আর হয়তো ওই মিলের টানেই তুলসী নামের মেয়েটাও ওদের সঙ্গে জুটতে আসতো।

তুলসী ওই ইঁটের স্তূপ আর ভারার বাঁশগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললো। কোথাও আর ফাঁকা জায়গা বলে কিছু থাকবে না।

আবার হঠাৎ মনে মনে হেসে উঠলো, থাকবে। শুধু মনের মধ্যেটায় থাকবে ফাঁকা। আর সেটা বেড়েই চলবে। বাইরে যত দম আটকে আসবে, 'ফাঁকাটা' আর কোথাও জায়গা না পেয়ে মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

আচ্ছা, আজ আমি এদিক দিয়েই বা এলাম কেন? এটা তো ঘুর পথ, এটায় তো হাঁটতে হচ্ছে বেশী।

অসমাপ্ত ব্লকের পাশ কাটিয়ে চির-পুরানো বাড়ি গুলোর ধারের রাস্তায় পড়তেই কোনো একটা খুপরির সামনের দরজা থেকে একজন ডেকে উঠলো, 'কী তুলসী? আজ এতো বেলায় যে?'

তুলসীকে অনামনস্কতা ত্যাগ করতে হলো। এগিয়ে গিয়ে হাস্যবদনে বলতে হলো, 'এই একটু দেরি হয়ে গেছে বৌদি!'

'এই শোনো, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল—'

'বলুন।'

তারপর হঠাৎ চোখে-মুখে কৌতুক ফুটিয়ে গলা নামিয়ে বলে তুলসী 'কী? আমাদের ওখানে ভর্তি হতে যাবেন নাকি?'

'মরণ তোমার!' বৌদি ঝলসে হেসে ওঠেন, 'আবার মরতে যাবো আমি?'

'মরতে কেন গো! বাঁচতে যাবেন।'

'থাম বাপু! এই শোনো, আমার ননদ এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, আজকালের মধ্যেই বোধহয় চালান দিতে হবে তাকে। তোমাকে যেন পাই সে সময়।'

'এই সেরেছে! ডেটটা কী?'

'সেই তো মুশকিল। একটু গোলমেলে আছে—'

'তা হলে?'

'ওসব জানি না বাবা! তোমাকে চাই। আমি ননদকে খুব আশ্বাস দিয়ে রেখেছি—বিশেষ করে রাত্তিরের জন্যে। সবাইয়ের নামেই তো বদনাম শুনি, ঘুমিয়ে পড়ে, পেসেন্ট ডেকে সাড়া পায় না, নয় তো ঘুম ভাঙালে খিঁচোয়—' গলা নামিয়ে বলে, 'বাঙালীও তো তেমন নেই আর?'

'আমার নামে বদনাম শোনেন না?'

'তোমার নামে? ও বাবা! তোমার নামে তো জয় জয়কার।'

'তাহলে তো তরেই গেলাম। আচ্ছা বৌদি যাই! দেখি আপনার ননদের দিনে—'

চলে যায় হনহনিয়ে।

প্রশংসায় মন প্রসন্ন হবারই কথা।

অথচ তুলসীর মনটা যেন বেজার হয়ে গেল। এই একটি মাত্র পরিচয় তুলসীর এই করণপুরে। ভাল আয়া!

প্রসূতিকে যত্ন করে, রাতে ঘুমিয়ে পড়ে না, মেজাজ ভাল, কথার গুণে চাঙ্গা করে তোলে পেসেন্টকে।

না, আর কোনো পরিচয় নেই তুলসীর।

হাসপাতালে মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। ঘাড়ে গর্দানে ডাক্তার ঘোষ। ঘাড়টা আরো গুঁজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে প্যাসেজ পার হয়ে চলে যান। মাথার মাঝখানটা টাক, ঘাড়ে গুচ্ছির চুল। তাতে কাঁচাব থেকে পাকার ভাগই বেশী।

গম গম করে হাসপাতাল কাঁপিয়ে রোগী দেখে বেড়ান উনি, সবাই যমের মত ভয় করে। বলে 'বাঘ ডাক্তার।'

তুলসী ওঁর ওই তাড়াতাড়ি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চলে যাওয়া দেখে মনে মনে হাসে। যমেরও যম আছে।

আশ্চর্য! মানুষ কী আজব জীব!

আর দিনের মানুষটার সঙ্গে রাতের মানুষটার কত তফাত!

* * *

বাজেন আর জগু গুম্ হয়ে বসেছিল।

সামনে সুখেন।

তলে তলে এই চালাচ্ছে তুলসী!

এটা যেন ওদের আশঙ্কার জগতে ছিল না। তুলসী বাচাল, তুলসী বেহায়া, তুলসী আড্ডা দেবার সময় মেয়ে-পুরুষে ভেদ করে না, তুলসী সাজে, তুলসী বিড়ি-সিগারেট খায়, তবু কোনখানে যেন অপরিসীম একটি বিশ্বাস ছিল তুলসীর উপর এই ছেলে তিনটের। সেই বিশ্বাসটির উপরই ওদের ভালবাসা ন্যস্ত ছিল।

কিন্তু সুখেন কাল রাত্রে যা দেখে এসেছে তার ওপর তো আর কথা চলে না। যাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, তাই শুনিয়েছে সুখেন ওদের।

খোলাখুলিই স্বীকার করে যে ঈর্ষার জ্বালাতেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। স্থিরনিশ্চয় করেছিল গিয়ে দেখবে রাজেন জগাই তখনো তুলসীর ওখানে আড্ডা মারছে, কিন্তু দূর থেকে দেখলো দাওয়া অন্ধকার।

পাপমনের চিন্তাও ব্যক্ত করেছে সুখেন তার আশৈশবের বন্ধুদের কাছে। জ্বালায় ছটফটিয়ে ভেবেছিল, ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকেনি তো ও দুটো?

আচ্ছা দেখে নেবে সুখেন। বন্ধুদের এই বেইমানীর শোধ নেবে।

কিন্তু আর একটু এগোতেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝিম মেরে গিয়েছিল সুখেনের।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে যে লোকটা তুলসীর বেড়ার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিশে গেল, সে রাজেনও নয়, জগুও নয়।

সুখেন তাকে চেনে।

সুখেন দেখলো অন্ধকারে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুলসী।

তার মানে দাঁড়িয়ে থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

ওরা গর্জন করে বলে উঠেছিল, 'তুই কিছু বললি না? হাতে হাতে ধরে ফেললি যখন?'

যেন সুখেন তুলসীর গার্জেন। সুখেন কিন্তু সে কথা বলেনি।

সুখেন তখন একটু থেমেছিল।

সুখেন একটা গোপন কথা তার আশৈশবের বন্ধুদেরও বলতে পারেনি। বলতে পারেনি তুলসীকে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেন কে জানে সুখেনের দু'চোখে হুশ করে জল এসে গিয়েছিল। সুখেন হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সটান উল্টোমুখ ধরে ফিরে এসেছিল।

সুখেন ওই গোপন কথাটা চাপা দিয়ে বলেছিল, 'পিরবিত্তি হল না। তব্দণ্ডেই ওকে ডেকে কথা কইতে পিরবিত্তি হল না।'

তারপর বসে আছে গুম্ হয়ে তিনজনে।

যেন যে ব্যাঙ্কটায় ওদের তিনজনেরই টাকা জমা ছিল, সেই ব্যাঙ্কটা ফেল্ হয়ে যাবার খবর এসেছে ওদের কাছে।

লেভেল ক্রশিংয়েব ওধারে যে একটা ইঁটের ঢিবি মতন আদি অন্তকাল পড়ে আছে, তাব উপব বসে ছিল ওরা। যেন কথাবার্তা, সব ফুরিয়ে গেছে।

তাই নিঃশব্দে শুধু একটাব পর একটা বিড়ি টেনে চলেছিল।

কিন্তু কে জানতো এমন অসময়ে এবং অনুপযুক্ত জায়গায় হঠাৎ স্বয়ং অভিযুক্ত আসামীই এসে হাজিব হবে।

পরস্পরে তাকাতাকি করলো।

দিব্যি তো মটমট করে আসা হচ্ছে।

লজ্জার বালাই মাত্র নেই।

থাকবে কেন? বড় গাছে নৌকো বেঁধেছেন যে!

এই নতুন বেঁধেছে, কি কতকাল বেঁধেছে, কে জানে। কিন্তু এদিকেই বা আসছে কেন?

'কেউ কথা কসনে।'

বলে ওরা ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

'তোরা এখানে? আর আমি তোদের খুঁজে খুঁজে—'

তুলসী ওদের ঠেলে দিয়ে একপাশে বসে পড়ে বলে, 'রাজরাস্তা থেকে কোণে এসে বসে তিন শেয়ালে কী যুক্তি হচ্ছে?'

ওরা কেউ কোনো কথা বললো না। যা করছিল তাই করতে লাগলো। ব্যাপারটা অভিনব।

সুখেনের না হয় অভিমানের কারণ আছে, কাল রাত্রেই সেটা দেখিয়ে চলে গিয়েছিল গটগটিয়ে। আর দুটোর হঠাৎ কী হল? রাত দুপুর পর্যন্ত তো দেখা হয়েছে। গাল-গল্প করতে করতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। সুখেনের অপমানে ওদের অপমান, এমন চিহ্ন তো প্রকাশ পায়নি।

তুলসী দু হাতের তালু উল্টে বলে, যা বাব্বা! একটার মুখে-ও কথা নেই যে! মুখ দেখে মনে হচ্ছে বৈরাগী হয়ে যাবি। তিন জনেই এক পথের পথিক হচ্ছিস তাহলে? কাপড়চোপড গেরুয়ায় ছুপিয়ে-টুপিয়ে নিয়েছিস নাকি? হরে-কেষ্ট কাপড়ই বা কোথা? সবই তো পেন্টুল। নাঃ। গোড়াতেই মৌনীবাবা! ছাড় দিকি, একটা বিড়ি ছাড়।'

আর চুপ করে থাকতে পারে না রাজেন।

বলে ওঠে, 'কেন? ওসব ছোটলোকের জিনিসে তোর দরকার? তোর তো ওর গন্ধে মাথা ধরে।'

'ধরতো! তা কী আর করা যাবে। ফুরিয়ে গেছে। নেই।'

অগত্যাই দেশলাইটা আর প্রার্থিত বস্তুটা এগিয়ে দিয়ে রাজেন বাঁকা গলায় বলে, 'রাজরাণীর আবার অন্নের অভাব? এখন তো বড় গাছে নৌকো বেঁধেছিস, অভাব কিসের? ফুরোবার আগেই যোগান হবে।'

তুলসী ভুরু কুঁচকে ওদের বিদ্বেষ-বিষাক্ত মুখ তিনটে দেখে বলে, 'কিসে নৌকো বেঁধেছি?'

'কিসে বেঁধেছিস নিজেই ভাল জানিস। মনে করেছিলি ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না। তা হয় নারে! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

তুলসী অনায়াসে ধোঁয়া উডিয়ে বলে, 'ধর্মের কল কোথায় নডে ধর্মই জানে, এখন আপাতত তোদের মাথায় কোনোখানে পোকা নডেছে। কী যে আবোল-তাবোল বকছিস। এলাম তোদের কাছে একটা বিপদে পড়ে পবামর্শ করতে—'

'বিপদ। ওঃ।' সুখেন সন্দেহ-বিকৃত মুখে ভারী গলায় বলে, 'তা বিপদটা কী শুনতে পাই না?'

'শোনাবার জন্যেই তো এসেছি, তা তোরা দেখছি কেবল ব্যাঁকা কথাই কইছিস। ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার কিছু না। গরীব হতভাগাদের কথায় কান দেওয়ার দরকার নেই।'

'এই সুখেনটা শুধু হতভাগাই নয়, ইল্লুতে ছোটলোক।'

তুলসী তীব্র গলায় বলে, 'কী একটু বলেছি, তাতেই নুনের নৌকো ডুবে গেছে। বলি জগৎ-সংসাবে যে বাঘ ভাল্লুক জন্তু-জানোয়ারই বেশী এটা তো মিথ্যে নয়? কে কখন জানোয়ার হয়ে ওঠে বলাও শক্ত। কাল রাত্তিবে তোরা দু'জনে আমায় পৌঁছে দিয়ে যেমনি পিছু ফিরেছিস, তেমনি দেখি সামনে এক কুকুর!'

'কুকুর!'

জগাই বলে, 'সে তো আমরা তাড়িয়ে দিয়ে এলাম।'

'কাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলি?'

'কেন, সেই বীরভদ্দর কেলে কুকুরটাকে।'

'ও, সেইটা? সেটা আর কী এমন? সে তো কুকুরের মতন দেখতে কুকুর—'

তুলসী হাতের বিড়িটা শেষ না হতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাপিনীর মত হিস হিস করে বলে, 'মানুষেব চামড়া ঢাকা কুকুরটাকে তো তাড়িয়ে দিয়ে আসিসনি? আঃ, আর একটু যদি এগিয়ে আসতিস! বেড়ার দোর থেকে ছেড়ে না দিয়ে দাওয়ায় তুলে দিতিস। দেখতে পেতিস মানুষের চামড়া মোড়া কুকুর আরো কত ভয়ঙ্কর!'

সুখেন ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'লোকটা কে?'

'বলে আর কী হবে—'

তুলসীর গলায় ঔদাসীন্য, 'সমাজের মাথা একজন কেষ্টবিষ্টু বেক্তি, এই আর কী?'

'নাম বল তুলসী! সেই 'মাথা'র মাথাটা দু'চির করে দিয়ে আসি।'

'তাতে কেলেঙ্কারী বাড়বে বৈ কমবে না সুখেন!'

তুলসী গভীর গলায় বলে, 'একটা ছোটলোক আয়ার ইজ্জতের থেকে ওসব মাথার দাম হাজার গুণ বেশী।'

'তার মানে লোকটাকে তুই বাঁচাতে চাস?'

'তা মিথ্যে বলবো না সুখেন, ওর মতন বিচক্ষণ ডাক্তার তো আর এ তল্লাটে নেই—'

'ডাক্তার!'

'এইরে বলে মলাম! যাক ওই পর্যন্তই। শুধু এই কথাই বলছি, ওর মাথাটা দুফাঁক হয়ে গেলে, রুগীগুলোর কপাল বেবাক ফাঁকা হয়ে যাবে।'

'এই সব পাজী লোক একটা বিদ্যে শিখেছে বলে তাদের ইহ-পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে?'

'তা এই তো এ জগতের নিয়ম রে জগাই! কত কেষ্ট-বিষ্টুর ফর্সা জামার নীচে কত কাদা। তবু তারা পৃথিবীর কাজে লাগছে বলে সমাজ-সংসারে মাথার মণি।'

রাজেন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এখন ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠে, 'আর আমরা যারা পৃথিবীর কোন কাজে লাগি না, তারা সমাজ সংসারের জুতোর সুখতলা। এই তো?'

'যা বলেছিস! কিন্তু তুই না বললেও সেই কুকুরটা যে কে আমি ধরতে পারছি, ওই বুড়ো বজ্জাতটা এর আগে অনেক কীর্তি করেছে। ওকে শেষ করলে একটা পুণ্যের কাজ হবে।'

তুলসী হতাশ গলায় বলে, 'তোদের মাথায় শুধু ওই শেষ করাই ঘুরছে। ওতে আমি ভরসা পাবো না। ছারপোকার বংশ যত মারো ততই বাড়ে। একটা কুকুর মেরে আর কতটুকু আসান হবে? আমি তোদের কাছে অন্য কথা বলতে এসেছিলাম!'

বলতে এসেছিলাম!

তাই তো। তারা তো সেটা তেমন ভাবেনি। ভেবেছে এমনি এসে বসেছে।

'কি বলতে এসেছিলি?'

তিনজনে একযোগে একই কথা বলে ওঠে।

তুলসী কাঁধের আঁচলটা টেনে বেশ চোস্ত হয়ে বসে।

কারুর মুখের দিকে না তাকিয়ে, সামনের রেলের ওই গুমটি ঘরের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে 'বলছিলাম, বেড়ালের মুখ থেকে মাছ আগলাতে আগলাতে জীবন মহানিশা হয়ে গেল! অথচ বেড়াল-কুকুর নিধন করে এ সমিস্যের সমাধান হয় না বুঝলি? একমাত্তর সমাধান, মাছটাকে যেখানে সেখানে ফেলে না রেখে শিকেয় তুলে রাখা। তাই ঠিক করেছি নিজেকে আর এমন বেওয়ারিশ ফেলে না রেখে একটা ওয়ারিশানের হাতে তুলে দেব। যুদ্ধ করে করে আক্লান্ত হয়ে গেছি।'

তুলসী আঁচল তুলে ঘাড়ের ঘাম মোছে।

সুখেন, রাজেন, জগাই পরস্পরের মুখেব দিকে তাকায়।

তুলসীর কথায় এ যে এক অদ্ভুত নতুন সুর!

এই অদ্ভুত কথাটার যথার্থ মানে কী?

তাহলে কি তুলসী তলে তলে কিছু ব্যবস্থা করে ফেলেছে?

কিন্তু তুলসী যে বড় 'আক্লান্ত'।

তুলসীর মুখটা দেখে মায়া আসছে। চিরদিনের সেই তেজে-মটমটে তুলসী যেন উদাস বিষণ্ন!

কে কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলেই বোধহয় তিনজনেই উসখুস করে, অথচ কিছুই বলতে পারে না।

তুলসী আবার বলে, 'পোড়ারমুখো ভগবান, মেয়েজাতটাকে এমন অসহায় করেও গড়েছিল! দেহখানাকে সন্দেশ মণ্ডার মতন লোভের বস্তু করে রেখে দিয়েছে। এ শাস্তিটা ভগবান দিল কেন মেয়েমানুষকে তাই বল? এ পাপ না থাকলে মেয়ে পুরুষ সমান হয়েও পৃথিবীতে চলতে পারতো। তা হবে কেন? বিধাতা পুরুষ যে নিজে পুরুষ, তাই মেয়েজাতটার সুখ-দুঃখ বোঝেনি। মরুকগে—যা করেছে

তার তো আর চারা নেই। মেয়েমানুষ জাতটাকে চিরটাকাল ফাঁসির আসামী হয়েই থাকতে হবে। যাক্ ওসব কথা—আসল কথাটাই বলি স্পষ্ট করে—ভেবে দেখলাম একটা বিয়ে করে ফেলাই হচ্ছে সমিস্যে সমাধানের উপায়।'

'বিয়ে! মানে তোর?'

জগাই বলে ফেলে বোকার মত।

'তোরও হতে পারে—'

তুলসী হেসে ওঠে, 'বিয়ে করতে হলে তোদের মধ্যেই একজনকে করা ভাল। এই বয়সে আর একটা অচেনা অজানা নতুন লোকের সঙ্গে ভাব ভালবাসা জমানো পোষাবে না। তোদের সঙ্গে চিরকালের ভালবাসা। এখন বল কে রাজী আছিস?'

কে রাজী আছে!

তিন তিনটে সা-জোয়ান ছেলে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এ আবার কেমন ধরনের প্রস্তাব।

তুলসীর যেন সবটাই অদ্ভুত!

তবু সুখেনই তাড়াতাড়ি প্রস্তাবটাকে হাতে তুলে নেয়। বলে ওঠে, 'রাজী না থাকার কথা উঠছে কোথা থেকে?'

ইস:

সুখেনটা কী চালু! ফট্‌করে উত্তরটা দিয়ে বসলো!

রাজেন আর জগাই জিভ কামড়ায়।

এ কথাটা তো আমিও বলতে পারতাম!

তবে রাজেন পিঠোপিঠিই বলে, 'সত্যি, রাজী হওয়া না হওয়ার কথাই নেই তুলসী, তুই যাকে পছন্দ কববি—'

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই তো ঠিক—'জগাইও নিজের কথাটা বলে নেয়, 'তুলসীর যখন এতোদিনে বিয়ের ইচ্ছে, মানে বিয়ের মত হয়েছে—'

তুলসী গম্ভীর মুখে বলে,—ইচ্ছেও নয়, পছন্দও নয়, মত হওয়া-হয়িও নয়, স্রেফ দায়ে পড়ে তোদের কাছে এসে পড়েছি। বলতে পারিস, তোদের শরণ নিচ্ছি। নিজের ভার আর নিজে বইতে পাবছি না। একজনের বিয়ে করা বৌ হয়ে গেলে পাঁচজনে আর মানুষটাকে পাবলিকের সম্পত্তি ভাবতে সাহস কববে না।'

তিনজনেই একসঙ্গে কিছু কথা বলে ওঠে।

ঠিক বোঝা যায় না, তাদের ব্যাকুলতা বোঝা যায়।

অকস্মাৎ এই প্রস্তাবের আঘাতে ওরা প্রায় বিমূঢ়।

আশ্চর্য! তুলসী যদি বললোই তো এই ভাবে বললো!

সুখেন মনে মনে কপালে করাঘাত করে।

তুলসী কি জানেনা সেই শৈশবকাল থেকে সুখেন তুলসী বলে মরে যায়? জানে না তুলসীকে সে কী চক্ষে দেখে? অথচ একটি বার একা সুখেনকে ডেকে বলতে পারলো না, 'সুখেন, ভাবছি এবার বিয়েটা করে ফেলি।' বাকি কথা সুখেনই বলতো।

ওর ইচ্ছেটুকু প্রকাশের পর আর কিছু করতে হত না তুলসীকে। ...সুখেনও তো ঠিক করে ফেলেছিল, এবার একটা বিয়েই করে ফেলবে। সে বিয়ের কনে যদি তুলসী হয়, তার থেকে সুখের আর কী আছে।

কিন্তু তুলসী কিনা রাজরাস্তার মাঝখানে একসঙ্গে তিন তিনটে লোককে বলে বসলো. 'আমায় কেউ বিয়ে করবি?'

ছি ছি, এতো বুদ্ধি ধয়ে তুলসী, আর এই বুদ্ধির পরিচয় দিল!

সুখেন গাঢ়স্বরে বললো, 'তুই তো জানিস তুলসী, তোকে আমি চিরকাল কী চক্ষে দেখি—'

'আহা সে তো জানিই।'

তুলসী অনায়াসেই বলে, 'তোদের তিন জনকেই জানি। আমার কোন 'সারপর' নেই। তোদের মধ্যে যার সুবিধে হবে, যার অবস্থায় কুলোবে, তার সঙ্গেই বিয়েয় বসে যেতে রাজী। কিন্তু এই দণ্ডে জবাব চাইছি না, দুটো দিন সময় দিলাম, ভেবে-চিন্তে দেখ ঘরে গিয়ে। নিজের নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর। আমার আর কী! এতো এতো দিনই যদি পারলাম আর ক'টা দিন চালিয়ে দেব। বুড়ো বদমাইসটা এখন দু'চারটে দিন বোধহয়—' তুলসী উঠে দাঁড়ায়।

হাত বাড়িয়ে বলে, 'দে আর একটা দে। চলি।...ভেবে-চিন্তে উত্তর দিবি আমায়। সুখেনের তো মস্ত একটা অসুবিধে, ওই পিসি! সে কি আর একটা সরকারী হাসপাতালের আয়াকে বৌ করে ঘরে তুলতে রাজী হবে?'

'পিসিকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

বীরবিক্রমে গর্জন-করে সুখেন, 'আমার যে মেয়েকে ইচ্ছে তাকেই বিয়ে করবো।'

'বাপও তো আছে তোর।'

'বাবার কথাও বাদ দে। সাতেও নেই পাঁচেও নেই, দুটো বাড়াভাত পেলেই হলো।'

রাজেন মনে মনে নিশপিশ করে।

সব কথাগুলো সুখেনটাই বলে নিচ্ছে।

আচ্ছা দুটো দিন তো সময় দিয়েছে, তার মধ্যে রাজেনের নিজের যা বলার বলবে।

সুখেন যতই বলুক, ওব ওই পিসি বুড়ি ফ্যাচাং তুলবেই। সে দিক থেকে আমার বাবা বেপরোয়া।

আর জগাই মনে মনে হিসেব করতে থাকে, তিনজনের মধ্যে চাকরীটা কার সবচেয়ে ভালো, মাইনেটা কার আর দুজনের থেকে বেশী...জগাই তোদেব মতন কথায় অতো চৌকস না হতে পারে, তাস খেলতে হেরে মরতে পারে, কিন্তু চাকরীটা তারই ভালো, মাইনেটা তারই বেশী।...তা ছাড়া তুলসীর নিজেব আয়ও তো কম নয়। সংসার সুখেই চলবে।

ভাবে জগাই, যা বলবার পবে বলবো।

তুলসী বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে একটা টানের পর হাতে রেখে বলে, 'তাহলে ওই কথাই রইল। ভাব বসে বসে। তিন শেযালের যুক্তিব শেযে কী হয় দেখি।' তুলসী চলে যায়।

আর ওরা তিনজন নিজেদের বিষয়ে কথাটি না কয়ে বলে ওঠে, 'আচ্ছা ওই ডাক্তাব শালা কে বল দেখি? কোন শয়তানটা?'

ননীর দোকানে লোহার শিকে হারিকেন লণ্ঠন ঝুলছিল, চৌকিতে মাদুব পাতা ছিল, এবং ননী একা বসে তাসটা ভাঁজছিল।

আশ্চর্য! পরপর দুটো দিন চলে গেছে, আজ তিনদিন, ননীর দোকান নিঃঝুম। ননীর দোকানে তাদের আড্ডা নেই। তিনটে ছেলের একটাও এই তিনদিনে এল না, এর মানে কী?

অথচ ননী দোকান থেকে নডতে পারছে না। সকালবেলা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ননী।

একফোঁটা ছেলেটাকেই ডেকে ডেকে একটু সাহায্য চেয়েছে।

এ রকম কখনো হয় না।

এদিকে দিদিও তো জবাব দিয়েছে।

তিনজনের একসঙ্গে অসুখ করবে, এটাও তো সম্ভব কথা নয়।

ননী ভাবতে থাকে সেই শেষ দিন কী ঘটেছিল। খেলার সময় তুলসী এসে পড়ে খেলাটা ভেস্তে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এরকম তো হয়ই। তুলসী মুখপুড়ী এসে উদয় হলেই খেলার জমাটিটা ভেঙে যায় এসেই হয় কারুর হাত থেকে খপ করে হাততাসটা টেনে নিয়ে 'সরে বোস, আমি একটু খেলি', বলে খেলতে বসে যায়, এক জনকে বেকার বসে থাকতে হয়, নয়তো গাল-গল্প করে বিড়ি-সিগারেট

উড়িয়ে খেলার বাঁধুনীটা নষ্ট করে দেয়।

সেদিনও তাই করেছিল, তার বেশী কিছু নয়। ননী তো কাউকেই কিছু বলেনি।

ভারি চিন্তায় পড়ে যায় ননী।

ওই বাচাল মেয়েটা যেন মায়াবিনী জাদুকরী! তিনটে ছোঁড়াই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে আছে চিরটা কাল। বিয়ে-থা ঘরকন্না পর্যন্ত করছে না। এক একটা বিয়ে করে ফেললেই বৌ ওই জাদুমন্তর ফর্সা করে দিতো। ননী এবার ওদের জোর করবে। ননীকে ওরা বড়ভাইয়ের মতই ভাবে, ননীর একটা দায়িত্ব আছে।

ননী তাস নিয়ে পেসেন্স খেলে চলে।

হঠাৎ ননীর সামনে একটা ছায়া পড়লো।

চমকে তাকালো ননী।

ছায়ামূর্তি বলে উঠলো, 'কী ননীদা, আজ এমন দুরবস্থা যে তোমার? এক্ষুনি রাজ্যপাট গুটিয়ে গেছে?'

ননী গম্ভীর ভাবে বলে, 'আয় বোস। রাজ্যপাট আজ তিনদিন বন্ধ।'

'তাই নাকি? কেন?'

'কেন সেটা তো তোকেই জিজ্ঞেস করবো ভাবছি।'

'আমি কী বলবো? কেন? ওরা আর আসছে না?'

'না?'

'তার মানে তাসের 'আড্ডা বন্ধ?'

'হুঁ।'

'না আর হুঁ! তোমার আজ কী হল?'

'কী আর হবে। ভাল লাগছে না—বসে আছি। ওদের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়েছে এর মধ্যে?'

তুলসী একটু কেঁপে ওঠে।

ডাহা মিছেকথাটা বলবে কী করে?

কী করে বলবে, রোজই দেখা হয়েছে, হচ্ছে। সকালে সন্ধ্যেয়। আমি চেয়েছিলাম ওদের মধ্যে কোনো একটাকে বিয়ে করে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসি, আর সত্যি বলতে কি, মনে ঠিকই করা ছিল। সুখেনটাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওটাই চিরকাল যেন আমার গার্জেনের পোস্ট নিয়ে আছে। যেন আমার ওপব ওর কিসের এক দাবি দাওয়া। কিন্তু এখন দেখছি তিনটেতেই আমার জন্যে—

ননী বললো, 'ভাবছিস কী? ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করলাম, শুনে যেন দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলি। অসুখ বিসুখ হয়নি তো কারুর?'

'অসুখ-বিসুখ শত্রুর হোক। ভাবছি এই তো কখন যেন দেখা হলো—'

'তুই যেন কী চাপছিস মনে হচ্ছে তুলসী!'

তুলসী চৌকীর একটা কোণে বসে পড়ে তাসগুলো টেনে নিয়ে ভাঁজতে ভাঁজতে বলে, 'তোমার চোখে কিছু এড়ানোর জো নেই। তা হলে খুলেই বলি। একটা সিগ্রেট ধরাবো ননীদা?'

ননী বেজার গলায় বলে, 'কেন, দু'দণ্ড আর ওই ধোঁয়া না গিললে চলে না? এমন ছোটলোকের মতন অভ্যেসটা কী করে করে ফেললি?'

'ছোটলোকের মত?'

তুলসী হেসে ওঠে, 'কী বল গো ননীদা? ভালো ভালো ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেরা খাচ্ছে না?' বলে, 'ওটাই হলো মডার্ন ফ্যাশান। আমাদের বড় সার্জেনের শালী এসেছিলেন, তিনি নাকি কোন মস্ত অফিসারের বৌ, হাসপাতাল দেখতে এসেছিলেন, তার মধ্যে বোধ হয় এক প্যাকেট সিগ্রেট ধ্বংসালেন।'

'বেশ করলেন। অফিসারের পরিবারের যা শোভা পায়, তা দীন-দুঃখীদের পায় না তুলসী! ওরা যেটাই করুক, সেটা হচ্ছে ফ্যাশান, আর গরীবগুরবোরা করলেই ছোটলোকমি।'

'বাবা বাবা! সামান্য নিয়েও এতো লেকচার ঝাড়তে পারো তুমি ননীদা! তাহলে আর কী হবে, বিনি মৌতাতেই বলি—নানান জ্বালায় জ্বলে ঠিক করে ফেলেছি, আর এমন বেওয়ারিশ হয়ে থাকব না। একটা ওয়ারিশান জোগাড় করে ফেলে একটু নিশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে বাঁচি।

ননী তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'অত' কায়দা করে বলার কী আছে? এতোদিনে তাহলে বিয়ের মন হয়েছে? তা নানান জ্বালাটা কী?'

তুলসী ননীর দিকে একবার চোখ তুলে তাকায়। তারপর মাথা নীচু করে ছেঁড়া মাদুরের ভাঙা কাঠি ভেঙে নিয়ে টুকরো করতে করতে বলে, 'সে আর তোমায় কী বলব ননীদা! দাদা বলি, গুরুজন বলে মনে করি। পৃথিবীতে জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব তো কম নয়।'

'হুঁ, তা বিয়েটা কি ঠিক হয়ে গেছে। পাত্তর কোথাকার? সরকারী হাসপাতালের দাইকে বিয়ে করতে রাজী তো?'

তুলসীর চোখের তারায় ফস করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে।

তুলসী আত্মস্থ গলায় ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, 'রাজী কি গো? শুনে অবধি পায়ে পডছে!'

'পায়ে পড়ছে!'

ননীও ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'এমন একটা হতভাগাকে জোটালি কোথা থেকে?'

তুলসী হেসে উঠে ছুরিকাটা গলায় বলে, 'একটা কী গো ননীদা, একসঙ্গে তিনটে জুটেছে। তিনটেই ওই শুনে অবধি আমার বাড়ির মাটি নিয়েছে। তা আমি ওদের বলছি, হ্যাঁরে আমি কী দ্রৌপদী হব?'

'হুঁ'।

ননী হঠাৎ তুলসীর হাতের কাছ থেকে তাস কটা সরিয়ে প্যাকেটে পুরে ফেলতে ফেলতে গম্ভীব গলায় বলে, 'তা হতে বাধাই বা কী? তিনটেকেই যখন নাচিযেছিস—'

তুলসীও গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি মোটেই কাউকে নাচাতে যাইনি ননীদা, শুধু বলেছিলাম, এ ভাবে আর রাক্ষসের ভয়ে কাঁটা হয়ে বাতে না ঘুমিয়ে ঘুমিযে পেবে উঠছি না। সেই এতটুকুন বয়েস থেকে যুদ্ধ করে যেন ফুবিয়ে যাচ্ছি। তাই তোদের শরণ নিচ্ছি, যে পারিস আমায় একটু আশ্রয় দে। কী কবে জানবো তিনজনেই দরজা খুলে বসেছিল!'

'ওঃ!'

ননী তুলসীর মুখের দিকে তাকায়!

অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখছেন বোধহয় শ্রীমতী তুলসী মঞ্জরী। ওই হ্যাংলা হতভাগা তিনটে হামড়ে গিয়ে পড়ে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আব কী!

কিন্তু তাই কি?

তুলসীর মুখে দর্প-অহঙ্কারের উগ্রতা কোথায়?

যেন বেশ বিপন্ন বিপন্ন মুখ।

যেন সত্যিই বেচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

দেখল, তা বলে ননী নরম হল না।

ননী বেশ বিদ্রূপের গলায় বলে, 'ওঃ তাহলে একেবারে রাজকন্যার স্বয়ংবর-সভা বসে গেছে বল? তা' ভাবনার কী আছে? যে দরজাটা সবচেয়ে বড় সেটাতেই ঢুকে পড। তারপর শুম্ভ নিশুম্ভর পালা চলুক।

তুলসী উঠে দাঁড়ায়। আহত গলায় বলে, 'তুমি আমায় চিরকাল ঠাট্টা-ব্যঙ্গই করলে ননীদা, আমার দুঃখু জ্বালাটা কখনো দেখলে না। ছোটবেলায় যখন এর দোরে ওর দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি, তখন যদি একটু দয়া-ঘেন্না করে আশ্রয় দিতে, তাহলে হয়তো আজ সরকারি হাসপাতালে দাই হতে হত না'।

'আমি?'

ননী আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'আমি তোকে কী সুবাদে আশ্রয় দিতাম?'

'সুবাদ কি শুধু সম্বন্ধ দিয়েই হয় ননীদা? তুমি একটা মানুষ, আর আমিও একটা মানুষ—এই সুবাদে!'

'এই সুবাদে?'

ননী প্রায় খিঁচিয়ে ওঠে, 'আহা! তুলসী, তুই যেন এইমাত্তর সগ্‌গো থেকে খসে পড়লি, নরলোকের কিছু জানিস না। মানুষের ওপর 'মানুষে'র ব্যবহার করাটি যত সহজ মেয়েমানুষের ওপর তা নয়, বুঝলি?'

'বুঝলাম।' বলে একটু হাসে তুলসী, 'এই যে একটু সুখ-দুঃখের কথা কইছি, তাতেই বুক ছম্‌ছম করছে, এক্ষুনি দরজার আড়ালে পদ্মদির ছায়া পড়বে।'

পদ্মদি।

ননী উদাস গলায় বলে, 'দিদি নেই।'

'নেই! নেই মানে?'

'মানে চলে গেছে?'

'কোথায় গেছে?'

ননী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তিক্ত গলায় বলে, 'শ্বশুরবাড়ি।

'ও বাবা! বল কি? পদ্মদির আবার যাবার মতন একটা শ্বশুরবাড়ি ছিল নাকি ননীদা?'

'ছিল না! গজালো। ভাসুর না অসুর কে যে ছিল, সে বুঝি মরেছে, তাই ইনি তার সদ্যবিধবা পরিবারের সঙ্গে মামলা লড়ে বিষয়ের ভাগ আদায় করতে গেলেন।'

তুলসী ননীর ওই তিক্ত মুখের দিকে তাকায়।

তুলসী অবাক হয়ে বলে, 'এ-সব কখন হল? এই তো সেদিনও—'

'হয়েছে কাল। খবর পাওয়া মাত্তর দড়ি-ছেঁড়া হয়ে চলে গেল। দুটো বাচ্ছা যে ওর মুখোপেক্ষী হয়ে পড়ে আছে তাও ভাবল না একবার। বলল কি জানিস? জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। পিসি বিহনে কি আর ওদের খাওয়া আটকে থাকবে? মেয়েমানুষ জাতটা ভারী লুভিষ্টে, বুঝলি তুলসী। কী ছাইয়ের বিষয় সম্পত্তি আছে ভগবান জানে, তবু লোভে পড়ে লড়ালড়ি করতে ছুটল। এখানে তোর অভাবটা কী ছিল? খেতে পাচ্ছিলি না? পরতে পাচ্ছিলি না? গিন্নিত্বর অভাব ছিল? রাতদিন তো ভাইটা আর ভাইপো-ভাইঝি দুটোর মাথা হাতে কাটত। তবু ওই বললাম তো, মেয়েমানুষ জাতটা লোভেই মরে— '

তুলসী তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'জাতটাকে তো ভালই চিনে ফেলেছ দেখছি ননীদা। তবে কনক বৌদিও মেয়েমানুষ জাতেরই ছিল।'

ননী চমকে উঠল যেন।

ননী বোধহয় এ কথাটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

ননী গুম হয়ে গেল।

তারপর নিশ্বাস ফেলে আস্তে বলল, 'এক-আধজন দেবী অংশে জন্মায় তুলসী।'

'তা বটে!'

তুলসী মনে মনে বলে, সময়কালে মরতে পারলেই দেবী হওয়া যায়। যার মরণ নেই তার দেবী হওয়ার উপায় নেই।

যাক, তুলসী তো আর দেবী অংশে জন্মায় নি। তুলসী কীটপতঙ্গের সামিল। তুলসী অতএব ওই সব বড় বড় কথা ছেড়ে ফট্ করে একটা কীটস্য কীটের মত কথা বলে। বলে, 'সরকারী হাসপাতালের দাইয়ের হাতে খেলে তোমার না হয় জাত যেতে পারে, শিশু দুটোর কী সে ভয় আছে?'

ননী হঠাৎ প্রায় ধমকে উঠে বলে, 'জাত যাওয়ার কথা বলেছি তোকে আমি? একবার একটা কথা বলে ফেলেছি বলে খালি খালি সেই খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। জাত যাবে! বলেছি আমি জাত যাবে?'

কোনদিন কারুর ধমকেই ভয় খায় না তুলসী।

তাই বেশ সতেজেই বলে, 'বলনি তা সত্যি! তবে এ কথাও বলনি, তুলসী ওদের পিসি চলে গেছে, দুটো ভাত সেদ্ধ করে দিয়ে যাস।'

'দিদি সবে কাল গেছে।'

'কাল গেছে, তারপর তিন চারটে বেলাও গেছে।'

'তোর বড্ড সময় তাই তাকে বলতে যাবো!'

'সময় আছে কি নেই সেকথা আমি বুঝতাম।'

'বেশ বাবা ঠিক আছে। এই গলায় বস্তর দিয়ে বলছি—তুলসী-মঞ্জরী, তুমি এসে দুটি রান্না করে দিয়ে যেও। তবে এও বলব তুলসী, এটা চালালে লোকনিন্দে হতে ছাড়বে না।'

'উঃ ননীদা।'

তুলসী কপালে হাত থাবড়ে বলে, 'চিরটাকাল ওই ভাবনাতেই মলে ননীদা! যাক্‌গে তুমি না হয় আমায় কিছু মাইনেই ধরে দিও তার বদলে। তাতে তো আর দোষ নেই? ঝি-চাকবানীর হাতে খেতে তো আর নিন্দে নেই, আর কে না খাচ্ছে এখন?'

তুলসী দোকান থেকে নামে।

ননী একটু এগিয়ে আসে।

বলে, 'আচ্ছা তুলসী, এত কটু কথা শিখলি কোথায় বল তো? এই করণপুর শহরে বোধহয় তোব মতন মুখরা আর দুর্বাক্য বলিয়ে মেয়ে দুটো নেই।'

তুলসী চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়ায়।

তুলসীর মুখে ওই ঝুলন্ত লণ্ঠনের আলোটা যেন একটা আলোছায়ার নক্সা কাটে।

তুলসী একটু গভীর রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'কোথা থেকে এত কটুকথা শিখলাম তাই জিগ্যেস করছ ননীদা? যদি বলি ভাগ্যের কাছে।'

'ভাগ্যেব কাছে মানে?'

'মানে বুঝিয়ে বলতে বসি, এত সময় আর এখন নেই ননীদা, আজ আবাব ডিউটি। তবে এইটুকুই বলে যাই, এই মুখই আমার অস্তর! এবই জোবেই এযাবৎ শত্রু তাড়িয়ে আসছি। তুলসীব এই মুখটা না থাকলে আজ তুলসীব অস্তিত্ব বলে কিছু থাকত না, কোথায় তলিয়ে যেত। যাক্‌গে ওসব কথা, বলি ভোবের বেলা রাঁধব তেমন রসদ আছে ভাঁড়ারে? নাকি এসে দেখব ভাঁড়ার ঢনঢন।'

'জানি না! দেখিনি।'

'ওঃ জানো না, দেখোনি। তা আজ বাপ-বেটা-বেটিতে কী খাওয়া হয়েছিল? হরিমটর?'

'আজ হোটেলে খেয়ে এসেছি সবাই মিলে।'

'বাঃ চমৎকাব। এই তো চাই। ঠিক আছে, আসছি।'

তুলসী এবার দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়।

কিন্তু ননী যে কেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেইদিকে তাকিয়ে?

তুলসীই বা মোড়ে বাঁক নেবাব সময় ঘুরে তাকিয়ে দেখে কেন?

তুলসী এখন ননীকে আলোর আড়ালে দেখতে পায়। ননীব কপালে আলোছায়ার নক্সা নেই, ননীর সবটাই অন্ধকার, শুধু মাথার পিছনে একটা আলোর আভাস।

সামান্য রেখায়।

ওই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ননীকে যেন কেমন বেচাবী বেচারী দেখতে লাগে। যেন খোলা মাঠের মাঝখানে একলা একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

পথের মাঝখানে পিছু ধরল একজন। তাড়াতাড়ি হেঁটে কাছাকাছি পৌঁছে আস্তে ডাকল, 'তুলসী।'

তুলসী চমকালো না, কারণ ওই সঙ্গ নেওয়াটা তুলসীর চোখ এড়ায়নি।

তুলসী গম্ভীরভাবে বলে, 'রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ভাল দেখায় না জগাই!' জগাইও গম্ভীর হতে জানে।

বলে, 'তা বাড়িতেও তো যেতে দিস্ না তুলসী!'

'তা রাত-বিয়েতে বাড়িতেই বা যেতে দেব কেন?'
'আমায় তুই অবিশ্বাস করিস তুলসী?'
জগাইয়ের গলায় আহত অভিমান।
তুলসী চলতে চলতে বলে, 'অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না, লোকনিন্দের কথা হচ্ছে।'
'দুদিন বাদে তো তোর সঙ্গে আমার বিয়েই হবে।'
'একেবারে হবেই ধরে নিয়েছিস?'
জগাই কাতরভাবে বলে, 'ধরে নেব না? তুই আমায় সে আশ্বাস দিসনি? বলিসনি, তা তোকে বিয়ে করা বরং ভালো। একটু বোকা-সোকা ভালো-মানুষ আছিস, আমাকে এঁটে উঠতে পারবি না—বলিসনি?'
তুলসী হেসে ফেলে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলাম বটে। তুই যে সেটা একেবাবে বেদবাক্য বলে ধবে নিবি তা বাবা বুঝতে পারিনি।'
'বুঝতে পারিসনি? তা পারবি কেন? কোনোদিনই তো জগাই হতভাগার দিকে ভাল কবে তাকিযেও দেখিসনি। অথচ আমি চিরকাল তোকে—'
তুলসী হতাশভাবে বলে, 'আমাব কী অবস্থা হযেছে জানিস জগাই, তেষ্টা পেযে একঘটি জল চাইলাম, ভগবান ডুবিয়ে মারতে এক-পুকুর জল দিল। মনে করেছিলাম ছেলেবেলা থেকে চেনা জানা, আড্ডা-ইয়ার্কি দিই, এই পর্যন্ত। সত্যি কি আর তোদের কারুব এই হাসপাতালের দাইটাকে বৌ কবে ঘবে নিযে যাবাব হিম্মত হবে? প্রথমটা যদিও বা আগ্রহ দেখাস, শেষটা সাত পাঁচ ভেবে পিছিয়ে যাবি। তা আমাব সে হিসেব তো ভুলই হয়েছে দেখছি.. কে? কে ওখানে?.. ওঃ বাজেন? এই দেখ্ জগাই, আমাব আব এক খদ্দেব।..রাজেন, তোদের বলেছিলাম মন স্থির করতে দুটো দিন সময নে, এখন দেখছি উল্টো হচ্ছে। আমাবই এখন মনঃস্থিব কবতে সমযের দবকাব।'
বাজেন ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'তা জানি, এখন ভাবছিস, একটা বডগাছে নৌকো বাঁধলেই হত।'
'বডগাছে মানে? কী বলতে চাস তুই?' তুলসী পলকে ফিরে দাঁডায।
রাজেন বলে, 'বলতে কিছুই চাই না তুলসী। আক্ষেপেব মাথায কথাব কথা বলেছি। তবে এই যদি তোর মনে ছিল, তবে সেদিন অকারণ একটা সুখেব ছবি দেখালি কেন? এখন গাছে তুলে দিযে মই কেডে নিচ্ছিস? আমি ইত্যবসরে জগাকে নোটিস দিযেছি ঘব খুঁজে নিগে যা।'
'নোটিস দিযে দিয়েছিস?'
তুলসী রুক্ষ গলায় বলে, 'নোটিস দেওযার কী ছিল?'
'বাঃ আমার বাসায় তো মোটে দেডখানা ঘব। ওব চালচুলো নেই বলে একসঙ্গে থাকি। এবপব কী করে চলবে?'
'কেন, ওই আধখানা ঘরেই থাকত ও।'
তুলসী ঘাড ফিবিয়ে বলে, 'কী রে জগাই, পারতিস না?'
কেউ সাড়া দেয় না।
কখন নিঃশব্দে চলে গেছে সে।
তুলসী ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'চিরকালের বন্ধুকে বিতাডিত করে বৌ এনে প্রতিষ্ঠে করবি রাজেন? ভেবে লজ্জা হল না?'
রাজেন অম্লান মুখে বলে, 'কিছু না। ভাইবন্ধু আত্মকুটুম্বু সব্বাইকে বিতাড়িত করে বৌকে প্রতিষ্ঠে করা যায়। তাতে লজ্জার কিছু নেই, জগৎ সংসার তাই করছে। বৌযের তুল্য বস্তু পৃথিবীতে আর আছে নাকি তুলসী?'
'উচ্ছন্ন যাও তুমি!'
বলে তুলসী হনহনিয়ে পা চালায়।
কিন্তু রাজেন কি আর হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে?

রাজেনও এগিয়ে গিয়ে ধরে।

বলে, 'খুব তো মহত্ত্ব দেখাচ্ছিস! বলি ওর চোখের সামনে তোকে নিয়ে সংসার করব, এটা ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবে, সেটাই বুঝি খুব আহ্লাদের হবে জগাইয়ের? যা বলেছি 'ভালর জন্যেই বলেছি রে তুলসী!'

তুলসী ক্লান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে।

তুলসী অনেকটা পথ জোরে জোরে এসেছে। আর ননীর দোকান থেকে তার নিজের বাসা তো কম দূর নয়। হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলোর কাছাকাছিই বাসা নিয়েছিল ও। শুধু মাঝখানে একটা মাঠের ব্যবধান।

নিশ্বাসটা ফেলে তুলসী বলে, 'তুই আমায় নিয়ে সুখে সংসার করছিস এ কথাটা কী পাকা হয়ে গেছে?'

'পাকা কাঁচা তোর হাতে', রাজেন তীব্র উত্তর দেয়, 'তবে আমাকে না করলে রইল ওই হাবা জগাই। সুখেনকে তুমি পাচ্ছ না। সুখেনের পিসি বলেছে খ্যাংরা নিয়ে বৌ বরণ করতে আসবে।'

তুলসী বলে, 'সুখেন বলেছে, ওসব ভয় দেখানোকে ও কেয়ার করে না।'

'এখন তাই বলছে, কার্যক্ষেত্রে দেখিস, পিসি ঠিকই থাকবে আর দুবেলা খ্যাংরা মেরে তবে কথা কইবে। আমার বাবা নাঙ্গার নেই বাটপাড়ের ভয়। কেউ কোথাও নেই।'

'তেমনি বৌ যত্ন করতেও কেউ নেই।'

রাজেন পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলে, 'কেউ-য়ের দরকার কী? আমিই করব, দেখিয়ে দেব যত্ন কাকে বলে! আমি সেই কবে থেকে—বলতে গেলে জ্ঞানাবধিই—'

'রাজেন একটু চুপ কর। আমার মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করছে।'

অগত্যাই চুপ করে যেতে হয় রাজেনকে।

তুলসীর মাথা ঝিম ঝিম?

সে তো সোজা কথা নয়।

কে জানে এক একজন কোন লগ্নে জন্মায় তাদের অকারণ সবাই সমীহ করে, ভয় করে।

ভিখিরীর ঘরের মেয়েও রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকা নেয়।

'যাচ্ছিস তো চল আমার সঙ্গে,' তুলসী বলে, 'দেখিগে আবার কোন শয়তান এসে বাড়ি পাহাবা দিচ্ছে কি না।'

অনুমান ভুল নয় তুলসীর। বেড়ার দরজা থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দাওয়ার ওপর একটা দীর্ঘাকৃতি কালো ছায়া।

'রাজেন, চলে যাসনে।'

তুলসী হুকুমের স্বরেই বলে, 'এখন যাসনে। ওই ইঁটখানা দে।'

কিন্তু ছায়ামূর্তি ততক্ষণে বলে ওঠে, 'এই, এই, আমি আমি।'

'তুই! তুই এত রাত্তিরে যে?'

'কেন আর? তোর কাছে পাকা কথা নিতে।'

তুলসী সেই দাওয়ার সিঁড়ির ওপরই বসে পড়ে বলে, 'তোরা কী চাস বলত? 'আমি দ্রৌপদী হই?'

আটটাব সময় গিয়ে পৌঁছনোর কথা, প্রায় রোজই সাড়ে আটটা বেজে যাবেই।

নার্স মনোরমা মণ্ডল ভুরু কুঁচকে বলে, 'এভাবে প্রতিদিন দেরী করলে তো চলবে না তুলসী! কী হচ্ছে আজকাল? ঘুম কী তোমার এত বেড়েছে?'

তুলসী দ্রুত ভঙ্গীতে ওষুধের জলে হাত ধুতে ধুতে বলে, 'ঘুম বাড়তে যাবে কেন? ঘুম শত্রুর বাড়ুক। আপনাকে তো বলেই ছিলাম একটা পার্ট টাইমের চাকরী নিয়েছি।'

মনোরমা মণ্ডল বড় গলায় বলে, 'তোমার পার্ট টাইমের কাজ বজায় রেখে ডিউটি দিতে এলে তো আর ওপরওয়ালারা শুনবে না।'

তুলসী হেসে বলে, 'আমার ওপরওলা তো আপনি। আপনি শুনলেই হল।'

ডাক্তার ঘোষের একদার অনুগৃহীতা, এবং এখন পরিত্যক্তা নার্স মনোরমা মণ্ডল স্বভাবতই তুলসীর উপর দারুণ ক্ষিপ্ত।

ঘটনাটা ঘটুক বা না ঘটুক, মেয়েমানুষ এসব দুর্ঘটনার আঘ্রাণ পায়। মনোরমা মণ্ডলও পেয়েছে। এবং পেয়ে অবধিই ছুতোয় নাতায় তুলসীর ব্যাপার কমপ্লেন করছে।

আজও করল।

গম্ভীর গলায় বলল, 'ওসব পার্ট টাইম ফাট টাইম দেখাতে চাও তো বড় মিস্‌কে বলগে। তবে তোমার এবার এখানের চাকরীটি যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।' তুলসী দাঁড়িয়ে ওঠে।

অগ্রাহ্যের সুরে বলে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'তোমারও তাই মনে হচ্ছে?'

নার্স মনোরমা মণ্ডল ভুরু কুঁচকে কপালে নানা কাটা দাগ বসিয়ে বলেন, 'তোমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে বৈকি!'

তুলসী মৃদু হেসে বলে, 'আপনি যখন চাকরীটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন!'

'তার মানে, বলতে চাও আমি তোমার চাকরী খেয়ে দেব?'

তুলসী মৃদু হেসে বলে, 'তা দিতে পারেন। আশ্চর্য কী?'

'হুঁ।'

মনোরমা মণ্ডল আগুনের মত ফেটে পড়ে বলে ওঠে, 'যা শুনতে পাচ্ছি, তা তাহলে ঠিকই? তা নইলে এত দুঃসাহস হয়? আচ্ছা চাকরী যখন পারি তখন খাবো।...তোমার এই গাফিলতি এবং তোমার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে যা শুনেছি 'সব রিপোর্ট করে দিচ্ছি।'

তুলসী খুব অমায়িক গলায় বলে, 'ওটাও রিপোর্ট করা যায় মণ্ডলদি? ওমা তা তো জানতাম না। তা হলে আরও চারটি নাম আপনার লিস্টিতে পুরে দেব, লিখে নেবেন।'

'ও! তুমি আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছ?'

মনোবমা মণ্ডল পা ঠুকে বলে, 'আজই তোমার ডিস্‌মিস্‌ করিয়ে দিচ্ছি দেখো।'

তুলসী করিডোর পার হয়ে যেতে যেতে বলে, 'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না মণ্ডলদি, আপনাব খাটুনি আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। চাকরী ছেড়ে দেওয়াব নোটিস দিয়েছি।'

'নোটিস দিয়েছ? ওঃ। কার কাছে শুনি? ডাক্তার ঘোষের কাছে বোধ হয?'

'আ ছিছি, এ কী বলছেন মণ্ডলদি? আমাদের মতন তুচ্ছ মানুষের কি ওনাদের কাছে যাওয়া সাজে। আপনাদের সে সাহস আছে। আমি বড় নার্স দিদিমণিকে বলে দিয়েছি।'

মনোরমা মণ্ডল এই নির্ভয় মূর্তির দিকে তাকিয়ে রাগে থরথর করতে করতে বলে, 'বড় নার্সকে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া, তা শুনে তিনি বোধহয় তোমায় সন্দেশ খাওয়ালেন!'

তুলসী হেসে উঠে বলে, 'খাওয়াননি, বরং খেতে চাইলেন।' বললেন, 'দেখো তুলসী, বিযেতে আমাদেব যেন বাদ দিও না, নেমন্তন্ন চাই।'

'বিয়ে!'

মিস মনোরমা মণ্ডল স্খলিত স্বরে বলে, 'ওঃ বিয়ে! তাই এত অহঙ্কার। পাত্রটি কে শুনতে পাই না?'

তুলসী এবার ওর অভ্যাসসিদ্ধ হাসিতে গড়িয়ে পড়ে, 'সে আর শোনাব কি মণ্ডলদি। নিজেই জানি না। একগণ্ডা বর দুবেলা হেঁটে হেঁটে পায়ের জুতো ক্ষইয়ে ফেলছে। কোনটার গলায় যে মালা দেব শেষ অবধি, তাই জানি না।'

তুলসী এখন তার সেই রেল কোয়ার্টারের বৌদির 'ননদে'র সেবার ভারপ্রাপ্তা। তুলসী ঘরে ঢুকতেই

সে বলে ওঠে, 'আমার বৌদির মুখে তোমার কত প্রশংসা শুনেছিলাম তুলসী, আর আমার বেলাতেই তুমি এই করলে!'

তুলসী ওর বিছানা ঝেড়ে দিতে দিতে হেসে বলে, 'আপনাকে তুলে না দিয়ে তো যাচ্ছি না দিদি!'

'তা তো দিচ্ছ। ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে তোমায় স্পেশাল করে রাখব কিছুদিন, তা হল কই!'

তুলসী হাতজোড় করে বলে, 'ওই অপরাধটি রয়ে গেল দিদি, আর হবে না। তবু এই এখান থেকে আপনাকে তুলে দিয়ে তবে যাব।'

'বর কেমন হচ্ছে রে তুলসী?'

'সে কী আর আপনার কাছে বলা যায় দিদি! তবে নাকি এ জগতে একটা কথা আছে, রাজার জন্যে রাণী আর কানার জন্যে কানী। সেটাই আর কী।'

'তা তোমার তো তিনকুলে কেউ নেই, বিয়েটা কে দেবে?'

তুলসী ওর চুল আঁচড়ে দিতে দিতে বলে, 'বন্ধুবান্ধবরা দিয়ে দেবে।'

ননী চৌকিটার উপর বসে ছিল চুপচাপ।

তুলসী হাসপাতাল-ফেরত এসে দাঁড়াল, বলে উঠল, 'একী গো ননীদা, এই ভাবে বসে আছ? ছেলেদের নতুন জামা-প্যাণ্ট দুটো কেনা হয়েছে?'

ননী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

তুলসী মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'তা সেটা কবে হবে?'

'তাড়াতাড়ির কী আছে?' ননী গম্ভীর ভাবে বলে, 'ওরা তো আর বরযাত্রী যাচ্ছে না?'

'আহা তা নাই বা গেল। তা বলে নতুন জামা-জুতো হবে না?'

'কেন, ওদের কী খুব সুখের দিন পড়েছে?'

তুলসী কড়া গলায় বলে, 'দেখো ননীদা, তুমি আমায় রাগিও না বলছি। কেন, কী দুঃখের দিনই বা হচ্ছে? তবু তো দুবেলা নিয়ম করে দুটো খেতে পাবে, পাতা বিছানাটা পাবে, হাতের কাছে জামা জুতোটা পাবে।'

'হুঁ!'

ননী একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, 'আর তার সঙ্গে একটি সৎমা পাবে।'

'ঠিক কথাই বলেছ ননীদা!' দৃঢ়স্বরে বলে তুলসী, 'সৎ' মা-ই পাবে।'

'তা, তুই এখনো আমায় ননীদা ননীদা করে মরছিস যে?'

তুলসী হেসে ফেলে বলে, 'অভ্যেস বলে কথা। আজকের অভ্যেস তো নয়!'

'আমি এখনো ভেবে পাচ্ছি না তুলসী, তুই এসব কী করলি! ছোঁড়াগুলোর কাছে আর মুখ দেখাতে পারছি না—'

তুলসী হি হি করে হাসে।

'তা পারবে কী করে? চিরকেলে মুখচোরা তো! কেন, আমি তো বেশ পারছি!'

'বেশ পারছিস?'

'বাঃ, না পারলে চলবে? আমার আর তিনকুলে কে আছে? ওরা ছাড়া কাজকর্ম করবে কে? তোমার আত্মজন বলতেও ওরা, আমার বন্ধুজন বলতেও ওরা।'

'তবে তুই যা, বিদেয় হ এখান থেকে। এখনো এখানে ঘুর ঘুর করছিস কেন? অনেক চুনকালি তো লাগালাম মুখে, আরো বাড়িয়ে দিয়ে তোর কী চতুর্বর্গ লাভ হবে শুনি?'

'তা হবে হয়তো কিছু। কিন্তু আমার তো এক্ষুনি চলে গেলে চলবে না! তোমার এই হাড়ির হাল সংসারে, বৌ এসে দাঁড়াবে কোথায়? সেটা তো ব্যবস্থা করে যেতে হবে। সেটা কিছু আর বেটাছেলের কাজ নয়।'

'তোকে আর অত গিন্নেপনা করতে হবে না, এখান থেকে বিদেয় হ বলছি।'

'আচ্ছা।'

তুলসী একটি তীক্ষ্ণ ভ্রূভঙ্গী করে বলে, 'আজ পর্যন্ত বলে নাও। আর দুদিন পর থেকে দেখব কেমন বিদেয় হ বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পার।'

চলে যায় মুখ টিপে হেসে।

ননী অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবে, কী করে এমন সহজ স্বচ্ছন্দ হতে পারে তুলসী!

তা ননীর মত সরল সাবধানী আর সভ্যালোকের পক্ষে অবাক হবারই কথা। অনেকদিন হয়ে গেল তবু সেদিনের সেই কথাগুলো যেন এখনো পরিপাক করে উঠতে পারছে না। অথচ তুলসী অবলীলায় এসে বলে উঠেছিল, 'দেখো ননীদা, দুঃখে-ধান্দায় পড়ে একটা বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তা বলে তিনটে বিয়ে করতে চাইনি'।

ননী হাঁ হয়ে গিয়ে বলেছিল, 'তার মানে?'

'মানে তিনটে ছোঁড়াই আমায় বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। এখন তুমি কি চাও আমি দ্রোপদী হই?'

ননী খিঁচিয়ে উঠেছিল, 'তা তুমি যেমন কুলকাঠের আঙরাতে বাতাস দিতে গিয়েছিলে?'

'বাঃ, আমি কি জানি ছাই! ভেবেছিলাম কেউই হয়তো গা করবে না। এতটুকু বয়েস থেকে ঝি খাটতে দেখেছে, আর এখন হাসপাতালের আয়াগিরি করতে দেখেছে। তাছাড়া পাড়া মজিয়ে আড্ডা দিয়ে বেড়াই, বিড়ি-সিগ্রেট ওড়াই, কার রুচি হবে এ মেয়েকে বিয়ে করতে! ওমা! এ একেবারে উল্টো উৎপত্তি! এখন দেখছি যদি জোর করে একটার গলায় মালা দিয়ে বসি, বাকী দুটো তার জন্মের শোধ শত্রু হয়ে যাবে। এখন ওদেরও এ বিপদ থেকে রক্ষে করতে হবে, আমাকেও ওই তিনটে বরের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।'

'তা' আমি কী করব? আমার কী করার আছে?' রেগে মেগে বলেছিল ননী।

আর তুলসী দিব্যি সহজ ভাবে, যেন কথাটা মোটেই লজ্জার কথা নয়, এইভাবে বলে উঠেছিল, 'করলে তোমারই 'করার' আছে। তুমি যদি আমায় বিয়ে করে ফেলো, সব ল্যাঠা চুকে যায়।'

ননী অবিশ্যি একথা শুনে বাচাল বেহায়াটাকে মারতে উঠেছিল। কিন্তু কে পারবে ওর সঙ্গে। ওর হি হি তো বন্ধ হয় না। বলে কিনা কথা আদায় না করে যাবই না।

আজ রাজেনের বাসায় বিশেষ ঘটাপটা।

উঠোনে ইঁট সাজিয়ে উনুন পাতা হয়েছে তার মাথায় ছোট শামিয়ানা। সরু দালানের এক কোণে বড় বারকোশে কিছু কিছু কুটনো কোটা, ওদিকে দু তিনটে হাঁড়িতে দই-মিষ্টি।

সুখেন একরাশ কাঠচাঁপা ফুল একটা মাদুরের ওপর ফেলে হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে দুগাছা মালা গাঁথছে, রাজেনের হাতে পিটুলিগোলা। তেল দিয়ে একটা পীড়িতে মোটা মোটা দাগায় আলপনা দিচ্ছে রাজেন।

আর জগাই বসে বসে চারটি মাটির খুরি গেলাস ধুচ্ছে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই, মেঘাচ্ছন্ন মুখ।

হঠাৎ একসময় সুখেন বলে ওঠে, 'ধেৎতেবি নিকুচি করেছে! লক্ষ্মীছাড়ি যেন আমাদের নিয়ে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছে। ওনার বাসরের মালা গাঁথছে বসে বসে শালা সুখেন!'

রাজেন বলে, 'আর আমি তার পীঁড়ি ঘোরাবার পীঁড়ি আলপনা দিচ্ছি।'

'শখের প্রাণ গড়ের মাঠ!'

জগাই ওপাশ থেকে বলে ওঠে, 'সব হওয়া চাই। বলা হয় কিনা তোরা বেটাছেলে, জীবনে পাঁচ-দশবারও বিয়ে করতে পারবি, ভেবে দেখ তুলসী হতচ্ছাড়ির তো এই জন্মের মধ্যে কম্ম—তা এসব সাধ একটু আধটু হবে না? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—'

রাজেন বলে, 'এই পীঁড়ি আলপনা সেরে আমায় এখন একটা রাঁধুনীঠাকুর ধরে আনতে হবে।'

'আর আমি এই মালা সেরে যাব বাসরের বিছানার ব্যবস্থা করতে!'

'ওদিকে তো আবার ননীদার ওখানেও অনেক কাজ। বরযাত্রীদের নিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে আসা—'

'বরযাত্রী আবার এত পাচ্ছিস কোথায় তুই?'

'জানি না, কোথা থেকে না কোথা থেকে দু পাঁচটা জুটিয়েছে।'

হঠাৎ জগাই জেগে ওঠে, 'আমাদের তো বিয়েতে একটা প্রেজেনটেশান দেওয়া উচিত ছিল।'

সুখেন কড়া গলায় বলে, 'উচিত ছিল, দিয়েছি। নিজের মান সম্ভ্রমটাই প্রেজেন্ট দিচ্ছি।'

'আহা তা বললে কী হবে! একখানা কাপড় টাপড়—'

সুখেন তেমনি ভাবেই বলে, 'তোর পরামর্শর পিত্যেশে বসে নেই জগা! লাল চেলি কিনে রেখেছি একখানা।'

'অ্যাঁ, তোর ওকাজ হয়ে গেছে?'

জগাই কাতর গলায় বলে, 'রাজেন, চল তোতে আমাতে দোকানে যাই!'

রাজেন আলপনাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বলে, 'আমি ওসব কাপড়-টাপড়ের মধ্যে নেই, একখানা কানপুরী ছিটের বিছানার চাদর এনে রেখেছি।'

'ওঃ! সবাইয়ের সব হয়ে গেছে, তা আমায় একবার বলবি তো? ঠিক আছে, আমি একাই যাচ্ছি। তখন যেন আবার জগা জগা রব না ওঠে।'

দরজার কাছে সহসা একটি চাঁচাছোলা কণ্ঠস্বর ঝলসে ওঠে—'সে তো উঠবেই। জগা ভিন্ন ওঁচা কাজগুলো করবে কে? এই যে পীঁড়ি চিত্তির হয়ে গেছে? বাঃ! আর বলছিলি কিনা পারব না। পারব না কথার কোন মানে নেই, বুঝলি?...কুটনোটা আমি একবার দেখে যাব। ক'জন খাবে বুঝি। টোপর এনেছিস?'

সুখেন মালা দুটো ঠেলে ফেলে রেখে বলে ওঠে, 'যা যা হুকুম হয়েছিল তার কিছু বেতিক্রম হয় নি।'

'তা হবে কেন?' বুঝে সুঝে ঠিক লোকদেরই কাজের ভার দিয়েছি। রান্নার মশলাপাতি সব এসে গেছে?'

'এসেছে।'

'তোদের ফর্সা জামাকাপড় মজুত আছে তো?'

'আমাদের আবার কী দরকার? রাজেন ভারী গলায় বলে।

তুলসী উচ্চকিত গলায় বলে, 'তার মানে? তোদের দরকার নেই? ননীদার বিয়ের বরযাত্রী হবি না সেজে-গুজে? হ্যাঁ ভাল কথা, গাড়িটার ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? আমার দু তিনটে বান্ধবী আসবে, দেখিস যেন তারা আবার অব্যবস্থা দেখে না হাসে। অবিশ্যি বলেছি আমি তাদের—'ভারী তো বিয়ে! তার দুপায়ে আলতা।' আচ্ছা আর দেখ—'

তুলসী গাঢ়স্বরে বলে, ছেলেমেয়ে দুটোকে একটু সকাল সকাল করে ডেকে এনে খাইয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে ভারটা জগাই তুই নে ভাই!'

সুখেন মালায় পাতা চাপা দিয়ে বলে ওঠে, 'খুব বাঁদরনাচটা নাচালি বটে!'

তুলসী ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে।

তুলসী ওদের কাছাকাছি বসে পড়ে আহত গলায় বলে, 'ওকথা কেন বলছিস রে? যা করছি অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছি।...দেখলাম তোরা তিনজনেই আমায় প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছিস। সবাই তুল্য-মূল্য। কেউ কম যায় না। তখন ভেবে দেখ্ সত্যি তো আর তিনজনের গলাতেই মালা দিতে পারি না।...একজনকেই দিতে হবে। বাকি দুজনের ওপর তখন দারুণ অবিচার হবে কিনা?'

ওরা অবশ্য কথা বলে না।

গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

তুলসী তেমনি নরম গলায় আস্তে আস্তে বলে, 'আর সত্যি বলতে, ননীদার দুঃখুটাও চোখে সহ্য হচ্ছিল না রে! একা দাঁড়িয়ে ছিল যেন বাজ-পড়া তালগাছ। পদ্মদির ব্যবহারে বড় দুঃখু পেয়েছে। মেয়েমানুষ

জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ওই বাচ্চাদুটোর কথাও চিন্তা কর।'

সুখেন বলে, 'করা হয়েছে চিন্তা।'

'সেই তো, তোরা বুঝমান বলেই এত সাহস! তা আমাকেই কি সোজা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে নাকি?'

তুলসী হাসে—'ননীদার পরিবারের 'ধোঁয়া' খাওয়া চলবে না। হাসপাতালে কাজ করা চলবে না। রাস্তায় টো টো করা চলবে না। এইসব সত্যবদ্ধ করিয়ে নিয়ে তবে কেতাখ করে বিয়েতে রাজী হয়েছেন বাবু। আর তোদের সঙ্গে যে কড়ার হয়েছে মনে আছে তো? যেমন তাসের আসর চলত চলবে। যেমন আড্ডা গল্প চলত চলবে।...যেমন ননীদার সাহায্য করা হত চলবে।...আর তখন বৌদি সেজে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন তিনটেকে একে একে ধরে ধরে হিল্লে করে বিদেয় কবে দেওয়া হবে, কথাটি কওয়া চলবে না। মনে আছে তো? ঠিক? এসব নইলে তো আমাব সুখ হবে না। তোদের কাছেই আমার জীবনের সুখ-শান্তি ভিক্ষে কবছি।

তিন ভুবনের কাহিনী

অবৈধ

প্রসাধনের শেষে ড্রেসিংটেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন চারুপ্রভা।

গাঢ় নীল রঙের পিওর সিল্কের শাড়ির উপর আলাদা বসানো চওড়া জরির ভারী পাড়টা এমন প্লেন আর টাইট ভাবে বুকের উপর থেকে টেনে কাঁধ ডিঙিয়ে পিঠে ফেলে দিয়েছেন মনে হচ্ছে ওর আর ওখান থেকে সিকি ইঞ্চিও নড়বার ক্ষমতা নেই, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ কাটা গলা ব্লাউজটার অন্তরাল থেকে নিটোল অটুট গঠন-সৌষ্ঠবের যে রেখাটি উঁকি মারছে, তাকে কিছুতেই ঢাকা দিয়ে ফেলবে না।

বুক আর গলার অনেকখানি ফর্সা ধবধবে অনাবৃত অংশের মাঝখানে সরু একছড়া শুধু মুক্তোর হার চারুপ্রভার রুচির এবং অবস্থার পরিচয় বহন করছে। চারুপ্রভার নিটোল মোলায়েম বাহুবল্লরীও সম্পূর্ণ অনাবৃত, ব্লাউজে যে দুটো 'হাতা' থাকা আবশ্যক, এই বাজে সেকেলে নিয়মে বিশ্বাসী নন চারুপ্রভা। ঘন নীল শাড়ির ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে তিনি যে সাদা সার্টিনের ব্লাউজের 'অনুকল্পটি' শ্রীঅঙ্গে ধারণ করেছেন, তাব কাঁধের উপর ইঞ্চি দেড়েক চওড়া দুটি টেপ বুক পিঠ দুদিকের অংশকে আটকে রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করে 'হাতা' নামের গৌরবটুকু অর্জন করে নিয়েছে।

অন্য অনেক বিষয়ে ব্যয়বাহুল্যের অপবাদ থাকলেও এই একটি ব্যাপারে চারুপ্রভা মিতব্যয়ী। এক মিটার কাপড়ে দু'দুটো ব্লাউজ বানিয়েও ফালতু খানিকটা ফালি বাড়তি হয়ে যায় চারুপ্রভাব।

শুভ্র মরালগ্রীবাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেহের পাশ এবং পিছন যতখানি দেখতে পারা সম্ভব দেখে নিলেন চারুপ্রভা, কোথাও কোনখানে ঢিলেঢালা না থাকে।

দেখতে দেখতে ঠোঁটের কোণায় সূক্ষ্ম একটু হাসি ফুটে উঠল চারুপ্রভার। কেউ বলুক দিকি সাতচল্লিশ-আটচল্লিশের কাছে বয়েস হয়েছে তাঁর। নিজের কাছেও একটু কারচুপি করলেন চারুপ্রভা, করেন অনেক সময়। মনকে চোখ ঠারেন, সাল-তারিখগুলোর ওপর দিয়ে যেন আলগা হয়ে ভেসে যান।

আসলে চারুপ্রভার এখন ঊনপঞ্চাশী চলছে, সামনের মাসেই তাঁর থেকে গড়িয়ে পড়বেন পঞ্চাশের সীমারেখায়। তবু সেটা এখন ভাবতে পারছেন না।

চারুপ্রভার পঞ্চাশ বছর বয়েস হবে এ কখনো ভাবা যায়?

প্রসাধনের সরঞ্জামগুলো তাড়াতাড়ি আয়নার ড্রয়ারে পুরে ফেলে চাবি লাগিয়ে চাবিটা হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে দিলেন চারুপ্রভা। অনেক কিছুই তো রীতিমতো সিক্রেটের ব্যাপার। চোখের কোণায় যে পটে আঁকা ছবিব ভাবরেখা, চিবুকের ধারে যে ছোট্ট কালো তিলটি, সে সব যে চারুপ্রভার স্বোপার্জিত, বিধাতাপুরুষ এতটা দিয়ে পাঠান নি, একথা চারুপ্রভা বাড়ির লোকের কাছেও ভাঙতে রাজী নয়।

অবশ্য বাড়ির যে লোকটাকে নিয়ে এই তিরিশ বছর ঘর করলেন, সে লোকটাকে তিনি 'লোক' মাত্রই মনে করেন, 'ব্যক্তি' বলে গণ্য করেন না, কারণ স্ত্রীকে সে স্ত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই জানে না। 'সুন্দরী স্ত্রী' এই পর্যন্ত। সেই সৌন্দর্যের মধ্যে যে অগাধ সুষমা, অপার রহস্য, অপূর্ব শিল্পবিন্যাস, তা বুঝতেই পারে না।

চারুপ্রভাদের সমিতির 'বাচাল বেহেড' নামে বিখ্যাত সদস্যা উজ্জ্বলা বলে, 'উঃ চারুদি, যাই বলুন, ভাগ্যিস ভগবান আমায় পুরুষ করে পাঠায় নি, পাঠালে আর আপনার রক্ষে ছিল না, হালুম করে খেয়ে ফেলতাম।' ...বলে, 'স্থিরযৌবনা' শব্দটা অভিধানেই দেখেছি, শব্দের মানেটা জানছি আপনাকে দেখে।'...কখনো বলে,

'রাস্তায় বেরোবার আগে কড়ে আঙুলটা একটু কামড়ে নেবেন চারুদি, নইলে নির্ঘাৎ নজর লাগবে। মেয়েমানুষেরই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছেন—'

যতবার দেখে ততবারই যেন চমকে ওঠে উজ্জ্বলা।

আর সে কথা বলার পরই অন্যেরা যোগ দেয়। যে কথাগুলো শুনতে তোয়াজের মত।...এটা কিন্তু চারুপ্রভা সমিতির প্রেসিডেন্ট বলে নয়, বা চারুপ্রভা সমিতিতে মোটা মোটা ডোনেশান দেন বলেও নয়, চারুপ্রভার অসাধারণ ব্যক্তিত্বই সকলের থেকে উর্দ্ধে তুলে রেখেছে চারুপ্রভাকে। ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু বেশী রাশভারী নয়। বাচাল মেয়েটার বেহেড কথাবার্তাও তো সহ্য করে চলেন। তোয়াজ জিনিসটা বড় মারাত্মক, বশীকরণের মাদুলীকবচের মতই ওর অলৌকিক ক্ষমতা। একমাত্র তোয়াজই পারে একজন বিশিষ্টকে করায়ত্ত করে ফেলতে।

আবাল্য রূপের খ্যাতি শুনে আসছেন চারুপ্রভা তবু পুরনো তো লাগে না। ববং যেদিন কেউ তেমন লক্ষ্য করে না, সেদিন কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

রূপলাবণ্যকে অটুট রাখবার, 'স্থিরযৌবন' শব্দটার প্রত্যক্ষ অর্থ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কলা-কৌশলের প্রয়োজন, সেটি চাকপ্রভার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। রূপচর্চার পাঠ নিতে দেশী-বিদেশী সব রকম পদ্ধতির দ্বারস্থ চারুপ্রভা।

চারুপ্রভা জানেন শরীরের বাঁধুনী ঠিক রাখতে কোন খাদ্য গ্রহণীয়, আর কোন খাদ্য বর্জনীয়, চারুপ্রভা জানেন রাতে শোবার আগে মুখের রেখায় রেখায় কী ধরনের মাসাজ করলে মুখের পেশী সতেজ থাকে, আর সকালে জাগার পর কোন কোন প্রক্রিয়ায় মুখ ফোঁটা ফুলেব মত টাটকা দেখায়।

চারুপ্রভা জানেন, কোন স্টাইলের সাজের সঙ্গে বব্ করা চুল মানায়, কোন স্টাইলের সঙ্গে 'তাল' খোঁপা, চূড়া খোঁপা। ছাঁটা চুল, বড় খোঁপা, সবই মজুত আছে চারুপ্রভার ভাঁড়ারে।

বলতে গেলে এটাই চারুপ্রভার জীবনের সাধনা। ছেলেবেলায় রান্নাঘরের কোণে মায়ের হাতের কলাইয়ের ডাল আর ডাঁটা-চচ্চড়ি মেখে ভাত খেতে খেতে চারুপ্রভা সিনেমার ছবিতে দেখা ঘরবাড়ির মত ঘরবাড়ির স্বপ্ন দেখত। যেখানে যা ঐশ্বর্যের ছবি দেখত তার মাঝখানে নিজেকে বসিয়ে বসিয়ে দেখত।

অথচ চারুপ্রভার মেয়ে?

যার ভাল নাম লোপামুদ্রা, ডাক-নাম জিপসি। সে এক অদ্ভুত।...নিজের নামটা নিয়ে অসন্তোষের শেষ নেই চারুপ্রভার, এবং পবলোকগত অভিভাবকদের উপর অভিযোগেরও শেষ নেই। কেন? জগতে আর নাম ছিল না? তাই চারুপ্রভার জন্যই এই সেকেলে গাঁইয়া নামটা! এর কোন্ অংশটাকে ভেঙে-চুরে বাঁকিয়ে আধুনিকীকরণ সম্ভব? বরং চারুপ্রভার বড়দির নামটা শতগুণে ভাল। নীরপ্রভাকে সহজেই নীরা করে নেওয়া যায়। চারুপ্রভা? সমস্ত সম্ভাবনা রহিত।

কী অবিচার!

নিজের মেয়ের উপর তাই সুবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন চারুপ্রভা। পোশাকী নামটি রেখেছেন মহাভারত ঘেঁটে, অথচ ডাক-নামটি কত স্মার্ট স্বচ্ছন্দ!

জিপসি! যেন বিদ্যুতের চমক। যেন বেতের ডগার আচমকা আস্ফালন। শুনলেই বোঝা যায়—তার নামকরণকারী আর যাই হোক গাঁইয়া নয়।

কিন্তু এমনি কপাল চারুপ্রভার যে, স্বভাবে মেয়েটা পুরো গাঁইয়া। আপ্রাণ চেষ্টা করেও চারুপ্রভা তাকে স্মার্ট করে তুলতে পারছেন না, পারছেন না কায়দাদুরস্ত করতে। আগে ভাবতেন বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে, এখন দেখছেন ধারণাটা ভুল, বলতে গেলে একেবারে উল্টো। যত বড় হচ্ছে জিপসি, ততই মায়ের ইচ্ছার বিপরীতে চলে যাচ্ছে। চারুপ্রভা গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেন না তাই, নাহলে বলতেন তাঁর মেয়ের উপযুক্ত বিশেষণ হচ্ছে 'ল্যাদাড়ু'। যেটা নাকি স্মার্টের একেবারে বিপরীত।

আবাব তার উপর এককাঠি সরেশ, নিজের এই অপটুতার জন্যে লজ্জার বালাই নেই মেয়ের, ররং সুযোগ পেলেই মাকে ব্যঙ্গ করতে ওস্তাদ। অথবা বলা যায়, মা-র এই টিপটপ্ কায়দা-দুরস্থ সভ্য-ভব্য

প্রকৃতিকে ডাউন করবার তালে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

অতএব নিজের প্রসাধনের সরঞ্জামরাশি চাবি-বন্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় কী চারুপ্রভার? একটা কিছু চোখে পড়লেই জিপসি সেটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর হেসে হেসে বলে, 'মা, তোমার এই অপরূপ রূপরাশির কতটা নিজের আর কতটা দোকান থেকে কেনা, সেটা ভাগ্যিস তোমার ভক্তরা জেনে ফেলে না।' বলে, 'যাই বলো বাবা, শ্রমবিমুখতা নিয়ে মাকে কিছু বলা যাবে না। কী পরিমাণ পরিশ্রম যে করেন ভদ্রমহিলা আসল রূপটাকে খানিকটা বাড়িয়ে আর আসল বয়সটাকে খানিকটা কমিয়ে দেখাতে! উঃ, ভাবা যায় না।'

ঠিক বাপের মত হয়েছে মেয়েটা।

ওই একটাই মেয়ে। একাধিক সন্তান চারুপ্রভার কাছে বিভীষিকাতুল্য, তাই ওই একজনের আবির্ভাবের পরই দ্বিতীয় তৃতীয়ের আসার পথ বন্ধ করে ফেলেছিলেন চারুপ্রভা। ভাগ্যিস ফেলেছিলেন, তা নইলে এই রূপলাবণ্য, এই নিটোল যৌবন এমন অটুট থাকত? তাছাড়া ওইরকমই তো হত আরো দু'চারটি? জীবন মহানিশা করে ছাড়ত চারুপ্রভার।

বিজনবিহারী অবশ্য খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তখন। বলেছিলেন, 'একটাও অন্ততঃ ছেলে দরকার নেই মানুষের?'

চারুপ্রভা হেসে উঠেছিলেন।

'আসবার দরজা খোলা পেলে, যার ইচ্ছে সে আসবে, তোমার দরকার মাফিক আসবে? পর পর মেয়েই আসতে পারে পাঁচ সাত দশবারও। তোমার নিজেরই ছয় পিসি নেই, পাঁচ বোন?'

বিজনবিহারী অবশ্যই এ যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ম্ ওই 'জিপসি'। যাকে বিজনবিহারী মাঝে মাঝে 'খুকু' বলেন।

তা বলে খুকুটি যে বাবারই 'নিজ জন' তাও নয়।

খুকু যেন দুটো অর্বাচীন বৃহৎ মাপের খোকা-খুকুর বোকাটে বোকাটে খেলার একটি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান বয়স্ক দর্শক। তাই তার ঠোঁটের কোণায় সর্বদাই একটা কৌতুকহাসির ছাপ।

জিপসি যদি তেমন সীরিয়াস টাইপের মেয়ে হত, হয়তো ওর মনের মধ্যে মা-বাপ দু'জনের জন্যেই সঞ্চিত থাকত বিরক্তি বিদ্বেষ অবজ্ঞা ঘৃণা। কিন্তু তা নেই। জিপসির টাইপ আলাদা।

তাই সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড গেট'-এর মালিক বি. বি. দত্ত যখন দিনান্তে সারাদিনের কর্মকাণ্ডের বেশভূষা ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজে তোলার হুকুম দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যান, তখন জিপসির মুখে ফুটে ওঠে ওই তরল কৌতুকের হাসিটি।

চারুপ্রভা অবশ্য সে সময় বাড়ি থাকেন না, তবে দৈবাৎ কোনদিন থাকলে, জিপসি হেসে হেসে বলে, 'এ বাড়ীটা কী মজার দেখছ মা? সন্ধ্যে হতে না হতেই বাড়ির হেড শ্রীমতী চারুপ্রভা দাসী, মিসেস দত্ত হয়ে বেরিয়ে যান; আর মিষ্টার বি. বি. দত্ত বেরিয়ে যান স্রেফ বিজনবাবু হয়ে।'

চারুপ্রভা দাসী!

চারুপ্রভা রেগে আগুন হয়ে বলেন, 'দাসী মানে? দাসী মানে কী? দাসী লিখতে তুই দেখেছিস কোনদিন আমায়?'

'আহা তোমায় না দেখি, তোমার মাকে তো দেখেছি। এখনো লেখেন শ্রীমতী হেমপ্রভা দাসী।'

চারুপ্রভা আরো উত্তেজিত হন, 'চিরকাল লিখে এসেছেন বলেই এখনো লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। বাড়িটা ওঁর নামে—'

'আহা হা সেই কথাই তো বলছি—চিরকাল যা করে এসেছেন তাই করে চলেছেন। বুড়ি মহিলাটি লোক খাঁটি।'

'অমন খাঁটি হওয়াকে আমি ঘৃণা করি।'—চারুপ্রভা রাগে কাঁপেন, 'দাসী! হাতে করে লিখতে লজ্জাও করে না!'

জিপসি সরলতার প্রতিমূর্তি।

ওঁমা লজ্জা করবে কেন? তোমার বাবাও তো লেখেন পান্নালাল দাস।'

'তোমাকে আর আমার মা-বাপকে নিয়ে কথা বলতে হবে না।'

'এ মা। তুমি রাগ করছ? তাহলে বলব না বাবা।' বলে জিপসি হয়তো তখন ফট্ করে রেডিওটা খুলে দেয়, নচেৎ পোষা কুকুর লুসিকে আদর করতে বসে।

জিপসি অবশ্য লুসিকে লুসি বলে না, বলে 'টিপসি'।

এই বিটকেল শব্দটা শুনতে হয় বলে চারুপ্রভা রেগে আগুন হন, কিন্তু জিপসি অবলীলায় বলে, 'ঠিকই তো বলি মা। জিপসির বোন টিপসি। বেশ কেমন মিল আছে।'

'ও তোর বোন?'

'নয়ই বা কেন? তোমার যখন পালিতা, আর আদরে যখন কন্যাতুল্য, তখন বোন বলাই তো উচিত।' বলে জিপসি তারস্বরে ডাকে ও আমার বোনটি! ও আমার বোনটি! আমার টিপসি বোনটি!

চারুপ্রভা যখন সান্ধ্যভ্রমণে, অথবা বৈকালিক ভ্রমণে বেরোন, তখন সেটা দেখায় যেন সম্রাজ্ঞীর বিজয়-অভিযান। চারুপ্রভা সাজসজ্জা করেন ঘণ্টা দুয়েক ধরে এবং সবসময়ই ঝকমকে ঝকঝকে হয়ে। আর বেরোবার সময় সংসারের সকলকে সচকিত করে জোরাল ঘোষণায় জানিয়ে যান, ফিরতে রাত হতে পারে, বেশী রাত হলে চারুপ্রভার জন্যে যেন কেউ বসে না থাকে। ধরে নিতে হবে বাইরে থেকে খেয়ে আসছেন তিনি। এই ঘোষণার মধ্যে কর্ত্রীর দাপট আছে।

বিজনবাবু হয়ে যাওয়া বি. বি. দত্তর কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা।

বিজনবাবুর এ সময়কার ভূমিকাটি যেন চোর চোর। বেবোবার সময় কারুর চোখে না পডলেই যেন বাঁচেন। আর মোটা মাইনে দিয়ে রাখা রাতদিনের ড্রাইভারকে সাততাড়াতাড়ি 'ছুটি' দেবারই বা কী আছে তা কাউকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বোঝাতে পারেন না। শুধু বলেন, 'সারাদিন ঘুবছে বেচারা।'

'ঘুরছে তা কী? তুমি ঘুরছ না?'

'আমার কথা বাদ দাও।'

কেন বাদ দেওয়া হবে, সে কথার উত্তর নেই।

মোটের মাথায় বাড়িতে দু'দুখানা গাড়ি থাকতেও নিজস্ব ভ্রমণে ট্যাক্সিই পছন্দ করেন বিজনবিহারী। এবং পছন্দ করেন চারুপ্রভা বেরিয়ে যাবার পরে বেরোতে।

সোস্যাল ওয়ার্কার মিসেস দত্তকে তো রোজই বেরোতে হয়। ভয়ানক কাজের মানুষ তিনি।

প্রতিদিন পড়ন্ত বিকেলে অথবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাজসজ্জার শেষে সর্বাঙ্গে রূপের হিল্লোল ছড়িয়ে, আর সমস্ত পরিবেশটাতে দামী সেন্টেব গন্ধ ছড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান চারুপ্রভা।

নিজের ঘর থেকেই টের পান বিজনবিহারী, কাবণ বেরোবার আগে মেয়ের ঘরের সামনে একবার দাঁড়িয়ে সুরেলা গলায় বিশেষ একটি টোনে 'জিপসি' বলে ডেকে যাওয়া চারুপ্রভার নিয়ম।

কেন নিয়ম তাও জানেন বিজনবিহারী, চারুপ্রভা যে এখনো কত তাজা, কত সুন্দরী সেটা মেয়েকে দেখিয়ে যাওয়া।

বিজনবিহারী না শুনেও বুঝতে পারেন চারুপ্রভা একটুক্ষণ দাঁড়াবার কারণ সৃষ্টি করতে মেয়েকে কী কী বলেন।

হযতো মেযের এই মনোরম সন্ধ্যাকালে ঘরকুনো হয়ে বসে থাকার জন্যে, হয়তো বিকেলবেলাটাও অপ্রসাধিত অবস্থায় থাকাব জন্যে। বিস্ময় প্রকাশ করবেন, ক্ষোভ প্রকাশ করবেন, এবং চারুপ্রভাব মেয়ে হয়েও সে যে এমন অদ্ভুত হল কেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কৈফিয়ৎ চাইবেন।

বিজনবিহাবী জানেন, মেয়েও পাল্টা বিস্ময় প্রকাশ করবে মায়ের প্রতিদিনই এই একই বিস্ময়ের বহর দেখে!

বলবে, 'তোমার আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতা দেখে আমি তো হাঁ হয়ে যাই মা।

তোমার কথা শুনলে মনে হয় জীবনে এই আজই প্রথম দেখলে আমাকে।'

তখন রাগ করে তর-তর করে নেমে যান চারুপ্রভা।

সেন্টের গন্ধটা অনেকক্ষণ থাকে। বাতাসে ভেসে ভেসে একেবারে মিলিয়ে যেতে সময় লাগে।

আজ কিন্তু চারুপ্রভা মেয়ের ঘরের দরজায় না গিয়ে এ ঘরে এলেন।

বিজনবিহারী টেবিলে একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে বোধকরি হিসেব মেলাচ্ছিলেন।

চারুপ্রভা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাঙ্কের ভল্টের চাবিটা রেখে যেতে বলেছিলাম, রেখে যাওয়া হয়নি কেন?'

বিজনবিহারী মুখ তুলে চাইলেন।

বিজনবিহারীর মনে পড়ল দোকানে বেরোবার সময় একবার যেন শুনেছিলেন কথাটা। ব্যবসাপত্তরের অবস্থা জটিল, নানা চিন্তায় কথাটা আর মনে পড়েনি।

স্বীকার করলেন সে-কথা।

'ঈস! একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আশ্চর্য ভুল! বলেছিলাম না আজ একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে, জড়োয়ার দু'একটা বার করে আনব।'

'হ্যাঁ, মানে তাড়াতাড়িতে—'

বিজনবিহারী বলতে পারতেন, 'জড়োয়া গহনাটা বাহুল্য, তুমি এমনিতেই বিয়ে-বাড়ি মাৎ করতে পারবে।' তাহলে হয়তো পরিস্থিতি কিছুটা হালকা হয়ে যেত, কিন্তু বিজনবিহারীব শব্দচয়নেব জ্ঞানের বালাই নেই, নেই প্রকাশভঙ্গীব।

তাই বিজনবিহারী বলে বসলেন, 'আজকালকাব দিনে বেশী গহনা-টহনা পবে না যাওয়াই ভাল। চারিদিকে যা শুনতে পাই।'

'চমৎকার। তা তোমাব মত ভোঁতা ব্যবসাদারের উপযুক্ত কথাই বটে। বিযে-বাড়ি-টাডিগুলো একবাব দেখে আসা উচিত তোমার। ছিনতাইয়ের ভয়ে কে কে ভিখিবি সেজে এসেছে দেখতে পেতে।'

বিজনবিহাবী অন্য কোন কথা খুঁজে না পেয়েই বোধহয় বলেন, 'বিয়েটা কোথায়, মানে কাদের বাড়ি?'

'বললে তুমি চিনবে?'

অবজ্ঞাব একটি বিশেষ ভঙ্গীতে কাঁধ নাচিয়ে বেড়িয়ে যান চারুপ্রভা। নেহাত দেরী হযে গেছে, তাই। নচেৎ আরো দু'চাবটে কথা শুনিয়ে যেতেন।

চারুপ্রভা বেরিয়ে যাবাব পরও ঘরে সেন্টের গন্ধটা ছড়িযে রইল।

হঠাৎ বিজনবিহারীর চোখের সামনে একটা সুন্দর কাট্‌গ্লাসের ছোট খালি শিশির চেহাবা ভেসে উঠল।

অথচ সেটা আজকের দেখা নয়, বহু বহুদিন আগের কথা।

বিয়েব সময় গায়ে-হলুদের তত্ত্বে যথারীতি সাবান্ পাউডার আলতা সিঁদুর তেল চিরুনী ইত্যাদির সঙ্গে একটা সেন্টও পেয়েছিল চারুপ্রভা।

বিজনবিহারীদের বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল। তখন বিজনবিহাবীর বাবা-কাকা সবাই বেঁচে, অতএব বৌ-তত্ত্বর মাল-মশলা কেনায় বিজনবিহারীর কোন হাত ছিল না। বোধকবি কাকাই কিনে এনেছিলেন। এবং কাকার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ীই এনেছিলেন, তবু চারুপ্রভার কাছে খুব আদরণীয় হয়েছিল জিনিসটা। কোথাও যাবার সময় এককোঁটা করে মাখত, বেশী খরচ করত না। তবু এক সময় তো খরচ হবেই। হল।

কিন্তু চারুপ্রভা খালি শিশিটা ফেলে দিতে পারেনি প্রাণ ধরে। কত কত দিন যাবৎ বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। বাক্স খুললেই বলত, 'ফাঁকা শিশি তবু গন্ধ দেখ। বাক্স খুললেই পাই।'

হ্যাঁ, তখন তো চারুপ্রভার ওই বাক্সই সার, আলমারীর স্বপ্ন নেহাতই স্বপ্নলোকে।

ঠাকুর্দার আমলের সামান্য একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান ছিল, বাপ-কাকার সঙ্গে সেটাতেই খাটছিলেন তখন বিজনবিহারী। কিন্তু মাথার মধ্যে অনেক প্ল্যান ছিল তাঁর, সেও এক প্রকার দুর্লভ স্বপ্ন।

চারুপ্রভার বাবা পান্নালাল দাসের ছিল বড়বাজারে রঙের দোকান। অবস্থা খারাপ ছিল না, কিন্তু হাড়কিপ্পন

ছিল। মেয়েদের মানুষ করেছিল হাড়ির হালে, আর বিয়ে দিয়েছিল স্রেফ শাঁখা-শাড়ি দিয়ে।

কাজেই চারুপ্রভার জীবনে সেই বিয়েয় পাওয়া সেন্টের শিশিটাই হয়েছিল প্রথম বিলাসিতার সৌরভবাহী।

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তার মূল্যবোধ ছিল বেশ প্রবল।

আর শখ-শৌখিনতাটা চারুপ্রভার মজ্জাগত প্রকৃতি। আয়ত্তের মধ্যে যা ছিল তাই দিয়েই সে রূপচর্চা করত। শাশুড়ী ছিল না, দিদিশাশুড়ী বলত, 'রোজ আলতা পরা! তরল আলতার শিশিগুলো পাঁচদিনে শেষ।'...বলত, 'গেরস্থঘরের বৌ সর্বদা ধোপ কাপড় পরার অভ্যেস কেন? উড়নচণ্ডী বৌ!'

কিন্তু হঠাৎ একসময় ভাগ্যের চাকাখানা যেন হুড়মুড়িয়ে ঘুরে গেল। যেন কোন দেবদেবীর বর পেয়ে গেলেন বিজনবিহারী। ওই গ্রীল আর গেটের ব্যবসা থেকে টাকা আসতে লাগল অপ্রত্যাশিত, কারবার ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠতে লাগল বর্ষার নদীর মত, এবং বিজনবিহারীর যত টাকা বাড়তে লাগল, চারুপ্রভার তত পাখা গজাতে লাগল।

টাকাই তো চলার চাকা।

টাকাই তো ওড়ার পাখা।

টাকাই তো পরমানন্দমাধব, যার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘায়।

যে চারুপ্রভা একদা শাড়িখানাও গুছিয়ে পরতে জানত না, সেই চারুপ্রভা এখন এখানে এসে পৌঁছেছেন।

বাড়িতে একখানা মাত্র গাড়ি থাকাটা যে কিছুই নয়, প্রত্যেকেরই নিজস্ব একখানা গাড়ি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, না থাকা মানেই জীবনের মানে না থাকা, একথা অনেকদিন আগেই জেনে ফেলেছিলেন চারুপ্রভা, এবং এটাও জেনে ফেলেছিলেন কোন এক রকমের 'সোস্যাল ওয়ার্কের' সঙ্গে জড়িত না থাকলে অভিজাত হয়ে ওঠা যায় না।

জেনে ফেলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে চারুপ্রভার। প্রায় অলৌকিকের মত। তাই এই আধুনিক নক্সার বাড়িখানা বানানো থেকে, অতি-আধুনিক নক্সার আসবাবপত্রে সে বাড়ি সাজিয়ে ফেলার সব কিছু গৌরবই চারুপ্রভার। সে গৌরবের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

বিজনবিহারী যেন দিশেহারা হয়ে যান এই সব ঘটনায়। তাঁর ধারণা ছিল মা-লক্ষ্মীর কৃপায় টাকা যখন হয়েছে চারটি, তখন বেশ দেখবার মত একটা বাড়ি হোক, আর সে বাড়িটা ভাল করে একবার সাজিয়ে টাজিয়ে নিয়ে বসাও হোক, কিন্তু অবিরতই সেটা হোক, হয়েই চলুক, রোজ নতুন নতুন ফার্নিচার আসুক, নতুন নতুন পর্দা, বেডকভার, সোফা-সেটির ঢাকা, টী-সেট, ডিনার-সেট আসতেই থাকুক, এমন অভাবিত বস্তু-টস্তুগুলি যে আগামীকালই একেবারে বাতিল করে দিতে হয়, তাও জানা ছিল না বিজনবিহারীর।

বিজনবিহারীর শৈশব-বাল্যের ফার্নিচারের স্মৃতি হচ্ছে ভারী একখানা কাঁঠাল কাঠের ঢাউশ চৌকী, যাতে ঠাকুমাকে মধ্যমণি করে তাঁরা অনেকগুলো তুতো ভাই বোনে মিলে শুতেন। একটা প্রকাণ্ড উঁচু আলনা, যার পিঠটা সর্বদাই গাধার পিঠের যত উঁচু হয়ে থাকত, এবং তার মধ্যে থেকে নিজের জামাকাপড় খুঁজে বার করতে পারা বেশ একখানা দুরূহ কর্ম ছিল।

বাড়িতে আর ছিল ক'খানা গুমো চেয়ার, যাতে বসবার অধিকার বড়দের ছাড়া ছোটদের ছিল না।

বিজনবিহারীর ধারণায় টাকা হলে ব্যাঙ্কে রাখতে হয়, বিষয়-সম্পত্তি বাড়াতে হয়, চিত্ত উদার করতে পারলে দান ধ্যান করতে হয়। কিন্তু এমন একটা সর্বনাশা বুদ্ধি নিয়ে দুহাতে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিতে হয়, এ-ধারণা ছিল না।

কিন্তু চারুপ্রভা তাঁকে তাঁর ধারণাতীত পথে টেনে নিয়ে চলেছেন দুর্বার গতিতে।

অথচ প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই ভোঁতা বিজনবিহারী দত্তর।

উপায়ও নেই।

বিজনবিহারীর কোষ্ঠিকারক জ্যোতিষী বলে রেখেছেন বিজনবিহারীর যা কিছু সুখ-ঐশ্বর্য সবই স্ত্রীভাগ্যে। সুখের কথা বলতে পারেন না বিজনবিহারী, তবে ঐশ্বর্যের কথা অস্বীকার করা চলে না। চারুপ্রভা আসার পর থেকেই এ সংসার উথলোতে শুরু করেছে। বিজনবিহারীর বাবা তার সূচনা দেখে গেছেন। তিনি সহৃষ্ট

চিণ্ডে বলতেন, 'মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

তখন চারুপ্রভা পিঠে আঁচল ফেলে শাড়ি পরতে জানতেন না, আঁচলে চাবি বেঁধে পিঠে ফেলতেন। আর তখনো হয়তো সেই ফাঁকা শিশিটা বাক্সের কোনখানে তোলা ছিল তাঁর।

তারপর তো ধাপে ধাপে উঠেছেন।

উঠেছেন তো উঠেছেন। আর ওই ওঠার সূত্রেই চারুপ্রভার বি. বি. দত্তর সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশই কমে আসছে, কারণ সময় নেই দুজনেরই। এখন শুধু দেনদার আর পাওনাদারের সম্পর্কটি বলবৎ। এখন আর বিজনবিহারী ব্যাঙ্কের খাতা সামলাতে চেষ্টা করেন না, এবং 'মা-লক্ষ্মী' ঘরে এলে তাঁকে যত্ন করে তুলে রাখতে হয়, এই পুরনো ধারণাটাকে ত্যাগ করেছেন।

যার ভাগ্যে ধন, সেই করুক ভোগ। খেলুক তা নিয়ে ছিনিমিনি।

তবে বিজনবিহারীকে যে 'সাহেব' হতে হয়েছে এইটাই কষ্ট। বিজনবিহারীকে সকালে জলখাবারের বদলে ব্রেকফাস্ট করতে হয়, দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের বদলে লাঞ্চ, আর সন্ধ্যায় নৈশ আহারের বদলে ডিনার। মাছের সর্ষে কাঁচালঙ্কার ঝালের স্বাদ ভুলেই যেতে হয়েছে বেচারীকে, পেঁয়াজ রসুন আদা টোম্যাটো সম্বলিত 'কারি'ই সার। ফ্যাশনের প্রয়োজনে নিজের রসনাকেও প্রশ্রয় দেন না চারুপ্রভা।

আহারে বাহারে চলনে বলনে, চারুপ্রভার নির্দেশ মানতে মানতে অবাক হয়ে ভাবেন বিজনবিহারী, আশ্চর্য! ও এতো সব জানল কোথা থেকে! আমার সঙ্গেই তো জীবনযাত্রার শুরু। এই অচেনা যাত্রাপথটা ও চিনল কী করে? যে পথে চোখ বাঁধা অবস্থায় ছুটে চলেছেন বিজনবিহারী।

শুধু ওই একটা সময় বিজনবিহারী স্ব-ভূমিতে।

ওই সন্ধ্যাবেলাটায়।

জিপসির ভাষায় মিষ্টার বি. বি. দত্ত যখন স্রেফ বিজনবাবু হয়ে যান।

চারুপ্রভার গাড়ি বেরিয়ে যাবার শব্দ হল।

খাতাপত্তর গুটিয়ে উঠে পড়লেন বিজনবিহারী।

আসলে কাজটা খুব কিছু দরকারী ছিল না। বলতে পারা যায় এই খাতাগুলো বিজনবিহারীর আত্মরক্ষার অস্ত্র। বাড়িতে ড্রয়ারে রেখে দেন এই রকম চারটি।

চারুপ্রভা ঘরে আসছেন টের পেলেই তাড়াতাড়ি ওগুলোকে টেবিলে বিস্তার করে বসেন। ওর আড়ালে মুখটাকে বাঁচানো যায়, এবং চারুপ্রভার তীব্র আক্রমণাত্মক বাণীগুলি উচ্চারিত হবার সময় অন্যমনস্ক হবার ভান করা যায়।

এখন আর ভানের প্রয়োজন নেই।

উঠে পড়ে চটপট বি. বি. দত্ত থেকে বিজনবাবু হয়ে গেলেন। পাঞ্জাবির ভিতর পকেটে কিছু টাকা রাখলেন, 'লকারে'র চাবিটা কোঁচার খুটে বেঁধে কোমরে গুঁজে নিলেন। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে এই জায়গাটিকে সব থেকে নিরাপদ মনে করে থাকেন বিজনবিহারী। তবে চারুপ্রভার সামনে এখন আর চলে না এসব। আগুন হয়ে যাবেন চারুপ্রভা এরকম গাঁইয়ামীতে।

অথচ এভাবে সর্বস্ব ফেলে রেখে কর্তা-গিন্নী দুজনে বেরিয়ে যাওয়া! মন সায় দেয়না। কিন্তু উপায় কী?

ঘরে চাবি-তালা দিয়ে যাওয়াটাও যে চারুপ্রভার না-পছন্দ। ওতে নাকি চাকর-বাকরদের কাছে প্রেসটিজ থাকে না, এবং তাদেরও প্রেসটিজের হানি করা হয়।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে যাওয়া বিজনবিহারীর ঠাকুর্দার আমলের ব্যাপার।

অতএব আর কিছু করার নেই বিজনবিহারীর লকারের চাবিটি কোঁচার খুটে বেঁধে নিয়ে যাওয়া ছাড়া। আবার একথাও ভেবে উদাস হাসি হাসেন, সোনা রূপোর থেকে অনেক দামী জিনিসটাই তো অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যাচ্ছি আমরা!

একথা তুলে চারুপ্রভাকে সাবধান করে দিতে গিয়ে ঝঙ্কার খেতে হয়েছিল।

চারুপ্রভা ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'বোকার মত কথা বোল না। মেয়ে বড় হয়েছে বলে তাকে

আগলে বসে থাকতে হবে? আর নয়তো চাকরগুলোকে ছাড়িয়ে দিতে হবে? এই চিন্তাটা শুধু বোকাটেই নয়, অশ্লীল। হ্যাঁ, আমি বলব তোমার এই মনোবৃত্তিটা অশ্লীল। ভদ্র সভ্য ঘরে একথা কেউ ভাবতেই পারে না।'

বিজনবিহারী তবু বলেছিলেন, 'একথা শুধু একা আমিই বলি? মেয়ে বড় হলে আগলাতে হয় সংসারে আর কেউ বলে না?'

'বলবে না কেন? তোমার মত বুনোলোকের তো অভাব নেই সংসারে। বেশ তো এতই যদি ইয়ে, নিজেই থেকো না সন্ধ্যা বেলা মেয়ে আগলে।'

'আমি?'

'কেন? মায়েরই শুধু দায়িত্ব? বাপের নেই?'

'সেকথা বলছি না আমি। বলছি এতগুলো শার্ট-পায়জামাপরা মস্তান চাকরের কী দরকার? ঝি-টি দিয়ে চলে না?'

'চলবে না কেন? কিছু না থাকলেও চলে। তোমার মা-ঠাকুমার তো চলত।'

বিজনবিহারী বলে উঠতে পারতেন, 'তোমার মা-ঠাকুমারও চলত। এখনো একটামাত্র বুড়ি ঝি দিয়েই তোমার মা-র চলে।'

কিন্তু বলতে পারলেন না।

পান্নালাল দাস সম্প্রতি মারা গেছেন। সেই কথা উঠিয়ে কথার বন্যা বহাবেন চারুপ্রভা। বললেন অন্য কথা, 'তোমারও একদা একটামাত্র ঝি দিয়ে চলেছে—'

চারুপ্রভা মুখ বাঁকান, 'সেই সুখস্মৃতি আর নাই তুললে। তাতে তোমার নিজের গৌরব বাড়বে না। একদা তো হাওড়াহাটের শাড়ি পরেও দিন কেটেছে আমার। সেটাই জীবনযাত্রার আদর্শ নয়! ভাত না জুটলে ফ্যান খেয়েও কাটাতে পারে লোকে। তোমার মেয়েই বা কুনো হয়ে বাড়ি বসে থাকে কেন? বেরোতে পারে না? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না?'

'সেটাই বা কী এমন নিরাপদ?'

বলে ফেলেছিলেন বিজনবিহারী।

আর শুনে চারুপ্রভা ঝলকে ঝলকে হেসেছিলেন।

'নিরাপদ? ওঃ! তা পয়সাকড়ি তো আছে, একটা লোহার হারেম বানিয়ে ফেল না। মেয়েকে ভরে রাখতে পারবে।'

এর পর আর কোন কথা?

তখনকার সেই সদ্য বড় হয়ে ওঠা মেয়ে তো এখন প্রস্ফুটিত কুসুম। তবে মায়ের রূপের ধারে-কাছেও লাগে না। বাবার দিক ঘেঁষা চেহারা। তাও চারুপ্রভার হাতে পড়লে ঘসে-মেজে সমাজে তুলতে পারতেন। মেয়ে 'তেলি হাত পিছলে গেলি' বলে পিছলে গেছে।

মেয়ের সম্পর্কে অতএব কোন মূল্যবোধ নেই চারুপ্রভার।

অতএব জিপসি সারা সন্ধ্যা এই তিনতলা প্রাসাদের কোন একখানে একা একা পড়ে, লেখে, গান গায়, রেডিও শোনে, ফ্রীজ খুলে খুলে ঠাণ্ডা জল খায়, এবং ওই মস্তান চাকরগুলোকে শাসন করে, ফরমাশ খাটায়।

বাকি সময় শুয়ে থাকে।

গ্র্যাজুয়েট হওয়া হয়ে গেছে, আর পড়বে না। অধিক উচ্চশিক্ষার প্রতি মোহ নেই তার।

এ হেন জিপসি।

হেলা ফেলা হালকা-স্বভাবের মেয়ে। তবু বিজনবিহারী কেন যে ভয় করেন তাকে!

উনিও বেরোবার আগে মেয়ের ঘরের পর্দা ফেলা দরজার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ান, একটু ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু ডাকেন না।

বরং পাছে টের পায় তাই যাকে বলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেঁটে পার হয়ে যান সেখানটা।

হঠাৎ আজ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গলা শোনা যাচ্ছে খুকুর।

কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। কার সঙ্গে?

বান্ধবী, না বন্ধু?

কী বলছে!

বিজনবিহারী ওর সেই তরল কৌতুকের গলা শুনতে পেলেন, হি হি হি।

'আমাদের বাড়ির তো সবই মজার। বাবা জানে মা মহিলা সমিতিতে যাচ্ছে, আর মা জানে বাবা বোধহয় গুরু আশ্রমে যাচ্ছে। অবশ্য ওটা অনুমান। গাড়ি টাড়ি ছেড়ে দিয়ে যে রকম দীনহীন ভাবে যায়। হি হি হি।'

এই কথা বলছে খুকু! এ কী কথা!

কী ভাবে যে চলে এলেন বিজনবিহারী সেখান থেকে, সে তাঁর অন্তরাত্মাই জানে।

বুকের মধ্যে যেন ধমাস ধমাস করে হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

বাবা জানে না মহিলা সমিতিতে যাচ্ছে, মা জানে বাবা—

কিন্তু খুকু নিজে কী জানে?

অন্য সকলের জানার পরিধি সঙ্কীর্ণ করবার জন্যে বিজনবিহারী নিজের গাড়িতে যান না, পাছে ড্রাইভারের দ্বারা জানাজানিটা বাহিত হয়ে আসে। তবু একথা বলছে খুকু!

কাকেই বা বলছে?

আচ্ছা খুকু কি তাহলে কোনদিন ফলো করেছে বিজনবিহারীকে?

আজও কি করবে?

বিজনবিহারী ঠিক করলেন আজ আর সেখানে যাবেন না, যেখানে নিতান্ত দীনহীন বেশে যান।

ট্যাক্সিটাকে বললেন, 'ময়দান চল।' ঘুরলেন খানিকটা অকারণ, কিন্তু মন ছটফট করতে লাগল। পাঞ্জাবিব ভিতর পকেটের বস্তুটা যেন ঠ্যালা মারছে।

গতকাল তাড়াতাড়ি বেবিয়ে পড়েছিলেন, নিয়ে যাওয়া হয় নি, আজ টাকাটা না দিলেই নয়। অসুবিধেয পড়ে যাবে গৌরী।

অতএব কিছুক্ষণ পরে শশী বড়াল লেনের একটি ছোট একতলা বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে দেখা গেল বিজনবিহারীকে।

বি. বি. দত্তকে যারা জানে চেনে, তারা দেখতে পেলে অবাক হয়ে যেত সন্দেহ নেই।

কড়াটাকে একবার বৈ দু'বার নাড়তে হল না, দরজা খুলে গেল।

একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক দরজাটি খুলে ধরেই অস্ফুটে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন কবল, 'এত দেবী যে?'

'দেরী হয়ে গেল একটু—'

ঢুকে গেলেন বিজনবিহারী।

কথাটা প্রশ্নের উত্তর নয়, তবু আপাতত ওর বেশী কথা মুখে জোগাল না বিজনবিহাবীব।

দরজাটা বন্ধ করে স্ত্রীলোকটিও পিছন পিছন চলে গেল।

জগতে কত রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটে।

না, প্রকৃতির রাজ্যে নয়, মানুষেরই রাজ্যে।

ভেবে দেখলে—মানুষ জাতটাই অবিশ্বাস্য রকমের 'অবিশ্বাস্য'। সে যে কী করতে পারে, আর কী করতে না পারে!

জীব-জগতে সব প্রাণীরই নিজস্ব একটা রীতি-নীতি আছে, নিজস্ব ধর্ম আছে, অবিচল একটা চরিত্র আছে। সাপ সাপেরই মত, বাঘ বাঘের মত। হরিণ, ময়ূর, কুকুর, বিড়াল, প্রজাপতি, টিকটিকি, সকলেই নিজ নিজ

চরিত্রের নির্ভুল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ওদের চরিত্রহীন হবার ভয় নেই। একমাত্র মানুষ নামের প্রাণীটারই নিজস্ব কোন ধর্ম নেই, নেই নিশ্চিত একটা চরিত্র। কাজেই তার সম্পর্কে কোন নিশ্চিন্ততাও নেই।

যে-কোন লোক যে-কোন সময় যাহোক একটা কিছু করে বসতে পারে। তার নিজস্ব বিধানে যেটা অন্যায় অবৈধ উল্টোপাল্টা।

নইলে বিজনবিহারীর মত একজন ভদ্র, শান্ত, ভীরু প্রকৃতির লোক এমন একখানা কাণ্ডের নায়ক হতে পারেন?

কে ভাবতে পারবে বালিগঞ্জ প্লেসের ওই বিরাট তিনতলা অতি-সুসজ্জিত বাড়ির সংসার এবং চারুপ্রভার মত অতি-উজ্জ্বল একখানি স্ত্রীর মালিক বিজনবিহারী দত্ত শশী বড়াল লেনের একখানা পচা পুরনো একতলা বাড়িতে গৌরীবালা নামের নেহাত বাজে চেহারার আর নেহাত সাধারণ বুদ্ধির একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে দ্বিতীয় একটি সংসার পেতে রেখেছেন। আর কে ভাবতে পারবে এই সংসারটিতেই তাঁর সংসার স্বাদের, পরম পরিতৃপ্তির। যেন এটাই আসল।

অথচ কে না বলবে এটা অবৈধ।

কিন্তু বিজনবিহারীর মুখের রেখায় অপরাধীর গ্লানি নেই। অথচ অন্য আর সব কারবারী লোকেদের মতন দোকানে ইনকামট্যাক্সের নাকের সামনে ধরে দিতে দ্বিতীয় একখানা খাতা রাখার কথা ভাবতেই পারেন না বিজনবিহারী। খুব গর্হিত বলে মনে করেন ওই কাজটাকে।

তবে?

মানুষ জাতটা একটা অবিশ্বাস্য রকমের উল্টোপাল্টা জীব কিনা।

বাড়িটা সেই আদ্যিকালের প্যাটার্নের।

ছোট্ট উঠোন, নীচু দাওয়া, দাওয়ার সামনে খান দুই শোবার ঘর ধারের দিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, উঠোনের একধারে করোগেট শেডের নাইবার ঘব-টর। অর্থাৎ শশী বড়াল লেনের একেবারে প্রান্তসীমায় যেমন বাসটি হওয়া উচিত ঠিক তেমন।

দাওয়ায় উঠে সামনে পড়ে থাকা সরু বেঞ্চটাতেই বসে পড়ছিলেন বিজনবিহারী, গৌরীবালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল 'এখানে কেন? একেবারে ঘরেই চল।'

'ঘরে বড্ড গরম না?'

'গরম তা কী?'

গৌরীবালা জোর দিয়ে বলে, 'বাতাস করতে আমার হাত ক্ষয়ে যাবে নাকি?

বিজনবিহারী জানেন, ওই 'ঘরে বসানো' নিয়ে গৌরীর বিশেষ একটা আকুলতা আছে। বিজনবিহারী যদি কোনদিন দশ-পনেরো মিনিটের জন্যেও আসেন, গৌরীবালা ঘরে না বসিয়ে ছাড়ে না। যেন বিজনবিহারী একবার ওই ঘরে ওই অযত্নে পাতা বিছানায় না বসলে গৌরীর সব মিথ্যে।

'তবে চল।'

বলে বিজনবিহারী ঘরে ঢুকে এলেন। ছোট ঘর, তবু তার মধ্যেই ঘরজোড়া এক তক্তপোষ।

এ দেখে বিজনবিহারীর বালিগঞ্জ প্লেসের সেই বৃহৎ ঘরের দু দেয়ালে ঘেঁসে পাতা দু'খানা সিঙ্গল খাটের ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে যায় অতীত যুগের একখানি মাঠসদৃশ খাট।

বিজনবিহারী হেসে হেসে বলেন, 'নাতি-নাতনী হলেও এই চৌকীতেই শুতে পারবে তুমি, কী বল গৌরী? আমার ঠাকুমা যেমন শুতো।'

নাতি-নাতনী?

গৌরীও হেসে ওঠে 'ও বাবা! ততদিন বাঁচব?'

গৌরীর হাসিটা বেশ।

চেহারা সাধারণ, কিন্তু অমার্জ্জিত ভাবের ছাপ নেই। বেশ ঝরঝরে, কাটাছাটা হাসি-হাসি। গৌরীর পরনে একটা ঢলঢলে সাদা সেমিজ, আর একখানা বেগুনী চুড়িপাড় মিলের সাদা শাড়ি। হাতে গাছকয়েক চুড়ি

আর সরু একজোড়া রুলির সঙ্গে বেশ জবরদস্ত একজোড়া শাঁখা। বয়সের পক্ষে চেহারাটা একটু ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ।

সাজের মধ্যে গৌরীর কপালের সিঁদুরটিপটি। বেশ নিপুণ হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরু করে পরা একখানা লুডোর ঘুঁটির সাইজের টিপ একেবারে কপালের মাঝখানে। মাজা-মাজা শ্যামবর্ণ কপালে মানিয়েছে মন্দ নয়।

বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৌরীর পিঠটা একহাতে একটু জড়িয়ে চাপ দিয়ে বলেন, 'বাঁচবে না মানে? বললেই হল?'

অতঃপর বিজনবিহারী সেই ঢাউশ চৌকীটার উপর উঠে বসেন পা মুড়ে গুছিয়ে।

সারাদিনই তো চেয়ারে সোফায় কৌচ কেদারায় পা ঝুলিয়ে বসা, এই একটুক্ষণ সময় পা মুড়ে গুছিয়ে বসার আরাম।

ঘরের দেয়াল বিবর্ণ মলিন, জানলা-দরজা রং-চটা, কিন্তু বিছানাটি সাদা ধবধবে। রঙিন চাদর টাদর নয়, স্রেফ সাদা। ঠিক শোবার মতও নয়, মাথার বালিশ পাশের বালিশ বলতে কিছু নেই, মশারীও নেই ধারে-কাছে, ফর্সা ফরাসের উপর ফর্সা ফর্সা গোটা দুতিন ছোট বড সাইজের তাকিয়া।

তার মানে এটা গৌরীর বেডরুম নয়, ড্রইংরুম।

চৌকীটাই প্রায় ঘরজোড়া, তবু দেয়ালের ধারে ধারে একটা বইয়ের র‍্যাক, একটা পালিশ খসে যাওয়া টেবিল, একটা ছোট্ট কাঁচের আলমারি, ঘর মধ্যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর কিছু খেলনা-পুতুলের সঙ্গে বেশ দামী দামী কিছু খেলনা-পুতুল সাজানো।

টেবিলের ওপর দু একটা বই-খাতা, র‍্যাকেও ব্রাউন পেপারের মলাট দেওয়া কিছু বই সাজানো। মলাট খুললে দেখা যাবে সবই পাঠ্যপুস্তক। স্কুলপাঠ্য।

বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো আছে, কিন্তু পাখা নেই।

লাল শালুর ঝালর দেওয়া একখানা পাখা এনে কাছে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে থাকে গৌরী।

বিজনবিহারী কিন্তু বেশীক্ষণ এ আরাম উপভোগ করেন না, গৌরীর হাত থেকে পাখাটা কেডে নিয়ে· বলেন, 'বোস তো চুপ করে! আমিই তোমায় বাতাস খাওযাই।'

বলে পাখাটা নিয়ে জোরে জোরে নাড়েন যাতে দু'জনেরই গায়ে বাতাস লাগে।

এখন আবার গৌরী ব্যস্ত হয়, 'তুমি আমায় বাতাস করবে? নরকেও ঠাঁই হবে না যে আমার। দাও তো!'...কাড়াকাড়ি চলে।

কাড়াকাড়িতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজনবিহারীরই জিত হয়।

'তোমার সঙ্গে কে পারবে?'

বলে সাদাসিধে একটু মিষ্টি হেসে গৌরী বলে, 'তবে খাও নিজে নিজে হাওয়া, আমি যাই চা-টা নিয়ে আসি।'

বলে চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'সন্ধ্যেটা তো সবই পুইয়ে এলে চায়ের সঙ্গে খাবে তো কিছু?'

দোকান থেকে ফিরে বাড়িতে টাইম-মাফিক চা-টা বিজনবিহারীকে খেতেই হয়। অনিয়ম চারুপ্রভা বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনিও খান এসময়।

সকাল বিকেল দু'বেলা মেয়েকে এবং কর্তাকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে, কতকগুলো কেক্, পেস্ট্রী, স্যাণ্ডুইচ, বিস্কুট এবং তৎসহ কিছু কাজু-টাজু তাদের পেটের মধ্যে চালান করিয়ে দেওয়াটা চারুপ্রভা গৃহিণীর অবশ্যকরণীয় বলে মনে করেন। কাজেই বিকেলের চা-টা খেতেই হয় বাড়িতে।

তবু বিজনবিহারীর শশী বড়াল লেনের কয়লার উনুনে জল গরম করা মোটামুটি পেয়ালায় রাখা একটু চা না খেলে চলে না। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিকও কিছু।

গৌরীর কাছে খাওয়া বলতে তো শুধু এই সময়টুকুই! এটুকুও যদি ও না পায়, সেটা ওর প্রতি রীতিমত

অবিচার করা হয়। তাছাড়া—এখানে বিজনবিহারী খাবার পাত্রে হারানো অতীতকে ফিরে পান।

গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতি-প্রশ্ন করলেন বিজনবিহারী, 'কী আছে?'

'আমার কাছে আর কী থাকবে?' গৌরী একটু বিষণ্ন হাসি হাসে, 'ভাগ্য তো করে আসিনি। তুমি মুড়ি ভালোবাসো বলে বিকেলে মুড়ি আর ঝালছোলা নিয়েছিলাম, আর ঘরে চারটি কলাইয়ের ডালের ফুলুরি ভেজেছিলাম—'

'চমৎকার! চমৎকার! অতি উপাদেয় হবে,' বিজনবিহারী বলে ওঠেন, 'এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, তুমি বললে বলে টের পাচ্ছি, দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। নিয়ে এসো চটপট।'

গৌরী একটু অভিমান-অভিমান মুখে বলে, 'এখন নিয়ে এসো চটপট।

আর সন্ধ্যে থেকে আমার একেবারে যা প্রাণ ছটফট করছিল।'

বিজনবিহারী মৃদু হেসে বলেন, 'এখনো প্রাণ ছটফট? বয়েস কত হল?'

'আহা! কী কথার ছিরি! দুর্ভাবনা হয় না বুঝি?'

'দুর্ভাবনা আবার কিসের?'

'নয়ই বা কিসের? জগতে রাতদিন কত কী ঘটছে!'

বিজনবিহারী বড় একটা ও-বাড়ির কথা এ-বাড়িতে বলেন না, তবু আজ বলে ফেললেন। বললেন, 'জানো গৌরী, ওখানে যদি আমি সারারাতও না ফিরি, চারু ভাবনা-টাবনা করবে না।'

গৌরী বিস্ময় প্রকাশ করে না, সমালোচনার দিকেও যায় না, বরং ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'না করবে না। বলেছে তোমাকে। মেয়েমানুষের প্রাণ, ভাবনা না করে থাকতে পারে বুঝি?'

'সব মেয়েমানুষের মধ্যেই 'মেয়েমানুষের প্রাণ' থাকে না গৌরী।'

'থাকে না বৈ কি। থাকতে বাধ্য। তবে কেউ কেউ হৈ-চৈ করে বলে মরে, কেউ শক্ত হয়ে বসে থাকে, প্রকাশ করে না।'

'তা হবে।'

বলে পকেট থেকে লাইটার বার করে সিগারেট ধরান বিজনবিহারী।

গৌরী বেরিয়ে যাবার সময় বলে যায়, 'খুব চটপট হবে না কিন্তু, তেল জ্বলিয়ে ফুলুরি ক'টা আর একবার ভেজে নেবো। ন্যাতা হয়ে গেছে।'

বিজনবিহারী কেমন অভিভূতের মত বসে থাকেন। ওঁর মনে হয় যেন বহুযুগের ওপার থেকে মাকে কথা বলতে শুনলেন।

ডালের বড়া বাবার ভারী প্রিয় ছিল।

অনেক সময় বাসি বড়াও রেখে দিতেন মা, সকালে বাবাকে চায়ের সঙ্গে খেতে দিতেন আর একবার ভেজে। আর ঠিক এই ভাবে বলতেন, 'দাঁড়াও আর একবার ভেজে দিই, ন্যাতা হয়ে গেছে।'

আচ্ছা গৌরীর গলার স্বরটা কি বিজনবিহারীর মায়ের মত? তা নইলে ওর কথা শুনলেই হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় কেন কোথায় যেন শুনেছি। কেন মাকে মনে পড়ে যায় হঠাৎ?

সেই অনেক অনেক দিন আগে, প্রথম দিন তো ওই গলার স্বরেই আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বিজনবিহারী।

কার্যগতিকে হঠাৎ নবদ্বীপে যেতে হয়েছিল বিজনবিহারীকে, আর সেই সময় কিসের যেন একটা মেলা বসেছিল 'পোড়া মা' তলায়।

মেলার ভীড় কাটিয়ে চলে আসছিলেন বিজনবিহারী, হঠাৎ কানে এল, 'খোকা, অ খোকা। তুই আবার কোন দিকে গেলি?'

বিজনবিহারীর মধ্যে সহসা যেন একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠলো।...

বিজনবিহারীর মনে হল কোনখানে বসে মা ডাকছেন তাকে। মা তো কোনদিন 'বিজন' কি 'বিজু' বলতেন না, বলতেন 'খোকা'।

সেই স্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন বিজনবিহারী। মেলার ভীড়ের মধ্যে অমন কতজন কত কাউকে ডাকে, কে কার দিকে তাকায়। ওই আর্ত মেয়ে-গলাটা যে তখনো ডেকে চলেছে, 'খোকা! অ খোকা! এই লক্ষীছাড়া ছেলে তো দেখছি আমায় আচ্ছা জ্বালাল...' কে-ই বা শুনছে।

বিজনবিহারী ভেবেছিলেন, কোন মায়ের ছেলে হারিয়ে গেছে ভীড়ের মধ্যে। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন মা নয়, একটা মেয়ে মাত্র। কুমারী মেয়ে।

একখানা সবুজ ডোড়া শাড়ি আর একটা টুকটুকে লাল ব্লাউজ পরা ডাগর-ডোগর স্বাস্থ্যবতী গ্রাম্যমেয়ে।

বিজনবিহারী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে ওঠেন, 'কে হারিয়েছে তোমার?'

'বালাই ষাট হারাবে কেন?' মেয়েটা ভ্রূভঙ্গী করে বলে, 'দেখতে পাচ্ছি না। আমার ছোটভাই খোকা। একটু আগে পয়সা নিয়ে ওই দিকে কোথায় গেল—'

বিজনবিহারী সেই অনির্দিষ্ট 'ওদিক'টায় তাকিয়ে বললেন, 'কেমন দেখতে তোমার ভাই?'

মেয়েটা এ প্রশ্নকে খুব একটা গ্রাহ্য না দিয়ে নিজেই এগোতে এগোতে বলে, 'বলে চেহারা বোঝানো যায়? আমার ভাই আমারই মত।'

বিজনবিহারীর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতেই হয়, ভীড় ঠেলে ঠেলে সেই 'খোকা'কে খুঁজে বার করলেন তিনি।

যেদিকে ধামা কুলো ঝুড়ি চুপড়ির হাট, সেই দিকে একধারে বসে পাঁপরভাজা খাচ্ছিল খোকা।

বিজনবিহারীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীও গিয়ে পৌঁছেছিল, ভাইকে দেখতে পাওয়া মাত্রই সে কোন কথা না বলে টেনে একটা চড় কসায় ঠাশ করে?

বছর আষ্টেকের ছেলেটা আচমকা এমন মার খেয়ে প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপরই রুখে উঠে বলল, 'মারলি যে?'

'বেশ করেছি মেরেছি, লক্ষীছাড়া ছেলে! আমি খুঁজে খুঁজে মরছি আর তুমি এই কর্ম করছ? পাজী ছেলে।'

বসাল পার একটা চড়।

বলাবাহুল্য পাঁপর ভরা মুখেই কেঁদে উঠল।

'দিদি আমায় মারলি?'

এবার দিদির পালা।

'তুই আমায় এত ভোগালি কেন?' বলে সে-ও কেঁদে ফেলল।

'আহাহা মার-টার কেন,' কান্নাকাটি কেন, বলে বিজনবিহারী তাদের ভীড়ের পাশ কাটিয়ে বার করে আনলেন।

টের পেলেন না অদৃশ্য কোন গ্রহের চক্রান্তে সেই মুহূর্তে নিজে নাগপাশে পড়ে গেলেন।

গ্রহের চক্রান্ত ছাড়া পথে যেতে যেতেই ছেলেটা বমি শুরু করবে কেন? এবং শেষ পর্যন্ত বিজনবিহারীকে দিয়েই শেষকৃত্য করিয়ে নেবে কেন?

গৌরী আর গণেশ মা-বাপমরা দুই ভাই-বোন ঠাকুমার কাছে মানুষ হচ্ছিল, কিছুদিন আগে ঠাকুমা মরেছে। ছোটভাইটাকে বাঘিনীর মত আগলে রাখছিল গৌরী, রাখতে পারল না।

পাড়ার লোকজন কেউ তেমন গা করে উঁকি মারল না। শুধু কলেরা রুগীর বাড়ি বলেই নয়, বেশী সহানুভূতি দেখাতে গেলেই পাছে ওই নির্বান্ধব নিঃসহায় মেয়েটা ঘাড়ে পড়ে যায়, এ ভয়ও ছিল।

অতএব ওই নিঃসহায় মেয়েটা মাটিতে লুটোপুটি করে কাঁদতে লাগল, 'ওরে খোকা, আমি যে তোকে জীবনে কখনো মারি নি। একদিন মারলাম বলে তুই চলে গেলি?'

এ দৃশ্যের দর্শকের আসনে শুধু বিজনবিহারী, কলকাতার কাজকর্ম ফেলে পুরো দুটো দিন এদের নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন। চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, বিজনবিহারী এমন দৈবপ্রেরিত হয়ে এসে না পড়লে কিছুই হত না, তবু সব কিছুই বৃথা হল।

কিন্তু সে যা হল তা হল, বিজনবিহারী এখন এই দীনদুঃখী শোকার্ত মেয়েটাকে একলা ফেলে রেখে ফিরে যান কী করে? অথচ নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

জিপসি তখন বছর খানেকের মেয়ে এবং চারুপ্রভা তখন ধাপে ধাপে উঠেছেন। বাড়িতে নিয়ে এসে ওর ইতিহাস বলে চারুপ্রভার কাছে গছিয়ে দেওয়া?

ও বাবা!

ভাবাই যায় না।

তাছাড়া—যদিই তেমন অসমসাহসিক কাণ্ড করতে পারেনও বিজনবিহারী, চারুপ্রভা কি মনে রাখবে ও একটা ভদ্র গেরস্থঘরের মেয়ে? নির্ঘাৎ ওকে বাচ্চার ঝি বানিয়ে ছাড়বে!

বিজনবিহারী অন্য চিন্তায় গেলেন।

ভাবলেন কিছুদিন ওকে সাবধানে কোথাও রেখে, দেখে-শুনে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলবেন।

সাবধানে রাখতেই অত খুঁজে খুঁজে শশী বড়াল লেনের ওই বাসাটা ভাড়া করে ফেললেন, এবং একটা ঝি রেখে দিলেন। কিনে কিনে জড়ো করলেন একটা সংসারে যা লাগে, একটা মেয়ের যা লাগে।

কিন্তু মনের মত পাত্র কোথায়?

অমন গুণের একটা মেয়েকে তো যা-তা ছেলের হাতে সঁপে দেওয়া যায় না।

বিজনবিহারী পাত্র খুঁজছেন।

মানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, আর ভাবছেন গৌরীর ভাগ্যে যেন একটি মহাদেব তুল্য বর জোটে।...কিন্তু—ইত্যবসরে গৌরী নামের মেয়েটা কৃতজ্ঞতায় কৃতজ্ঞতায় মরে বসে আছে।

বিজনবিহারীর এ খবর জানার কথা নয়, তিনি শুধু উপযুক্ত পাত্র খুঁজে খুঁজে জেরবার হচ্ছেন।

অনেকগুলো দিন মাস বছর কাটিয়ে ফেলে বিজনবিহারী যখন ওকে বাড়ি ছাড়া করবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছেন, তখন হঠাৎ একদিন গৌরী আছড়ে পড়ে কেঁদে ঘোষণা করল, শশী বড়াল লেনের এই স্বর্গধাম থেকে এক পা-ও কোথাও যাবে না।...বিজনবিহারী যদি তবুও ওকে তাড়াবার ফন্দী করেন, তাহলে গৌরী নিজেই বিজনবিহারীর পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে যাবে, বিষ খেয়ে অথবা গলায় দড়ি দিয়ে।

কান্না-টান্না সইতে পারে না বিজনবিহারী তাই বিচলিত হয়ে গিয়ে 'তুমি আমার পায়ের বেড়ি গৌরী? তাই জন্যেই আমি তোমায়—' বলে তাকে টেনে নিয়ে আদর-ফাদর করে একাকার কবে বসলেন।

এরপর আর পাত্র খোঁজার কথা ওঠে না। বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

গৌরী বেশ কিছুকাল যাবৎ 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় তার সাধের স্বর্গধামে অবস্থান করল, কিন্তু খুব অধিক দিন চলল না সেটা।

বিজনবিহারীর অনবরত আসা-যাওয়া এবং সমস্ত সময়ই উপঢৌকন আনা, পাড়ার লোকের দৃষ্টিকে পীড়িত করল। লোকটা এ পাড়ায় পরিচিত নয়, আসল নামও কেউ জানে না, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় পয়সাকড়ি আছে।

তবে?

একটা বয়স্থা কুমারী মেয়েকে এইভাবে পুষে রেখে দিয়ে আসা-যাওয়ার অর্থটা কি, বোঝে না কেউ? ভদ্রপাড়ায় এসব চালাতে দেওয়া চলবে না। পাড়াটা বেওয়ারিশ নয়।

বেওয়ারিশ নয়, কাজেই পাড়ার দায়িত্বশীল ওয়ারিশগণ একদিন ওই আসা-যাওয়ার পথের ধাবে ওৎ পেতে বসে থেকে চেপে ধরলেন অজানা-অচেনা এই দুশ্চরিত্র লোকটাকে।

তাঁদের দাবি সামান্য।

হয় ওই পাপের মূল সমেত এপাড়া থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান বিজনবিহারী, নচেৎ ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করুন।...বিজনবিহারীকে বলতেই দিল না তিনি বিবাহিত এবং মেয়েটাব ইতিহাস কি।

সমূলে উচ্ছেদ হওয়া বড় শক্ত। কলকাতায় তখন আর ইচ্ছে করলেই ভাড়াটে বাড়ি জোটে না। তাছাড়া

ওই বুড়ি ঝিটা? ও না-থাকা মানেই তো চোখে অন্ধকার। অন্য পাড়ায় গেলে ওকে হারাতে হবে। তাহলে?

পরামর্শটা গৌরীই দিল।

মাথায় খানিকটা সিঁদুর লেপে দিলেই যদি ওই ক্ষেপে যাওয়া লোকগুলোকে শান্ত করা যায় তো তাই করা হোক। আট আনায় এক থান সিঁদুর কিনে নিয়ে এসে দাও ঢেলে।

বিজনবিহারী অবশ্যই এমন অদ্ভুত প্রস্তাবকে এক কথায় মেনে নেননি। কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর ক্ষয় হয়, সে জায়গায় মানুষ তো কোন ছার।

ক্ষয় হয়ে যাওয়া পাথর অবশেষে একদিন সিঁদুর কিনে নিয়ে এলো, দেগে দেবে বলে!

কিন্তু হঠাৎ মন ঘুরে গেল বিজনবিহারীর। বলে বসলেন—'তাই যদি করতে হয় তো একটা দেবস্থানে গিয়েই হোক। তোমার তো এই প্রথম সিঁদুর পরা?'

হল তাই।

কালীঘাটে নয়, কালীঘাটের নামেই যেন বিয়ে-বিয়ে গন্ধ। দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলেন বিজনবিহারী মিথ্যে সিঁদুর দিতে মেয়েটাকে। বেশ বেড়ানোও হবে। তারপর?

তার পরের ঘটনা?

তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত ।

তার পরের ঘটনা অতি প্রাঞ্জল। সেই মিথ্যে সিঁদুর কখন কোন ফাঁকে যে সত্যি হযে উঠল, দুজনের একজনও খেয়াল করেনি!

এক সময় দেখা গেল দুজনেই ওই মিথ্যেটাকে পরম সত্যি বলে গ্রহণ করে বসে আছে।

আছে।

তদবধিই আছে।

ঋতুচক্রের আবর্তনে গৌরী নামের সেই সবুজ ডোরা শাড়ি পরা মেয়েটা দিব্যি 'গিন্নী' হয়ে গেছে।

প্রথমদিকে ও বিজনবিহারীকে 'আপনি' করে কথা বলত, বিজনবিহারীই শোরগোল তুলে আপত্তি করলেন। 'আপনি' বললেই কেমন পর পর লাগে। এখন যখন এতটা ঘনিষ্ঠতা এসে গেছে।

তবে আর কী।

যাতে বর বর লাগে তাই বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেল গৌরী।

অভ্যাসটা পাকা হল একবার নবদ্বীপে গিয়ে দিন চারেক থেকে।

'কাজের খাতিরে' যেতে হয়েছিল বিজনবিহারীকে, গৌরী গেল জন্মভূমিকে আর একবার দেখতে।

চারুপ্রভাকে অবশ্য বলতে হয়েছিল 'আসানসোল যাচ্ছি।'

নবদ্বীপ শুনলে চারুপ্রভা নাক তুলে প্রশ্ন কববে নবদ্বীপে আবার ভদ্রলোকের বাব বার কোন কাজ থাকতে পারে?

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই বিজনবিহারীকে 'কাজের খাতিরে' বাইরে যেতে হয়েছে, যেমন আসানসোল, রাঁচী, দুর্গাপুর, টাটা। এখনো হয় মাঝে মাঝে।

তবে এখন আর চারুপ্রভা প্রশ্ন তোলেন না। পুরুষমানুষ কাজের খাতিরে বাইরে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। সভ্যতা।

'ঘরকুনো' পুরুষ চারুপ্রভার দু'চক্ষের বিষ।

শশী বড়াল লেনের এই ছোট্ট বাসাটা গৌরীর কাছে স্বর্গধাম, তবু মাঝে মাঝে ওই রেলগাড়ী চড়ে বাইরে চলে গিয়ে দু'দশদিন কাটিয়ে আসা, যেন বৈকুণ্ঠলোকের স্বাদবাহী।

কিন্তু গৌরী বুদ্ধিমতী।

গৌরী আত্মস্থ।

গৌরীকে যে মানায়, গৌরী শুধু সেইটুকুই করে, যে মানায় না, তা শত লোভনীয় হলেও গ্রহণ করে না।

বিজনবিহারীর তো টাকার অভাব নেই, বিজনবিহারী দামী দামী শাড়ী-গহনা দিতে এসেছেন গৌরীকে, গৌরী হেসে বলেছে, 'ও যাকে মানায়, তাকেই দাও গে।...আমার এই সংসারে যেমন মানায়, তেমনি এনো। এই বাসায় থেকে যদি নিত্যনতুন দামী দামী শাড়ী-গয়না পরি লোকে ফের ভাববে বাবু 'মেয়েমানুষ' রেখেছে।'

তাছাড়া এখন তো আবার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে।...

হ্যাঁ, ছেলে-মেয়ে গোটা তিনেক এসে গেছে।

গৌরীর তো সেই খেলার সিঁদুরটাই জীবনের আসল সিঁদুর। তার কাছে ওটা পরম সত্য। কাজেই ছেলে-মেয়ে এসে যাওয়াকে গৌরী গর্হিত বলে ভাবেনি। এবং চারুপ্রভার মত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রেও বিশ্বাসী নয় সে।

ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত ডুরে শাড়ি, রঙিন শাড়ি ছেড়েছে গৌরী।

বলে, 'মা সাজগোজ করছে, এটা বড় দৃষ্টিকটু।'

এমনিতেই তো বাপের সম্পর্ক ওদের বহুবিধ কৌতূহল, প্রশ্ন।

বাবা কেন অন্য জায়গায় থাকে? ইস্কুলের আর সব ছেলেমেয়েদের বাবা তো একই বাড়িতে থাকে। বাবা যেন কুটুম্।

এই রকম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে গৌরীকে।

গৌরীর অবশ্য গল্প বানানোর ক্ষমতা অসীম।

বিজনবিহারীর অগাধ কাজের ফিরিস্তি দিয়ে দিয়ে তাদের বুঝিয়ে রেখেছে গৌরী। তাছাড়া নবদ্বীপের ইতিহাসটিও শাখা পল্লবিত করে বলে বলে ওদের কাছে ওদের বাপকে দেবতা করে রেখেছে।

বিজনবিহারীর ভেবে আশ্চর্য লাগে চারুপ্রভার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে বিজনবিহারীকে মেয়ের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা।

মনটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

খুকু তখন ও-কথা বলল কেন?

খুকু বিজনবিহারীর এই দ্বিতীয় সংসার-জীবনের কথা জানে?

যদি জানে, তো কী করে জানল?

একটা থালার ওপর বসিয়ে ফুলুরি, চা, আর তেলমাখানো মুড়ির বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকল গৌরী।

বলে উঠল, 'কী গো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'ঘুমিয়ে?'

'তা সেই রকমই তো দেখছি, হাতের সিগ্রেটটা তো পুড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, আরটু হলেই ছ্যাঁকা লাগত আঙুলে।'

বিজনবিহারী মৃদু হেসে বলেন, 'ঘুম নয়, স্মৃতি!'

'স্মৃতি!'

'হ্যাঁ, হঠাৎ সেই নবদ্বীপের মেলার কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা।'

গৌরী চৌকীর ধারে একটা টুল টেনে এনে থালাটা নামিয়ে রেখে বলে, 'ভাবছ তো কী কুক্ষণেই সেই দেখাটা হয়েছিল!'

'কুক্ষণ?'

বিজনবিহারী গভীর গলায় বলেন, 'না গৌরী, ভাবছিলাম কী শুভক্ষণই ছিল সেটা আমার জীবনে! এই শশী বড়াল লেনের বাড়ীতে, তোমার সঙ্গ-সাহচর্যে আমি যেন আমার নিজেকে খুঁজে পাই, যে আমি তালতলার দত্তবাড়ির ছেলে—'।

গৌরীও একবার গভীর চোখে তাকায়। তারপর বলে 'নারায়ণ বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেয়ে সব থেকে তৃপ্তি

পেয়েছিলেন, সেটা নারায়ণের মহত্ত্ব।...এখন ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে খাও তো। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বিজনবিহারী মুড়ির বাটি থেকে একথাবা তুলে নিয়ে বলেন, 'একা খাব?'

'খাও না বাপু। আমাদের তো হয়ে গেছে একবার।'

'উহুঁ তোমার হয়নি...'

গৌরী হেসে ফেলে।

'বেশ বাপু হয়নি তো হয়নি। ফুলুরি ভাল লাগছে?'

'ভাল লাগবে যদি তুমিও একসঙ্গে'—বলে গৌরীর হাতে দুটো ফুলুরি তুলে দিয়ে, নিজে একটাতে কামড় দিয়ে বলেন, 'অপূর্ব!'

আচ্ছা চারুপ্রভা যদি এই দৃশ্যটি দেখতে পেতেন?

একটা দীনহীন ঘরের মধ্যে জারুলকাঠের একটা ঢাউশ চৌকিতে বসে বিজনবিহারী কলাইডালের ফুলুরিতে কামড় দিয়ে পরিতৃপ্তিতে চোখ মুদে বলছেন 'অপূর্ব'!

চারুপ্রভা কি তদ্দণ্ডে বিষ খেতে যেতেন?

অথবা খেতে হত না, এমনিতেই হার্টফেল করতেন?

নাকি বিজনবিহারীকেই শক্ত কায়দায় ফেলে মেণ্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দিতেন?

কী যে করতেন ভাবা যায় না।

দেখতে পান না এই রক্ষে।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরকাল অদ্ভুত এক কৌশলে দৃশ্যটাকে বিজনবিহারী তাঁর পরিচিত সমাজ থেকে আড়াল করে রেখে আসছেন।

চারুপ্রভার একটা অবজ্ঞাসূচক ধারণা আছে, বোধহয় কোন গুরু-ফুরুর বুজরুকির গাড্ডায় পড়ে আছে লোকটা, চারুপ্রভার ব্যঙ্গহাসির সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

গৌরী হেসে বলে, 'তোমার যেন সেই রূপকথার সুয়োরাণীর মত পদ্মপাতা পেতে নুন-পান্তা খাবার সাধ। বাড়িতে তোমার কত ভাল খাবার গড়াগড়ি মাড়ামাড়ি, আর তুমি এখানে এই তুচ্ছ বস্তু—'

'গৌরী! বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার কাছে বাড়ি বলতে এটাই। এখানে এসে বসলেই যেন আমি নিজেকে খুঁজে পাই। মনে বিশ্বাস আসে আমি সেই তালতলার দত্তবাড়ির ছেলে।...আমার মা-র ঘরের দেয়ালে মায়ের হাতের বোনা ঠিক এমনি একটা কার্পেটের ছবি টাঙানো থাকত, জান? ওই যে গাছের ডালে দুটো পাখি, তলায় লেখা 'দুটি পাখি দুটি প্রাণ, সুখে রেখো ভগবান'। আচ্ছা তুমি তো সেটা দেখনি, ঠিক তেমনি বোনা বুনলে কী করে? আশ্চর্য!'

গৌরী হেসে ফেলে, 'ও মা' এ তো ছকে বাঁধা প্যাটার্ন, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ঘর গুণে কাজ তো, ঠিক একরকমই হয়।... আসলে ওটা আমার মায়ের আমলের, বাক্সের তলার দিকে রেখে দিয়েছিল মা, হয়তো পরে বুনবে বলে। আর সময় পায় নি।...আমার দেখে মন কেমন করেছিল, তাই বসে বসে বানিয়েছিলাম।'

'তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্যের একটা আশ্চর্য মিল আছে গৌরী। তোমারও ছেলেবেলায় মা গেছে, আমারও—'

গৌরী আস্তে বিজনবিহারীর হাঁটুর উপর একটা হাত রাখে। ওই হাতের ছোঁওয়াটুকুর মধ্য দিয়েই যেন প্রবাহিত হয়ে আসে ভালবাসা সহানুভূতি শ্রদ্ধা।

গৌরী মনে-প্রাণে জানে বিজনবিহারী তার স্বামী, তবু গৌরী নিজেকে অনেক নীচেয় রেখে ভাবে। যেন বিজনবিহারী এক দূর আকাশের তারা, আপন মহত্ত্বে মাটিতে নেমে এসেছেন তৃণখণ্ডটুকুকে দয়া করতে।

গৌরী এত কিছু লেখাপড়া জানে না যে এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নিজেকে বুঝবে, অথবা বিজনবিহারীকে ঠিক অনুভব করবে, তবু সহজাত অনুভূতিতে যেন অনেকটা বুঝতে পারে।

বিবাহিত জীবনে যে সুখী নয় লোকটা, এত টাকা রোজগার করে, ধনবান নাম অর্জন করেও যে ভিতরে ভিতরে কাঙাল, এটা বুঝতে পারে গৌরী।

'এদের দেখছি না যে ?'

খাওয়ার শেষে হাত ধুয়ে বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৌরীর আঁচলটায় একপ্রান্তে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বলেন, 'এদের দেখতে পাচ্ছি না যে?'

এই একটা ছেলেমানুষী আছে বিজনবিহারীর, ওই শাড়ির আঁচলে হাত মোছা। ছেলেবেলার স্মৃতিতে দৃশ্যটা যেন জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। বাবা ভাবত বিজুটা বাচ্চা, ও কিছু বুঝতে পারে না, তাই কাজে বেরোবার সময় খাওয়ার পরের ভিজে হাতটা মায়ের শাড়িতে মুছে নিত। মা চাপাগলায় বলত, 'এই যা! বাইরের কাপড়ে ছুঁয়ে দিলে তুমি আমায়! মায়ের রান্নাঘরে কাজ রয়েছে এখনো—'

বাবা হেসে বলত, 'তবে গঙ্গাজল মাথায় ছিটোওগে, মেথরে ছুঁয়েছে যখন—'

এই সব বাক্য-বিনিময়ের মধ্যে মা-বাবার মধ্যে যে দৃষ্টি-বিনিময় হত, সেটা যে অন্য আর সকলের সঙ্গে পৃথক তা ওইটুকু ছেলেও বুঝে ফেলত। তাই অন্যমনস্কের ভান দেখিয়ে আজেবাজে খেলা খেলতে খেলতে আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখত পাকা ছেলেটা।...

দাম্পত্য সুখের এই সব ছবিই বিজনবিহারীর ধারণার জগতে ছিল।

চারুপ্রভা তাঁকে সেই ছবির রাজ্য থেকে টানতে টানতে বহু বহু দূরে নিয়ে চলে গেছেন, যেন কর্তিত বৃক্ষকাণ্ডের মত।

বিজনবিহারীর প্রায়ই এই তুলনাটা মনে আসে।

বৃহৎ একটা গাছ, মাটির নীচে ছিল গভীর শিকড়, তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে কাঠ চেরাইয়ের আড়তে। ইচ্ছে মত সাইজে কেটে ছেঁটে র‍্যাঁদা ঘষে প্লেন করবে তাকে, পালিশ করবে।

তার মানে ওরা ভাবছে ওই রাফ্ গুঁড়িটাকে সুন্দর চেহারা দেবে।

চারুপ্রভাও বলেন, 'কী ছিলে আর কী করে তোলা হয়েছে তোমায় ভাবো। ভেবো না শুধু পয়সা রোজগার করারই গুণ। এই তো তোমার মামারা তো খুব পয়সাওলা, তাকিয়ে দেখেছ তাদের বাড়ি? এখনো কর্তারা সকলের সামনে গামছা পরে বসে তেল মাখেন, গিন্নীরা পুরুষ দেখলেই ঘোমটা দেন। এখনো দালানে পিঁড়ে পেতে কাঙালী-ভোজনের মতন লাইন দিয়ে খেতে বসে সবাই, কাচের বাসন ভেঙে যাবার ভয়ে কলাই-করা গেলাসে চা খায়। তা হলেই বোঝ পয়সাটাই সব নয়।'

বিজনবিহারী বলতে পারেন না, 'সে তুমি যাই বল, মামার বাড়ীতে গেলে এখনো আমার খুব ভাল লাগে।' বিজনবিহারী সুন্দরী চারুপ্রভার ব্যঙ্গতিক্ত সূক্ষ্ম হাসিটাকে বড় ভয় করেন।

অতএব স্বীকার করতেই হয়, চারুপ্রভাই তাকে দশের একজন করে তুলেছেন।

ছেলেদের কথা তুলতে গৌরী বলল, 'দেবু তো কোন বন্ধুর বাড়ি পড়তে গেছে, মিঠুর কাল পরীক্ষা তাই পড়া করছে, আর মুনমুনটা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

বিজনবিহারী যেন বড় আহত হন।

যেন একটা লোকসান হয়ে গেল তাঁর। বললেন, 'এত শীগগির ঘুমিয়ে পড়ল?'

'দুপুরে একটু শোয় না, দস্যিবৃত্তি করে বেড়ায়, আমিও তুমি আসছ না দেখে ঘর-বার করছি, কোন ফাঁকে মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'খাবে না?'

'রাত্তিরে তুলে খাওয়াব।'

'মিঠুর এবার কোন ক্লাস হবে?'

গৌরী হেসে ফেলে বলে, 'হবে ছেলে দেব ভাত, নাম রাখব রঘুনাথ! এটা তো হাফ ইয়ার্লি না কী বলে তাই। শীতকালের পরীক্ষায় ক্লাসে ওঠাওঠি। তখন ক্লাস টেন ছেড়ে এগারো ক্লাসে উঠবে। যদি পাস করে।'

'কেন, কখনো তো ফেল হয় না, ফার্স্ট সেকেণ্ড হয় তো।'

'তা হয় বটে।' গৌরী হাসে, 'মুখ্যু মায়ের বিদ্বান মেয়ে হবে।'

'পাস না করলেই যে মুখ্যু হয় তা নয়', বিজনবিহারী বলেন, 'তা এত পড়া, একবারও এল না?'

গৌরী অপ্রতিভ হাসি হেসে বলে, 'আমিই মানা করেছিলাম। আজ যেন মনে হল তোমার মনটা ভাল নেই, অন্যমনা মতন, তাছাড়া—রাতও হয়ে গেছে, তাই ব্যস্ত করতে বারণ করলাম।'

বিজনবিহারী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'এতটা দেখতে পাও তুমি গৌরী? আজ আমার মনটা ভাল নেই একথা তো জানতে দিইনি—'

হেসে ফেলে গৌরী বলে, 'সবই কি আর জানিয়ে দিলে তবে জানতে হয়?'

বিজনবিহারী গভীর গাঢ় গলায় বলেন, 'সত্যিই আজ মনটা ভাল নেই গৌরী! মনটায় হঠাৎ একটা খটকা লাগল—আচ্ছা বলব কাল। আমার ওই রাজকন্যে মেয়েটা যে কী টাইপের, বুঝতেই পারি না। কী যে বলে কী যে করে, কাদের সঙ্গে মিশছে তাও ঠিক জানি না। মা তো কিছুই দেখে না।'

গৌরীর মনে হয়তো প্রশ্ন অনেক ওঠে, কিন্তু গৌরী সমালোচনার সুরে কথা বলতে জানে না, অথবা বলতে রাজী নয়। তাই শান্ত গলায় বলে, 'লোকজন চাকর দাসী তো অনেক। মা আর আলাদা করে কী দেখবে? যাক, রাজকন্যেটির বিয়ে দিয়ে দাও না একটি রাজপুত্তুর যোগাড় করে।

'পাগল হয়েছ? ওটা হচ্ছে মিসেস চারুপ্রভা দত্তর বিজনেস?

'বাঃ, পাত্তর খুঁজবে তো তুমি?'

'তুমি এখনো পঞ্চাশ বছর আগের যুগে পড়ে আছ গৌরী। ওসব আজকাল আর বাবাদের দায়িত্ব নয়।'

গৌরী একটু আবদেরে গলায় বলে ওঠে, 'তা আমি যখন পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ তখন আমার মেয়ের সেই রকমই হোক, মেয়ের বাপ পাত্তর খুঁজে আনুক।'

'বল কী? এক্ষুনি?'

'বাঃ এক্ষুনি কী, ষোলয় পা দিয়েছে।'

'ও তো এখন নেচে বেড়াবার বয়েস।'

'না না, সে সব আমার ভাল লাগে না বাপু। ষোল কি কম বয়েস নাকি? এই তো বয়েসকাল। বেশি পাকা হয়ে গেলে কি এক গাছের ডাল আর এক গাছে জোড়া লাগে?'

বিজনবিহারী একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেন, 'যে ডাল জোড়া লাগবার জাতের নয়, তাকে কাঁচায় জুড়ে দিলেও কিছু লাভ হয় না গৌরী। তা যাক, তোমার যখন এক্ষুনি শাশুড়ী হবার শখ, তখন পাত্র দেখতে হয়।'

'আহা আমার যেন শাশুড়ী হবার বয়েস হয়নি?' গৌরী বলে, 'দেবু যদি মেয়ে হত, এতদিনে হতাম না শাশুড়ী? পঁয়তাল্লিশ বছর পার করতে চললাম।'

'আচ্ছা খুব বুড়ি হয়ে গেছ, মেয়েটাকে ডাকো একটু দেখে যাই।'

গৌরী ডাক দেয়, 'মিঠু এদিকে আয়।'

মিঠু নামের ষোলর পা দেওয়া মেয়েটা লজ্জিত মুখে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটার মুখটাই লজ্জা-লজ্জা।

বিজনবিহারী সস্নেহে তার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'পড় ভাল করে। তোমার মায়ের খুব পড়ার সাধ ছিল, হয়ে ওঠেনি। কিছু চাই-টাই, বল তাহলে, কাল নিয়ে আসব।'

মিঠু মাথা নেড়ে বলে, 'না চাই না কিছু, সবই তো আছে।'

বিজনবিহারী হেসে ওঠেন, 'ঠিক মায়ের মত প্রকৃতি হয়েছে। চাই না কিছু। সবই তো আছে। আমার কিন্তু কাল একটা জিনিস আনতে ইচ্ছে আছে।'

'ওমা, কি আবার?'

'এখন বলব না। কাল আনলে দেখতে পাবে।'

বিজনবিহারী দাওয়া থেকে নেমে উঠোনে পা দেন। আনমনা গলায় বলেন, 'এই তো এতক্ষণ দিব্যি আরামে কাটল, এবার যেই বালিগঞ্জ প্লেসের সেই গেটওলা বাড়ির গেটটা পার হব, মনে হবে যেন দিল্লী-বম্বের একটা দামী হোটেলে এসে ঢুকলাম।'

'বাঃ, সাজানো-গোছানো তো ভালই।'

গৌরী বলে ওঠে কথাটা।

'ভাল যদি তো নিজে ভালবাসো না কেন? সংসারে যা কিছু করতে যাই, বল কেন অত বাবুয়ানায় কাজ নেই, অত আড়ম্বরে দরকার নেই!'

গৌরী হেসে ফেলে বলে, 'ঘুঁটেকুড়ুনী রাণীরা তাই বলে।'

'মাথায় খালি রূপকথা ঘুরছে'—বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন বিজনবিহারী।

দেবু বাড়ি থাকলে দেবুই ট্যাক্সি ডেকে দেয়, আজ নিজেকেই ডাকতে হবে। আজ একটু রাত হয়ে গেছে। ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত, তাছাড়া—শশী বড়াল লেনের মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। একটু হেঁটে বড়রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হয়।

তা সেটাও মন্দ নয়।

ট্যাক্সিওলাটাকে যদি কেউ জিগ্যেস করে বসে, 'কোনখান থেকে এই সোয়ারীকে আনলে তুমি?'

কিন্তু কে প্রশ্ন করবে?

চারুপ্রভার তো ফিরতে আরো রাত হয়। চারুপ্রভার মহিলা সমিতির সংলগ্ন আরো একটি ক্লাব আছে, ব্রীজ ক্লাব। সেটি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত ক্লাব।

অনেক চেষ্টায় খেলাটা মোটামুটি শিখে এই ক্লাবের মেম্বার হয়েছেন চারুপ্রভা। জেদের মাথায় খেলতে খেলতে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি প্রায় কারোরই থাকে না।

আজ অবশ্য আলাদা ব্যাপার...মিসেস খাস্তগীরের মেয়ের বিয়ে। পরলোকগত খাস্তগীর সাহেব এত টাকাকড়ি রেখে গেছেন যে ব্রীজের আড্ডায় রোজ হেরেও মেয়ের বিয়ের ঘটাপটায় ঘাটতি হবার প্রশ্ন ওঠে না।

আলোয় মোড়া বাড়িতে সুদৃশ্য ডেকোরেটিং করা মণ্ডপে উঁচু মঞ্চে বর-কনেকে বসানো হয়েছে, এবং একটি নাট্যদৃশ্যের দর্শকের মত চারিদিকে দামী গদি মোড়া চেয়ারে বসে আছেন নিমন্ত্রিতের দল।

কিছুক্ষণ আগে সকলের হাতে হাতে গোলাপের বোকে দেওয়া হয়েছে, এখন গায়ে সেন্টের স্প্রে দেওযা হচ্ছে।

এরপর খাওয়া।

পর্দার আড়ালে কোন এক কক্ষে টেবিলে থরে থরে সাজানো আছে সুখাদ্যর রাশি, আর গোছা গোছা শূন্য প্লেট। তুমি ঢুকে যাও, যা ভাল লাগে তুলে নিয়ে খাও, মিটে গেল। আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।

চারুপ্রভার মনে হচ্ছিল এব থেকে সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আর হতে পারে না। জিপসির বিয়েতে তিনি এই রকমই করবেন।....বরং খরচ আরো বেশীই করবেন।

কিন্তু জিপসি?

ভাবলে প্রাণে সুখ আসে না।

বেচারী চারুপ্রভা!

লোকে বাইরে থেকে দেখে ভাবে, সুখের সাগরে ভাসছেন তিনি, কিন্তু চারুপ্রভা নিজে তো জানেন ভিতরটায় তাঁর কী দাবাদহ।

স্বামী কন্যা, এই দুটোর একটাও তাঁর নিজের নয়, তাঁর মনের মত নয়। জিপসিটাও যে এমন হবে কে জানত। লোকে অবশ্য ভাবে বিজনবিহারীর মত বশংবদ স্বামী পাওয়া বহু ভাগ্যের ফল, এমন কি আত্মীয় নামের শত্রুমহল থেকে স্ত্রৈণ অপবাদও ওঠে বিজনবিহারীর. কিন্তু সে-সব যে কত ফাঁকা চারুপ্রভার মত কে জানে?

তবু চারুপ্রভা ওই লোকসমাজে জগতের সেরা সুখীর ভূমিকায় ঝলসে বেড়ান।

বিজনবিহারী যখন বাড়ির গেটে ঢুকে চারুপ্রভার গ্যারেজটা ফাঁকা দেখে একটা বুক-হালকা-করা নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ঢুকলেন, তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে উজ্জ্বলা হাসিতে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বলছে, 'ভাগ্যিস মিষ্টার দত্ত ভল্টের চাবি রেখে যেতে ভুলে গেছলেন! নইলে কী করে টের পেতাম আমরা চারুদি, বিনা অলঙ্কারেও আপনি কত সুন্দরী।....পুরুষরা তো আপনাকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ। ওখানে বলাবলি হচ্ছিল, কতকগুলো গহনা-টহনা পরাই যে সাজা নয়, সেটা ওঁকে দেখে শিখতে পারে মেয়েরা।'

চারুপ্রভা অমায়িক গলায় বলেন, 'পুরুষদের দায় পড়েছে এই বৃদ্ধা মহিলার সম্পর্কে আলোচনা করবার।'

'বৃদ্ধা মহিলা?'

উজ্জ্বলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'কথাটা রাষ্ট্র করে দেব নাকি? আর তাই যদি বললেন চারুদি, সদ্য তরুণীদের থেকে অনেক বেশী লোভনীয় হচ্ছে পূর্ণ পরিণত যৌবন। যার থেকে প্রমাণিত হয়—ইনি অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। যথেষ্ট পরিমাণে খরচ করেও এখনো বিত্তশালী।'

পিছনের চেয়ার থেকে মিষ্টার সরকার বলে ওঠেন, 'আমার বলবার কথাগুলো সব আপনি বলে নিচ্ছেন মিসেস হালদার? ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। এ আপনার অপরের অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ। আমায় বলতে দিন।'

চারুপ্রভা চোখ ভুরু পাকিয়ে কৃত্রিম কোপে বলেন, 'মিস্টার সরকার, আমাব বয়েস আপনি জানেন?'

চারুপ্রভার অলক্ষ্যে উজ্জ্বলা হালদারের সঙ্গে সাগর সরকারের একটি কৌতুক দৃষ্টির বিনিময় হয়, অতঃপর সাগর সরকার জোরালো গলায় বলেন, 'জানি। পঁচিশ।'

চারুপ্রভা হেসে প্রায় ভেঙ্গে পড়েন।

'ওঃ হো হো! মিষ্টার সরকার, আপনি চশমা বদলান! আমার মেয়েরই যে প্রায় পঁচিশ হল—'

পঁচিশ অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে পার হয়ে গেছে জিপসি, তবু ওই 'প্রায়'টাই বলেন চারুপ্রভা।

অবশ্য দরকার ছিল না তার, সাগর সরকার বলে ওঠেন, 'অসম্ভব! নিশ্চয় সে মেয়ে আপনার সপত্নী-কন্যা। আপনি যতই লুকোন মিসেস দত্ত, আপনি নির্ঘাৎ মিষ্টার দত্তর দ্বিতীয় পক্ষ। বয়েসেব যা ডিফারেন্স!'

'আপনি দেখেছেন ওঁকে?'

'হুঁ!' কাজে পড়ে ইণ্ডিয়ান গ্রীলে ঢুকে। রীতিমত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।'

চারুপ্রভা যেন হেরে যাচ্ছেন, অথচ দুর্বল হাতে লড়ছেন, এমনি ভঙ্গীতে বলেন, 'হ্যাঁ বয়েসে আমার সঙ্গে ওঁর অনেকটা ডিফারেন্স, তবে বিশ্বাস করুন সরকার সাহেব, আমি দ্বিতীয় পক্ষ নই। মেয়েও আমাব, মানে সত্যিকার নিজের মেয়ে।'

বারে বারেই সুকৌশল দৃষ্টি-বিনিময় ঘটে সাগর সরকারের সঙ্গে উজ্জ্বলা হালদারের। চারুপ্রভার উঁচুচুড়ো খোঁপার আড়ালে আবদ্ধ থাকে সে রহস্য, চারুপ্রভা চালিয়ে যান, 'মেয়েদের রূপ-টুপ থাকাও বিপদ সরকার সাহেব, বাল্যেবিবাহের বলি হয়ে বসতে হয়। যখন জ্ঞানবুদ্ধির বালাই মাত্র হয়নি—(সবকাব সাহেব অনুচ্চার মন্তব্য করেন, যেন এখনই হয়েছে) তখন স্রেফ্ বলির পশুর মত বিয়ের পীড়িতে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছিল আমায়।'

চারুপ্রভার সাজ, আর চারুপ্রভার বয়েস কমানো নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে, কিন্তু টের পেতে দেয় না। চারুপ্রভার হাত দরাজ, মেজাজ দরাজ, তার তো একটা মূল্য আছে সমাজে।

গল্প করতে করতে একসময় বলে ওঠেন, 'উঃ কী কাণ্ড! সবাই যে চলে গেল। আমায় বাড়ি ফিরতে হবে না?'

মিস্টার ভাদুরী বলে ওঠেন, 'আহা হা থাকুন না আর একটু। অন্ততঃ পরোপকারের জন্যেও।'

'পরোপকার! আমি আবার কার কী উপকার করছি?'

'আপনার উপস্থিতিই উপকারী মিসেস দত্ত। সমস্ত পরিবেশটা তাজা থাকে, সরস থাকে।'

চারুপ্রভা বিগলিত বিনয়ের হাস্যে বলেন, 'আপনারা বড্ড বাড়ান মিস্টার ভাদুড়ী!'

'ভুল বলছেন। যতটা বলা উচিত, ততটা বলেই উঠতে পারি না, ভাষার দৈন্য।'

সাগর সরকার চলে যাচ্ছিলেন, চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'শুধু শুধু বাড়াতে যাব কেন বলুন? আমরা মিস্টার দত্তর কারখানায় চাকরি চাইতে যাচ্ছি না।'

হো হো করে হেসে উঠলেন দুই পুরুষ।

এখন আর হাসতে বাধা কী?

হাসির কথা যখন হয়েছে একটা।

চারুপ্রভার অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস পড়ে।

এই আলো, এই ঔজ্জ্বল্য, এই মুগ্ধ-মুগ্ধ দৃষ্টির নৈবেদ্য, এ সমস্তই ক্ষণিকের।

যতক্ষণ পারেন উপভোগ করে নেন সত্যি, তবু তো এখান থেকে বেরিয়েই গিয়ে পড়তে হবে একটা প্রাণহীন বদ্ধ জলাধারের মধ্যে।

যতই কেননা চারুপ্রভা তাঁর পরিবেশটাকে নিত্য নতুন সাজে চমকপ্রদ করে তুলুন, প্রাণ কোথায়? এত চেষ্টাতেও প্রাণসঞ্চার করতে পারছেন না।

নিজের বাড়ীতে যেদিন যেদিন মহিলা সমিতির অধিবেশন বসান, কিছুক্ষণের জন্যে ওই আমন্ত্রিতরাই জমজমাটি করিয়ে যায়, চারুপ্রভার নিজের দিকে কী?

ঠিক সেইদিনেই বুঝে বুঝে বিজনবিহারীর বিশেষ কাজ পড়বে, আর জিপসির অসম্ভব পড়ার চাপ পড়বে।

বিজনবিহারীর জন্যে তত না, লোকসমাজে বার করবার মত নয়ও, কিন্তু জিপসি, সে তো পারত চারুপ্রভার সহকারিণী হতে, চারুপ্রভার সংসারের একটু নমুনা দেখাতে।

রাত বেড়ে যাচ্ছে আর দেরী করা সঙ্গত নয়।

চারুপ্রভা উঠলেন।

আবার উঠেও উঠলেন না।

জনে জনে দেখা করে বলতে লাগলেন, 'চলি তাহলে। খুব আনন্দ পেলাম।'

সভ্যরা যে এটা করে না, যেই নিজের কাজ মিটে যায় অবলীলায় উঠে যায় কারো দিকে দৃকপাত মাত্র না করে, সেটা চারুপ্রভা ঠিক ধরতে পারেন না। চারুপ্রভার এই সব আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মঞ্চ থেকে চলে যেতে মন চায় না। চারুপ্রভার ভিতরটা সমারোহের কাঙাল।

বিজনবিহারী অবশ্য চারুপ্রভার গ্যারেজ ফাঁকা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, তবু হঠাৎ কেমন একটা রাগও এসে গেল।

মেয়েমানুষ তুমি, একা নেমন্তন্ন গেছ, রাত বাড়ছে খেয়াল নেই? আবার জড়োয়া গহনার অভাবে রাগে অগ্নিশর্মা। বাইরে কত বিপদ আছে জানো না তুমি?...ওই ড্রাইভার ছোকরাও...তো নতুন, ক'মাস মাত্র কাজ করছে।

বদ মতলব থাকলে ও তোকে নাকে ক্লোরোফর্ম রুমাল ঠেকিয়ে সর্বস্ব নিয়ে নিতে পাবে না? ব্যাগেও তো গাদা গাদা টাকা নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন শিক্ষা হয় তো বেশ হয়।

নিজের স্ত্রীর জন্য এই শুভকামনাটি করে বিজনবিহাবী হঠাৎ বাড়ির সবদিক তাকাতে লাগলেন, চারুপ্রভা যতই বাহাদুবি দেখাক, এই সমস্তই বিজনবিহারীর টাকায়। বিজনবিহারী এই সমস্ত কিছুরই মালিক।

অথচ—বিজনবিহারী সবাইকে ভয় করে চলেন। নিজের স্ত্রী-কন্যাকে তো বটেই, বাড়ির চাকর-বাকরদের পর্যন্ত। ভয় হয়, কিছু বললে পাছে চারুপ্রভাকে লাগিয়ে দেয়।

আর চারুপ্রভা 'সাহেবের' মান-মর্যাদার জ্ঞান ভুলে ওদেরই সমর্থন করেন, 'লোকজনকে পায়ের তলায় রাখার যুগ চলে গেছে, বুঝলে? জমিদারীর কাল আর নেই। ওরাও ভদ্রঘরের ছেলে, অসুবিধেয় পড়ে

খাটতে এসেছে। তোমার দোকানের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ওদের কিছু তফাত নেই!'

বিজনবিহারীর সব কিছুতেই অনধিকারীর ভূমিকা। তাঁর যদি দেওয়ালের একটা ছবি অথবা ঘরের একটা টেবিল এদিক-ওদিক করবার ইচ্ছে হয়, করতে সাহস হয় না।

জানেন সেটা করে ফেললে, চারুপ্রভা বিজনবিহারীর সৌন্দর্যজ্ঞানের তীব্র সমালোচনা করে যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানেই রেখে দেবেন।

হঠাৎ মনে হল, 'কেন? কেন আমি সব সময় সকলকে ভয় করব? আমি বাড়ির কর্তা নই?'

এই যে খুকু, কার সঙ্গে না কার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না, কে সে? কাদের সঙ্গে মেশো তুমি? এই যে আমি তখন নিজের ঘরে গিয়েই ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে রেখে শার্ট-পায়জামা পরব কেন? আমার বাড়িতে আমি যা ইচ্ছে করতে পারব না কেন?

ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। দেখলেন জিপসির ঘর অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে? রাত তো মাত্র সাড়ে দশটা, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে? ওর মা আসা পর্যন্ত তো থাকেই জেগে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা কুটিল সন্দেহ পা থেকে মাথা অবধি চড়াৎ করে উঠল।

জোরে জোরে ধাক্কা দিলেন দরজায়।

বার তিনেকের পরই জিপসি উঠে এল। চোখ মুছতে মুছতে অবাক হয়ে বলল, 'কী বাবা? কী হল?'

বিজনবিহারী ঘরটার মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন ঘর আলোয় ভাসছে, একার মত সরু খাটের বিছানা থেকে যে উঠে এসেছে, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেলেন বিজনবিহারী। এতক্ষণের কর্তা মনোভাব অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার মনেব মধ্যে যে কুটিল সন্দেহ উঁকি মেরেছিল সেটা জিপসির জানবার কথা নয়, তবু বিজনবিহারীব মনে হল, যেন জেনে ফেলেছে খুকু।

সেই অপ্রতিভ ভাবনা সামলাতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এক্ষুনি শুয়ে পড়েছিস! এবকম তো ঘুমোস্ না, শরীর খারাপ-টারাপ হয় নি তো? হঠাৎ ভয় হল, তাই—'

জিপসি একবার বাবাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে 'শরীর খারাপ তো আমার হয় নি বাবা, মনে হচ্ছে তোমারই হয়েছে।'

'আমার কেন হবে। আমার কেন হবে।' বলে চলে আসেন বিজনবিহারী। তবে খুকু তো ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়! তাই বলে ওঠে, 'অসুখ আমার হবে, অথচ তোমার 'কেন হবে?' এর উত্তর হয় না বাবা। আমি বলছি তোমার এক্ষুনি শুয়ে পড়া উচিত!'

'না না, আমি বেশ আছি। তোর খাওয়া টাওয়া হয়েছে?'

'হুঁ, কখন! শ্রীমতী মাতৃদেবী যে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন, আমি যেন—কিন্তু তোমার তো—'

'দ্যাখ্ আমারও আজ তেমন খিদে নেই।'

'ওই তো। বলেছি তোমার শরীর খারাপ—' বলেই ভীত গলার ভান করে বলে ওঠে, 'ও বাবা, সর্বনাশ হয়েছে, বোধহয় মা ফিরলেন, গাড়ির শব্দ পেলাম। আর তুমি এখনো ধুতি পরে? যাও যাও, শীগগির বদলে ফেল গে—'

বিজনবিহারী মিয়োনো চড়া গলায় বলেন, 'যদি না বদলাই? যদি বলি আমার যা খুশী আমি তাই পরব।'

জিপসি মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলে, 'ওঃ মাই পুওর চাইল্ড। এতদিনে তোমার এই জ্ঞানোদয় হল? বড় লেট-এ বাপী, বড় লেট্-এ। আর হবে না।'

'হয় কিনা দ্যাখ্।'

বিজনবিহারী জোর দেখিয়ে বলেন, 'এবার থেকে দেখিস।'

'দেখব।'

বিজনবিহারী একটু দাঁড়ান, বলেন, 'আমি তোর মাকে ভয় করি? ভয় করি অপমানের। রাগলে তো জ্ঞান থাকে না তোর মার, লোকজনের সামনে যা মুখে আসে বলে—'

জিপসি একটু চকিত হয়।

বাবা মায়ের ভয়ে কাঁটা এই জানে সে, সেই ভয়ের স্বরূপটা কী তা ভেবে দেখেনি কোনদিন।

জিপসি কিছু বলার আগে বিজনবিহারী আবার কথা বলেন, 'বিকেলবেলায় কে এসেছিল রে?'

'বিকেলবেলা? কই কেউ তো আসেনি।'

বিজনবিহারী বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আসেনি বললেই শুনব? আমি নিজের কানে শুনে গেলাম তুই কার সঙ্গে যেন কথা বলছিস—'

'ওমা! তুমি যখন বেরোলে তখন? সে তো তিলকদার সঙ্গে! সে তো রোজই আসে—'

'তিলকদা! তিলকদাটি কে?'

'বাবা! তুমি কী গো! তিলকদাকে চেন না? তিলক গাঙ্গুলী পাড়ার সব থেকে ফেমাস ছেলে।'

তিলক গাঙ্গুলী! জীবনে নাম শোনেননি বিজনবিহারী, অথচ পাড়ার সব থেকে ফেমাস ছেলে।

রোজ আসে।

তার মানে লাভার।

লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে তার সঙ্গে আড্ডা দেয়, আর মা বাপের কথা নিয়ে হাসাহাসি করে।

হঠাৎ যেন মাথায় রক্ত চড়ে যায় বিজনবিহারীর।

চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'তা তারই বা রোজ আসার কী দরকার? বেছে বেছে সেই সময়, যখন তোমার মা বাড়ি থাকে না, আমি বেরিয়ে যাই—'

বাবার এই চীৎকারের মুখেও জিপসি আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা গলায় প্রায় যেন অবাক গলায় বলে, 'তা তখন এলেই তো ভাল বাবা, নেহাত একা পড়ে থাকতে হয় আমায়। ও না এলে তো টিপসির সঙ্গেই গল্প করে কাটাতে হত। অথচ তোমাদেরও না বেরুলেই নয়, কত-সব দারুন দরকারী কাজ।'

মাথায় চড়ে ওঠে রক্তটা কি সারা শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে মাথার আগুনটাকে বয়ে নিয়ে? তা নইলে হঠাৎ এত গরম হচ্ছে কেন?

প্রত্যেকটি লোমকূপ থেকে ফুটন্ত রক্তস্রোত ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে কেন?

গলার স্বরটাও কি তাই স্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে না থেকে শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল?

সেই ঝুলে পড়া স্বরটা বলল, 'তা তুমিই বা ঘরে বসে থাকো কেন? কলেজের মেয়ে- টেয়ের বাড়ি বেড়াতে যেতে পার না?'

জিপসি এই স্খলিত স্বরটা চিনতে ভুল করল। জিপসি ভাবল ভীরু স্বভাব বিজনবিহারী ভয় পেয়ে—

জিপসি তাই খুব অমায়িক গলায় বলল, 'এ কথাটা তোমায় মা শিখিয়ে দিয়েছেন বুঝি বাপী?'

এখন একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটল।

বিজনবিহারী 'হল'-এর ধারে রাখা একটা ভারী পিতলের বুদ্ধমূর্তি সানো টেবিলের কোণ চেপে ধরে হুমড়ি খাওয়া মত অবস্থায় ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'তোমরা সবাই মিলে আমায় অপমান করবে? সবাই মিলে? আমি আর থাকব না তোমাদের বাড়ি। সাতের এক শশী বড়াল লেনে চলে যাব আমি। তারা আমায়—তারা আমায়—তা-রা আমা-য়—'

টেবিল এবং ভারী মূর্তিটা সমেত গড়িয়ে পড়ে গেল বিজনবিহারীর হালছাড়া পালছেঁড়া ভারী শরীরটা।

ভয়ঙ্কর একটা শব্দ যেন বাড়ির প্রতিটি দেয়ালে ধাক্কা মেরে মেরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

কতক্ষণ সময় জিপসি ওই গুঁজড়ে পড়ে যাওয়া শরীরটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

অনেক অনেকক্ষণ? হয়তো তাই।

না হলে ওর যখন চমক ভাঙল, তখন সারা ঘর লোকে ভর্তি কেন?

ওই শব্দটাই সবাইকে ডেকে এনেছে।

আধডজন চাকর থাকার উপকারিতা—এখন বোঝা যাচ্ছে। ওরাই তো সবাই মিলে ধরাধরি করে ভাল জায়গায় সরিয়ে এনে শুইয়ে দিল বিজনবিহারীর দেহটাকে।

এখন জিপসিকে হাল ধরতে হবে।

ডাক্তারকে খবর দিতে ফোন তুলল। কিন্তু কী বলবে সে তাদের পারিবারিক চিকিৎসককে?

'ডাক্তারবাবু, আমি বাপীকে খুন করে ফেলেছি, এখন আপনি আসুন, বাঁচান।'

চারুপ্রভা যখন ফিরলেন, তখন সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে, বাড়ি লোকে ভর্ত্তি।

পরিচিত ডাক্তার তো এসেইছেন, আরো দুজন বিশিষ্ট ডাক্তার এসে গেছেন।...এসেছেন পাড়ার কর্তা-ব্যক্তিরা অনেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া সদর দরজা খুলে।

হলেই বা অনেকটা রাত, যে ব্যক্তি মারা যেতে বসেছে, তার টাকাকড়ি আছে না প্রচুর? যেটা সব বন্ধ দরজা খোলার চাবি!

চারুপ্রভা এক সমারোহ থেকে আর এক সমারোহের মধ্যে এসে পড়ে প্রথমটা যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

তা সমারোহ বৈ কি।

মৃত্যু যখন ভাগ্যমন্তের দরজায় এসে দাঁড়ায়, তার অভ্যর্থনার আয়োজন সমারোহময়ই হয়। বাড়িতে শুধু একা একটা তরুণী মেয়ে মাত্র ছিল বলে কি আয়োজনের ত্রুটি হয়েছে কিছু।

বাড়ি আলোয় ঝলমলে, দরজায় গাড়ির সারি, লোকজন ছুটোছুটি করছে।

জিপসিকে অবশ্য এসবের জন্যে বেশী কিছু করতে হয় নি, জিপসির বাবার টাকাই এসব করে তুলেছে মুহূর্তে।

প্রথমটা দিশেহারা হয়ে গেলেও সামলে নিলেন চারুপ্রভা। ওর মনে পড়ল, মৃত্যুর প্রবল প্রবেশের ধাক্কায় যখন সকল দরজা হাট হয়ে খুলে পড়ে, তখন সেই হাট-হয়ে-যাওয়া দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ে হাটের হট্টগোল।

হাটের লোকের সাহস বেড়ে যায়, হঠাৎ তারা যেন একটা অনধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যায়।

তাই চারুপ্রভার 'হল'-এর মেঝেয় পাতা পুরু কার্পেটের উপর এসে দাঁড়িয়েছে বাসন-মাজা ঝিয়ের বাসার লোক, পাড়ার চায়ের দোকানের চাকর, পানের দোকানের মালিক।

প্রথমে এসেই চারুপ্রভার সব থেকে জরুরী মনে হয়েছিল পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীটা কী ছিল তার তদন্ত করা।

তাই জেরা করতে শুরু করেছিলেন সকলকে। কখন ফিরেছিলেন বিজনবিহারী, তারপর কী করেছিলেন, ঠিক কোন পজিশনে পড়ে ছিলেন, মাথা ঘুরে পড়া, না কিছু পায়ে বেধে পড়া?

কিন্তু কে দেখেছে ওসব?

সকলেই তো পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে এসেছে।

একমাত্র দিদিমণি।

যার সঙ্গে নাকি কথা বলছিলেন সাহেব।

তা সেই জিপসি বলছে কি না আমিই ফেলে দিয়েছি। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি বাপীকে।

সে মেয়েকে ঘরে পুরে দিয়ে পাখার তলায় শুইয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কী? আচমকা 'শক'-এ পাগলের মত কী বলছে না বলছে! হঠাৎ কারো কানে গেলে তো কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ওকে।

চারুপ্রভার নার্ভ অমন খেলো মালমশলায় তৈরী নয়, আচমকা শক্ খেয়ে এলোমেলো হয়ে যান না চারুপ্রভা।

চারুপ্রভা বরং বিচলিত হয়েছেন বিজনবিহারীকে অমন ধুতির কোঁচা লটপটিয়ে ন্যাতাজোবড়া হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে।

চারুপ্রভার ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি মানুষটাকে পোশাক বদলে সভ্য-ভব্য করে শুইয়ে দেন।

সেটা সম্ভব না হওয়ায়, যেটা সম্ভব সেটাই করেন চারুপ্রভা, সবলে রায় দেন, 'আমি বলছি, স্ট্রোক ট্রোক নয়, স্রেফ্ কোঁচা লটপটিয়েই জড়িয়ে পড়ে গিয়ে—অবাক হয়ে যাচ্ছি হঠাৎ এ শখ হল কেন ওর!'

চারুপ্রভার অঙ্গে এখনো বিয়ে-বাড়ির সাজ। ঝকঝকে চকচকে। শুধু চূড়ো খোঁপাটা ভেঙে পিঠে লুটোনোর দরুন আর চুলগুলো মুখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার দরুন উগ্র আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

চারুপ্রভা এখন খাঁচায় বন্ধ বাঘিনীর মত ছটফট করছেন, গর্জন করছেন, ছুটোছুটি করছেন, 'এরা সব কারা? এরা এখানে ভীড় বাড়াচ্ছে কেন? জগদীশ, এদের সব্বাইকে সরিয়ে দাও।...চাবি লাগিয়ে দাও সব দরজায় দরজায়।...দোকানের চাবি কার কাছে থাকে?—ম্যানেজারবাবুর কাছে? কী আশ্চর্য! সে লোক নর্থের দিকে থাকে না? তার কাছে দোকানের চাবি? জিপসি, এবার উঠে পড়, দেখ তোমার বাবার কাণ্ড। দোকানের চাবি ম্যানেজারের কাছে।...এক্ষুনি যে করে হোক খবর পাঠাও তাকে চাবিটা এখানে পৌঁছে দিয়ে যেতে। দোকান এখন খোলা হবে না।...লিস্ট মিলিয়ে সব দেখে তবে—তোর বাবার লকারের চাবিই বা কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো! শীগগির দ্যাখ, গোলেমালে কেউ সরিয়ে ফেলল কি না। উঃ কতদিক যে এখন দেখতে হবে আমায়, কোথায় কী কাগজপত্র, কোথায় ভল্টের চাবি—কোনদিকটা যে দেখব—'

জিপসি উঠে বসে, এত কথার উত্তরে শুধু বলে, 'সব কিছু দেখার আগে তোমার এই বিয়ে-বাড়ির সাজটা বদলে ফেল মা।'

চারুপ্রভা ক্রুদ্ধ মুখে বলেন, 'কেন? সাজটায় তোমায় কী কামড়াচ্ছে? তুমি কি আমায় এক্ষুনি থানপরা বিধবা মূর্তিতে দেখতে চাও?—উঃ আশ্চর্য! আর কোন কথা খুঁজে পেল না। তুমি ভিন্ন কেউ ভাবতে বসছে না, আমি স্বামী মারা যাওয়ার পর সেজে-গুজে শোক করছি। এরপর কী জ্বালাতন যে করবে তুমি আমায়, তা টের পাচ্ছি। কিন্তু মনে জেনো চারুপ্রভা দত্ত শক্ত মেয়ে।'

শক্ত মেয়ের অহঙ্কার নিয়ে চারুপ্রভা চারিদিকে আটঘাট বাঁধতে বসেছিলেন, ভেবেছিলেন ঐ আলগাবুদ্ধি লোকটা কোথায় কি করে রেখেছে তীক্ষ্ণচোখে সে-সব বুঝে নিয়ে সব কিছু নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলতে হবে, দোকানের কর্মচারীদের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। বোকাসোকা সরল সাদা বিজনবিহারী সবাইকেই বিশ্বাস করতেন, কে জানে তারা কত আখের গুছিয়ে নিয়েছে। চারুপ্রভা অত চোখ বুজে বিশ্বাস করতে রাজী নন, চারুপ্রভা জানেন জগতের কাউকে বিশ্বাস নেই।

চারুপ্রভা এখন সব কিছুতে বজ্রআঁটুনি কসবেন।

চিরকাল চারুপ্রভা ওই বজ্রআঁটুনিতেই বিশ্বাসী, ওতেই সব থেকে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এখন?

এখন কি চারুপ্রভা শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবেন তাঁর সারাজীবনের সমস্ত বজ্রআঁটুনির তলায় তলায় গেরোটা কী ফস্কাই ছিল!...নাকি চারুপ্রভা জোরগলায় ঘোষণা করবেন, 'দেখো, দেখো তোমরা! বলিনি আমি জগতে কাউকে বিশ্বাস নেই!'

তা চারুপ্রভা যদি নাও বলে বেড়ান, যদি আপন জীবনের দৈন্য উদ্‌ঘাটিত করতে না চান, লোকে কি বলতে ছাড়বে? ছাড়ছে কি?

দেশসুদ্ধু লোকই তো অবাক হয়ে গালে হাত দিচ্ছে। ঘৃণায় লজ্জায় ছি ছি-ক্কার করছে 'ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড গেট'-এর একমাত্র মালিক বি. বি. দত্তকে।

কে জানত ওর 'সৎচরিত্রের' মুখোশের আড়ালে এতখানি দুশ্চরিত্রতা ছিল।

পঁচিশ বছর ধরে লোকটা দ্বিতীয় একটা অবৈধ সংসার পেতে বসে দিব্যি চালিয়ে গেছে! কেউ ধরতে পারেনি!

কী করে পারবে ধরতে?

'জীবন' যে সবকিছু আড়াল করে রাখে তার দু'হাত বিছিয়ে তার সব ত্রুটি, সব দৈন্য, সব ভালবাসা।

মৃত্যু দুরন্ত পদপাতে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। দিয়ে যায় সব আড়াল ঘুচিয়ে, সব দেওয়াল ভেঙ্গে। যা থাকে একান্ত গোপনতার মধ্যে, মৃত্যু তাকে উদ্‌ঘাটিত করে ফেলে, পৃথিবীর সামনে মেলে ধরে।...তবু হয়তো এত তাড়াতাড়ি সবটা মেলে ধরতে পারত না, যদি না বিজনবিহারীর নিজের মেয়েই এই উদ্‌ঘাটনের সহায়ক না হত।

এখন বিজনবিহারী নামের লোকটার নির্লজ্জতায় সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে কিনা তার ওই অবৈধ সংসারটাকে বৈধ প্রতিপন্ন করতে উইলে লিখে রেখে গেছে—'আমার দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী গৌরী দত্তর গর্ভজাত আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান দেবনাথ দত্ত 'ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড্ গেট'-এর একমাত্র মালিক হইবেন।'

বাকি সবই অবশ্য প্রথমা স্ত্রী চারুপ্রভা দত্ত, আর তার গর্ভজাত কন্যা লোপামুদ্রা দত্তর নামেই উৎসর্গ করে গেছে লোকটা। ব্যাঙ্কের অগাধ টাকা, বালিগঞ্জ প্লেসের বিরাট বাড়ি, দুখানা গাড়ি, লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকা, সবই।

তবু আসলটাই তো হাত ফসকে গেল।

দোকান গেলে চারুপ্রভার রইল কী!

কী চক্ষুলজ্জাহীন! কী কুৎসিৎ নোংরামি!

মরবার কোন ঠিকঠাক ছিল না, অথচ কোন্‌কাল থেকে এই দলিল করে রেখেছে, পাকা দলিল! যাতে ওর ওই 'মিথ্যে' স্ত্রী-পুত্র 'সত্য' বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু চারুপ্রভা মানবেন নাকি ওই উইল? কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেবেন না? আদালতে 'নকল' আছে ওর? তা থাকল তো বয়েই গেল। আদালতে কত আসল 'নকল' হয়ে যাচ্ছে, আর এ তো পুরোটাই নকল।

সেই 'বিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নী' প্রমাণ করুক কবে কখন কোথায় তার ওই বিবাহটি হয়েছিল। কে পুরুত? কে নাপিত? কে সাক্ষী?

চারুপ্রভার ভাগ্য!

চারুপ্রভা যখন নিশ্চিন্ত হচ্ছেন ওই 'প্রমাণ'টা আর হবে না, তখন চারুপ্রভার ভাগ্যের শনি এসে দাঁড়িযে বলল, 'আমি সাক্ষী দেব।'

'তুই সাক্ষী দিবি?'

'দেবই তো ঠিক করছি।'

'ওঃ! তুই তোর বাপের বিয়ে দেখেছিস তাহলে?'

'সবই কি দেখতে হয় মা? তুমি কি তোমার বাবার বিয়ে দেখেছ? দেখনি? তবু নিজেকে বৈধ বলে জানো।'

'তুই আমার এতবড় শত্রুতা করবি?'

'শত্রুতা নয় মা, মিত্রতা।'

'ওঃ! মিত্রতা! অত মহত্ত্বে আমার দরকার নেই।'

'তোমার নেই আমার আছে মা! মহত্ত্বের নয়, প্রায়শ্চিত্তের।'

হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব নিয়েই জিপসি 'শশী বড়াল লেন' নামের জায়গাটা শহবের কোনখানে থাকতে পারে তার খোঁজ করেছিল। হয়তো ওই খোঁজটা করতে না গেলে আব কিছুদিন চাপা থাকত ঘটনাটা।

কতদিন ধরে যেন ভয়ানক একটা যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছিল জিপসি। কেবল ভেবেছিল, আমি কেন ভাবিনি সেদিন, সবসময়ই মজা করতে বসা ঠিক নয়। বাবাকে রাগিয়ে মজা দেখবার জন্যে কেন হঠাৎ আমি এক 'তিলকদা' তৈরী করে বসলাম!—যার কোন অস্তিত্বই নেই।

আমি তো সত্যিকথাটাই বলতে পারতাম, 'বাপী, আমি ঘরের মধ্যে বসে আমার মনে-প্রাণে যা উদয় হয় টিপসিকে বলি। ও এমন ভাবে ল্যাজ নাড়ে, মনে হয় সব বুঝছে।'

যদি আমি ওই 'তিলক'দাকে না গড়তাম, বাপী হয়তো পড়ে যেত না, মরে যেত না।

যন্ত্রণাবোধের মধ্যেই বিজনবিহারীর সেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলা কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে, 'আমি তোমাদের বাড়িতে থাকব না, আমি সাতের এক শশী বড়াল লেনে চলে যাব।'

শশী বড়াল লেনে গিয়ে কোন দৃশ্যের সামনে দাঁড়াতে হবে তার কোন ধারণাই ছিল না জিপসির। তবু অস্পষ্ট একটা সন্দেহের বিষ মনের এক কোণে ছায়া ফেলেছিল।

কোন স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারই!

রোজ সন্ধ্যায় ওই অন্যবেশ ধারণ করে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে যোগ আছে শশী বড়াল লেনের।

অধ্যবসায়ে সবই হয়।

শশী বড়াল লেনের সাতের এক বাড়িটা খুঁজে বার করে কড়া নেড়েছিল জিপসি।

একটি বছর ষোলর মেয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে, প্রায় আর্তনাদের মত ডেকে উঠেছিল, 'মা!'

কিন্তু জিপসি কি ধারণা করেছিল, রোদে ঝলসে যাওয়া শাকের মত চেহারার ওই ময়লা থান পরা বিধবাটিকে দেখবে?

আচ্ছা ইনি যে থান-টান পরে বসে আছেন, এঁদের খবর দিয়েছিল কে? কার দায় পড়েছিল শশী বড়াল লেন খুঁজে বার করে খবর দিয়ে যেতে—'ওগো সেই বিজনবিহারী দত্ত হঠাৎ হার্টফেল করেছেন। যাঁকে তুমি 'স্বামী' বলে মনে করতে।'

না, কারো দায় পড়েনি, শুধু পরদিন সকালে স্থানীয় সংবাদে আকাশবাণী কলকাতা জানিয়ে দিয়েছিল, 'সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান গ্রীল অ্যাণ্ড গেট-এর মালিক বিজনবিহারী দত্ত গতকাল রাত্রি বারোটার সময়—'

তিনজন ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওরা কেউ কথা কইছিল না, শুধু নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছিল, আর জিপসি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এই বাড়ির মেঝেয় পা ফেলে ফেলে হেঁটেছে বাবা, এদের ঘরের ওই চৌকীতে বসেছে, হয়তো ওদের হাতে চা খেয়েছে। আর এই দেয়াল-ভাঙা বালি-খসা দীনহীন বাড়িটাতেই বাবা চলে আসবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল ঠিক মারা যাবার আগে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেষ্টা করল, বিজনবিহারী দত্তকে এই পবিবেশে কেমন মানায়। ...তারপর ওই মলিনমূর্তি মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, আর তখনই ওর বাবার শেষ কথাটা, যেটা সমাপ্ত করতে পারেননি বিজনবিহারী, আর যাকে সমাপ্তি দিতে এই ক'দিন ধরে অনেক কথার টুকরো বসিয়েছিল জিপসি সেখানে, আবার তুলে তুলে ফেলে দিয়েছিল, সেই কথাটা আপনি সমাপ্ত হয়ে উঠল। 'ওরা' আমাকে—ওরা আমাকে—ওরা আমাকে ভালবাসে।'

এই কথা।

আর কিছু হতে পারে না।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মলিন নিষ্প্রভ চারটি মূর্তি নিরুচ্চারে ওই কথাটাই উচ্চারণ কবছে, 'আমবা তাঁকে ভালবাসতাম। আমরা তাকে ভালবাসি।'

আচ্ছা জিপসি কি তাব বাবাকে ভালবাসত না? বাসে না? না বাসলে এত যন্ত্রণা হচ্ছে কেন জিপসির বাবা মরে গেল বলে?

তবু জিপসির নিজেকে যেন ওদের থেকে অনেক নীচেয় মনে হচ্ছে, অনেক ছোট। কিন্তু জিপসির তো সবই উল্টোপাল্টা, তাই সেখানে জিপসি ছোট হয়ে মরছে, সেখানেই বার বার আসছে।

'কোথায় যাস তুই রোজ রোজ?'

চারুপ্রভা মারমুখী হয়ে থাকেন। মারমুখী হয়ে জিগ্যেস করেন।

জিপসি বলে, 'ঠাকুর-মন্দিরে যাই।'

'ঠাকুর-মন্দিরে। আমি জানি না? জগদীশকে দিয়ে খবর নিইয়েছি আমি। আমি বলছি জিপসি, ওই সর্বনাশীর খপ্পরে যাসনি তুই, ও তোর বাপকে তুকতাক করে বশ করে রেখেছিল, এখন তোকে করছে।

শেষ পর্যন্ত মরবি, বলে রাখছি।'

'শেষ পর্যন্ত তো সবাই মরবে মা' বলে হেসে ওঠে জিপসি।

'আমি তোকে বারণ করছি জিপসি—'

জিপসি আবার হাসে, 'কবে আবার আমি তোমার বারণ শুনেছি মা! আমি তো তোমার চিরকেলে অবাধ্য মেয়ে।'

'আমি তোকে দিব্যি দিচ্ছি জিপসি—'

'ও মা! কি বললে গো! মিসেস চারুপ্রভা দত্তর মুখে এই গাঁইয়া কথা!' দিব্যি! এসব তুমি মানো?'

'আমি তোকে চাবি দিয়ে রাখব—' সাপিনীর মত হিসহিসিয়ে গর্জন করে ওঠেন চারুপ্রভা।

জিপসি মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে।

রূপের জেল্লায় আজও অম্লান চারুপ্রভা, শুধু চোখের কোণের সেই মদির কটাক্ষের ছায়াটা কোথায় সরে গিয়ে সেখানে সর্বদাই যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে দু ড্যালা আগুন জ্বলছে।

চারুপ্রভার সাজসজ্জা আজও অপরিবর্তিত, শুধু সরু সিঁথির মাঝখানে ঘন চুলের অন্তরালে যে ক্ষীণ লাল রেখাটুকু ছিল সেইটুকু নেই, আর কিছু না।

চারুপ্রভার একটা যুক্তি আছে।

চারুপ্রভাকে বৈধব্যের বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকজনে মানবে না, আত্মীয়স্বজন অবহেলা করবে, পাড়াপড়শীর কাছে মূল্য কমে যাবে আর নিজের কাছে নিজেকে বেচারী মনে হবে। এতগুলোর ভাব বহন করতে পারবেন না চারুপ্রভা।

কিন্তু জিপসিকে এঁটে ওঠা না গেলে যে চারুপ্রভার সবই যায়।

অথচ ও প্রতিজ্ঞা কবে বসে আছে তুকতাকে বশীকরণগ্রস্ত ওর বাপেব মতিচ্ছন্নের পবাকাষ্ঠা ওই উইলটাকে প্রতিষ্ঠিত করে তবে ছাড়বে।

লড়াইটা অভাবনীয়, সন্দেহ নেই।

হয়তো মহামান্য আদালত বাহাদুরও বলবেন, 'না, আমার জীবনে এমন সৃষ্টিছাড়া লড়াই আমি দেখিনি।...'

মায়ে-মেয়েতে মামলা?

অজস্র, আকছার। কিন্তু এমন অদ্ভুত বিষয় নিয়ে? কখনো নয়। বাপেব অবৈধ সন্তানকে বিষয়ের ভাগ পাওয়াবার জন্য, মায়ের সঙ্গে মামলা।

পাগল ছাড়া আর কেউ করবে?

অথচ ডাক্তারে ওকে পাগল বলবে, এমন আশা নেই চারুপ্রভার।

কিন্তু মা-র সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে সাতের এক শশী বডাল লেনে রোজ রোজ যেতে হচ্ছে কেন জিপসিকে? যাবার দরকার তো উকিলবাড়িতে।

হয়তো শুধু ওইটুকুর জন্যেই নয়, জিপসি যেন একটা আবিষ্কারেব কাজে নেমেছে, শশী বড়াল লেনে গিয়ে তার কাজের মালমশলা সংগ্রহ করছে।

জিপসির আবিষ্কারের বিষয়বস্তু হচ্ছে তালতলার দত্তদের ছেলে বিজনবিহারী দত্ত লোকটা সারাজীবন ধরে যা করে গেছে, সেটা বৈধ কি অবৈধ, সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছে জিপসি। নাকি বুঝেই ফেলেছে?...

তাই জিপসিকেও শশী বড়াল লেনের দাওয়ায় বসে কাঁসার বাটি করে মুড়ি খেতে দেখা যায় তার বাপ বিজনবিহারী দত্তর মতই।

চারুপ্রভা ভাগ্যিস দেখতে পান না।

ভাগ্যিস শুনতে পান না জিপসি ওই থানপরা ন্যাড়াহাত বাসন মাজা ঝিয়ের মত দেখতে গৌরীবালাকে 'মা' বলে ডাকছে। দেখলে শুনলে চারুপ্রভা বিষ খেতেন, না গলায় দড়ি দিতেন কে জানে।

ছাইয়ের মধ্যে তাপ

বাড়িটি যে পদস্থ ব্যক্তির তা বাইরে থেকেই বোঝা যায়। হয়তো কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টার্স, হয়তো বা কোম্পানির দেওয়া মোটা ভাড়ায় আহরিত—যাই হোক, বাড়ির চেহারায় মালিকের পদস্থতার ছাপ সুস্পষ্ট।

উঁচু লোহার গেটের ধারেই পালিশ করা টুলে বসা সুসজ্জিত দারোয়ান, ফুলের কেয়ারিতে সাজানো সবুজ মখমলের মত ঘাসের আস্তরণ পাতা লন, একেবারে বাড়ির দেয়ালে বারান্দায় উঠতেই দুষ্প্রাপ্য ক্যাক্‌টাসের সারি বারান্দার মধ্যে গর্বিত ভঙ্গীতে নিঃশব্দে পায়চারীরত বিশালাকায় অ্যাল্‌সেসিয়ান, বারান্দায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খানচারেক বেতের চেয়ারে পুরু ডানলোপিলোর কুশান, এবং ঢুকতেই প্রথম ডানহাতে ঘরটির দরজায় তাম্রফলকের উপর কালো রেখায় লেখা—অফিস রুম।

সুসীমা তাকিয়ে দেখল লেখাটা, রুচি আছে।

এই ঘরের মধ্যে দারোয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

অফিস রুমের উপযুক্ত সাজসজ্জা সম্বলিত ঘরে টেবিলের সামনে চেয়ারে কাঁচাপাকা চুল মাথায় যে ভদ্রলোকটি বসে ছিলেন, তিনি সুসীমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, বসুন। ভদ্রলোকের ভঙ্গীতে বোঝা গেল, তাঁর বিশেষ কোন পদস্থতা নেই, অফিস রক্ষক কর্মচারী মাত্র।

চেয়ারে বসে ব্যাগ থেকে খবরের কাগজের একটি কাটিং বার করে টেবিলে রেখে সুসীমা বলল, 'এটা তো আপনারাই দিয়েছিলেন?'

কাঁচাপাকা চুলওলা ভদ্রলোক কাগজটুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেই বুঝতে পারলেন, তাঁদের দেওয়াই বিজ্ঞাপন। একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হচ্ছে গত দু' সপ্তাহ থেকে।

'একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাতৃহীন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিক্ষিতা সেবানিপুণা ধৈর্যশীলা নার্স আবশ্যক।' এইটিই এরা ইংরেজি দৈনিকে দিয়েছেন, যাতে যেমন তেমন আয়া এসে ভীড় না করে।

অবশ্য কলকাতার বাইরে এই ইস্পাত-নগরীতে কর্মপ্রার্থিনীর ভীড়ের প্রশ্ন কম, তবু এঁরা সাবধানতা অবলম্বন করেছেন।

ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ আমাদেরই দেওয়া কনডিশান সব নিচেই দেওয়া আছে—'

সুসীমা আর একবার কাটিংটার দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করল। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—ভদ্র পরিবেশ, থাকা খাওয়া উচ্চমানের, মাসিক বেতন তিনশত। বলল, 'দেখেছি।'

'তাহলে আপনি'—কাঁচাপাকা চুলওলা ভদ্রলোক যেন ইতস্তত করছেন। কারণটা হয়তো এই—এঁরা নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত ঘর বলে বিজ্ঞাপিত করে চাহিদার মান জানালেও এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার নার্স এসে হাজির হবে, এটা বোধ করি ধারণা ছিল না ভদ্রলোকের।

মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে থেকে মহিলাটিকে বা মেয়েটিকে দেখে নিলেন ভদ্রলোক, সুন্দরী কি রূপসী একথা মনে এল না তাঁর, শুধু মনে এল—ও বাবা, এই মহারাণীর মত মেয়ে ছেলের ধাই হতে এসেছে!

সুসীমার বেশে-বাসে গঠনে ভঙ্গীতে মুখশ্রীর দীপ্তি আর দৃষ্টির দৃপ্তিতে যেন সত্যিই একটি মর্যাদাময়ী মহিমাময়ী ভাব।

সুসীমার কথার ভঙ্গী কিন্তু খুব নম্র। বলল, 'কাজটা পেলে আমার সুবিধে হয়।'

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা তো এরকম একটি লোকের জন্যেই হাঁ করে রয়েছি।

মানে একেই তো ছেলেটির মা নেই, তার ওপর আবার বাবা, মানে আমাদের মালিক এম, এন, চ্যাটার্জি—ওঁকে হঠাৎ মাস তিনেকের জন্যে বাইরে চলে যেতে হল, ছেলে একেবারে ক্ষেপে-টেপে—'

'স্বাভাবিক।' বলল সুসীমা।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ গলায় বলেন, 'এইতো আপনি ঠিক ধরতে পারলেন, এটাই স্বাভাবিক। সবাই বাচ্চার সাইকল্যাজি বুঝতে পারে না। তাহলে এখন থেকেই—মানে আপনার জিনিসপত্র এনেছেন তো?'

সুসীমা বলল, 'হ্যাঁ, সুটকেস একটা আছে সঙ্গে, স্টেশনমাস্টারের ঘরে জমা রেখে এসেছি—'

ভদ্রলোক বললেন, 'সে কি, সে কি? রেখে এলেন কেন?'

সুসীমা একটু হেসে বলল, 'বাঃ চাকরিটা হবে কি না হবে তার ঠিক নেই—'

ভদ্রলোক বিব্রত বিপন্ন বিগলিত গলায় বললেন, 'এ কি বলছেন! আপনার মত একজন—আচ্ছা আমি এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি—'

সুসীমা ওঁর ব্যস্ততা দেখে মনে মনে হাসল। তবে মুখে খুবই নম্রতা দেখিয়ে বলল, 'না, আপনাকে আনিয়ে নিতে হবে না, আমি সাইকেল রিকশাটাকে দাঁড় করিয়েই রেখেছি। ভাবলাম ইন্টারভ্যুর জন্যে ঘণ্টাখানেক সময় লাগতে পারে। তা আপনার মালিক তো আবার—'

ভদ্রলোক আরো ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিছু না কিছু না। সাহেব আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে গেছেন। মানে আমার এ সংসারের ম্যানেজারও বলতে পারেন, কেয়ার-টেকারও বলতে পারেন, বাজার-সরকারও বলতে পারেন, আসলে সাহেবের তো আর—'

নিজস্ব ভঙ্গীতে অসমাপ্ত কথার মাঝখানে ড্যাস টেনে দিয়ে ভদ্রলোক একটু নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আর সংসার বলতেই বা কী? ওই তিন বছরের ছেলেটা।...আমার নাম সুরেশ ঘোষ, নিজের ঘর সংসার নেই, সাহেবই আমায়—'

সুসীমা বলল, 'এখানেই আপনাদের স্থায়ী বাস তো?'

সুরেশ ঘোষ বোধহয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু থেমে বললেন, 'স্থায়ী মানে আর কি! সাহেব যতদিন এখানে টেলকোয় চার্জ নিয়ে এসেছেন। তা বছর চার পাঁচ হল। আমিও তদবধিই আছি।...আপনি কি টাটা এক্সপ্রেসে এলেন?'...অর্থাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, এটাই সুবিধে মনে হল।' বলল সুসীমা, ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে। তারপর তাকিয়ে দেখতে লাগল চারিদিকে। জানলা দরজার পর্দা, দেয়ালের ছবি।

সুরেশবাবুর মনে হল মেয়েটি যেন বিমনা হয়ে যাচ্ছে। ভয় হল। তবে কি চাকরিটা নেবে কিনা দ্বিধা করছে?

কেন রে বাবা! শয়তান ছেলেটিকে তো দেখেনি এখনো। বাইরে থেকে কি কেউ বলেছে? কিন্তু কে-ই বা বলবে? বর্ত্তমান আয়া মালতির সঙ্গে তো এনার দেখাই হয়নি। তাছাড়া কেনই বা বলবে মালতি, সে তো স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। নেহাৎ যে ক'টা দিন শিক্ষিতা ধৈর্য্যশীলা নার্স না পাওয়া যায়, সেই কদিনের জন্যে তাকে খোশামোদ করে রাখা হয়েছে। আসলে তো সেটা বাসন মাজা ঝি, তাকেই ভবি্য করে আয়া বানানো হয়েছে কিন্তু আর তো চলে না, ছেলে যত বড় হচ্ছে ততই তো প্রবলেম প্রবল হয়ে উঠেছে।

বিমনা হবার মানে কী? মাইনে আরো বেশী চায়? তা চায় তো নিক না বাবা, এমন মানুষটি ফস্কে না যায়। এটা ঠিক, এ রকমটি আর মিলবে না।

সুরেশবাবু ব্যস্ত গলায় বলেন, 'দেখুন, বিজ্ঞাপনে আমরা একটা মোটামুটি ইয়ে ধার্য করেছি বটে, তবে আপনার যদি মনে হয়, ওটা কম হচ্ছে, তাহলে যা বলবেন—'

সুসীমা অবাক গলায় বলে, 'সে কী? কম মনে হচ্ছে একথা তো বলিনি আমি! ভাবিওনি।'

'বেশ বেশ। তাহলে ঠিক আছে। তা আগে আপনার ঘর-টর দেখে নেবেন, না আগেই স্টেশন থেকে—'

সুসীমা বলল, 'রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, আগেই ও কাজটা সেরে আসি।'

সুরেশবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে মনে ভগবানকে ডাকলেন। ভাগ্যিস!

কে বলতে পারে ছেলে দেখে মেজাজ ঘুরে যেত কি না। একেই তো সেই বিচ্ছু ছেলে, তার আবার ক'দিন জ্বর-টর হয়েছে, ইচ্ছে মত খেতে পাচ্ছে না।

সুসীমা গিয়ে রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে স্টেশনে যাওয়ার নির্দেশ দিল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তরতর করে বেরিয়ে গেল সে।

আসবে তো আবার! কে জানে বাবা! কিন্তু অপছন্দ হবার মত কিছু দেখেইনি এখনো।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন সুরেশ ঘোষ কিছুক্ষণ, তারপর নিশ্বাস ফেলে ভিতরে ঢুকে এলেন। আশ্চর্য কপাল সুরেশ ঘোষের! এই সময়টিতেই সাহেব নেই। সাহেব থাকতেই তো বিজ্ঞাপনটা দেওয়া হয়েছিল, কে জানত কোম্পানি একেবারে বিনা নোটিশে হঠাৎ বাইরে পাঠিয়ে দেবে ওঁকে। ঠিক এই সময়ই যেন ওদের ওই এস এন ব্যানার্জিকে আমেরিকা না পাঠালে চলছিল না।

এখন আফ্‌শোস হচ্ছে নিজে মেয়েটির সঙ্গে গেলেন না বলে। যদি আর না আসে। কিন্তু যাবেনই বা কোন ছুতোয়।

তারপর ভাবলেন, না আসবেই বা কেন? স্বেচ্ছায় এসেছে, সঙ্গে সুটকেসও এনেছে, তার মানে চাকরিটা দরকার। বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর চিঠিপত্র এসেছে অনেকগুলো, তাঁদের উত্তরও দিচ্ছেন সুরেশ ঘোষ, কিন্তু খুব মনঃপূত হচ্ছে না কোনটাই। ইংরেজি কাগজে দেওয়ার জন্যে অবাঙালীর কাছ থেকেই আবেদন এসেছে বেশী, তার মধ্যে প্রধানত মাদ্রাজী। সুরেশবাবুকে কাটলেও যাদের ভাষার একবর্ণও বুঝতে প'রবেন না।...বেহারীও রয়েছে, যাহোক হিন্দিতে চালিয়ে দেওয়া যায়, তবে কেউ কেউ বলেছে, ট্রেন ভাড়া পাঠাতে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে, বাড়িতে আর কোন মহিলা আছেন কিনা, দু'একজন আবার প্রশ্ন করেছে শিশুর মেজাজ কেমন, গাঁটের কড়ি খরচা করে স্রেফ চলে আসেনি কেউ। এবং বিনা প্রশ্নে রাজী হয়ে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠেনি।

তার মানে, টাকাটাই ওর কাছে জরুরী। অথচ মোচড় দেবার সুবিধে পেয়েও দিল না। তার মানে ভদ্র। আর বোধহয় সত্যিই শিক্ষিত। চেহারাটা যেন বড় ঘরের মত। পরিচয়টা নেওয়া হল না। কুমারী, না বিধবা? সধবাও হতে পারে। আজকাল তো সিঁদুর ফিঁদুর পরেও না সবাই। কিন্তু নামটাই বা জিগ্যেস করলেন কই সুরেশবাবু? দেখেই কেন যে কেমন অভিভূত হয়ে গেলেন। মেয়েটার রূপ এবং ভঙ্গীর জন্যেই বোধহয়।

স্টেশন থেকে ঘুরে আসবার টাইমটা দেখতেই হবে ধৈর্য ধরে। কিন্তু তারপর? তারপর আর কোন উপায়ই নেই যোগসূত্র স্থাপনের। যারা চিঠিপত্র দিচ্ছে, তাদের নাম ঠিকানা রয়েছে। এর তো কিছুই—

মনের চাঞ্চল্য দমন করতে না পেরে, ভিতরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন সুরেশবাবু, 'মালতি—'

মালতির ঝঙ্কার শোনা গেল, 'কি বলছেন ম্যানেজারবাবু এখানে এসে বলেন! আমার এখন মরণের টাইম নাই।'

মরণের টাইম নাই। অতএব এগিয়ে গেলেন সুরেশবাবু। গিয়ে দেখলেন বিছানার উপর বসে আছে সাগর, তার চারিপাশে বালিশ-টালিশ লণ্ডভণ্ড ভাবে ছড়ানো, ঘরের মেঝেয় দুধের সাগর বইছে। তার সঙ্গে কাঁচের গ্লাস ভাঙা টুকরো।

সাগরের মুখ হিংস্র, তার মুঠোর মধ্যে মালতির শাড়ির একাংশ এমনভাবে ধরা, উঠে চলে যাবার চেষ্টা করলে মালতিকে শাড়িটা ফেলে রেখে শুধু সায়া পরে চলে যেতে হবে।

অথচ সাগরের মুখে বাক্যি-টাক্যি নেই। এক এক সময় এইরকম নীরব হিংস্র হয়ে ওঠে সাগর।

সাগরের রং অতিরিক্ত ফরসা, চুল আর চোখ ধূসর। সাগরের গড়ন রোগাটে, মুখটা শুকনো। খুব সম্ভব ক'দিনের জ্বরে আরো শুকনো।

সুরেশবাবু খুব সন্তর্পণে বললেন, 'কি হল?'

মালতি তীব্র কণ্ঠে ব'লে উঠল, 'কি হল সে তো দেখতেই পাচ্ছেন! আজই আমায় ছেড়ে দেন ম্যানেজারবাবু। দেহে প্রাণটা থাকতে থাকতে বিদেয় হই! উঃ কি ছেলে! পিচেশ, না দ্যোত্যি তা জানিনে।'

সুরেশবাবু আস্তে বলেন, 'সাগর মালতির কাপড়টা ছেড়ে দাও বাবু—'

সাগর একবার তাচ্ছিল্য ভরে তাকিয়ে দেখে হাতের মুঠোটায় আরো একটা পাক দেয়। যাতে শাড়ির আরো খানিকটা অংশ ওর কবলিত হয়ে যায়।

সুরেশবাবু ভীত চক্ষে ছেলেটির দিকে তাকান। তারপর তেমনি ভীত গলায় বলেন, 'মালতি, একটু আগে একটি মেয়ে এসেছিল, দেখেছিলে?

মালতি তীব্র কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'আমার বাবা এলেও দেখতে পেতুম্‌নি ম্যানেজারবাবু, তা মেয়ে।'

'না মানে মেয়েটি তো বলে গেল ছেলে দেখার কাজটা নেবে। তবে ঠিক আসবে কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আসবে নাই বা কেন, অ্যাঁ? চাকরি করবে বলেই তো এসেছে—

মালতি বেজার গলায় বলে, রোজই তো আপনার কাছে লোকের গপ্‌পো শুনি। চিঠি নিকেচে, আসব বলেচে তা আসুক চাই না আসুক, আমি আজ বিদেয় নিচ্ছি। সাহেব নেই বলে যদি মাইনে আটকে রাখেন, রাখুন। আমি যাবই!

সুরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'আহা মাইনে আটকে রাখার কথা উঠছে কেন? আমি তো তোমায়, মানে, মেয়েটি যদি—'

হঠাৎ সাগর ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে আসবে?'

সুরেশবাবু তাড়াতাড়ি বলেন, 'তোমার নতুন মাসি।'

সাগর হিংস্র গলায় বলে, 'না, আসবে না, এলে আমি মেরে শেষ করব, চুল ছিঁড়ে দেব, গলা কেটে দেব।'

সুরেশবাবু নরম গলায় বললেন, 'ছি, বাবু, ও কথা বলতে নেই। দেখবে উনি কত ভাল!'

'না—আ!' সাগর আপ্রাণ চেঁচায়, 'ভাল না হাতী। আমি ওকে খাট থেকে ফেলে দেব।' বলে বালিশগুলো তুলে নিয়ে খাট থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই অবকাশে মালতি বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠে পালায়।

সুরেশবাবু বিচলিত চোখে ঘরের দৃশ্যটি দেখতে থাকেন। এই দৃশ্যের সঙ্গে সুরেশবাবু সেই মেয়েটিকে মনে করেন। প্রথম এসেই যদি ঘবেব এই দৃশ্য দেখে, মানসিক অবস্থাটি কেমন হবে তাব? মালতি আর এ ঘরে সহজে ঢুকছে না, এটা নিশ্চিত। নিরুপায় হয়ে ঘরমোছা চাকরটাকে ডাক দিতে বেরিয়ে আসেন, আব দেখেন সেই চাকরটা বলতে বলতে এগিযে আসছে—এই মাত্তর যে মেয়েছেলেটা এসে আবার চলে গেছল, সে আবার এসেছে ম্যানেজারবাবু।'

সকলের আগে তাকে নামটাই জিজ্ঞেস কবলেন সুরেশবাবু। যেভাবে বললে শোভন হয।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'মিস মিসেস্ কিছু বলতে হবে না আপনাকে, স্রেফ 'সুসীমা' বলে ডাকবেন।'

সুরেশবাবু কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বললেন, 'তা কি করে হয়?'

'কী মুশকিল! কেন হবে না? আমি তো আপনার মেয়ের বয়সী। কী, আপনার মেয়ের বয়স আমার মত হবে না?'

সুরেশবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'মেয়ে থাকলে হয়তো তাই হত। তবে ঘর সংসার তো করিনি, বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়িয়েছি। সাহেবই প্রথম আমায় ঘরবাসী করেছেন। এমন মানুষ হয় না, দেবতার মতন।'

সুসীমা অভিভূতের মত বলে, 'তাই বুঝি?'

সুরেশবাবু আক্ষেপের গলায় বলেন, 'এসেই প্রথম নম্বর দেখতে পেলেন না, এই দুঃখ। যাই হোক এসে যাবেন শীগগিরই। তিনমাসের মধ্যেই এসে যাবেন।'

সুসীমা বলে, 'তা এইবার আমার আসল ডিউটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।'

সুরেশবাবুর মনের চোখে সেই আসল ডিউটির ঘরের দৃশ্যটা ভেসে ওঠে।

সুরেশবাবু প্রমাদ গুণে বলেন, 'আহা সেই পরিচয় তো হবেই। এখন নিজের ঘরটা দেখে-টেখে নিন, হাত-মুখ ধুয়ে নিন, ট্রেনে এসেছেন একটু বিশ্রামের দরকার।'

কিন্তু সুরেশবাবুর বাধা দেবার চেষ্টা বৃথা হয়। বিশ্রামের প্রশ্নটা হেসেই ওড়ায় সুসীমা।—মাত্র ঘণ্টাকয়েকেব

ট্রেন-জার্ণিতে আবার বিশ্রাম কিসের, বলে হাসে, এবং নিজের ঘর সম্পর্কে কোন রকম ঔৎসুক্য আগ্রহের লেশ না দেখিয়ে, তার চাকরির ফাইলটি দেখার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অগত্যাই সুরেশবাবুকে বলতে হয়, 'তবে চলুন। ব্যাপার হয়েছে কি সাহেব রওনা দেবার পরই জ্বর হয়ে গেল বাচ্চাটির, ইচ্ছে মতন খেতে-টেতে তো পাচ্ছে না, রেগে যাচ্ছে। এইমাত্র দেখে এলাম দুধের গ্লাস উল্টে ফেলে ঘরের চেহারা যা করেছে না—'

সুসীমা হেসে ফেলে বলে, 'সে তো অনুমানই করছি। আপনাদের বিজ্ঞাপনের চাহিদার মধ্যে একটা কথা ছিল, 'ধৈর্যশীলা' সেটা আমার মনে আছে।'

সুরেশবাবু অভিভূত হন। একী নিধি পেলেন তিনি! তবু ভয় হচ্ছে; ভাগ্যে কি টিকবে? সাহেব আসা পর্যন্ত কি ধরে রাখতে পারবেন? ইস্, সাহেব থাকতে যদি এসে যেত মেয়েটা। সুরেশবাবুর আর কোন দায়িত্বই থাকত না। যা কিছু জানাবার তিনিই জানাতেন। সুরেশবাবু কি জানেন, কতটুকু বলতে হবে কতটুকু জানাতে হবে। ভাববার সময়ও তো পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কিছু না বলে দিলেও তো দেখে চমকে যেতে পারে।

সুসীমাকে সঙ্গে করে সাগরের কাছে নিয়ে যেতে যেতে সুরেশবাবু নীচুগলায় বলেন, সাহেব উপস্থিত না থাকায় আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়াই উচিত মনে হচ্ছে, না হলে আপনি হয়তো—মানে বাচ্চাটির মা ছিলেন একজন ইউরোপিয়ান লেডি। কিন্তু খুবই দুঃখের ঘটনা. শিশুটি যখন মাত্র বছর দেড়েকের তখন তিনি—' সুরেশবাবু মাথা নীচু করেন।

সুসীমা মৃদু গলায় বলে, 'মারা গেলেন?

সুরেশবাবুর মুখটা একটু পাংশু দেখাল। বললেন, 'হ্যাঁ তাই-ই। সেই অবধি সাহেবের যা অবস্থা! দেখলে দুঃখ হয়।'

সুসীমা আস্তে বলে, 'এক একজনের ভাগ্যই দুঃখের হয় সুরেশবাবু। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সুখের উপকরণ ওর হাতে সবই মজুত, কিন্তু—'

'ঠিক বলেছেন আপনি, ঠিক বলেছেন।' সুরেশবাবু কৃতজ্ঞ গলায় বলেন, যথার্থ শিক্ষিতা তো।

যথার্থ শিক্ষিতা মহিলাটিকে নিয়ে সেই বেহেড ঘরের দরজায় এসে পৌঁছলেন সুরেশবাবু। দেখা গেল ঘরের চেহারা একই আছে, ক্ষুদে চাকর গণেশ সাবধানে মাটি থেকে কাঁচের টুকুরো কুড়োচ্ছে, আর সাগর হি হি হেসে হেসে বলছে, 'বেশ হবে, ঠিক হবে, তোর হাতে কাঁচ ফুটে যাবে, রক্ত পড়বে—'

সুরেশবাবু ম্লান গলায় বলেন, 'আপনাকে বলছিলাম না—'

'আপনি'টা আপনি ছাড়ুন সুরেশবাবু, তা নাহলে আমার খুব অসুবিধে হবে।'

সুরেশবাবু বিপন্ন ভাবে বলেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তাই হবে।'

তারপর খুব সাবধানে বলেন, 'সাগর, এই তোমার নতুন মাসি। সেই যাঁর আসার কথা বলছিলাম তখন—'

সাগর খাটের উপর দাঁড়িয়ে উঠে বলে ওঠে, 'বলেছিলাম না নতুন মাসি আসবে না। এলে আমি গলা কেটে দেব।'

সুরেশবাবুর বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে সুসীমা কৌতুকের সঙ্গে একটু করুণাও অনুভব করে। কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলে না, দিব্যি হৈ হৈ গলায় বলে ওঠে, 'নিশ্চয়। দেবেই তো। কে ওই মাসিকে আসতে বলেছে? মাসিটাসি এলে তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে মেরে শেষ করে দেব না?'

সাগর বোধহয় ঠিক এ রকমের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই সন্দেহের গলায় বলে, 'তাহলে তুমি কে?'

'আমি?' সুসীমা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'আমি তো আন্টি।'

'আন্টি?' সাগর চোখ কুঁচকে দেখে নেয়, বোধহয় অনুধাবন করতে চেষ্টা করে ওর সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার সঙ্গত, তারপর বলে, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

'বাঃ কলকাতা থেকে তো? ওঁরা তোমায় বলেননি আমি আসব?'

সাগর তীব্র ছন্দে বলে, 'ওরা আমায় কিছু বলে না, দারুণ পাজী।'

বছর চারেকের ছেলেটার ভাষার ছটায় বিগলিত সুসীমা দ্রুত গলায় বলে 'এই সেরেছে। ওই ভাবে কথা বলছ? ভগবান রেগে যাবেন না?'

এই ছেলেকে যে 'ছি বাবা, বলতে নেই' ভাষায় নিবৃত্ত করতে যাওয়া নিছক বাতুলতা, তা এক নজরেই বুঝে ফেলে সুসীমা।

সাগর থমকে গিয়ে বলে, 'কি করে? ভগবান কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে?'

'নিশ্চয়!' সুসীমা বলে, 'সক্কলের সব কথাই শুনতে পান।'

'ছাই পান! সব তোমার গুল্'—সাগর হি হি করে হেসে উঠে বলে 'আমায় ঠকাতে এসেছ।'

তবু ভাল যে হেসেছে। সুরেশবাবু আশান্বিত চিত্তে বললেন, 'কিন্তু আপ—মানে তোমার তো চা-টা খাওয়া হল না।'

'হবে, হবে, তাড়া কি?' বলে সুসীমা সাগরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি বল সাগর, চা খাওয়ার তাড়া কী? পরে খেলেই হবে।'

সাগর কড়া গলায় বলে, 'না পরে না, তুমি এক্ষুনি চা খাবে, বিস্কুট খাবে, কেক্ খাবে, রসগোল্লা খাবে।'

সুসীমা আতঙ্কের ভানে বলে, 'ওরে বাবা, এত খেতে হবে?'

সাগর আত্মতৃপ্ত গলায় বলে, 'হবেই তো, আমায় কেন গাদা গাদা খেতে দেয়।'

সুসীমা বলে, 'আর হবে না। আমি সক্কলকে বকে দেব। গাদা গাদা খেতে বিচ্ছিরি লাগে না বুঝি?'

সাগর আবার ভুরু কুঁচকে বলে, 'তুমি থাকবে?'

'থাকবই তো।'

'ক'দিন থাকবে?'

'যদি তুমি রাগ না কর তো অনেক দিন।'

সাগর উদার গলায় বলে, 'আমি কেন রাগ করব? তোমার যতদিন ইচ্ছে থেকো। চিরকালও থাকতে পারো।'

সুসীমা হেসে উঠে বলে, 'অতটা বোধ হয় পেরে উঠব না। কিন্তু আমি একা একা খাব? এস না দুজনে মিলে খাই। সুরেশবাবু আছেন এখানে? কাউকে বলুন না, আমাদের দুজনের খাবার এনে দিতে। সাগর বাবুর তো দুধ খাওয়া হয়নি।'

সাগর ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আমি দুধ খাব না, তুমি যা খাবে, তাই খাব।'

'ও মা, তা আর বলতে,' সুসীমা বলে, 'যাই দেখিগে ওরা কি দিচ্ছে আমাদের।'

সুরেশবাবু যে এতক্ষণ দরজার আড়ালেই ছিলেন তা বুঝতে দেরী হয়নি সুসীমার। এদিকে চলে আসতে তিনিও সরে আসেন। উৎফুল্ল মুখে বলেন, 'তুমি পারবে।'

সুসীমা হেসে বলে, 'এখুনি অত আশা পোষণ করবেন না।'

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে রোগীর সঙ্গে রোগীর খাদ্য খেয়ে তাকে ওষুধ খাইয়ে এবং গল্প-টল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে যতক্ষণে ছুটি হল ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে।

এতক্ষণে সুরেশবাবুর নির্দিষ্ট ঘরে এসে দাঁড়ায় সুসীমা। চারিদিক তাকিয়ে একটু হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে।

'খাওয়া থাকা উচ্চমানের' এই ভাষাটা নেহাৎ বিজ্ঞাপনের ভাষা নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। তবু এতটা উচ্চমানের হবে এমন আশা ছিল না। ডান্‌লোপিলোর গদিদার সিঙ্গল খাট, শৌখিন ডিজাইনের ড্রেসিং টেবল্, ছোট আলমারী। নীচু ওয়ার্ডরোব, খাটের ধারে টেবিল চেয়ার, দেয়ালের ধারে একখানা টানা লম্বা সোফা, মেঝেয় কার্পেট, সুদৃশ্য পাপোষ। হাতের কাছে বেডসুইচ, সুন্দর টেবল ল্যাম্প, ছোট বুক শেলফ্, জানালার বেদীতে ক্যাকটাস, নীচু আলমারির মাথায় ফুল সমেত ফুলদানী। এ কে ধারণা করতে পারে?

এক কথায় একটি সুরুচিসম্পন্ন শৌখিন মানুষের একক কক্ষ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ ঠিক তেমনটি।

কিন্তু কার জন্যে সাজানো এই ঘর? সুসীমা আসছে একথা কি জানা ছিল এদের?

'এই তোমার ঘর। যদি কিছু অসুবিধে হয়, জানাবে।' বলে চলে যান সুরেশবাবু।

সুসীমা খাটের উপর বসে পড়ে। সুসীমার মুখের উপর যেন একটি হালকা সূক্ষ্ম হাসির জাল। সুসীমা আরো হালকা উচ্চারণে প্রায় মনে মনেই বলে, 'আমার ঘর!'

তারপর ভাবে অবোধেরা কত অনায়াস অবলীলায় কত অবাস্তব কথা উচ্চারণ করে বসতে পারে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি গেছে, তবু সুসীমার যেন শুয়ে পড়ার তাড়া নেই। সুসীমা ঘরটাকে নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে। কে থাকত এ ঘরে? কার জন্যে সাজানো গোছানো হয়েছিল এই ঘর? সেই ইউরোপিয়ান লেডির জন্যে?

তা তাঁর জন্যে একক শয্যার ঘর কেন? মৃত্যুর আগে কি মহিলা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছিলেন? তাই তাঁর জন্য একক কক্ষের প্রয়োজন হয়েছিল? তা সেও তো অনেক দিনের বিগত ঘটনা।

আচ্ছা, শুধু ঘরটা দেখে কি বোঝা যায়, এ ঘর মহিলার অধিকৃত ছিল, কি পুরুষের? ড্রেসিং টেব্‌লটায় কি মহিলার ব্যবহারের ছাপ আছে?

সুসীমা ভাবল, আশ্চর্য, সম্পূর্ণ অজানা এই নতুন জায়গাটায় এসে আমার কিছু ভয় করছে না কেন?

ভয় করছে না, তবু সুসীমা উঠে ঘরের দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা খুলে দেখে নিল। এই বাড়ির এই ঘরের সঙ্গে মানানসই বাথরুমের সাজসজ্জা, পাশের দিকে জমাদার ঢোকার দরজাটা শুধু ছিটকিনি দিয়েই বন্ধ নয়, একটা তালাচাবিও লাগানোর রয়েছে।

অতএব নিরাপত্তার অভাব নেই। তবে যেন মনে হচ্ছে দরকার ছিল না, এত নিরাপত্তার দরকার ছিল না। হয়তো দরকার হত, যদি বাড়ির মালিক উপস্থিত থাকতেন। কে বলতে পারে, কী তাঁর মতিগতি, কী তাঁর ধরণ!

যাক, আপাতত তিনমাসের জন্য তো নিশ্চিন্ত, মনে মনে বলে নিল সুসীমা। তারপর ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, বেডরুম লাইটটা জ্বেলে নিয়ে শাড়ি জামা বদলাবার প্রস্তুতিতে হাত লাগাল।

মৃদু নীল আলোয় প্রায় নিবাবরণ দেহের স্বপ্নিল ছায়াটা প্রকাণ্ড লম্বা আয়নাটার গায়ে প্রতিফলিত হল। সুডৌল সুঠাম এই সুগঠনা নারীমূর্তির দিকে যেন মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইল সুসীমা একজোড়া পুরুষের চোখ নিয়ে।

আশ্চর্য, আমি সারারাত দিব্যি চমৎকার একখানা ঘুম ঘুমিয়েছি! ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতেই কথাটা ভেবে নিল সুসীমা। ঘুমের কোন ব্যাঘাত হল না, সারারাত কোন অশরীরি আত্মার অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল না, কোন কৌতুকপরায়ণা কঙ্কালের হাড়ের খটখটি শুনতে পেলাম না। শুলাম, আর ঘুমিয়ে পড়লাম! ছিঃ! আমি একটা কী!

উঠে পড়ল সুসীমা, পাপোসের কাছ থেকে চটিটা টেনে নিয়ে পায়ে গলিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরের ঢাকা বারান্দায়।

এখন খুব ভোর, তবু এখনই এখানে মাঝখানের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। তার মানে টিপটপ, নিয়মের বাড়ি। লোকজন ট্রেন্‌ড। কিন্তু কারো সাড়া শব্দ নেই।

সুসীমার হঠাৎ তার বাবা মারা-যাওয়ার পরের দিনের ভোরবেলাটার কথা মনে পড়ে গেল। অকারণেই! কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য নেই, তবু।

মনে পড়ল অনেক রাত্রে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছল সুসীমা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল যখন, তখনো খুব ভোর কেমন যেন আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুসীমা, কাউকে দেখতে পেল না।

মা কোথায় কে জানে! মায়ের মা আর বোনেরা এসেছেন, কোন একটা ঘরে পড়ে আছেন তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায়। সুসীমা আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় নেমে এল, সেখানেও কেউ কোথাও নেই, শুধু এখানে সেখানে কিছু ছেঁড়া ফুল ছড়ানো, শুধু এখানে ওখানে বিসদৃশ দু-একটা জিনিষ পড়ে। বোধহয় কাত হয়ে

গড়িয়ে থাকা একটা ঘটি, একখানা তালপাতার পাখা, একখানা দড়ি পাকানো শুকনো গামছা।

একা ওই স্তব্ধতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুসীমার গা ছমছম করে উঠেছিল, সুসীমা খালি মেঝেয় বসে পড়েছিল দেয়ালে ঠেশ দিয়ে।

সেই পরিবেশের সঙ্গে আজকের এই ছিম্‌ছাম ফিট্‌ফাট পরিবেশের কোন সাদৃশ্য নেই, তবু কেন কে জানে সুসীমার সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। সুসীমার রাত্রে একটুও গা ছমছম করেনি, এখন এই ভোর আকাশের কোমল আলো আর গা জুড়ানো বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুসীমার গা ছমছম করে এল, গা থরথর করে উঠল। অদ্ভুত বৈ কি?

সুসীমার ইচ্ছে হল সেদিনের মতই মাটিতে বসে পড়ে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ভোরের স্তব্ধতা ভেদ করে সাগরের চিৎকার শোনা গেল, 'তুই কেন আমার কাছে শুয়েছিলি? তুই কেন আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস!'

এরপর মালতির গলাও শোনা গেল, 'আমার কপাল? আর কেন! ম্যানেজার বাবুর হুকুম আরো পাঁচদিন থেকে নতুন আয়াকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে। ছেড়ে দাও না বাবা, আমি আজই দেশে চলে যাই।'

ওদের কথার বাঁধুনিতে নতুন আয়ার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

সুসীমাকে দেখে সাগর উথলে উঠল, 'তুমি কেন অন্য ঘরে শুয়েছিলে? মালতি কেন আমাব গায়ে হাত ঠেকিয়েছে—'

সুসীমা চটপট বলে ফেলল, 'কী আশ্চর্য মালতি, তুমি ওর গায়ে হাত ঠেকিয়েছ? না তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। যাও যাও তুমি চা-টা খাও গে, সাগরের কাছে তো শুধু সাগরের আন্টি থাকবে, তাই না?'

চট করে সাগরের মুখে অলৌকিক হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সাগর সেই হাসি নিয়ে বলল, 'তুমি আমায় মুখ ধুইয়ে দেবে? তুমি আমায় জামা পরিয়ে দেবে।'

সুসীমা বলল, 'নিশ্চয়।'

মালতি একটা জ্বালা ভরা চোখে তাকিয়ে বলে, 'কর না কর, জন্ম জন্ম কর, মেমসাহেবের বেটাকে সামলানো তোমার মতন মেমসাহেবেরই কাজ। আমি ম্যানেজার বাবুর কাছে আজই ছুটি করিয়ে নিচ্ছি।'

এও এক মজার মনস্তত্ত্ব, যে কাজে মালতি নিজে অহরহ ত্রাহি ত্রাহি করছে, চলে যাবার জন্য অস্থির হচ্ছে, সেই কাজই অন্য আর একজন দখল করতে এল দেখে এখন ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলতে শুরু করেছে।

ঘরের বিছানাপত্র পাট করতে করতে মালতি আপন মনে গজ গজ করতে থাকে, 'এতটুকুন বয়েসে মা তো ফেলে চলে গেল, সর্ববিধ করা করে মানুষ করে তুলল কে? এই মালতি ছাড়া আর কেউ ছিল? এখন মালতি দু'চোক্ষের বিষ হয়েছে। দেখব ওই বিবি মাসি ক'দিন সুচক্ষের মধু থাকে।'

সুসীমা আস্তে সরে এল। কিন্তু সরে আর কতক্ষণ থাকবে? কতক্ষণ থাকা যায়? উগ্র ভালবাসার মত অত্যাচার আর কী আছে?

যে অত্যাচারে সেই একজনের মত সাজানো ছিমছাম ঘরটি ছেড়ে সাগরের ঘরে এসে শুতে হয়, আগে সাগরকে ঘুমোবার গল্প বলতে হয়, আর সাগরের কাছে সাগরের বাবার গল্প শুনতে হয়। ওটা না শুনলে রক্ষে নেই।

সাগর বলবে, 'আমার বাপী না, হিমালয় পাহাড়ের মতন উঁচু বুঝলে?'

সুসীমাকে বলতে হবে, 'ওরে বাবা! বল কী? এত উঁচু মানুষ তো কক্ষনো দেখিনি।'

সাগর পরিতৃপ্তির হাসি হাসে, 'দেখবে। বাপী বিলেত থেকে আসুক।'

সুসীমাও হাসে, 'আর আমি যদি তখন না থাকি?'

সাগর অবাক হয়ে বলে, 'কোথায় যাবে?'

'যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে।'

সাগর কপাল কুঁচকে বলে, 'তোমার নিজের বাড়িতে?'

'নাঃ। 'নিজের কিছু বাড়ি টাড়ি নেই আমার।'

'তবে কোথায় থাকবে?'

'এমনি অন্যদের বাড়িতে।'

'কে তারা?'

'এই চেনা-টেনা লোক-টোক?'

'তারা তোমায় ভালবাসে?'

সুসীমা মৃদু হেসে বলে, 'একটু একটু'।'

সাগর সদম্ভে ঘোষণা করে, 'তুমি যেখানে যাবে না। আমার কাছে থাকবে।'

'তুমি তো আমায় মারো।'

সাগর কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলে, 'সে তো রাগ হলে—'

'তোমার তো রোজই রাগ হয়।'

'তুমি রোজই দুধ খেতে বল যে—'

'কাল তো দুধ খেতে বলিনি। শুধু চকোলেট খেতে দিয়েছিলাম।' সাগর গতকালের ঘটনা স্মরণ করে অবলীলায় বলে, 'তুমি চুল আঁচড়ে দিতে লাগিয়ে দিয়েছিলে কেন?'

'ও, তা বটে। এবার থেকে আর লাগবে না। তাহলে মারবে না তো? আচ্ছা সাগর, তোমায় যদি কেউ মারে তোমার লাগে না?'

'ইস, মারবে বৈকি।'

'বাঃ তুমি লোককে মারবে—'

সাগর সগর্বে ঘোষণা করে, 'আমি তো বাপীকেও মারি। দুম দুম করে মারি।'

সুসীমা যেন আকাশ থেকে পড়ে। সুসীমা মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'অ্যাঁ! সে কী? তুমি বাপীকে মাবো!'

সাগরের মুখে সেই দিব্য জ্যোতি মাখা একটি অলৌকিক হাসি ফুটে ওঠে, 'কেন মারব না? বাপী কেন অফিস চলে যায়?'

'বাঃ, বাপীদের তো অফিস যেতেই হয়। সব্বাইয়ের বাপীই অফিস যায়। যায় না? তোমার বন্ধুদের বাপীরা?'

সাগর গম্ভীর আত্মস্থ গলায় বলে, 'আমার কোন বন্ধু নেই।'

সুসীমা আবার মাথায় হাত দেয়। আবার আকাশ থেকে পড়ে, 'বন্ধু নেই? ইস্, এমন কথা তো কক্ষনো শুনিনি। পৃথিবীতে সব্বাইয়েরই বন্ধু থাকে।'

সাগর একটু বিমনা হয়ে যায়। সন্দেহের গলায় বলে, 'চোরেদেরও থাকে।'

'নিশ্চয়। চোরেদের চোর বন্ধুই থাকে।'

'আর ডাকাতদের?'

'তাদেরও ডাকাত বন্ধু থাকে।'

'আর রাক্ষসদের?'

'তাদেরও তাই। রাক্ষস বন্ধুই থাকে।'

সাগর জোরে জোরে বলে, 'বাপী এলে বলব অনেক বন্ধু কিনে এনে দিতে।'

সুসীমা যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, এতে সাগরের ভারী স্ফূর্তি, তাই সুসীমাকে মুহুর্মুহুই মাথায় হাত দিতে হয়, হায় হায় করে বলতে হয়, 'বন্ধু আবার কিনে আনা যায়?'

সাগরও মাথায় হাত দেওয়ার দৃশ্যে উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'কেন যাবে না? বাপীর কত টাকা আছে জানো? আকাশের মতন।'

সুসীমা মাথা নাড়ে, 'তা হলেও হবে না। বন্ধু নিজে জোগাড় করতে হয়।'

সাগর অতএব ক্রুদ্ধ, 'কি করে? আমি কি রাস্তায় যাই?'

আর কথা বাড়ানো সমীচীন বোধ করে না সুসীমা, মুহূর্তেই পরিস্থিতি ওলোট পালোট হয়ে যেতে পারে।

অতএব সুসীমাকে বোকা হাঁদা বুদ্ধু সাজতে হয় এবং নিজের ভুল স্বীকার করতে হয়।—সত্যিই তো যে একা একা পথে বেরোতে পারে না, সে আবার বন্ধু জোগাড় করবে কোন সূত্রে? সুসীমা নেহাৎই বুদ্ধু তাই বলছে—'

নতি স্বীকার করলে সাগরের প্রসন্নতা অর্জন করা যায়, এ তথ্যটি জানা থাকলেও মালতি কিছুতেই সেটুকু করতে রাজী হত না। এমন কি গণেশ, যে গণেশ সাগরের কাছে মার খেতে খেতে যার জান যাচ্ছে, সেও না। কিছুতেই বলবে না, আমার ভুল হয়েছে, আমি বোকা—সুসীমাকে মিনিটে মিনিটে সেই নতি স্বীকার করতে হয়। সাগর উৎফুল্ল হয়, উৎসাহিত হয়, উদ্ভাসিত হয়।

সাগর এখন আহ্লাদ ভরা কণ্ঠে বলে, 'বাপীও বুদ্ধু!'

সুসীমার মুখে একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। সুসীমা বুককেসের উপর রক্ষিত ফটোস্ট্যাণ্ডে রাখা ফটোটার দিকে তাকায়। না, চেহারা দেখে এ সন্দেহ কেউ করতে বসবে না লোকটা বুদ্ধু।

সাগরের খাটটা এমন জায়গায় বসানো যে, এখানে বসলেই ওই ছবিটা দেখতে হবে, দেখে দেখে মুখটা মুখস্থ হয়ে যাবে।

সুসীমার মুখস্থ হয়ে গেছে—ওই মুখটার মধ্যে চোখ দুটো দীপ্ত দীপ্ত বুদ্ধি উজ্জ্বল, নাকটা যতটুকু চোখা হলে লাবণ্য হারায় না ঠিক ততটুকু চোখা, ঠোঁটের গঠন ভঙ্গিমায় আশ্চর্য একটি সৌকুমার্য, অথচ দৃঢ়তার ছাপ কপাল প্রশস্ত, চোয়াল সুগঠিত এবং সবটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আকর্ষণময়। যেন ঘরে ঢুকলে তাকাতেই হবে, আর তাকালেই বার বার তাকাতে হবে।

তবে খুব সাবধানে তাকাতে হয়, বিচ্ছু ছেলেটির কোন কিছুই চোখ এড়ায় না। একদিন তো বলেই বসেছিল, 'তুমি খালি খালি বাপীর ছবি দেখছ যে?'

সুসীমাকে অতএব অবলীলায় বলতে হয়েছে, 'ও মা! দেখব না? দেখে দেখে চিনে রাখতে হবে না? যখন আসবেন, যদি চিনতে না পারি?'

সাগর আশ্বাসের গলায় বলেছে, 'আমি তো চিনিয়ে দেবই।'

সুসীমা আতঙ্কের ভাণ করে, 'ও বাবা আমি সামনেই যাব না। যদি ভয় পাই?'

'ভয়?' শুকনো শুকনো মুখ, কিন্তু টুকটুকে ঠোঁট ঝিকঝিকে দাঁত, সেই দাঁতে ঝিলিক্ দিয়ে হেসে ওঠে সাগর, হাসতে থাকে—'বাপীকে তুমি ভয় পাবে? বাপী বাঘ? বাপী ভালুক? বাপী রাক্ষস?'

সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে সেই হাসির ঢেউ।

সুরেশ ঘোষ প্রায় করজোড়েই বললে, 'কি বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব মা। তুমি অসাধ্য সাধন করছ। ওই ছেলের মুখে এমন হাসি!'

সুসীমা একটু হাসে।

'কোন্ মন্ত্রে যে তুমি ওকে বশ করলে মা?' সুরেশ ঘোষের অভিভূত উক্তি।

সুসীমা বলে, 'আসলে প্রবলেম্ চাইল্ড সম্পর্কে একটু বিশেষ চিন্তার দরকার থাকে। ওরা যখন দেখে ওদের ঠিকমত বোঝা হচ্ছে না, দারুণ ক্ষেপে যায়। আর ওদের ইচ্ছের অনুকূলে রায় না দিয়ে প্রতিবাদ করলে তো কথাই নেই।' সুসীমা একটু হাসে। সেই হাসির মধ্যে অনেকখানি ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়।

মালতি চলে গেছে কিন্তু যাবার আগে পাড়ার লোকের কাছে অনেক বিষ-উদ্‌গীরণ করে গেছে। এবং এই অভিমত ব্যক্ত করে গেছে—'ওই ঘুঘু সুরেশ ঘোষের সঙ্গে নিশ্চয়ই আগে থেকে যোগসাজস ছিল ছুঁড়ির, তা নইলে ওই রকম রূপসী যুবতী বিদ্যেবতী একখানা মেয়ে আয়ার কাজ করতে আসে?'

'আর কিছুই নয়, ওই আয়াই এরপর বাড়ির গিন্নি হবে, সেই মতলবেই ওকে নিয়ে এসেছে বুড়ো, যাতে আগে থেকে ছেলের মন ভিজিয়ে হাত করে ফেলতে পারে। নচেৎ ওই মেমের ছানা কি সৎমাকে স্থলকূল দেবে? আয়া! আয়া হলে তার এত সমাদর? যেন কুটুম-কন্যে এসেছে! মালতি এ যাবৎ আয়ার কাজ করে এল, কই, কবে তাকে সাহেবের টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছে, রবারের গদিতে শুতে দেওয়া হয়েছে?'

অপরের বাড়ির দাসদাসীর মুখে তাদের হাঁড়ির খবর জানতে পাওয়া গিন্নী মহিলাদের প্রধান প্রধান কয়েকটি সুখের মধ্যে অন্যতম সুখ। কাজেই মালতি অবহেলিত হয় না। লোকে তাকে সমাদর করে বসিয়েছে, চা খাইয়েছে। এমন কি তাকে রাখবার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছে, তবে সে এখন বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত।...ঝাড়গ্রামে বাড়ি তার, টাটায় আসতে আর কতক্ষণ? আসবে আবার। সাহেব বাড়ির নতুন নাটক দেখবে।

অনেক নাটক তো দেখা হয়েছে, আবার কোন্ নাটক নামে দেখা যাক।

কিন্তু সুসীমাও কি কোন একটা নাটকের প্রতীক্ষা করছে না? সুসীমা যখন ওই ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ সরাতে ভুলে যায়, তখন তার হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত স্বাভাবিক চলাচলের নিয়ম লঙ্ঘন করে উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় না? ওই ছবিটা জলজ্যান্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে না?

নির্জনতা বড় দুর্লভ। একাকীত্বের প্রশ্ন স্বপ্নমাত্র। রাহুর প্রেমে আঁকড়ে ধরে আছে ওই ছেলেটা সুসীমার দিনের সমস্ত ক্ষণটুকু।

শুধু রাত্রে ছুটি। তাও তার অফুরন্ত চাহিদার গল্প শোনাতে শোনাতে তো নিজের চোখে ঘুম ভেঙ্গে আসে।

তবু কোন কোন রাত্রে সাগরকে ঘুম পাড়িয়ে পিছনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বসে সুসীমা। এখানেও বেতের চেয়ার ছড়ানো আছে দু-তিনখানা।

সুসীমার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। যেন এক অভিশপ্ত যক্ষপুরী। শূন্য কক্ষ, শূন্য অলিন্দ, শূন্য বাতায়ন। বলতে কি, সবই একটা অর্থহীন শূন্যতায় ভরা, অথচ সর্বত্র আরাম আয়েস আর বিলাসিতার উপকরণ ছড়ানো।

অধিক রাত্রে এই বারান্দায় বসে সুসীমা সমস্ত দিনের হারানো সুসীমাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। আর তখনই ভাবতে বসে, আচ্ছা, হঠাৎ আমি এমন একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলাম কেন?

আমার মা, আমার দাদা বৌদি অবাক হয়েছে। ধিক্কার দিয়েছে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে, যা খুশী কর। বলেছে, যতই ইংরেজি কাগজে ইংরেজি ভাষায় সভ্য করে লিখুক, লোকে কি ছেলের আয়া, না হয় নার্স ছাড়া আর কিছু বলবে? কিন্তু কী জেদই যে চাপল সুসীমার, একটা মাতৃহীন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবার।

যদিও আবেদনে 'ধৈর্যশীলা মহিলার' প্রার্থনা ছিল, তবু ছেলে যে কী সাংঘাতিক সে কথার উল্লেখ ছিল. কী? উল্লেখ ছিল—ছেলেটার চোখ আর চুল ধূসর, ছেলেটা অস্বাভাবিক ফর্সা, ছেলেটার মা বিদেশিনী।

সুসীমা আবার এও ভাবে, কিন্তু তাতে আমার কী। এ সংসার থেকে যে চির বিদায় নিয়েছে, সে কী ছিল আর না ছিল, জেনে লাভই বা কী আমার।

সাগর যদি তার সেই সাগরপারের দুহিতা মায়ের শিক্ষা সাহচর্য কিছুটাও পেত, তাহলে এমনটা হত কী? হয়তো হত না। কিন্তু হতভাগ্য শিশু মাকে হারিয়েছে জ্ঞান উন্মেষের আগে, মুখে বাক্ ফোটবার আগে।

অতএব যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা তার মালতির কাছে, গণেশের কাছে বাসন-মাজা ঝি কুডুনির কাছে। তাদের যা ভাষা তাই শিখিয়েছে তারা। অথবা শেখাতে হয় না, শিশু নিজেই শেখে, যা শোনে যা দেখে। চ্যাটার্জি সাহেব এমন অনভিজাত দাস দাসী রেখেছেন কেন, এই আশ্চর্য!

বাচ্চাটা যদি গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলত, দেখতে কী মজাই লাগত! কিন্তু সেই মজাটা আর দেখা গেল না।

আপাতত সাগরের ভাষার নমুনা এই—'ও আন্টি! আন্টি। এখনো ওখানে কী করছ? খাচ্ছ? একশো ঘণ্টা ধরে কত খাচ্ছ? শীগগির আমায় গপপো বলবে এস। দেরী করলে চুল ছিঁড়ে দেব। আহ্লাদ পেয়েছ! আমার বুঝি ঘুম পায় না?' একটা সাহেব মার্কা চেহারার শিশুর মুখে অনর্গল এ হেন বাক্যধারা কী অদ্ভুতই লাগে!

সাগরের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে ধারণা করতে চেষ্টা করে সুসীমা, ওর সেই মেম মা, সামনে বসে শুনছে তার গর্ভজাত সন্তান এই ভাষায় কথা বলছে।

হিন্দি নয়, ভাঙা বাংলা নয়, একেবারে খাঁটি গাঁইয়া বাংলা। ভাবতে ভাবতে আবারও করে প্রশ্ন জাগে, চ্যাটার্জি সাহেবের বাড়িতে এমন অনভিজাত দাসদাসী কেন? এ কি ইচ্ছাকৃত, না কি সবটাই ওই সুরেশবাবুর নিজস্ব অবদান? তিনিই তাঁর চেনা-জানার জগত থেকে জোগাড় করেছেন এদের? না কি সবটাই কাকতালীয়? মালতি ঝাড়গ্রামের, গণেশ কাঁথির, কুড়ুনি বাঁকুড়ার। জীবিকান্বেষণে কে কোনখান্ থেকে ছিটকে কোথায় এসে পড়ে।

এই যে এদের মনিব—চ্যাটার্জি সাহেব। তিনিই কি এখানকার? তিনি কি আগে আসামের এক নাম-করা শহরের বাসিন্দা ছিলেন না?

ছিলেন, এবং বড় সুখেই ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের এক ক্রূর গ্রহ তাঁকে সেই শান্ত ছন্দের জীবন থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে এই বাংলা বিহার বর্ডারে।

তা এখানেও তো পেয়েছিলেন সব। ভাল বাড়ি, দামী গাড়ি, সোনালী মুখ স্ত্রী, রূপবান পুত্র, মর্যাদাসম্পন্ন থাকায় যখন তখন বিদেশ ঘুরে আসার সুযোগ। তবু চ্যাটার্জি সাহেবের বাড়ি দেখে তার ছেলের পরিচর্যাকারিণী অভিশপ্ত যক্ষপুরীর সঙ্গে তুলনা করে বসে।

কিন্তু কতক্ষণই বা নিজেকে নিয়ে বসে থাকার সময় আছে তার? ঘর ছেড়ে একটু সরে এলেই কেমন করে যেন টের পেয়ে যায় অঘোরে ঘুমন্ত ছেলেটা। হঠাৎ 'আন্টি আন্টি' করে চিৎকার করে ওঠে, তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়।

'তুমি চলে গিয়েছিলে কেন?'

সুসীমা গম্ভীর গলায় বলে, 'আমার গরম হচ্ছিল—'

'পাখাটা জোরে ঘুরিয়ে দাওনি কেন?'

'আমার বাগান দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

ছেলেটা বিছানায় উঠে বসে বলে, 'দিনের বেলা বাগান দেখতে পারো না?'

সুসীমা গাম্ভীর্যের মাত্রা বাড়ায়, 'আমার রাত্তিরেই ভাল লাগে।'

'না, তুমি রাত্তিরে বাগান দেখবে না।'

সুসীমা দৃঢ় গলায় বলে, 'হ্যাঁ, আমি রাত্তিরেই দেখব।'

যে মানুষ সর্বদা নতি স্বীকার করে, হঠাৎ তাকে বিপরীত ভূমিকায় দেখে সদ্য ঘুম ভাঙা ছেলেটা বোধ করি ভয় পেয়ে যায়, হঠাৎ প্রবল ভাবে কেঁদে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে থাকে, 'আমি বাপীকে বলে দেব। তুমি আমায় বকেছ—'

সুসীমা তখন ওকে একটু কাঁদতে দেয়। এ কান্নার উৎস যে অনেক গভীরে তা অনুভব করতে পারে, তাই চুপ করে তাকিয়ে থাকতে ভাবে, আমার যদি ছেলে থাকত, সে কি এইরকম হত—এই রকম উদ্ধত অস্বাভাবিক বেয়াড়া নিষ্ঠুর?

খানিকটা কাঁদতে দিয়ে স্বগতোক্তি করতে হয় সুসীমাকে, 'বোকারা মোটেই ঠাট্টা বোঝে না।'

হঠাৎ কান্নাটা বন্ধ হয়ে যায়। সুসীমা উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে জল খেতে খেতে বলে, 'যারা ঠাট্টা বোঝে না তাদের লেখাপড়া হয় না। রাত্তিরে কেউ বাগান দেখে? লোকে তো বেড়াল তাড়াতে রাত্তিবে বাগানে যায়।'

আবার উঠে বসে ছেলেটা। হঠাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে চকিত করে টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে ঝিকঝিকে দাঁতের ঝিলিক তুলে বলে, 'বেলাল এসেছিল?'

সব কথা চোস্ত সাগরের, সুসীমা মাঝে মাঝে বলে, 'তুমি চার বছরের না চোদ্দ বছরের?' কিন্তু বেড়ালকে সাগর 'বেলাল' বলে। আর দেখলে আহ্লাদে বিগলিত হয়। এবং বেড়াল প্রসঙ্গেই সন্ধি হয়ে যায়। এবং সুসীমা নিজের বিছানায় শুয়েছে দেখে ঘুমিয়ে পড়তে দেরীও হয় না তার।

কিন্তু সুসীমা? না, তার ঘুম আসা এত সোজা নয়। সুসীমা অন্ধকারে ঘরটাকে অনুভব করতে করতে মনে মনে বলে, একেই বোধ হয় বলে অদৃষ্টের পরিহাস।...আমাকে নিজস্ব একটা ঘর দিয়েছিল এরা, সেটুকু সইল না আমার। আমি এখন অনধিকার প্রবেশকারিণী।

সাহেবের শোবার ঘরে শুয়ে আছি আমি সাহেবের ছেলেকে আগলে।

ভাগ্যিস মালিক অনুপস্থিত। তবু আমি কি করে রাজী হয়ে গেলাম এ ঘরে শুতে আসতে! একজন বিপত্নীক পুরুষের শোবার ঘরে আমি—

ছেলেটাকে তো আমি আমাকে দেওয়া সেই ঘরটায় নিয়ে যেতে পারতাম। মালতি অবশ্য বলেছিল, 'ওই বিচ্ছু ছেলে এ ঘর থেকে নড়বেনি! আমি তো কত বলি চল মাণিক আমার সঙ্গে বড় দালানে শোবে চল, আমার এ ঘরে শুতে নজ্জা নাগে, তা শোনে? বুনো ঘোড়া দিদিমণি, ঘাড় বেঁকিয়ে আছে!'

কিন্তু মালতির কথা গণ্য করার কথা তো আমার নয়। মালতির লজ্জা লাগে অথচ আমার লাগল না। সেই মানুষ যখন এসে দেখবেন আমি নির্লজ্জের মত আস্তানা পেতেছি। ছি ছি!

হলেও আপাতত অনুপস্থিত, তবু একজন বয়স্ক পুরুষের নিজস্ব শয়নকক্ষে তার অশরীরি উপস্থিতি থাকে। সেটাকে হয়তো বলা যেতে পারে সত্তার স্পর্শ।

সেই স্পর্শের স্বাদ কি গভীর রাত্রে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলে না? আমি কি তার কথা শুনতে পাই না? বাতাসে পাতা নড়ার মত ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে। ওই ছবিখানা কি জীবন্ত হয়ে যায় না তখন?...আমাব বিছানার ধারে বসে না? আমার নাম ধরে ডাকে না?

নাঃ! ওই ছবিখানাই আমায় পাগল করে তুলেছে। ওই ছবির চোখ যেন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, আমার বুকের মধ্যেটা পর্যন্ত দেখে। আমার বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় সুসীমা। মনে মনে বলে, একজন বিপত্নীক এবং সন্তানের পিতা আত্মস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে এ কী নির্লজ্জ দুর্বলতা আমার ... দাদা আমায় বলেছিল, 'তোকে দুর্মতিতে ধরেছে—'

ঠিকই বলেছিল! আমার নিয়তিই দুর্মতি হয়ে আমায় এখানে নিয়ে এসে ফেলেছে। এত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখি, এইটা দেখেই বা হঠাৎ আমার সমস্ত চেতনা এইখানেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল কেন?

বৌদি বলেছিল, 'হতে পারে থাকা খাওয়া উচ্চমানের আর তিনশো টাকা মাইনে। তবু বলতে হলে তো খাওয়া পরার চাকরি, দিনরাতের আয়া।' তারপর একটু কটাক্ষ করে বলেছিল, 'শিশু যখন মাতৃহারা, তখন হতভাগা বাপটাও সর্বহারা, কে জানে কী মতবল?'

সুসীমা হেসে বলেছিল, 'কে জানে আমরই বা কী মতলব?'

বৌদি বলেছিল, 'তাহলেও তো বাঁচতাম। তোর একটা হিল্লে হল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতাম। তা তো আর হবে না, তুমি যে বাবা একেবারে কাঠকবুল!'

বৌদি সুসীমাকে চেনে। কিন্তু সুসীমা নিজে? নিজেকে কি চেনে সুসীমা?

'তোমার প্রতি খুবই অত্যাচার করা হচ্ছে'—বললেন সুরেশ ঘোষ, 'একতিলও বিশ্রাম পাচ্ছ না তুমি, রাত্রে পর্যন্ত।'

মিষ্টি করে হাসবার একটি অলৌকিক ক্ষমতা আছে সুসীমার, সেই ক্ষমতাটি প্রয়োগ করে বলে, 'বাঃ চাকরিটা তো তাই, আপত্তি করলে চলবে কেন।'

সুরেশবাবু বলেন, 'আসলে কি জান? তোমাকে দেখি আর মনে হয়, আমি যেন সোনার তরোয়ালে ঘাস কাটাচ্ছি।'

'ও বাবা! আপনি যে দেখছি রীতিমত কবি মানুষ।'

'ব্যক্তিগত জীবনের কথা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়'। সুরেশবাবু বলেন, 'তবে তুমি আমায় কাকাবাবু বলে ডাকো তাই সাহস করে জিগ্যেস করছি, কে আছেন সংসারে?'

সুসীমা হেসে হেসে বলে, 'ও মা, এতে এত কুণ্ঠা কেন আপনার? বাড়িতে মা আছেন, দাদা বৌদি আছেন, ছোট্ট একটি ভাইঝি আছে—'

'কলকাতা ছেড়ে এত দূরে চলে আসায় ওঁরা আপত্তি করলেন না?'

সুসীমা বলে, 'ওরে বাবা, করলেন না আবার? মেয়েরা একবার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে চাইলেই তো আপত্তি! ছেড়ে দিন ও কথা।'

ব্যস ওইখানেই ইতি সুরেশবাবুর ঠোঁটের কাছে আসা প্রশ্নটা আবার পেটের মধ্যে চলে যায়।

সুরেশবাবু লোকটি ভাল, তবে বড্ড বেশী দাস্যভাব। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। সুসীমা মনে মনে বলে তোমরা সাহেবের দাস আছ থাক, আমার কাছে এত বিনয়াবনত কেন?

কিন্তু মুখে তো আর এভাবে বলা যায় না? শুধু সহজ ভাবটা আনতে কাকাবাবু ডাকটা চালু করেছে এই পর্যন্ত। প্রথম দু'দিন মেসোমশাই বলে কথা বলেছিল, হঠাৎ খেয়াল হল। হেসে উঠে বলল সুসীমা, 'এ মা, আমি কাকে কী বলছি? মাসিমা ব্যতীত মেসোমশাইয়ের অস্তিত্ব কোথায়? দাদামশাই জ্যেঠামশাই সব হতে পারেন আপনি, কিন্তু মেসোমশাই পিসেমশাই? অসম্ভব।'

শুনে সুরেশবাবু তাঁর স্বভাবছাড়া জোরে হেসে উঠেছিলেন। সুরেশ ঘোষের জোরে হাসি মনে পড়ে না কারুর। সেদিন বাড়ির লোককে চমকে দিয়ে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'আরে তাই তো। এটা আমিও তো খেয়াল করিনি।'

তখনো মালতি ছিল। আড়ালে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'এই এক ছেনাল মেয়েমানুষ এল। বোবার বোল্ ফোটায় উইটিবিকে হাসায় নাচায়। ম্যেনেজার বাবুর মুখে হাসি। যে মানুষ মেয়েছেলের হাওয়া সইতে পারে না, ধারে কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালে ছিটকে সরে যায়। তুইও তো দেখেছিস কুড়ুনি?

কুড়ুনি স্রেফ একটা জঙ্গুলে মেয়েমানুষ, তার চুলে তেল পড়ে না, গায়ে সাবান পড়ে না, কাপড়ে ক্ষার পড়ে না, তবু কুড়ুনি মুচকে হেসে বলেছে, এ্যাখোন মেনেজার বাবু, এরপর্ব মনিববাবু। দেখে নিয়ো।'

রূপ আর বয়েস, বড় সন্দেহের বস্তু।

সাহেবের অবিশ্যি মেমসাহেব ছিল রূপ সম্বন্ধে যারা তুলনীয়। কিন্তু তাঁকে কি রূপসী বলা যেতে পারত? কেমন যেন এক তীব্রতা ছিল তার মধ্যে। লাবণ্য বস্তুটার অভাব বড় বেশী চোখে পড়ত।

তাছাড়া স্বভাব? কুড়ুনির ভাষায়, 'পরিবার তো নয়, যেন সাক্ষেৎ রণচণ্ডী! রাগ হল তো হম্বি দীঘ্যি জ্ঞেয়ান নেই। এটা ফেলছে ওটা ছুড়ছে কাঁচের বাসন আছড়ে ভাঙছে আর ইনজিরি বোলে মুখ ছোটাচ্ছে। বাক্যি ভাষা বুজতে না পাবি, কথাগুলো যে গালমন্দল তা তো বুজতে আটকায় না। মুখ চোখের চ্যায়রা কি ত্যাখন? যেন আগুনখাকী। গেছে, না, সাযেব বেঁচেছে।'

একলপ্তেই বলে ফেলেছে। যেই একবার ফুলষ্টপ দিয়েছে, সুসীমা তাড়াতাড়ি বলেছে, 'ওসব কথা আমার কাছে বলতে এস না কুড়ুনি। আমার শুনে কি দরকার? যে মানুষ নেই, তার কথা এভাবে বলতেও নেই।'

কুড়ুনি অগত্যা নিবৃত্ত হয়েছে, হযতো বা বিড়বিড় করতে করতে বলে গেছে, 'দেখনি তাই এত সমেহা। দেখলে বুঝতে।'

হতভাগ্য চ্যাটার্জি সাহেবের জন্যে দুঃখ হয় সুসীমাব। মনের মধ্যে যেন কি একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে ওঠে। আর ওই ছবির মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, মেমবৌ তো আর মা বাপেব ধবে দেওয়া বৌ নয়, নিজের আহরিত। কোন্ গুণে মজেছিলে তাতে? এত রূপ তোমার, এত গুণ, এত বিদ্যে সাধ্যি, বাড়ির লোকেরা বলে মানুষ না দেবতা অথচ মানুষ চেনবাব ক্ষমতা ছিল না?

ছবিটার সঙ্গে দস্তুরমত কথাই কয় সুসীমা। শুধু যা উচ্চারিত হয় না সে কথা। এ বকম কথায তো আপনি আজ্ঞের দরকার হয় না। তাই ইচ্ছেমতই বলে।

কুড়ুনী বলে, 'গেছে, গেছে না সাহেব বেঁচেছে।'

কিন্তু সাহেবকে বাঁচিয়ে গেছে কি মেমসাহেব নিজে মরে গিয়ে? সকলে অবশ্য তাই বলে। বাপের অসুখ শুনে বাপের দেশে গেছল কোলের কচি ছেলেটাকে রেখে, আর এসে তাকে কোলে নিতে হল না, সেখানেই মারা গেল হঠাৎ।

কিন্তু সেই ছেলেটা অন্য কথা বলে। যদিও তার জ্ঞানের জগতের কথা নয়, অজ্ঞান শৈশবের কথা, তবু বলে যেন ছুরির ধারে।—'মরে গেছে না হাতী! বাপী সকলের কাছে গুল্ মারে। বলে মরে গেছে। ও তো কারখানার ছোট মেনেজার মরিস সাহেবের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ওর বাবার অসুখ করেছিল না কচু। পালিয়ে যাবে বলে গুল্ দিয়েছে। মালতি আমায় সব বলেছে।'

সুসীমা ব্যথিত হয়েছে, কাতর হয়েছে, এসব কথা বলতে বারণ করেছে, কিন্তু নিষেধ না শোনাই তো পেশা সাগরের। অবাধ্যতাতেই আনন্দ।

তাই সুসীমা যদি শুনব না বলে দু'হাতে কান চাপা দিয়েছে, সাগর হাত খামচে খামচে নামিয়ে ছেড়ে বলেছে, 'ও তো বিচ্ছিরি মা। পাজী মা। মদ খেয়ে খেয়ে মাতাল হয়ে বাবাকে মারত—'

সুসীমা প্রায় আর্তনাদের মত বলেছে, 'মালতির কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না সাগর। মালতি নিজেই দুষ্টু পাজী বিচ্ছিরি—!'

কিন্তু সাগরের যখন মুড আসে তখন তাকে রোখা ভগবানেরও কর্ম নয়। অতএব সুসীমাকে বসে বসে শুনতে হয়েছে, ওর মায়ের যত ভাল আয়া বকুনি খেয়ে খেয়ে রাগ করে করে চলে গিয়েছিল বলে মালতি আর কুড়ুনিকে রাখা হয়েছিল। রসিদ বাবুর্চি চলে গেছে বলে ভাগ্যধর ঠাকুর রান্না করে, আর বয় বলে ছেলেটা চলে যাওয়ায় গণেশকে আনা।

মাত্র চার বছরের ছেলেটা যে এত চোস্ত কথা বলে কি করে এই এক রহস্য।

সুসীমা আসার পর মালতি মাত্র দিন চারেক ছিল, তবু তার মধ্যেই অনেক বিষের থলি উজাড় করে গেছে। সোচ্চারে ঘোষণা করেছে, 'আমড়া গাছে কি ল্যাংড়া ফলবে? যেমন মা তার তেমনি ছা হবে না? মাতাল অসচরিত্তির মেয়েছেলেকে কি মেম বলে পুজ্যি করব আমি?...আহা, ভালমানুষ মানুষটাকে একদিনের জন্যে শান্তি দেয়নি গো—'

হয়তো নতুন একজন শ্রোতা পেয়ে মালতির নতুন উৎসাহ জেগেছিল।

এদের সমবেত চেষ্টা সুসীমার কাছে একটা বিধ্বস্ত জীবনের সম্পূর্ণ ছবি পৌঁছে দিয়েছে। অবিরতই দিচ্ছে।

সেদিন কোথা থেকে একখানা ফটো অ্যাল্‌বাম বার করে এনে দেখাতে বসল সাগর।—'দেখ দেখ, বাপী যখন ছোট্ট ছেলে ছিল তখন কী রকম দেখতে ছিল।...এইটা বাপীর মা'র ছবি, এইটা বাপীর বাবার, এটা বাপীর দাদার—'

সাগরের বাপীর বাল্য কৈশোরের স্মৃতি-খচিত অ্যালবামটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে সুসীমা।

'তুমি ছবি দেখছ, না আকাশ দেখছ?'

সুসীমা বলে, 'ও মা সেকী! ছবিই তো দেখছি। ভাবছি তুমিও তো এখন এইটুকুন ছেলে, আবার পবে বাপীর মতন বড় হবে।'

সাগর হি হি করে হেসে বলে, 'তুমি কী বোকা! বাপীর মতন কী করে হব? বাপী তো তখন আরও অনেক অ-নে-ক বড় হয়ে যাবে।'

শোনা কথা মুখস্থ কথা যখন বলে, তখন ছেলেটাকে শয়তান মনে হয়, আবার যখন নিজের বুদ্ধিমত শিশুসুলভ কথা বলে, তখন এই অভাগা ছেলেটার জন্যে মমতায় মন ভরে যায়।

অভাগা ছাড়া আর কীই বা? হতভাগা বাপের অভাগা ছেলে। ওর বাপ ওর মায়ের উপর ঘৃণায় আব আক্রোশে ওকে ওর 'মাতৃভাষা'র স্পর্শ পেতে দেয়নি, আর এ যাবৎ ওকে যাদের হাতে সমর্পণ করে রেখেছে, তারা ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, একটা দরকারি কাজ অবশ্য করে দিয়েছে ওরা, ছেলেটাকে বাঙালী করে তুলেছে ঠিকই। ওই কটা চুল, কটা চোখ, আর অতিরিক্ত ফর্সা রং নিয়ে ছেলেটা যে পরিবেশে ঘুরে বেড়াবে, তারা কি ওকে সহজ সমাদরে নেবে? না, ব্যঙ্গ কৌতুক আর অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে?

তাছাড়া ওর মাতৃসূত্রে পাওয়া রক্তে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অবাধ্যতার বীজ। যেটা কোনদিনই ওর জীবনকে সুপথ্য জোগাবে না। ছেলেটার জীবন দুঃখের সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছেলেটার জন্যে আমার মন ভারাক্রান্ত হয় কেন?

সুসীমা ভাবে, একটা বিদ্যেসাধ্যি সম্পন্ন বেকুব, আর একটা বেহায়া বেপরোয়া মেয়েমানুষ, এই দুইয়ের

যোগফল এই ছেলেটা ভালই বা হতে যাবে কোন্ ভগবানের কৃপায়? আর ভাল না হলেই বা আমার কী এসে যাচ্ছে?

লোকটাকে বেকুব বলে কি ভুল করছি? উঁহু। কর্মক্ষমতায় দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করলেও ওই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যে বেকুব তাতে সন্দেহ কি? ওই মেয়েমানুষটার খপ্পরে যে পড়তে পারে, কি বলবে তাকে লোকে?

তবু ওই বেকুব আর বেহায়ার যোগফল ছেলেটাকে নিয়ে আপ্রাণ খাটে সুসীমা। ধীরে ধীরে তাকে বর্ণপরিচয়ের জগতে নিয়ে আসে, তার তীব্রতাকে হ্রাস করিয়ে আনে মাত্রা মাপা বশ্যতা আর শাসন প্রয়োগ করে করে।

আন্টি চলে যাবার ভয়ে নিজেকে রীতিমত সামলে নেয় সাগর নামের সমস্যা শিশুটি।

ওই একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে সুসীমার হাতে। এই শ্মশানতুল্য সংসারে আন্টি যে তার একটা পবম আশ্রয়, সে বোধ জন্মে গেছে ছেলেটার।

সুরেশবাবু রোজ দু'চারবার করে কৃতজ্ঞতার ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করেন, রোজ দু'চারবার করে জানতে চান সুসীমার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না। আর রোজ একবার করে সাগবকে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কেমন ভাল আন্টি এনে দিয়েছি?'

সাগর একটু হাসির প্রসাদ বিতরণ করে। সাগবের শুকনো শুকনো কাঠ বার কবা মুখটা পুবন্ত হয়ে ওঠে, হাসিটা ভারী লাবণ্যময় দেখায়। •

সুসীমা ওকে ছড়া শেখায়, বাংলা, ইংরেজি।

সাগর প্রথমটা বলেছিল, না, ইংরেজি শিখব না, বাপী রাগ করবে।

শুনে সত্যিই মাথায় হাত দিতে হয়েছিল সুসীমাকে।

সাগর বলেছিল, হ্যাঁ সত্যি বলছি, বাপী বলেছে, কক্ষণো ইংরিজি বলবি না।

'তোমার বাপী একটি বুদ্ধু'—সুসীমা বলে ফেলেছিল। কিন্তু বলা কথা তো আর ফেবৎ নেওয়া যায় না। অতএব সাগর যখন হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল, 'এ মা বাপীকে বুদ্ধু বলেছ—বাপী এলে বলে দেব।'

তখন সুসীমাকে সতেজে বলতে হয়েছে, 'দিও না বলে। আমি তোমার বাপীর সামনেও বলতে পাবি।'

মাঝে মাঝে সাগর খুব সহৃদয় প্রশ্নও করে। সাগরের মধ্যে যে একটি দয়ালু হৃদয়ও বর্তমান তা আজকাল মাঝে মাঝেই প্রকাশ পায়। সাগর বলে, 'আন্টি, তোমার বাপী নেই?'

'না রে।'

'তোমার বাপী বিলেত গেছে?'

'উঁহু। আমার বাপী মারা গেছেন।'

সাগর আতঙ্কিত মুখে বলে, 'খুব বুড়ো?'

সুসীমা এ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে সামলে নিয়ে বলে, 'নিশ্চয়। খুব বুড়োই তো।'

সাগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আর তোমার মা? ভাল না বিচ্ছিরি?'

'ওরে বাবা! দারুণ ভাল। বুড়ো মানুষ তো'—মায়ের প্রতি করুণা জাগাতে শেষের কথাটা বলা।

অতঃপর দাদা বৌদিব কথা ওঠে, এবং সবাই ভাল শুনে সাগর কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হযে বলে, 'তুমি ওদের কাছে থাকো না কেন?'

'বাঃ তোমাকে তাহলে কে দেখবে?'

সাগর এ প্রশ্ন নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, 'ভাগ্। তুমি কি আমায় চিনতে নাকি?'

অগত্যাই হার স্বীকার কবতে হয় সুসীমাকে। নিজেকে বুদ্ধু বলতে হয়।

এই ভাবেই চলছে—

সাগরের সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের লাবণ্য, সাগরের চোখে মুখে সভ্যতার লাবণ্য, সাগরের এখন অনেকখানি

সময় কাটে ছবির বই দেখে, বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় সাধন করে। সাগর সুসীমার সঙ্গে রাস্তায় বেরোয়, বেড়ায়, খেলে। সাগরকে যেন একটি সুস্থ জীবনের দরজায় এনে দিচ্ছে সুসীমা।

কিন্তু কতদিন আর চলবে এভাবে।

বাড়ির মালিক তিনমাসের জন্যে গিয়ে ছ'মাসে তুললেও এবার তো ফিরবেন। তখন কি সুসীমার থাকা সম্ভব হবে? সুসীমা যদি ওর নিজস্ব পোস্টে থাকত তাহলেও কথা ছিল।

কিন্তু সুসীমা তো কেবলমাত্র মাতৃহীন শিশুর পরিচর্যাকারিণীর পোস্টেই অধিষ্ঠিত নেই, সুসীমা যে কোন্ ফাঁকে এ সংসারের মূল কেন্দ্রেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে আছে। কেনই যে এ সংসার তাদের ছেলের সেবিকাকে সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে বসে আছে কে জানে।

সুরেশবাবু অনায়াসেই সকালে এসে প্রশ্ন করেন, 'মা কি বাজার আসবে?'

ভাগ্যধর অনায়াসে প্রশ্ন করে, 'দিদিমণি কি রান্না হবে?'

কুড়ুনি মাছ কুটতে বসে নির্দেশ চায়, ধোবা এসে সুসীমাকেই খোঁজে, বাগানের মালি ফুলের তোড়া বানিয়ে সুসীমার হাতেই দিয়ে যায়। এবং ভাঁড়ারে কি আছে কি নেই, কি আনার দরকার সেটা সুসীমাকেই জানতে হয়।

প্রথম প্রথম সুসীমা বলেছে, 'এ কি, আমায় জিগ্যেস করছেন কেন?'

সুরেশবাবু অবলীলায় বলেছেন, 'জিগ্যেস করতে পেরে বেঁচে যাচ্ছি মা। সুখটুকু থেকে বঞ্চিত কর না বুড়ো মানুষটাকে। বড় আরাম পাই।'

প্রথমে সাগরের পথ্যের নির্দেশ দিতে এসেই এই খাল কেটে কুমীর আনা। কুড়ুনীও বলে, কেউ তো বলে দেয় না দিদিমণি, বড় মুশকিল লাগে। আপনি বলে দিলে বেঁচে যাই।'

সুসীমা সবাইকে বাঁচাবার ভার নিয়েই এসেছে।

কারণ অবশ্যই সাগর। সাগরের বিস্কুট ফুরিয়েছে কিনা, সাগরেব মাখন আছে কিনা,সাগরের বিনা মশলায় রান্নার প্রক্রিয়াটা কি, সাগরের ভাত কতটুকু সিদ্ধ হবে—এই সবের তদারক করতে গিয়েই মস্ত এক গাড্ডায় পড়ে গেছে সুসীমা।

সুসীমা জানালা দরজার পর্দা বদলায়, সুসীমা দেয়ালে ঝুল কি মেঝেয় ধুলো দেখলে গণেশকে তাড়া লাগায়। কুড়ুনিকে বকে।

সুসীমা সাগরের বাপীর ঘরের সব জিনিস ঝাড়ে মোছে, নতুন করে গোছায়। সুসীমা লেশ বুনে সোফা সেটের পিঠের ঢাকা বানিয়ে দিয়েছে, বালিশ-টালিশের নতুন ওয়াড় বানিয়ে দিয়েছে।

সাগরের বাবার ড্রয়ারের চাবি সাগরের তীব্র প্ররোচনায় সুরেশবাবুর হাত থেকে মাঝে মাঝেই সুসীমার হাতে এসে যায়। অতএব সেই মনিব ভদ্রলোকের ফেলে রেখে যাওয়া পোশাক পরিচ্ছদগুলির সেবাযত্ন করতে হয়।

মাস দুয়েকেই সুসীমা যেন এ বাড়ির চিরকালের হয়ে বসে আছে। আসল কথা, এখানে যারা বাস করে, সবকটাই অনাথ অসহায়, তারা করিৎকর্মা মেয়েটাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে।

একমাত্র মালতিই ছিল ব্যতিক্রম, তা...সে তো আগেই বিদায় নিয়েছে। আর সে বিদায় নিয়েছে বলেই হয়তো সংসারে কুচক্রের চাষ বন্ধ হয়েছে।

সুরেশবাবু বলেন, 'আহা, প্রথম থেকেই যদি তোমায় পেতাম মা, ছেলে কখনই অমন বেয়াড়া বেসামাল হয়ে উঠত না।'

সুসীমা হেসে বলে, 'বাঃ ওর বাবা তো ছিলেন। এখনই না হয়—'

'বাবার কথা আর কি বলব মা', সুরেশবাবু আক্ষেপ করেন, 'মানুষটাকে যেন তুলো ধুনে দিয়ে গেছেন মেমসাহেব। এখন তোমার কাছে বলি, মারা যাওয়াটা রটানো, আসলে—'

'সুসীমা বাধা দিয়ে বলে, 'জানি।'

সুরেশবাবু একটু থেমে বলেন, 'তবে তো বুঝেছই মা। মা ছাড়া ছেলেটাকে কেবল আদরই দিয়েছেন

সাহেব। যা বলছে তাই, যা চাইছে তাই। হয়ে গেল বেয়াড়া, তোমার হাতে পড়ে যা চেঞ্জ হয়েছে ধারণাই করা যায় না। আমি লিখে দিয়েছি সাহেবকে, আপনি কোন চিন্তায় ব্যস্ত হবেন না, যতদিন দরকার ওখানে থেকে আসুন। যা রত্ন একটি পেয়েছি, তার তুলনা হয় না।'

'ওরে সর্বনাশ!' সুসীমা আতঙ্কের ভান করে বলে, 'তাহলে তো আমায় আগেই পালাতে হবে। বলবেন, কি বাজে কথা বানিয়েছেন।'

সুরেশবাবু আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, 'ঠিক উল্টো। বল, কতখানির মধ্যে কতটুকু বলেছেন সুরেশবাবু?'

কিন্তু ক্রমশ আর গল্প কথা থাকছে না। আসার দিন সন্নিকট হয়ে আসছে। খবর এসে গেছে তারিখ ঠিক করে—এখন অহরহই বাতাসে যেন কার পায়ের শব্দ!

'সাগর তোমাদের আর অ্যালবাম নেই?'

'হুঁ কত আছে। বাপীর আলমারিতে আছে।'

'সে সব ছবি তুমি দেখেছ?'

'হুঁ!'

'তাতে কার ছবি আছে?'

'কত লোকের।'

'তোমার মার ছবি নেই?'

সাগর সবেগে ঘাড় নেড়ে বলে, 'মোটেই না। মা'র ছবি তো বাপী সব ফেলে দিয়েছে।'

সুসীমা আহত গলায় বলে, 'এটা খুব অন্যায় তোমার বাপীর। তোমার মা'র মুখ তোমার মনে থাকবে না।'

সাগব একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, 'আমার মা যে দুষ্টু পাজী।'

'হোক! তবু মাকে ভক্তি করতে হয়, ভালবাসতে হয়।'

সাগর একটু মলিন মুখে বলে, 'বাপী এলে আলমারী থেকে অ্যালবামগুলো বার করে নেব, দেখাব—'.

সুসীমা আবার এখন মনে মনে হাসে।

মালতির মত ভাষায় মনে মনে বলে, আমার কপাল! তাই সেই বেহেড মেয়েমানুষটার ছেলেকে আমি মাতৃভক্তি শেখাচ্ছি।

সুরেশবাবু তাঁর অফিসরুম আলো করে বসে ছিলেন, ঝড়ের মত গিয়ে পড়ল সাগর, 'জ্যাঠামশাই। বাপীর আলমারি খুলে দাও। অ্যালবাম নেব।'

সুরেশবাবু হতচকিত।—'কিসের অ্যালবাম?'

'জানি না। আন্টি দেখবে। তুমি শীগগির দাও বলছি।'

সুরেশবাবু বিপন্ন মুখে বলেন, 'ওসব কিসে আছে জানি না তো বাবা।'

'আমি জানি, উঁচু আলমাবিতে। তুমি চাবিটা দাও না।'

'বাপী তো দুদিন পরেই এসে যাবেন বাবু, এখন আর ওসব নাড়াচাড়া কেন।'

এরপরও সাগর নিজমূর্তি করবে না, এ তো হতে পারে না। সাগরের চোখের আগুন জ্বলে ওঠে। সাগর তীব্র হয়ে বলে, 'তুমি দাও বলছি। আন্টি দেখবে, আর তুমি দেবে না?'

দমদম এয়ারপোর্টে প্লেন এসে থামল। হুড়মুড়িয়ে নেমে আসতে চায় সবাই। নামার সময় সকলেরই ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রতা।

শান্তনুও নামল দ্রুত ভঙ্গীতে। অবশ্য লাইনের আইন মেনেই। পাখী হয়ে উড়ে আসাটাও ক্রমশ এত অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে অভিজাতদের যে সেই আসাটা মনের গতির থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে অধৈর্য অপেক্ষার স্বাদই এনে দিচ্ছে।

তাই শান্তনু চ্যাটার্জির মনে হচ্ছিল, জটায়ুর ডানা ঝিমিয়ে যাচ্ছে কেন! এখন এই দণ্ডে আরো দ্রুত

উড়ে গিয়ে সাগরের কাছে পৌঁছে যেতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু উপায় নেই। কাজ বড় নিষ্ঠুর শাসক। কলকাতায় কিছু কাজ আছে ঘণ্টাকয়েকের মত, অতএব সে সব সেরে ট্রেনই ধরতে হবে।

আসার আগে ছেলেটা 'বাপী কেন চলে যাবে, বাপী কেন চলে যাবে' করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জ্বর এনে ছেড়েছিল, সেই অবস্থাতেই চলে আসতে হয়েছে। পরে অবশ্য সুরেশবাবুর চিঠিতে জেনেছে শান্তনু, ভাল হয়ে গেছে সাগর এবং কাগজের বিজ্ঞাপনের সূত্রে তার এমন একজন পরিচর্যাকারিণীও পাওয়া গেছে, যেমনটি না কি বহুজন্মের পুণ্যফলেই মেলে।

নানা জায়গায় ঘুরেছে শান্তনু, এই ছ'মাসের মধ্যে সুরেশ ঘোষের মাত্র দু'খানা চিঠি তার হাতে পৌঁছেছে। প্রথমখানায় নানা কথার মধ্যে ওই পুণ্যফল প্রাপ্তির সংবাদ, দ্বিতীয়খানায় শুধু পুণ্যচরিত কাহিনী। অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ লোকটার ভাবের অতিশয্য দেখে মনে মনে হাসলেও বেশ একটু নিশ্চিন্তও হয়েছিল শান্তনু। যাই হোক, সাগর যে ওই শিশুমনস্তত্ত্ব অভিজ্ঞা, শিক্ষিতা মহিলাকে ভাল মনে গ্রহণ করেছে এই ঢের।

সমস্যা তো ওইখানেই। সাগরের জন্যে যারা প্রাণপাত করছে, সাগর তাদের নিচ্ছে না। সাগর তাদের প্রাণপাতের উপর পদাঘাত করছে। মালতি আর গণেশ যে কত মার খায়। সাগর চায় বাপী সারাক্ষণ তার কাছে থাকুক। তার সঙ্গে লুডো খেলুক, বল খেলুক, গল্প বলুক, বেড়াতে নিয়ে যাক, খাইয়ে দিক, ঘুম পাড়াক।

এই দুরন্ত চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা তো আর এক বিরাট কোম্পানির বিশিষ্ট চ্যাটার্জি সাহেবের হতে পারে না। তবু ছুটির দিনগুলো তো সম্পূর্ণই উৎসর্গ করে সে ছেলের চরণে।

কিন্তু বয়েস যত বাড়ছে, চাহিদাও তো ততই বাড়ছে, ক্রমশ শিক্ষা দীক্ষাও প্রয়োজন জাগছে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শান্তনু দেশে থাকতে একটাও ঠিকমত লাগেনি।

সুরেশবাবুর নাম ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা দেওয়া। যদিও ঠিকানাটা শান্তনুরই। সুরেশ ঘোষের আর ঘর বাড়ি কোথা?

ইদানীং বলছিল সুরেশ ঘোষ, সাহেব আপনার নাম দিয়ে অ্যাডভার্টিজমেণ্টটা দিলে বোধহয় ভাল সাড়া পাওয়া যেত! যাক্, সুরেশ ঘোষের নামেও ভাল সাড়া পাওয়া গেছে তাহলে শেষ পর্যন্ত।

সুসীমা দেবীর গুণমুগ্ধ সুরেশ ঘোষের চিঠির উচ্ছ্বাস থেকে পঁচাত্তর ভাগ বাদ দিলেও, যা থাকে মন্দ নয়। তবে বলা যায় না সরল ভদ্রলোক কোন ভয়ঙ্কর ঘোরেল মহিলার কবলে পড়েছে কিনা।

আশ্চর্য, এত কথা লিখেছে সুরেশ ঘোষ অথচ মহিলাটির বয়েস কি রকম সধবা না বিধবা, নাকি বুড়ি আইবুড়ি সে সবের কিছুই লেখেনি। তবে তার যত্নে সাগরের স্বাস্থ্য ফিরেছে। এটা আশার কথা। আর একটা বেলা পরেই দেখতে পাওয়া যাবে এ চিঠির কতটা সত্যি, কতটা অতিশয়োক্তি।

ট্যাক্সিতে উঠে বুকপকেট থেকে পার্সটা বার করে তার খাঁজ থেকে সাগরের ফটোখানা বার করল শান্তনু। বহুবার দেখা, বলতে কি প্রায় রোজ রাত্রেই দেখা এই ছবিটা আবার নতুন করে দেখতে ইচ্ছে হল। ছেলে তো কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে চায় না, ছবি তুলতে গেলেই মুখ ভ্যাঙচায়, দাঁত বার করে—অনেক কষ্টে এই একখানা ভাল ছবি করা হয়েছিল ওর। তারই এককপি সঙ্গের সাথী করে নিয়ে গিয়েছিল শান্তনু।

ছবিটা দেখতে দেখতে যখন ভয়ানক মন কেমন করে উঠত, তখন কতদিন ভাবতে চেষ্টা কবত শান্তনু, সারার গর্ভজাত ওই ছেলেটা এভাবে আমার মন-প্রাণ দখল করে বসল কী করে? কেন আমি ওর জন্যে এমন উতলা হই? কেন মনে হয় ওই ছেলেটাই আমার জীবনের সার?

প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য পরিহাস বৈকি! সারা যখন চলে গেল, আমি তো ওকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করেছিলাম, বিদ্বেষের চোখে দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ভাবনা ধোপে টিকল না। আমার পিতৃস্নেহ বরং শতধারায় উপচে পড়ে মাতৃ পরিত্যক্ত হতভাগ্য শিশুটাকে ভাসিয়ে দিল, ভিজিয়ে দিল। মমতায় মরে যেতে লাগলাম আমি ওর জন্যে।

অথচ ছেলেটার জন্মের সূচনা থেকেই তো সারা মোহিনী মূর্তি পরিত্যাগ করে বাঘিনী মূর্তি ধরেছিল। সে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ডিব্রুগড়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সারাকে নিয়ে যখন আমি

াগ্যান্বেষণে অকূলে ভেসেছি, তখন সারার কী মূর্তি!

একাধারে প্রিয়া জায়া বান্ধবী জননী! হ্যাঁ জননীও! সারা আমায় সাহস জুগিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে, ার তারই দুরতম এক আত্মীয় মরিস সাহেবকে ধরে আমাকে টেল্‌কোর এই মস্ত কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মরিসকে দেখেই সারা যেন হঠাৎ বদলে গেল, সারা যেন এত দিনে হঠাৎ তার অভীষ্টকে খুঁজে পল। আর সেই থেকেই ক্রমশ অশান্তির মাত্রা বেড়ে উঠতে লাগল।...বেড়ে উঠতে লাগল ওর উচ্ছৃঙ্খলতা।

অতএব তখনই আমি প্রশ্ন তুললাম, 'মরিসকেই যদি তার দরকার ছিল, তাহলে আমার একটা সাজানো ীবনের ছন্দ ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে, আমাকে আমার জীবন, সমাজ, আত্মীয়স্বজনের ভালবাসা, সব কিছু থকে বিধ্বস্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমার স্কন্ধে ভর করেছিলে কেন?'

এই প্রশ্নেই ও আরো ক্ষেপে উঠল, আমাকে মিথ্যাচারী শয়তান বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল, আর চূড়ান্ত াতাল হয়ে যা তা করতে শুরু করল।

যাক্‌গে ওর কথা ভাবতে প্রবৃত্তি হয় না, শুধু অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি, তারই রক্ত-মাংসে গঠিত, ার চেহারার চিহ্নে কলঙ্কিত ওই ছেলেটা আমার এতখানি কেড়ে নিয়েছে।

যখন ও জন্মাল, তখনো তো সারা সম্পর্কে আমার আশা একেবারে নির্মূল হয়নি। ডাক্তার বলেছিল নেক মেয়ে গর্ভাবস্থায় এ রকম ক্ষেপে যায়, উগ্রমূর্তি হয়ে ওঠে, প্রসবের পর সেরে যায়, সেই আশ্বাসটা হল তখনো মনের মধ্যে। তাই শখ করে সাগরপারের দুহিতার সন্তানের নাম রেখেছিলাম সাগর।

ডাক্তারের আশ্বাস ধূলিসাৎ করে দিয়ে সারা উত্তরোত্তর উগ্র উচ্ছৃঙ্খল আর মাতাল হয়ে উঠতে লাগল। খন আমি ওই ছেলেটার দিকে আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেবেছি, আমার চেহারার লেশমাত্রও পায়নি কন ও? আরো কুটিল সন্দেহে ওর প্রতি নিষ্ঠুর হতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে সন্দেহ দানা বাঁধবার অবকাশ তা পায়নি। ওর যখন জন্মের সূচনা, তখন কোথায় ওই রাস্কেল মরিসটা, আর কোথায় সারা! সারা তো খন প্রিয়া জায়া বান্ধবী এবং জননীর ভূমিকায় এখানে সেখানে।

ছেলেটা আমারই। আমার জীবন বৃক্ষের প্রথম ফল। তাই ছেলেটা আমার বুক জুড়ে চেপে বসে গেছে। কন্তু ক্রমশই বুকজোড়া দুশ্চিন্তাও এনে দিচ্ছে।

প্রথম প্রথম মনে হত, মা ছাড়া শিশু দাস দাসীর কাছে মানুষ হচ্ছে এ রকম জেদি আবদেরে তো হবেই, কন্তু ক্রমশই আমার ভয় জন্মে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ও ওর মায়ের মতই জেদি একগুয়ে ার্থপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। মায়ের মত মতলববাজও। ও যখন কিছু বাগাবার ইচ্ছে করে, তখন ও দেবশিশুর ভূমিকা নিতে পারে। যেমন পেরেছিল ওর মা।

একজনের জীবনবৃন্ত থেকে ফুটন্ত ফুলটি ছিঁড়ে কেড়ে নেবার চেষ্টায় সারাও তো পবিত্র দেবদূতীর মূর্তি নয়ে দেখা দিয়েছিল আমার চোখে। নিজেকেও আমি ক্ষমার যোগ্য মনে করি না, তবু দেখে বিস্মিত হই আমার সারা প্রাণ জুড়ে সারার ছেলে! ওকে কি করে মানুষ করে তুলতে হবে, সৎ সভ্য করে তুলব, ই বিষয়ে আমার দিন রাত্রিগুলো পীড়িত ক্লিষ্ট হয়ে আছে।

ছবিটা আবার ভাল করে দেখতে থাকে শান্তনু।...আমি কি চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলছি? এইটুকু তো শিশু! এর সম্বন্ধে এতই বা ভাবছি কেন? ছেলেবেলায় কত ছেলে কত দুষ্টু থাকে।

সুরেশবাবুর উচ্ছ্বাস আর আশ্বাস ভরা চিঠিখানা, অনেক অনেকবারের পর আরও একবার চোখের সামনে মেলে ধরল—'এতদিনে আশা হইতেছে সাগর বাবাজীবনের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ থাকিতেছে না। দিনে দিনে যা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিতেছি। মনে হয় বড় ঘরের মহিলা, বাড়ির উপর রাগ অভিমান করিয়াত চলিয়া আসিয়া এই চাকুরি গ্রহণ।'

সেই আশ্চর্য পরিবর্তন-সাধিনী আশ্চর্য ক্ষমতাময়ী বড়ঘরের মহিলাকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে শান্তনু। তার স্থির বিশ্বাস—নিশ্চয় কোন স্কুল মিস্ট্রেস ছিলেন মহিলা; হয়তো বা কোন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের।

রোদ উঠেছে চড়া, পোস্ট অফিস থেকে ফিরছিল সুসীমা। দুটো চিঠি আর একটা বই নিয়ে। বইটা পোস্টে আনিয়েছে। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বই। এসে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু রেখেছে সুসীমা। এসেই পোস্ট

অফিসে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে রেখে গিয়েছিল, এবং ব্যবস্থা করেছিল সপ্তাহে তিনদিন করে ও নিজেই এসে চিঠির খোঁজ করে যাবে।

এ এক খেয়াল। কোথায় রয়েছি বাড়িতে জানাবে না।

এসেই মাকে জানিয়েছিল, বাড়ির মালিক বিদেশে। বাড়ির ঠিকানা সম্বন্ধে এখনও সঠিক হইনি, আপাতত তোমরা পোস্ট অফিসের কেয়ারেই চিঠি দিও। পরে সঠিক ঠিকানা জানাব।

সেই সঠিকটা আর জানানো হয়নি। ওই আপাততের পিরিয়ডই চলছে। সুসীমা দাদাকে বৌদিকে কি মাকে চিঠি লেখে, সেটা নিয়ে পোস্ট অফিসে চলে যায়, নিজের কোন চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ করে নিয়ে আসে।

আজ মা আর দাদা দুজনের চিঠিই একসঙ্গে এসেছে। যদিও আলাদা আলাদা তারিখে লেখা। দু'দিন আসা হয়নি তাই পড়ে ছিল।

মা লিখেছেন, তুমি তো এ যাবৎ সঠিক কোন ঠিকানা দিলে না। জানি না, কোথায় আছ কি ভাবে আছ। তোমার বয়েস হয়েছে, স্বাধীনতা আছে, কাজেই আমার কিছু বলার অধিকার নেই, তবে তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আস্থাও আর আমার নেই। কাজেই খুবই উদ্বিগ্ন আছি। তোমার দাদাকে বারংবার অনুরোধ করছি একবার ওখানে গিয়ে তোমার খোঁজ করে আসতে সে অনুরোধে কান দেয় না। আমারও তো বেশী বলার মুখ নেই। তুমি তার বালিকা কুমারী বোন নও। বৌমা তো আমার উদ্বেগ দেখলে ব্যঙ্গ হাসি হাসে। কী করব, আমার হয়েছে শাঁখের করাত। ভগবান আমায় একবার বন্ধনমুক্ত করে সুখের সাগরে ভাসিয়ে আবার যে এমন করে বন্ধনগ্রস্ত করবেন তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। যাই হোক, তুমি একটা ঠিকানা জানিয়ে নিশ্চিন্ত করবে। যে শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণ করছ—তার উন্নতি হচ্ছে, স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে, তোমায় ভালবাসছে জেনে সুখী হলাম। তবে তোমার এই 'লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা' দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। আজ কোথায় তোমারই চারিদিকে দাসদাসী পরিচর্যা করবে, নিজের রাজত্বে রাজত্ব করবে, তা নয় এই হীন দাস্যবৃত্তি। সকলই আমার অদৃষ্ট।

ইতি—আশীর্বাদিকা মা

এ চিঠিটি অবশ্যই খামে। দাদার চিঠিটা পোস্টকার্ডে। দাদার ভাষাটা হচ্ছে—তোমার জন্য মা সর্বদাই দুশ্চিন্তিত। নিয়মিত চিঠি দিয়ে এবং ঠিকমত ঠিকানা দিয়ে মা'র চিন্তা দূর কববে! আশা করি কুশল।—দাদা

দাদার চিঠিটা পড়ে একটু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল মুখে। মা উদ্বিগ্ন মা'র দুশ্চিন্তা দূর কোরো—

সাইকেল রিকশা করেই পোস্ট অফিসে যায় আসে সুসীমা, চিঠি দুটো ফেরার পথে রিকশাতেই পড়া হয়ে গেল। পড়ার শেষে ব্যাগে পুরে ফেলে সামনের পথের দিকে তাকিয়ে দেখল। সোজা গেলে স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া যায়, চ্যাটার্জি সাহেবের পদস্থ কোয়ার্টার্সে যেতে হলে ডাইনে বাঁক নিতে হয়।

সুসীমা যদি ওই ডাইনের মোড়টা না ফেরে? যদি সোজা চলে যায়? থাকার মধ্যে একটা সুটকেস, খানকয়েক শাড়ি জামা। মস্ত একটা মাথা ঘামাবার মত কিছু নয়। চলে গেলে কী হয়?

হঠাৎ বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল। বেরোবার সময় সাগরকে এ, বি, সি, ডি, লিখতে বলে এসেছে, এবং চালাক ছেলে সাগর সঙ্গে সঙ্গে শর্ত আরোপ করেছে, 'তাহলে তুমি টফি আনবে?'

সাগরের সেই টফির ঠোঙা সুসীমার হাত ব্যাগের মধ্যে। আর সকালবেলা সুরেশবাবু ছেলেমানুষের মত বলে বসেছিলেন, 'বাজারে হঠাৎ ভাল ইলিশ দেখলাম মা, নিয়ে এলাম। রান্নার সময় তুমি যদি ওই ভাগ্যধরটাকে একটু দেখিয়ে দাও—শুধু ওর হাতে পড়লে দফা শেষ করে দেবে।'

ব্যাচেলার মানুষ, কে বা কবে যত্ন করে খাইয়েছে, অথচ মানুষটা খেতে-টেতে ভালবাসেন। মায়ার বশেই সুসীমা বাজার থেকে এটা ওটা আনতে বলে, এবং রান্নার তদারক-টদারকও করে একটু।

আজ সেই প্রত্যাশা নিয়ে বলেই ফেলেছেন ভদ্রলোক লজ্জার মাথা খেয়ে। সুসীমা সেই প্রত্যাশার মুখে ছাই দেবে? তাই এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা তখন অবাস্তব মনে হল।

আমি এত নার্ভাস হচ্ছি কেন? ভাবল সুসীমা। নিজেকে তো এত ভীরু মনে হয়নি এতদিন। সাগর

নামের ওই বাচ্চাটার 'বাপী'র সঙ্গে দেখা হওয়ার আনার এত ভয় কিসের?

বাড়ি ঢুকতেই সুরেশবাবু যাকে বলে হন্তদন্ত বলে ওঠেন, 'মা এসে গেছ? এতক্ষণ আমি একা একা—'

সুসীমার ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, সাগরের হঠাৎ কোন অসুখ করেনি তো? তাকিয়ে থাকে চুপ করে। কথা বলতে পারে না। সুরেশবাবু এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেন না, সেইভাবেই বলে চলেন, 'সাহেবের তো পরশু প্লেনে আসার কথা? আজই এসে গেছেন হঠাৎ। তুমি বেরোবার পরই ট্রাঙ্ক টেলিফোন, বললেন, হঠাৎ একটা টিকিটের সুবিধে হওয়ার দু'দিন আগেই—গলার স্বরটা শুনে হঠাৎ যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না—'

একটু দম নেন ভদ্রলোক, আবার বলেন, 'কিন্তু কলকাতায় কিছু কাজ আছে। সেটা সেরে নিয়ে যে গাড়িটা পাবেন চলে আসবেন। বললেন বাই কারে আসতে পারতেন, মাণিকজী না কে যেন আসছে। কিন্তু তাতে হয়তো দেরী হতে পারে। ওদের সুবিধে মত তো? তাই ট্রেনেই—তোমার কথা খুব আগ্রহ করে জিগ্যেস করছিলেন।'

এতক্ষণে একটা কথা বলে সুসীমা, 'আমার কথা? আমার কথা তিনি কী জানেন?'

সুরেশবাবু বিগলিত হাস্যে বলেন, 'সবই জানেন। আমি বুঝি আমার মায়ের কথা লিখতে ছেড়েছি?'

নিজের নাম করা সেই ঘরটায় এসে বসে সুসীমা, এখানেই তার দৈনন্দিন জীবনের সব সরঞ্জাম। ব্যাগটা রাখল, টফির ঠোঙাটা বার করে নিল, সাগরকে ডাক দিল না, নিজেই গেল ওর সন্ধানে।

বলা বাহুল্য হাতের লেখার খাতা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। ভিতর বারান্দার পিছনে রান্নাঘরের লাগোয়া বাগান থেকে সাগর এবং গণেশের উদ্দাম কলরোল ভেসে আসছে।

কান পাতল। না। কলহ নয়—উল্লাস। শুনতে পেল, 'কী মজা, কী মজা! বাপী আজ আসবে—কী মজা!' গণেশও চেঁচাচ্ছে, 'সাহেব আসবেন কী মজা!' সুসীমা এগিয়ে গিয়ে তাকাল। দুজনই উর্দ্ধবাহু হয়ে উদ্দাম নৃত্য করছে, গণেশ সাগরের থেকে আড়াই গুণ বড় হলেও ভঙ্গীতে পার্থক্য নেই। সুসীমার মনে হল, সুসীমাও যদি ওদের ওই উল্লাস নৃত্যের শরিক হতে পারত!

সুসীমাকে দেখেই সাগর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল, 'আন্টি, আন্টি, আজ বাপী আসবে। তুমি আমার বাপীকে ভালবাসবে?'

দেখা হল, নির্জনে নয়, একান্তে নয়, একেবারে হাটের হট্টগোলে, উপায় ছিল না। ঠাকুর চাকর মালি ঝি সুরেশবাবু এই সমবেত সভার মধ্যে সবলে টানতে টানতে নিয়ে এল সাগর তার আন্টিকে।

'বাপী এই দেখ আন্টি, আসছিল না, আমি না টানতে টানতে—'

আশ্চর্য, ভয়ানক একটা কিছু ঘটল না। আকাশের নক্ষত্ররা খসে পড়ল না, পৃথিবীটা ভূমিকম্পে ওলোট পালট হয়ে গেল না।

এমন কি পায়ের তলা থেকে মাটিটা ধসে পাতালেও নেমে গেল না।'

শান্তনু তাকিয়ে দেখল 'সুসীমাদেবী'কে, সুসীমা সাহেবকে। কিন্তু 'চ্যাটার্জি সাহেব'কেই তো জানে সে, 'শান্তনু' বলে কে কবে ডেকেছে? বাদে বন্দনা!

এক সময় শান্তনুকে সেই বন্দনার মুখোমুখি হতে হল। হাটের হট্টগোলে নয়, হঠাৎ পেয়ে যাওয়া একটু নিরালার অবকাশে। শান্তনু অভিভূতের মত বলল, 'বন্দনা এ কী দয়া তোমার!'

বন্দনা ঠোঁটের কোণায় একটু তিক্ত হাসি মাখিয়ে বলল, 'দয়া! দয়ার কথা উঠছে কোথা থেকে? কতদিন আর ভাইয়ের ঘাড়ে চেপে থাকা যায়? পয়সাকড়ির তো দরকার, হয়ে গেলাম সাহেব বাড়ির ছেলের আয়া! মাসে মাসে তিনশো টাকা মাইনে, খাওয়া থাকা উচ্চ মানের—মন্দ কি?'

'বন্দনা!' শান্তনুর ঠোঁট কাঁপছে। শান্তনুর ভিতরের চাঞ্চল্য ভিতরে থাকতে চাইছে না। শান্তনু পড়ে থাকা একটা টুলের উপর বসে পড়ে বদ্ধ গভীর গলায় বলে, 'বন্দনা! এর থেকে আরো অনেক অনেক বেশী ধিক্কার আমার প্রাপ্য, নিজেকে ধিক্কার দেবার ভাষা আমি নিজেই পাই না। তবু জিজ্ঞেস না করেও পারছি না—এটা কী করে সম্ভব হল?'

বন্দনা অন্যদিকে চোখ রেখে আবছা গলায় উত্তর দিল, 'বললাম তো চাকরির দরকার হচ্ছিল।'

'এটা তো বিশ্বাসের বাইরের কথা।'

'তাহলে কোন্‌টা বিশ্বাসের?' বন্দনা আবার বাঁকা হাসির চেষ্টা করে বলে, 'সাহেবের বৌ মরেছে শুনে করুণা পরবশ হয়ে তার মাতৃহীন শিশুর আয়াগিরি করতে এলাম?'

'আমার কোনটাই বিশ্বাসের বলে মনে হচ্ছে না বন্দনা।' শান্তনু হঠাৎ বন্দনার দুই কাঁধ চেপে ধরে খাদে নামা গলায় বলে ওঠে, 'এই তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ, তোমাকে ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না এটা সত্যি! মনে হচ্ছে স্বপ্ন, মনে হচ্ছে এক্ষুনি ভেঙে যাবে।'

ওই চেপে ধরা হাতের নীচে থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে আস্তে বলে সুসীমা দেবী নামের বন্দনা, 'ছোঁয়ার মধ্যে না পাওয়াই ভাল, দাসী চাকররা হঠাৎ দেখতে পেলে ভাববে বিলেত ঘুরে এসে সাহেবের তো খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। ছেলের আয়ার গলা ধরছেন।'

'বন্দনা, তুমি আমায় যা খুশি বল, আমায় অপমান করতে পারবে না। শুধু তোমায় একবার বলতেই হবে, কেন এখানে এসেছ তুমি? কেন সারার ছেলেকে এমন প্রাণপাত করে মানুষ করে তুলছ?'

বন্দনা এখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'বাঃ আসল কথাটা সাহেব মানতে না চাইলে আমি কী করব? ডিব্রুগড়ের চ্যাটার্জি সাহেবের সেই বড় সাধের দ্বিতীয় পক্ষের মেমবৌ কেটে পড়েছে, সাহেব তার ছেলেকে মাতৃহীন বলে চালিয়ে বেশী মাইনের টোপ ফেলে লোক চাইছে, এসব আমি জানব কেমন করে? জগতে আর কোন চ্যাটার্জি সাহেব থাকতে পারে না?'

শান্তনু আবার ওর বাহুমূল চেপে ধরে বলে ওঠে, 'তুমি বলতে চাও, তুমি না জেনে এখানে এসে পড়েছিলে?'

বন্দনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে. বন্দনা এখন যেন আর চেষ্টাকৃত সমাহিত ভাবটা রাখতে পারছে না. বন্দনা প্রায় উত্তেজিত গলায় বলে, 'আমি কিছুই বলতে চাই না শান্তনু! শুধু যেতে চাই। কালই আমি চলে যাব—হাতটা ছেড়ে দিলে ভাল হয়।'

শান্তনু তবু ছাড়ে না, তেমনি শক্ত ভাবে চেপে ধরে বলে, 'না ছাড়ব না, কেন তুমি এভাবে এলে, কেন এতদিন রইলে, এর জবাব দিতেই হবে তোমায়।'

বন্দনা হঠাৎ সরাসরি মুখ তুলে তাকায়, একটুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, 'যার জবাব নিজেই জানি না সে আর কি করে দেব?'

'বন্দনা, তবু কি মনে হয় জানো? তুমি জেনে বুঝে আমাকে দয়া করতেই এসেছিলে—'

বন্দনা আস্তে বলে, 'তা ঠিক নয় শান্তনু। অত মহৎ আমি নই। অ্যাডভার্টিজমেণ্টটা দেখেই হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে কি হয়ে গেল। ডিব্রুগড়ের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব কোথায় কোথায় ঘুরল, কোথায় গিয়ে বসল, সবই কেমন করে যেন জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলাম সুযোগ যখন একটা জুটে যাচ্ছে, গিয়ে মুখোমুখি দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, এত আদরের মেমগিন্নীকে রাখতে পারলে না? সে হঠাৎ মরল যে?' বন্দনা হঠাৎ একটু হেসে উঠে বসে; একেবারে রঙ্গমঞ্চে প্রতিহিংসাপরায়ণা খল নায়িকার মত আর কি!...

কিন্তু এসে দেখি পরিস্থিতি উল্টো। তারপর আর কি, অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়লাম। সতীনের ছেলের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

'বন্দনা অনেক কিছুই হয়তো শুনেছ, তবু সবটা তো শোননি, সব বলতে ইচ্ছে করছে তোমায়—'

বন্দনা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'লাভ কি শান্তনু। আর তো আমরা সেখানে নেই, যেখানে পরস্পরের কাছে মনের কথা বলতে ইচ্ছে করে।'

শান্তনু হঠাৎ জেদের গলায় বলে, 'আবার আমরা সেইখানে ফিরে যেতে পারি না বন্দনা? মাঝখানের এই দুঃসহ দিনগুলো আবার ঘসে মুছে ফেলতে পারিনা? সারা যেদিন আমার জীবনের শনি হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তার আগের দিন থেকে আবার শুরু করি এস বন্দনা। মনে কর ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছি আমরা।'

বন্দনা শান্ত গলায় বলে, 'এটা একেবারে অতি-নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে শান্তনু। এক সময় যা-ই ঘটুক এখন

আর তুমিও পাগল নয়, আমিও পাগল নই।...চল ওদিকে। হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে সে ভাল বলবে না।'

শান্তনু আবার জেদের গলায় বলে, 'পড়ুক চোখে। আমি আমার নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস ব্যক্ত করব সকলের কাছে, আমি ওদের কাছে তোমার সত্য পরিচয় দিয়ে দেব।'

বন্দনা হঠাৎ কঠিন হয়। কঠিন গলাতেই বলে, 'কি সত্য পরিচয় দেবে তুমি আমার? এক সময় বন্দনা নামের এই মেয়েটা ডিব্রুগড়ের চ্যাটার্জি সাহেবের মিসেস ছিল, ভারী খাতির ছিল মিসেস চ্যাটার্জির সেই শহরের শহুরে সমাজে? হঠাৎ একদিন অন্য কোন্ এক অফিসের সাহেবের মেমকে দেখে চ্যাটার্জি সাহেব উন্মাদ হয়ে গেল, বাহ্যজ্ঞান হারাল, উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতে শুরু করল তার নিজের মিসেসকে? ডিভোর্স আদায় করবার জন্যে আদাজল খেয়ে লাগল আর শেষ অবধি করে তবে ছাড়ল—বলবে এসব? বলবে, সেই হতভাগ্য সাহেব বেচারার জীবনও অতিষ্ঠ করে দিয়ে দু-দুটো বিবাহ বিচ্ছেদের দলিলের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা দুই উন্মাদ নারী পুরুষ একটা নতুন বিয়ের দলিল গাঁথলে? আর তারপর—'

বন্দনা ওই নিরালা জায়গাটা থেকে সরে আসতে আসতে বলে, 'যা হয় না, তা নিয়ে বাজে ভাবনা ভেবে লাভ নেই শান্তনু। মানুষ গায়ের গহনা নয় যে তার একটা ডিজাইন আগুনে গলিয়ে ভেঙে আবার তা দিয়ে নতুন ডিজাইনের গহনা বানানো যাবে। আমি কাল সকালেই চলে যাব।'

কিন্তু চলে যাব বলে ঘোষণা করলেই কি যাওয়া এত সহজ? সহজ হত, যদি সত্যিই সেই সত্য ইতিহাসটা ব্যক্ত করতে পারত সুসীমা নামের ছদ্মবেশে ঢাকা বন্দনা। কিন্তু তার চাইতে কঠিন কাজ আর কি আছে?

অথচ আর একটা দরজা কঠিন করে তুলেছে দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত সাগর চ্যাটার্জি। ঘুম থেকে উঠেই তার উদ্দাম ডাক সারা বাড়িটা তোলপাড় করে তোলে, 'আন্টি, তুমি কাল আমার কাছে শুলে না কেন? তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন? কেন বললে পরে শোব?'

ছেলেটার আন্টি কি তখন ওর সঙ্গে কথা বলবে না? না কি নিজের ঘরে দরজা আটকে বসে থাকবে? বাড়িতে আরো অনেক চোখ আছে সাহেব ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের নার্সের এই উৎকট পরিবর্তন কি চোখে পড়বে না তাদের?

সুসীমার খোলশটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে ওদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে চলে যাবে কি সুসীমা?

তা হয় না। যা খুশি হওয়ানো গেলে তো শান্তনুর প্রস্তাবও গ্রহণীয় হতে পারত। নতুন করে গাঁটছড়া বেঁধে আবার সেই আট বছর আগের একটা তারিখ থেকে শুরু করা যেত। বড় দুঃসহ গোলমেলে অবস্থা—কিন্তু এ অবস্থা তো বন্দনার নিজের সৃষ্টি।...

বন্দনা বলল, 'বাঃ, কাল তো তুমি তোমার বাপীর কাছে শুয়েছিলে—।'

'বাপী তো শোয়নি। বাপী তো সোফায় বসে ছিল সারা রাত্তির।'

সুসীমার মধ্যে বন্দনা একটু কেঁপে ওঠে, তারপর চট করে দিব্যি সুসীমা হয়ে গিয়ে বলে 'আর তুমি বুঝি সারারাত্তির বসে থেকে পাহারা দিচ্ছিলে?'

'আমি দেখেছি। বাপী খালি খালি সিগারেট খাচ্ছে আর বসে আছে।'

এ সময় শান্তনু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসে দরজায় দাঁড়াল। শান্তনুর মুখের চেহারায় তার শিশুপুত্রের কথার স্পষ্ট প্রমাণ। শান্তনুর মুখ শুকনো, চোখের কোলে কালি। শান্তনুর পরণে রাতের ঢিলে পোশাক। চুল এলোমেলো, চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ। সমগ্র চেহারায় একটা বিধ্বস্ত জীবনের ছাপ।

সুসীমা তাকিয়ে দেখল। যেন হঠাৎ হোঁচট খেল একটা।

সুসীমা হোঁচট খেয়ে আট দশ বছর আগের একটা দিনে পৌঁছে গেল। দেখল—ডিব্রুগড়ের সেই বাড়িটা, যেখানে বন্দনা নামের একটা মেয়ে আহ্লাদে ডগমগিয়ে এই শান্তনুকে নিয়ে ঘর পেতেছে, উছলে উছলে সংসার করছে।

সেই বাড়ির একটা দরজায় ঠিক এই রকম শান্তনুকে দেখতে পেল সুসীমা। ঠিক এই রকম পরণে ঢিলে পোশাক, মুখ শুকনো শুকনো, চুল এলোমেলো। শুধু চোখের দৃষ্টিতে তারতম্য। সে দৃষ্টিতে কৌতুকের হীরের ছটা; সমগ্র চেহারায় যেন বিজয়ীর উল্লসিত ঔদ্ধত্য।

সুসীমা দেখল বন্দনার স্নান হয়ে গেছে, ঝকঝকে মাজা ঘসা মুখ, ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো, পরণে একখানা দেশী তাঁতের সবুজ রঙা শাড়ি, তার সঙ্গে লাল টুকটুকে হাতকাটা ব্লাউজ। বন্দনার হাতে একটা গরম দুধ ভরা সস্‌প্যান, এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে—

দরজায় দাঁড়ানো লোকটা বলে উঠল, 'আরে আরে একটা ম—স্ত টিয়াপাখি কোথা থেকে উড়ে এল!'

বন্দনা চমকে হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে ঘরের সীলিঙের দিকে তাকাল, 'কই? কোথায়?

'এই তো, এই তো সামনেই, কী মুশকিল, দেখতে পাচ্ছ না? এই এই, আয় আয় টিয়ে—'

বন্দনার তখন নিজের শাড়ি ব্লাউজের রঙের দিকে নজর পড়ল, বন্দনা বলে উঠল,'সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অসভ্যতা শুরু হয়ে গেল।....ছুটি বলে বুঝি রাজ্যপদ পাওয়া হয়েছে? এতক্ষণে ঘুম ভাঙল সাহেবের?

শান্তনু একটা হাই তুলে এলোমেলো চুলগুলো কপাল থেকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'কী করা যাবে? মেমসাহেব রাত্তিরে সাহেবের ঘুমের বিঘ্ন ঘটায় কেন?'

বলল। কারণ তখনো সুখের গাছের শিকড় মাটির গভীরে। সেই গাছে সোনার ফুল হীরের ফল ফলছে। তখনো 'মেমসাহেব' শব্দটা কৌতুকের জোগানদার। সাহেবের বৌ মেমসাহেব। সেই নকল মেমসাহেব কটাক্ষে অমিয় ঢেলে বলল, 'দেখ ভাল হবে না বলছি কিন্তু—'

'ভাল? হায় গড্‌! যেদিন মাথায় টোপর পরেছি, সেইদিন থেকেই তো ভাল হবার আশা ত্যাগ করেছি।'

'আহা! জগতে যেন আর কেউ মাথায় টোপর পরে না—'

তারপর খুনসুটি আর খুনসুটি।

দেখে বন্দনার মুখ লজ্জায় লালচে। বন্দনা বলছে, 'অনেক তো হল সাহেব, এবার চায়ের টেবিলে বসার যোগ্য হয়ে বোসো।'

আর সেই সাহেব হাসতে হাসতে বলে গেল 'মেমসাহেব বড় বেরসিক।'

'দুজনেই সমান রসিক হলে সংসারটা যে ভেসে যাবে।' হি হি করে হেসে পাশের ঘরে চলে যায় বন্দনা।

অবশ্য গৌরব করেই 'সংসার' বলল, সংসার বলতে শুধু ওই দুটো আহ্লাদে ভাসা প্রাণী। বন্দনা আর শান্তনু। নতুন কোন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি।

তারপর সত্যিকার এক সোনালী চুল সোনালী চোখ মেমসাহেবের পদার্পণ হল ওদের ওই ছন্দে গাঁথা জীবনখানির উপর। আর কেমন করে কে জানে সে ওই নকল মেমসাহেবের সুখের গাছটি উপড়ে ফেলে দিল শিকড় সুদ্ধু।

বদলে গেল শান্তনু নামের ওই মানুষটা, বদলে গেল জীবন, বদলে গেল সমস্ত পৃথিবী। বিশ্বাস বলে যে একটা শব্দ ছিল একদার পুরণো পৃথিবীতে, সেকথা ভুলে গেল বন্দনা।

সেই শিকড় ছেঁড়ার ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো ফরফরিয়ে উড়ছে সুসীমার সামনে—সুসীমা দেখতে পাচ্ছে বন্দনার মুখ বিরক্ত বেজার, 'ওখানে তোমার এত কী? তাস খেলার নেশা না আর কিছুর নেশা? কতকগুলো জুয়াড়ির সঙ্গে মিশে তাস ধরে উচ্ছন্নে যেতে বসেছ তুমি, বুঝতে পারছ না?'

দেখতে পাচ্ছে শান্তনু মাথা চুলকিয়ে বলছে, ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, আর কখনও যাব না।'

কিন্তু অন্য পাতা উড়ছে। সেখানে বন্দনাকে দেখা যাচ্ছে আরক্ত, উত্তেজিত—লজ্জায় নয়, আবেশে নয়, রাগে দুঃখে—বলেছিলাম, 'গোড়া থেকে বলেছিলাম, উচ্ছন্নে যেতে বসেছ তুমি। তখন হেসে উড়িয়েছ, নিজের ওপর বড্ড বেশী আস্থা ছিল যে! এখন? এখন কী বলবে?'

সুসীমা দেখল সেই শান্তনু জবাব দিচ্ছে উদ্ধত ভঙ্গীতে।—'আমি কারো কেনা চাকর নই। আমার যা খুশি আমি তাই কবব।'

অন্য পাতা খুলে পড়ছে। বন্দনার মূর্তি বদলে গেছে। বন্দনা পাথরের পুতুলের মত মুখে বলেছে—'কী চাও তুমি? ওই অসভ্যটাকে নিয়েই ঘর করতে চাও? তাই কর তবে। আমায় বিদেয় দাও। কলকাতায় পাঠিয়ে দাও আমায়।'

তখনো শুধু ওইটুকুই বলতে পেরেছিল বন্দনা। কারণ তার উর্ধ্বে আর কিছু ভাবা যায়, তা ভাবতে জানেনি।

অতঃপর সেটা সেই ভয়ঙ্কর ভাবে বদলে যাওয়া শান্তনুই জানাল। পালা বদলে গেল। শান্তনু নামের এক ভদ্র মার্জিত পুরুষ ওইটুকুতেই ক্ষান্ত হল না। একেবারে শেষ পর্যন্ত গেল, বন্দনা নামটাকে তার জীবন থেকে নির্বাসিত করে তবে ছাড়ল। কারণ সে তখন ভাবতে বসেছে, এতেই তার সুখ, এতেই তার আনন্দ।

আর এখন? এখন সে একটা ধ্বংসস্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছে।

সুসীমা ওদিক থেকে ছেলের দিকে চোখ ফেরাল।

বলল, 'কাল যা ঘুম পেয়েছিল আমার, বাব্‌বাঃ। নড়তেই পারছিলাম না, বসে বসেই ঘুমিয়ে গেছি।'

সাগর তীব্র গলায় বলে, 'আজ শোবে। বুঝলে? বাপীকেও তোমার সব গপ্‌পোগুলো বলতে হবে। বাপী কিচ্ছু গপ্‌পো জানে না।'

সুসীমা শান্ত গলায় বলে, 'আর কী করে হবে ওসব, বাঃ। আমি তো আজ চলেই যাব।'

'চলেই যাবে!' সাগর ঝিকঝিকে হাসি হেসে বলে, 'যাাঃ।'

'বাঃ যাব না? আমার মা'র জন্যে মন কেমন করছে আমার।'

সাগর স্বচ্ছন্দে বলে, 'তোমার মাকে চলে আসতে চিঠি লিখে দাও।'

'বাঃ, মা কেন তোমাদের বাড়িতে আসতে যাবেন?'

সাগর উত্তেজিত গলায় বলে, 'কেন আসবেন না? আমরা কী পাগল? আমরা কী রাক্ষস? ডাকাত? পাজী? তুমি তাহলে আছ কী করে?'

সুসীমা অন্য পথে যায়।—'এখন তো তোমার বাপী এসে গেছেন। আবার কী ভাবনা।'

'তা হোক, তুমি যাবে না।'

'বললেই হল। আমি বুঝি তোমাদের বাড়ি চিরকাল থাকতে এসেছি?'

'এসেছই তো। চিরকাল থাকবে তুমি।'

স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকা চ্যাটার্জি সাহেব এতক্ষণে কথা বলেন, 'শিশুর মুখে ভগবান কথা কন।'

সুসীমা মুখ তুলে তাকায়। ছোট একটু হাসির সঙ্গে বলে, 'যাদের ভগবান আছেন তাদের কাছে বলেন হয়তো, সকলের কাছে নয়।'

'ভগবান সকলের কাছেই আছেন, শুধু এক এক সময় লুকিয়ে পড়েন।'

সাগর চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাপী, তুমি আন্টিকে চেনো?'

আন্টিই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বাঃ, তুমি কাল চিনিয়ে দিলে না?'

'ও।' সাগর নিশ্চিন্ত গলায় বলে, 'আমি ভাবলাম তোমার চেনা। আন্টি, আজ তুমি পুডিং করবে?'

ছেলেটার এটা প্রিয় খাদ্য। সুসীমার মনে পড়ে, দু'দিন আগে থেকে এটার বায়না করেছে সাগর। মনের মধ্যেটা মুচড়ে ওঠে, আস্তে বলে, 'করব বাবু।'

'আর ঝাল না দিয়ে চপ, অ্যাঁ? আর খেজুরের চাটনি, আর মুরগীর—'

'বাঃ, তোমার যে ফিরিস্তি বেড়েই যাচ্ছে এত সব করে কখন যাব আমি?'

'আবার যাবার কথা! হঠাৎ সাগর অনেকদিন পরে নিজমূর্তি ধরে। 'বলছি না যাবে না। গেলে আমি তোমার গলা কেটে দেব—চুল ছিঁড়ে দেব, পা ভেঙে দেব।'

সুসীমা হেসে উঠে বলে, 'তা তাই কর। আমি তো তাহলে বেঁচে যাই।'

এরপর আর তেজ রাখতে পারে না বেচারা। মাটিতে আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকে, 'তুমি যাবে না। তুমি যাবে না। তুমি গেলে আমি বনে চলে যাব। আমি মরে যাব।'

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত শিশুর এই কান্নাটা ভীতিকর। অগত্যাই সুসীমাকে বলতে হয়, 'আচ্ছা আজ যাব না।'

শান্তনু এ দৃশ্যের দর্শক হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, এখন শান্তনু আস্তে বলল, 'এখন কি হতে পারে না বন্দনা?'

সুসীমা চাপা গলায় বলে, 'পাগলামী করবেন না।'

কিন্তু এ বাড়ির সবাই বুঝি পাগল। সুরেশবাবু একরাশ মাছ নিয়ে এসে হাজির করেন।—'মা, আজ তোমার কাজ বাড়িয়ে দিলাম। তোমার সেই স্পেশাল রান্নাগুলো সাহেবকে না খাওয়ালে তো চলবে না। তার মানে আমাদেরও বেশ একটা ভাল ভোজ হবে।'

সুসীমা কি এই সরল অবোধ লোকটার মুখের ওপর বলে দেবে—'ওসব আশা ছাড়ুন? আমি আজই চলে যাব।'

সুসীমাকে সেদিন থেকে যেতে হয়। তারপর দিন তারও পর দিন।

এক হতভাগ্য জীবন বিধ্বস্ত পুরুষ যদি খেতে বসে পরিতৃপ্তির মুখ নিয়ে বলে, 'জীবনে এ সবের স্বাদ ভুলে গিয়েছিলাম। এবং তার ছেলের আন্টির অসতর্ক মুহূর্তে বলে এত ঝড় বয়ে গেল জীবনে তবু হাতটা ঠিক তেমনিই কী করে রেখেছ বন্দনা? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বুঝি ডিব্রুগড়েই রয়েছি।...তুমি রান্না করছ, যত্ন করে খাওয়াচ্ছ। স্বপ্নের মত লাগছে—'

তাহলে কি মনে হয় না, কী এসে যায় আর দু'একটা দিনে? যদি এক অনুতপ্ত পুরুষ অহরহ ভিক্ষুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্ষমার আশায় তাহলে মেয়ে-মন মমতায় কোমল, ক্ষমায় স্নিগ্ধ না হয়ে পারে?

কিন্তু শুধুই কি তাই? নিজের দিক থেকেই কি কিছু নেই? শান্তনুর জন্যে বন্দনার যে এখনো এতখানি ভালবাসার প্রাণ মজুত ছিল তা কি বন্দনা কোন দিন নিজেই জানত?

বন্দনার সেই প্রাণটা হঠাৎ খুব একটা কষ্টে মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, যখন দেখে শান্তনুর চোখে আশা আর বিশ্বাসের আভা, শান্তনুর মুখে প্রত্যাশার দীপ্তি।

সেই দীপ্তি যেন স্থির বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে তাকিয়ে থাকে, যখন বন্দনা সুরেশ ঘোষকে স্নেহের তিরস্কার করে বেআন্দাজি বেশী বাজার করার জন্যে, কুড়ুনীকে বাসন ভাল করে না মাজার জন্যে, ধোবাকে ইস্ত্রী ভাল না করার জন্যে, আর সাগরকে দুধ ফেলার জন্যে, ভাত খেতে দুষ্টুমীর জন্যে, রোদে ঘোরার জন্যে, সময়ে পড়তে না বসার জন্যে।

'ছ' মাসে তুমি ওর এতটা ইম্প্রুভমেণ্ট করেছ বন্দনা, অবিশ্বাস্য।'

বন্দনা বলে, 'অবিশ্বাস্য কিছু না। পড়ার বয়েসটা হয়ে এসেছিল ওটা যে কারো হাতেই হতে পারত।

'তোমার স্বচ্ছন্দ সংসার পরিচালনা দেখলে বিশ্বাসই হয় না, ছ'মাস আগেও তুমি এখানে ছিলে না।'

বন্দনা বলে, 'কত অবিশ্বাস্য জিনিষই বিশ্বাস করতে হয়, এটা তো তুচ্ছ।'

'সাগর তোমার কী ভক্ত তা তুমি হয়তো নিজেও বুঝতে পারো না বন্দনা।'

'নিজে তো অনেক কিছুই বুঝি না। নিজেকেই না। নাহলে তোমার সংসার তরণীর হাল ধরে বসে আছি, তোমার জন্যে সযত্নে রান্নাবান্না করছি তোমার ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে যন্ত্রণায় মরছি।'

শান্তনু ব্যাকুল হয়, শান্তনু ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'ছেড়ে যাওয়ার কথাটা ছেড়ে দাও না বন্দনা।'

'ছেড়ে দেব?' বন্দনার কণ্ঠে তীব্রতা নয়, তীক্ষ্ণতা নয়, অদ্ভুত একটা শূন্যতা।

আশান্বিত পুরুষ মন বলে ওঠে, 'তাহলে পাথর গলেছে।' বলে, 'বন্দনা, আমার ভিতরের সবটাই তো তুমি দেখতে পাও। দেখতে তো পাচ্ছ সেখানে কী দাহ কি যন্ত্রণা! শুধু যদি তুমি—ছেলের গভর্ণেসকে বিয়ে-করা কিছুই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।'

'জগতে কোন ব্যাপারই আশ্চর্যর নয় শান্তনু! কারণ মানুষের মত আশ্চর্য প্রাণী আর নেই।'

অনেক সাবধানতা তবু সাগর এক সময়ে চমকে উঠে বলে, 'বাপী তুমি আন্টিকে বন্ধনা বন্ধনা বলে ডাকো কেন?'

শান্তনুর আগে বন্দনাই উত্তরটা দেয়, 'তার মানে, তোমার বাপী আমায় জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমার সব খোলা, কিছুই বন্ধ না।'

সাগর এখন ধরে নিয়েছে, চলে যাব বলাটা সাগরের আন্টির দুষ্টুমী! সাগর তাই বাপীর কাছে বায়না ধরে তিনজনে মিলে বেড়াতে যেতে, তিনজনে এক টেবিলে খেতে।

সাগরের উদ্দাম ভালবাসার কাছে হার স্বীকার করতেই হয় মাঝে মাঝে। তিনজনে একসঙ্গে বেরোনো হয়, অথবা চারজনে। পরেশও বন্দনার হাতে জাতে উঠেছে।

গাড়ি করে অনেক দূরে চলে যায় ওরা, এক মুখর শিশু আর দুই স্তব্ধ নরনারী। শিশু ওই স্তব্ধতা ধরতে পারে না, সে আপন আনন্দে বিভোর।

কোন কোনদিন ওই নারীও হঠাৎ তার স্তব্ধতার খোলশ ফেলে মুখর হয়ে ওঠে, সাগরের সঙ্গে মাতামাতি করে, হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বলে ওঠে এক একদিন, 'তোমার মনে আছে ডিব্রুগড়ে সেবার আমরা—'

আর হঠাৎ হঠাৎ বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে নিঃসঙ্গ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ভাবে বিধাতার কি এসে যেত, যদি এই জীবনটা সত্যি আমার নিজের হত এই কৃত-কৃতার্থ পুরুষ, এই সমর্পিত-প্রাণ শিশু, এই সুখময় সংসার, মাঝখানে আমি।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হেসে ওঠে। মনে মনে বলে, বন্দনা সরে পড, আর নয়। ওই পুরুষ হঠাৎ কোনদিন তার প্রাক্তন স্বামীত্বের মোহে আর নিশ্চিন্ততায় তোমায় ধ্বংস করে বসবে।

বন্দনা তোমার লোভকে ঠেকাও, মমতাকে ঠেকাও। সব যাক, সম্ভ্রম থাক।

অতএব একদিন, যখন সুরেশবাবু আর তার সাহেব এক গভীর গোপন পরামর্শে নিমগ্ন তখন বন্দনা এসে দাঁড়াল।

'আপনাকে তো বলাই হচ্ছে না সুরেশবাবু, সব সময়ই আপনি ব্যস্ত, কাগজে আবার একটা অ্যাডভার্টিজমেণ্ট দিন, আমায় তো যেতেই হচ্ছে—'.

হ্যাঁ, তবু চলে যেতে হবে সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। সম্মানের স্বর্গে। সম্ভ্রমের স্বর্গে। সেই স্বর্গের টিকিট যে কিনে বসে আছে, তাকে নিবৃত্ত করতে থাকার ধৃষ্টতা আর আসে না কারো।

বন্দনা বলেছিল, 'ট্রেনে তুলে দিতে যাবার দরকার নেই, আমি তো একাই এসেছিলাম।'

সুরেশবাবু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, 'তখন তুমি সাগরের আণ্টি ছিলে না, আর এই বুড়ো ছেলেটার—। তারপর সামলে নিয়ে বলেন, কিন্তু আর কোনদিনই কি—'

বন্দনা হেসে উঠে বলে, 'সাগরের বিয়ের সময় বুড়ি আণ্টি হয়ে আসব।'

সাগর এসব ষড়যন্ত্রের কিছুই জানে না। রুমাল উড়িয়ে উড়িয়ে বলে—'টা টা' 'টা টা।' দু'দিন পরেই চলে আসবে তোমার মাকে দেখে।'

জানালার ধারে বসেছিল বন্দনা, নীচে শান্তনু। শান্তনুর একটা হাত জানালার উপর রাখা। বন্দনা হাতটার উপর একটা চাপ দিয়ে আস্তে বলে, 'গাড়ি নড়ে উঠেছে, সরে যাও।'

'বন্দনা, ভেবে দেখবার জন্যে কোন আশাই কি অবশিষ্ট রাখা যায় না?'

বন্দনা আরও একটু চাপ দিয়ে হাতটা তুলে নিয়ে বলে, 'পাগল।'

গাড়ি গতি নেয়। পরিচিত মুখগুলি সরে সরে হারিয়ে যায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো কিছুক্ষণ হতাশ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে ফিরতি মুখে হাঁটতে থাকে মাথা নীচু করে।

সম্ভাবনা

'এই এই ভেঙে যাবে, ভেঙে যাবে কাঁচের জিনিষ—'

ভর দুপুরের স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে প্রায় আর্তনাদের মত এই সাবধান বাণীটি কোথা থেকে উঠ্‌লো, কোথায় আছড়ে পড়লো বোঝা গেল না। অথচ সাবধানতাটি যেন একেবারে সঙ্কট মুহূর্তের।

অভীক কিছু কাঁচের জিনিস ভেঙে পড়ার ঝন ঝন শব্দ শোনার অপেক্ষা করতে লাগলো।

এক মিনিট, দু' মিনিট, কয়েক মিনিট।

না শ্রুতির এলাকায় তেমন কোনো দুর্ঘটনা প্রমাণ পাওয়া গেল না।

বোঝা যাচ্ছে হুঁশিয়ারিটি কাজে লেগেছে, কোথাও কিছু ভাঙেনি। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অভীকের মাথার মধ্যে যেন একটা কাঁচ ভেঙে যাওয়ার ঝনঝন শব্দ পাক খেতে লাগলো।

লেখাটা শেষ করার কথা ছিল আজকে, কথা দেওয়া আছে, রাত্রেই নিতে আসবে, অথচ শব্দটাকে মাথার মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না।

শব্দটা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কথার পর কথা সাজিয়ে যে জালটা বোনার কথা, সেই জালটার বুনুনি ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'তার মানে আর কোথাও কিছু না ভাঙুক, আমার সম্পাদকের কপালটা আজ ভাঙলো।'

কলমটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো অভীক, বারান্দার নীচেই কী ঘটনা ঘটছে বোঝবার উপায় নেই।

এটা তিন তলা, এর নীচে দোতলার বারান্দাটা। ঠিক এমনি, একই মাপের একই গড়নের। তার নীচের বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তাটায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কে জানে।

তবে একটা কিছু হচ্ছে মনে হচ্ছে। কোনো অসন্তুষ্ট কুলি বা রিকশ-ওয়ালার অভিযোগ বাণীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই তিন তলাতেও উঠে আসছে সেই রুষ্ট ক্ষুব্ধ অনমনীয় কণ্ঠস্বর।

অভীক বুঝলো নীচের তলায় টলায় কেউ ওদের কারো সঙ্গে বচসা করছে।

অভীক ভারী আশ্চর্য হয় এতে।

সামান্য একটা কুলি অথবা রিকশওলা কতটা দাবি করতে পারে? দশ বিশ টাকা। নিশ্চয়ই নয়? যৎসামান্যই, অথচ সেইটুকু নিয়েই কী মারামারি লোকের।

অভীকের নিজের দাদাই করে।

অভীক এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে অনায়াসে বলে, 'থাম্ বাবা। তুই আর আমায় জ্ঞান দিতে আসিস না। পয়সা গাছে ফলে? আর ওদের ওই অ্যাটিচিউডটাই আমার ভাল লাগে না। যতই দাও, অসন্তোষ করবেই।

অভীকের ইচ্ছে হয় বলে ওঠে, 'তাই কি আর সত্যি দাদা? তুমি কোনোদিন দুটো টাকা দিয়ে দেখেছ? মাত্র দুটো টাকা? তা তো দেখনি? তবে কেন বলছো 'যতই দাও অসন্তোষ ওরা করবেই।'

বলতে পারে না, তার কারণ দাদা তার থেকে অনেকটা বড়। দাদার আর তার মাঝখানে একটি পাল দিদি বর্ত্তমান। আধডজন দিদির নীচেকার ছেলে তাই তার নামকরণ উৎসবে নাকি খুব ঘটা হয়েছিল। আর নাকি অভীকের নামকরণের ভারটা দাদা নিয়েছিল। বলেছিল, তোমাদের যা পছন্দ, 'অ' দিয়ে নাম রাখতেই

হবে ভেবে হয়তো নামকরণ করে বসবে 'অভয়' কি 'অবিনাশ'। আর নয়তো আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখবার উৎসাহে রেখে বসবে 'নবীন'। আমি নাম দিচ্ছি—ওর নাম থাক 'অভীক'।

এই নামের অবদানটির জন্যে দাদার উপর রীতিমত কৃতজ্ঞ অভীক। কে জানে বাবা মা কী ঠাকুমার হাতে পড়লে কী সর্বনাশই করে রাখতেন তাঁরা অভীকের।

অবিশ্যি দাদার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কারণ অনেক আছে, বলতে গেলে দাদাই অভীককে মানুষ করেছে, দাদাই অভীককে নিজের মানসিকতার পথে যেতে আনুকূল্য করেছে। দাদার গুণও বিস্তর।

কিন্তু ওই একটি বিরাট দোষ, দাদা পয়সাকড়ির ব্যাপারে বড্ড হুঁশিয়ার। অথচ দাদা যখন বাড়ি থাকে না, দাদার অসাক্ষাতে বৌদি ফেরিওয়ালা ডেকে ডেকে কত পয়সা নষ্ট করে, কত টাকা ঠকে।

ওদের এই নতুন বাড়িটিতে আসার পর থেকেই যেন, ওদের দুটো জিনিষই বেড়েছে।

দাদার ওয়ান পাইস্ ফাদার মাদার, আর বৌদির ঘর সাজানো। এই পাড়ায় সবাই বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, এসেই সেটা আবিষ্কার করে ফেলেছে বৌদি। এবং সকলের তালে তাল মিলিয়ে চলবার সাধনা করছে। অবশ্য মাঝে মাঝেই তাল ভঙ্গ হয়।

দাদা হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে বাড়িতে বেশ কিছু নতুন জিনিষ আমদানি হয়েছে, দাদা তখন প্রশ্ন করে, 'এসব আবার কোথা থেকে এলো?'

বৌদি জিনিসগুলোকে 'উপহার' পেয়েছি বলে চালাতে চায়, কিন্তু এতো উপহারই বা দিচ্ছে কে রমলাকে?

অতএব মিথ্যে কথাটা ধরা পড়ে যায়।

দাদা পরম ক্ষমার মুখে বলে, 'যা করেছো, করেছো, আর যেন না হয়। পয়সা জিনিসটা নষ্ট করার জন্যে নয়। বাড়ির পেছনে কত ধার হয়ে গেছে।'

আর এতেই বোধ হয় বৌদির মান সম্মান বেশী আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর থেকে যদি অবনী রাগারাগি করতো, ছিল ভালো।

তা জগতে কি আর সবকিছুই ভাল হয়?

এই তো অভীকের আজ লেখাটা শেষ করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু হল না। এই ছুটির দিনের দুপুরে হঠাৎ অভীকের মাথার মধ্যে কাঁচ ভেঙে পড়ার ঝনঝন শব্দ পাক খেতে লাগলো।

এত শব্দয় কি লেখা হয়?

কলম টলম তুলে ফেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল অভীক।

এত দুপুর রোদে বেরোনোর মানে হয় না, তবু এমন মানে হীন কাজ অভীক ববাবরই করে। লিখতে লিখতে মন না লাগলেই কলম তুলে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তা সেটা সকাল সন্ধ্যে দুপুর বিকেল যাই হোক।

এখন অবশ্য দুপুরগুলো সীমিত।

কেবলমাত্র ছুটির দিনটাতেই 'দুপুরে'র স্বাদ।

যদিও সদ্য কলেজ জীবনে, যখন সবে দু' চারটে লেখা ছাপা হচ্ছে এবং অপ্রত্যাশিত প্রশংসা জুটেছে, তখন অভীকের স্বপ্ন ছিল, চাকরী ফাকরীর দিকে যাবে না, শুধু লিখবে। 'কায়মনবাক্যে' সাধনা না করলে সত্যিকার ভাল লেখা তৈরী হয় না।

কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ করে বাস্তবভূমিতে পা দিয়ে দেখলো, ওই স্বপ্নটা নেহাৎই অবাস্তব স্বপ্ন।

পায়ের তলায় একটা মাটি থাকা; আবশ্যক। ওটা থাকলে আকাশের দিকে চোখ তোলা সহজ হয়।

অভীক একটা চাকরী জোগাড় করে ফেললো।

কফি হাউসের আড্ডার বন্ধুরা অভীকের এই 'শোচনীয় পরিণামে' রীতিমত আহত হয়েছিল, বলেছিল "আর কিছুটা দিন ধৈর্য্য ধরে দেখা উচিত ছিল। তোর ওই লেখা থেকেই শুধু জীবিকা কেন গাড়ি বাড়ি সব হতো। এ একেবারে লেখার বারোটা বেজে গেল।"

'বারোটা বেজে যাবার ভয়টি একেবারে যে ছিল না তা নয়, তবু অভীক সংকল্পে স্থিরই রইল! তখন তো 'প্রোডাকশান' কম, চাহিদার শুরু মাত্র! মাঝে মাঝে কিছু গলদ কি দু' একটা ছোট উপন্যাসের জন্য দক্ষিণা, এই! নির্দিষ্ট কিছু নেই।

নিজেকে কেমন বেকার বেকার লাগতো।

একটা চাকরীতে লেগে থাকা গৌরবের না হলেও সৌষ্ঠবের।

পরে দেখলো, সৌষ্ঠব থেকেই স্বস্তি। আর স্বস্তি থেকেই অনুশীলনের স্থিরতা!.. কফি হাউসের উদ্দাম আড্ডার মধ্যে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গী, অনেকের চিন্তাধারা, এবং অনেকের বক্তব্য যুক্তি আর ভঙ্গী মনে প্রবল ঢেউ তুলতো, 'নিজের কথা' প্রায়শঃই ঝাপসা হয়ে যেত।

দেখছে সেই ঝাপসা পর্দাটি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, অনুভূতিতে আসছে স্বচ্ছতা, আসছে স্বকীয়তা!

মাঝে মাঝেই অনুভবে আসছে। 'পৃথিবী নামক ঠাঁইটাতে কেবলমাত্রই যে জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে, অন্যায় আর অবিচারই আছে তা নয়, সেখানে রং আছে, রূপ আছে, স্বাদ আছে, ভালবাসা আছে, এবং 'মানুষ' ও আছে।

এই মানুষগুলিই গল্পের প্লট।

লেখার প্রেরণা।

আরো একটা জিনিস অনুভবে এসেছে, লেখার জন্যে 'অনেক অবকাশে'র দরকার হয় না। বরং অবকাশের প্রাচুর্য্যই লেখার শত্রু।

অবকাশ নিশ্চিন্ততার সুখ দেখিয়ে অলস করে তোলে। হয়তো ব্যতিক্রম আছে, সত্যিকার সাহিত্যসাধকরা হয়তো প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে পারেন। অভীক পারতো না।

অভীকের অনেক সময় অপব্যয় হতো।

সকাল থেকে আড্ডা দিতে দিতেই 'বারোটা বেজে যেত'।

এখন রোদের দুপুরটা আটকে থাকতে হয় বলে ভোরের সকালটা কাজে লাগাচ্ছে (যেটা আগে আদৌ হয়ে উঠতো না), আর সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দুপুর বলে সেটাকে পরম মূল্যবানের পর্য্যায়ে ফেলছে।

'সময়' জিনিসটা যে এমন মূল্যবান বস্তু এটা কি টের পেতো অভীক? জানতো—সকালের পর দুপুর আছে আবার, দুপুরের পর বিকেল। আর তারপর সন্ধ্যা এবং রাত্রি।

এখন সেটা নেই বলে; মাত্র 'একটুখানি আমার' বলে, সেইটুকুকে যত্নে সাবধানে খরচ করতে মন হয়।

তবু ওই অভ্যাসটি রয়ে গেছে।

লিখতে লিখতে মুড্ চলে গেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া!

ঘড়িটা দেখলো।

মাত্র দুটো কুড়ি!

চায়ের আগে চলে আসা যাবে! তা হলে বৌদির অভিযোগের মুখে পড়তে হবে না!

বৌদি অভীকের থেকে বড় জোর বছর আষ্টেকের বড়, কিন্তু এমন এমন ভাবে শাসন চালান যে মনে করা যেতে পারে বৌদিই শৈশবে মাতৃহীন দেবরটিকে মানুষ করেছেন! অক্লেশে-ই 'তুই' করে কথা বলেন এবং সমস্ত গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন!

অভীক যখন তীব্র প্রতিবাদ জানায় একজন লোককে এভাবে পাহারা দিয়ে রাখা অন্যায় অসঙ্গত, তাতে তার চিন্তার বিকাশে বাধা আসে, রমলা অনায়াসে বলে, 'তোকে 'লেখক' হতে কে মাথায় দিব্যি দিয়েছিল?'

'ধর আমার জন্ম নক্ষত্র।'

'তাহলে ধরে নে এই একখানি দজ্জাল 'শাসিকা'ও তোর সেই গ্রহনক্ষত্রের অবদান।'

অভীককে অতএব হেসে ফেলতে হয়। তবে সেও শাসিয়ে রাখে, 'দেখো একদিন তোমাদের এই খাঁচার শিক কেটে উড়ে পালাবো!'

'তার আগে একখানি ইস্পাতের তৈরী মজবুত খাঁচায় ভরে ফেলা হবে লেখক মহোদয়কে। ভারী আমার লেখক রে।'

তা এক হিসেবে তাই।

লেখক নামের অযোগ্যই অভীক।

তা নইলে এই সাতাশ আটাশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত এমনি বসে থাকে? একটা, প্রেমে পড়তে পারে না?

অথচ ওর বন্ধু স্মরজিৎ?

যে নাকি আবার অভীকের থেকে বয়সে খানিকটা ছোটও। স্মরজিৎ অন্ততঃ বার আষ্টেক দশ প্রেমে পড়েছে।

তেরো বছর বয়েস থেকে প্রেমে পড়ে আসছে স্মরজিৎ।

ছ' ছমাস অন্তরই স্মরজিৎকে নতুন বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়, এবং তার কাছ থেকে 'নতুন প্রেমের' গল্প শোনা যায়। প্রত্যেকবারই স্মরজিৎ বলে, 'নাঃ ভাই, এতদিনে বুঝলাম...এযাবৎ কী ছেলেখেলাই করেছি। রাংকে সোনা ভেবে আহ্লাদে বিগলিত হয়েছি। এই প্রথম বুঝছি—সোনা কাকে বলে! প্রেম কী বস্তু!'

অভীক ওকে ওর নামটা নিয়ে ক্ষ্যাপায়।

বলে 'স্মরজিৎ ও বলে, 'তোর নামটাই বা কোন্ সার্থক? অভীক মানে কী? নির্ভীক না? অথচ বছব আষ্টেক দশ ধরে শুধু বানানো প্রেমের গল্পই লিখে চলেছিস, নিজের একটা প্রেম বানিয়ে তোলবার সাহস হল না। মেয়ে ফেয়েগুলো কি তোর জগতের ছায়া মাড়ায় না?'

অভীক হাসে।

বলে,—'মেয়ের মত মেয়ে বোধহয় মাড়ায়নি।'

'ওই আশাতেই থাকো বন্ধু। দূরে থেকে যাকে 'মেয়ের মত মেয়ে মনে হবে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলেই দেখবে সেও আর পাঁচটা মেয়ের মতই স্রেফ্ মেয়ে।'

'তা' হলে তো যতদিন না ছুঁয়ে দেখা যায় ততদিনই লাভ।'

'লাভের মধ্যে স্বপ্ন দেখার সুখ।'

'সেটাই বা কম কী?'...

'দূর দূর কোনো মানে হয় না। আমি তো বাবা বুঝি মেয়ের মত মেয়ে যখন সোনার পাথরবাটি, তখন যেমন তেমনই একটা জুটিয়ে নিয়ে একটু লাট খাটিয়ে বেড়াই। হোক ক্ষণিক, হোক সাময়িক, তবুতো জীবনে কিছুটা রস আসে?

'তোর জীবন দর্শনটা ভাগ্যিস ছোঁয়াচে রোগ হয়। হলে সমাজের বিপদ হতো।'

'সমাজ।'

স্মরজিৎ একটি মুখভঙ্গীর সাহায্যে 'সমাজ' শব্দটাকে স্রেফ নস্যাৎ করে দিয়ে বলে, 'সমাজ ধুয়ে জল খেগে যা। আমি তোদের ওই পচা সমাজের ধার ধারি না। আমার যা ভাল লাগে আমি তা করবো। আনন্দই আমার একমাত্র লক্ষ্য।'

'কিন্তু তুই যে ওই এক ডাল থেকে আর এক ডালে বিচরণ করে বেড়াস, লাফ দেবার সময় আগের ডালটা ভেঙে পড়ে গেল কিনা দেখিস তাকিয়ে?'

অত দেখতে গেলে চলে না ব্রাদার? তা' হলে তো জীবনে একটা বৈ দুটো প্রেম হয় না। যেটাকে দেখতাম, তার সঙ্গেই সারাজীবনের মত নিজেকে জুড়ে দিতাম। রাবিশ! তবে খুব বেশী ভয় করিস না, ভেঙে গুঁড়িয়ে টুড়িয়ে যায় না। মেয়ে গুলোই কি কম চালু? বিয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় না করে একটু ইয়ে মানে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে দেয় না। কে বাবা দিয়ে বসবে সে প্রতিশ্রুতি? তবে যাও কেটে পড়।

স্মরজিৎ কথা থামিয়ে মাঝে মাঝে মিটি মিটি হাসে।

বলে, 'তবে আমার থেকেও মস্তান মেয়ে আছে রে ভাই। তাদের দুঃসাহস আর কলা কৌশল দেখলে আমিই হাঁ হয়ে যাই। সত্যি বলতে ও রকম মেয়েও আমার ভালো লাগে না। দেখে শুনে বাৎ মারি।'

'খুব মহৎ কাজ করো।'

স্মরজিৎ বলে, 'তা তখন আমি তাই ভাবি।...আমি নিজে পাজী তা জানি, কিছু পাজী পাজী সঙ্গীও যে নেই তা নয়, কিন্তু পাজী মেয়ে আমার বরদাস্ত হয় না।'

'তার মানে তোমার বাসনা ভালো ভালো সৎ সরল মেয়েগুলিকে গোল্লায় দিয়ে তুমি সরে পড়বে আবার নতুন সুখের সন্ধানে।'

'দেখ অভীক, ওই 'গোল্লায়' শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে। ওই জন্যেই পাজী মেয়েদের সহ্য করতে পারি না আমি।'

'ওঃ তার মানে তুমি শুধু স্বর্গীয় প্রেমের স্বাদ দেখে দেখে বেড়াও।'

'ঠিক তাই।'

স্মরজিৎ হেসে ওঠে, 'অতএব সেই সৎ সরল ভালো ভালো মেয়েগুলি যথাসময়ে ভালো ভালো লাভের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সৎ সরল বৌটি হয়ে চলে যায়। হয়তো অশ্রুজল একটু বেশী পড়ে। দীর্ঘশ্বাস একটু বেশী ওঠে।...তা ওটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তাছাড়া 'ব্যর্থ প্রেম' জীবনের একটা সম্পদ বুঝলি?'

'বুঝলাম না।'

'দূর দূর। তোকে ওই লেখক হওয়াটা আদৌ মানায় না।...ওই যে অবকাশ সময়ে একটু দীর্ঘশ্বাস, বিশেষ কোনো মুহূর্তে একটু বাষ্পোচ্ছ্বাস, এইটিই হলো কী বলবো—যাকে বলে স্ত্রী ধন। বুঝলি? এই তো দেখনা, আমি প্রথম প্রেমে পড়ি আমার মাসতুতো বোনের। সেজমাসির মেয়ে মনে হয়েছিল এই বোধহয় সেই জন্ম জন্মান্তরের ব্যাপার। আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি প্রবল প্রাণের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।...আমার বয়েস তেরো, নীলার সাড়ে তেরো। মামার বাড়িতে একটা বিয়ে উপলক্ষ্যে গিয়ে দশদিন থাকার সূত্রে প্রণয় গভীরতর হলো, দুজনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, সমাজ যখন আমাদের অনুমোদন করবে না, তখন সমাজের মুখে চুণকালি লেপে আমরা হয় পালাবো নয় মরবো।...তারপর? তারপর কিনা নীলা বিয়ের কিছুদিন পরেই আমার সামনে ওর বরকে সেই কথাগুলো বললো হি হি করে। আবার বললো কিনা এই স্মরজিৎ বাজে কথা বলিস না, ভুলে গেছিস বৈ কি। খুব মনে আছে।'বলে জীবনের প্রথম প্রেম।'...আমি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছি। আমার যে একটা মান মর্য্যাদা আছে, তা ভাবলোই না। এখনো—এই সেদিনও হেসে হেসে বললো, তোর মনে আছে স্মরজিৎ, সেই আমাদের ছাতের কোণে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে থাকা?'...

'...তার মানে নিজেই মনে রেখে দিয়েছে। তা বলে কোনো কিছুতে ঘাটতি আছে তা মনে কোরোনা। সুখের সাগরে ভাসছে।'

'মনে হচ্ছে তোর ওই মাসতুতো বোন দুঃখের সাগরে ভাসলেই যেন তোর শান্তি হতো।'

'পাগল। তারপরে বলে কতো এলো, কত গেলো। আমার বাবা যায় তো যায়ই, মেয়েগুলো সেই যাওয়া জিনিষের ভগ্নাংশটুকু রেখে দেয়। তা' ওদের কথা বাদ দে। ওরা ভাঙা কাঁচের চুড়িও বাক্সে তুলে রেখে দেয় বেশ সুন্দর দেখাত বলে, একদা ওর হাতটা সুন্দর দেখতে হয়েছিল বলে। মাঝে মাঝে কারুর সঙ্গে দেখা হয়, স্বপ্না বিশ্বাস, মাধবী রক্ষিত, শিবানী রুদ্র, শ্যামলী ঘোষ, এরাতো কলকাতাতেই থাকে? অজন্তা অবশ্য আমেরিকায় চলে গেছে, রেখা বোস বম্বেয়। তা এদের সঙ্গে দেখাটেখা হলে দিব্যি একটি গাল হেসে বলে, কী স্মরজিৎ, কী খবর? এখনো বিয়েটিয়ে করনি? তেমনি ছেলেমানুষী করে বেড়াচ্ছো?'...কেউ কেউ আবার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে চায়, চা খাওয়াতে চায়। দিব্যি অম্লান মুখ অমলিন ভাব।'..

অভীক শোনে, হাসে।

জানে এই পাখি যখন নীড়ে বসবে, তখন ডানা ঝাপটানো তো দূরের কথা পালকও নাড়বে না। বুড়িয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে। ....দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়ে।

কী ঝটপটানিই করেছে একদা।

বিয়ে সম্বন্ধে কী নতুন নতুন থিওরি তার।

তারপর?

তারপর একটি মোটাসোটা কালোকালো মেয়েকে যথারীতি নাপিতে পুরুতের বিয়ে করে ফেলে যাকে বলে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। সকালে থলি হাতে বাজারে যায়। মেয়ের জন্যে 'খাঁটি দুধ' জোগাড় করতে গোয়ালা বাড়ি যায়। হপ্তায় হপ্তায় মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়িতে জমা দিয়ে বৌকে নিয়ে সিনেমায় যায়, আর তাকে মাসে মাসে ব্লাউজ পীস্ কিনে দেয়। একেবারে আদর্শ পিতা, আদর্শ পতি।

দুপুর রোদে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎই এইসব বন্ধুদের কথা মনে পড়লো অভীকের।

স্মরজিৎ নাকি এখন বিভাসের বৌটাকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এন্তার বেড়াচ্ছে। সেদিন জোসেফ্ বলছিল। হেসে বলছিল জোসেফ, 'গাড়ি একখানা থাকলে, আর নিজে মানিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারলে অনেক মাছরাঙাকে জালে ফেলা যায়। গাড়ি আর শাড়ি এই দুটি জিনিষ মেয়েদের হৃদয় জয়ের অস্ত্র।'

এই খবরটা পছন্দ হয়নি অভীকের।

আবার বৌ টৌ কেন?

বিভাসের সংসারে একটা অশান্তি টেনে আনা। কে বলতে পারে যে সে অশান্তি 'দিনের খাতা' থেকে জীবনের খাতায় উঠে পড়বে কি না। বিয়ে না হওয়া মেয়েদের তুমি তোমার ওই রাজপুত্তুর মাফিক চেহারা আর হীরো হীরো ভঙ্গী এবং দরাজ পকেটের টোপ ফেলে, ছিপে গাঁথ গে যাও, কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে কেন?

বিভাস অবশ্যই ফ্যাসানের খাতিরে প্রথমটা উদারতা দেখাবে, কিন্তু শেষরক্ষা হবে কি?

মনে পড়ে গিয়ে ভাল লাগলো না।

আরো কতদূর কী এগোচ্ছে কে জানে।

অভীকের কি কিছু বন্ধুকৃত্য ছিল?

অভীক কী একদিন যাবে বিভাসের বাড়ি?

কিন্তু গিয়েই বা কী?

বিভাসের বৌ বিভাসের বন্ধুর গাড়িতে মার্কেটিং করতে যাচ্ছে, এবং হয়তো সে বন্ধু সৌজন্য দেখাতে তাকে তার বটুয়ার মুখ খুলতে দিচ্ছে না। এই তো। এর বেশী কিছু জানবার তো কথা নয়।

এইটার ওপব ভর করে কি বিভাসকে সাবধান করতে যাবে অভীক?...আগুন আব পতঙ্গ যে যাব নিজের ধর্ম পালন করবেই।

নিজের বোকামী ভেবে একটু হেসে বাড়ি ফেরার পথ ধরলো অভীক। ফিরেই চটপট চা খেয়ে নিয়ে লেখাটা শেষ করে ফেলবে।

কিন্তু দরজার কাছেই যে এমন একটা বাধার সম্মুখীন হতে হবে কে জানতো।

অভীকদের অর্থাৎ অবনীর এই নতুন বাড়ির একতলা দোতলা দুটোই ভাড়াটে কবলিত। মাত্র তিন তলাটাই নিজেদের ব্যবহারে আছে। অবনীর মতে বাড়ির·ধার শোধ করে ফেলে দোতলার ভাড়াটে তুলে দেবে। বাড়ি মেনটেনেন্সের খরচ তুলতে ওই একতলার ভাডাটে রেখে দেবে।

রমলা বলেছিল, 'একবার যে ঢুকছে, তাকে আর তুমি তুলতে পারবে?'

অবনী হেসেছিল, 'বুঝেসুঝেই ভাড়াটে যোগাড় করেছি। বদলীর চাকরী, নিজে থেকেই চলে যাবে।'

আপাততঃ তারা আছে।

অভীকদের নিজেদের 'গৃহপ্রবেশের' দরজাটি হচ্ছে পাশের প্যাসেজ দিয়ে?...সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দোতলা বাসীদের সঙ্গে কখনো মুখোমুখি হতে হয়, কখনো নির্জনই থাকে।

একতলার সঙ্গে মুখ দেখাদেখির অন্ততঃ অভীকের কোনো প্রশ্ন নেই।

আজ ওই প্যাসেজটার মুখেই বাধা।

'কী রকম বাড়ি আপনাদের? কলে জল পড়ে না।'

অভীক চমকে ওঠে।

অভীক যে শব্দটাকে মাথা থেকে তাড়িয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে গল্পটাকে শেষ করবে বলে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল, সেই শব্দটা আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো অভীকের অনুভূতির নার্ভগুলোর ওপর!

সেই কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ!

অভিযোগের ঝঙ্কার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিন্তু অভিযোগটা কী?

কেন? কে এ?

অভীকদের বাড়িতে কলে...জল পড়ে না?

এ আবার কেমন কথা? এইতো একটু আগে বেরোবার আগেই কলের জলে হাত মুখ ধুয়ে গেছে অভীক।

জলটা খুব গরম লেগেছিল।

পাম্পের জল .তা, রিজার্ভারের গায়ে রোদ লাগে।

কিন্তু অভিযোগতো জলের গরমত্ব নিয়ে নয়। জলবিহীনতা নিয়ে।

অতীতের এইটুকু অনুপস্থিতির মধ্যেই বাড়িতে কী এমন ওলট-পালট হয়ে গেল, যে এই মহিলাটি--তা মহিলাই বলা উচিত, চেহারায় সে ভারভারীত্ব না থাক, মাথায় যখন সিঁদুর রয়েছে। সে যাক্ মহিলাটি এসে 'জল নিয়ে' তম্বি করতে বসলেন অভীককে?

জলটা গেলই-বা কখন?

অভীক দিশেহারা হয়ে বলে, 'দেখুন আপনার কথা আমি তো ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

বুঝতে পারছেন না?'

মহিলাটি একবার অভীকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনি অবনীবাবুব ভাই নয়?'

'নিশ্চয়! কিন্তু তা'তে কী?

'তাতে আর কি। আপনি যদি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে কিছু বুঝতে পারছি না বলেন, আমার কিছু বলার নেই। অবনীবাবুকেই বলবো।'

অভীক আরো বিমূঢ় হয়।

কোনো ভাড়াটেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু কোনখানের?

এ বাড়ির একতলা দোতলা দুটো ফ্ল্যাটেই তো—অভীক যতদূর জানে—ভাড়াটে আছে। তাহলে?

আরো কোথাও ফ্ল্যাট আছে নাকি দাদার? থাকলে অভীকের অজানা থাকতো? তাছাড়া—এই মহিলাটি কি নিজেকে 'অজানা' থাকতে দিতেন?

ওঁর এই কাঁচের গেলাস ভাঙ্গার ঝনঝনানি তোলা কণ্ঠস্বর, আর এই দৃপ্ততপ্ত মেজাজ, এতো অজানা থাকার কথা নয়!

নাঃ। অভীকের কর্ম নয় অনুমান করা—ইনি কে?

অভীক অতএব আবার সেই একই কথা বলে, আরো বিনীতভাবে।

'দেখুন আপনি অকারণ রাগ করছেন। সত্যিই আমাব পক্ষে কিছু বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। দাদার মানে অবনীবাবুর যে আর কোথাও কোনো ফ্ল্যাট আছে, আমার জানা নেই।'

'আর কোথাও! আর কোথাও মানে?'

শ্যামলাঙ্গী সুন্দরী পড়ন্ত রোদের আঁচে এবং রাগের আঁচে বক্তাভ হয়ে ওঠেন, 'কী বলছেন আপনি, আমারও তো বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। আপনি এই বাড়িতেই থাকেন, না অন্য কোথাও?'

এধরনের অভিযোগ নিয়ে যদি কোনো হতভাগ্য পুরুষ এভাবে কেটে পড়তো, আর এরকম প্রশ্ন করতো, তাহলে অভীক কিছু আর উত্তর দেবার জন্য—দাঁড়িয়ে থাকতো না। নিশ্চয়ই উপেক্ষা ভরে মাপ করবেন

আমি কিছু জানিনা। বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

কিন্তু পরিস্থিতি আলাদা।

অভিযোগকারিনী একটি বিদ্যুৎ শিখার সঙ্গে তুলনীয় মহিলা।

গায়ের রং অবশ্য শ্যামল।

অনেকটা সদ্য চারা গাছের কচিপাতার মত উজ্জ্বল শ্যামল। তবু 'বিদ্যুৎ শিখা' শব্দটাই মনে এসে গেল অভীকের।

ওর কপালে এসে পড়া ঝরো চুল গুলো কাঁপছে, ওর চোখের পাতা দুটোর আগায় ঝিরঝিব করা বড় বড় পল্লব গুলো কাঁপছে, আর ওর বুকের ওপরকার পাতলা শাড়ির আচ্ছাদনটুকু ভেদ করে দেখা যাচ্ছে লাল টুকটুকে ব্লাউজটাও কাঁপছে।

অভীকের এই উল্টোপাল্টা সময়ে ও হঠাৎ মনে হলো শাড়িটা কী পাতলা। শুধু ওই লাল টুকটুকে ব্লাউজটাই নয়। ওর নীচের জালিকাটা কাজ করা সাযাটাও দেখা যাচ্ছে সেলাই সমেত।

প্রিন্টেড শাড়ি। কিন্তু কী শাড়ি? অভীক কি বলে উঠবে, 'আপনি এতো পাতলা শাড়ি পরে রাস্তাব ধারে বেরিয়ে এসেছেন কেন? একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে নেমেছেন কেন? যান একটা ভালমত শাড়ি পরে আসুন।'

না। বলে ওঠেনি। অভীক আপাততঃ এই অভিযোগের আক্রমণে হঠাৎ বেকুব বনে গেলেও, সত্যি কিছু আর বেকুব নয়।

অভীক এরকম 'জল শাড়ি' 'হাওয়া শাড়ি' পরা মেয়ে যে রাস্তায় হরদম দেখছে না তাও নয়।

তখন যে সহসা এমন চোখে ঠেকলো। মহিলার শাড়িটা এলোমেলো করে জেবাব ভঙ্গী দেখে। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ করে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মেয়েটা দেখতে আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই।

অভীক অন্যদিকে তাকিয়ে খুব মার্জিত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকি।'

'বাড়ির কোন খবর রাখেন না বোধহয়?'

অভীক সেইভাবেই বললো, 'খুব বেশী নয়।'

'খুব বেশী কেন, আদৌ নয়। আপনাদের এই ফ্ল্যাটে কখন কে চলে যাচ্ছে, আর কখন কে আসছে আপনি জানেন?'

পডন্ত বেলায় সেই চির কাব্যময় কনে দেখা আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে আকাশের পটে, বৈশাখের বিকেলের বাতাসও চঞ্চল।

উডন্ত আঁচলটাকে টেনে কোমরে জডানো মেয়েটা। অথবা বৌটা।

অভীক আরো ভদ্র বিনীত গলায় বললো, 'বোধহয় জানি না। একতলায় এস দাশগুপ্ত, আব দোতলায় পি চন্দ্র, এই তো আছেন বলে জানি।'

'ভুল জানেন।'

এইমাত্র কোমরে জড়ানো আঁচলটাকে আবার টেনে খুলে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে মহিলা বলেন, 'ভুল জানেন। পি চন্দ্র বলে কেউ নেই আর এখন! তাঁরা সকাল আটটার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন।'

'তাই নাকি? আশ্চর্য তো!'

পি চন্দ্রর ছোট্ট মেয়েটাকে মাঝে মাঝে বাসের টিকিট দিতো অভীক। বাসের টিকিট জমানো বাতিক তার।

সকলের কাছে নেয়। গোছা গোছা টিকিট রবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে রেখে দেয়।

চলে গেছে ওরা।

অভীক তো কই দেখতে পেলো না।

সকালবেলা কোথায় ছিল অভীক?

ওঃ। সকালবেলা দমদমে গিয়েছিল অভীক। বারীন কানাডা যাচ্ছে বলে তুলে দিতে গিয়েছিল।

পি চন্দ্রর পুরো নামটা ঠিক জানে না অভীক, প্রভাত না প্রমথ কী যেন। কিন্তু মেয়েটার নাম জানে, প্রমিতা।

অভীক বলতো, 'তুমি এইটুকুন মেয়ে তোমার এতবড় নাম কেন?'

ও বলতো, 'বাঃ আমি বুঝি বড় হবো না? তখন আমি একটা মস্তবড় নাম কোথায় পাবো? মার যা দশা হয়েছে তাই হবে। মা যখন ঠাকুমা হয়ে যাবে তখনও সবাই মাকে টুনু বলবে। টুনু চন্দ্র।'

শিশুর সঙ্গে টেপ রেকর্ডারের তুলনা করা যায়। যা কানে শোনে, তাই গলায় তুলে নেয়।

মেয়েটা চলে গেল!

'আশ্চর্য তো!'

সামনের মহিলাটি বোধহয় অভীককে বেশ ভাল করেই অবলোকন করছিলেন। ওই আগের ভাড়াটেরদের চলে যাওয়াটা যে এনার জানা নেই তা বোঝা যাচ্ছে। এবং ওই চলে যাওয়াটা যে একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত হেনেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কী?

কোন প্রণয় ঘটিত ব্যাপার ছিল নাকি? আর সেই জন্যেই এনার অজানতে এবং অসাক্ষাতে আসামী পাচার করা হয়েছে?

এটা ভেবে নিয়ে বোধহয় বেশ কৌতুক বোধ করে সে।

তথাপি গম্ভীরভাবে বলে, 'আশ্চর্যটা আপনার না হয়ে আমারই হবার কথা। আপনি এই বাড়িতেই থাকেন বলছেন, অথচ টের পেলেন না ভাড়াটে বদল হয়ে গেল। পি চন্দ্র-রা সকালে চলে গেছেন। আমরা এই দুপুরে এসেছি। মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস বোস। ওঁরা আমাদের একটু আত্মীয় মত। এ ফ্ল্যাটের খবর ওঁরাই দিয়েছিলেন। অবশ্য বদলটা খুব আকস্মিক হয়ে গেল। ফ্ল্যাটটা ভালো। কিন্তু এসে পর্যন্ত এক ফোঁটা জল পাইনি তা জানেন?'

অভীক ওই রুষ্ট ক্ষুব্ধ এবং গ্রীষ্মতপ্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বোকার মত বলে ফেলে, 'কেন?'

'কেন?'

মহিলা আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে গিয়ে বলেন, 'সেটা আপনি আমায় জিগ্যেস করছেন?'

অভীক নিজের এই বোকামীতে নিজের ওপর রেগে যায়।

খেয়াল হয় আগাগোড়াই বোকা বোকা কথা বলেছে সে।

এবারও অবশ্য ওই বোকাটে কথাই বলে।

তাছাড়া আর কী বলার ছিল?

বললো, 'আচ্ছা আমি বৌদিকে জিগ্যেস করে—'

'আপনার বৌদিকে? মানে অবনীবাবুর স্ত্রী রমলা দেবীকে? আপনার কি ধারণা ওই জিগ্যেস করাটা আপনার অপেক্ষায় রেখে দিয়েছি?'

'ওঃ। জিগ্যেস করেছেন? কী বললেন?'

'বলবেন আর কী?'

মহিলা দু'হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গী করে বললেন, 'মহিলা জনোচিত কথাই বলেছেন। ...পাম্পে জল না উঠলে তিনি আর কী করবেন।

পাম্পে জল উঠছে না। তিনি আর কী করবেন।

কিন্তু অভীকই বা কী করবে?

অভীকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

এ হেন দুর্ঘটনা সংসারে আরো ঘটে কিনা, এবং ঘটলে কী করতে হয় তা জানা নেই অভীকের।

দাদা তাকে ডিসটার্ব করতে চায় না।

অভীক জানেনা, বাড়িতে কে বাজার করে,...কখন বাজার করে, রেশন আসে কী প্রকারে। সংসারে আরো কী লাগে না লাগে, কিছুই জানা নেই অভীকের।

কখনো কোনো সময় বৌদি কোন কাজের ভার দিতে চান, দাদা বলে ওঠে, আচ্ছা ওকে আবার এসব নিয়ে ডিসটার্ব করছো কেন?

অবনী তার ছোট ভাইয়ের লেখা কোন দিন পড়েছে কিনা জানে না অভীক অন্তত দেখেনি পড়তে; কিন্তু ভায়ের লেখা সম্পর্কে অবনীর খুব সমীহ।

এখন অভীকের মনে হলো। দাদার এই মমতাটি অযাচিত।

কিছু কিছু জানতে দেওয়া উচিত।

পাম্পের জল না উঠলে কোথায় গিয়ে মিস্ত্রী ডাকতে হয় রে বাবা।

'থাক ঠিক আছে—'

মহিলাটি হঠাৎ পাক খেয়ে ঘুরে বলেন, আপনাকে আর ভেবে কাতর হতে হবে না। দেখে মনে হচ্ছে এই সংসারে যন্ত্রপাতি কলকব্জা এরা যে মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে এ খবর আপনার জানা নেই। এবং আপনি বাড়িতে থেকেও নেই, কবি টবি নাকি?

—তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যায়। দরজাটা বন্ধ করার শব্দ হয় দড়াম করে।

অভীক ওঠে, আস্তে ধীরে সুস্থে।

রমলা চায়ের টেবিলের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল, অভীককে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'বেশ তো ঘরে বসে লেখা টেখা করছিলি, হঠাৎ কখন বেরিয়ে গেলি? আমার এদিকে কী যন্ত্রণা!'

যন্ত্রণাটা যে কী, অভীকের বুঝতে দেরী হয় না। তবু ভালমানুষের মত মুখ করে বলে, 'কীসের আবার যন্ত্রণা হল তোমার? পেটের? না মাথার?'

'পেটের? মাথার?'

রমলা নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'ওসবের নয়, আসলে এই কপালের। যাকে বলে ললাটলিপি। তা নইলে দোতলার ফ্ল্যাটে নতুন একটা ভাড়াটে এলো আজ, আর আজই পাম্প খারাপ? ওপরে এসে যাচ্ছেতাই করে গেল আমায়।'

'যাচ্ছেতাই করে গেল? মানে?'

অভীক চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে।

'আরে বাবা ওই ওই! সত্যি কি আর যাচ্ছেতাই? মানে জলের অভাবে ওর কী কী কষ্ট হচ্ছে সেটাই বেশ বিশদ করে জানিয়ে বলে গেল, ভাড়াটে ঢোকার আগে বাড়িওয়ালার নাকি এগুলো চেক্ আপ করা উচিত।'

অভীকের মাথার মধ্যে এখনো যেন সূক্ষ্ম সুরে একটা কাঁচের গেলাস ভাঙার শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু অভীক জোব দিয়ে বললো, 'কথাটথা বলার ধরন খুব খারাপ মহিলার।

'ওমা! তুই জানলি কী করে?'

'এই তো—আসছিলাম যখন, বেশ একপালা হয়ে গেল।'

'তোকেও বললো তো ওইসব?'

'ঠিক ওইসব বলেননি? তবে যা বললেন, তাও খুব আরামদায়ক নয়।'

'দেখছিস তো, এক ফোঁটা মেয়ে, কী মুখ।'

অভীক ভুরু কুঁচকে বলে, 'একফোঁটা না কি? বেশ তো বড়ই মনে হল।'

'এমন কিছু না। ভদ্রলোক তো তোর দাদার থেকে কমবয়সী।'

'তার থেকেই তোমরা ক্যালকুলেশান করে ফেলতে পারো?'

'মোটামুটি পারি বৈকি। মেয়েটা বরং তিরিশের নীচে তো ওপরে নয়।'

'তার নাম এক ফোঁটা!'

অভীক হেসে ফেলে।

'তিরিশ বছরের মহিলাকে তোমার একফোঁটা বলে মনে হয়? তোমার বয়েস কতো?'

'আমার? আমার বয়েসের গাছ পাথর আছে না কি?'

'তা বটে।'

অভীক তাকিয়ে দেখে।

কথাটা বলার অধিকার বৌদির আছে। বৌদিকে কোনোদিন সাজতে দেখেছে কি না মনে পড়ে না অভীকের।

ওই চিরকালীন বেশ।

চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, ঢলঢলে ব্লাউজ, কপালে সিঁদুরের টিপ্ হাতে একগোছা চুড়ি।

একেই রীতিমত ভারী শরীর, তার সঙ্গে ওই বিরাট চওড়া পাড় শাড়ি, আর ঢিলে জামা রমলাকে দেখলে মনে হয় বেচারা সবসময় হাঁসফাঁস করছে।

রমলাকে 'গিন্নী' ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।'

'যৌবন' নামক হালকা চরিত্রের লোকটা কোনোদিন রমলার ঘরের দরজায় উঁকি মেরেছিল কি না বলা শক্ত।

আর ওই মহিলাটি।

কেন জানি না ওর তুলনাটাই মনে এলো অভীকের।

যৌবন ওকে কোনদিনই ছেড়ে যাবে কিনা বলা শক্ত।

রমলা, 'মেয়েটাকে বললাম জলতো আমাদেরও নেই। তবে বালতিতে জল ভরা আছে। তুমি গাটা ধুয়ে নাও, তা গ্রাহ্যই করলো না কথা। বললো, শুধু নিজে গা ধুয়ে ঠাণ্ডা হলেই তো হবে না।'

'খুব অসভ্য তো! কোথা থেকে পেলো দাদা ওদের?'

'ওইতো আগেকার ওদের কে যেন হয়। ওরাই বলে কয়ে—'

'আমি জানতাম না—'

অভীক হাসে, 'জানতাম না, ইতিমধ্যে ভাড়াটে বদল হয়ে গেছে। বেশ বোকা বনে গেলাম।'

'ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে। যেমন সবসময় আকাশ পানে মন। কেন, সকালে চায়ের টেবিলে বললো না তোর দাদা, চন্দনের আরো—সাতদিন পরে বাড়ি ছাড়ার কথা, হঠাৎ নাকি দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম 'কালই চলে এসো।'

'কী জব্দ করা বল? তা ওদের সব মালপত্র নাকি নিয়ে যেতেও পারেনি, তাই এদের—আজই আসতে বলে দিয়েছে। ...এরা তো একেবারে আলগোছ হয়েই ছিল।—বিনা ঝঞ্ঝাটে এমন একখানা ফ্ল্যাট পেয়ে গেলি। তার কৃতজ্ঞতা নেই। একটু জলের অসুবিধের জন্যে—এই ভাড়াটে নিয়ে কী ভাবে কাটানো যাবে তাই ভাবছি।'

রমলার মুখে চিন্তার ছাপ।

'মেলামেশা না করলেই হবে।'

'তাই দেখছি। আমি আবার বাবা তেমন পারিও না। এক বাড়িতে থাকবো, অথচ ভাব করবো না—'

অভীক হেসে ফেলে বলে, 'তবে তো এই দণ্ডেই পাম্পের মিস্ত্রী ডাকতে যেতে হয়। বল কোথায় সেই দুর্লভের দর্শন মিলবে?'

'তুই যাবি মিস্ত্রী ডাকতে?'

'কেন পারি না? আমি এতোই অধম?'

'অধম কেন বাবা, উত্তম। এসব তুচ্ছ কাজ তোমার জন্যে নয়।'

'দাদা ওই করে করেই আমার বাবোটা বাজিয়ে রেখেছে। তোমার ওই 'এক ফোঁটা মেয়েটি' আমায়

অনায়াসে বলে দিলেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সংসারের যন্ত্রপাতি কলকব্জা যে মাঝে মাঝে খারাপ হয় এ আপনার জানা নেই।'—না না এটা ভারী অন্যায়।'

'কোনটা অন্যায়? তোর না জানাটা, না ওর ওই বলাটা?'

'না জানাটাই।'

'মোটেই না।'

'রমলা বলে, 'তোর দাদা বলে, জগতে বাজার করবার, রেশন আনবার, মুচি ডাকবার, মিস্ত্রী ডাকবার লোক অনেক আছে, বই লেখবার লোক কতজন আছে?'

অভীক হেসে ওঠে।

বলে 'টন টন আছে। এ যুগে অন্ততঃ পাঠকের থেকে লেখকই বোধহয় বেশী।'

'সবাই তোমার মতন ভাল লেখে?'

'আমি ভাল লিখি কি ছাই পাঁশ লিখি, জানো তুমি?"

'আহা একখানাও যেন পড়িনি? যেটা সেই সিনেমা হলো? সেটা আগাগোডাই পডেছি। ছবিতে কী বদলে দিয়েছে মা গো। দেখতে দেখতে মনে হল কার বই দেখছি। না পড়লেই হতো!'

'ওই একটাই পড়েছ তাহলে?'

রমলা হেসে ফেলে বলে, 'আমি না পড়লেই বা তোর কী? পাঠকের অভাব? আমার কী দশা জানিস? একখানা বই হাতে নিলাম কি জগতের ঘুম আমার চোখে এসে ঝাঁপিয়ে পডলো।

'ভালই করে ওই ঘুমেরা।'

অভীক হাসে, জগতের অনেক গোলমেলে চিন্তার হাত থেকে তোমায় বাঁচায়। চিন্তা ওই মনের কী হবে?

'তোর দাদার তো এসে পড়বার সময় হলো। এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অভীক বৌদির ওই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে।

বৌদিকে ভারী সুখী সুখী দেখতে লাগে। সুখী হওয়ার আশ্চর্য একটি ক্ষমতা আছে বৌদির, ভাবলো অভীক, এ ক্ষমতা সকলের থাকে না।

আচ্ছা এটা আসে কোথা থেকে?

এই সুখী হওয়ার ক্ষমতাটি?

বিশ্বাস থেকে? নিশ্চিন্ততা থেকে?

ভালবাসা থেকে?

না কি বুদ্ধির ঘরের ঘাটতি থেকে?

তাই কী? বোকা লোকের তো অভাব নেই সংসারে, সবাই এমন সুখী? সবাই এমন উজ্জ্বল? রমণীর ওই সুখী মুখটা যেন সব সময় জ্বলজ্বল করে।

অথচ বৌদি দাদাকে লুকিয়ে ফেরিওয়ালা ডাকে, দাদাকে লুকিয়ে মহিলা সমিতিতে মোটা চাঁদা দেয়, আর দাদা বুঝে ফেলেছে দেখলে দারুণ চটে যায়। তখন যত ঝাল ঝাড়ে অভীকের কাছে। অনায়াসে বলে, এতো বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাঁচতে পারে মানুষ? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

আবার তখুনি বৌদি সে ইচ্ছে সংবরণ করে হয়তো রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে দাদার জন্যে মোগলাই পরটা ভাজতে বসে।

জিনিষটা দাদার প্রিয়।

অভীকের বন্ধুরা অভীককে ধিক্কার দেয়। দিলীপ সুধাংশু স্মরজিৎ।

বলে, 'তুই যেভাবে জীবনের সমস্ত ঝড় ঝাপটা থেকে দূরে মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত লালিত পালিত হয়ে আছিস, তাতে তোর দ্বারা যথার্থ বাস্তব সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে যন্ত্রণা।

ছন্নছাড়া হতে হবে, দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে, জীবনকে দেখতে হবে, জানতে হবে। তবে তো?...সমস্ত বড় বড় লেখকের জীবনের ইতিহাস খুঁজে দেখ—প্রারম্ভে দারিদ্র দুর্দ্দশা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, হতাশা প্রেম। আর তুমি এতখানি সম্ভাবনা নিয়ে এসেও—

'তা' হলে কী করতে বলিস আমায়? দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাইস হোটেলে খাবো, বড়লোকের বাড়ির রোয়াকে শুয়ে থাকবো, আর ফুটপাথে বসে রাস্তার আলোয় লিখবো?'

সুধাংশু বলে, 'ঠাট্টা নয়। তোমায় জীবনকে জানতে হবে। জীবন শুধু দাদার আওতায় থেকে আর বৌদির হাতের ছানার জিলিপি খেয়ে একটি মার্চেণ্ট অফিসে চাকরী করা নয়।...জীবনকে দেখতে হবে হাটে বাজারে, রাস্তায়, বস্তিতে, মদের দোকানে, পতিতালয়ে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, সাধুর আশ্রমে, শুভ সাধুর আখড়ায়, তথাকথিত নীতি দুর্নীতির বেড়া ভেঙ্গে, চরিত্র নষ্ট করে, প্রেম করে, ও গুণ্ডা বদমাইসের সঙ্গে মিশে জেল খেটে—'

বলতে বলতে সুধাংশুর মুখ লাল হয়ে ওঠে, খুব উত্তেজিত হয়ে যায় সুধাংশু।

তখন অবশ্য হাসি পায় অভীকের।

বলে, 'তার থেকে তুইই লেগে পড়না কলম নিয়ে। এসব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বোধহয় তোর আছে।'

সুধাংশু বলে, 'আমার বিধাতা যদি আমায় সে ক্ষমতা দিত, দেখিয়ে দিতাম। কিছুর পরোয়া করতাম না। কিন্তু সে গুড়ে যে বালি। পোষ্টকার্ডে একটা চিঠি লিখতে পারি না।'

অভীক তখন অবশ্য হাসে।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে সত্যিই হয়তো ছানার জিলিপি আর কড়াই শুঁটির কচুরী দিয়ে জলযোগ সেরে যখন লিখতে বসে, তখন নিজেকে সত্যিই যেন জোলো জোলো লাগে।

নাম হয়নি তা নয়। প্রতিষ্ঠাও যে কিছু হয়নি তা নয়, টাকা পয়সাও আসছে বেশ, তবু যেন কোথায় একটা বড় রকমের শূন্যতা। যেন ওই রকমই একটা ঝড়ঝঞ্ঝা বিশৃঙ্খলা, নিয়মের বেড়াভাঙা জীবনের জন্যে তীব্র পিপাসা জাগে।

যেন সত্যিই তেমন একটা কিছুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলেই অভীকের ভিতরের সত্যকার সৃষ্টি শক্তি জেগে উঠবে, জ্বলে উঠবে। এই আরামের শয্যাতল থেকে টেনে নিয়ে যাবে অভীককে।

আবার অন্য সময় ওই সব ভেবেছে, ভেবেই হাসি পায়।

হাসি পায় তখন, যখন সম্পাদকের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা আসে, যখন প্রকাশকের কাছ থেকে বইয়ের জন্য জোর অনুরোধ উপরোধ আসে, ছবির জন্যে কণ্ট্রাক্ট হয়।

জীবনটাকে এলোমেলো করলেই কি এর থেকে অধিক কিছু পাওয়া যাবে?

অক্ষমতার মধ্যে একটা প্রেমে পড়া হল না।

কিন্তু করা যাবে কি?

তেমন মেয়ে কোথায়? যে মেয়ে হৃদয়ের মর্মমূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে অলসতা আর নিশ্চেষ্টতার শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে নেবে অভীককে?

যারা কাছাকাছি আসে, তাদের বিগলিত বিগলিত ভাব দেখলে হাসি পায়। নিতান্ত বালিকা মনে হয়। ... কেউ কেউ আবার এমন আবদার আর আদিখ্যেতায় গলে পড়ে যে বিরক্ত ধরে যায়।

অটোগ্রাফ নিতে এসে—'আমায় ভীষণ ভালো করে লিখে দিন—' বলে হাতের ওপর হুমড়ে পড়ে, চোখের কোণে মায়া কটাক্ষ হানতে চেষ্টা করে, করে না তা নয়। কিন্তু তারা তো শুধুই মেয়ে।

মেয়ের মত মেয়ে কি?

'হায় অভীক সেন!' নিজেই নিজেকে বলে অভীক, 'তোমার ললাটে স্রেফ ওই রমলা দেবীর খুঁজে এনে দেওয়া বৌ-ই নাচছে!

যে বৌ তোমার সংসার দেখবে তোমার পুত্র কন্যা সামলাবে, তোমার এই সংসারের ত্রিতাপ জ্বালার আওতা থেকে বাঁচিয়ে লেখার টেবিলে বসিয়ে রেখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চায়ের জোগান দেবে, আর তোমার

অনুরক্তজনের হামলা থেকে তোমায় রক্ষা করতে অক্লেশে বলবে—'উনি তো বাড়ি নেই। কোথায় গেছেন জানি না, কখন ফিরবেন জানি না।'

লিখতে বসলো, মন বসলো না।

জলাভাব মানুষের কী কী কষ্ট হতে পারে ভাবতে চেষ্টা করলো। যদিও স্নানের অভাব ছাড়া কিছু মনে করতে পারলো না।

কতক্ষণ যেন পরে হঠাৎ একসময় পাম্প চলার পরিচিত আওয়াজটা কানে এসে ধাক্কা মারলো।

তার মানে শ্রীযুক্ত অবনী সেন কর্ম অন্তে ঘরে ফিরেছেন, এবং অচল যন্ত্রটাকে সচল করতে যা করবার তা করেছেন।

শব্দটা সব সময় বিরক্তিকর, আজই শুধু মধুর ধ্বনিতে বাজতে লাগলো।

পরদিন সকালেই আবার সেই আবির্ভাব।

আজ আর প্যাসেজে নয় ঘরের মধ্যে!

প্রাণ ভরে চান করছে বোধ হয়, চুলগুলো খোলা, মুখ ঝকঝকে, শাড়িটা ফাঁপানো।

আগে পর্দা ঠেলে রমলা, পিছনে সেই নবাগতা।

রমলা বললো, 'এই যে তোমার এক ভক্ত পাঠিকা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।'

অভীক কলমের মাথায় টুপি পরিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'কেন ক্ষমা চাইবার কী হলো?'

অভীক চেয়ে চেয়ে দেখলো বৌদি যে বলেছিল 'এক ফোঁটা মেয়ে, খুব ভুল বলেনি। এখন ওকে সত্যিই নেহাৎ কমবয়সী দেখাচ্ছে। তিরিশ পর্যন্তই কি পৌঁছেছে?

যেখানে পৌঁছক হালকা পাতলা গড়নটার জন্য কোথাও কোনোখানে বয়সের ভার লাগেনি।

চোখে মুখে ক্ষমাপ্রার্থীর ভাবের বদলে বরং কৌতুকের ঝলমলানি। সেই চোখ দিয়ে ঘরটার সবটা খুঁটিয়ে দেখছে। বিস্ময় কৌতূহল আগ্রহ আবেগ সবকিছু মিলিয়ে চোখের তারকায় একটা আশ্চর্য দীপ্তি।

রমলা বললো, 'ওই যে কাল তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছে না কি—'

'ঝগড়া!'

অভীক ইচ্ছে করে আকাশ থেকে পড়ে। 'ঝগড়া মানে? ঝগড়া শব্দটার তো একটাই মানে আমার জানা আছে, সেটা হচ্ছে—'উভয়পক্ষের বিতণ্ডা।' কিন্তু তেমন কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা—'

সেই ঝঙ্কার তোলা ধ্বনি তুলে বলে ওঠে মেয়েটা, (হ্যাঁ এখন মেয়েটাই বলছে অভীক মনে মনে) 'আমিই' না হয় একাই বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছি—তা তার জন্যে তো আরো বেশী করেই ক্ষমা চাওয়া উচিত।' হাত জোড করে দিব্যি।

অভীক হাসি চেপে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে ওটা এই মহিলাটির কাছে চাইলেই চলবে। অবনীবাবুর স্ত্রী রমলা দেবীর কাছে। বাক্য যন্ত্রণাটি বোধ হয় ওঁরই মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধেছিল।'

'সেটা বাকি নেই—'

বলল মেয়েটা।

বৌদি বলে উঠলো, 'আর বলিসনে ভাই, এ এক আচ্ছা পাগলা মেয়ে' সক্কালবেলা ওপরে উঠে এসে কিনা আমার রান্নাঘরের দরজায় এসে দুহাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কথাটি নেই।...আমি তো দেখে হাঁ।...কী ব্যাপার। না, কালকের রাগ দেখানোর জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছে।'

রমলা ওকে এক হাতে বেষ্টন করে ধরে আব এক হাত নেড়ে বলে, 'বোঝ আমার অবস্থা। তখন ওকে নিয়ে বুকে রাখি না মাথায় রাখি তার ঠিক নেই।'

এই রকমই কথাবার্তা রমলার। কথাকে সাজানো গোছানোর বালাই নেই।

অভীক তেমনি হাসি চেপে বলে, 'মনে হচ্ছে বোধ হয় মাথাতেই রাখলে।'

'উহু।' রমলা হেসে হেসে বলে, 'বুকে'।

কাল থেকে যা দুর্ভাবনাই হয়েছিল। সারা রাত ঘুম নেই। না জানি কী রণচণ্ডীই বাড়িতে এসে অধিষ্ঠিত হলেন। বাব্বা 'ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।'

অভীক মৃদু হেসে বলে, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ও জ্বরটা ম্যালেরিয়া জ্বরের মত—আবার আসবে যখন তখন—

বৌদি হেসে উঠে বলে, 'আর আসবে না। আমি হচ্ছি বাবা ওর অভীক সেনের গার্জেন। ...সত্যি জানিস যখন আমার কাছে শুনলো, আমার দ্যাওর একজন নামকরা লেখক, তখন গায়েই মাখেনি। ভেবেছে বোধ হয় নামকরা না হাতী। কী অলকা, তাই ভাবোনি?'

অলকা অনায়াসে ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'তাই তো। ভাবলাম মরে বেঁচে একখানা বই বোধহয় নিজের খরচায় ছাপিয়েছে দ্যাওর—বৌদি তাতেই বিগলিত।'

বৌদির কথা শুনে জানা গেল ওর নাম অলকা, এবং ও আগে এই বাড়ির বাড়িওয়ালার ভাইয়ের নাম জানত না!

অথবা কে জানে সবটাই চালাকি কিনা। যে প্যাটানে ক্ষমা চাওয়াটি মিটোলো, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, মহা ধুরন্ধর মেয়ে।

রমলা হাসে।

ঠিক ওই ভাবটাই মুখে ফুটিয়ে বলে কিনা, 'নামটা কী?'...যেই না তোর নামটা বলেছি, একেবারে 'অ্যাঁ' বলে ছিটকে উঠলো।'

অলকা অমায়িক গলায় বলে, 'শুধু ছিটকে উঠলো বলছেন কেন? তখন যা বলেছেন, সেটাও বলুন?'

'কী আবার বলেছিলাম তখন?'

'বাঃ বললেন না, 'ও কী তুমি ওর নাম শুনে গরম তেলে কৈ মাছের মতন ছিটকে উঠলে কেন?'

হেসে ওঠে রমলা, বলে, 'তা তুমি যে ভাই তাই করলে।'

'হোপলেস্।'

অভীক বলে, 'বৌদি, ভাষা-টাষাগুলো আর একটু সভ্য করলে ভাল হয় না?'

রমলা অম্লান বদনে বলে, 'ভাবি তো করবো, ফট্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় বাপু।'

'ঠিক আছে।'

অলকা বলে, 'আপনার বৌদির প্রকাশভঙ্গী আপনার থেকে অনেক বেশী প্রাঞ্জল।'

'তাহলে আর কিছু বলার নেই।'

রমলা ব্যস্তভাবে বলে, 'আপাতত আমারও আর কিছু শোনার নেই। রান্নাঘর আমার বিরহে পড়ে কাঁদছে, চললাম। এখন লিখবে না পাঠিকার সঙ্গে আলাপ করবে। অলকা, তুমি কিন্তু ভাই চা না খেয়ে যেতে পাবে না।'

রমলা চলে যেতেই অলকার সেই কৌতুক কৌতুক ভাবটা অন্তর্হিত হয়। অলকার মুখে ফুটে ওঠে, একটি গভীর পরিতাপের ভাব।

একটু সরে আসে ও, টেবিলের কোণটা ধরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে বলে, 'আপনার কাছে যে কি বলে ক্ষমা চাইবো।'

'বাঃ ওসব কথা তো হয়ে গেছে।'

'সে তো কথার কথা। ঠাট্টার কথা। এখন তো আপনাকে মুখ দেখাতে পারছি না।'

অভীক মৃদু হেসে বলে, 'বেশ তো পারছেন। এই তো দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

অলকা চেয়ারে বসে।

এদিক ওদিক আরো ভাল করে দেখে, তারপর বলে ওঠে, 'উঃ কত বই, কত পত্রিকা। আপনার বৌদির কি মজা।'

অভীক আর একটু গম্ভীর হাসি হাসে।

'মজা জিনিসটা আবার সকলে টের পায় না। বৌদির বই হাতে করলেই ঘুম আসে।'

'বলেন কি।' অলকা এখনো আবার প্রায় গরম তেলে কৈ মাছের মত ছিটকে ওঠে, 'বই হাতে ধরলেই ঘুম আসে? আর আমার আপনার এই ঘরটা দেখলে কী মনে হচ্ছে জানেন? যদি আমায় কেউ এই ঘরটায় থাকতে দিতো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে থাকতাম।'

'খুব ভালবাসেন বই পড়তে?'

'খুব বললে কিছুই বলা হয় না।'

অলকার চোখে মুখে যেন লোভের আহ্লাদ। 'পেটুক লোককে খাবারের রাজত্বে এনে ছেড়ে দিলে তার যা অবস্থা হয়, আমারও তাই হচ্ছে এই ঘরটা দেখে।'

'ঘরটাতো সারাদিন পড়েই থাকবে।'

অভীক বলে, 'অতএব আপনিও এসে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে থাকতে পারেন।'

আশ্চর্য! এই কথা বললো অভীক?

যে লোক ঘরে ঝি-চাকরদের পর্যন্ত অসাক্ষাতে ঢুকতে দেয় না, পাছে কিছু নড়িয়ে সরিয়ে বসে, রমলাকে টেবিল গুছিয়ে দিতে দেয় না যদি কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

এমন সাদা কাগজে সই দিয়ে বসা, অভীকের পক্ষে নতুন।

ভাগ্নীটাগ্নী আসবার কথা থাকলেও তো নিজের বইপত্র লেখা, ফাইল কপি, সব গুছিয়ে সরিয়ে রেখে যায়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে আসবার কথা থাকলে কাতরভাবে বলে যায়, 'বৌদি, আমার যথাসর্বস্ব তোমার কেয়ারে রেখে গেলাম।'

বৌদিও চক্ষুলজ্জার মায়া ত্যাগ করে অভীক চলে গেলেই ঘরটায় চাবি লাগিয়ে রাখে সেসব দিনে।

ওরা লেখক ছোটমামার ঘরটা দেখবে বলে ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে, রমলা দালানের জানালাটা খুলে দেখায়। বলে আমার ঘরের আলমারিতে ওর সব বই একখানা করে আছে, পড়বি তো ওখান থেকেই পড়।'

তরুণীরা অবশ্য পত্রিকাগুলোর ওপরই লোভার্ত দৃষ্টি হানে বেশী, কিন্তু সুবিধে করতে পারে না।

আর আজ হঠাৎ অলকার ভাগ্যে এমন অঘটন ঘটলো? এতো সৌজন্য দেখাবার মতো এমন কি পরিচয়?

বরং পরিচয়ের গোড়াতেই তো তিক্ততা।

নেহাৎ মেয়েটা চালাক বলেই—

অথচ অভীক বোকা হল।

অভীক বললো, 'আপনার যদি সময় থাকে কষ্ট করে চলে আসবেন সিঁড়িটা ভেঙে।'

'বাঃ আপনি থাকবেন না, আর আপনার ঘরে এসে উপদ্রব করবো?'

'ঘরের মালিক ঘরে না থাকা কালেই তো উপদ্রব করার সুবিধে।'

অলকা উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে দু' একটা বই বার করে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, 'আপনি সত্যি বলছেন না ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছি না।'

'ঠাট্টা করছি? এই মনে হচ্ছে আপনার?'

'তাই হওয়াই তো স্বাভাবিক। কাল আপনাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছি!'

অভীক হেসে ফেলে বলে, 'ভালই করেছেন। টিকে দেওয়া হয়ে গেল। আর কোনদিন দুর্ব্যবহার করবেন না।'

তারপরই কী ভেবে হেসে বলে, 'আচ্ছা ধরুন আমি যদি আপনাদের লেখক অভীক সেন না হতাম। তাহলে কি আপনি ক্ষমা চাইতে আসতেন?'

অলকা ঝরঝরিয়ে হেসে ওঠে, 'পাগল হয়েছেন। তা'হলে—কালকের ওই ঝগড়াটি আরো পাকিয়ে রোজ একবার করে কমপ্লেন করতে আসতাম।'

'রোজ?'

'রোজ।'

'এতো বিষয় পেতেন কোথায়?'

'ইস্ আপনি এতবড়ো লেখক, আর আপনি এইটি জানেন না, কমপ্লেনের কারণের অভাব হয় না।'

'আমাকে কি আপনার খুব বড় লেখক মনে হয়?'

'শুধু আমার কেন, সকলেরই হয়।'

অভীক হেসে বলে, 'সামনে বসে প্রশংসা শোনাটা খুবই কষ্টকর। কিন্তু কেন জানিনা আপনার মুখ থেকে বেশ ভালই লাগলো।'

'ওটা মুখের গুণ।'

'সে তো একশোবার! যাক এই বলা রইলো, আপনি যখন ইচ্ছে আসবেন, বইটই পড়বেন।'

অলকা বলে, 'এমন অবাধ স্বাধীনতা কে কবে দিয়েছে বলুন? বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'অবিশ্বাসের কী আছে? মানুষই শুধু বই পড়ে, অন্য জীবেরা পড়ে না। বই যার কাছে আছে সে মালিক হলেও, পড়বার অধিকার সকলেরই আছে।'

অভীক হেসে বলে, 'অবশ্য ছেঁড়বার নয়। বই ছিঁড়ে গেছে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

'কলে জল না থাকলে যেমন হয়?'

মৃদু হেসে বলে অলকা।

অভীক বলে, 'ওতো কিছুই নয়। যে আমি একেবারে ফায়ার!'

'আমাকে দিয়ে কি আপনার মনে হবে, আমি বই পড়তে নিয়ে ছিঁড়ি?'

'দেখে?'

অভীক বলে, 'বাইরে থেকে দেখে কি কাউকে কিছু বলা যায়?'

'যায় না, না? তা সত্যি।'

অলকা কেমন উদাস উদাসভাবে টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর পাতা ওলটাতে বলে, 'লেখকরা এসব ঠিক ধরতে পারেন।...'

তারপর চঞ্চল হয়ে বলে, 'আমি যাই। আপনার কত দামী সময়—'

'আমার সেই দামী সময়টাতো এখন একটি বেনের দোকানের টেবিলে ব্যয় হবে।

'বেনের দোকানে?'

'ওই আর কি। মার্চেন্ট অফিসকে আমি বেনের দোকানই বলি।'

অলকা যেন আকাশ থেকে আছড়ে মাটিতে পড়েছে।

অলকার মুখে সেই আঘাতের যন্ত্রণা।

'আপনি একটা সাধারণ অফিসে চাকরী করেন?'

'অফিসটা সাধারণ কিনা জানিনা, তবে আমার চাকরীটা সাধারণ! নেহাৎ সাধারণ।'

অলকা হঠাৎ যেন খোলস ছাড়া সাপিনীর মত ফোঁস করে ওঠে, 'এই কথা বলছেন আপনি হেসে হেসে? এইভাবে আপনার শক্তির অপচয় করছেন কেন? চাকরী করার আপনার কি দরকার?'

'দরকার নেই তাই বা কি করে জানলেন? আপনার কি ধারণা আমাদের মত লেখকদের শুধু লেখার টাকাপয়সা থেকেই চলে যায়?'

'আমারতো তাই ধারণা। নিশ্চিত ধারণা।'

'ধারণাটা ভুল!'

অলকা ব্যগ্র গলায় বলে, 'আমি বলছি, ঠিক এখনই না হলেও—আপনার অনেক প্রতিষ্ঠা হবে। আপনি

আপনি—নাঃ আপনার ওই বেনের দোকানের চাকরীটি করা চলবে না। না কিছুতেই চলবে না।'

অলকার কথাটা যে কতো হাস্যকর তা কি অলকা খেয়াল করে না?

নাকি সত্যিই মেয়েটার মাথা খারাপ?

অভীক হেসে বলে, 'আপনার অনুরোধটি বিবেচনা করে দেখতে হবে।'

অলকা এক অদ্ভুত কাজ করে বসে, হাত বাড়িয়ে অভীকের জামার একটা কোণ টেনে ধরে বলে ওঠে। 'অনুরোধ? অনুরোধ কে করছে আপনাকে? এ আমাদের আদেশ। বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকার প্রতিনিধি হিসেবে এই আদেশ জানাচ্ছি আপনাকে।...উঃ অসহ্য। যে সময়টাকে আপনি আমাদের মানসভোজের পাত্র সাজাতে কাজে লাগাতে পারতেন, সেই সময়টাকে কি না একটা বাজে কেরাণীর কাজে ব্যয় করছেন?'

অভীকের মনে হলো কথাগুলো যেন সাজানো সাজানো। তবু প্রাবল্যের একটা আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ আছে আর পাঁচজনের থেকে ভিন্ন ধরণের প্রকৃতির প্রতি।

অভীক তাই ওকে নস্যাৎ করে দেওয়ার বদলে খুব মার্জিত গলায় বললো, 'তা আপনার জন্যে তো করছিই। করছি না? ওই যে কী বললেন, মানস ভোজের পাত্র নাকি, ওটাকে তো সাজিয়ে চলেছি—'

'আরো বেশী করে করবেন। অন্যসমস্ত চিন্তা ছেড়ে দিয়ে করবেন।'

অভীক অলকার তীব্র ইচ্ছায় মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

তার পক্ষে কী বলা শোভন, একেবারেই জানে না মেয়েটা। জানে না কতটুকু পরিচয়ে কতটা আন্তরিকতার দাবী করা যায়।

তবু আসামী একটা ছেলে নয়।

একটা মেয়ে।

হয়তো বোকা, হয়তো বাচাল, তবু মেয়ে বলেই পার পেয়ে যায়। আচ্ছা অভীক মুখের উপর অবজ্ঞা অগ্রাহ্য না করুক, হেসে উড়িয়ে দিতেও পারতো? অভীক আবার ওর সামনে যুক্তির ঝুলি খুলে বসতে গেল কেন?

অভীক কেন বোঝাতে বসলো, 'অগাধ অবকাশ শিল্প সৃষ্টির পক্ষে বরং প্রতিকূলতাই করে, আনুকূল্য নয়।' ...বোঝাতে বসলো, 'এই যে সারাদিন কাজে বন্দী মন ছটফট করতে থাকে তা'তে প্রেরণা বেশী আসে।'

অনেকক্ষণ বলে চলে অভীক।

আশ্চর্য বৈ কি!

খুবই আশ্চর্য।

এমন কি দাদাকেও কখনো অভীক এসব কথা বোঝাতে বসে না। দাদা একটু 'গোলা' লোকের মত কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে।

যুক্তি তর্কের জালে পড়ে যাওয়া অলকা বলে, 'বেশ করতেই যদি হয় তো কাগজের অফিসে চাকরী করেন। যেখানে অন্ততঃ সাহিত্যের আবহাওয়া। বেনের দোকানে নয়। কিছুতেই নয়।'

অভীকের অস্বস্তি হতে শুরু করেছে।

কারণ অভীক যতই সংস্কারমুক্ত লেখক হোক, গেরস্থবাড়ির ছেলে।

একদিনের পরিচিত মেয়েটা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল তো পড়লই, চালিযে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, একী?'

এ প্রসঙ্গ বদলানো দরকার।

অভীক বলে উঠলো, 'কাল আপনার কোনো কাঁচেব জিনিয ভেঙে গেছে?'

অলকা বলে, 'হঠাৎ একথা কেন?'

'বলুনই না।'

'ভাঙেনি। আর একটু হলে এক ঝুড়ি কাঁচেব বাসন ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। ওই কুলিটুলিগুলো এমন অসাবধান! আমি তো কাল শুধু ওই কাঁচগুলোই সামলেছি। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?'

'হাত গুনতে জানি।'

অলকা কি বলতে যাচ্ছিল কে জানে, কথায় ছেদ পড়লো। রমলা এলো চা নিয়ে।

তার সঙ্গে 'টা'য়ের সমারোহ।

'কী আশ্চর্য্য! আপনি এতো সব বয়ে নিয়ে এলেন? আপনার ওই লোকটা তো রয়েছিল।'

'কে? ওই হারুর মা? ওর হাতে চা পাঠাবো? না ভাই ওসব আমি ভালবাসি না। খেতে দেব মানুষকে। নিজে হাতে করে না দিলে কি মন ভরে?'

'এইসব নিমকি বেগুনী এখন করলেন?'

'ও আর শক্ত কী? রোজই তো করি।'

অলকা বলে, 'আশ্চর্য্য!'

অভীক হেসে ওঠে বলে, 'এইটুকুতেই আশ্চর্য্য হয়ে আশ্চর্য্য হওয়াটা খরচ করে ফেলবেন না। বৌদির ষ্টকে আশ্চর্য্য করে দেবার মত আরো অনেক বস্তু আছে।'

'আমার দ্বারা এসব কিছু হয় না।'

অলকা অম্লান মুখে বলে, 'সকাল বেলা রান্নাঘরের দিকে যেতে হলে আমার হৃদকম্প হয়।'

রমলা অবাক হয়।

'ওমা! তা বললে মেয়েমানুষের চলে? যতই তোমার রান্নার লোকজন থাক, ঠিক কি আর বাড়ির লোকের মত হয়?'

অলকা বলে, 'তবু ওর রান্না খাওয়া চলে, আমার তো আমি নিজেই মুখে তুলতে পারি না।'

রমলা গালে হাত দেয়।

বলে, 'অবাক করলে যে তুমি অলকা? না ধেৎ! ঠাট্টা করা হচ্ছে। এমন চটপটে খরখরে মেয়ে তুমি রান্না করতে পারো না? তা আবার হয় নাকি?'

'সবাই কি আপনার মত হয়, অলকা বলে, এসব আজে বাজে কাজ আমার ভাল লাগে না।'

রমলা আহত হয়।

রমলা দুঃখের গলায় বলে; 'রান্নাটা আজে বাজে কাজ নয় অলকা! মেয়েমানুষের ওটাই প্রধান কাজ। তোমায় বোধহয় কেউ এসব শেখায় নি, তাই ওর আনন্দটি জানো না। কাল থেকে এসো তো আমার কাছে। সব রকম রান্নাটান্না শিখিয়ে দেব। রান্নায় নেশা ধরিয়ে দেব দেখো। আসছো কাল থেকে—।'

'আসবো।'

অলকা দুষ্টু হাসি হেসে একবার অভীকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নিশ্চয় আসবো। তবে আপনার নেশায় আসক্ত হতে নয়। আমাব নিজের নেশার সুখ তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে।—আজ কিন্তু কিছু বই নিয়ে যাচ্ছি। লোভ সামলাতে পারছি না।'

তারপর হাতে বুকে যতগুলো ধরে, ততগুলো বই বেছে বেছে নিয়ে, বুকে চেপে ধরে হাসতে হাসতে বিদায় নিলো অলকা।

কিন্তু সত্যি কি বিদায় নিল।

রমলা বললো, 'সারা সকালটা এখানেই কাটানো, স্বামী খাবে টাবে খেয়াল নেই। মেয়েমানুষে রান্না করতে নারাজ, এ বাবা বড় আশ্চর্য্য।' তারপর আবার সহানুভূতির গলায় বলে, 'ঘরে মন বসে না। ছেলেপুলে তো নেই। স্বামী নাকি বিজনেস করেন। বলছিলেন তোর দাদা।'

অভীক বলে, 'মহিলাটিকে বেশী প্রশ্রয় দিও না বৌদি। সন্দেহ হচ্ছে হেড্ অফিসে কিছু গণ্ডগোল আছে। বেশী এলে না আবার তোমার সব ভেঙে চুরে তচনচ্ করে।'

বলে ফেলে অবাক হলো অভীক।

একথা কেন বললাম আমি?

একথা তো বলার ছিল না।

রমলাও অবাক হলো।

বললো, 'ওমা। শোন কথা। বাচ্চা মেয়ে নাকি, যে ভাঙবে চুরবে?'

তাইতো ভাবা স্বাভাবিক।

কিন্তু অলকা নামের ওই মেয়েটা?

এই শান্ত ছন্দ সংসারটার ছন্দ ভাঙতেই কি তাকে তার বিধাতা এখানে এনে ফেললেন।

সে কি এতদিন যাবৎ এই রকম ছিল? তার এই উনত্রিশ বছরের জীবনে সে অনেক হৈ চৈ করেছে, অনেক হেসেছে কথা বলেছে, বাচালতা করেছে, ঝগড়া করেছে, কিন্তু কোনদিন সর্বনাশা ভাঙনের মূর্তি নিয়ে দাঁড়ায় নি। বরং কাঁচের জিনিস ভাঙবার ভয়ে সবকিছু সামলে সামলেই এসেছে এযাবৎ।

হঠাৎ ওর মধ্যেও কি একটা ভাঙনের হাওয়া এসে হাজির হল।

কে ভেবেছিল অতগুলো বই নিয়ে গিয়েও সত্যিই পরদিন সক্কালবেলা আবার এসে হাজির হবে অলকা?

অভীক প্রমাদ গণে।

কারণ অভীকের ঘরেই তার পদার্পণ।

অভীক কোনদিনই ভীরু নয়।

তবু অভীকের বুকটা কেঁপে ওঠে। অভীক যেন ওর ওই আসার মধ্যে একটা সর্বনাশের ছায়া দেখতে পায়।

অভীক সেই ছায়াটাকে ঢাকা দিতে তাড়াতাড়ি বলে, 'বৌদির শুভ-প্ররোচনা কাজে লেগেছে তাহ'লে! যান এখন সো-জা রান্নাঘরে চলে যান। মোচার ঘণ্ট রাঁধতে শিখুন গে।'

'রান্নাঘরে যেতে আমার দায় পড়েছে—'অলকা বলে, 'আমি তো আপনাব কাছেই বসতে এলাম। লেখক অভীক সেনকে যে এভাবে আমার একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাব তারই ঘরে বসে বসে, একী কোনদিন ভেবেছিলাম?'

অভীক বিচলিত হয়।

অভীক সেগুলো গোপন না করে বলে, 'কিন্তু আপনার না দুপুরবেলায় আসবার কথা ছিল? ঘরেব মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘর তচনচ করবার কথা?'

অভীক কথা বলছে, আর নিজেই অবাক হচ্ছে। একথাও তো বলার ইচ্ছে ছিল না আমার।...একমুহূর্ত্ত আগেও তো এ কথাটা বলবে বলে ভাবেনি।'

কেন বললাম ঘর তচনচ, করার কথা ছিল। এমন আবদার দিয়ে কথাতো কাউকে বলি না!

তবু বলে ফেলে।

বলে, 'কেউ বই পড়তে ভালবাসে, শুনলে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

অলকা দুষ্ট হাসি হেসে বলে, 'তাকেও ভালবাসতে ইচ্ছে করে।'

অভীক ওর আবেগ আর আবেগে ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে, 'বোধহয় ইচ্ছে করে।'

অলকা টেবিল হাতড়ায়, র‍্যাক থেকে বই নামায়, চাবি দেওয়া আলমারিটার পাল্লা ধরে টানাটানি করে। আর তার সঙ্গে কথার ফুলঝুরি ঝরায়, 'আচ্ছা কখন লেখেন আপনি? মুড্ এলেই? যদি অফিসে বসে, কি রাস্তায় যেতে যেতে মুড্ এসে যায়? আচ্ছা—বইয়ের চরিত্রগুলো কি আপনার দেখা? নিশ্চয়ই দেখা। না দেখলে কখনো, অতো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে? আচ্ছা আপনার 'নদীর চরে' উপন্যাসটার নায়িকাকে অমন মারাত্মক মুহূর্তের মুখে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলেন কেন?'...

আর কেউ কোনদিন এভাবে অভীকের বই কাগজ নিয়ে লণ্ডভণ্ড করেছে? চাবিবন্ধ আলমারির পাল্লা ধরে টেনেছে কেউ?

অভীক হাঁ হাঁ করে উঠল না, অভীক বিরক্ত হল না। অভীক শুধু ড্রয়ার থেকে চাবিটা বার করে ওর হাতে দিল।

অলকা সেটা তুলে নিয়ে বললো, 'আমি খুব অসভ্য, না?'

অভীক আস্তে বললো, 'আপনি যে ঠিক কী, তা এখনো বুঝতে পারছি না।'

আজ আবার প্রথম দিনের সেই হাওয়া শাড়িটা পরেছে অলকা।

যেন ব্লাউজ আর শায়ার ওপর একটা প্রজাপতির ডানার ওড়না উড়িয়েছে।

অভীকের মনে পড়ে দাদা বাড়িতে রয়েছেন। মনে হয় বৌদি হয়তো অপেক্ষা করছেন অলকা ওঁর কাছে যাবে বলে।

অভীক হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনি এতো পাতলা শাড়ি পরেন কেন?'

অলকা বোধহয় একটু চমকালো।

অলকা অবশ্যই এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাবলে ঘাবড়ায়ও না। অভীকের বিছানার ওপর একখানা বই নিয়ে বসে তার পাতা ওলটাচ্ছিল, তেমনি ভাবেই বসে থেকে বলে, 'শাড়ীগুলো দোকানে বাজারে বিক্রী হয় বলে? কেন আপনার কী এসে যাচ্ছে তাতে?'

'দেখতে খারাপ লাগছে।'

অলকা মুখ তুলে একটু হেসে বলে, 'খারাপ মোটেই লাগছে না, 'খারাপ লাগছে' বলাটা ভাল দেখায় তাই বলছেন।'

'আপনার কথাবার্তা খুব সাংঘাতিক। এভাবে আর কেউ কথা বলতে সাহস করেনি কখনো।'

অলকা সকৌতুকে হেসে বলে, 'তাই নাকি? তাহলে তো বলতে হয় আমিই আপনার প্রথমা!'

অভীক একটু শক্ত হবার চেষ্টা করে।

বলে, 'আপনি আবার কী হতে যাবেন? নেহাত পাম্পে ঠিক জল উঠছে, ইলেকট্রিক ঠিক আছে, নর্দমার জল আটকাচ্ছে না, তাই ঝগড়া ঝাঁটি হচ্ছে না। এই পর্যন্ত!'

'ইস। তাই বৈকি।'

অলকা মাথা দুলিয়ে বলে, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনি ভয় পাচ্ছেন বলেই সত্যি কথাটা অস্বীকার করছেন!'

আজও অনেকক্ষণ অভীককে জ্বালিয়ে আজও অনেক বই নিয়ে বিদায় হয় অলকা। অলকা আজ চান করেনি, অলকার খোলা রুক্ষ এলোচুলগুলো যেন সাপের ফনার মত দুলে ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়।

'মেয়েটা কে রে?'

অবনী এঘরে এসে প্রশ্ন করে।

এটা আশ্চর্য্য!

অভীকের ঘরে কতরকমের লোক আসে। কত ছেলেমেয়ে আসে, অবনী কখনো 'ও কে রে?' এ প্রশ্ন করে না।

অভীক চকিত হয়, কিন্তু আত্মস্থ হয়। বলে, 'কেন বৌদি বলেনি?'

'বৌদি তো বলছিল, দোতলার নতুন ভাড়াটে মনিবাবুর স্ত্রী। কিন্তু—'

অভীকের হঠাৎ মনে হয়, দাদা নিশ্চয় বৌদি প্রেরিত হয়ে এসেছে। অলকা কেবলমাত্র এঘরে এসে গল্প করে চলে গেছে তাই বৌদির রাগ হয়েছে। কিন্তু সেকথা দাদাকে দিয়ে বলাবে?

অভীক আর একটু শক্ত হয়, 'ওর আর কিন্তু কী? মহিলাটি ভীষণ বইপাগল, তাই এসে আর নড়তে পারছিলেন না।'

'সে তো দেখলাম।'

দাদা তার স্বভাবজাত অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলে, 'মেয়েটার জামা কাপড়গুলো দেখতে ভাল নয়।'

হয়তো অভীকের মধ্যে চিরাচরিত যে সংস্কারজনিত উদ্বেগ কাজ করছিল, সেটাকে জোর করে তাড়াতে চেষ্টা করছিল বলেই দাদার ওই সহজ প্রশ্নটাই কৈফিয়ৎ তলবের মত লাগলো তার। ভিতরে রয়েছে অকারণ একটা অপরাধবোধ। তাই নিজেকে কাঠগড়ায় আসামীর মত লাগলো।

অভীক কখনো যা করে না তাই করলো।

দাদার মুখের ওপর একটু ক্ষুব্ধ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো, 'এসব তোমার নজরে পড়ে? জানা ছিল নাতো। আমি অত দেখিনি।'

কিন্তু বিদ্রূপের হাসি দিয়ে অবনী সেনকে চুপ করিয়ে রাখবে তুমি অভীক সেন?

তাছাড়া রমলা নেই?

রমলা যদি দিনের পর দিন দেখে দোতলার ওই বেহায়া বাচাল বৌটা তার দেওরের ঘরে এসে হুড়েপড়ে পড়ে থাকে, ঢুকলে আর বেরোতে চায় না, সকাল নেই সন্ধ্যে নেই, ছুটির দুপুর নেই, অভীককে যেন গ্রাস করে রাখে, তাহলে রমলার গৃহিণীসত্তা রুখে দাঁড়াবে না—তার অভীকের সম্পর্কে কল্যাণ চিন্তা?

প্রথম প্রথম রমলা অভীককে বলতো, 'ব্যাপারটা কী বল্তো অভী? বেহায়া ছুঁড়ির বরটা কি হাবাকানা? বৌটা যে এখানে সারাদিন, পারলে রাতটাও কাটাতে আসে, কিছু বলে না কেন?'

বল্তো, 'আচ্ছা অসভ্য মেয়ে বাবা! একটু সমীহ নেই। বাড়িতে যে আরো দুটো লোক রয়েছে, তা যেন খেয়ালই নেই। এসেই তোর ঘরে ঢুকে বসে আছে। তোর তো লেখা টেখা 'ডকে' উঠছে। কিছু বলতে পারিসনা?'

অভীক ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'কী বলবো? আপনি আর আসবেন না?'

রমলা ওই চিরপরিচিত মুখটায় যেন অপরিচয়ের ছায়া দেখতে পায়।

রমলা ভয় পায়।

তাড়াতাড়ি বলে, 'তাই কি আর বলা যায়? একটা ভদ্রতা সৌজন্য নেই। একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে বলা আর কি।...এদিকে তো লেখক অভীক সেন শুনে লাফিয়ে উঠেছিলেন মেয়ে, সেই লেখাই তো ঘুচিয়ে দিতে বসেছিল বাবা।'

অভীক তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'লেখা ঘুচিয়ে দেবার সামর্থ্য কারো নেই। তবে হ্যাঁ ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।...ওর মধ্যে সাহিত্যের প্রতি, শিল্পের প্রতি, গানের প্রতি কী অসীম পিপাসা। আর সেই ভদ্রলোকের কিসের বিজনেস জানো? ভুষির।'

'ভুষির? কিসের ভুষির?'

'সে তাঁর ভগবানই বলতে পারেন। ভদ্রলোক এ জগতে ওই ভুষি ছাড়া আর কিছু চেনেন না। কোনো একদিন ক'জনে মিলে ওই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির দুটো মানুষকে কতকগুলো আবার নিয়মের দড়াদড়িতে বেঁধে রেখেছে বলে যার একটু পৃথিবীর খোলা বাতাস নিতে ইচ্ছে করে সেটুকুও নিতে পারে না?'

রমলা মনে মনে বলে, 'পাবে না কেন? পৃথিবীতে তো চারিদিকেই খোলা বাতাস, নিকগে না দু'ডানা ছড়িয়ে উড়ে উড়ে। আমার ঘরে এই শান্তির হাওয়াটুকুকে নষ্ট করতে আসা কেন?'

কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

রমলাকে যত বোকা মনে হয়, তত বোকা সে নয়। সোজা হাওয়া উল্টো হাওয়া সে বোঝে। বোঝে হাওয়া উল্টো বইছে।

রমলা নিতান্ত বোকা সেজে বলে যায় 'ভুষির আবার ব্যবসা কী বাবা? এ ব্যবসা ভদ্রলোকে করে? তাতে পয়সা হয়?'

কিন্তু রমলা অবনী সেনের কাছে গিয়ে পড়ে। 'ও মেয়ে জাদুকরী! ও তোমার ভাইটাকে জাদু করেছে! কী হবে? তুমি একটা বিহিত করবে না?'

অবনী সেন তলে তলে ভাড়াটে তোলার চেষ্টা করে।

বাড়িটা দু'মাস ছ'মাস পড়ে থাকলে যে পয়সার লোকসান সেটা আর এখন খেয়ালে আসে না হিসেবী অবনী সেনের।

এইভাবেই 'উপায়' ভাবে অবনী সেন।

এতোদিনে বুঝি অভীকের বন্ধুদের ইচ্ছেটা পূরণ হচ্ছে।

অভীক আর মাতৃক্রোড়ে শিশুর ভূমিকায় থাকছে না। অভীকের এখন প্রায় প্রায় অখিদে থাকে বলে রমলার যত্ন করে তৈরী খাবার টাবার গুলো পড়ে থাকে।

অভীকের কথা-টথা এতো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে যে রমলাকেও প্রায় মৌনী করে ফেলেছে।

রমলার সেই সুখী সুখী উজ্জ্বল মুখটা যে আর তেমন সুখী সুখী নেই তাও আর দেখতে পায় না অভীক।

অভীক এটাই ভাবে, সত্যিই এতোদিন আমি যেন নেহাৎ আঁচল চাপা হয়ে পড়েছিলাম। আমি একটা বয়স্ক পুরুষ, বলতে কি একজন নামকরা লেখক, আমাকে একটু দেখার আশায় ছেলেমেয়েগুলো মরে যায়, একবার সভায় নিয়ে যেতে পারলে তরুণদল কৃতার্থ হয়, অথচ আমি কিনা কোনো একজন ভক্ত পাঠিকাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছি বলে ভয়ে কাঁটা হচ্ছে?

ওই কাঁটা হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গডে উঠে। গড়ে তোলে যুক্তি খাড়া করে করে।

অবনী সেন যা ভেবেছিল তা হল না। ভাড়াটে এমন এক কথায় বিদেয় করা যায় না।

সিঁড়ির-তলায় বাইরে বেরোবার পথে অলকা সেই প্রশ্নটাই উপস্থাপিত করে অভীক সেন নামের বাসনাছন্ন লোকটার সামনে।

অভীক চমকে বললো, 'তার মানে?'

'মানে আপনারাই বলতে পারেন। আপনারা বাড়ির মালিক।'

'আচ্ছা আমি ফিরে এসে সন্ধ্যেবেলা দাদাকে জিগ্যেস করছি—'

'অনে-ক ধন্যবাদ। আপনার কাছাকাছি আসতে পেয়ে আমার জীবনে যে কী বিরাট ওলোট পালোট হয়ে গেছে, তা' বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।'

অভীক ওই ঢলঢলে চোখের চাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে।

'কী দেখছেন?'

'আপনাকে।'

'এমা আমি কী একটা দ্রষ্টব্য বস্তু?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'বেশ তাহলে আরো কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে চলুন। আমিও বেরোচ্ছি।'

'কোথায়?'

'কোথায়—?' অলকা হেসে ওঠে, 'এই যে দিকে দু'চক্ষু যায়—'

'ও রিক্সা নেবেন না', অভীকও হাসে, 'দিক্‌ভ্রান্ত হবার ভয়।'

অলকা অভিমানের গলায় বলে, 'আমার তো আর আপনার মত একটা নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র নেই যে, দিক্ ঠিক করাই আছে। আপনি চলে যাবেন, আর আমিও সারাদিন বোকার মত নিঃশ্বাস ফেলবো হাঁপাবো, 'যেকানে যেতে ইচ্ছে হয় না, সেখানে বেড়াতে যাবো। আর যদি আমার 'ভুষিমাল' দয়া করে যখন একসময় বাড়িতে ফেরেন, তখন তাঁর নৈবেদ্য সাজাবো।'

অভীকের মনের মধ্যের সহানুভূতির তারটা ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে।

অভীকের ইচ্ছে হয় ওকে অঙ্গসুধায় ভরিয়ে দেয়, কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ কী হাত পা বাঁধা।

বাসের রাস্তার দিকেই যাচ্ছিল, অলকা হঠাৎ বলে উঠল, 'ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে আপনিও শুধু কেরাণীর মত প্রতিটি দিন অফিসে হাজরি দেন!'

'আমারও আশ্চর্য্য লাগে।'

'তবু তাই করে চলেছেন।

'তবু তাই করে চলেছি।'

'বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় না?'

'হয় বৈ কি। তবু নিজেকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে রাখাকেও শ্রেয় বলে মনে হয়।'

অলকা রাস্তার মাঝখানেই শব্দ করে হেসে ওঠে। 'ঠিক আমারই মত দশা। আমিও ওই শ্রেয়র খাজনা

দিচ্ছি বসে বসে। ভুষিমালের নৈবেদ্যি সাজাচ্ছি।'

'যাক। যেতে দিন।'

অভীক সহসা অলকার পিঠে একটা হাত রেখে তার মধ্যে গভীর স্পর্শের স্বাদ ঢেলে দিয়ে বলে, 'আজ কাট্ মারলাম। চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।'

'বেড়িয়ে? আপনার সঙ্গে?

অলকার চোখে আষাঢ়ের আকাশের ছায়া!

'মিছে কেন আর একদিনের জন্যে স্বর্গের স্বাদ দিতে আসছেন?'

'মাত্র একদিনের জন্যেই বা ভাবছেন কেন? বলুন কোথায় যেতে চান।'

'আমার কি কোনো জগতের খবর জানা আছে? আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাবো।'

'আচ্ছা চলুন 'শালিমারে' ঘুরে আসি। এসময় আপনার বাড়িতে কোনো কাজ নেইতো?'

'আমার বাড়িতে আমার কোনো সময়েই কোনো কাজ থাকে না অভীক বাবু। আমি অবান্তর, আমি অপ্রয়োজনীয়, আমি ফালতু।'

এরপর আর ভয় কিসের? একটা ফালতু অবান্তর অপ্রয়োজনীয় প্রায় বেওয়ারিশ জিনিষকে তুলে নিতে বিবেকের প্রশ্নই বা কী?

'আগে একটু চা কি কফি খেয়ে নেওয়া যাক।'

বললো অভীক।

নির্ভয়েই ঢুকলো একটা একেবারে নাম না করা জায়গায়।

নামী-দামী জায়গায় গিয়ে বসলে তো নামকরা লোকদের বিপদ। কোথা থেকে কে চিনে ফেলে।

কেউ কি জানতো অমন নিশ্চিন্ততার শিবিরের মধ্যে সহসা এক শত্রু হানা দেবে।

তা এখন এই দণ্ডে স্মরজিৎকে শত্রুই মনে হলো অভীকের।

জীবনের এই প্রথম দিনটা কিনা বরবাদ!

স্মরজিৎ একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো, 'কী বাবা লেখক, তোমার যে আর দর্শনই পাওয়া যায় না। ওঃ তাই।'

পশ্চাৎবর্ত্তিনীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে এতক্ষণে।

স্মরজিৎ অলকাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে ওঠে, 'তা শুভ কাজটি সারা হল কবে? বন্ধুবান্ধবদের কলা দেখিয়ে?'

অভীক ধমকে ওঠে, 'কী যা তা বলছিস?'

'ওঃ মাপ করবেন মিসেস্ মিসেস্।'

'মিসেস্ টিসেস্ নয়, শ্রীমতী অলকা রায়।'

অলকা হাতজোড় করে একটি নমস্কার করে।

অভীক বলে, 'আমার প্রতিবেশিনী। আমার বন্ধু স্মরজিৎ।'

অতএব আর একখানি 'নিভৃত কুলায়' 'দুজনে কূজনে' কফিপান হয় না, বাইরের টেবিলেই তিনজন।

এতেও যদি স্মরজিৎকে শত্রু মনে না হবে তো কিসে হবে?

স্মরজিৎ একবার অলকার কান বাঁচিয়ে বলে নেয় 'কী বাবা ভাল ছেলে, উচ্চমার্গের জীব। কবে থেকে এ উন্নতি?'

অভীক চাপা গলায় বলে, 'থাম।'

তারপর খোলা গলায় বলে ওঠে, 'তা তুই আজ এমন হতভাগ্যের মত একা যে? জানেন অলকাদেবী, জীবনে আজ এই প্রথম আমি আমার এই বন্ধুটিকে একা ঘুরতে দেখছি। একটি করে বান্ধবী থাকবেই সঙ্গে—'

বলবেই তো। ওকে অপদস্থ করাই ঠিক।

যেমন শত্রুতা সাধলো স্মরজিৎ।

কিন্তু অপদস্থ কোথায়?

স্মরজিৎ দিব্যি হেসে উঠে বলে, 'তাহলেই বুঝুন? জগতের সার বস্তুটি কি, সে জ্ঞান জন্মাতে ওর এতদিন লাগলো, আর আমি তাকে কোন কালে জেনে বুঝে আস্বাদ নিয়ে এখন জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে পরিত্যাগ করে ফেলেছি।'

অতএব অভীকই অপদস্থ।

রাগে অভীকের মাথা জ্বলে যায়।

অভীক ফট করে একটা নির্লজ্জ উক্তি করে বসে, 'একবারে পরিত্যাগ? তা ওহে জ্ঞানবৃদ্ধ! তোমার সর্বশেষ শিকারটি যেন কে? বিভাসের শ্রীমতী না? তাই শুনছিলাম মনে হচ্ছে।'

স্মরজিৎ মুখটিকে করুণ করুণ আর অনুতপ্ত অনুতপ্ত করে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ ভাই। যা শুনেছিলি ঠিকই কিন্তু তারপরেই মনটা কেমন বদলে গেল। মনে হলো, দূর ওতে কোন সুখ নেই। 'পরস্ত্রী' জিনিষটা কেমন ভারী ভারী, কুমারী মেয়েগুলো তা নয়। এবার ঠিক করে ফেলেছি একটা নিজস্ব স্ত্রী সংগ্রহ করে নেবো।'

'আরে তাই নাকি?'

অভীক লাফিয়ে ওঠার ভান করে। 'কবে সেদিন আসছে? তোমার মতে যেটা মতিচ্ছন্ন ছিল? জানেন অলকাদেবী, এই লোকটার মতে মতিচ্ছন্ন না হলে কেউ বিয়ে করে না।'

অলকা চোখ ভুরু নাচিয়ে বলে, 'তবে? হঠাৎ মতিচ্ছন্নে মতি কেন?'

'ওই তো ভেবে দেখলাম যতরকম পরকীয়া হতে পারে তার স্বাদ তো চাখা গেল, 'স্বকীয়া'র কেমন না জেনেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব?'

'এখুনি আপনার সে চিন্তাও এসে গেছে? পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার চিন্তা।'

'ওর আর এখন তখন কী?' স্মরজিৎ উদাস ভাবের অভিনয় করে বলে, 'সর্বদাই মনে করা উচিত 'শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির' কথা। পৃথিবীর যা অবস্থা।'

'স্মরজিৎ তোর বারোটা বেজে গেছে মনে হচ্ছে।'

'আমারও হয়েছে।'

স্মরজিৎ প্রসন্ন হাস্যে বলে,'তাই এবার আবার একটা থেকে শুরু।'

কথার মাঝখানে কফি আর কাজু খাওয়া হয়েছে, স্মরজিৎ 'জবরদস্তি করে তার দাম দিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'চল্ তোরা কোথায় যাবি পৌঁছে দিই!'

'সঙ্গে গাড়ি আছে বুঝি?'

অলকা বলে।

অভীক বলে, 'স্মরজিৎ আছে, গাড়ি নেই দৃশ্য কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'কিন্তু এখন, এই বেলা এগারোটার সময় এতো রোদ্দুরে কোথায় যাবি?'

স্মরজিৎ বলে, 'অফিস থেকে যে কাট মেরেছিস সে তো বুঝতেই পারছি। যাবার জায়গাটা ঠিক করেছিস কিছু?'

'কিছু না। এমনি হঠাৎ আর যেতে ইচ্ছে হল না। আর ইনিও—'

'থাক্ ও আর আমায় বিশদ বোঝাতে হবে না।'

স্মরজিৎ হেসে বলে, 'আমায় ডিরেকশানটা দিয়ে দে।'

অভীকের ইচ্ছে ছিল না তার আজকের এই নতুন দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার সুখের ওপর এমন একটা অবাঞ্ছিত ছায়া এসে সবটুকু গ্রাস করে ফেলে, তাই ভেবেচিন্তে কিছু একটা ঠিক করছিল, মাঝখান থেকে অলকা বলে বসে, 'তার থেকে আপনিই ঠিক করুন।'

'আমি? আমি আপনাদের ব্যাপারে—'

অলকা হতাশ হতাশ ভাব দেখিয়ে বলে, 'ব্যাপার ট্যাপার কিছু নয় মশাই। যা ভাবছেন তার কিছু না! আমি হচ্ছি ওঁনাদের বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের ভাড়াটের স্ত্রী এবং ওঁনার লেখার একটি পরম ভক্ত পাঠিকা।

এইমাত্র ব্যাপার। জীবনে এই প্রথম উনি বললেন, 'আজ আর অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না, চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি। ফিরে এসে ওঁনার বৌদির জেরার মুখে পড়বার প্রস্তুতি নিয়েই যাচ্ছি।'

'বৌদি, ও হো হো—তোর সেই বৌদি?'

স্মরজিতের হাসির মধ্যে বিস্ময়ের ভাগটাও অনেকটা থাকে।

'এখনো তাহলে তুই দাদা বৌদির হেপাজতেই আছিস? আমি ভাবছিলাম কিছুটা বুঝি উন্নতি হয়েছে—'

অলকা বলে, 'ও আর হবার নয়। দেখে দেখে অবাক হয়ে যাই। এভাবে একটা নানাবিধ সংস্কারের আওতার মধ্যে ভয়ে ভয়ে থাকা, ওঁর পক্ষে যে কীভাবে সম্ভব হয়।'

আলাপের ধারাটা মাত্র অলকা আর স্মরজিতের মধ্যেই বয়ে যাচ্ছিল।

অভীক যেন হঠাৎ ওর বাইরে পড়ে গেছে পিছনে।

অভীকের খুব রাগ হচ্ছিল।

স্মরজিৎকে এত ভিতরের খবর দেবার দরকার কী। অভীক কি করে না করে তা' অন্যাকে বলার কি আছে?

অভীক যেন ওর থেকে আরো বিরাট বিশাল হতে পারতো, শুধু তার কাপুরুষতার জন্যে পারছে না, এইটা ঘোষণা করে বলার মধ্যে অভীক সেনের গৌরবের পরিচয় কোথায়?

অভীক গম্ভীর গলায় বলে, 'সব ভয়-ই যে সত্যি ভয় তা নাও হতে পারে।'

'দেখে তো তা' মনে হয় না।'

বলে অলকা।

যেন উত্তেজিত ভাবেই বলে, 'আমার কেবল মনে হয়, উনি ওঁর নিজের শিল্পীসত্তার মূল্য কতটা তার খবর রাখেন না। উনি ওঁর ওই বাধ্য ছোট ভাই লক্ষ্মণ দেবর আর ভদ্র সামাজিক মানুষের সত্তাটাকেই পরম মূল্য দিয়ে রেখে দিয়েছেন।

স্মরজিৎ...গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, 'চলুন ব্যাণ্ডেল পার্কে যাওয়া যাক।'

অলকা ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, 'কী মজা! কী মজা!'

তারপর হেসে হেসে বলে, 'সাধে আর আপনাকেই জায়গা নির্বাচন করতে বললাম। জানলাম তো আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় রয়েছে।'

সেদিনটাকে সবটাই গ্রাস করে নিল স্মরজিৎ। স্মরজিৎ নিজের গাড়ি চড়িয়ে বেড়িয়ে আনলো, নিজের পকেট হালকা করে খাওয়ালো এবং পৌঁছেও দিয়ে গেল বাড়ি অবধি।

স্বভাবতঃই অলকার কথা হাসি সবই স্মরজিৎ অভিমুখী হতে থাকলো।

অভীক একটা মৌন দাহ নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

শুধু দাহর একটু প্রকাশ হয়ে গেল স্মরজিৎকে বিদায় দেবার সময়।

বললো, 'খুব তো ঘোষণা করে বলা হলো, পাখিজুকি খাই না এখন ধর্মে দিয়েছি মন—দেখে তো তা মনে হল না।'

স্মরজিৎ হেসে বললো, 'পুরনো পাপী তো? এমন হয়ে যায়। তবে ভয় নেই আর জ্বালাতনে ফেলবো না, একেবারে নেমন্তন পত্তর নিয়ে আসছি।'

অভীক তীব্র দৃষ্টিতে ওর গাড়ির নম্বরটার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

অভীকের মনে হলো আজকের দিনটা একেবারে বরবাদ গেল।

আর অদ্ভুত মনোভাবে মনে হলো, অভীকের একটা সম্পত্তি যেন স্মরজিৎ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে নিতে এসেছে।

আশ্চর্য্য! কোথা থেকে যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এটা ভাবলো না, ওই অলকা নামের মেয়েটা 'আমার সম্পত্তি' কেন?

বাড়ি ফেরার সময়টা অফিস টাইমের কাছাকাছি, অতএব নিশ্চিন্ত হয়েই দরজায় বেল দিল। সঙ্গে সঙ্গে

খুলেও গেল দরজা, কিন্তু যিনি খুললেন, তিনি আর কেউ নয়, স্বয়ং দাদা—শ্রীঅবনী সেন।

অবনী সেন চিরদিনই ধৈর্য্যের জন্যে বিখ্যাত, তবু আজ অধৈর্য্য হলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তুমি আজ অফিস যাওনি?'

একেই মেজাজ ছিল খিঁচড়ে, আবার এসেই এই।

তার মানে সেই পাহারা।

অভীক দপ করে জ্বলে উঠে বললো, 'আমার ওপর পাহারা দেওয়ার কাজটা তা হলে ঘরে বাইরে চলছে?

অবনী সেন অবাক হল না, আর ওই চিরপরিচিত মুখটায় অপরিচয়ের ছায়া দেখে রমলার মত ভয়ও পেল না। গম্ভীর হয়ে বললো, 'সেটা যখন বুঝতেই পেরেছো, তখন আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

'তার মানে?'

'মানেটা তোমাকে বোঝাবার সময় এখন আমার নেই। তবে দোতলার মনিবাবু এসে আমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেছেন সেটাই জানিয়ে রাখলাম তোমায়।'

অভীক ভিতরে ভিতরে একটু নিভে গেল।

তবু মুখে জোর দেখিয়ে বললো, 'এর মধ্যে মনিবাবুর সম্পর্কটা কী?'

'সম্পর্ক এই, তুমি মনিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একটা জটিল সম্পর্ক বাধিয়ে তুলছো বলে?'

দাদা চলে গেল।

এরপর এলো বৌদি।

বললো, 'কিছু খাবার মত জায়গা পেটে আছে না সবটা ভরিয়ে এসেছো?'

রমলা ওকে 'তুমি' বললো।

অভীক উদ্ধতভাবে বলল, 'জায়গা নেই।'

'জানতাম।'

রমলার সেই হাঁসফাঁস ভাবটা গেল কোথায়, রমলা অমন স্থির হয়ে আছে কী করে?

রমলা শান্ত গলায় কথা বলতে শিখেছে।

'তোমার দাদার সুখে দুঃখে মাথাটা কখনো হেঁট হয়নি, আজ হলো। দোতলাব মনিবাবু যা তা বলে গেল, বলবে না কেন, সুযোগ পেয়েছে যখন।'

অভীক কোন কথা বললো না।

রমলা আবার বললো, 'ভদ্রলোক বলে গেল 'দু-দশখানা বই লিখেছেন বলে উনি কি ভেবেচেন সমাজের মাথা কিনেছেন? আমার স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাবার উনি কে?'

'ওঁর স্ত্রী নাবালিকা?

'নাবালিকা কি সাবালিকা তা জানি না বাবা, তবে ওনার বাড়ির চাকরই বলেছে, 'মা বাডিওয়ালাব ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় চলে গেলেন।' তা কেনই বা নিয়ে যাওয়া বাবা?'

'আমি এ সম্পর্কে আর আর একটাও কথা বলবো না।'

বলে ঘরের মধ্যে চলে যায় অভীক।

আজকের দিনটাই অশুভ।

আশ্চর্য্য। অলকা বলেছিল ওর স্বামী রাত দশটায় আসবে।

মানুষ কত বদলাতে পারে। কত দ্রুত বদলাতে পারে।

কদিন পরে কোন এক সময় অবনী সেনের চিরকালের স্নেহবাধ্য ছোট ভাই উদ্ধত মূর্তিতে তাব কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বিনা ভূমিকায় বলে ওঠে, 'দাদা, ভাড়াটেকে নির্দেশ দিলেই উঠে যেতে বাধ্য?'

অবনী সেন স্থির স্বরে বলে, 'আইনে তা বলে না।'

'আইনে বলে না! অথচ তোমার ভাড়াটে নোটিশ পেয়েই চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।'

অবনী খবরের কাগজ পড়ছিল, একটা জরুরি খবরের ওপর চোখ রেখে বললো, 'তাহলে বুঝতে হয় বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায়ই যাচ্ছেন।'

'এই বাজারে এমন চমৎকার একটা ফ্ল্যাট পাওয়া নিশ্চয়ই সহজ নয়? কি করে ভাবা যাবে উনি স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন।'

'সাধারণ বুদ্ধিটা হারিয়ে না ফেললে বুঝতে পারতে। যেতে বাধ্য নয়, তবু চলে যাচ্ছেন, এ থেকেই বোঝা যায় কারণটা অন্যত্র।'

তারপর কাগজটা মুখ আড়াল করে ধরে সহজভাবে বলে, 'আমাকে নোটিশ দিতে হয়নি, উনিই নিজে নোটিশ দিয়েছিলেন। আজ চলে যাচ্ছেন। এখানে তাঁর নানা অসুবিধে হচ্ছিল।'

কথার সুরে মনে হলো এতে বড় সুখী হয়েছে অবনী।

ওইটা যদি মনে না হতো, হয়তো ব্যাপারটাকে বুঝতে পারতো। বুঝতে পারতো দোষটা দাদার নয়।

কিন্তু পারলো না, তাই সব দোষটা দাদার ওপর চাপিয়ে একটা বড় কিছু প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করে বসলো।

কিন্তু কীইবা প্রতিশোধ নিতে পার তুমি অভীক, ওই কৃতী আত্মস্থ স্বয়ং নির্ভব ব্যক্তিটির উপর? বাইবে কোন স্কোপই নেই নেবার।

আছে যা তা ভিতরে।

একেবারে অন্তরের অন্দর মহলে। •

তবে সেখানেই আঘাত হানো।

একেবারে মর্মমূলে ছুরি বিঁধিয়ে উপড়ে তুলে নাও সেই আশাটুকুকে, সেই ভালবাসাটুকুকে।

এতোদিন ধরে যেটুকুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ওরা। অবনী সেন আর তার অবোধ স্ত্রী রমলা সেন।

এখানে নাকি অভীকের লেখাটেখার অসুবিধে হচ্ছে, তাই অন্যত্র থাকতে যাবে সে।

ছোট্ট একটু চিরকুটে বক্তব্যটিকে লিখে দাদাব টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিযে রেখে এল অভীক। প্রতীক্ষা কবতে লাগলো প্রতিক্রিয়াব। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

মানেটা কী?

দেখতে পায়নি, না কী?

নাকি না পাওয়ার ভান।

ঠিক আছে সোজাসুজিই বলে দেবো। এতো ভয় কিসের?

তা সোজাসুজি বলার পরিশ্রমটা আর করতে হল না।

খেতে বসে অবনী বললো, 'ওরে এই কাগজটুকু কি তোর উপন্যাস-টুপন্যাসের কিছু?'

বাঁহাতে ছিল সেটা এগিয়ে ধরলো।

অভীক ভাবলো, ওঃ কায়দা। হাতে নিল না। শুধু বললো, 'ওটাকে কি তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

'তাই তো ভাবছিলাম, হয়তো হঠাৎ এসে পড়া কোনো 'থট' তাড়াতাড়ি—'

অভীক বেশ শান্ত স্থির গলায় বললো, 'না হঠাৎ এসে পডা কোনো 'থট' নয়, ওটা অনেকদিন ধরে ভেবে স্থির সিদ্ধান্ত!...এখানে আমার লেখাটেখার অসুবিধে হচ্ছে।'

কিছুদিন আগে হলেও রমলা তাড়াতাড়ি দুই ভাইয়ের কথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, বোকার মত কথা-টথা বলে, পরিস্থিতিটা হালকা করে দিতো, পবিণামটাকে ঠেকাতো।

কিন্তু এখন রমলা শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ওই কঠিন কঠোর মুখটার দিকে চেয়ে।

রমলা যেন একটা মাতৃশোক অনুভব করছে।

রমলা আর কোনোদিন ওই ছেলেটাকে 'তুই' করে কথা বলতে পারবে না, রমলা আর কোনোদিন ওর থালায় জোর করে কিছু বাড়তি খাবার চাপিয়ে দিতে পারবে না।

হয়তো ও যখন চলে যাবে, তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বলতে পারবে না 'ঠিকানাটা দিয়ে যাও?'...বলতে পারবে না, 'একবার এসো—'

অবনী অবাক হয়ে বললো, 'এখানে তোমার অসুবিধে হচ্ছে? বাচ্চা টাচ্চা নেই বাড়ীতে।'

'তাহলেও, পরিবেশটা অসুবিধের।'

'এই পরিবেশের মধ্যেই তুই নামকরা লেখক অভীক সেন হয়ে উঠেছিস, অভী।'

'আমার আরো সম্ভাবনা ছিল। সে যাক্, সে তোমাদের বোঝানো যাবে না। এখানে আমি চিন্তা করতে পারছি না—'

অবনী সেন লাভ ও লোকসানের হিসেব খতাতে ভুলে গিয়ে বলে, 'তা তাই যদি তোর মনে হয়, দোতলাটা তো খালি পড়ে রয়েছে, সেখানেই থাক না। কেউ তোকে ডিসটার্ব করতে যাবে না।'

অভীক একটু বাঁকা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'সে ও তো তোমারই দয়ার আশ্রয়।'

'দয়ার আশ্রয়। আমার দয়ার আশ্রয়?'

'তাছাড়া আর কী?

'তার মানে তুই এতোদিন আমাদের দয়ার আশ্রয়ে ছিলি, অভী!'

অভীক সেন এসব সেন্টিমেণ্ট পছন্দ করে না। তাই সোজা শক্ত গলায় বলে, 'ভেবে দেখ তাই কি না। এ বাড়িতে আমার কোনো দাবি আছে?'

অবনী বলে, 'বেশ তাই যদি মনে হয়, আমি বাড়ির অর্ধেকটা তোর নামে লেখাপডা করে দিচ্ছি।'

অভীক সেন ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ সে হো হো করে হেসে ওঠে। সিনেমার নায়কের মত টেনে টেনে শুকনো হাসি।

তারপর?

তারপরের ঘটনা বড দ্রুত প্রবাহিত।

একটা 'বিরাট সম্ভাবনার বীজ' বহন করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যখন চোখে প্রায় ধোঁওয়া দেখছে অভীক সেন; আর ভাবছে 'অলকা' নামের সেই মেয়েটা শহরের এই জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল? যে মেয়েটা বলেছিল—'ওদেশের যে কোন বিখ্যাত কবি শিল্পী বা সাহিত্যিকের একটি বিশেষ প্রেরণা-দায়িনী থাকে, থাকে বিশেষ ভালবাসার পাত্রী। এদেশে কবি শিল্পী লেখক টেখকদের ওপর ও সাধারণ মানুষের মত সমান আইন। ভাবলে, অবাক লাগে।'

অভীক অলকার ঠিকানা জানে না, কিন্তু অলকাতো অভীকের জানে?

সেই জানার পরিচয়টুকু দিচ্ছে না কেন?

প্রেরণার অভাবে যে অভীক সেনের কলম বন্ধ হবার জোগাড।

কিন্তু ও আসাব আগে কী লিখতাম না আমি?

ভাবতে চেষ্টা করে অভীক।

তখন মনে হয় যা লিখেছি সব জোলো জোলো পানসে। ওতে আর আত্মসন্তুষ্টি নেই। সেই লেখা কোথায়? যা অভীক সেনেব বিদ্রোহী আত্মার দৃপ্ত প্রতিবাদকে প্রতিফলিত করবে? যা তীব্র তপ্ত মদের মত?

সেই লেখাটা আসে না, কিন্তু সত্যিকারের তীব্র তপ্ত মদটা আসতে পারে।

অলকার প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে যায়।

'কই আপনার ঘরে তো বোতল টোতল দেখি না। তবে যে শুনি লেখকদের ঘরে ওটা থাকেই।'

হেসে উঠেছিল অভীক, 'কার কাছে শুনলেন?'

'এই সব বন্ধু-টন্ধুর কাছে। তারা বলে, ওসব না খেলেটেলে নাকি লেখা আসে না।'

সেদিন হেসেছিল অভীক, এখন হাসে না। এখন দেখে কথাটা ঠিক।

তাই এখন হাসে 'এতোকাল কী বোকার মত শুচিবাই ছিল তার।'

কিন্তু স্মরজিতের সেই নেমন্তন্নপত্তরটার কী হল?

সন্ধান করলে হয়।

গেল একদিন, বাড়ির দরজার কাছেই দেখা। ফিরছে কোথা থেকে।

অভীককে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো যথারীতি। 'কী ব্যাপার? আর নতুন বইটই বেরোতে দেখছি না। অথচ বাড়িতে গিয়ে শুনলাম লেখা-টেখার অসুবিধে হচ্ছিল বলে দাদার বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছিস—'

অভীক বললো, 'গিয়েছিলি কেন? নেমন্তন্ন পত্তর নিয়ে?'

স্মরজিৎ মুচকে হেসে বলে, 'না ভাই, ওটা এখন স্থগিত রাখলাম।'

আর একটু হেসে বললো, ভাবলাম—'ওটা তো হাতের পাঁচ আছেই। শেষবারের মত একবার চুটিয়ে অবৈধ প্রেমটা করে নিই।'

'ওঃ। বড় ভাল সংবাদ! তা এটি কোন বনের হরিণী?'

স্মরজিৎ রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'ধীরে বন্ধু ধীরে। দেখাবো। আয় গাড়িতে উঠে আয়।'

'থাক থাক পরে দেখলেই হবে।'

'আরে বাবা আয় না। এক্ষুণি তো বাড়ি ফিরছিলাম না।'

'তবে?'

'একটা জিনিষ ফেলে গিয়েছিলাম তাই। ঠিক আছে পরে নিলেও চলবে। আয় চলে আয়।'

তখনও দেখা যাচ্ছিল না তাকে।

কোন চেপে বসেছিল।

উঠতে গিয়ে দেখতে পেল।

কিন্তু তখন কি বলে উঠবে অভীক, 'অলকা তুমি এখানে? আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে—তোমাব জন্যে আমার লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার সেই স্বামীটা তোমায় কী যন্ত্রণা দিচ্ছে ভেবে আমাব রাতের ঘুম চলে গেছে।'

না এসব বলা যায় না।

যা বলা যায় তাই বলে ওঠে।

বলে, 'বাঃ এবাব তা হলে বড গাছে নৌকো বেঁধেছো।'

স্মরজিৎ বলে, 'বিদ্রূপ কোরোনা বন্ধু, ওর কী যন্ত্রণাময় জীবন ছিল, তা তুই একবাড়িতে থেকেও কোনদিন সন্ধান করিস নি। সেই পাজী রাস্কেলটা ওকে মেরেছে পর্যন্ত।'

অলকা বলে ওঠে, 'থাক স্মরজিৎ, ওসব কথা তুলে যন্ত্রণাটা নতুন কবে মনে পডিয়ে দিও না। আমায় ভুলে থাকতে দাও। সেই সেদিন যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল? আমার জীবনের সেটা এক পবম শুভদিন।'

অভীকের মুখটা পেশী পেশী দেখায়, অভীকের ঠোঁটেব রেখাটা বাঁকা দেখায়।

অভীক ভেবে পায় না ওই অর্দ্ধসমাপ্তের মত বেশবাস পরা অসভ্য মেয়েটার জন্যে এতোদিন ধরে এমন অস্থির হয়ে বেডাচ্ছিল কেন? ওর সম্মানে ঘা লাগার আশঙ্কায় অভীক অবনী সেন নামেব একটা মানী লোকের সম্মানে আঘাত হেনেছিল না? একটা সুখী সুখী মুখ মানুষের মুখের সেই 'সুখ সুখ' ছাপটা মুছে দিয়েছি।

তারপর?

তারপর তো অভীক সেন স্মরজিতের গাডি থেকে নেমে পড়েছিল 'কাজ আছে' বলে।

তারপর?

তারপর এই সেদিন গিয়ে দেখি একটা আজে বাজে মেস বাড়ির ভাঙা তক্তপোষের ওপর রাজ্যের কাগজ পত্র ছড়িয়ে বসে আছে অভীক সেন। চোখে আগুনের জ্বালা।

হাতের কাছে পানপাত্র।

হয়তো এইবার তার সেই আসল লেখার জন্ম লগ্নটি আসছে।

যার থেকে অভীক সেন পৃথিবীর লেখকদের একজন হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন কিছু হচ্ছে না।

এখন লেখা নিতে এসে হতাশ হয়ে ফিরছে সম্পাদকের লোক। এখন লেখা চেয়ে চেয়ে যাওয়া বন্ধ করছে 'লেখা' নিয়ে যাদের কারবার।

পাঠক পাঠিকারা হতাশ হয়ে অন্য ডালের ফুল তুলতে চলে যাচ্ছে।

অভীক যেন তার 'সিদ্ধপাত্র' হাতে নিয়ে তার 'আসল' লেখার আবির্ভাবের পদধ্বনির আশায় কান পেতে বসে আছে।

আর লোকে বলছে 'অভীক সেন? ওর বারোটা বেজে গেছে।'

ওদিকে এক নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতি স্তব্ধ হয়ে বসে বসে অতীতের দিকে পিছু হেঁটে হেঁটে চলে যায়। ভাবে যদি সেদিন ওই নতুন ভাড়াটেরা না আসতো। যদি ওদের ওই বৌটা অমন জাদুকরী না হতো।...যদি আমরা গোড়ায় খুব সাবধান হতাম।'

উনিশশো উনআশিতেও

১

দেশ রাজ্য জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে এখন উনিশশো উনআশীর ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, আর শুধু শহর বাজারে নয়, গ্রামে গঞ্জেও মায়ের কোলের শিশুটাও জানে মানুষ চাঁদে ঘুরে পুরনো হয়ে এসেছে সেই কবে, এখন মঙ্গল গ্রহে টুঁ মারতে যাচ্ছে। এবং তাবৎ জনেই জানে মানুষ ক্রমশঃ বুধ, বেস্পতি, শুক্কুর, শনি হয়তো শেষতক্ রবির বাড়িও সঙ্কেত পাঠাবার তাল করতে, শূন্যে 'স্টেশন' বসাচ্ছে।

এই সাগরপুকুর গ্রামেও কারো জানতে বাকি নেই বিজ্ঞানের বলে এখন মানুষের শরীর যন্ত্রগুলোর কোনটা অকেজো-টকেজো হয়ে গেলে তাদের বাদ বাতিল করে কৃত্রিম অকৃত্রিম নতুন সব যন্ত্র বসিযে নিয়ে দিব্যি কাজ চালানো যায়। চোখের সামনেই ক'জনা তাদের হাওয়া ফুরিয়ে আসা হার্টের গায়ে 'হার্ট-মেসিন' বসিয়ে পুরোদমেই বেঁচেবর্তে রয়েছে। মেসিনের আয়ু ফুরিয়ে এলে, কলকাতায় গিয়ে আবার নতুন 'আয়ু' ভরে নিয়ে আসছে। তবু—তবু এখনো বিন্দে বুড়িকে হঠাৎ ঘাটে পথে দেখতে পেলেই, ছেলে বুড়ো সবাই উল্টোপাক খেয়ে চোঁ চাঁ সট্‌কান দেবে। তার কারণ? কারণ 'দৃষ্টি'।

বুড়ির 'দৃষ্টি'কে সকলের দারুণ ভয়।

ওই দিষ্টিতেই তো বুড়ি কী না কি অনিষ্ট ঘটাতে পারে কে জানে! মানুষ গ্রহান্তরে ঘুরে আসতে শিখেছে বলেই তো আর 'নজর লাগা' 'বান মারা' 'তুকতাক' 'জুড়ি-বুটি' এগুলো মিথ্যে হয়ে যায়নি? আর শক্তিও ফুরিয়ে যায়নি জল-পড়া, তেল-পড়া, ফুল-পাতা, শেকড়-বাকড, হোমের ছাই, হাড়িকাঠের মাটির।

বিপদে পড়লে, এরাই বিপদতারণ।

এদের নিয়ে যাদের কারবার, তারা 'ভরে'র ঘোরে স্বর্গ মর্ত পাতাল ঘুরে এসে তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছুর ফটো তুলে তোমার সামনে ধরে দেবে। বিজ্ঞান পারবে এ সব? সে বড জোব তোমাব রক্ত.মাংস চামড়া শিরা ভেদ করে হাডের ফটোটা তুলে ধবতে পারে। কাজেই বিজ্ঞান হাব মানলেই অ-জ্ঞানের কাছে আশ্রয়। আশ্রয় তো নিতেই হবে কোথাও।

একদা বৃন্দেও এ তল্লাটের পরম 'আশ্রয়' ছিল। বৃন্দের নাম তখন একডাকের মাথায়। বৃন্দে তখন 'গুনীন্ মা'। বিপদে পড়লেই ডাক ডাক বিপদতারিণী গুনীন মা-কে। কিন্তু এখন পালা বদলে গেছে। এখন বিন্দেবুড়িই যেন গ্রামের একটা বিপদ-কেন্দ্র।

ওর দৃষ্টি পড়ার ভয়ে ওব বাড়ির সামনে দিয়ে সাধ্যপক্ষে কেউ হাঁটে না।.... অথচ ঝোপ জঙ্গল আব ফণীমনসার বেড়ায় ঘেরা বুড়ির ওই বাড়িটার সামনে দিয়েই স্টেশনে যাবার শর্টকাট রাস্তা। গ্রাম সুদ্ধ লোকেরই তো ডেলি প্যাসেঞ্জারীর ব্যাপার। পুরুষ ছেলেরা তো নিশ্চয়ই যাবে, গ্রাম ঝেঁটিয়েই যাবে। কলকাতা না ছুটে গতি কি? এখানে 'পাত' সেখানে 'ভাত'।

গ্রামের বৌ-ঝিও তো কম যায় না পড়তে, পডাতে, চাকরি করতে, গান শিখতে, এমন কি সেলাই-বোনা শিখতেও।

সুবোধ কুমোরের মেয়েটা নাকি মাটির মূর্তি গড়া শিখতে নিত্যদিন বেলগাড়ি চডে কলকাতায় যাচ্ছে আসছে।

এত প্রগতির হাওয়া সাগরপুকুর গ্রামে, তথাপি সব স্টেশন যাত্রীরাই বিন্দের দিষ্টির ভযে দুশো পাঁচশো গজ বেশী হাঁটা স্বীকার কবে নিয়েও ভাঙা শিবমন্দিরের পিছন দিয়ে ইস্কুলবাডির পাশ দিয়ে ঘুরে স্টেশনে যায়। শুধু সাইকেল আরোহীরাই যা চোঁ চাঁ মারে সামনে দিযে।

মুশকিল এই, বুড়ির বর্তমানের বাসস্থান ওই খড়ের চালার ঘরটা, আর ফাটা বাঁশের খুঁটির ঠেকনোয় ঠেকানো থুখুড়ে দাওয়াটা, একটা ঢিপি জমির ওপর। সেই দাওয়ায় বসে থাকা বুড়িটাকে দেখলে ঠিক অশোকবনের চেড়ির মতো দেখতে লাগে! আর মরা আগুনের ঢেলার মতো চোখটাও চোখে পড়ে।

অথচ জমজমাট জ্বলজ্বলট যে ঘরবাড়ি আর সাজানো সংসারখানা ছিল বৃন্দের, সেখানে এখন আর তার পা ফেলবার হুকুম নেই। ও মুখো হতে গেলেই টগর ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। বলবে—এখেনে ক্যানো? এখেনে উঁকিঝুঁকি ক্যানো? আমার বাচ্চাকাচ্চাকে নজর দিতি এইচিস বুড়ি?

'নজর'। হায় সে ক্ষমতা যদি এখন থাকত বৃন্দের।

তাহলে এতদিনে কবে টগরের 'সপুরী একগাড়ে' হয়ে যেত। কিন্তু বৃন্দে এখন বিষ হারানো ঢোঁড়া। বৃন্দের এখন মন্তর-টন্তর বিস্মরণ হয়ে গেছে, শেকড়-বাকড় চিনতে পারে না। বাণ মেরে অন্যকে শুকিয়ে দেবে কি, নিজেই তো শুকিয়ে শুকিয়ে আখের ছিবড়ে হয়ে গেছে। শুকিয়েছে বয়েসে, শুকিয়েছে মনের জ্বালায়, আর শুকিয়েছে পেটের আগুনে।

সর্বনাশিনী সর্বগ্রাসিনী টগর বৃন্দেকে শুধু দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তার রুজি রোজগারের পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছে শয়তানীর জাল ফেলে ফেলে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি যাচ্ছিল, রোজগারও কমে এসেছিল, বৃন্দের 'দুলোর বাপ' মরতে সাহায্যকারী হারিয়ে, আরোই ক্ষীণধারা হয়ে এসেছিল, তবু কিছু তো ছিল?

এখনকার বাচ্চাদের পেঁচোয় না পাক, হঠাৎ জ্বরের তাড়সে 'তড়কা'-টা তো হয়? আমাশা, ঘুংড়ি কাসি এ সবও হয়ে পড়ে রাংতামোড়া বড়ি-ফড়ি ছাপিয়েও। আর বুড়োদের ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা এগুলোও হয়। বৃন্দের জল-পডা তেল-পড়াগুলো তো এ সবে ম্যাজিকের মত কাজ করত। এইটুকুর পেন্নামী থেকেই পেটটা চলে যেত একা বৃন্দের। টগর সে গুড়েও বালি দিয়েছে।

টগরের বিষ মন্তরে চাকা ঘুরে গেছে। এখন বৃন্দে সাগরপুকুরের বিভীষিকা স্থল। বিপদতারিণী থেকে বিপদকারিণীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে এখন তাকে দেশের লোক।

ইচ্ছে করে তো কেউ ওর ছায়া মাড়াতে যায়ই না, দৈবাৎ পথে ঘাটে দেখতে পেলেও ছুট মাবে।

তা পথে দেখাটাও ক্রমশঃই বিলোপ পাচ্ছে। শুধু ঘাটেই বলা যায়। লাঠি ঠুকে ঠুকে খুট খুট করে যায় বৃন্দে শুধু ঘাটে। পেট বড কড়া মনিব। মায়া মমতার বালাই নেই, উঠতে না পারলেও ঠেলে তুলে খাটতে পাঠায়।

পুকুরে তো যেতেই হবে।

বৌ হারামজাদি তো 'টিপকল' সমেত উঠোনটাই দখল করে নিয়েছে।

এতটুকুন একটা মেটে কলসীর গলায় গামছা বেঁধে দুলিয়ে দুলিয়ে একটু রান্না খাওয়ার জল নিয়ে আসে বিন্দে পুকুর থেকে। আর পুকুর পাড় থেকে খুঁটে খুঁটে নিয়ে আসে কিছু শুষনি কলমি শাক, দুটো শামুক গুগ্‌লি। কি দুটো 'ঘেনি কাঁকড়া'।

ধনুকের মত গোল হয়ে যাওয়া শরীরটাকে আরো গোল করে হেঁট হয়ে বৃন্দে যখন ওই সব সংগ্রহ করে, তখন ওর ঘাড়টা অসম্ভব নড়ে। আর ঘাড় নড়ে বলে মাথার ওপরকার ঘোলাটে সাদা ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের দু'ধারে সাপের ফণার মত দুলতে থাকে। দৃশ্যটা দূরে থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের পিলে চম্‌কে দেবারই মত। বড়দেরও ভীতিকর।

ঘাড় আরো বেশী নড়ে, বিন্দের বিড়বিড়িনি বকুনির ঠ্যালায়।

বকুনি আর কি!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গাল পাড়া। স্বর্গের ভগবানকেও ছেড়ে কথা কয় না। তবে প্রধান টার্গেট হচ্ছে দুলোর বৌ টগর। যে বৌটার স্বামী হঠাৎ হাট থেকে ফিরে 'বুক কেমন করতেছে' বলে ধড়ফড়িয়ে মরে যাওয়ায় রটিয়ে বেড়িয়েছিল, বেটার বৌয়ের প্রতি আক্রোশে তাকে জব্দ করতে নিজের বেটাকেই বাণ মেরে খতম করেছে বুড়ি। ..... তদবধিই বিন্দে গ্রামের বিভীষিকা।

বিন্দের তাই এখন গালমন্দই একমাত্র অস্ত্র।

ইহ পৃথিবীতে যত গাল থাকতে পারে তার সবগুলো বৃন্দে ছেলের বৌয়ের প্রতি প্রয়োগ করে। আর ইহ সংসারে মেয়েমানুষের জীবনে যত রকম দুর্দশা ঘটা সম্ভব, সেই 'দশা'গুলো বৌয়ের ভাগ্যে ঘটাবার জন্যে তার জানা জগতের যাবতীয় দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করে।

কিন্তু সবই ওই বিড়বিড়িয়ে। গলা তুলে গাল পাড়বার সাহস ঘুচে গেছে। গেছে বৌয়ের বন মেয়েটা লায়েক হয়ে ওঠা পর্যন্ত। বছর দশেকের মেয়েটা একদিন একখানা খেঁটে বাঁশ উঁচিয়ে তেড়ে এসে বলেছিল, 'ফের যদি মায়ের নামে গাল পাড়বি, তো এই বাঁশ মেরে মাথা ফাইটে দেবো, তা বুলে আক্‌চি অ্যাঁ।'

তদবধি 'গলা' বন্ধ বৃন্দের ওই বিড়বিড়। ওটাই এখন রোগে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় নড়ে, আর গলার নলি নড়ে।

ফণীমনসার বেড়ায় ঘেরা থুখুড়ে চালাঘরটার দাওয়ায় বসে মাৎগুড়মাখা চালভাজার গুঁড়োর দলা গিলতে গিলতে বিড়বিড় করে, আচ্চয্যি! এখনকার কাঁচা কচিগুলান কি সব্বাই আকুলি-সুকুলির বর পাওয়া? মা চণ্ডির বরপুত্তুর? তাই সাজ্‌জন্মে অ্যাকটাকে ডাইনেও চোষে না?

টগর যে গাঁয়ে তার দফারফা করে রেখেছে, সেটা বুড়ির জ্ঞান গোচরে ধরা পড়েনি, অগোচরেই রয়ে গেছে। কেউ তো আর কাছে এসে বলে যায় না। তাই ভাবে রোগ-বালাই উপে গেছে গ্রাম থেকে। তাই বলে, মা ওলাইচণ্ডীও কি গাঁ থেকে বিদেয় নেচে গা? মা শেতলা তার বেটাদের আঁচলে গিঁট বেঁদে থুয়ে একেচে?......আর ভূতপেরেৎও ভেবোন ছাড়া হয়ে গ্যাচে? তাই ঝি বৌর গায়ে এট্টু হাওয়া বাতাসও নাগে না?.... তবে আর গিরোস্তো বাড়ি থেকে বিন্দে কাওরাণীব ডাক পড়বে কোন কাজে?

কত ঝি বৌর দাঁত কবাটি ছাইড়েচে এই বিন্দে। কত বেয়াড়া মেয়ের ভূত ছাইডেছে। চোক উল্টে যাওয়া ছেলেপুলেরে সোজা করে দাঁড় কইরে দেচে। .... ডাগদার বোদ্যি কি আর ছেল না গাঁয়ে? ছেল, তবু বিন্দেকে নৈলে চলতনি কাউর।...

এখন যেন সব সায়েব ম্যাম্ হয়ে গ্যাচে। আহা,মা ওলাইচণ্ডি, মা শেতলা, ভূত পেরেৎ হাওয়া বাতাস, সবাই মিলে একবার ঝাঁইপে পড় না এই সাগোরপুকুর গাঁয়ে।

আর বিন্দেকে শোক্তি দাও। নোতুন যৈবনের মতন শক্তি।

মনের প্রাণের কথা শোনবার লোক চলে গ্যাছে। অন্য আর কে এমন ভয়াবহ কথা কান পেতে শুনবে? তাই এই আক্ষেপের বাণী, প্রার্থনার বাণী ওই চালভাজার গুঁড়োর মধ্যেই গুঁড়ো হয়ে যায়।

কিন্তু শুধু বৃন্দে বুড়ি কেন? আধবুড়ো অনঙ্গ ডাক্তারই যখন তার ফাঁকা ডিস্‌পেনসারি ঘরের মধ্যে হাতল ভাঙা চেয়ারটায় বসে কাঁচা পাকা গোঁফের ঝুড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলে, দেশটা কি বিলেত হয়ে গেল, অ্যাঁ! চিরপরিচিত রোগগুলো সব উবে গেল তল্লাট থেকে? এখন রোগের মধ্যে রোগ, যত সব দুরারোগ্য ব্যাধি? নে, রুগী নিয়ে কলকেতায় ছোট। কলকেতায় যেন ধন্বন্তরী বসে আছে! কলকেতায় লোক মরে না!

বলি অনঙ্গ ডাক্তারের হাতে এ-যাবৎ ক'টা রুগী ফেঁসেছে? গুণে বলতে পারি।..... খাতায় লেখাও আছে। ডাক্তার মরলে দেখিস খাতা খুলে। ... আর তোদের ওই কলকেতার পেশালিস্টদের হাতে? হুঁ! ... বলি নাড়িজ্ঞান আছে কারুর? রুগী নিয়ে গিয়ে সামনে ধরে দিলেও তো টাচ্‌টি করে না। হুকুম হবে রুগীর রক্ত আন্—ইউরিন আন্—হ্যান আন্—ত্যান্ আন্—মাথা থেকে পা অবধি এক্সরে ফটো আন্, তবে রুগী ছোঁব। ... তখন বাবুদের হাজারে হাজারে টাকা ঢালতে পেছপা নেই। মাসের পর মাস ঘোরাচ্ছে। রুগী বয়ে বয়ে কলকেতায় যাও আর আসো, তারপর আর বোয়ো না। তাকে হাসপাতালে রেখে এসো, আর শেষ অবধি কলকেতার শ্মশানে পুড়িয়ে খালাশ হও।... অথচ অনঙ্গ ডাক্তারকে দুটোর ওপর তিনটে ভিজিট দিতে হলেই বুক ফেটে যায়। তখন শাসানি—কই ডাক্তার? কিছু তো উন্নতি দেখছি না। .... তা দেশটা বিলেত হয়ে গেল বৈ আর কী বলব? দুরারোগ্য ব্যাধি ভিন্ন কলেরা নেই, বসন্ত নেই, ম্যালেরিয়া নেই, পেটের অসুখ রক্ত আমাশা পর্যন্ত নেই। ছিঃ? থাকবে কোত্থেকে? এখন যে সব স্বয়ং কর্তা বাবুদের

পকেটে পকেটে ওষুধের মোড়ক। বিশ্বসুদ্ধ সবাই ডাক্তার হয়ে বসে আছে। রোগকে কি আর মাথা তুলতে দেয়?

তখন কি আর দেয়াল ছাড়া অন্য কাউকে বলে অনঙ্গ দাস? এ-সব কথা মনেরও অগোচরে থাকে।

শুধু মড়িপোড়া ঘাটের 'গুনো ডোম'? সে রাতের বেলা হাই তুলতে তুলতে তার সাকরেদকে ডেকে ডেকে হেঁকেই বলে, হ্যাঁ রে বেচু, সাগরপুকুরের লোকগুলো কি অমর হবার পিতিজ্ঞে নিয়েচে? রাতভোর বাসর জাইগে বোস করে রইচি, একখান মড়া নাই?

গুনো ডোমের ঘাটটাকে এখন 'সাগরপুকুরের' লোকেরা সভ্য করে বলে 'বার্ণিংঘাট' তা 'বার্ণিং' হতেই বা আসচে কে? আসবে না। বড়জোর দিনান্তে দুটো কি একটা। অথচ আগে?

গুনো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বসে বলে, ত্যাখনকার কতা মনে কর বেচা! গাঁয়ে এ্যাক অ্যাকটা মড়োক নাগচে, আর তোতে আমাতে চিলু সাজাতে দিশে-পিশে পাচ্চিনে। ... এই আসচে, এই আসচে তার ওপোর তার ওপোর। দিন রাতের ভেদ নাই।

বেচু হয়তো বলে, আজকাল আর লোক রাত-ভিতে বেরোয়-না মামা, মড়া কোলে নে বোস করে থাকে ফর্সা হবার ওপিক্ষেয়। অথচ অ্যাখোন মা মনসাব বংশোধরেরাও তো নোপাট্টি। আর জনে জনে হাতে টচ্‌বাতি। ভয়ের কী আচে?

গুনো নিঃশ্বাস ফেলে বলে, রাতে বেরোয় না—তো দিনোমানেই বা বাসিমড়ার ভিড় কই? সাদে বলচি এ তল্লাটের লোকেরা অমর হবার পিতিজ্ঞে নেচে।

তা গুনোর এ আক্ষেপও তার প্রাণের প্রাণ পাতানো ভাগনা বেচু ভিন্ন কি আর কারো কানে ঢোকে? কাজেই গ্রামবাসীর টের পাবার উপায় নেই তাদের সেই অতি অকিঞ্চিৎকর বেঁচে থাকাটার উপর কোথায় কি বিষদৃষ্টি পড়ছে।

তবে এমনিতেই বৃন্দের 'দৃষ্টি' সম্পর্কে সবাই অবহিত।

বৃন্দের ওপর দিকের তিন পুরুষ, না, ঠিক পুরুষ বলা চলে না, তিন নারী'ই বরং বলতে হয়, মা দিদিমা আর তস্য মা সবাই ছিল নাড়িকাটা দাই। গেরস্ত বাড়ির আঁতুড ঘরই তাদের কর্মক্ষেত্র। বৃন্দে যে কেমন করে 'গুনীন মা' হয়ে উঠেছিল সেটাই রহস্য।

অবশ্য রহস্য আবিষ্কার কবতে গেলে, উৎস-মুখের সন্ধান যে না মেলে তা নয়। বৃন্দের যখন প্রথম বয়সে মানে বাল্যবয়েসেই, সত্যকার বিয়ে হয়েছিল, এবং বেশ ক'বছর শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়েও ছিল, তখনই এই বিদ্যাটি শিক্ষার সূত্রপাত।

বৃন্দের দিদিশাশুড়ি ছিল ওদের হলুদ গাঁয়ের নাম-করা মেয়ে। যত রকম জড়ি-বুটি শেকড-বাকড়েব সঞ্চয় থাকা সম্ভব, তা তার ছিল। দিদিশাশডির এই সব জড়ি-বুটির সাপ্লাযার ছিল একটা যোয়ান বয়সের বেদেনী। তার সঙ্গে ভাব-ভালবাসার সূত্রেই বিন্দের এই বিদ্যে শেখার সূত্রপাত। উৎসাহ দেখে দিদিশাশুডিও শিখিয়েছিল অনেক। নিজের সব বিদ্যেই মরণকালে নাতবৌকে দিয়ে যাবে এ অঙ্গীকারও করে রেখেছিল, কিন্তু তার মরণকালের আগেই বিন্দের মরণ হল।

'অমনিষ্যি' যে বরটা ছিল বিন্দের সেটা একদিন বলা কওয়া নেই দুম্ করে মরে গেল, আর বিন্দেও পত্রপাঠ তার পিসতুতো দ্যাওরের সঙ্গে পলায়ন দিল।

ওদের সমাজেও দ্যাওরের সঙ্গে বিযে হয় না। কিছুদিন ঘুরল একসঙ্গে, কারণ লোকটার ছিল ওই ঘুরুনীর নেশা। আর যুবতী বিন্দের কাছে তখন পৃথিবীটা দারুণ আকর্ষণের। বলতে কি—ওই দেশ বিদেশ ঘোরার প্রলোভনেই দেশ ছেড়েছিল বিন্দে। কিন্তু লোকটার নেশা লোকটাকে আরও দূরে নিয়ে গেল।

একদিন মুঙ্গেরের গঙ্গার ঘাটে 'তুই এট্টু বোস, আমি আসতেছি—' বলে বিন্দেকে বসিয়ে বেখে সেই যে হাওয়া হয়ে গেল, তো গেলই।

বিন্দে কি তা বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে এই বিশ্বাসঘাতকতার জ্বালা জুড়োবে? না, তেমন পলকা ধাতুর মেয়ে বিন্দে নয়। বিন্দে সেই মুঙ্গেরের ঘাট থেকে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে আর একটা পুরুষের

ঘাড় জোগাড় করে, তার সঙ্গে তারই গাঁ এই সাগরপুকুর এসে ঘর বাঁধল। দুলো তার এই তৃতীয় সংসার জীবনের ছেলে।

এই সাগরপুকুরেই বিন্দের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কেটেছে, বিন্দে সংসার করেছে, জমি-জিরেত করেছে আবার দোহাতা কর্মজীবনের পশার জমিয়েছে। এত ঘোরা ঘুরতির মধ্যেও বিন্দের অতীত বিদ্যাটি নষ্ট হয়ে তো যাইইনি, বরং বেড়েছে। নানা সংস্পর্শে এসে নানা সাহায্যে বেড়েছেই সত্যি।

বিন্দে মানুষের ভাল করতেও শিখেছে, মন্দ করতেও শিখেছে।

তবে গেরস্ত ঘরের ঘর সংসারী মানুষরা তো মন্দ করতে বলতে তেমন সাহসী নয়, ভাল চাইতেই আসত ছুটে ছুটে, আর সে ভালটাই করত বিন্দে। জল পড়া তেল পড়া মাদুলী শেকড় বাকড় ঝাড় ফুঁক, যা চাও, বিন্দের কাছে আছে।

কোলের ছেলেকে মায়ের কোল থেকে 'ডান চুষলো'—ছেলে বমি করে করে নেতিয়ে পড়ে যায় যায়—তখনই ডাক ডাক গুনীনমাকে ডাক।

তখনকার বিন্দের চেহারা, যদ ক্যামেরায় ধরা থাকত, এখন দেখলে কি কেউ বিশ্বাস করত, সেই মানুষটা এই মানুষ?

মাজামাজা গড়ন, পিঠ ছড়ানো কালো চুলের 'ঢাল'। মুখ চোখ কুঁদে কাটা। সুন্দরী ছিল বৃন্দে কালো রঙেও।

কিন্তু রূপ-যৌবন জিনিসটার তো চিরস্থায়িত্বের গ্যারান্টি নেই। তুকতাকেও থাকে না। রূপ তো গিয়েইছিল—

বিন্দে ক্রমশ গেঁযো যোগীও হয়ে পড়েছিল। লোকের হঠাৎ ঘাড়ে কোমরে ব্যথা আটকে ধরলে অভ্যেসের বশে বিন্দের কাছে 'ঝাড়াতে' যাচ্ছিল বটে, কিন্তু হাতে হাতে ফল পেলেও, বলছিল—'দূর। ওই অ্যানাসিনের বড়ি দুটোই কাজ করল।'

বিন্দের কালো চুল শাদা হচ্ছে, ভরাট গালে ভাঙন ধরছে। খাড়া ধনুক শরীরটাকে অলক্ষ্যে কে কোথায় বসে যেন ছিলে পরাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর ওদিকে সাগরপুকুরের মাটি থেকে ম্যালেরিয়া কমছে, ওলাবিবি বিদায় নিচ্ছে, মা শীতলা, যদিবা তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুটোকে মাঝে মাঝে ছাড়ছে, কিন্তু আসল জোরাল ছেলেটাকে সহজে আঁচল ছাড়া করছে না।

অনঙ্গ ডাক্তারের মতন তো বিন্দের হাতে পর্যাপ্ত ওষুধ নেই। তাই রাতের অন্ধকারে পুকুরের জলে ছড়িয়ে রেখে এসে মড়কের পদধ্বনির আশায় ঘণ্টা গুনবে।

দুলোর বাপ থাকলেও হয়তো বা করত একটা ব্যবস্থা।

সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না এমন সব ওষুধ তারও জানা হয়ে গিয়েছিল। সংগ্রহ করে আনতে পিছপা হত না। আর এমন অলক্ষ্যে কাজ সারত যে শিবের বাবাও টের পেত না। মন্দটি করে রাখত সে আর বিন্দে ভাল করত। ধরা পড়ত না।

অনঙ্গ ডাক্তার ধরা পড়েছিল।

আর পড়েছিল বিন্দের হাতেই।

রাতের অন্ধকারে দু'জনে মুখোমুখি। পুকুরের জলে 'ওষুধ' ঢালবার মুখে।

বিন্দে শেকড়ের চেষ্টায় গিয়েছিল।

গেরস্থদের বৌ ঝি বিশেষ একটা 'ওষুধের' জন্যে তখনো বিন্দের দ্বারস্থ হত। দশটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ল্যানজারি হওয়ায় যে সুখ নেই, সেটা বুঝেছিল তারা গরমেন্টের প্ররোচনার অনেক আগে থেকেই। তাদের সেই বোধ বুদ্ধির সহায়ক ছিল বিন্দে। তাই অমাবস্যার রাত্তিরে পুকুর ধারে শেকড় তুলতে এসেছিল সে।

ডাক্তারের ক্রিয়াকলাপটা দেখে ফেলে বিন্দে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করল, ডাক্তার মশাই এটা কি হল?

অ্যাঁ! কে? কে তুই? কোন্‌টা কি?

শুদোচ্ছো ক্যানো? নিজেই জানো নাই?

অনঙ্গ দাবাড়ি দিয়ে অস্বীকার করতে পারত কিন্তু সেইমাত্র অকর্মটা করে ফেলে বুকটা ধড়ফড় করছিল—তাই বলে উঠল, চুপ বাবা চুপ! তোর মা চণ্ডীর দোহাই! কাজটার ফল ফললে তো তোরও লাভ, আমারও লাভ!

বিন্দে তীব্র গলায় বলল, আর গুনো ডোমেরও লাভ।

আহা না না, অত কিছু না। তেমন জোরালো কিছু না। শুধু একটু রোগ-বালাই হতে পারে।

আচ্চা দেকব। ত্যামন হলে তোমায় ধরে নে গে মা চণ্ডীর তলায় বলিদান দেওয়া করাবো, তা কয়ে রাকচি।

অনঙ্গ মুসড়ে গিয়ে খানিকটা তুতিয়ে পাতিয়ে শেষে রেগে গিয়ে বলেছিল, আচ্ছা, তোরও হাটে ভাঙবার হাঁড়ি আছে।

কী আচে আমার, অ্যাঁ? কী আচে শুনি?

আছে। তোর বেটার বৌই বলেছে। বলে হন হন করে চলে গিয়েছিল অনঙ্গ ডাক্তার।

কিন্তু দুজনারই কপাল। তেমন কিছু ছেড়ে কিছুই হল না। নির্ঘাৎ ভেজাল ওষুধ।

আর সাগরপুকুরের লোক তো সহজে পুকুরের জল ব্যাভার করছে না অনেক দিন থেকেই। রাস্তায় রাস্তায় টিপকল বসিয়ে দিচ্ছে গরমেন্ট। পয়সাওলারা নিজেরাই নিজ নিজ উঠোনে বসিয়ে নিচ্ছে।

বিন্দের উঠোনেই তো টিপকল বসেছে তখন।

প্রথম যখন জিনিসটা গাঁয়ে চালু হয়েছে। দুলোর বাক উয্যুগ আয়োজন করে নিজের উঠোনে ওই 'পাতালগঙ্গা' বসিয়েছিল।

সেই জিনিস এখন দুলোর বৌয়ের অধিকারে।

সর্বস্বই তার অধিকারে। পেটের বেটাই বিন্দেকে দূর দূর করে খেদিয়েছে।

বুড়ি আমার মেয়ে ক'ডাকে নজর দে নজর দে ওগা করে দেচে—।

এই ঢেউ তুলে টগর দুলোকে লেলিয়ে দিয়ে বিন্দেকে ভিটে ছাড়া করে রান্নাঘরের ধারে ওই চালাখানা তুলিয়ে বসতি করিয়ে দিয়েছে। তার মানে দূর করেই দিয়েছে।

তাড়িখোর দুলো, বোঝ না সোঝা। ঠ্যাঙা নিয়ে বোঝ। বৌয়ের কথা শুনে বলেছে, তাই তো, মেয়েগুলানতো রোগা হয়ে গেছে।

দুলো মাকে চোখছাড়া করে এসে মায়ের ঘরের বড় চৌকিখানায় হাত পা বিছিয়ে শুয়ে বলেছে, ভালই হল। আমার একখানা নেজস্বো ঘর হল। তোর ওই নরিষ্টি, গরিষ্টি মেয়ে তিনডেরে নে। তুই ও ঘরে রাজত্বি করগে যা টগরি।

কিন্তু সে আর ক'দিন? দুলোকেও তো সে চৌকি ছাড়তে হল। কে জানে এখন কোথায় কোন্‌ চৌকি জুটেছে তার। এখন তো সবটাতেই টগরের রাজত্বি। বিন্দে বুড়ি ও অঞ্চলে পা দিতেই পায় না।

মাঝে মাঝে গলা তুলে চেঁচায় বটে, টিপকলের জলডা আমারে নিতে দিবেনি ক্যান্‌রে লক্ষ্মীছাড়ি? নান্নাখাওয়ার জলডা নিতে দিবিনে ক্যান্‌? ওডা তোর শোউরের তৌউরি না। সে মালিক না?

টগর বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, তো যমের বাড়ি থে ডেকে নে আয় মালিককে। তা-পর দখল নিতে আসিস।

নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র শাপ শাপান্ত।

টগর যে তার ওই সোয়াগের মেয়ে তিনটেকে নিয়ে রাতারাতি বিছানায় মরে থাকবে, এমন ভবিষ্যৎ বাণীও করে বিন্দে।

টগরও চেঁচাতে ছাড়ে না, আর দু'পক্ষ যখন সপ্তমে ওঠে, তখন ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে সেই দস্যি লোকটা, দুলোর জায়গায় যে ওই সংসারটাকে বাগিয়ে নিয়েছে। ওখানেই খায় শোয় বসে

দাঁড়ায়, আর সংসারটার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে দৈত্যের মত খাটে।

তাড়িখোর দুলো উঠোনের একমুঠো ঘাস কখনো ছেঁড়েনি। আর এ লোক ওইটুকুতেই সোনা ফলাচ্ছে।

সে এসে টিপকলটার ধারে দাঁড়ায়, আর হুঙ্কার দিয়ে বলে, হয়েচেটো কী? অ্যাতো চেল্লাচিল্লি কিসের?

ব্যস। সব চুপ হয়ে যায়।

দুলোর মেয়েগুলো হি হি করে হাসে, আর বলে বাপটারে, বুড়ি য্যানো ঢিল খাওয়া নেড়ি কুত্তার মতন পাইলে গ্যাল। তাই লয়?

আশ্চর্য!

লক্ষ্মীছাড়ি ছুঁড়িগুলো কিনা আপন ঠাকুমাকে বাঁশ নিয়ে মারতে আসে, আর নিজের বাপের থেকে সৎবাপকে ভালবাসে। 'বাপটা' বলতে গড়িয়ে পড়ে একেবারে।

দেখে আর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় বিন্দের। মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে শাপ দেয়, মরবি মরবি। মা ওলাবিবি তিনডেরে অ্যাক সাতে ধরবে। আত পোয়াতে না পোয়াতে, দোক্‌খিন দোরে যাবি।

ওরা আর ভয় পায় না।

একই কথা শুনে শুনে কানে ঘাঁটা পড়ে গেছে।

নতুন কথা আর পাবে কোথায় বিন্দে? শুনতে পেলে মেয়েগুলো জিভ ভ্যাংচায়, পা দেখায়, আর হি হি করে হাসে। বুড়ি তখন যদি বলে, পা দ্যাকাচ্চিস? বাপের মায়েরে পা দ্যাকাচ্চিস? ওই পায়ে কুট্ হবে, জিব খোসে যাবে—। সেটাই কি নতুন বলে?

কিন্তু আর কোন সম্বল আছে এখন বিন্দের?

সন্ধেবেলা ভাতের পাট নেই। কোথায় ভাত যে পাট থাকবে? ক্ষমতাই বা কোথায় ভাত সেদ্ধ করতে? সন্ধ্যেবেলা চালের খড় খসে পড়া থুখুড়ে দাওয়ার নীচে বসে তেল নুন আর জল মাখা ছাতুর গুলি চিবোতে চিবোতে বৃন্দে উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তার সেই উজ্জ্বল সমারোহময় দিনগুলোর কথা ভাবে।

২

উকিলবাবুর মেয়ের ঘরের পেরথম নাতি, চাঁদপারা রূপ ঝিয়ের কোলে চেপে পাড়ায় বেড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ ছেলে চিৎকার করে কেঁদে উঠেই ভয়ে নীল হয়ে সেই যে ঘাড় নটকে ঝিয়ের কাঁদে মুখ গুঁজল, সে মুখ আর তুলছে না। শুধু বু বু করতে করতে মুখে ফেনা কাটছে।

নজর লাগাই। কিন্তু মোক্ষম কিছু।

কিন্তু ও রোগের ওষুধ কি আর ডাক্তার বদ্যির কাছে মেলে। এর চিকিৎসা গুণীনমা। ডাক তাকে, এখুনি ছুটে যা।

রান্না চড়াচ্ছিল বৃন্দে, জ্বলন্ত কাঠে জল ঢেলে দিয়ে ছুটে এলো। দেখে কপাল টিপে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ছেলের মাকে জিগ্যেস করল। ঝির সাতে ছাড়া করার বেলা ছেলের কপালে কাজলের টিপ দ্যাও নাই?

হ্যাঁ। দিয়েছি গো।

হাতের ত্যালোয় গোবরের ফোঁটা?

তাও দিয়েছি।

কোড়ে আঙ্গুল কামড়ে নেচলে?

হ্যাঁ মা, সব করেছি।

মুখে 'থুক' দেচলে?

ছেলের মা মাথা নাড়ল।

দাও নাই। উইতো, উইটিই তোমাদের দোষ। শুদোই মা তোমার সাত দুয়োরি ঘরের ছটা দুয়োরে খিল হুড়কো নাগিয়ে তালাচাবি দে বন্দ করে, যদি অ্যাকটা দুয়োর হাট রেকে থোও, সেই ফাঁক দে দিয়ে চোর মাতা গলাতি পারে, কি নারে'? বল আমারে?

মা নীরব।

দিদিমাকে বলে, আপনি তো মান্যিমান গিন্নী মনিষ্যি। তো আপুনিও তো দ্যাবে? আপুনি জানো না কি থেকে কী হয়?

দিদিমা ইতস্তত করে জানালেন তিনি তো বলেছিলেন, কিন্তু মেয়ে বলে ঘেন্না লাগে।

ঘিন্না নাগে? তো অ্যাকোন বোজো? বলে মায়ের থু অমতো। ওই ফাঁকা দুয়োরটি দিয়েই চোর সেঁদিয়েচে।

মা দিদিমা দুজনেই হাপাসায়।

ডাক্তার গিন্নী আর উকিল গিন্নী।

আর কখনো এমন ভুল হবে না মা। এখন তুমি বাঁচাও।

তা বাঁচাল বৈকি বৃন্দে, মায়ের খোঁপার লোহার কাঁটা পুড়িয়ে এক ঝিনুক দুধে তিনবার ছ্যাঁক ছাঁক করে ডুবিয়ে, সেই দুধ জোর করে গিলিয়ে দিল মুখ গোজা নেতিয়ে পড়া ছেলেকে। দণ্ড দুই পরেই হেঁটে বেড়ালো।

তা তো বেড়ালো। কিন্তু এমন কাজটা করলে কে?

আর কেউ নয়। সেই দাসী।

কেন এত দিনের বিশ্বাসী লোক। লোভ! লোভে পড়ে মানুষ কি না করে।

তার পেট কেঁচড়ের আঁচল থেকে বেরোল ছেলের গলার সোনার হার।

এতক্ষণ ছেলে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সবাই, দেখেনি গলার হার গলায় আছে কি নেই। বিন্দের জেরায় স্বীকার করতে বাধ্য হল যে নিয়েছে লোভে পড়ে। এখন ধরা পড়ল। দেখা গেল ছেলের ঘাড়ে গলায় হার হিঁচড়ে টানার দাগ.....।

কলকাতার স্যাকরার গড়া, আধুনিক 'টিপকল' খুলতে পারেনি, ছিঁড়ে নিয়েছে। তদবধিই ছেলে মুখ গুঁজেছে। ঘাড় তোলেনি।

স্বীকার না করে উপায় ছিল?

বৃন্দে একগোছ পান মন্তর-পড়া জলে ডুবিয়ে ধরে শাসাচ্ছিল, বল মাগী, বল কেমন করে নেছিলি? ... মিচে কতা বলবি তো এই পানজলের আচড়া মারব। জন্মের শোদ বাক্যি বন্ধ হয়ে যাবে। তোর ঝাড়ে বংশে শ্যাষ হবে।

উকিল গিন্নী হাতের আংটি খুলে দিয়ে দিয়েছিলেন বৃন্দেকে। আর তাঁর মেয়ে দিয়েছিল চওড়া লাল পাড় পাটের শাড়ি। সেই শাড়ি-পরা রূপ দেখে দুলোর বাপ বলেছিল, পতে ঘাটে এই রূপ নে ঘুরিসনে দুলোর মা। গোরায় ধরে নে যাবে।

বৃন্দে বলেছিল, মরণ! বুড়ো-কালে অ্যাকনো কতায় কত অস।

কথা। একদা ওই কথাতেই মজে বৃন্দে ওর সঙ্গে জাকিয়ে বসে ওর দেশ গাঁ এই সাগরপুকুরে এসে বসবাস করতে লেগেছিল। চওড়া বুক, চওড়া পিঠ, বাবরি চুল, হাত পা যেন লোহায় গড়া। অথচ প্রাণটা মায়ার সমুদ্দুর। আর মুখের কথা? যেন মিছরির পানা।

কতকাল হয়ে গেছে, তবু এখনো মনে করলে, মনটা হুহু করে ওঠে।

ভাল করতেও পারত বৃন্দে, মন্দ করতেও পারত। দত্তবাড়ি, জ্ঞাতির লড়াই। গলাবাজি থেকে হাতাহাতি।

দুই জ্ঞাতি ভাই, জ্যাঠতুতো খুড়তুতো, লেখাপড়া জানা। তথাপি পরস্পরে বাপ তুলে গালিগালাজ। অতঃপর কোর্টে ছোটে আর কি!

কিন্তু ঝগড়ার কারণ? কারণ হাস্যকর।

বড় দত্তর হাজারে নারকেল গাছের আগাটা ঝুঁকে এসে পড়েছে, ছোট দত্তর ভাগের পাঁচিলের এধারে।

ছোট দত্ত শাসায়, উঠোনে ঘুঁটে শুকোয়, কাঠ শুকোয়—ছায়া পড়ে। গাছের মাথা সরিয়ে নেবে তো নাও, নচেৎ বাগদী লাগিয়ে গাছ ঝাড়ে মূলে শেষ করে দেব।

আর বড় দত্ত শাসায়, ডেকে আন উকিল ব্যারিস্টার। বলুক কে বলবে, গাছের ছায়া অন্যের জমিতে পড়তে পারে না। পড়াটা বে-আইন। দেখি কেমন বাগদী লাগাস। গাছ দু'ফাঁক হবে তো তোর মাথাও দু'ফাঁক হবে।

ছোট দত্ত রাতের অন্ধকারে এসে ধরল বৃন্দেকে।

দুলোর বাপ হেসে বলল, তা আপনারই তো ছোটকত্তা গাজুরি লড়াই? গাছের ছাওয়া নে নড়াই চলে?

ছোটকত্তা একগোছা দশটাকার নোট 'মায়ে'র পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, তা জানিনে। বিহিত একটা করতেই হবে। এ হচ্ছে ইজ্জতের লড়াই। বলে কিনা কোর্টে যাবে। মাকে দেখতেই হবে। মুখ রাখলে শাড়িজোড়া। নতুন গামছা, আরো টাকা।

অগত্যই দেখতে হল মাকে।

ব্যস! রাতারাতিই বড় দত্তর হাজারে নারকেল গাছ, কাঁদি কাঁদি ডাব সুদ্ধু বাণ খেয়ে কাঠ। একটা ডাবের মধ্যেও ছিটে বিন্দু জল নেই।

পরদিন বড় দত্ত আপসে এসে পড়ল, তুই আমার এই করলি বাছা? বলি ছোট হারামজাদা কত টাকা দিয়ে গেছল তোকে? আমায় একবার তুই জানালি না কেন? আমি তার ডবল দিতাম। অন্যায় তো ওরই।

বৃন্দে অকুতোভয়ে বলল, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার মালিক বিন্দে না। ট্যাকা তার ছপ্পর ফুঁড়ে পড়ে। উনি অগরে শরোণ নেচে, উনির সাতে বেইমানী করব?

বড় দত্ত আগুন হয়ে বলে গেল এক মাঘে শীত পালায় না বিন্দে! দেখব। তা সেই তেনাকেই আবার দাঁতে কুটো নে আসতে হল বৃন্দের দোরে।

ছেলের বৌয়ের গহণার বাক্স চুরি হয়ে গেছে। ছিল কোথায়? ঘরের মধ্যে লেপের চালির ওপর তোলা ছিল। বিছানা বালিশের মধ্যে তাকিয়ার তুলো বার করে তার ভিতর পুরে রাখা থাকত। সে জিনিস চোরে নেয় কেমন করে? মই ভিন্ন তো নাগাল পাবে না।

থানা পুলিশ করতে গেলে জিনিস মিলবে না, হয়রাণি সার হবে। এ কথা গ্রামের বাসিন্দাদের জানতে বাকি নেই। অতএব? অতএব 'গুণীনমা'।

কড়ি চেলে বল মা, কে এমন কাজ করেছে। কোন ঘরশত্তুর বিভীষণ? গিন্নীর একটা অগাবগা ভাইপো থাকত সংসারে, দু'বেলা দুটি খাওয়ার বিনিময়ে মজুরে খাটুনী খাটত, তবু কর্তার দু'চোখের বিষ সে। 'সন্দ' তার ওপর।

কড়িটি চাললেই খ্যাঁক করে তার কণ্ঠনালিতে চেপে বসবে। কাঁকড়া বিছের কামড়ের মত। হাতে ধরে ছাড়ানো যাবে না। স্বীকার করলে আপনি ছেড়ে খসে পড়বে।

আর অস্বীকার করলে? সে কথা বৃন্দেই জানান দিল। নিয়ে অস্বীকার কল্লে মুখে অক্ত উটবে।

কত্তা বললেন, যা হয় হোক।

গিন্নী বললেন, ওই মুখে রক্ত ওঠাউঠি বাদ দিয়ে হয় না?

বৃন্দে মাথা নাড়ে।

মন্তরের কাজ মন্তর করবে। কড়ির কাজ কড়ি। চলার পর আর বৃন্দের হাতে নেই। সে নিজের পথে ছুটবে। তবে হ্যাঁ, চোরের চেহারা চরিত্তির বলে দিতে পারে বৃন্দে চোখ বুজে। তারপর তোমরা থানা পুলিশ কর, আর মারধোর কর। তবে কড়ি হচ্ছে মোক্ষম। নির্ভুল।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে বৃন্দে, লম্বাপারা গড়োন, গোরাপারা অং।

গিন্নী নিশ্বাস ফেলে। স্বস্তির নিশ্বাস। আর যাই হোক তাঁর ভাইপোকে কেউ 'গোরাপারা রং' বলে

অপবাদ দেবে না। আর লম্বাপারাও নয়। দেখা যাক কে?

বৃন্দে বলে চলে, মাতার সুমুকের চুল পাতলা, বাঁ পায়ে একটা জড়ুল। আর ডান কানের পিঠে তিল। ... ঘরেই বসবাস, ঘরেই শোওয়া বসা—

ছেলের বৌ ডুকরে ওঠে।

কত্তা গিন্নী বৃন্দের পায়ের সামনে উপুড় হয়ে বলেন, মা, কড়িচালায় ক্ষ্যামা দাও। এই তোমার পেননামী, এ-কথা যেন আর কারো কাছে প্রকাশ না হয়।

কিন্তু করেছে কি সে গহণা? বেচেছে? গালিয়েছে? না কি—

হ্যাঁ তাই। বেচেওনি গালায়ওনি। ভাবের মেয়েছেলেকে দেচে। কলকেতায় থাকে সে মাগী, এ অঞ্চলেই নয়।

তবে আর কী করা যায়!

করার কিছু নাই।

বৌ বাপের কাছে গিয়ে আবদার করে আবার গহণা বাগাক। বলুক, চোরে নেচে বলে তোমার বেটি ন্যাড়া গায়ে লোক-সমাজে বেরোবে?

তা বিশ্বাসের মূল্য রাখে বৃন্দে। আজ পর্যন্ত বলেনি কাউকে।

৩

চোখের ওপব ভাসে সামন্তগিন্নীর চেহারাটা।

মোটাসোটা দলদলে গয়লার গাইয়ের মত আকার। গলায় ইয়া মোটা কড়ি হার, হাতে মোটা গোলাপপাতা বালা, ওপর হাতে পালংপাতা অনন্ত। কোমরে রুপোর গোট—দেডসেরের কম ওজন নয়। নাকে ফাঁদি নথ, কানে সার মাকডি।

ভর দুপুরে পাঁচটা পান, পাঁচটা সুপুরি নিয়ে এসে চুপি চুপি গছিয়ে আর্জি জানিয়ে রেখে গেল, বৃন্দের ঘরের 'উদ্দানী চণ্ডির' ঘটের ঠাঁই।

'রুদ্রাণী চণ্ডী যে কোন দেবী, কোন মূর্তি তা জানে না বৃন্দে। সেই কোন অতীতে প্রথম পক্ষের দিদিশাশুড়ির কাছে শুনেছিল। এই তাদের ইষ্টদেবী। এনার নামে ঘট পিতিষ্টে করে রাখতে হবে, যে যা বাসনা জানাতে আসবে, পাঁচটা পান সুপুবি ঘটের সামনে 'গছিয়ে' রেখে চুপিচুপি মনের কথা ব্যক্ত করে যাবে।

'এমারজেন্সির' ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা পদ্ধতি।

তখন তো ডাক পেয়ে ছুটতে হয়। জ্বলন্ত উনুনে জল ঢেলেও।

তখন ওই ঘট পেন্নাম করেই ছুট। পরে সফল হলে মায়ের পুজো দেবে খদ্দের।

তা অসফল আর ক'বার হয়েছে বৃন্দে তার জীবনে?

এখনি চাকা ঘুরে গেছে।

ডাকই নেই, তা সফল আর অসফল।

সামন্ত গিন্নীর আর্জি, বেটার বৌকে জব্দ করতে হবে। বৌ নাকি জাহাবাজ চোপাবাজ। শাশুড়িকে মনিষ্যি জ্ঞান করে না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। পাডার লোকের কাছে বলে বেডায় শাশুড়ি গিল্টির গহণা 'পবে বাহার দিয়ে বেডায়। কলকেতায় বোনের বাড়ি, সেখান থেকে কিনে আনায়।

.....'সোয়ামীর সোয়াগে' দিন দিন আস্পদ্দা আরো বাড়ছে।

এই বৌকে যদি জব্দ করতে না পারত সামন্ত গিন্নী তো তার জীবনে ধিক।

কী ভাবে জব্দ করতে হবে।

তা জানে না সামন্ত গিন্নী। শুধু তার স্বামীপুত্তরের গায়ে আঁচড়টি না লাগে। আকাশে ধুলো ছুঁড়লে আপন গায়ে এসে লাগে। তাই ওইটি বাদে। অনিষ্ট যদি করতেই হয়, তা তার বাপ ভাইয়ের হোক গে।

বৃন্দে জিভ কেটেছিল।

না গো না। বিন্দে ও কম্মে নাই। মানষের পেরাণ হানির মধ্যে নাই। কেন? বিন্দের ভাঁড়ারে কি ওষুধের অভাব? এই শেকড়টুকু নে যাও, যেমন করে পারো বৌয়ের মাতার বালিশের তলায় একে দ্যাওগে, আতটুকু। অ্যাকটা আত।

সামন্তগিন্নী মুখ শুকিয়ে বলে, রেতে তো ছেলের সঙ্গে এক বালিশে মাথা মা! সোহাগের ছড়াতেই তো আছে—

'এক বালিশ দুই মাথা, আস্তে আস্তে কয় কথা।' তা ছেলের কিছু অনিষ্ট হবে না তো?

হলি আমি দিই?

বৃন্দে বলেছিল, শেকড়ে নাম বেঁধে থোবনি? বৌর নামডা বোলে যাও।

নাম মালতি।

মালুতি! ওঃ ফুলের নামে নাম? তাই বলি! হবেই তো। এই মেয়েছেলেরাই জাঁহাবাজ হয় মা। তুমি হিসেব নে দেকো।

তা যে যত জাঁহাবাজই হোক না কেন, বৃন্দের শেকড়ের কাছে সব ঠাণ্ডা।

শেকড়ের পরদিন থেকে বৌ আর মুখে 'রা' পাড়ে না। ঘাড় গুঁড়ে সংসারের কাজ করে, আর বাকি সময় আকাশ পানে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ওদিক সামন্ত গিন্নীর ছেলের যেন মেঁজাজ গমগম। বৌয়ের দিকে সে আদরের চাউনি নেই, ছুতোয় নাতায় বৌয়ের ধারে কাছে ঘুরঘুর করা নেই। বুকটা ঠাণ্ডা সামন্ত গিন্নীর।

একজোড়া কানফুল হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, বিশ্বেস কর মা, গিল্টি না, খাঁটি গিনি ভেঙে গডানো। দিলাম তোমায়। তবে ছেলের এই ভাবটি যদি বরাবরের মতন বজায় রাখতে পারো, তা তোমায় রূপোব চুড়ি সেট গতিয়ে দেব।

বিন্দে তাতে রাজী হয়নি।

বলেছিল, বৌ তোমায় অমান্যি করেছেল, চোপা করেছেল মুখ ভোঁতা করে দিচি, ব্যস। দেকো আর কখনো গলা তুলি রা কাড়াবেনি। তবে চেরদিনের মতন সোয়ামী স্ত্রীরির বেরহো বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবনি। পাপ নাগবে। পাপ পুণ্য ধর্ম অধর্ম মেনে চলতে হয় বইকি।

তা নইলে মা উদ্দাণীর গোঁসা হবেনি?

তবে ক্ষেত্তোর বুঝে কম্মো।

মন্দ কাজেও মায়ের আদেশ নিতে হয়। পাওয়া যায় না তা নয়।

জমি নিয়ে মামলা মায়ে বৌয়ে। ত্রিভুবনে শুনেছে কেউ এমন কথা?

একমাত্র ছেলে, মা মরলে তো ছেলেরাই সব, তবু মামলাবাজি।

দু'পক্ষই চুপি চুপি এসেছে পান সুপুরি হাতে।

মা বলে, মামলার দিন ছেলে যেন পড়ে পা মচ্‌কায়, কোর্টে যেতে না পারে। এক তরফা ডিগ্রী হয়ে যাক।

ছেলে বলে, মামলার দিন মার যেন পক্ষাঘাত হয় কোর্টে যেতে না পারে। এক তরফা ডিগ্রী হয়ে যাক।

বিন্দে বলল, না, চেরকাল জানি, কুপুত্তুর যোদ্যাপি, হয়। কুমাতা কখনো নয়। তো মায়ের শরীরেই পক্ষাঘাত দ্যাও।

দিলো তো মা তাই।

অবিশ্যি খাটতে হয়েছে বৃন্দেকে। হোম যজ্ঞ, উপোস কবাস।

তবে মজা এই সেই মা মাগী কিন্তু পরে দূষলো না বৃন্দেকে। বলল, আমার কর্মফল। ভগবান হাতে হাতে দেখিয়ে দিল।.... আর আরো মজা, সেই ছেলেই মাকে এমন সেবাটা করলো, যে পাড়ার লোক

ধন্যি ধন্যি করলো। মাকে তুলে ধরে নাওয়ালো খাওয়ালো সব। সেও আবার বলল, 'পাপের প্রাচিত্তির করছি'। কত মানুষ, কত মুখ। কত চুপিচুপি সলা পরামর্শ। কত জনের কেঁদে পড়া। মেয়ে মানুষের জীবন যে বড় ছলনা বঞ্চনার। এই সব তুকতাক মারণ উচাটন বশীকরণ বিষকরণ না হলে তাদের চলবে কি করে?

স্বামী যদি অন্য মেয়েছেলেকে মন দেয়, বৌ বাঁজা বলে আবার বিয়ে করতে যায়, বছরে বছরে আঁতুড় ঘরে ঘুরে আসতে আসতে যদি দেহ ভেঙে যায়, বাচ্চা হয়ে হয়ে যদি না বাঁচে, তাদের গতি কি এই সব ছাড়া?

ডাক্তারকে বলতে যাবে?

ডাক্তারকে বলবার কথা?

তাছাড়া ডাক্তার ডাকতে হলে পুরুষের কানে তুলতে হবে না?

সকল কথা পুরুষের কানে তোলা যায়?

বৃন্দে যেন ভাবনার সুতোর গুলিটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছে, যত ইচ্ছে গড়িয়ে যাচ্ছে সুতো খুলতে খুলতে। বড় বড় ঘরানাদের ঘরে গতায়াত ছিল বৃন্দের, কতোই দেখেছে। কত লোভ, কত পাপ, কত নিষ্ঠুরতা, কত ভণ্ডামী, কত নির্লজ্জতা। বৃন্দের কাছে অনেক ইতিহাস।

বাঁড়ুয্যে কর্তার দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নী বৃন্দেকে এসে ধরে পড়ল, সতীনপো বৌটার যাতে জন্মের শোধ ছেলেপুলে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওমা। সি কি, জোয়ান মেয়ে, নতুন বে হয়েচে।

তা' হোক। ওর ছেলেপুলে হলেই তো আমার ছেলের ভাগীদার হবে? তোমায় আমি অনেক টাকা দেব।

বৃন্দে বলেছিল, টাকাতো আপনি আমায় দেবে মা, বলি পরকালে জবাব দেবার ভারটি নেবে কি? এত বড় অধম্মো ধম্মে সইবে?

ছোট গিন্নী মুখনাড়া দিয়ে বলল, তুমি আর ধম্মকথা কইতে এসো না বাছা। কতলোকের কত করছো। হওয়া ছেলে মেরে ফেলতে তো বলছিনে? যাতে না হয় তারই প্রতিকার চাইছি।

মনের অগোচরে পাপ নেই, লোভে পড়ে এ যুক্তিটা নিয়েছিল বৃন্দে। সত্যি এ তো আর মানুষ খুন নয়?

তা এ ওষুধ তো বৃন্দের হাতের মুঠোয়।

কতজনকেই সাপ্লাই করছে হরদম।

'কপাটবন্দী' গাছের বাকল, আর 'বিনষ্টি' লতার মূল, ওতো ঘরে মজুতই থাকে বৃন্দের।

অদৃষ্টের ফের।

আবার একদা সেই বৌ-ই এসেছে চুপিচুপি।

স্বামী না কি কলকেতায় নিয়ে গিয়ে অনেক ডাক্তার বদ্যি করেছে, কাজ হয়নি। তো সে মানুষ নাকি মাদুলি কবচে বিশ্বাসী নয়, তাই বৌ তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি এসেছে।

দেখে মায়া হয়েছিল বৃন্দের।

পয়সার লালসে কাজটা করেছিল খুব খারাপ। কিন্তু আর তার হাত নেই। খোদার ওপর খোদকারি বারবার হয় না।... কে জানে, কোন পাপে বৃন্দের আজ এমন দুর্দশা।

আহা 'ভাল' 'মন্দ' দুই-ই তো করেছে বৃন্দে। তবে? পাপ পুণ্যিতে কাটাকুটি হয়ে যায় না? পয়সার লোভে অনেক অকর্ম করেছে বটে, অনেক পাপ। কিন্তু যারা করিয়েছে? তারা পাপী নয়? পাপের ফল তাদের ছোঁয় না?

ওইতো বাঁড়ুয্যে গিন্নী রামবাজত্ব করে সংসার করে ড্যাংডেঙিয়ে মরে গেল। বরং সতীনপো বৌটাই দুঃখে কষ্টে থেকেছে। সন্তান নেই, স্বামীও রইল না। তারপর চলেই গেল দেশ ছেড়ে বোনের বাড়ি,

না ভাইয়ের বাড়ি।

কি দিয়ে তবে বিচার? বারুইদের মেজ বৌটা?

আপনার ছেলের মাথার দোষ কাটাতে, ননদের ছেলেটাকে পাগল করে দেয় নি?

বৃন্দে তো নিমিত্ত। প্ররোচনাটা কার?

সেই মেজ বৌয়ের কত বোলবোলাও। ইস্টিশানের ধারে তাব সেই ছেলেব কতবড় সিনেমা হল আরো এক ছেলে কলকাতায় বড়বাজারে দোকান দিয়ে 'লাল' হয়েছে, মেজকর্তা এখনো জ্যান্ত। বৃন্দেব তবে কিসের পাপে এতো খোয়ার?

স্বেচ্ছায় ভালকাজই কি করেনি বৃন্দে?

দুলোর বাপ তখনো বেঁচে, একদিন হাসতে হাসতে এসে বলল, জগা বাউবি তো তোব অন্নো মাববে রে।

বৃত্তান্ত কি?

না, জগা কোথা থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছে।

জগার কী মদগর্ব। বললো, তুই তো 'নিশিরডাক' ডাকতে শিকিস নাই, জগা সেডা শিকেচে।

বৃন্দে বলল, শিকুক। ওতো মানুষ মারা কল।

মানুষ বাঁচানোরও।

তা হোক। ওটা মহাপাপের কাজ।

তা একদিন সেই মহাপাপের কাজ চোখে পড়ে গেল বৃন্দেরই। বৃন্দেব তো বাতে ভিতেই চরা। গেছিল মাঝরাত্তিরে কলাগাছের গায়ে গুনছুচ্ বিঁধতে। কাৰু মন্দ করতে নয়, হিত করতেই। মুখুয্যে বাড়িব মেয়েব বিয়ে, মহা ঘটাপটার ব্যবস্থা। কিন্তু মেয়ে নাকি 'বাদুল'। যদি বিয়ের রাত্তিরে বৃষ্টিতে ভাসায, এত আয়োজন পণ্ড হবে। তখনো তো জমিদার বলে কথা আছে, ওনারাই ছিল জমিদার। রসুনচৌকি বসিযেছে সাতদিন আগে থাকতে। বরযাত্রীরা আসবে বলে, ইস্টিশান থেকে আলোবাতির মালা। ইংবিজি বাজনা মজুত। আর খাওয়ান দাওয়ানের কথা তো বাদই দাও।

বৃষ্টি হলেই তো সব লণ্ডভণ্ড।

তাই ওই কলাগাছের গায়ে গুণছুঁচ পুঁতে 'বিষ্টিবন্ধন'।

মাঝরাত্তিরে এলোচুলে ছুঁচ পুঁতে দিয়ে যাবে, যতক্ষণ না বৃন্দে নিজে এসে সে ছুঁচ টেনে তুলে ফেলে দেবে ততক্ষণ বৃষ্টির সাধ্যি নেই যে নাবে।

তবে গাছের এমন ঠাঁই পুঁততে হবে, যাতে কারো চোখে না পড়ে। মুখুয্যেদেরই কলাবাগান। সেখান থেকে চলে আসছে কাজ সেরে, দেখে জগা চলেছে হনহনিয়ে।

বৃন্দেকে দেখে বাঁশঝাড়ের গা ঘেঁসে ঘেঁসে হাঁটছে।

কিন্তু সেই এক লহমাতেই তো বৃন্দে যা দেখবার দেখে ফেলেছে। বৃন্দের শ্যেন দৃষ্টি। জগাব হাতে একটা মুখকাটা ডাব। বাঁ হাতের তেলোয় বসিয়েছে, ডানহাতে কাটা মুখটা চেপে ধবেছে।

এলো চুল জড়াতে ত্বর সয়না, বৃন্দে ছুটে আসে। 'কার সববোনাশ কত্তে যাচ্ছিস বে লক্ষীছাডা?'

জগা শিউরে উঠে বলল, সববোনাশই বা কেন? সুবকাজেও। ছাড় বিন্দেদি, দাঁডানো চলবেনি।

বলি রক্কেটা হচ্চে কার?

নবীনবাবুর শালার মেযে। কলকেতা থেকে এযেচে। ডাক্তাব বদ্যি হার মেনেচে, নবীনবাবুর পবিবাব তাই ভাই-ভাজকে আনিয়েচে রুগী মেয়েরে নে। সেই ছুঁলি বিন্দে দি? দোহাই তোর ছেড়ে দে। ছুঁড়িটা খাবি খেতেচে—

হুঁ। বড় দরোদ। অনেক ট্যাকা কবলেচে বোধ হয়?

তা ওগড়া কী?

ওগ্ অক্তচোষা। শরীলের সব অক্ত ভস্মোকীটে শুয়ে নেচ্চে—

ও বাঁচবেনি।

বৃন্দের অমোঘ স্বর।

সেকতা তুই আমি বললি তো হবে না। বাঁচিয়েই ছাড়বে।

এক সন্তান?

বেটাছেলে আচে তিনটে চাট্টে, বেটিছেলে ওই এ্যাকটাই বটে। পয়সার অদিবদি নাই, বলে আজার আজত্তি দেবে, যদি মেয়ে বাঁচে। হাতডা ছাড় বিন্দে দি—

'মেয়ে' শুনে বৃন্দের মন থেকে অনেকখানি মূল্যবোধ ঝরে পড়েছিল, তায় আবার শুনল বেটা আছে তিন চাট্টে, বৃন্দে আরো শক্ত করল হাতের মুঠোটা।

বলল, পয়সার গরম। তাই মহাপাপেও ভয় নাই। বলি ডাবের খোলের মদ্যি করে পেরাণ পাকিটা পুরে নে যাচ্ছিস?

জগা বলতে রাজী নয়, বৃন্দেও ছাড়বে না।

শেষতক্ জগা বাউরি শাসাল, দণ্ডো পার হলি, কাজ হবেনি, একুল ওকুল দুকুল যাবে। বেশী 'এ' কল্লে ভাল হবে নি বলচি।

বৃন্দের চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

কী বললি জগা? বিন্দেকাওরাণীকে তুই ভাল হবেনি দেকাতে এইনিচস? এক ফোঁট্টা ছেলে, এই সেদিন ও কাঁকালে ঘুনশি বেঁদে উদোম হয়ে আস্তায় ঘুত্তে দেকেচি। বিন্দেকে শাসানি? বল বলচি, কার সববোনাশ কল্লি? নইলি হাত মুচড়ি পটকে দিবো।

জগার অবস্থা বেপোট।

দুটো হাতই বন্দী। আবার সেই হাতেরই কব্জি বৃন্দের কবজায়। অগত্যা বলে ফেলতে বাধ্য হয়।

শুনে শিউরে ওঠে বৃন্দে।

অ্যাঁ কী বললি? হরিকুমোরের ওই হাবামরা একমাত্তোর ছেলেডা?

জগা কাতর বচনে বলে, ওস্তাদ বলে থুযেচে একমাত্তোর না হলি, এ কাজ হবেনি।

হবেনি। তাই তুই বড় মানসের ঘরের একটা পোকায়কাটা বাদুড়চোষা ছুঁড়ির জন্যি, ওর জলজীয়ন্তো ব্যাটাটাকে হত্যে করচিস? ভাল চাসতো, অ্যাকনো ডাবের মুক ছেড়ে দে জগা।

ছেড়ে দেব?

জগা হাপসে পড়ে।

কতো চেষ্টায় কতো সাদোনায় ঘটানু। অ্যাখোন তুই বলছিস—

বলচি।

বৃন্দে আবার অমোঘ স্বরে বলে, আমি বলচি ও মেয়ে বাঁচবেনি। আজ তুই বাঁচাবি, কাল আবার মত্তে পড়বে। অ্যাখনো সেময় আচে জগা, হরির ছেলেডার পেরাণডা ফিরিয়ে দে।

জগা তখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়, ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি সে জানে না।

জানে না অবশ্য বৃন্দেও।

একাজের শিক্ষাটা নেই তার। তবু শুনেছে ঢের।

তাই কড়া গলায় বলে। পেরাণডা শুধু নিতি জানলিই হয়নারে জগা, দিতি জানতিও হয়। ওই ডাবের জলটুকুন অ্যাখোন ওই কুমোরের বেটার মুকেই ঢালগে যা।

ওবাবা। আমায় পুলিশে দেবেনি?

দেবে, জেল খাটবি। না দিলি, তোরে আমি ফাঁসি দেওয়া করাবো, তা' কয়ে আকচি।

শুনেছিল জগা তার কথা।

তবে বৃন্দে সঙ্গে গিয়েছিল।

ম্যানেজ করেছিল, মায়ের 'স্বপ্নাদেশের' গল্প বানিয়ে। তারা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা তখনও বিপদ টের পায়নি। ছেলে ঘুমোচ্ছে না ঘুমোচ্ছে। আট দশ বছরের ছেলে, কাঁথায় শোওযা তো নয় যে, মা রাতে উঠে দেখবে।

ছেলের চেহারা দেখে মনে মনে হেসে ফেলেছিল বৃন্দে। অঘোব ঘুম ঘুমোচ্ছে ছেলে, যেমন কে তেমন। তার মানে কিছুই শেখেনি জগা।

বৃন্দে দরজার শেকল নেড়ে দোর খুলিয়েছিল, জগা বাইরে দাঁড়িয়েছিল ডাব হাতে। বৃন্দে বেবিয়ে এসে চুপিচুপি বলল, ডাবে দরকার নাই, তুই পালা, আমি পরে যাচ্চি।

হরিকুমোর দেবতুল্য ভক্তি করে বৃন্দেকে, কাতর হয়ে বলল, স্বপন দেকে ছুটে এয়েচে মা। তোমাব দয়ার শেষ নাই। তো কী স্বপন দেকলে মা?

কিচু না বাবা। যেন কানে শুননু 'হরির ঘরে যা দিকিন অ্যাকবার। মন নিচ্চে কেউ অনেষ্টব তালে আচে। তাই ছুটে এনু।'

এই মাজ রাত্তিবে। মাগো তোমার গরীব ছেলে, কী শোদ দেবে?

শোদ?

বৃন্দে হেসেছিল, তোদেব ভক্তি ভালবাসাই আমার শোদ বাবা। বসে থেকেছিল আরো খানিকক্ষণ। হরিব বৌকে বলেছিল পান খাবো বৌমা।

বাইবে আসার পর জগা ধরল, এডা কী হল বিন্দেদি?

হলো?

গল্পবানাতে ওস্তাদ বৃন্দে বলল, দেকনু ছেলেব গতিক তো সুবিদের না। অ্যাখোন যদি টেঁশে যায়। তো তোর আমার দুজনাব হাতে হাতকড়া পডবে। বলবে মাজ আত্তিরে দুগোর ঠেঙিয়ে ছেলেকে তুক করে মেবে ফেললো। তো মায়ের শরোন নিনু। হাতচালা, ঝাড ফুঁক, মন্তোর তন্তোব—ছেলে চোখ মেলল দেকে, তবে এনু।....

জগা মলিনমুখে বলল, ওদের কী জবাব দিবো?

কেটে পড় গা। দু'চাদ্দিন গা ঢাকা দে থাকগে যা। নবীনবাবুর শালা তো আব চেরকাল বোনাই বাডি থাকবেনি?

ট্যাকা খেয়েচি—

খেয়েচিস, ফেরত দেগা যা। বলবি—ওষুদ খুঁজতে ওস্তাদেব কাচে গেচনু—

ট্যাকা ফেরৎ দিবো?

দিবি!

নিবে না।

বৃন্দে চোখ টিপে বলে, বড় মানুষ তো। অ্যাকোন শুনবে তুই ওষুদ খুঁজতে গেচলি, আব মেয়ে নিকেশ হয়ে গ্যাচে শুনি ট্যাকা ফেরৎ দিতি এইচিস, ত্যাখন বলবে ওতে দবকাব নাই।

তাই বলতেচো।

বলতেচি। তোর আসার অনেক আগে পিথিবিতে এইচি—

তদবধি জগা বাউরি বিন্দের প্রতিপক্ষ না হয়ে মান্যভক্তিই করতো। আসল কথা তো ফাঁস করেনি বৃন্দে। 'নিশিরডাকে' মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে এলো, এই কথাই জেনেছে জগা।

কিন্তু সে বৃন্দে কোন বৃন্দে?

সে কি এই নখদন্তহীন বিন্দে বুড়ি?

বিধবা ব্যাটার বৌয়ের সংসারে পরের দাবড়ানি খেয়ে যে বুড়ি নিজের উঠোন থেকে পালিয়ে আসতে পথ পায় না? আর লোকে যাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

সকল শক্তি হারিয়ে ফেলল বৃন্দে কোন ফাঁকে?

সকল শিক্ষেদীক্ষে ভুলে গেল কী করে?

আঃ, ওই বজ্জাতটাকে যদি বিন্দি একখান বাণ ঝেড়ে বোবা কানা করে দিতে পারতো। দূরে থেকে বাণ মারার ইতিহাসও তো আছে।

বড় দত্তর হাজারে নারকেল গাছ, বুদো গয়লার ক্ষেপে যাওয়া মোষটা, লরিগাড়ি, কামারনীর লক্‌লকে বেগুন ক্ষেতটা, হাড়পাজী দুগ্‌গা তেলিনীর দুধেলা ছাগলটা, এরা সব বৃন্দের বয়েসকালের শক্তির সাক্ষী।

'মা উদ্দানী চোন্‌ডি, তোর নামডা পর্য্যন্ত বিস্মরোণ হয়ে যাই মাজে মাজে। কিন্তুক লোকে আমারে ছাড়ালো ক্যানে মা? কী অপোরাদ কন্নু তোর কাচে। লোকে যে কেন ছেড়েছে, সেই তথ্যটিই জানে না বৃন্দে। বৃন্দেকে তো কেউ বলতে আসেনি—তোরই বৌ টগর বলে গেছে বিন্দে আগে নিজে 'মন্দটি করে, তবে তারিনীমূর্তিটি ধরে ভাল করতে বসে। নিজে 'নজর' দিয়ে পরে নজর ছাড়ায়। নিজে ভূতে ধরিয়ে পরে ভূত তাড়ায়। নিজে ডান চুষে' পরে ঝাড়ান কাটান করে। এতদিনে তোর স্বরূপ জানা গেছে।'

না, বলে কেউ যায়নি।

অনঙ্গ ডাক্তার একদিন বলেছিল রাগ করে সব ফাঁস করে দেব। কোথায় ফাঁস করেছে কে জানে। বৃন্দের কাছে নয়।

ভিতরে ভিতরে ভাঁওতা আছে।

এখনো আছে। জানে, ভাল করতে না পারুক, মন্দ করতে পারে এখনো।

বসে থাকতে থাকতে বৃন্দের পেটের ভিতরটা জ্বালা করে উঠে। খিদের চোঁয়ান নাড়িতে ছাতু আর কাঁচালঙ্কা বিষ হয়ে ওঠে। বৃন্দে এই সময় ভাত ফোটার গন্ধ পায়।

টগরের রান্না ঘর থেকে বাতাসে ভেসে আসে।

ভাত ফোটার, খেঁসারি ডাল ফোটার আর কাছিমের মাংস সেদ্দর।

কিন্তু ওই রান্নাঘরটা কি টগরের?

বড় সাধ করে হাঁড়ি মাচান বসিয়ে বসিয়ে ধাপি গেঁথে গেঁথে বানিয়ে দেয়নি দুলোর বাপ বৃন্দের জন্যে?

বলেছিল—অ্যামন রান্নাশাল বানিয়ে দিনু তোকে, যে রানতে রানতে আর উটতে হবেনি। হাতের মাতায় সব পাবি। চুলোর গোড়ায় কাট খসি রাকতে এই এট্টু মাচান পয্যোন্তো বানিয়ে দিচি। নে কতো রাঁদবি রাঁদ।

খেতে ভালবাসতো, এনেও দিত তেমনি।

তখন তো ওই পাপিস্টি এসে ঘরে ঢোকেনি, দুলো মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরত। দুলো জল এনে দিত, মশালা পিষে দিত মাছ কুটে দিত। আর আহ্লাদে ডগমগ বাপবেটায় ভাত বেড়ে ডাক দিত আয়। খাবি আয়। পেট জ্বলে না?

৫

পেট 'জ্বলা' কি জানিস, তা' কী জানতো বৃন্দে? জানত না তবু বলতো। আর এখন?

জ্বলা পেটটা গামছার বিঁড়েয় চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বৃন্দে। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে। ওই ভাত ফোটার ডাল ফোটার মাংস সেদ্ধর গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

কবে একদিন, ওই শয়তানের বেটাটা কোথায় গিয়েছিল, বৃন্দে তাই সাহসে ভর করে এই দাওয়া

থেকে নেমে, ফণীমনসার বেড়া ডিঙিয়ে ওই টিপ্‌কল বসান উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, অ জবা! জবা! শোন একবার।

সেজ নাতনীটার নাম জবা।

বড়টার মতন অত হারামজাদা নয়। সেটির নাম পদ্ম। বৃন্দে বলে, 'শুদু পদ্যো না। পদ্যো কাঁটা।' তা জবা এসে দাঁড়িয়েছিল, কী?

বলতেচি, তোর মা কী আঁদবে র‍্যা বড় খাশা খোশবো বেইরেচে। কাচিমের মাংসো বুজি?

জবা বলেছিল, হুঁ।

তো আমায় এট্টুখানি দিতে বল্ না। এট্টু মালাখোলা যাতি হোক।

বেরিয়ে এসেছিল পদ্ম।

হেঁকে বলেছিল, বুড়ি কি বলতেছে র‍্যা জবা?

জবা ঢোক গেলে বলেছিল, মা মান্‌সো রাঁদতেছে তাই এট্টু চাইতেচে।

অ্যাঁ কী বললি? মান্‌সো চাইতে এসেচে। বুড়ির যে দেকি বড়ো নোলা। বলে দে মান্‌সো অ্যাতো সসতা না।

তবু মান খুইয়ে বলেছিল বৃন্দে, এট্টু দিলি কী তোদের অ্যাতো কমতি হবে। এ্যাতো খাবনা ভাতের উপুর অ্যাক হাতা ঢেলে দে' দে নক্ষীসোনা।

নক্ষীসোনা। জবা হেসে পালিয়ে গিয়েছিল।

আর ঘরের মধ্যে থেকে সমবেত হাসির আওয়াজ ভেসে এসেছিল, নোলাদাগীবুড়ি। অ্যাখোন নক্ষীসোনা বলতে এয়েচে। পাঁশ কেটে কেটে থুচ্চে আতদিন। যা বেরো। খৈরান নিয়ে নিয়ে নজোর দিতি আসবেনি বলছি। পদ্ম, জবা, ঘেঁটু, তিন ফুলের মুখেই তখন হাসির ধুম।

টগরের গলা শোনা গেছল, নজোর নাগা দব্যি পেটে সইবেনি পদ্যো, নোক চিমটে এট্টু তুলে নে পাঁদাড়ে ফেলে দে আয়। ফের এখোন মাতা গলাতে এইচিস বুড়ি? হায়া নাই? নাজ নাই? যাঃ। যাঃ।

যেন বেড়াল কুকুর তাড়াচ্ছে।

তা মরে মরে পুরানো চেনা পরিচিত বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেও তো এমনি। যাঃ যাঃ করে অবিশ্যি বাড়িগুলোই পরিচিত, মানুষগুলো সবই অচেনা অপরিচিত হয়ে গেছে। একদিন সামন্তবাড়ির দরজায় লাঠি ঠুকে ঠুকে গিয়ে জিগ্যেস করেছিল একটা ছোটমেয়েকে, তুমার নাম কী গো? তুমার বাপের নাম কী গো?

তো মেয়েটা চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, মা, মা, একটা ডাইনী বুড়ি আমায় নজর দিতে এসে কী বলচে সব।

টগরের রান্নাঘর থেকে—

ভাত মাংস চাইতে যাওয়ার দিনকে ঘরে ফিরে এসে বৃন্দে তার 'চণ্ডীর কুলুঙ্গীর' নীচে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকে বলেছিল, মা তুই যোদি সতোর হোস্ আর বিন্দে যোদি তোর কন্যে হয়, তো এই আতের মদ্যেই ওই হারামজাদির য-পুরী একগাড়ে হয়ে মরে কাট হয়ে থাক। না যোদি হয় তো তোকে টান মেরে ওই পানা পুকুরে বেসজ্জন দে দেব।

মাথা ঠুকে ঠুকে কপাল ফুলিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু দুঃসময়ে ইষ্টও বিমুখ হয়।

একদা যে দেবী বৃন্দের একডাকে সাড়া দেচে 'থানে' থেকে কত কানে নেচে, সেই দেবী বৃন্দের কালশিটে পড়ে যাওয়া টিপি কপালের দিকেও নীরবে তাকিয়ে বসে থাকে। ঘটের গায়ে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চোখ দুটো তো আবছা অন্ধকারে বিভীষিকার মত জ্বলে। চোখ তো জ্যান্ত।....

তবু—

পরদিন সক্কালেই টগরের ঘর থেকে হাঁসের ডিম ভাজার সুগন্ধ ভেসে আসে। তার মানে এখন সব

কটায় মিলে চা খেতে বসবে। লক্ষ্মীছাড়াটা রাতে ফিরেছে মনে হচ্ছে। লোকটা হাঁস চাষ করে, ঝুড়িঝুড়ি ডিম বাজারে বেচে আসে। আবার বাড়িতেও ঝুড়ি ভর্তি। যার যখন ইচ্ছে হচ্ছে ভেজে খাচ্ছে, সেদ্ধ করে খাচ্ছে।

পদ্মতো কাঁচাই মেরে দেয় কত সময়। পদ্মর প্রাণের পুতুল বেড়ালছাড়া 'মিশকালী'ই বোধহয় দিন দুটো চারটে খেয়ে পার।

এতবড় নিষ্ঠুর বেইমান হতে পারে মানুষ?

মাঝে মাঝে যে অবাক হতে হতে পাথর হয়ে যায় বৃন্দে।

বৃন্দেরই সর্বস্ব গ্রাস করে বসে আছে, অথচ বৃন্দেকে কুকুর বেড়ালের মত দূর দূর করা। কুকুর বেড়ালকেও মাছ ভাত মেখে মেখে, 'আয় আয়' তুতু করে ডেকে খাওয়ায়। হাঁস মুরগীকেও খেতে দেয় আর বৃন্দেকে খিদের জ্বালায় পেটে গামছা বেঁধে ঘুমোতে হয়।

দিনে দুটো ভাত ফুটিয়ে খায় বটে,—দুটো পান্তা রেখে দিলে চলে। কিন্তু বুড়ো হয়ে এক মরণ হয়েছে, পান্তা খেলেই পেট ভাঙবে, বমির উপর বমি।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কি আবার কাঠ কুটো জ্বেলে ভাত ফোটাতে বসতে পারে? জল আনতে হবে সেই পুকুর থেকে। ছোট্ট কলসীটাকে গামছায় বেঁধে ঝুলিয়ে বড় জোর দু'বার আনতে পারে, সে আর কতটুকু? ভাত রাঁধতে জল লাগে। ছাতু খেতে লাগে না।

দুলো মাকে 'ডাইনী' আখ্যা দিয়ে আলাদা করে দিয়েছিল বটে, তবু যতদিন বেঁচেছিল, বড় মেটে কলসী করে দু'এক কলসী জল এনে দিতো। তা' বৃন্দের কপালে তাও ঘুচল।

জগতে একটা ভাল লোক আছে এখনো, তাই ওই একবেলার ভাতটুকুও জোটে, সন্ধ্যেয় মাৎগুড় চালভাজার গুঁড়ো, ছাতু তেল নুন। লোকটা হচ্ছে সত্য মুদি।

মুদিখানাটা তার বড় নয়, তবে মনটা বড়।

আর ওই একটাই লোক যে বৃন্দেকে ভয় পায় না, ডেকে কথা কয়। অবিশ্যি ভয় পাবেই বা কেন? তিনকুলে আছেটা কে তার? যার জন্যে ভয় তরাশ? একদা সত্যর একটু উপকার করেছিল বৃন্দে।

সত্যর বাপের দোকানটা উঠে যাব যাব হয়েছিল, সেই সময় দোকানটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বৃন্দে।

তখন দুলোর বাপ মারা গেছে সবে, মন প্রাণ উদাস, সেই সময় বৃন্দে মুখুয্যে বাড়ি থেকে পাওয়া সেই দশ ভরির সোনার হার ছড়াটা দিয়ে দিয়েছিল সত্যকে। বলেছিল, এটা থেকে তুমি দোকানটা ফের তোলো।

সত্য ভয়ে ভয়ে বলেছিল, তোমার ছেলে জানতে পারলে, আমায় পুলিশে দেবে যে গো—

ক্যান্? মাগনা?

বৃন্দের যুক্তি এ তার নিজের পাওনা জিনিস। দুলোর বাপের দেওয়া তো নয়।

তা ছাড়া—জিনিষটা যে আছে, সেটা টের পেলেই তো হতভাগা মুখপোড়া ছলে বলে কৌশলে যে করেই হোক ওটা বাগিয়ে নিয়ে ওই সোহাগের বৌকে পরাবে। নচেৎ বৌ সর্বনাশীই কোন ফাঁকে চুরি করে নেবে। তার থেকে সত্যের দোকানটা জাঁকুক।

সত্য না হয় অসময়ে বুড়িকে দুটো ভাতের ব্যবস্থা করবে। মনে জানবে দোকানের আয়ে বিন্দেরও কিছু ভাগ আছে।

কিন্তু বলেছিল বলেই কি, সে কথা রাখবে সত্য, এমন ভরসা থাকার কথা নয়। দুনিয়াটাকে তো দেখছে বৃন্দে। না দিলেই পারতো। খেদিয়ে দিলেই পারত। বলতে পারত তুই যে সাহায্য করেছিলি, কে তার সাক্ষী আছে?

কিন্তু তা করে না সত্য।

দৈনিকের খাদ্যটা জোগান দিয়ে যায়।

একসঙ্গে দেবে কি? কে সামলাবে ইঁদুর আরশোলা? কখন হাত পা লেগে পড়ে যাবে। রোজের

রোজ চারটি চাল একটু নুন, নারকেল মালায় একটু সরষের তেল, আর কাগজের ঠোঙায় একটু ছাতু আর মাটির ভাঁড়ে একটু মাৎ গুড়।

ওই সত্যর সঙ্গেই যা দুটো কথা।

বৃন্দে বলে, আরজন্মে তুমি আমার বেটা ছিলে বাপ।

সত্য বলে, ও কিছু না। ও কিছু না।

লাজুক আছে লোকটা।

আসলে লোকটা ভালই।

প্রশংসায় লজ্জা পায় এমন লোক তো এযুগে বিরল। আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, নিজেই নিজের ঢাক পেটাবে এযুগে এটাই তো স্বাভাবিক। সত্যচরণ তা হলে এ যুগের মত নয়। সত্যচরণের আত্মপ্রশংসায় লজ্জা, সত্যচরণের একদা উপকার পাওয়ার বদলে চিরকালের কৃতজ্ঞতা। এটি না থাকলে বৃন্দেকে তো নির্ঘাৎ এতদিনের দুর্ভিক্ষের মড়ার মত চিমড়ে চিমসে মরতে হতনা!

তা'ছাড়া ওই দশভরি সোনার হারটার জন্যে কৃতজ্ঞতার সমীহ সম্ভ্রম যা ছিল তা তো ছিলই আর ছিল বিস্ময়ের সম্ভ্রম।

বৃন্দের হারান প্রাপ্তির মূল উৎসের ইতিহাসই সত্যকে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নম্র করে রেখেছিল। সত্যচরণ যে পেয়েছিল, তার মূলে বৃন্দের শুধু যে বদান্যতাই ছিল তা' তো নয়, স্বার্থও ছিল। পষ্টাপষ্টিই তো বলেছিল বুড়ি, ঘরে থাকলি তো ওই বৌ হারামজাদি চুরি বাটপাড়ি যে করে হোক হাতিয়ে নেবে। এ তবু জ্বেয়ান হবে সত্যর দুকানে বিন্দের কেচু অংশো রইলো বিন্দের অসময়ের জন্যি। অতএব এটা এমন কিছু মহত্বের নয়। আশ্চর্যেরও নয়।

আশ্চর্যের হচ্ছে বিন্দের হারটা পাওয়ার কারণ।

দেখে রোমাঞ্চ হয়েছিল সত্যর বিন্দেমাসি মুখুয্যেকর্তার মরে যাওয়া নাতিটাকে মন্তরের জোরে বাঁচিয়ে তুলল।

সত্য তো দেখেছিল নিজের চোখে।

৫

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠির সকালে মা দশভুজা যখন দালান আলো করে বিরাজমান, তখন কিনা রোল উঠল, রাতের মধ্যে কখন কর্তার তিন বছরের নাতিটা মরে তক্তা হয়ে আছে। মা ওঠাতে এসেছে নতুন জামা পরিয়ে কলা-বৌ নাওয়ানের সঙ্গে পাঠাবে বলে। বার উঠোনে ঢাকী-ঢুলিরা সেইমত ড্যাডাং ড্যাং করে ঢাকে কাঠি দিয়েছে, ঠাকুর দালানে নবপত্রিকার তোড়জোড়, হঠাৎ এই নিদারুণ সংবাদ।

থেমে গেল বাজনা বাদ্যি, উঠলো কান্নার রোল।

কর্তা উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে দালানে উঠে প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে করতে চীৎকার শুরু করে দিলেন, বল সর্বনাশী। বল কেন এমন কাজ করলি?

ইতিমধ্যে অন্যান্য জ্ঞাতির পাঁচ বছরের ছেলের মৃত্যু অশৌচ, ক'পুরুষ পর্যন্ত লাগে। পুজোর দিনগুলো তো তা হলে গেল। আর বলাবলি করছিল, ভয়ঙ্কর একটা কোনো অপরাধ ঘটেছে।

কিন্তু মা কি এমনই প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন?

শাস্ত্রে পুরাণে অবশ্য দেখা যায়, দেবদেবীরা মানুষের থেকে অনেক বেশী প্রতিহিংসা পরায়ণ, তাই বলে মা দুর্গা?

এই মুখুয্যে বাড়ির ঠাকুর দালানে যিনি তিনপুরুষ ধরে পূজিত হয়ে আসছেন ত্রুটিহীন আয়োজনে, চ্যুতিহীন নিষ্ঠায়।

ডাক্তার এসে তো রায় দিয়ে গেল।

কিন্তু ইত্যবসরে যে কে বা কারা, হয়তো বাড়ির ভৃত্যকুল, ডেকে নিয়ে এসেছে 'গুনীন্‌মাকে।

গুনীন্‌মার তখন ভাগ্যরবি মধ্যগগনে। এই মানুষই তো এই ক'বছর আগে বাদুলে মেয়ে দিদিমনির বিয়েতে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি বন্ধন করেছিল। এ বাড়িতে বৃন্দের বরাবরই আসা যাওয়া।

বাসিমুখে ছুটে এসেছিল বৃন্দে।

কিন্তু নিজেই জানে না বৃন্দে কী হয়েছিল।

আজ পর্যন্তই জানে না।

সেদিনের ঘটনা তার কাছে চির রহস্যাবৃত।

বৃন্দে জানে না সে কী করেছিল, তবে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা দেখেছিল, ঠাকুরদালানের নীচের বিরাট উঠোনের মাঝখানে খড়ির গণ্ডিকাটা খানিকটা জায়গায় মাঝখানে বড় বড় ক'খানা আঙ্গুট কলাপাতার উপর শোওয়ানো সেই মৃতদেহটার ধারে মাথা খুঁড়ে রক্ত গঙ্গা হয়েছিল বৃন্দে, আর সেই খড়ির গণ্ডি ঘুরে ঘুরে একটা মেটে কলসী ভরা মন্তরপড়া জল থেকে আঁজলা ভরে ভরে ছেলের মুখে গায়ে আছড়ে আছড়ে মারছিল।

গুনীনমা যে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে একাজ করছে, দর্শকরা অনুভব করছিল। সেই অনেক দর্শকের মধ্যে সত্যচরণও একজন ছিল। যুবক সত্যচরণ।

অবিশ্বাস আর উত্তেজনা, এই ছিল দর্শকদের মধ্যে।

ছেলের তরুণী মা কোথায় কোনখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল কে জানে, যুবক বাবা ঠাকুর দালানের নীচের সিঁড়িটায় দু'হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে বসেছিল, আর ঠাকুরদা প্রতিমাকে ঠেলে নড়াতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে এসে উঠোনে এই দৃশ্যের ধারে এসে বসে পড়েছিলেন। শুধু ঠাকুরদা, মুখুয্যে গিন্নী স্থির হয়ে চোখবুজে বসে জপ করে যাচ্ছিলেন। এতোলোক জমা হয়েছিল, এবং বিশেষ কারো মধ্যেই বিশ্বাসের ভাব ছিল না তবু জায়গাটা নিঃশব্দ নীরব ছিল। কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করছিল না।

শুধু মাঝে মাঝে গুনীনমার তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার মা! মা!.... ক্রমশঃ গলাটা ভেঙ্গে আসছিল।

বাড়ির বাইরে অনঙ্গ ডাক্তার কিছু লোকের কাছে বলছিল আর কতক্ষণ এ ফার্স চলবে? এবং যে বড় ডাক্তার 'মৃত' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বৈঠকখানায় বসে 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখে বিরক্ত চিত্তে বসেছিলেন কর্তাদের কাউকে দেখতে না পাওয়ায়।

হঠাৎ কী একটা ঘটল কে জানে।

তুমুল একটা কলরোল যেন আকাশ ছাপিয়ে অসীম শূন্যলোককে বিদ্ধ করল। ওটা সমবেত কণ্ঠের একটা জয়ধ্বনি।

হয়ত তার ভাষাটা ছিল, 'জয় মা'।

তবে সেটা বোঝা গেল না, শুধু ধ্বনিটাই পরিব্যাপ্ত হল।

কী হল?

চমকে উঠল ডাক্তার, আর অনঙ্গ ডাক্তার।

চমকে উঠল জনতা।

কী ঘটলো? আরো কোন অভাবনীয় মর্মান্তিক?

যিনি দশভুজা প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন আর দেবীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি করছিলেন, তিনি কি তাঁর সেই মহাপাপের শাস্তি স্বরূপ প্রাণ হারালেন?

অথবা—তরুণী মা ভাগ্যের এই অন্যায় আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে—এগিয়ে এলেন তাঁরা। এগিয়ে এসেছে তারাও, যারা এতক্ষণ যাকে বলে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়েছিল, আর এখন 'জয় মা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

এখন চীৎকার ধ্বনিটা হচ্ছে—চোখ চেয়েছে। চোখ চেয়েছে।

এই অবিশ্বাস্য শব্দে চকিত হয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে এল ছেলের দিশেহারা বাপ। আর ঘর থেকে উন্মাদিনীর মত এলোকেশ হয়ে বেরিয়ে এল মা।

কিন্তু এখন বিপদ।

ছেলেটাকে চোখ চাইয়ে, 'গুনীনমা' কি নিজে চিরদিনের মত চোখ বুজল? খড়ির গণ্ডির ধারে ঠিক মৃতের মতই তো পড়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

ততক্ষণে ছেলে শুধু চোখই চায়নি, উঠে বসতেও চেষ্টা করেছে।

কোন অপদেবতাকে মড়ার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল না তো? বলেছিল কেউ কেউ, যার মধ্যে অনঙ্গ ডাক্তার প্রধান। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের ঘটনা যারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী নয়, তারা কিন্তু এ কথাটা বিশ্বাস করছে। মৃতদেহে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব।

এমন কি এও মনে মনে ভেবে নিল কেউ, 'আচ্ছা পরে ছেলের ভাবভঙ্গী দেখেই বোঝা যাবে।'

আর বড় ডাক্তার এখন বললেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে এরকম রোগের আছে, যাতে রোগীর দেহে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে ওঠে।

ডাক্তার সেটা চিন্তা করছিলেন এতক্ষণ।

যাক এখন ছেলেকে ভাল করে ঢাকাঢুকি দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হক। যে ভাবে ঠাণ্ডা জল আছড়া দেওয়া হয়েছে, নিউমোনিয়া হতে কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ পরে বৃন্দেও উঠে বসেছিল।

ছেলেটাকেও বসিয়ে রাখা হয়েছে ঠাকুরমার কোলে। ভিতরে নিয়ে চলে যাওয়া হয়নি বৃন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গের আগে।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর বৃন্দে না কি ছেলেটাকে বসে থাকতে দেখে, হাউ হাউ করে কেঁদেছিল।

কে জানে কিসের এই কান্না।

বৃন্দেকে পাটের শাড়ি পরিয়ে গালচের আসনে বসিয়ে গলায় জবার মালা দিয়ে, কর্তা-গিন্নী দুজনে রীতিমত পুজোই করেছিলেন বলা যায়। অথবা এ যুগের ভাষায় সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করেছিলেন। অতঃপর মুখুয্যে গিন্নী তাঁর নিজের গলার দশভরির গোট হারখানা খুলে বৃন্দের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। কর্তা একখানা ফুলগিনি দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। আর বৌ বাক্স খুলে পুজোর কেনা নতুন বেনারসী একখানা নামিয়ে দিয়েছিল বৃন্দের পায়ের কাছে, ছেলে দিয়েছিল একগোছা নোটের তাড়া।

যে যেখানে ছিল নাটকের শেষ অবধি দেখেছিল।

যারা 'অপদেবতা' চালানের সন্দেহ পোষণ করছিল, তারাও ছেলেকে স্বাভাবিক কথা কইতে দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

সত্যচরণ ছিল সেখানে, কিন্তু সেই দলে নয়।

অভিভূতর দলে।

তা' তাও ছিল বৈকি কিছু। এমন দৃশ্যে অভিভূত হবে না। আর ব্যাপারটা তো প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। সাগর পুকুরের লোক তখন একেবারে অবিশ্বাসী হয়ে যায়নি।

তখন এই—

ঘটনার পর থেকে বৃন্দের বোলবোলাও যাকে বলে টপে উঠেছিল।

৭

দুলোর বাপ দূর থেকে দৃশ্যটা দেখেছিল।

সে তো অচ্ছ্যুৎ। সে তো আর পাঁচটা ভদ্রলোকের গায়ে গা দিয়ে দাঁড়াবে না। দূর থেকে দেখছে বৃন্দেকে মালা গলায় দিয়ে পাটের শাড়ি পরিয়ে কর্তা গিন্নী ছেলে বৌ সবাই প্রণাম করছে।

কী রোমাঞ্চ!

কী অদ্ভুত আবেগ উল্লাস!

বৃন্দে ঘরে ফেরার পর বোকাবোকা গলায় বলেছিল লোকটা, এখন তোর গায়ে হাত দিতি আমার ভয় নাগচে। মন নিচ্চে তোতে বুজি মা 'রুদ্দানী চোণ্ডীর' ভর হইচে। তো কেমন করি কী কল্লি বল দিকি?

বৃন্দে বলেছিল, আমার বোদ নাই।

আজ পর্যন্তও বোদ নাই।

তা' বোধ নেই বোধহয় সত্যচরণেরও।

নইলে বৃন্দের ছেলের বৌ যখন বৃন্দের নামে যথেচ্ছ অপবাদ দিয়ে দিয়ে তার 'গুণ ফাঁস' করে দিয়ে দিয়ে গ্রামের লোকের মন ঘুরিয়ে উল্টোমুখো বহাতে সক্ষম হয়েছে, তখনও সত্য নিজ বিশ্বাসের মত অবিচল আছে।

সে বোঝে বয়েস হয়েছে, এখন ক্ষমতা গেছে তা'বলে চিরদিনই বৃন্দে লোক ঠকিয়ে রেখেছে, একথা বিশ্বাস করতে নারাজ সে।

মুখুয্যে বাড়ির এই ঘটনার সময় হারু বাগদির মেয়ে টগর বালিকা মাত্র, দুলোর সঙ্গে মোলাকাতও ছিল না, তবু পরে দুলোর বৌ হয়ে এসে বলে বেড়ালো, উতো ওর নিজের কুকীর্তি! নিজে 'বাণ' মেরে বাচ্চাডারে খতম করে একে তৎপরে নোক সমাজে ঘটাপটা দেইকে বাঁচা করাল।

বাবুদের বাড়ি থে নিজেরা কেউ উকে ডাকতে এয়েছেলো? কোন্নোটা না। উয়ারই যডকরা লোক লোক গে খবোর দেচনো। বাণডা মোকখোম ছেলো, তাই সিটারে তোলা করাতে অত ঝালপিটাপিটি।

বালিকা ছিল টগর তখন।

তা' পদ্মও তো এখন বালিকা! সাপের চেয়ে সলুইয়ের বিষ বেশী।

বাপের সঙ্গে এসেছিল টগর।

হারু ফিরে যেতে যেতে বলেছিল, তাজ্জবডা দ্যাকালো বটে গুনীনমা।

মেয়ে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, ছেলেডা মরে নাই। শুধু ভিম্‌রি গেছল। মলে আর বাঁচাতি হর্তনি! ডাগদারে তো ঝেড়ে জবাব দে গেচলোরে।

দেক্‌কা যাক না ক্যানে। ঠিক দ্যাকে নাই। মানুষ জেয়ন্তোরে মাত্তি পারে, মড়ারে জেয়ন্তো কত্তি পারে!

বালিকা টগরের মুখে কথাটা হয়তো বেশী দার্শনিক শুনিয়েছিল। কিন্তু পদ্মও তো বালিকা। সাপের চেয়ে সলুইয়ের বিষ বেশী।

সত্যভাষিনী টগর পরবর্তী জীবনে, তার কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। জেয়ন্তোরে মারতে সক্ষম হয়েছে সে নিজেই। বৃন্দের জ্বলজ্বলাট গৌরিবমূর্তিটিকে সে ক্রমেই মৃদু বিষ প্রয়োগে জীর্ণ করে ধ্বংস করে ছেড়েছে।

৮

কিন্তু তখন গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে।

সেই ঘটনার পর থেকে একেবারে টপে উঠে গিয়েছিল বৃন্দে। শুধু এ গ্রামই নয়, নানাদিক থেকে লোক ছুটে আসতে শুরু করেছিল, দিকে দিকে সাগরপুকুরের 'গুণীনমার' নাম ডাক। "সাগরপুকুর" বিখ্যাত হয়ে গেল বৃন্দের মহিমায়। ... ষ্টেশনে ভিড় বাড়ে। আর রিকশাগুলোকে বললেই, সে বলে, 'ঠিক আছে বুঝেছি।'

সেই সময় দুলোর বাপ ঘরবাড়ি বাগান পুকুর করল, উঠোনে টিউবওয়েল বসাল, মনের মত করে রান্নাঘর বানিয়ে দিল বৃন্দেকে।

পেশার জন্যে বার ব্রত উপোস তিরেস অনেক করত বৃন্দে কৃচ্ছ্রসাধনের অনেক নিয়ম নীতিও মানত কিন্তু সংসারটি পুরো বজায় রেখেছিল।

ভরের সময় ছাড়া সে ঠিকই আছে।

'ভর' হওয়ার বাড়বৃদ্ধির পর থেকে, বৃন্দেকে আর লোকের বাড়ি ছুটতে হত না, লোকই ছুটে আসত।.... এমন কি স্কুলের ছেলেমেয়েগুলো পরীক্ষার আগে! চণ্ডীর ফুল নিয়ে যেত, নিয়ে যেত চণ্ডীর সেবিকার 'আশীর্বাদ।'

তা' এ একটা খুব বিরল দৃশ্য নয়।

আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে সেখানে, গাছ তলায়, বাঁশবনে এই সমারোহময় ভক্তির দৃশ্য দেখা যায়। একটা কিছু অলৌকিক শক্তির বার্তা পেলে হয়।.... আর আমাদের এই বঙ্গভূমিতে? সে তো বলে কাজ নেই। ... আজ দেখলে কেউ কোথাও পেতলের থালায় দুটো চারটে পয়সা রেখে চোখ বুজে বসে আছে, কাল দেখলে তার সেই বোজা চোখের ক্যাপাসিটিতেই থালায় পয়সা ধবছে না। ...অতঃপর মন্দির উঠল, দিনে দিনে সে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল, তারপর লোকের ভিড়ে অন্যলোকের রাস্তা চলা দায় হল।.... হয়ত ফলাও করে খবরের কাগজেও বেরোলো সেই বার্তা।

অহরহই এ দৃশ্য দেখা যায়।

মানুষ বিজ্ঞানের উন্নতি চরম সীমায় লক্ষ্যমাত্রা রেখে ছুটছে বলেই কি অলৌকিকের পিছনে ছুটবে না?

বৃন্দের ভাগ্যে তখন সেই মহালগ্ন এসেছিল।

দুলোর বাপ বলত দিনে দিনে তোর যা বোল বোলাও হতেচে বিন্দে, মন নিচ্চে তোকে নে কলকেতায় গিয়ে অ্যাকটা ঠাট্‌ বাট্‌ পেতে বসিগে।...তা'লে দালানকোটা বানিয়ে ফেলতি পারব।....

বৃন্দে উড়িয়ে দিত। বলতো শহরে বাজারের লোক এসবে বিশ্বে করে না কি? করেনি? বলতেতিস কি তুই? হুদো হুদো লোক আসতেচে না কলকেতা থেকে? 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' বাবুদের আপিসের লোকই কত আসতেচে। তুই তো ভরে' থাকিস কে আসতেচে যেতেচে খ্যাল করিস নাই।... তাই বলতেচি অ্যাকবার কলকেতায় নে গেলে—

বৃন্দের এতে তেমন সায় নেই। বৃন্দের বক্তব্য, এখেনডা হলো গে মায়ের থান। ঘটের পিতিষ্টে, এখেনছেড়ে ওন্যেত্তর গেলে কি আর মা উদ্দানী কেরপা করবে?

লোকটা বলত, আহা তোরে কি আর চাটি বাটি উঠিয়ে নে যেতে বলতেচি? কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের চাতালে কি কোনো মোহাশ্মশানের ধারে কাচে, হপ্তায় দু'দিন গে বসলি। তাতেই দেকচি—

হপ্তায় দু'দিন কোরে আমি কলকেতায় ছুটবো? এডা—অ্যাকটা কতা হোলো। আর এই বাবুরা যে রোজ দিন ছুটতেচে। মেয়ে লোকও ছুটতেচে আজকাল। শয়োরের লোক বিশ্বাস নে আসে না। মজা দেখতে আসে পরীক্ষা করতে আসে।

তো পরীক্ষেয় তো পাশ হবি তুই। ফাস্টো হয়েই পাশ দিবি।

বৃন্দে কেমন বিমনা হয়ে যেত।

বৃন্দের মনে হত এই তার বাঁশবন আর ফণী মনসার ঝাড়ের আড়ালে মনের মত ভিটেটুকু এই জোড়া নিমগাছ তলার কুঁড়েয় মায়ের ঘট পিতিষ্টে, এই শত শত ভক্তের পায়ের ধুলোয় পবিত্র হয়ে ওঠা উঠোন বাগান, এ সবের নড়চড় করলেই বুঝি বৃন্দে শক্তি হারিয়ে ফেলবে।.... আসলে যা কিছু করে বৃন্দে, আমি করছি, ঠিক এ বোধে করে না। যা করবে মা করবে মায়ের কি ইচ্ছে মা জানে এই সব বলে বলে অভ্যাস হয়ে গিয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে। তা ভয় হয় বুঝি ঠাঁই নাড়া হলেই বুঝি সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

হায় তখন যদি বৃন্দে সেই মানুষটার হিত কথা শুনতো! তা হলে হয়ত আজ এমন দুর্দশায় পড়তে হত না তাকে। .... সেই 'অন্যরকমই' তো হয়ে গেল।

কে জানে কোন মহাভাগ্যের বলে বৃন্দের হাত দিয়ে মরা পর্যন্ত বাঁচালো মা, বৃন্দের অবস্থা ফিরিয়ে দিল, আবার কোন কুটিল ভাগ্যের ফেরে বৃন্দে সর্বস্ব হারিয়ে কাঙালিনী হয়ে গেল।....

ওই মানুষডাই ছেলো আমার সৌবাগ্যো।

মনে মনে ভাবে বৃন্দে।

ও হতেই আমার অ্যাতো বাড়বাড়ন্তি, অ্যাতো বোল্‌বোলা।... ওরপরেই মা উদ্দানী এতো সদয় ছেলো ও মরার পর অবদি আমি সরবোস্বান্তো হলাম গো। হয়তো বৃন্দের কথাই ঠিক।

'ভুজুদা' নামের লোকটা বৃন্দের জীবনে খুব পয়া ছিল। তাই বৃন্দে ধুলো মুঠি ধরেছে সোনা মুঠি হয়েছে।

তবে—

ভুজঙ্গই ওই কালসাপিনীকে ঘরে আনার গোড়া।

বৃন্দে বলেছিল মেয়ে সোদ্দল বলে কি দুলো তোরে ধুয়ে জল খাবা?.... হেরোর আবস্তার ওই ছিরি। কিচু দেবেক থোবেক নাই।

ভুজঙ্গ হেসে বলেছিল, বেটার বোয়ের বাপের দ্যায়ায় থোওয়ায় পিত্যিসী তুই? তোর মা তোরে চেনে মেপে দেচ্চে না?

অস্বীকার করা যায় না কথাটা। অতএব—

অতএব যৌবন না আসতেই যুবতীর ধাক্কা ধরা রূপসী টগর, বৃন্দের বুকে জাঁতা বসাতে, এ সংসারে এসে প্রবেশ করলো।

ছেলের বৌকে প্রথম প্রথম ভুজঙ্গ খুব আদর যত্ন করেছিল, 'ছেলেমানুষ' ভেবে মায়াও করেছিল, এবং তাকে তার 'শাশুড়ীর মহিমা' সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলো, এটি কি বস্তু।

শ্বশুরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, পরিবারের লোকঠকালে ব্যবসা হতে সৌউর আমার বড়লোক বোলে প্যায়ে তো, তাই অ্যাতে ভোক্তি।....

তা কী আর করা?

একদিনে তো আর টগর বিষবড়ি খাইয়ে মারেনি শাশুড়ীকে? বড় হয়েছে, তিন তিনটে মেয়ের মা হয়েছে, এবং কেমন করে যেন বৃন্দের পাতানো সংসারখানাকে নিজের মুঠোয় ভরে ফেলতে শুরু করেছে। সেই সময় ভুজঙ্গ মারা গেল। দুম করেই গেল। চোখেকানে দেখতে দিল না বৃন্দেকে।

আর সেই শুরু হল টগরের পাড়া বেড়ানো।

অর্থাৎ বিষ ছড়ানো।

'নিজের সোয়ামীকেই যে আক্‌তে পাল্লোনি, সে জেবন বাঁচাবে ওন্যের? ক্যানো তোর জড়িবুটি গ্যালো কোতা? তোর উদ্দানী মা? হুঃ। সব ভুজুং।

৯

তখনি রাষ্ট্র হলো বৃন্দে লোক ঠকাতে নিজে 'মন্দ' করে তবে 'ভালো' করাতি দেখায়। রাষ্ট্র হলো—মুখুয্যেদের সেই বাচ্চা খোকাটাকে ঘরে বসে 'বিষবাণ' মেরে তারপর তাকে বাঁচাবার ভান করতে গেছিল বৃন্দে। ... অতোদিন আগের কথা, তবু লোকে টগরের কথাই বিশ্বাস করে ফেলল। ... তারা, অবশ্য আর গ্রামে নেই। সেই বছরই পুজোটি সমাধা করে মুখুয্যেরা গ্রামের বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় পাকাপাকি বাস করতে চলে গিয়েছিল। এমনিতে তো বেশীরভাগই থাকত, তবে পালে পার্বিনে, ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে আর ওই দুর্গোৎসবে আসতো।... দুর্গোৎসব উঠিয়ে দিল, নিজেদের আসা বন্ধ করে দিল। কেন কে জানে। ছেলে বেঁচে ওঠা সত্ত্বেও এই ডিসিশনে, কি জানি হৃদয় রহস্যের এ কোন্ রহস্য।

কিন্তু মুখুয্যেরা না থাকলেও গ্রামে ছিল তো অনেকেই। আর দীর্ঘকাল যাবৎ বৃন্দের প্রতি সমীহ আর কৃতজ্ঞতা নিয়েই ছিল। চিড় খেল সেই মনোভাবে। তারপর ভাঙন।...

তোমার আগুনলাগা ঘরে জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে তোমায় বাঁচিয়েছে বলে, যে পড়শীর প্রতি তুমি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত ছিলে, হঠাৎ যদি টের পেয়ে যাও আগুনলাগানোটা সেই পড়শীরই অবদান, মন যেভাবে ওলট পালট হয়ে যায়, সেইভাবেই ওলট পালট খেলো সাগরপুকুর গ্রামের মন।

ক্রমশঃই সবাই অতীতের খাতা উল্টে উল্টে টগরের কথার 'সমর্থন' আবিষ্কার করতে লাগলো, আর ওই একটা মুখ্যু অচ্ছ্যুৎ জাতের মেয়ে এতাবৎ এইসব বুদ্ধি রাগমান লোককে ঠেকিয়ে খেয়ে এসেছে বলে, আক্রোশে আর অপমানে বিকৃত হয়ে উঠল।.....

বৃন্দের কপাল তখন তার নিজের দেহতেও ভাঙ্গন ধরেছে।... বুকের বল চলে গিয়ে বুক গেছে ধ্বসে, যত্নের অভাবে শরীর যেতে বসেছে গুঁড়ো হয়ে। গ্রাম গ্রামান্তরের লোকেরও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এসেছে।..

চারিদিকেই তো নতুন উৎসাহের আবির্ভাব।

তখন 'রামদেবপুরের ফকিরের' বাড়বাড়ন্ত জাহির হচ্ছে।

অতএব বৃন্দে তলিয়ে যাবে, স্বাভাবিক।

দুলোর বাপ যে সাহায্য সহায়তা করতো—

তাড়িখোর দুলো তার সিকির সিকিতো করলই না। বরং একদিন টগরের প্ররোচনায় মত্ত অবস্থায় মাকে ভিটে ছাড়া করে ঢিবি জমির ওপর বানানো সেই 'চণ্ডীর কুটিরে' বসিয়ে রেখে এলো। শাসিয়ে এল খবরদার যদি আমার বেটিগুলানের ওপর নজর দেতে ও ভিটেয় উঁকি দিবি তো, তোকে ওই শ্যাওলা পুকুরে ডুইবে রেকে আসবো।

বৃন্দে রেগে কী বলল, আমায় এই শূন্যিঘরে একেথুলি, আমার জিনিষ পত্তর?

দুলো বলল, উসব তো আমার বাপের। তোর বাপের?

তোর বাপেরটা হোলো কমনে? আমার ওজগার না?

দুলো বলল, মানে দুলোর মাথায় ওটা নেশার রং বলল, তবে থানা পুলিশ করগা যা।...

কে করবে থানা পুলিশ?

কে লড়বে বৃন্দের হয়ে? কে বলতে আসবে ন্যায় কথা? কার দায় পড়েছে তাড়িখোর গোয়ারের সঙ্গে কথা কইতে আসতে?

বৃন্দে তো গ্রামের সকলের কাছে কেঁদে গিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু একটা 'শক্তির পতন' মানুষকে বড় বেশী সহানুভূতিহীন করে ফেলে। ... যেন সেই শক্তিকে বিশ্বাস করে এসে যে বোকামী করে এসেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করে।

মাটির খোলটায় পরিণত হয়ে আঁস্তাকুঁড়ে পড়ে রইল।

শুধু সত্য চরণ।

একটা ব্যতিক্রমের মত, নীরবে এসে বৃন্দের ভাঙা চালার নীচে মেটে দাওয়ার ওপর নামিয়ে দেয়। নিত্যদিনের সিধে।... একটু চাল, এতটুকু ডাল, একফোঁটা নুন, একছিটে তেল, দু'টো ছাতু, দুটো চাল ভাজা, দু'তিনটে গুলি গুলি আলু। একদা বৃন্দেকে যা খাওয়া অভ্যাস করিয়েছিল ভুজঙ্গ সেই অভ্যাসটার জন্যে অনেকদিন কষ্ট পেয়েছে বৃন্দে। এমন কি মান খুইয়ে ওদের গিয়ে বলেছে, ভাত দিস না দিস, অ্যাকটুক চা তো আমারে দিতি পারিস? নিজেদের অ্যাতো চায়ের র‍্যালা।

তখন টগর হেসে হেসে বলেছে, বসতি পেলেই মানুষে শুতি চায়। আজ তোরে অ্যাকটুক চা দিই, কাল তুই 'ভাত দে' বলে জুলুম কর। হুঁঃ। ক্যাঙালকে শাগের ক্ষেত দ্যাকাতে অ্যাচে।

টগর কেন এতো এমন করে ভেবে পায় না।

মনুষ্য চরিত্রে চির অভিজ্ঞ বৃন্দেও যে দিশেহারা হয়ে যায়। বুঝতে পারে না। বৃন্দের শক্তিকে ভয় করে বলেই টগর এমনভাবে তাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত ওই শক্তিকে

ভয় করে এসেছে, আর তাকে দাবাতে চেষ্টা করে এসেছে, এতোটুকু শিথিলতা দেখালেই যদি আপদ শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে টগরকে বিপদজনক অবস্থায় ফেলে।

কৈ-মাগুর মাছ কুটতে বৃন্দে নিজেই যেমন, তার চোখে মুখে নুন লাগিয়ে, মাথাটা ছেঁচে ছেঁচে নিস্তেজ করে ফেলে, তবে বঁটিতে দু টুকরো করে।

জিনিস কটা নামিয়ে রেখে সত্যচরণ বললো, মাসি, অসময়ে শুয়ে যে?

বৃন্দে উঠে বসে বলল, শরীলডে ভাল নাই। তা' তোমার আজ বিলম্বো?

আসলে বৃন্দে খিদেয় শুয়ে পড়েছিল। চালকটা না এলে তো ভাত রাঁধার উপায় নেই।

সত্য এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, শাক-টাক কিছু তোলোনি?

নাঃ। আজ আর মন নাই।

সত্য দাওয়া থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে একগাছা কাঁকুড় শাক, আর অ্যাতোটুকু একটু জালি কাঁকুড় তুলে এনে বলল, ন্যাও, উঠে রাঁধো। না খেলে শরীর ধুঁকবে।... আমার বাড়ি কাছে হলে, তোমার দুটো ভাতের ব্যবস্থা আমিই করতাম। সেই তো—নিজের জন্যে হয়। তো তুমিতো আর অতটা হেঁটে যেতে আসতে পারবে না।

বৃন্দে উঠে বসলো।

আহা! ভগমান আচে তালে অ্যাখনো।

তারপর বললো, না বাবা চলতে নারি।

ওই তো। নচেৎ দেখতে যেতে পারতে মুখুয্যে বাড়িটার এবার আবার কত জৌলুস ফিরেছে। ওদের বাড়ির পাশেই তো আমার ঘর।

বৃন্দে আবেগের গলায় বলল, কোন মুকুয্যে বাড়ি?

আহা মুখুয্যে বাড়ি আর কটা গো মাসি? ওই বাবুদের বাড়িই। তেনারা যে এবার আবার পূজো করছেন।

পূজো করচে!

বৃন্দের চোখের সামনে যেন একটা রং-মশাল জ্বলে ওঠে। অ্যাতোকাল বন্দো দে' আবার পূজো কবতেচে?

সত্যচরণের আজ রান্না করতে হবে না।

মুখুয্যে বাড়ির যে কেয়ারটেকার এযাৎকাল বাড়ি দেখাশুনো করে আসছে, সত্যচরণের সে বন্ধুলোক। সেও নিঃসঙ্গ। সত্যও তাই। তা আজ সে অফার দিয়েছে—আজ থেকে রান্নার লোক লেগেছে, রাঁধবে বাড়বে, বাবুরা এসে পড়বার আগে একটু পুরনো হতে. কেয়ারটেকার নিজে, আর কিছু 'লোকজন' খাবে। অতএব সত্যও যেন এসে বসে যায়।

সত্যর তাই আজ অনেক সময়।

দোকান বন্ধ করে এসে গল্প করতে বসেছে।

হয়তো বা বৃন্দের এই নিস্তেজ শিথিল ভঙ্গী, এই বলীরেখাঙ্কিত মুখ, নিভে যাওয়া কয়লার আঙারের মত চোখ আর হেরে যাওয়া চেহারাটা দেখে মুদির দোকানওয়ালা সত্যচরণের মায়া হল।

তাই বললো, বুঝলে মাসি, আজ আর আমায় হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না। আজ নেমন্তন্ন।

'নেমন্তন্ন' শব্দটা শুনেই বুড়ি বিন্দের বুকটা যেন উথাল পাথাল করে উঠল। কত বাড়িতে কত নেমন্তন্ন খেয়েছে বৃন্দে। যত জানা ঘর, তাদের ইষ্টপূরণ বাবদ খাইয়েছে, আবার কাজ-কর্মেও নেমন্তন্ন করেছে। তখন আবার বলেছে—ছেলেকে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসো মা।

এসব ক্ষেত্রে বড় একটা তা আনতো না বৃন্দে।

তার স্পেশাল খাতির থাকলেও, জাতের বিচারটাতো সমাজ সামাজিকতায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না? খেতে বসাবে নিশ্চয় অচ্ছ্যুৎদের সঙ্গে। বৃন্দে বলতো, অ্যাকটা লোক দিও মা, খাবার সঙ্গে নে যাব।

ওরা আসতে চাইবেনি।

বাড়িতে এনে তিনজনে একসঙ্গে খেতো। আর বাবুদের বাড়িব রান্নার তারিফ করতো। বিশেষ করে দুলো। বলতো, মাচ্-মানসো তো তুইও আঁছিস মা অ্যামন খোস্‌বো হয় না ক্যান বলতো?

ওনারা কতো তরিবৎ করে। আঁদুনী ঠাকুরে আঁদে।

বলে বৃন্দে নিজের ভাগের সবটা ছেলের পাতে তুলে দিতো।

যতক্ষণ সে ওই ক্রিয়াকলাপে আছে, ততক্ষণ যেন অন্য আর এক বৃন্দে। কিন্তু সংসার জীবনে বৃন্দে নামের মেয়েমানুষটা তো একেবারেই সাধারণ ছিল। স্বামী পুত্তরের প্রতি স্নেহশীল, সংসারে টান।

আর গাল মন্দ?

কেউ কোনোদিন শোনেনি তার মুখে। এক ভূতছাড়ানো মন্তরের মধ্যে ছাড়া।

জীবন্তেই কি প্রেতাত্মা হয়ে যেতে পারে মানুষ?

কিন্তু একটা সহজ মানুষ বৃন্দের সঙ্গে সহজভাবে গল্প করতে বসেছে দেখে বৃন্দে যেন অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যায়। উৎসাহের গলায় বলে ওঠে, বস্‌লে গো?

ওই তো মুখুয্যে বাড়ি। পর্শু আসবেন তেনারা আজ থেকেই রাঁধুনী ঠাকুর।

আসবেন তাঁরা।

এ দীর্ঘ পাঁচিশটা বছর পরে তারা আসবে। কিন্তু কারা কারা?

সত্যচরণ হাসে, সেই বুড়ো কর্তা-গিন্নী কখনো এখনো বেঁচে থাকে? এখন ছেলে বৌ। যেনাদের ছেলেকে তুমি জীবন দিয়েছিলে।

হঠাৎ বৃন্দের চোখে একঝলক জল এসে পড়ে। চোখ মুছে কষ্টে বলে, আমি কে? যা করেচে মা। তো তুই অ্যাখনো সে কথা স্মরোণে রেখেচিস বাবা? আর কোন্নো মানুষডা আকেনি। তো সেই ছেলেডা? আসে নাই।

আরে এসেচে বৈ কি।

সত্যচরণ জানায়, তার জন্যই না কি আসা।

এ বছরের এই দুর্গোৎসব তো তার নামেরই মানতি।

বুড়ো কর্তা-গিন্নী যে কী ভেবে এখানের পূজো তুলে দিয়েছিলেন তাঁরাই জানেন।

....কলকাতার বাড়িতে না কি ঘটে পটে পূজো করতেন, কর্তা মাবা যাওয়ার পর তাও উঠে যায়।

অথচ পয়সার অবধি নেই।

বিরাট ব্যবসা তো।

দালানের প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টায় মায়ের নাকি দশহাতের একখানা হাত খুঁতো হয়ে গিয়েছিল, কে জানে সেই অপরাধ বোধই কর্তাকে ওইভাবে চালিত করেছিল কিনা।

যাক সে তো অনেক দিনের কথা।

বর্তমানের ঘটনা—সেই মরেবাঁচা ছেলে বিলেতে পড়াশুনো করে ফিরেছে, এবং বিশেষ ঘটা সহকারে বিয়েও হয়ে গেছে। দেশে এই যে হবার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সেই বাবদ ছেলের মার এই মানত।

দেশে এসে একটা ঘটা করবেন, নতুন বৌকে দেশের পূজো দেখাবেন।

নিজের সেই বধূজীবনের আনন্দের স্মৃতির গল্প করেছেন, দেখাতে সাধ।

বলেছেন নাকি। গ্রামের লোক ত কেউ কোনো দোষ করেনি ছেলের নেমন্তন্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পূজোয় তার শোধ হোক। আমার নিজের বিয়ের সময় দেখেছি গ্রামসুদ্ধ লোক পাঁচদিন ধরে নেমন্তন্ন খাচ্ছে।

এখন অবশ্য খরচের হার অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু ব্যবসার আয়ও ত অনেক বেড়েছে। তাছাড়া বাপবেটা দুজনেই কৃতী।

এ সমস্ত গল্প শুনে এসেছে সত্যচরণ তার সেই বন্ধুজনের কাছে। কাজকর্মের অবসরে সে লোকটা

গল্প করতে সত্যচরণকে ডাকে। জমিদার বাড়ির নীচের তলায় কত ঘর কত দালান। এতোদিন পোড়া হয়ে পড়েছিল, এখন নতুন রং মেরামত হয়ে আবার পুরনো বাহার খুলেছে।

আমারে কেউ কয়না। আজ এই তুমি কইলে, তাই টের পেলাম।

বৃন্দে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কেমন দেখতে হয়েছে সেই খোকাডা, কত বড় হয়েছে দেখতে মন যাচ্ছে।

সত্যচরণ দুঃখের গলায় বলে, তুমি তো হাঁটতে পারোনা। তা একটা রিক্সা গাড়ি চেপে যাবে ক্ষ্যাপা?

বৃন্দে বলে, আমারে চেনবে? এডা আবার কেডা এলো, বলে দৌরানে গলাধাক্কিয়ে তাইড়ে দিবে।

সত্য জিভ কাটে।

ছি ছি। এ কী বলছো মাসি। তাঁরা সভ্য ভদ্দর শহরের মানুষ। এই সাগরপুকুরের লোকের মতন বেইমান নয়। পরিচয় দিলে, দেখো কত মান্য সম্মান করবে। কী বল? আজ এই এতো আহ্লাদ কোথায় থাকতো, যদি সেদিন—মরা ছেলে না ফিরে পেতো।

বৃন্দের বুকটা দুলে ওঠে।

বৃন্দে তবু নিজেকে সামলে বলে, আর বাচ্চা-কাচ্চা নাই?

নাঃ। ওই একটাই। সাধে বলছি—কী থাকতো তাহলে? কখন বিলেত ফেরৎ ছেলে, পরীর মতন বৌ, গ্রামের লোকেদের দেখিয়ে মুখটা বড় হবে কতো! তা তুমি বেঁচে আছো জানলে, নিশ্চয় তোমাকেও পূজোয় নেমন্তন্ন করবে।

বৃন্দে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, অ্যাকডা পেরানী ত এই বৃন্দেবুড়ির ছায়া মাড়ায় না। যাই তুমি ছেলে—তাই এখনো পেরানটা আছে।

সত্যচরণ ভাবে, ওনাদের কানে তুলতে হবে—সেই গুণীন মা এখনো বেঁচে আছে। তবে স্বামীপুত্তুর হাবিয়ে আর ছেলের বৌয়ের দুর্ব্যবহার বড় দুঃখে কষ্টে আছে। তাঁদের তো হাত ঝাড়লে পর্বত, যদি বুড়ির 'শেষ কালে' একটু সুব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

সত্যচরণ এর মধ্যে কোনো অযৌক্তিক দেখতে পায় না। ভদ্র মানুষের মধ্যে তো কৃতজ্ঞতা থাকবেই।

এই যাঃ। তোমার দেরী করে দিলাম মাসি। নাও নাও রাধো।

বলে সত্যচরণ চলে যায়।

কিন্তু বৃন্দের আর উনুন জ্বালতে গা ওঠে না। বৃন্দে ভাবে, সেজের কালে ভাত এঁদে খাবো অখন।

অতএব বৃন্দে সেই ছাতু কটাই জলে গুলে গুড় দিয়ে খেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে ছেঁড়া মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু রাতে ঘুম আসে না বৃন্দের তা দুপুরে।

অন্যদিন যদিবা একছিটে 'ভাত ঘুম' হয়, আজ তো তাও নয়। বৃন্দে সেই বাবুদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে বসে।

১০

বৃন্দে পঁচিশবছর আগে ফিরে যায়।

মুখুয্যেদের নব আবির্ভাবের উদ্যোগে গ্রামে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। যদিও আজকালকার ছেলে মেয়েরা কোনো ফালতু ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করাকে খেলোমি মনে করে, এবং এতোদিনের অবহেলিত জীর্ণ দশাগ্রস্ত প্রাসাদটায় মিস্ত্রীর হাত পড়েছে দেখেও, তাকিয়ে দেখে না। তবু এই মেবামতীতে আর রং করণে কত খরচা হতে পারে, তার একটা সম্ভাব্য হিসেব মনে মনে কষতে থাকে অনেকেই।

খরচা যে রীতিমতই হবে তাতে সন্দেহ কি?

এখন বয়স্ক মহলে জল্পনা-কল্পনা—এতো খবচের কারণটা কি? তবে কি ছেলে বৌকে কলকাতার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্তা গিন্নী নিজেরা এখানে এসে বসবাস করতে চান?

বিলেত আমেরিকা ফেরৎ ছেলে আর আধুনিক বৌ-এর সঙ্গে হয়তো বনছে না। আরে রেখে দাও তোমার বিলেত আমেরিকা ফেরৎ। কলকাতার রাস্তায় মুঠো মুঠো গড়াগড়ি যাচ্ছে।' না বনলে এমনিই বনছে না।

কিন্তু এখানে এসে বাস করবে কি করে, প্রসূন মুখুজ্যে তো এখনও সার্ভিসে। তা'ছাড়া অতো সব ব্যবসা।

তাতে কি? পয়সার তো অভাব নেই। ওদের জন্যেই তো পেট্রল। রোজ গাড়িতে যাওয়া আসা করবে। ক'মাইলই বা রাস্তা। বড়লোকেরা এমন করে আজকাল।

নাকের সামনে হঠাৎ এক বড়লোক এসে বাস করতে বসলে, ব্যাপারটা খুব সুবিধের হবে না।

তাতে তোর আমার কি?

তা অবিশ্যি। আমরা তো আর 'বাবু' এসেছেন বলে প্রজার মত জোড়হাতে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি না।

কেউ কেউ যাবে দেখিস। বুড়োরা তো নির্ঘাৎ। সেই পুরোনো প্রেম ঝালাতে যাবে।

কে যেন বলছিল, শুধু ধূমধাম সহকারে পূজো করে চলে যাবে!

গেলেই ভালো।

আচ্ছা শুধু চারিদিনের জন্যে এতো খরচা?

বড়'লোকি দেখানো। আর কিছু নয়।

মুখে ঔদাসীন্য দেখালেও, তলে তলে উত্তেজনা আছে।

কথাটা সত্যিও।

যদি বাসই না করে, চারদিনের জন্যে এতো খরচা? বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকে তো।

হয়তো বাড়াবাড়িটা বেশিই হয়ে গেছে।

কণ্টাক্টর লাগিলে কাজ তো।

তবু—

বাড়ি সম্পর্কে একটা অপরাধবোধ পীড়িত করছিল বোধ হয় বর্তমান মালিককে। টাকার অভাব তো নেই সত্যি, অবহেলায় পিতৃপুরুষের ভিটেটা পড়ে যাবে? তাছাড়া নতুন বৌকে দেখাবার বাসনাটাও পেয়ে বসেছিল নতুন বৌয়ের শাশুড়ীর। এ পুরনো গড়নের বাড়িরও কত বাহার বুঝুক। পুরনো নামেই তো নাক তোলে সব।

বাড়ি সারানো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল—আসল ঘটায়, মুহূর্তে মুহূর্তে চমকাচ্ছে সবাই।.... লরী চেপে কুমোরটুলীর ঠাকুর এলেন, সেটা এমনত কিছু না। 'সাগরপুকুর বান্ধব লাইব্রেরীর' সর্বজনীন দুর্গোৎসবেও কলকাতা থেকে ঠাকুর আসেন। কিন্তু প্যাণ্ডেল? ডেকরেটিং? আলোকসজ্জা? কেটারিঙের ব্যবস্থা?

পুজোর ভোজে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা। এটা এখনো হয়নি এখানে।

গ্রামসুদ্ধ নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে।

মাঝখানে একদিন গাড়ি করে এসে প্রসূন মুখুয্যে বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন করে গেছেন। এ সেকাল নয় যে, নায়েব গোমস্তা দিয়ে নেমন্তন্ন হবে।

মা দুর্গার ছবি আঁকা নিমন্ত্রণ কার্ডটা বাঁধিয়ে রাখার মত।

পঞ্চমীর দিন সাত আটখানা গাড়ি করে কলকাতা থেকে এসে গেল, নতুন বৌ ও আত্মীয় স্বজন। সেই সব গাড়ির সারি আসতে লাগল বৃন্দের বাড়ির সামনে দিয়েই।

শুধু আজ নয়, ক'দিন ধরেই আসছে গাড়ি, ট্রাক। যেন রাজসূয় যজ্ঞ। আসল কথা সকল জিনিস কলকাতা থেকে আনানোর ব্যবস্থায় সমারোহের ব্যবস্থাটা এত প্রকট দেখাচ্ছে।

টগরের বাড়ির লোকটার প্রকৃতপক্ষে ঘরামির কাজ।... পুজোটুজো বা বিয়ে থাওয়ায় সে রীতিমত 'ব্যস্তমানুষ।' আর এই উপলক্ষে তো বিরাট বায়না পেয়েছে সে। সবকিছু কলকাতা থেকে এলেও, বাঁশ দড়িগুলো এখানেরই। এবং দুচারটে ঘরামিও নেওয়া হয়েছে ডেকরেটারের নির্দেশে।

জবা, পদ্ম, ঘেঁটু ওদের মধ্যেও তাই উৎসাহ উত্তেজনা।

ওদের নাকি নবমীর দিনে খেতে যাবার কথাও আছে।

বৃন্দের কানে মাঝে মাঝেই ওদের কথার টুকরো ভেসে আসে ... কী খাওয়াবে রে বাপটা?

আমারে বুজি বলে থুয়েরে?

বেস্তর ঘটা? তাই না রে। তুই কটা মাচ খাবি জবা?

অ্যাক কুড়ি, দুকুড়ি। তুই?

দশকুড়ি।

দুর, পেট ফাট্যা অক্কা পাবি।

মা, তুই যাবিনে?

যাবো না ক্যানে?

শুদু বুডি পডে থাকবা। হি হি।

তো তুই কোলে ধরে নে যাস।

হি হি হি।

ওদের ওই হাসির আওয়াজটা বড় অসহ্য লাগে বৃন্দের। কান চেপে শুয়ে থাকে। পঞ্চমীব দিন একেবারে সিধে দিতে এসে উৎফুল্ল সত্যচরণ বললো, আজ সবাই এসে গেছে মাসি, আমাব বন্ধুকে বলে রেখেছি ওনাদের জানাতে।

বৃন্দে আজ ক'দিন ধরে আয়োজনের বহর দেখছে। আব কখনো কম্পিত, কখনো স্তিমিত, কখনো উত্তাল, কখনো স্মৃতি মর্মরিত।

মনে পড়ছে—মুখুয্যে কর্তার মেয়ের বিয়ের সেই 'বিষ্টিবন্ধন।'

চওডা লালপাড় তাঁতের শাড়ি প্রণামী দিল গিন্নীমা, কত মান্য, কত আদর। ছেলেব বিয়েতেও সাতদিন ধরে চলেছে খাওযা মাখা।

আর সেই ভয়ানক দিনে?

সেই ছবিটাই ঘুরিযে ফিরিয়ে দেখছে বারবার। গাড়ি করে কারা যেন সব এলো। ওব মধ্যে কি সেই ছেলেটা ছিল?

এখন বৃন্দে কিঞ্চিৎ স্তিমিত।

কারণ দুলোর মেয়েদের হি হি টা যেন এখনো বাতাসে ভাসছে।

বলল, কী জানান করবো?

এই—সত্য, একটু ঢোক গেলে বলে, তুমি এখনো বেঁচে বর্তে আছো, সেইটাই আর কি। বন্ধুকে বলে এসেছি—সে যা বলবার বলবে। চারটে রিকশাগাড়িকে ওরা রাতদিনের ভাড়া করে রেখেছে দরকার লাগতে—এক সময় তোমায় তারই একটায় চড়িয়ে—

বৃন্দে মলিন হাসি হেসে বলে, 'তোর যে বাবা গাচে কাঁটাল গোঁপে ত্যাল।'

আহা কাঁঠাল পাতে নাবছে দ্যাখোনা। জানতো না গিন্নীমা—যখন জানবে তুমি এখনো আছো, দেখে কী আহ্লাদ করবে।

তেনার কি অ্যাখনো সে কথা স্মরোণে আচে?

স্মবণে নেই? কী বল মাসি?

বলে যায়। তার কেয়ারটেকার বন্ধু তাকে অনুরোধ জানিয়েছে তিন চার দিনের মত দোকান বন্ধ করে ওখানে থাকতে। কাজের লোক, অনেষ্ট লোক। সত্য ভেবেছে, ভালই হয়েছে।

সত্য সেখানে থাকলে মাসির স্বামী একটু ভালমত ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে বলে বলে।

দিন কেটে যায় পাথরের ভার নিয়ে।

কোথায় কে?

'কী আহ্লাদের পসরা নিয়ে কি তবে, সেই ছেলের মা নিজেই আসবে? আজ যিনি গিন্নীমা! হয়তো তাই। তা সময় তো নেই, তাই এতো দেরী। রাত হয়ে যায় দাওয়া থেকে নড়ে না বৃন্দে।

ভাবে কতবড় বিরোদ কাজ মাতায়, তিনির কি সয়োজে অব্‌কাশ হবে? আত্‌ করেই আসা করবে।

রাত করে?

কিন্তু কত রাত?

সন্ধেবেলা ভাত রেঁধে খাবার কথা।

দুপুরে তো ছাতুগোলায় কেটেছে। কিন্তু কাঠকুটো ধরাতে সাহস হয় না। যদি তখনি এসে পড়ে? ধুঁয়ো লাগবে।

আর—আরও একটি ক্ষীণ আসা।

ঘটার বাড়ি থেকে আসবে, শুদু হাতে কি আর আসবে? 'ভালমন্দ' কিছু আনবে হয়তো। মিচিমিচি ভাত ক'টা খেয়ে খিদে নষ্ট করে বসে থাকবে?

১১

শুক্লাপঞ্চমীর রাত। মৃদু জ্যোৎস্না ঠাহর হয় না কত রাত। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে বৃন্দে?

মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে কথাটা তুলল টগর।

বলল, পদ্মোটা কেঁদে মরবে।

লোকটা বসে বসে একটা জবা ফুলের মালা গাঁথছিল।

বলল, চুপ! একদম চুপ! টু শব্দোটি না।

পেরাণ তুল্যি তো? তাই বলতেছি, আর কোতাও পেলি নাই?

পেলে তোরে বলিনা?

আকাশে তো চাঁদের আলো ফুটফুটি। ভয় লাগছে।

—তুই থামবি?

ওর দাবড়ানিতে টগরও থেমে যায়।

দুলোকে সত্যকার বিয়ে করা স্বামীকে ফুঁ দিয়ে ওড়াতো টগর। কিন্তু একে ভয় করে। একে বোঝা ভার। কখনো মাথায় তোলে, কখনো পায়ে ছ্যাঁচে। মেয়েগুলোও তাই ওকে কখনো বাপটা বলে আদর কাড়ায় কখনো যমের মত ভয় করে।

মালাটা সরিয়ে রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে লোকটা বলল, শয়তান বুড়ি রাত দুপুর অবদি দাওয়ায় বোস করে ছেলো ক্যানো বল দিকি?

টগব জানবে কেমনে? বাজনা বাদ্যির আওয়াজ আসতেছে তো, তাই শুনতে যে হবে।

বাজনা বাদ্যি। হুঁ কানের কত জোর!

শোয়াপল্লি যে? ঘুইমে পড়বি না তো?

লোকটা উঠে বসে বলল, ফের কথা? বলছি না চুপ!

টগর ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে। ভান দেখায় ঘুমিয়ে পড়ছে।

কিন্তু ঘুম কি আসবে? আসতে চায় না।

আচ্ছা টগরের তো ভরপেট তবে ঘুম না আসার কারণ কি?

ঘুম না আসতে পারে বৃন্দের। পেট খালি।

দাওয়া থেকে উঠে এসে বৃন্দে সত্যর দেওয়া সেই জালি কাঁকুড়টা বঁটিতে ফেঁড়ে নুন ঠেকিয়ে খেতে গিয়েছিল। খেতে পারা গেল না। তেতো হাকুত্।

কাঁচা চালই দুটো নিয়ে চিবিয়ে খেতে গেল, তাও হল না। শুধু মাড়ির জোরে জব্দ করতে পারল না তাদের। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে, তলানি গুড়টুকু মুখে দিয়ে ঢকঢকিয়ে খানিকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

ভাবনা, রাতে তেষ্টা পেলে খাবে কি।

আর তো জল নেই।

মরুকগে। রাততো পোহাবে এক সময়?

মনে হচ্ছে সত্যর বন্ধু কথাটা তেনাদের বলতেই ভুলে গেছে। সত্য ঠিকই বলেছে, গিন্নীমার কানে উঠলে নির্ঘাত লোক পাঠাতো..... হ্যাঁ লোকই পাঠাবে। বৃন্দের যেমন মরণ, তাই ভেবে মরেছে তিনি নিজে আসবে। তাই কখনো হয়। একি যে সে লোক।

মরতে ভাত কটা বাঁধল না বৃন্দে। ন্যাও অ্যাখোন মরো পেটে কিল মেরে জ্বলে মরো।

আচ্ছা বুড়ো হলে এতো ক্ষিদে পায় কেন?

বয়সকালে মায়ের নামে কত উপোস করেছে বৃন্দে, কই এমন তো হয়নি, টেরও পায়নি। সারাদিন উপোস করে মাঝরাত্তিরে উঠে শেকড় তুলতে গেছে। হঠাৎ বিড়বিড় করে নিজে নিজেই বলতে থাকে বিন্দে...

'বশ করার' ওষুধের কত খিরকেল!

আমাবস্যের দিনে নেজ্জলা উপোসে থেকে মাজ আত্তিবে গে পুকুরে ডুব দে, ভিজে কাপড়ে এলো চুলে শেকড় তুলে নে এসে। আতের মদ্যেই তারে বেটে পানের পাতে মাইকে থোও.... সেই পানটি চুন সুপুরি কপ্পুর দে সাজ করে নোকটারে খাওয়াও। ব্যস। সে তোমার পায়ে পায়ে ঘুরবে। করিচি তো এসব। কতো করিচি।

আচ্ছা।

নির্বুদ্ধির ঢেকি বিন্দে ছেলের বিয়ে হতে হতেই বৌটাকে কেন বশ করার পান খাওয়ায়নি? পেরথম পেরথম তো বৃন্দের পানের বাটা থেকে পান খেতে খুব তৎপর ছেলো বৌ।

দ্যাক্ তোর, না দ্যাক মোর।

বাটা খুলে পান নে দৌড়। আহা সেই মহালগ্ন হারিয়েছে বৃন্দে। আর উপায় নেই। আর শক্তিও নেই। একদিন তো বৃন্দে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ওই লোকটাকে 'বাণ' মারতে পারলো না, ঘাম ছুটে গেল, হাত পা কাঁপতে লাগল। বুক 'উৎলোতে' লাগল।

জেগে থাকতে থাকতেই কখন যেন স্বপ্নের শিকার হয়ে গেল বৃন্দে।

এই স্বপ্নের মধ্যে কত লোক, কত মুখ। চেনা অচেনা।

যেন—সেই উঠোনটায় আবার গিয়ে বসেছে বৃন্দে। পরনে পাটের শাড়ি। গলায় জবার মালা। ঝলমলে ঝকমকে গিন্নীমা বলছে আপনার হতেই তো সব মা। আপনি যদি সেদিনকে ওর জীবেনটা ফেরৎ না দিতেন কিছু হতো? ওরা সভ্য। ওরা 'আপনি' করেই কথা বলে।

কর্তা বলবে, জানতুম না আপনি বেঁচে আছো। জানলে আপনারে সকলের আগে নে আসতুম।

আর সেই খোকাডা? সেও এসে—

কিন্তু কোথায় সে? এরা কারা? এরা তো সেই বুড়ো কর্তা গিন্নী?

আর ওই বৃন্দে?

কালো চুলের ঢাল। মাজা মাজা রং। মাজা গড়ন। চকচকে তেলতেল মুখ। খাড়া হয়ে বসে আছে। ও কোন বৃন্দে?

সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে বৃন্দের। স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান তাকে কিছুতেই বাগিয়ে ধরতে পারছে না। অতীতের মধ্যে গলে গলে মিলে যাচ্ছে সেটা।

সারারাত বাজনার আওয়াজ আসছে।

কিন্তু এ বাজনা কি পূজোর বাজনা? ফিনফিনে গান, ঝিনঝিনে সুর।...

একে তো বলে মাইকের গান।...

হঠাৎ একসময় বেজে উঠল পূজোর বাজনা।

ঢাকে কাঠি পড়ল।....

ভোর হলো নাকি? তাইতো। কলাবৌ নাওয়াতে যাবে তবে এখন। টাকীঢুলি ঘুম ভেঙে উঠেই দিয়েছে দুটো ঘা। যাতে সবাই জেগে ওঠে।

বৃন্দেও উঠে পড়বে নাকি?

এই পথ দিয়েই তো বড় দীঘিতে যাবে ঢাক ঢোল বাজিয়ে সমারোহ করে, কলাবৌ নিয়ে।

আর বৃন্দেকে দেখতে পেয়ে বলে উঠবে। ইস তাইতো—বড্ড ভুল হয়ে গেছে মা, আপনাকে বলতে আসি নাই।

কিন্তু উঠবে কি হাত পা উঠছে না।

মাথাটা লট্‌কে পড়ছে। কালকের উপোসটা বড্ড লেগেছে।

আচ্ছা! বাজনাটা বেজেই থেমে গেল কেন? গোলমাল কিসের?

কোথা থেকে এমন রে রে, শব্দ আসছে?

শব্দটা বৃন্দের কুঁড়ের দিকেই আসছে যে। কাছে, আরো কাছে। আরো।—একেবারে দরজায়—

কী বলছে ওরা?

অতোগুলো লোক।

কোথায় সেই হারামজাদি বুড়ি।

টেনে বার কর। পিটিয়ে লাশ করে ছাড।

মেরে তক্তা বানিয়ে দে!

এই শয়তানী বুড়ি, বেরিয়ে আয় বলছি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো বজ্জাতি। এই বিন্দে! বিন্দে! বেরিয়ে আয় শীগগির!

তারমানে বিন্দেকেই খুঁজতে এসেছে।

কিন্তু এই কি নেমন্তন্ন করতে আসার ভাষা।

বৃন্দের দরজায় এতো গোলমাল, কিন্তু যাদের বাড়ি সমারোহ হবার কথা, সেখানে এক নিথর স্তব্ধতা। যেন এই আড়ম্বর আয়োজনে উদ্দাম উত্তাল হয়ে ওঠা প্রাসাদটায় হঠাৎ কোন দৈত্য এসে মরণ কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে গেছে।

এই ভয়াবহতায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বর্তমানের গৃহকর্তা প্রসূন মুখার্জি, সেই পঁচিশ বছর আগের এক দুর্গাষষ্ঠির ভোরের মত, ঠাকুর দালানে ওঠবার সিঁড়ির শেষ ধাপটায়। আজ আর দুহাতে মুখ ঢাকা নয় বটে, কিন্তু মুখের উপর যেন অদৃশ্য এক কঠিন আবরণ। বোঝা যাচ্ছে না মনোভাবটা কি।

দালানের উপর ধারের দিকে বসে আছেন বর্তমান গৃহিণী মীরা মুখার্জি। পাচিশ বছর আগের সেই দুর্গাষষ্ঠির দিনটায় যে মেয়ে কোথায় যেন পড়েছিল অচৈতন্য হয়ে। এখন তার মুখে একটা স্থির সংকল্পের আভাষ।

বাড়িতে একটি নবদম্পতি আছে, তারা কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না।

তবে সাহস করে এগিয়ে এসে স্তব্ধতা ভাঙছে না। মরণকাঠির প্রভাবটা অবহেলায় মুছে দিয়ে 'জীয়নকাঠির' সন্ধান এনে দিচ্ছে না।

উঠোন ভর্তি ডেকরেটারদের চেয়ার পাতা আছে. উঠোনের চারদিক বিচিত্র আর বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত।

মোটেই না। তবে চিরকাল এসব চলেও তো আসছে। ও নিয়ে তাল ঠোকার দরকার কি? কখনো ওদিকে যাবে না তুমি।

দৃশ্যটার বীভৎসতায় তার গা গোলাচ্ছিল।

দু'জনেই তাই আবার শয়নকক্ষেই ফিরে গেছে। সেখানে হয়তো দেশের এই সব কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে।

১২

গুঞ্জন ধ্বনি উঠল চারিদিক থেকে।

বোধন বসে গেছে, মহাপূজার সব আয়োজন সম্পূর্ণ, আর এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। অপূজিতা মাকে ঠাকুর দালানে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়া! এ কী একটা কথা হল?

মীরা মুখার্জি সংকল্পে অটুট। বলছেন—

আমারই অন্যায় হয়েছিল, পুজোর সাধ করা। শ্বশুর শাশুড়ী যখন তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে ঠাকুর আব এ বাড়িতে পুজো নেবেন না। খরচ অপচয় হলো অনেক। তা সেটা ভুলের খেসারৎ বলে ধরতে হবে।.... গাড়ির ব্যবস্থা করা হোক্, আমি এখুনি খোকাকে বৌমাকে নিয়ে চলে যাব। .... আপনাদের ছেলের ইচ্ছে হয়, শান্তি-স্বস্তেন করে নিয়ে করুন পুজো।

ছেলে দাঁড়িয়ে উঠলেন একটা অ্যাবসার্ড কথা, বলার কোনো মানে হয় না।

আমার থাকাটাও অর্থহীন।

তা'হলে প্রতিমা?

ঠাকুর মশাই তো রইলেন। যা করবার করবেন। খরচার টাকা রেখে যাচ্ছি। এই সব সাজ গোজ? ডেকরেটাররা খুলে নিয়ে যাবে। তাদের পাওনা তো পেয়েই গেছে।

আর কেটারাররা?

যা এনেছে উঠিয়ে নিয়ে যাক। লোকসান পুষিয়ে দেওয়া হবে।

সকলেরই সব লোকসান পুষিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু আশাহত নিমন্ত্রিত গ্রামবাসীদের?

তাদের কথা কেউ ভাবছে না।

'লৌকিকতার' ভারবিহীন তিনদিন ব্যাপী একটা নিষ্কণ্টক নিমন্ত্রণের আশায় যারা দিন গুনছিল।

কি আর করা। তাদের কপাল।

তাবা অতঃপর কিছুদিন ধরে এঁদের এই আচরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে ডিবেট চালাবেন। আর নতুন রং কবা বুড়ি বাড়িটা আবার ধীবে ধীরে রং হারিয়ে বার্দ্ধক্যের চেহাবায় ফিরে যাবে। আর যে কখনো আসবে এরা এমন মনে হয় না। তবে বাড়িটাকে একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে শোধন করে যাওয়া দরকার।

কে বলতে পারে, ওই মৃত কালো বেড়ালের আত্মা ওঁদের পিছু পিছু ধাওয়া করবে কিনা।... অলক্ষ্যে ওঁদের মোটরেও উঠে বসতে পারে।

'কালো বেড়ালের আত্মা' একটা পৃথিবী জানিত ভীতির বস্তু।

তা' করতেই যদি হয় তার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হোক।

এ বাড়িতে যখন রান্নাবান্না হবে না। বেলা হলে অসুবিধে।

কিন্তু সেই বুড়িকে এখনো এনে ফেলছে না কেন?

ধরে হোক বেঁধে হোক।

মারতে মারতে, তাকে তার 'তুকতাক' তুলিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করতে হবে। অতঃপর জায়টাকে গোবর গঙ্গাজল এবং অগ্নিশুদ্ধ করে নিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়ন যাহোক একটা কিছু করে ছেড়ে দেওয়া মুখুয্যে পরিবারকে।

কিন্তু কোথায় সে ভয়ঙ্কর অপরাধের নায়িকা?

তাকে নিয়ে এসে হাজির করছে কই?

না তাকে আর হাজির করে উঠতে পারেনি ওরা। যাদের ধরে আনতে পাঠানো হয়েছিল। মহেআহে গিয়েছিল যারা, স্বভাবতঃই তারা ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার দল।... বেঁধে আনার হুকুম পেলে আর একটা বাড়াবে—

এটাই স্বাভাবিক।

তারা অতএব 'পিটিয়ে লাশ', করে 'মেরে তক্তা বানিয়ে' নিয়ে এসেছে।

অবশ্য ঠিক 'নিয়ে' আসা বলা চলে না।

পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে রেখে এসেছে। চিরকালের শয়তান একটা সর্বনাশিনী ডাইনিকে যখন হাতে পাওয়া গেছে, হাতের সুখ করে নেবে না?

অতঃপর রেখে এসেছে সেই ভাঙা ঝরঝরে দাওযাটায়। যেখানে একটা চটা ওঠা কলাই করা বাটি ছাতু না কি যেন গায়ে মেখে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

রেখে এসে হাতের ধুলো ঝেড়ে বলল, চোখবাড়িয়ে—ডাকাডাকি করতে ভয়েই মরে গেল বুড়ি। ঘরে ঢুকে দেখি মরে রয়েছে।

কিন্তু তা বললে তো হবে না। পড়ে থাকলে তো চলবে না।

দেশে আইন নেই? পুলিশ নেই? তারা এলো, এবং 'নিয়ে' তারাই গেল বেঁধে ছেঁধে।

মর্গের রিপোর্ট অবশ্য 'ভয়ে'র কথা তোলেনি।

বলেছে। 'অপুষ্টি জনিত মৃত্যু।'

একদা এদেশে দোহাত্তা লোকে পীলে ফেটে মরতো এখন দোহাত্তা 'অপুষ্টি জনিত'য় মরে। অতএব এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যুই বলতে হয়। দোহাত্তই যখন ঘটছে। আর বুড়ির চেহারাও তো রিপোর্টের পক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেখে কি কেউ বলতে যাবে, ঘুষ খেয়ে রিপোর্ট দিয়েছে.

তবু জগতে মন্দ লোকের তো অভাব নেই?

তাদের কাজই অকারণ বিষোদগার।

দু'একটা দুষ্টমতি খবরের কাগজ, এমনি বিযোদগার করে বসলো। অক্টোবরের কোন একটা তারিখে ফলাও করে বেরোলো।

'এমনও হয়। এই উনিশশো উনআশীতে'ও হয়। কলিকাতার অতি নিকটবর্তী একটি গ্রামে, 'ডাইনি' সন্দেহে এক বুড়িকে পিটাইয়া মারা হইয়াছে।..... বুড়ির আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, অতএব পুলিশী তদন্তেরও প্রয়োজন হয় নাই। পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্ট 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

এই আমাদেশ দেশ।

অগ্রসর দেশের মানুষরা যখন গ্রহে গ্রহান্তরে পাড়ি দিবার সাধনা করিতেছে, তখন আমাদের দেশে এক গরীব অসহায় বুড়িকে 'ডাইনি' বলিয়া পিটাইয়া মারিয়া কেহ লজ্জিত হইতেছে না। .... অথচ এই গ্রামে শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই।....

অপর একটা কাগজ আবার আরো সরস করে বলেছে, যদিও এই গ্রাম বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া বিজ্ঞানের সুখ সুবিধাগুলি দ্রুত করায়ত্ত করিতেছে, এবং ক্লাবে লাইব্রেরীতে জনসভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বন্যা বহাইয়া, নিজেদেরকে রুচিবান ও সংস্কৃতিবান বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে. তথাপি—যাক খবরের কাগজের কথা কে ধরে।

ওদের কাজই তো তিলকে তাল করা।

হ্যাঁ তিল থেকে তাল করা, ভদ্র ব্যক্তিদের বৃথা অপদস্থ করা, পুলিশকে হ্যানস্থা করা, এবং কথায় কথায়! 'হায়! এই আমাদের দেশ' বলে আক্ষেপ করা। এই তো পেশা ওদের?

খবরের কাগজের কথায় কান দিলে চলে না।

তবে হ্যাঁ তিল থেকে যে তাল হয় না তা নয়। এই সাগরপুকুর গ্রামেই তো দেখা গেল তার দৃষ্টান্ত।

একটা নিহত বিড়াল শিশুর মৃতদেহ সারা গ্রামখানাকে তোলপাড় করে তুলতে সক্ষম হলো, কলকাতা থেকে আনা বহুমূল্য দেবী প্রতিমার মানতি পূজোর বহুমূল্য আয়োজন খতম করে দিলো, এবং একটি রাজসূয় যজ্ঞ পণ্ড করে ছাড়ল। এই শেষেরটায় গ্রামসুদ্ধ লোক তো কম আহত আশাহত হয় নি।..... এমন কি, যে লোকেরা ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারলো ভেবে উৎফুল্ল হচ্ছিল, তারাও ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবল, এতোটা হবে কে জানতো।

তবে হলোতো? ঐ তিল থেকেই হলো।

এই উনিশশো উনআশীতেও হলো।

আর ভয়ের কারণ নির্মূল হলেও এখনো লোকে স্টেশন যাবার ওই সহজ পথটা পরিত্যাগ করেই রেখেছে, সাইকেল আরোহী আরোহিনীরাও পর্যন্ত। .... ঘুরপথেই যাতায়াত করছে তারা।

কে না জানে, ওই ঢিবি জমিটার ওপর ফণী মনসার বেড়া ঘেরা চালা খসে পড়া ভাঙা দাওয়াটায় নিরবয়ব একখানা ছায়ার গায়ে আগুনের ঢেলার মত দুটো চোখ পথ চলতিদের রক্ত চুষতে রাতদিন জেগে বসে থাকে। ... 'গ্রাম' তো নামেই, প্রগতির কমতি নেই। তবু—

মার্কসবাদ কোনো কাজে লাগেনা, কাজে লাগে না ইংলিশ মিডিয়াম।

জোচ্চোর

ট্রেন থামার আগেই নিজের সাইট ব্যাগটা কাঁধে জম্পেস করে তুলে নিয়ে, আর সুদত্তার স্যুটকেসটাকে বাগিয়ে ধরে দরজার কাছে চলে এসেছিল প্রবাল সুদত্তাকে হাতের ইঙ্গিতে অনুগামিনী করে নিয়ে। থামা মাত্রই খালি হাতটা বাড়িয়ে সুদত্তাকে প্রায় হিঁচড়ে টেনে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

টেনে নামানো ছাড়া উপায় কি? ট্রেন তো এখানে মাত্র এক মিনিট থামে। আর লাফানো ছাড়াই বা উপায় কি? প্ল্যাটফর্ম বলতে তো ট্রেনের দরজা থেকে অনেকটা নীচে এবড়ো-খেবড়ো খানিকটা জমি।

নামার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা ঘস্‌ঘস্‌ করে বেরিয়ে গেল। সুদত্তা সেই দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হাঁফ-ছাড়ার মতো একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, বাবাঃ, এমন ভাবে টেনে নামালে যেন নারীহরণের নায়ক! এদিক ওদিক থেকে হৈ-চৈ করে লোক ছুটে এলে আশ্চর্য হতাম না।

আমি হতাম। প্রবাল কাঁধের ঝোলাটা আবার টেনে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে পা চালানো শুরু করে বলল, নারীহরণ হচ্ছে দেখে ছুটে আসবার মতো লোক ধারে-কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে?

সত্যি, স্টেশন এত চুপচাপ কেন!

এক মিনিট স্টপেজের স্টেশনে কত জনসমাগম আশা কর?

আশা-টাসা কিছু করছি না। সুদত্তা বলল, ভাবনা করছি কতখানি হাঁটাবে। গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

প্রবাল হাসল, এখনি ভয় ধরছে? একপা-ও তো হাঁটনি এখনো।

সুদত্তা রেগে উঠে বলল, হাঁটতে ভয় পাচ্ছি না কি আমি?

তবে?

তবে আবার কি? এখন এই দুপুর রোদে, সূর্যের দিকে মুখ করে হাঁটাটা খুব আরামদায়ক হবে কিনা সেটাই ভাবা হচ্ছে। কতটা রাস্তা কে জানে।

আমি তো জানি।

আহা, কতই জানো। নিজেই বলেছ দশ বছর পরে এই আসছ। সব কিছু মনে আছে যেন।

দশ বছরের বিরতিতে মামার বাড়ির রাস্তা ভুলে যাব?

ছেলেরা এ সব খুব তাড়াতাড়িই ভোলে।

ছেলেদের সম্পর্কে এমন জোরালো অভিজ্ঞতাটি কবে হল?

হিসেব দিতে হবে না কি?

নাঃ। প্রবাল কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তেমন সৌভাগ্য করে কি আর পৃথিবীতে এসেছি?

সুদত্তা ঘাড় বাঁকিয়ে ওকে দেখে নিল। রোদ পড়ে প্রবালের ফর্সা মুখটা আরো ফর্সা লাগছে, কপালে ঘাম জমেছে ছোট ছোট ফোঁটায়।

সুদত্তা শাড়ির আঁচলটা টান-টান করে কোমরে এঁটে নিয়ে বলল, স্যুটকেসটা এবার আমায় দাও তো।

প্রবাল গম্ভীর ভাবে বলল, কেন? টাকা-কড়ি গহনা-পত্র অনেক আছে বুঝি?

তার মানে?

মানে তো সোজা। অন্যের হাতে রেখে স্বস্তি পাচ্ছ না।

পাচ্ছি না-ই তো। সুদত্তা রেগে রেগে বলল, ঝোঁক করে চলে তো এলাম, এখন এই ক'টা দিনই তোমার সঙ্গে আমার বনলে হয়। যা না তুমি।

চমৎকার! দোষটা আমারই হল তাহলে?

ওঃ বলতে চাও আমিই ঝগড়াটি?

আমি তো কিছুই বলতে চাইনি। নিঃশব্দেই যাচ্ছিলাম। তুমিই—

বেশ নিজে খুব ভালো। সুদত্তা বলল, বীরপুরুষ তো এইটুকু রাস্তা এতটুকু একটা স্যুটকেস বয়েই ঘামতে শুরু করেছেন।

প্রবাল সুদত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

সুদত্তারও কপালে ঘাম জমে উঠেছে।

চুলের গোড়ায় গোড়ায় ভুরুর খাঁজে, চোখের কোলে।

সুদত্তার রং শ্যামলা, তবু রোদের আঁচে লাল্‌চে হয়ে উঠেছে।

প্রবালের ইচ্ছে হল পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘামটা মুছিয়ে দেয়। কিন্তু পাগল তো নয় প্রবাল, তাই এই দৌলতপুর হেন গণ্ডগ্রামের রাস্তার মাঝখানে এমন একটা অনাসৃষ্টি কাণ্ড করে বসে। ত্রিসীমানায় লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর কোন মুহূর্তে মাটি ফুঁড়েও মানুষ উঠে পড়ে এটা তো ঠিক। মমতাটুকু এখন তোলা থাক।

অতএব দুষ্ট বুদ্ধিকেই প্রশ্রয় দেওয়া যাক। স্যুটকেসটাকে একটু তুলে ধরে দুলিয়ে বলল, খুব এতটুকু অবশ্য নয়। ভেতরে ক'ডজন শাড়ি ভরা হয়েছে? ডজন তিন চার? না আরো বেশি?

ডজন তিন চার? আরো বেশি? কেন, আমি কি তোমার মামার বাড়ির দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাস করতে এসেছি? ক'টা শাড়ির ভার এত ভার? সুদত্তা আচমকা প্রবালের হাত থেকে স্যুটকেসটায় হ্যাঁচকা টান মেরে মাটিতে নামিয়ে ফেলেই হি হি করে হেসে বলে ওঠে, এমা! কী বোকা! বয়ে নিয়ে যাবার দরকার কি ছিল? এটার তো চাকা রয়েছে। টেনে নিয়ে গেলেই তো হল।

প্রবাল ওর হেসে গড়ানো মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। সুদত্তার হাসিটা একেবারে মার-কাটারি। হাসিটা দেখলে মনে থাকে না সুদত্তা ফর্সা কি কালো, সুদত্তার চোখ দুটো বড় বড় ভাসা ভাসা না ছোট ছোট নাচুনে মার্কা।

কিন্তু সুদত্তার হাসিটি কি সুলভ? সুদত্তা এ যুগের তরুণীদের মতো ভুরু প্লাক করে না, তার নিজস্ব ধনুকাকৃতি ভুরুজোড়া প্রায় সর্বদাই উঁচিয়ে রেখে কথা বলে। তবু সুদত্তা কী অদ্ভুত আকর্ষণীয়া।

প্রবাল অবশ্য এই পরম সত্যটি প্রকাশ করে না, বরং সুদত্তাকে ক্ষেপিয়ে তার ভ্রূধনুটি আরো উৎক্ষিপ্ত করিয়ে মজা দেখে। এখন বেশ গম্ভীর গলায় বলল, চাকাটার সাহায্যে কি টেনে নিয়ে যাবার ভূমিকাটা পোষা কুকুরের ম্যাডাম!

পোষা কুকুরের!

হ্যাঁ। তা জানো না তুমি? স্যুটকেসের তলায় চাকা লাগানোর ফন্দীটা মাথায় আনা হয়েছিল কুকুরের কথা ভেবেই।

কে বলেছে তোমায় এমন অদ্ভুত কথা! ওটা বানানোর উদ্দেশ্য কুলির কথা না ভেবে নিজের ভার নিজে বইবার জন্যে। বুঝলেন মশাই।

ওটা তোমার ভুল ধারণা। প্রথম যখন ওটা হাটে-বাজারে ছড়াল, আডভার্টিজমেন্টের ছবি দেখেছিলে? নব-দম্পতি হনিমুন-এ যাচ্ছে প্রেমে ভাসতে ভাসতে, পিছনে পোষা কুকুর। আর তার পিছনে ঢাউশ এক স্যাটকেস চলেছে কুকুরের মুখে চেপে ধরা দড়ির টানে। তা নইলে হয়তো আর কারো টানে অন্য দিকে চলে যেতো।

কই, এমন ছবি আবার কবে দেখলে তুমি? আমি তো দেখিনি।

আহা সবই কি আর সবাই দেখতে পায়? চোখ সজাগ থাকা চাই।

সুদত্তা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলে ওঠে, যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছ মানে? এটা হনিমুন অভিযান?

প্রবাল বলতে যাচ্ছিল, আহা সেই মনোরম অবস্থাটা ভাবলেই বা ক্ষতি কি। বলল না। বরং বলে উঠল, কী সর্বনাশ! এ কথা আবার কখন বললাম? বলেছি, যারা যায়, তাদের পক্ষে মালপত্র সামলাতে একটা পোষা কুকুর এসেনসিয়াল। আর তার কথা ভেবেই এই স্যুটকেসে চাকার আবিষ্কার। তবে যদি বল, যে কোন পোষ্যপ্রাণী হলেও কাজ চলে যায়, তাহলে অবশ্য—

এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, চাকা যে খুব মসৃণ ভাবে এগোতে পারছিল তা নয়। সুদত্তা থেমে পড়ে বলে, এই ভাবে ইয়ার্কি মারতে মারতে হাঁটলে পৌঁছতে ক'ঘণ্টা লাগবে খেয়াল আছে?

যতক্ষণ লাগে ততক্ষণটাই লাভ। গিয়ে পড়লেই তো সেই সমাজ সংসার সভ্যতা ভদ্রতা।

আহা, কী একেবারে সুখকর অবস্থা।.... সুদত্তা বলে ওঠে, তাই ভাবতে হবে 'সমাজ সংসার মিছে সব' এর নাম তোমার নব ফাল্গুন! মলয় বাতাসের বহর বটে! আর রোদের তাত জুন মাসকেও হার মানাচ্ছে।

প্রবাল ঘড়ি দেখল। বেলা দেড়টা। প্রখর রোদেরই সময়। আর পাড়াগাঁয়ের রোদের তাত বেশী। রাস্তা আর বেশী নেই, কিন্তু এটুকুও সত্যিই কষ্টকর।

হঠাৎ যেন ভুঁইফোঁড়ের মতো একটা সাইকেল বোঁ করে পাশ দিয়ে চলে গেল। আরোহীর জামার লাল রংটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো চোখ ঝলসে দিয়ে।

সুদত্তা বলে উঠল, আরে সাইকেল-ফাইকেল আছে তাহলে তোমার মামার বাড়ির দেশে?

দেশটাকে ভাবছ কি? নেহাৎ একটা অসময়ে এসে পড়েছ তাই। ছেলেবেলায় যখন আসতাম, যথেষ্ট সমারোহময় অবস্থা দেখেছি। বড়মামার আবার একটা টমটম জাতীয় ঘোড়ার গাড়ি ছিল। তিনি তাতে চেপে রোগী দেখতে বেরোতেন।

আছেন এখনো তিনি?

কে বড়মামা? নাঃ। বড়মামা বিগত, মেজমামা সপরিবারে কানপুর-বাসী। ছোটমামা জাপানে গিয়ে সেখানেই সেট্‌ল করেছেন। বড়মামার ছেলেরা কলকাতায় থাকে।

ও মা, তবে তোমার মামার বাড়িতে আছে কে?

কেন, আমাদের সেই বিখ্যাত নেবুমাসী আছেন। যাঁর কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে তুমি দেখতে আসতে চাইলে।

সুদত্তার হঠাৎ মনে হল কাজটা বোকার মতো হয়ে গেছে। অথচ তখন ভীষণ আগ্রহ অনুভব করেছিল যখন প্রবালের কাছে শুনেছিল তার ছেলেবেলায় মামার বাড়ি মানেই ছিল নেবুমাসী। আর তাঁর নিতান্ত নির্বেদেই নাকি ক'দিনের জন্যে মামা বাড়ির দেশে যাচ্ছে প্রবাল।

নেবুমাসী নাকি বাল্যকালে এমন সুন্দরী ছিলেন যে হেতমপুরের না কোথাকার যেন রাজা সন্ধান পেয়ে ছেলের বৌ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নেবুমাসীর বাবা সে অফার নেননি। অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন। বলেছিলেন না কি রাজবাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর মেয়েকে বেচে দেওয়া সমান। মেয়ে জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ হবে না, সাতজন্মে বাপের বাড়ি আসতে পাবে না। আমার একটা সন্তান, লোভে পড়ে বিসর্জন দেব?

তা এমন অহঙ্কারের কথা মানাতোও তাঁর মুখে। এই সারা দৌলতপুরটাই ছিল তাঁর অধিকারভুক্ত। বনেদী জমিদার। তৎপরে তিনি তখনকার কালে মেয়েকে প্রায় অরক্ষণীয়া করে তুলে বিয়ে দিয়েছিলেন এমন ঘটা করে যে নেবুমাসীর বিয়ের ঘটার গল্প দৌলতপুরের প্রায় একটা ঐতিহাসিক গল্প হয়ে থেকেছে অনেক কাল। প্রবালদের তো শুনে শুনেই মুখস্থ ছিল।

বলে বসেছিল সুদত্তা, আমি যাব তোমার সঙ্গে—।

কিন্তু সে উৎসাহ কি শুধুই ওই ঐতিহাসিক গল্পের আর সে গল্পের নায়িকাকে চাক্ষুষ দেখার আগ্রহে? তাহলে এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে কেন কাজটা বোকার মতো হয়ে গেছে?... আর নিজেকে তলিয়ে দেখে

মনে হচ্ছে কেন এই একটা ছুতোয় ছুটির ক'টা দিন প্রবালের সান্নিধ্যের আশাতেই তার এই ঝাঁপিয়ে পড়া। অবশ্য জেদটা আরো বেড়ে উঠেছিল প্রবালের প্রতিকূল বাণীতে।

সে যাবে শুনে প্রবাল তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, তুমি যাবে? তাহলেই হয়েছে!

হয়েছে মানে? কি হয়েছে?

ব্যাপারটা অসম্ভব তাই বলছি।

অসম্ভবটা কিসে?

আরে বাবা সে একটা অজ পাড়া গাঁ। বেণুদা সেদিন বলেছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না কলকাতার প্রায় নিকটবর্তী এখনও এমন জায়গা আছে, যেখানে সভ্যতার আলোক স্পর্শ করেনি।

সভ্যতার আলোকের দাহ তো জন্ম থেকেই অনুভব করছি, একটু অন্ধকারের শীতলতাই দেখা যাক না। আর তোমাদের সভ্যতা তো ক্রমশই পিছু হেঁটে হেঁটে আলোক থেকে অন্ধকারের দেওয়ালে গিয়ে ঠেকছে।

আহা এ সব তো পুঁথির বুলি, প্র্যাকটিক্যাল কথা হচ্ছে জায়গাটায় এখনো ইলেকট্রিসিটি যায়নি।

খুব বেশী তফাৎ মনে হচ্ছে কি? তোমার এই সাধের শহরে সেই ইলেকট্রিসিটির দাক্ষিণ্য কতক্ষণ?

তবু প্রবাল আরো কত কি বলেছিল, বাড়িটা ভীষণ পুরনো, কাজ করার লোকজন আছে কি নেই কে জানে ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের মাথায় সুদত্তার এই প্রস্তাবটা তার কাছে পরম লোভনীয় মনে হলেও নিবৃত্ত করার বেশ খানিকটা চেষ্টা করেছিল প্রবাল। কারণ জানে তো এখনও পল্লী-সমাজ বস্তুটা একেবারে তিরোহিত হয়নি। ওর সঙ্গে সুদত্তাকে দেখলে—

কিন্তু প্রবাল যত নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে সুদত্তার জেদ ততই প্রবল হয়ে উঠেছে। এটাই তার প্রকৃতি। ও বলেছে, তুমি ভাবছ অসুবিধেকে আমি ভয় খাই? যে কোন অবস্থার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নেবার ক্ষমতা আমার আছে! শুধু নাম-করা শহর খুঁজে বেড়াতে যাব, নামী-দামী হোটেলে গিয়ে উঠব, গাড়ি চড়ে দ্রষ্টব্য দেখে বেড়াব, একে আমি বেড়ানোই বলি না। ছেলেবেলা থেকে এই নিয়ে মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় আমার। আমার ইচ্ছে হয় সেকালের মতো পায়ে হেঁটে পাহাড় ডিঙোই, গ্রামে গ্রামে যা-হোক তা-হোক করে ঘুরে বেড়াই। তবে তোমার যদি আমায় তোমার মামাবাড়িতে নিয়ে যাবার কোন বাধা থাকে তো আলাদা কথা।

এরপর আর ঠেকাবার চেষ্টা করা চলে না।

এবং সত্যিই যখন মা বাপের অনুমতি আদায় করে সুদত্তা প্রবালের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, তখন অপূর্ব এক পুলক রসে মন কাণায় কাণায় ভরে উঠল।

সেই ভরা মনটাকে কি এখন ব্যাহত করবে প্রবাল সুদত্তাকে মনে করিয়ে দিয়ে যে, গ্রামে গ্রামে যেমন তেমন করে বেড়ানো রোদের আঁচ বাঁচিয়ে সম্ভব নয়।

বরং বলল, আশ্চর্য, দূরে দূরে অত ঝোপ-জঙ্গল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; অথচ রাস্তায় একটাও ছায়াশীতল বৃক্ষতল নেই যে তার তলায় তলায় হাঁটা যাবে। তোমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

সুদত্তা ভুরু তুলে বলল, শুধু আমার? কেন, আমিই বুঝি মোমের পুতুল? নিজেরও যে এদিকে শার্টের পিঠ ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ফ্লাস্কের জলটা ট্রেনেই ফুরনো হল।

আমি ভেবেছিলাম স্টেশনে অরেঞ্জ স্কোয়াশ জাতীয় কিছু একটা খেয়ে নেওয়া যাবে। এতদিনে কি আর এটুকু উন্নতি হয়নি? তা দেখছি—

ওদের কথার মাঝখানে আবারও হঠাৎ সেই লাল শার্ট-বাহী সাইকেলটা বোঁ করে ঘুরে এসে এদের কাছে দাঁড়াল।

সুদত্তা নীচু গলায় বলল, দুর্বৃত্ত বলে মনে হচ্ছে।

প্রবাল হাসল। তাকাল লাল শার্টের দিকে।

লাল শার্ট বলে উঠল, পলুদাদাবাবু তো?

হুঁ! তুমি কে?

আমি বাচ্চু! মণিরাম পালের নাতি।

আরে তাই নাকি? তা তুমি আমায় চিনলে কি করে?

বাচ্চু একটু আত্মতৃপ্তির মধুর হাসি হেসে বলল, অনুমানে।.....

ইস্টিশান মাস্টারের লোক গিয়ে বুড়ো দাদুকে খবর দিল, সে যাক। কথা পরে হবে। এখন রেক্‌শোটায় চড়ে পড়ুন।

রেক্‌শো! এই অভাবিত শব্দটি শুনে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখল এরা, সত্যিই একটা সাইকেল রিক্‌শা চলে আসছে স্টেশনের দিক থেকে।

প্রবাল বলল, এটিকে কোথায় পেলে হে?

আজ্ঞে দাদাবাবু ইস্টিশানের ওধার থেকে।

কই, আমি তো একখানার ছায়াও দেখতে পেলাম না।

ইদিকে আর কোথায় পাবেন দাদাবাবু? ইদিকটা তো ওঁচা দিক। ওই দোক্‌খিন দৌলতপুরের দিকে যা কিছু বোলবোলা। উদিকে সিনেমা হল রয়েছে তো। ইলেকটিক্ এয়েচে।

সুদত্তা মুচকি হেসে নীচু গলায় বলল, শুনে প্রাণে ভরসা পাচ্ছ। দেখ তোমার আর আক্ষেপের কিছু নেই, সভ্যতার আলোক যথেষ্ট পরিমাণেই এসে পৌঁচেছে। সাইকেল রিক্‌শায় উঠে পড়ল ওরা।

বাচ্চু রিকশাওলাটাকে বলল, নন্দদা, তুমি এগিয়ে যাও। আমি আসছি।

আর রিক্‌শাওলাটা নিজের আসনে উঠে বসতে বসতে বলল, কাপড়ের আঁচলটা সাবটে নিল বৌদি, পুরাতন গাড়ি, পেরেক ফেরেক আচে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

সুদত্তা বিরস গলায় বলল, বৌদি মানে?

বাঃ, আমি কি করে জানব? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

ওর ভুল ভাঙাতে হবে কিনা?

প্রবাল নড়ে চড়ে বসল। সুদত্তার রাগ রাগ মুখের দিকে তাকাল। তারপব উদাস অবহেলার গলায় বলল, পৃথিবীতে কত লোক তো কত ভুল ধারণা নিয়ে জীবন কাটিয়ে ফেলছে, তখন তুচ্ছ এই নন্দদার এই ক্ষণিকের ভুলটুকু ভাঙল আর না ভাঙল তাতে ক্ষতি কী?

ক্ষণিকের মানে?

মানে আর কি! ও তো আমাদের লাহিড়ীবাড়ির দেউড়িতে পৌঁছে দিয়েই, আবার সেই ওর দোক্‌খিন দৌলতপুরে ফিরে যাবে।

তাই বলে ও এই সব যাতা বলবে?

ওঃ যাতা! প্রবাল একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার অবশ্য তা মনে হয়নি। আচ্ছা দিচ্ছি ভুল ভাঙিয়ে। বলে গলাটা একটু বাড়িয়ে ডাক দিল, ওহে শুনছ, ও নন্দদা—

সুদত্তার এখন অস্বস্তি হল। কি না কি বলে বসবে কে জানে। বিশ্বাস নেই ওকে। তাড়াতাড়ি ওর পিঠে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আচ্ছা থাক, আর হৈচৈতে দরকার নেই।

প্রবাল কান দিল না ওর কথায়, আবার ডাক দিল, ও নন্দদা।

সুদত্তা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে। যা ছেলে, সুদত্তাকে জব্দ করতে হয়তো বলে বসবে, শোন, একে বৌদি বলায় ভীষণ চটে গেছেন। আসলে তো বৌদি নয়।

নাঃ ওই বিরক্তি দেখানোটা ঠিক হয়নি। ভাবল সুদত্তা, যাচ্ছি তো এক রিক্‌শায় দিব্যি পাশাপাশি। পাড়াগাঁয়ের লোক, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে আবার কি ভেবে বসবে কে জানে! ইস।

নন্দ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, দাদাবাবু কিছু বলছেন?

হ্যাঁ বলছিই তো, না হলে ডাকব কেন? বলছি—

সুদত্তার বুক ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। সুদত্তা জোর করে হালকা হবার চেষ্টা করে। আর তখনই শুনতে পায় প্রবালের গলা, বলছি দেশলাই আছে তোমার কাছে? আমারটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল।

দেশলাইটা বাড়িয়ে ধরে নন্দ বলল, থাকছেন তো ক'দিন?

ক'দিন আর কি? দিন চার পাঁচ।

নন্দ আস্তে আস্তে প্যাডেল করতে করতে পরিচিতের ভঙ্গীতে গ্রাম্য অন্তরঙ্গ সুরে বলল, থাকলে পাত্তেন দু-দশ দিন। জন মনিষ্যি তো আসে না। ওই ভগ্নো অট্টালিকেয় শুদু দুটো বুড়ো মনিষ্যি। আপনাকে পেয়ে বত্তে যাবে। ... ক'দিন আগে শুনেচি আসতেচেন। বৌদির কতা শুনি নাই, তো ভালই হল। শহরের মেয়ে, গাঁ ঘর দেকুন একবার। তা এসে য্যাখোন পড়েচেন, বুড়ি সহজে ছাড়লে হয়।

বোঝা যাচ্ছে নন্দ একটু বাক্যবিলাসী। কিন্তু ব্যাপার তো বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। প্রবাল ভয়ে আর সুদত্তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না। নন্দকে থামানোর জন্যেই আলগা গলায় বলে, উপায় নেই। ছুটি নেই বেশী।

ওই তো—নন্দ দার্শনিক গলায় বলে, এই দুরন্তো যুগে এক তিল ছুটি তো নাই কারো। রাতদিন শুদু ছুটোছুটিই আচে। কে কার মুক চাইতে আসচে। দুদ্দশা শুদু জেবন ফুরিয়ে যাওয়া বুড়ো বুড়ি গুলানের। জেবনও নাই, মরণও নাই এই সসেমিরে আবস্থা।

তা ঠিক! প্রবাল নন্দর উৎস-মুখে পাথর চাপা দেয়, তা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

কতক্ষণ আবার? নন্দর রেক্‌শো রকেট গাড়ি!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুট মারে নন্দ এখন।

সুদত্তা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ব্যাপারটা কী হচ্ছে?

'মানময়ী গার্লস স্কুল' নয়। স্রেফ ভাগ্যচক্র।

কলকাতায় ফেরার ট্রেন কখন?.... সুদত্তার কণ্ঠে ছুরির ধার।

প্রবালের অমোঘ গলা, রাত তিনটেয়।

রিক্‌শা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল। ওয়েটিং রুমে বসে তাকব।

ওয়েটিং রুম! প্রবাল নিরীহ গলায় বলল, সেটা কি রকম দেখতে?

ওঃ! কেন মরতে আমি—

প্রবাল আসতে ওর হাতটা একটু ছুঁয়ে বলল, ওই একটা বোকা বুড়োর ভুল ধারণা নিয়ে এত উত্তেজিত হবার কি আছে?

আমার খুব খারাপ লাগছে।

মন থেকে ঝেড়ে ফেল। ওই নন্দ রিক্‌শাওলা তো ক্ষণিকের ব্যাপাব।

নিশ্চয় ও সক্কলকে গৌরব করে বলে বেড়াবে—

কী বলে বেড়াবে?

রাগ বাড়িও না। বুঝতে পারছ না যেন। বলে বেড়াবে শহর থেকে বৌদি এসেছে। আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে এলাম—এই সব।

প্রবাল হঠাৎ হেসে ওঠে, কার কাছে বলে বেড়াবে? ওর সার্কেলে তো? তাতে তোমার কি এসে যাচ্ছে?

থাম! বেশ মজা দেখা হচ্ছে, না?

ঠিক ধরেছ তো! প্রবাল আবার হেসে ওঠে।

কাঁচা পাকা চুল নন্দ এই হাসির শব্দে একটু পাকা হাসি হাসে।... ভাবে নতুন বে, নতুন ভালোবাসা, এখন কী কথায় হাসি।

সুদত্তা একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, তুমি যে বলেছিলে তোমার ওই নেবুমাসি বালবিধবা?

বলেছিলাম তো, কিন্তু সেটা নাকচ করলাম কখন?

ওই নন্দ না কে যে বলল, দুই বুড়ো বুড়ি—

প্রবাল ঠাট্টার গলায় বলল, তাহলে দেখছ, হাঁদা নন্দ রিক্‌শাওলা আর রিসার্চ স্টুডেন্ট সুদত্তা মুখার্জি একই ভুল করতে পারে। বুড়ো বুড়ি হলেই যে তাদের কর্তাগিন্নীই হতে হবে তার কী মানে? ঢ্যাঙাদাদু তো আসলে এই লাহিড়ী বংশেরই কেউ নয়।

সুদত্তার ভুরু উঁচিয়ে ওঠে, কী দাদু?

ওহো হো। ওটা একটা মজা।

নন্দকে আরও একবার নাড়া দিয়ে হেসে উঠল প্রবাল, বেচারী ভদ্রলোক একটু বেশী লম্বা বলে নেবুমাসি ওকে ঢ্যাঙা বলে ডাকতেন। আমরা ছোটরাও শুনে শুনে বলতাম ঢ্যাঙাদাদু। এখনও সেই অভ্যেসে—

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশাটা থেমে যায়।

রাশিকৃত ভাঙা ইট-পাটকেলের বোঝা রাস্তা আটকে রেখেছে। আসলে একটা জঙ্গল-সদৃশ ব্যাপার।

বোঝা যাচ্ছে নন্দ বর্ণিত 'ভগ্নো অট্টালিকা'র সামনের অংশটার স্মৃতিচিহ্ন ওই ইঁট-পাটকেলের স্তূপ। তারই খাঁজে খাঁজে গাছ গজিয়ে জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে নন্দ সবিনয়ে বলল, এখেনেই নামতে হবে দাদাবাবু। চাকা আর চলবে না।

প্রবাল বিপন্ন গলায় বলল, এটা কী ব্যাপার বল তো? এমন অবস্থা তো ছিল না।

কত দিন আসেন নাই?

প্রবাল সাল তারিখটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, তা অনেক দিন। তখনো তো এই ঠাকুর দালানে—

অল্পে অল্পে ধসছিল। গেলবারের বন্যে বর্ষায় ভূমিস্যাং হয়েচে। এই দু'বছর ভেতর বাড়ির ঠাকুরঘরে নমো নমো করে পূজো হয়েছে।

প্রবাল আস্তে আস্তে ওই স্তূপ বাঁচিয়ে নেমে পড়ে সুদত্তাকে নামার সাহায্যকল্পে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সুদত্তা অপর দিক দিয়ে প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়ে শাড়ির ধূলো ঝেড়ে নিল। এবং বেশ সতেজ ভাবে এবড়ো খেবড়ো ডিঙিয়ে এদিকে চলে এলো।

প্রবাল মনে মনে হেসে নন্দকেই উদ্দেশ্য করে বলল, পুজো এখনো হয়?

তা হয় দাদাবাবু। বুড়ির গোঁ। বলে বাপের বিষয়টি খাব বসে বসে আর বাপের কুলকম্মোটি পালব না?

হুঁ, তা করে কে?

নন্দর গলায় আবার দার্শনিকতার সুর, ও যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে ন্যান। চেরকালের নোকেরা ঠিক ঠাক সময়ে আপন আপন কাজ করতে এসে যায়! তো আসেন, কলকেতা থেকে কেউ কেউ আসেন নেমন্তন্ন খেতে আসার মতন। এই যে ইদিক দিয়ে চলে আসুন। অ্যাখোন পাশদোরেই সদর হয়েছে। আসুন, আমি এগুয়ে গিয়ে খপরটা দিইগে—

তুমি আগে প্রথম সম্ভাষণ করোগে যাও—সুদত্তা তার টান টান করে গোঁজা সিল্কের শাড়ির আঁচলটা আলগা করে ছেড়ে দিয়ে রুমালে ঘাড় গলা মুছে নিয়ে বলল, আমি এই বাইরের রকে আছি। তুমি আগে আমার সঠিক পরিচয়টা দিয়ে ডাকবে, তবে যাব।

কিন্তু অতখানি অবকাশ হতভাগ্য প্রবালকে দিচ্ছে কে?

সুদত্তার কথা শেষ হবার আগেই তো চাঁচাছোলা গলায় সোল্লাস বাণী উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে এসেছেন বিখ্যাত নেবুমাসি।

কইরে পলা কোতায়? দেকি মুখখানা। বলি বে করেচিস তা এই বুড়িকে অ্যাকবার খপরও দিতে নেই?.... তা তোরই বা দোষ কী? টুনু চলে গ্যাচে, তা যাক সতীনক্ষ্মী হাতের নো সিঁতের সিঁদুর নে। অ্যাগে গ্যাচে, ভালই গ্যাছে। কিন্তু জামাই? তোর বাপ? তার কতা একটু মনে পড়ল না? ... না কি অ্যাকোনকার মতন 'লবম্যারেজ' করেচিস? তাই—

পুরুষালী ধরণে হা হা করে হেসে ওঠেন নেবুমাসি। পোশাকী নাম যার শরদিন্দুনিভাননী। এ নামটা

আবিষ্কার করেছিল প্রবাল কত যেন বয়েসে। দোতলার বড় ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধানো একখানা জীর্ণপ্রায় কার্পেটের ছবিতে লতাপাতা মণ্ডিত বর্ডারের মধ্যে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'পতি পরম গুরু'। আর তার নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা 'শ্রীমতী শরদিন্দু-নিভাননীদেবী।'

বাবা রে, কত বড় একখানা নাম! প্রবাল লাফাতে লাফাতে নেমে এসে ওই নেবুমাসিকেই জিজ্ঞেস করেছিল, ওপরে ওই কার্পেটের ছবিটা কে করেছে গো নেবুমাসি? শ্রীমতী শরদিন্দুনিভাননী দেবী কে!

নেবুমাসি হেসে উঠেছিলেন হাহা করে। পুরুষালী ভঙ্গীতে। চিরকাল এক ধরণ। তারপর ডাক দিয়ে বলেছিলেন, অ টুনু, তোর ব্যাটার কথা শোন। আমায় শুদোচ্ছে কার্পেটের ছবিতে কার নাম! হ্যাঁ লা, এত কালেও ছেলেকে বলিসনি মাসির নামটা কি।

হ্যাঁ মাসিই বলেছিলেন কারণ শরদিন্দুনিভাননী প্রবালের নিজের মাসি নয়, মায়ের মাসি। তাও নিজের মাসি নয়, বোধ হয় জ্ঞাতি গোছের।

নেবু তো তাঁর মা বাপের সবেধন নীলমণি।

কিন্তু টুনুর জীবনে বাপের বাড়ি বলতে তো এই দৌলতপুরই। প্রবালদেরও তাই মামার বাড়ি বলতে এটাই। ছেলেবেলায় যখন আসত প্রবালরা, আরো অনেক সমবয়সী ছেলেমেয়ে দেখতে পেত, তাদের সঙ্গে কার কি সম্পর্ক সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রশ্ন ছিল না, খেলাটা উদ্দাম হত, সেটাই মজা।

তা ওই শরদিন্দুনিভাননী অপভ্রংশে 'নেবু' তিনিই ছিলেন সেই অপোগণ্ড বাহিনীর আশ্রয়স্থল। সম্পর্ক যার যা থাকুক, সবক'টাই ওই একই নামে ডাকত। তাদের মায়েরাও।

প্রবাল এই কথার তোড়ের মুখেই প্রণাম করে ফেলে বলে উঠল, তুমি তো দেখছি একটুও বদলাওনি নেবুমাসি। ঠিক যেমন ছিলে তেমনি আছো।

নেবুমাসি তেমনি হাহা করে হেসে উঠে সতেজ গলায় বললেন, বদলাবো কেন? ভদ্দরনোকের অ্যাক কতা। বুজলি? তা তুই মস্তান আসল কতাটি চেপে রেকে চিটি দিছলি কেন? নিকবি তো একা যাচ্চিনে, জোড়ে যাচ্ছি। মহারাণীর উপযুক্তো ব্যবস্তা করতাম। যাক্ যা করেচিস বেশ করেচিস, দেকাতে যে নিয়ে এলি এই ঢের। এসো ভাই, রাজরাণী হও।

সুদত্তা রুষ্ট মুখে একটা প্রণামের মতো করে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছে দেখে প্রবাল মরীয়া হয়ে বলে উঠল, যা প্রাণ চায় বলে তো চলেছ, যা ভাবছ তা নয় বাবা! নাতবৌ দেখবার কপাল তোমার হয়নি এখনো। এ আমার সঙ্গে পড়ে, পাড়াগাঁ দেখাতে নিয়ে এসেছি।

অ! নেবুমাসি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলেন, বান্দবী? তা ওকেই আমরা হবু বৌ বলি। যাক এনে দেকিয়ে যাবার বুদ্দি হয়েছে তাও ভাল। সত্যি তো আর নেবুমাসি অমর বর নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি। যখন বে করবি, তখন হয়তো থাকব না। এসো ভাই। পাড়াগেঁয়ে বুড়ির কতায় কিছু মনে কোরো না। অনেক দিন পরে ছেলেটাকে দেকে প্রাণে বড় আহ্লাদ হল তাই।....

হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়ে ধিক্কারের গলায় বলে উঠলেন নেবুমাসি, কী রে ঢ্যাঙা, তুই যে অমন সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি? আয় ইদিকে? মুকচোরা লজ্জাবতী! চিরটাকাল অ্যাক রকমে গেল। তোদের ঢ্যাঙা দাদুকে কেমন দেকচিস রে পলা? হাড়বুড়ো হয়ে গেচে না?

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন এখন। তাকিয়ে দেখল প্রবাল।

হাড়বুড়োর কোন লক্ষণ দেখল না। দিব্যি সোজা সতেজ ঋজুভঙ্গী। গড়নটা একহারা বলেই লম্বাত্বটা চোখে পড়ে। বিশেষের মধ্যে দেখল মাথা ভর্তি চুলগুলোর খাঁজে খাঁজে যে কালোর ছিটে ছিল, সেগুলো সব নির্মল শুভ্র হয়ে উঠে, মাথার ওপর একটা সাদা পশমের টুপির মতো বিরাজ করছে।

প্রবাল এখন সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করছে, কারণ খুব গুরুতর একটা কাজ সে করে ফেলেছে, আর সুদত্তার কিছু বলার নেই। যদিও নেবুমাসির পরবর্তী কথাগুলো খুব স্বস্তিদায়ক নয়। তবু প্রবালকে তো আর দোষ দিতে পারবে না সুদত্তা।

তথাপি সুদত্তার দিকে না তাকিয়েই, সরোজমোহনকে, যিনি ঢ্যাঙা নামে অভিহিত, প্রণাম করে বলল,

কই, আমি তো তা দেখছি না। দাদুও তো একই রকম রয়েছেন।

সরোজমোহন মৃদু হাস্যে বললেন, ওনার মতন লম্ফঝম্ফ করতে না পারলেই সে হাড়বুড়ো। তো বুড়ো হব নাই বা কেন? আশী বছর বয়েস তো হল।

সরোজমোহনের দাঁত বোধ হয় নতুন বাঁধানো, অতএব প্রকৃতির নিজস্ব মাধুর্যের সঙ্গে বাড়তি ও শুভ্রতার যোগ হয়ে হাসিটি শুভ্রমধুর।

কিন্তু নেবুমাসির তো বাঁধানো দাঁত নয়। নীচের দিকের একটা দাঁতের অনুপস্থিতির শূন্যতা তার প্রমাণ দিচ্ছে। সারি দিয়ে সাজানো এই মুক্তোর মতো দাঁতের পাটিকে এখনো অটুট রেখেছেন নেবুমাসি!

সুদত্তা দেখছিল। নাঃ, বয়েসকালে ছিলেন বটে একখানি।

আচ্ছা, চুলও তো এখনো বারো আনা অংশ কালো। রেশম মসৃণ ঈষৎ কোঁকড়ানো ওই চুলের গোছাও অবাক করে সুদত্তাকে। এই পরিবেশে, এই বয়েসে মহিলা নিশ্চয় চুলে কলপ দেননি। কে জানে বয়েস কত। ওই বুড়ো ভদ্রলোককে তো তুই তুই করছেন। কোন্ সম্পর্কে?

এতক্ষণের বিরক্ত বেজার মনটা হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠল। তাছাড়া আর প্রবালের ওপর রাগ রাখা উচিত নয়। ওর পক্ষে যথেষ্ট করেছে। আমাকেই ফ্রী হতে হবে। সুদত্তা এগিয়ে এসে সরোজমোহনকে প্রণাম করে উঠল, গাড়া-গাঁ আমার দেখা হয়নি কখনো, তাই চলে এলাম।

বেশ করেছ দিদি! নাম কি?

সুদত্তা। সুদত্তা মুখার্জি। বলেই দুষ্টু হাসি হেসে বলল, আপনার নাম তো জেনেই ফেললাম। ঢ্যাঙা। তাই না?

সরোজমোহন হেসে উঠলেন হো হো করে।

হাসল সকলেই। সুদত্তা আরো একবার ওই মুক্তোর সারি দেখে নিঃসংশয় হল। নাঃ, বাঁধানো নয়। বাস্তবিকই কালে রীতিমত রূপসী ছিলেন। কিন্তু জীবনের কী অপচয়! কী অপচয়!

হাসি থামিয়ে নেবুমাসি ঠোঁটে একটি অপরূপ ভঙ্গী করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এখন তো শুদু নাম জেনে ফেলেচ। রূপও দেখলে। এরপর গুণ বুঝবে।

ঢ্যাঙা অবলীলায় বললেন, তোর গুণ ছাপিয়ে চোখ অন্যত্র যাবার অবকাশ পেলে তো বুঝবে! বলি এদের এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু বাকতাল্লা মারবি? এসো তো ভাই তোমরা। সুখীর মা, ভেতর বাড়ির নাইবার ঘরের চৌবাচ্চাটা চটপট ভরে দাও তো। আর তোমার সুখীকে ডেকে দিয়ে যাও, এই দিদিমণিকে কোথায় কি রাখবে দেখিয়ে দিতে।

ওঃ খুব হে কত্তবাগ্যান! নোক দেকিয়ে আর বাহাদুরী দেকাতে আসিসনে ঢ্যাঙা। তোকে আর ও সব ব্যবস্থায় নাক গলাতে হবে না। ... এসো ভাই আমার সঙ্গে .... ইয়ে, কি যেন নাম বললে?

সুদত্তা।

কী বললে? সু—

দত্তা। সুদত্তা।

সু-দ-ত্তা। তা এ নামের মানে কী রে পলা?

প্রবাল গম্ভীর গলা করে বলল, এ নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামিয়ে দেখিনি।

শোনো কতা! যা বলে ডাকচি, তার মানেটা কি সেটা ভাবতে হবে না?

আবার কথা? ঢ্যাঙা তেড়ে ওঠেন, ছেলে মেয়ে দুটোকে হাত-মুখ ধুতে দিতে হবে না? চা-টা খাবে না? এখন পুঁথি খুলে বসল, নামের মানে কী? বলি তোর নামটারই বা মানে কি? বোঝা ওদের।

নেবু মাসি ঝঙ্কার দিয়ে হেসে উঠলেন, ওর আবার বোজবার কী আছে? নেবু মানে জানে না? তবে হ্যাঁ, কি নেবু, সেটা অ্যাকটা কতা! তা বাপু কাগজি নয়, গন্ধরাজ নয়, পাতিও নয়, একেবারে মোক্ষম মান—গোঁড়া নেবুই। টকের জ্বালায় ভূত পালায়।

নেবুই বুঝি তোর নাম? ঢ্যাঙা প্রায় খেঁকিয়েই উঠলেন, আসল নাম নেই?

আসল নাম!.... শোনো কতা! জম্মো গেল নেবু নামে, এখন আসল নামের খোঁজ। সে নাম তাঁবাদি হয়ে গ্যাচে।

সুদত্তা ঈষৎ হেসে বলল, তা কেন? আপনার আসল নাম আমি জানি। তার মানেও জানি। এখন প্রমাণও পেলাম যাঁরা নাম রেখেছিলেন, তাঁরা বাজে কথার মানুষ ছিলেন না।

ও বাবা, মেয়ের তো খুব কতার বাঁদুনি। চল বাছা, চল।

নেবু মাসি ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, থমকাতে হল। বাইরে সাইকেলের কিড়িং কিড়িং শব্দ জানান দিল সেই লাল শার্টের আবির্ভাব ঘটল।

নেবুমাসি গলা তুলে বললেন, কে বাচ্চু? তা পেলি কিচু? না বিরিঞ্চি মুখপোড়া এখনো ঝাঁপ বন্দ করে ঘুম মারচিলো?

বাচ্চু ইট-পাটকেল বাঁচিয়ে সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে এগিয়ে নিয়ে বাড়ির ভেতর উঠোনে ঢুকল। তার সাইকেলের দু'হ্যাণ্ডেলে দুটো বড় সড় মাটির হাঁড়ি ঝোলানো। আর পিছনে ক্যারিয়ারে একটা পদ্মপাতা ঢাকা চ্যাঙারি।

নামাবো কোথায় এগুলো?

নেবুমাসি চড়া গলায় বললেন, নতুন হসনে বাচ্চু! জুতো খোল,, দালানে ঢুকে যা। বেঞ্চের ওপর বসিয়ে রাক। রেকেই যেন বাইসাইকেল উড়িয়ে হাওয়া হয়ে যাসনে। চা হলে গিলে তবে যাবি।

বাচ্চু বলল, সে আপনি না বললেও থাকতাম। মিষ্টি-মাষ্টি এনে রাখলাম, কচুরি এখনো ভাজেনি। কড়া চাপা করিয়ে তবে এলাম। যাব আবার একটু বাদে।

প্রবাল এতক্ষণ উঠোনের চারধার ঘুরে ফিরে গাছপালা বেড়া ইঁদারাটা, বাড়ির ভগ্নদশা দেখছিল, এখন বলল, এত সবের কি দরকার? বাড়িতে কি রাক্ষস এসেছে? যা মাল তোমার ওই হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিয়ে এলে তা তো দশ কুড়ি জনের মতো।

পোড়া কতা কসনে পলা। কলকেতয় থেকে থেকে খুব কলকেত্তাই হয়েচিস। কলকেতার নোক তো নিখাগী। ছাড় ও সব কায়দা। এই দৌলতপুরের ছানার জিলিপি কী ভালোই বাসতিস! মনে আচে—যকন তকন বলতিস, এত সব কুটনো তরকারি ভাত-ডাল করে কি হয় নেবুমাসি? শুদু ছানার জিলিপি খেয়ে থাকলেই তো হয়।

বলতাম বুঝি? প্রবাল হেসে ওঠে। এখন তো আমার ওই মিষ্টি-ফিষ্টি বেশী দেখলে ভয় লাগে।

তা নাগবে বৈ কি। শহুরে হয়েছিস তো! আচ্চা, আমার হাতে পড় না, দেখব অখন। সুখীর মা চায়ের জল চাপা। সু—সুদত্তা এসো ভাই। পলা, তোকেও কি দেকিয়ে দিতে হবে?

ঢ্যাঙা বললেন, তা হবে না? আগের মতো সব আছে? বারবাড়ি তো জবাব দিয়েছে। বাচ্চু দাদাবাবুকে নতুন দিকে টিউবওয়েলের ধারে নিয়ে যা।

বাড়ির বাইরের চেহারা দেখে ধারণা করা সম্ভব হয়নি ভিতরে এমন একখানি মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।

দোতলায় বারান্দায় চায়ের আসরে এসে অবাক হয়ে গেল সুদত্তা। ইতিপূর্বে অবাক হয়েছে দোতলার চওড়া দালানের ধারের সারি সারি ঘর দেখে। বৃহৎ বৃহৎ শার্সি খড়খড়ি সম্বলিত জানালা দরজা বহুল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ঘর, তালা চাবি খুলে দেখিয়েছেন নেবুমাসি। চাবির গোছা অবশ্য সুখীর মা'র হাতে।

দরজায় দরজায় লাগানো ভারী তালাগুলো খুলে খুলে দেখাবার কাজটা তার। নেবুমাসি আছেন সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে ঘরে পুরনো আমলের আসবাবপত্রও আছে অনেক।

এই সব ঘর দোরে আগে লোক ধরত না। একন মানুষ বিহনে পডে আচে। নেবুমাসি আক্ষেপের গলায় বলেন, কাকাদের ছেলেপুলে নাকি কলকেতায় অ্যাতোটুকুন ফেলাটে অ্যাতো অ্যাতো টাকা-ভাড়া দে বাস করচে।

সুদত্তা ইতিমধ্যেই বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। সে হেসে বলে, এই বাড়িটা যদি উঠিয়ে-নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বসিয়ে ফেলতে পারতেন, কত লাখ টাকা যে দাম হত কে জানে। উঃ, ভাবা যায় না যে এক সময় এখানে লোক ধরত না।

সেই তো। নেবুমাসি বললেন, এ সব দেকে দেকে ভাবতে বসলে মনে হয় কত কাল পৃথিবীতে এয়েচি। নচেৎ—মনেও পড়ে না এতখানি বয়েস হল। ছোটকালে যখন শুনতুম কারুর আশী বছর বয়েস মনে হত ও বাবা! একনো বেঁচে আচে কী করে। হাটচে চলচে খাচ্চে দাচ্চে কেমন কবে? এখন তাই ভেবে হাসি পায়। অনুমানে দেকি, সেই তো সক্কাল হলেই ওই বাঁশজাড়ের ওধার থেকে সূয্যি উঁকি মারে, সন্দেয় ওই দত্তবাড়ির চিলেকোটার পিছনে ডুব মারে, সেই তো বোশেকে বোশেকী ফুলে বাগান ভরে যায়, বর্ষায় কদম গাচে ফুল ধরে। শীতে গাঁাদা গাচ সোনা ঢালে। শীতের পর বসন্ত আর বসন্তর পর গ্রীষ্মি বর্ষা আসে।.... কোতা দিয়ে যে অ্যাতোগুলো দিন কেটে গেল ভগবান জানে।

সুদত্তা অবাক হয়ে তাকায়।

নেবুমাসির পরণে ধবধবে ফর্সা মিহি থান আর ধবধবে ফর্সা মিহি সেমিজ। নেবুমাসিব ঈষৎ কোঁকড়া কাঁচা পাকা খাটো চুলের গোছা রেশমের মসৃণতা নিয়ে ছড়িয়ে আছে মুখের পাশে কাঁধে ঘাড়ে। আর নেবুমাসির চোখে অধুনা দুর্লভ সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা। নেবুমাসির কাঁচা হলুদ রঙা মুখে পাতলা টিকটিকে নাকের ওপর এই পুরনো স্টাইলের চশমাখানাই যেন ঠিক। এ ছাড়া আর কিছু মানাতো বলে মনে হচ্ছে না।

সুদত্তার হঠাৎ মনে হল, অভিজাত চেহারা বলে যে একটা শব্দ আছে, সেটার মানে পাচ্ছি। অথচ—হ্যাঁ, অথচ একটা আছে। কথাবার্তায় তো স্রেফ গ্রাম্যভঙ্গী।

নইলে বাচ্চু নামের ছেলেটাকে খেতে দিয়ে—তুই শুদ্দু যদি আর দিও না আর দিও না করিস বাচ্চু তো তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।

বাচ্চু তার সামনে পদ্মপাতায় রক্ষিত একরাশ মুড়ির সঙ্গে বেশ কিছু কচুরি মিহিদানা ছানার জিলিপি আর গজার মুখোমুখি বসে করুণ স্বরে বলেছে, আমাদের বাপ ঠাকুদ্দার মতন খাবার ক্ষ্যামতা কি আর আছে ঠাকুমা? ঠাকুদ্দা তো শুনি আপনাদের পুরনো বাগানের ঢাকাই কাঁঠালের গাছের একটা আস্ত কাঁঠাল একাই খেত! সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আপনি একদিন দিচ্ছেন তাই, নইলে আমাদের এ যুগে না খেয়ে খেয়ে পেটের খোলা শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে।

নেবুমাসি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, সবোজমোহন বলে ওঠেন, সেই রাম অযোধ্যা যে আব নেই, এ কথা তোদের ঠাকুমা মানতে রাজী নয় রে বাচ্চু।

তবে আর কি, তুইও ওদের দেকাদেকি বলতে বোস আর দিও না অত দিও না। আজ আমার পলা এয়েচে, কত আল্লাদের দিন। আয় রে, তোরা বোস।

খালি খালি ঘরগুলো দেখে মনটা কেমন এক রকম বিষণ্ণ বিষণ্ণ লাগছিল সুদত্তার, এই চা খাবার বারান্দায় এসে যেন মনটা একটা আনন্দের স্বাদে ভরে গেল।

জীর্ণদশাগ্রস্ত হলেও জোড়া জোড়া থামের মধ্যে মধ্যে রেলিঙে লাইন ঘেবা মার্বেল মোডা বারান্দাটা যেন একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য।

চায়ের টেবিলও অভিনব। মাটিতে শতরঞ্চ পাতা, আর তার ওপরে কারুকার্য করা কাঠের পায়াদার পাথরের টপ বসানো নীচু নীচু চারটে চৌকী ঈষৎ দূরে দূরে। তার ওপরেই চা খাবাব রক্ষিত।

সুদত্তা মোহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কী চমৎকার! চা খাবার জন্যে এমন সুন্দব জিনিস। দেখিনি কখনো।

নেবুমাসি হেসে ওঠেন, চা খাবার জন্যেই বটে! যে কালে এ সব বানানো হয়েচিল, তখন চায়ের পাট ছিল না কি? ছেলেদের পড়তে বসার জন্যে দশখানা করিয়ে রেকেছিলেন, বাবা বলতেন মাদুরে বই শেলেট রেকে ঘাড় গুঁজে বসে নেকাপড়া করলে পিটের শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। এতে খাড়া থাকবে।

প্রবাল ঢ্যাঙা দাদুর সঙ্গে বারান্দাব রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় কী আলোচনা করছে, তাকিয়ে

দেখল সুদত্তা। পড়ন্ত বেলায় আলো পড়ে ঝকঝক করছে ওর মুখটা। হওয়াই স্বাভাবিক। রূপ আছে যৌবন আছে।

কিন্তু ওই বৃদ্ধের মুখটাও সে আলোয় এমন ঝকঝক করছে কী করে? যেন একটা অলৌকিক মাধুর্যের আভা এসে পড়েছে দুজনারই মুখে। কিসের আলোচনা হচ্ছে?

সুদত্তা বলল, আচ্ছা, এরা তো শুনছি মাঝে মাঝে মামার বাড়ি আসত, আর আপনি আপনার মা বাবার একমাত্র মেয়ে, তাহলে এত সব ছেলেমেয়ে কারা?

এই দ্যাকো, 'মেয়ে' আবার কখন বললাম গো। মেয়েরা বসবে শিরদাঁড়া খাড়া করে টুল নিয়ে পড়তে? ছেলে। সবই ছেলে। যত জ্ঞাতিগুষ্টির ছেলের পাল। বাবার আমার যে সদাব্রতর ব্রত। নিজের একটা মাত্তর সন্তান তাও মেয়ে সন্তান। কপাল-ক্রমে বাপের ঘর আগলে বসে আছি। নচেৎ তো পরঘরী হয়ে যাবার কতা। লাহিড়ী বংশের কুলপিদ্দিমদের মানুষ করতে হবে না? তাছাড়া আমার নিজের কাকা ছিল দুজন, তাদের ছেলেরা।... সবক'টাকে পড়িয়েছেন বাবা, সব মেয়েগুলোর বে দিয়েছেল। যেমন তেমন করেও দেননি, ঘটাপটাই করেচেন মোটামুটি। তবে কি আর আমার বে-র মতন?

পুরুষ দুজন রেলিঙের ধার ছেড়ে চায়ের সেই অভিনব টেবিলের ধারে বসেছে আসন পিঁড়ি হয়ে, শেষ সূর্যের আলো এসে পড়েছে একটা খিলেনের মধ্যে দিয়ে। সকলের মুখেই কনে দেখা আলো।

নেবুমাসির সেই শানানো গলা খানিকটা খাদে নামা। মুখে স্মৃতি রোমন্থনের পরিতৃপ্তির ছাপ।

বয়েস তখন দশ, জগৎপুরের রাজবাড়ি থেকে সম্বন্ধ এল। কোতা থেকে কার মুখে নাকি শুনেচে দৌলতপুরের লাহিড়ীবাড়িতে এক রূপের ধ্বজা মেয়ে আচে বে'র যুগ্যি—পাটিয়ে বসল ঘট্‌কী। বাবা তাকে কুটুমের মতন আদর যত্ন করলেন, একজোড়া কাপড় আর সিদে দিয়ে বিদেয় দিলেন, কিন্তু বিয়েব মত দিলেন না। রাজবাড়িতে মেয়ে দেওয়া মানে মেয়েকে জন্মের শোদ বিলিয়ে দেওয়া। জামাই-মেয়ে নিয়ে আদর আহ্লাদ করতে পারব না, মেয়েকে ইচ্ছে মতন আনা নেওয়া করতে পারব না, একটা সন্তান, মায়ের প্রাণ বোধ মানচে না। মায়ের দোহাই-ই দিলেন ভদ্দরতার দায়ে।... ঘটকী না কি হেসে বলেছিল, তার মানে ঘরজামাই রাকতে মন? বাবা বলেছিলেন, তা কক্‌খোনো না। ঘরজামাইয়ে আমার ছেদ্দা নেই। কথায় বলে, কালো বামুন কটা শুদ্দর বেঁটে মোছলমান, ঘরজামাই আর পুষ্যিপুত্তুর সবকটা সমান।

হঠাৎ ঢ্যাঙা বলে ওঠেন, তা আমিও তো কালো বামুন—আমাকেও ওই দলে ফেলছিস তো?

নেবুমাসি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, তোর আবার বেশি বেশি বিনয় ঢ্যাঙা। তুই আবার কালো কোতা? এখনই দিন দিন পোড়াকাটের মতন হয়ে যাচ্ছিস। ছোটকাল দিব্যি ঘিওলো ঘিওলো রং ছিল। বাতিকে বাতিকেই গেলি তুই। দুধ খাব না, ঘি খাব না, অধিক মিষ্টি খাব না—এতে কি আর চেহারায় শরীরে লাবণ্য থাকে?

ঢ্যাঙা চড়া গলায় বলেন, খাব না বললেই রেহাই দিস যে? জোর করে খাইয়ে খাইয়ে আমাশাব ধাত জন্মিয়ে দিলি। আশী বছরের বুড়োর চেহারায় আবার লাবণ্য।

নেবুমাসি তেড়ে উঠলেন, সেই ইস্তক আশী বচর আশী বচর করচিস ক্যান্‌রে ঢ্যাঙা? বলি, আমি বড না তুই বড?

ওঃ, ভারী তো বড়! তিন মাসের বড়, তার আবার বড়াই!

তিন মাস নয়, সাড়ে তিন মাস। নেবুমাসি দৃঢ় গলায় বলেন, আমি আশ্বিনের পয়লা, আর তুই পৌষের মাঝামাঝি। তা যে যাই হোক, বড় বৈ তো ছোট নয়? তবে আমার আশী না হতেই তোর আশী হয় কী করে?

তোরই বা হতে কতক্ষণ?

নেবুমাসী আরো দৃঢ় গলায় বললেন, যতোক্ষণ না সামনের আশ্বিন আসবে, ততক্ষণ?... হচ্ছিল লাহিড়ীবাড়ির সবধেন নীলমণি মেয়ের বিয়ের ঘটাব গপ্‌পো, দিলি তো ভণ্ডুল করে? দিবি বৈকি! হিংসের জ্বালা! নিজের তো ও গুড়ে বালি! তা বুঝলে বাছা—আঃ তোমার নামটি বাপু কেমন যেন পেটে আসে

মুখে আসে না। বলি ডাক-নাম নেই?

সুদত্তা কিছু বলার আগে প্রবাল বলে ওঠে, আছে। জানি।

সুদত্তা রেগে বলল, আছে! জানো? কোথা থেকে জেনেছ শুনি?

কোথা থেকে? নাঃ সোর্সটা বলব না, তবে জেনেছি—বলি?

না বলে ছাড়বে ভেবে কি আর প্রসঙ্গটা তুলেছ?

রেগে যাচ্ছ মনে হচ্ছে। তবে থাক।

সুদত্তা বলল, থাক-এর কিছু নেই। মা বাবা খুকু বলে ডাকে। একেই যদি ডাক নাম বলতে চাও বল।

খুকু! নেবুমাসি এক গাল হেসে বললেন, আহা, এমন মিষ্টি নামটি থাকতে আমি হোঁচট খেয়ে মরচি। তা বুজলে বাছা খুকু! আমার বাবা ওর বে দেবার জন্যে কম ব্যস্ত হননি, কিন্তু বাবুর এক গোঁ, ঘর নেই বাড়ি নেই বৌ এনে রাকবো কোতায়।.... বাবা শেষ অবদি রেগেই গেলেন, বললেন, অ্যাতো বড বাড়িখানায় তোর একটা বৌয়ের জায়গা হবে না? তবু গোঁ ছাড়ল না। নিজের পায়ে দাঁড়াব বলে কোতায় যেন চলে গিয়ে কত দিন কাটিয়ে এলো। .... তারপর বাবার মৃত্যুকালে বাবা—

সরোজমোহন রেগে বললেন, হচ্ছিল জমিদার কন্যে শরদিন্দু-নিভাননীর বিয়ের ঘটার গল্প, তার মধ্যিখানে এ হতভাগার জীবন কাহিনী ফাঁদতে বসছিস কেন? হ্যাঁ, ঘটা একখানা হয়েছিল বটে। ..... পলা তোরা ছোটবেলায় সে কাহিনী শুনেও থাকবি।

অসতর্কে নিজেই তিনি গল্পের খেই হাতে তুলে নিয়ে বসলেন। এবং চালিয়েও গেলেন। অবশ্য নির্বিঘ্নে নয়। প্রতি ধাপে প্রতিবাদের ধাক্কা খেতে খেতে।

তবু প্রবালের শোনা গল্প আবার ঝালানো হল আর খুকুরও শোনা হল—

নেবুমাসির বিয়েতে নাকি সেই পাকা দেখার দিন থেকে বিয়ের অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত রোজ দুবেলা যজ্ঞি চলেছিল। পাকা দেখা উপলক্ষে দিক দিগন্তর থেকে যত আত্মীয় কুটুম্ব এসেছিল, শশাঙ্ক লাহিড়ী তাদের আর ফিরে যেতে দেননি, আটকে ফেলেছিলেন। এক মাসের আগে আগে ছাড়েননি।

শ্রোতারা বলে ওঠে, চমৎকার। তিনি না হয় আটকে ফেললেন, লোকেরাও আটকে গেল? কাজ ছিল না কারুর?

তা একেবারেই ছিল না কি? ছিল। তবে তখনকার মানুষের এই শ্র যুগের নূতন এমন কাজ কাজ বাতিক ছিল না। থাকুক কাজ, তা বলে মান্যিমান একটা লোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে? শশাঙ্ক লাহিড়ী সবাইকে হাত জোড করে বলেছিলেন না—আমার জীবনে এই একটাই কাজ! এই প্রথম, এই শেষ। হবে না হবে না করে সাত ঠাকুরের দোর ধরে বুড়ো বয়সে এই মেয়ে। প্রাণ ভরে সাধ আহ্লাদ করব এই বাসনা।

তবে? এমন একটা আবেগময় অনুরোধের সামনেও লোকে নিজের কাজ দেখাবে? যাদের আপিস ইস্কুল, তারা কামাই করবে। চুকে গেল সমস্যা। তাছাড়া আসল কাজটি তো সমাধা হবে।

শ'দুই লোক বাড়িতেই ছিল, এ বাড়ি, কাছারী বাড়ি, জ্ঞাতিদের বাড়ি সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে খাবার ব্যবস্থা এইখানে। বিরাট বিরাট দুটো চালা বানানো হয়েছিল, একটা মেয়েদের একটা পুরুষের। তাতে সকাল থেকে রাত অবধি পাত পড়ার বিরাম নেই। জনা দশ কাজের লোক মোতায়েন ছিল সারাক্ষণ পাতা ফেলতে আর পাতা পাততে।

এখানে ঠিকরে উঠেছিলেন নেবুমাসি, হাঁদার মতন কতা বলিসনে ঢ্যাঙা। যারা পাত ফেলছিল, তারাই পাত পাতছিল? বলি এ বাড়িতে এমন মেলেচ্ছ কাণ্ড কবে দেকেচিস? পাত পেতেচে স্বজাতির মেয়ে পুরুষে।

তোর তো বিয়ে, তুই সব দেকতে গিয়েছিলি?

না যাই। জ্ঞানগম্যি তো আচে একটা! গোয়াড়ি না হাঁসখালি কোতা থেকে যেন এক কুড়ি হালুইকরকে

এনে স্থাপনা করিয়ে রাকা হয়েচিল, তারা কি ঘোড়ার ঘাস কাটচিল?

তবে তুইই বল।

কেন, এটুকু বলতেই তোর মুক ব্যথা হয়ে গেল? তো আমিই বলচি। বুঝলে খুকু, ওই ওদিককার মাঠে চালা তুলে জোল কেটে উনুনই বানানো হয়েছিল আটটা দশটা।

আটটা দশটা? তবে তো খুব বললি। এদিকে জলপানির দিকে আরো চারটে উনুন কাটা হয়নি? ফি দিন সক্কাল না হতেই ঝোড়া ঝোড়া কলাই ডালের বোঁদে ভাজা হচ্ছিল না? তার সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি খাস্তা নিমকি?

হ্যাঁ সে খবর তো তোরই বেশী জানবার কতা—নেবুমাসি হি হি করে হেসে উঠলেন, সেইখানেই তো পড়ে থাকতিস সকাল থেকে!

অকৃতজ্ঞতা করিসনে নেবু, শালপাতার ঠোঙা বানিয়ে বানিয়ে চুপি চুপি সাপ্লাই করা হত না তোর কাছে? বুঝলি পলা, বিয়ের দিন সকালে নিম্‌কি খাব বলে কি ঝুলোঝুলি! বলে কিনা শেষ রাত্তিরে খানিকটা দই চিঁড়ে গিলিয়ে গেল, আমার গা কেমন করছে?।... দোহাই ঢ্যাঙা, দু'চারখানা নিমকি এনে দে চুপি চুপি। যা সুবাস ছাড়ছে। ওই মাঠে কড়া চাপিয়েছে, এখানে ঘিয়ের গন্ধ ভেসে আসছে। কোথা থেকে যেন ঘি আনিয়েছে।

ওঁদের কথার ভঙ্গী শুনলে মনে হতে পারে, ঘটনাটা বুঝি এখনই ঘটছে। সত্যিই বুঝি সেই কোথা থেকে আনানো ভালো গিয়ের গন্ধ ভেসে আসছে।

থাক, ওই নিয়ে আবার অত বিশদ কিসের রে ঢ্যাঙা? দিয়েছিলি?

বাঃ! সেদিন না তোর উপোস করার কথা! দিয়ে অমঙ্গল করি আর কি!

আহা, না দিয়েও কি মঙ্গলের বাহার! হেসে গড়িয়ে পড়লেন নেবুমাসি, বচর না ঘুরতেই তো ঘরের মাল ঘরে ফিরে এলো।

এলো, সে বিধাতার লিখন। কিন্তু তখন তো আর সে বুদ্ধি হয়নি। নির্ঘাৎ মনে হত বিয়ের দিন খেয়েই এই কাণ্ডটি হল। আর নিজেকে মহাপাপী ভেবে—ঢ্যাঙা হাসলেন। চিরদিনের মজ্জাগত কুসংস্কার। ছেলে বুদ্ধি! কেবল মনে হয়েছে নিশ্চয় কোথাও কোন দোষত্রুটি ঘটেছে।

নেবু ঝঙ্কার দিলেন, ছেলেবুদ্ধি আবার কী? বুড়ো বুদ্ধিতেও তো ওই কথা বলছে। কেউ বলল, রাজার মুখের ওপর না করায় অপমানে শাপ দিয়েছে রাজা তাই এই দশা। দ্বিরাগমন না হতেই কপাল পুড়ল মেয়ের। হি হি হি, আমার কিন্তু তখন কি মনে হয়েছিল জানিস রে পলা, বাঁচলাম বাবা। আর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না।

চমৎকার! এদিকে তো কার্পেটে 'পতি পরম গুরু' ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

ও মা! শোন কতা? সে তো একটা শিল্পকাজ শিকচি বলে। ঘরে গুণে গুণে বুনলেই তো কতাটা নেকা হয়ে যায়। 'বন্দেমাতরম' ছিল 'জননী জন্মভূমিশ্চ' ছিল। যে যেমন প্যাটার্ণ ধরেছিল। আমি ওটা নিয়েছিলাম সোজা বলে। তা হটাৎ যকন খবরটা এলো, পিসি চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এসে বলল, 'ওরে নেবু, তুই এখানে প্যায়রা গাছে চড়ে বসে আছিস। তোর যে কপাল পুড়ল।' শুনে চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেকচি আগুনের ধারে কাচে আসিনি, পুড়ল কি করে! অবিশ্যি সেকালের তুলনায় আমি কিছু খুকী ছিলাম না, কিন্তু ববরাবরই ডাকাবুকো ছিলাম, আর যত বেটাছেলের মতন খেলায় ঘুড়িয়ে বেড়াতাম, তাই মেয়েলি কথা বেশী শিখিনি তখনো। তা আমার সকল ডানপিটেমির আজ্ঞাবাহী ছিল ঢ্যাঙা।

২

আকাশের আলো কখন বিদায় নিয়েছে, কখন কোন্ ফাঁকে কে যেন একটা হ্যারিকেন জ্বেলে বসিয়ে রেখে গেছে—খেয়াল নেই কারো। চলছে এই ভাবেই। দীর্ঘ দিন পরে দুটো সহিষ্ণু শ্রোতা পেয়ে যেন স্থানকালপাত্র হারিয়ে ফেলেছে মানুষ দুটো। হারিয়ে ফেলেছে বয়েসের ভার।

সুদত্তা অবাক হয়ে দেখছে, একশোবার বাদ প্রতিবাদ চালালেও, গল্পও এরা এমন ভাবে চালাচ্ছে, যেন এই ক'দিন আগের ঘটনা।

প্রবাল অবশ্য হেসে হেসে বলেছে, কি সুদত্তা, কেমন গল্প শুনছ? এক যে রাজা, 'থামনা দাদা। রাজা নয় সে রাজপেয়াদা' মনে পড়ে যাচ্ছে না?

সুদত্তা হাসল, কিন্তু সে হাসি কৌতুকের মাটিতে দাঁড়িয়ে নয়, কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে।

প্রবাল বলল, কি যেন ভাবছ মনে হচ্ছে?

হুঁ ভাবছি।

কী?

নিজেও এখনো ঠিক বুঝতে পাবছি না।

আমি বুঝতে পারছি।

তাই বুঝি?

হুঁ। ভাবছ তো, এই ভাবে এরা জীবনটা কাটাচ্ছে কী করে? আর কেনই বা কাটাচ্ছে।

সুদত্তা একটু হাসল। বালকের কথায় বিজ্ঞরা যেমন হাসে।

এভাবে হাসলে যে?

এমনি।

আমার ব্যাখ্যাটা অর্বাচীনের মতো লাগল মনে হচ্ছে?

আচ্ছা থাক।

খেতে বসে তিনজনেই রেকাবির মিষ্টি আলাদা থালায় তুলে রেখেছিল, বাদে নেবুমাসি। এখনকার ছেলেমেয়েদের খাওয়া নিয়ে ধিক্কার দিয়েছেন নেবুমাসি, এবং অধিকতর ধিক্কার দিয়েছেন তৃতীয় ব্যক্তিটিকে। আধুনিকদের দেখাদেখিই যে ঢ্যাঙার এমন অধঃপতন, সেটি সরবে ঘোষণা করে। নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে চারখানা ছানার জিলিপি, দুটো কাঁচাগোল্লা, দুটো খাস্তা গজা ও খানকয়েক হিংয়ের কচুরি সহযোগে চা খেয়ে বাড়তিগুলো ঘরে তুলতে গেছেন। ঢ্যাঙা গেছেন তাঁকে আলো ধরতে। আলো অবশ্য আধুনিকতার পাপে কলঙ্কিত টর্চ।

এই অবকাশে এরা কথা বলে নিচ্ছে।

প্রবাল সুদত্তার হাতটা একটু ছুঁয়ে বলল, ভাবছি এঁদের ভ্রান্তি নিরসন না করলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

তার মানে?

মানে হচ্ছে, ইয়ে আর কি, নন্দর ধারণা মতো থাকলে মন্দ কি হত? আমাদের একটু নিজস্ব গল্প-টল্প করার সুযোগ সুবিধে জুটত। নেবুমাসির বিচক্ষণতা আমাদের সাহায্য করত। তা তুমি যা না খেপচুরিয়াস হয়ে উঠলে।

ওঃ। তুমি বলছ, সেই অসভ্যতাটা চালিয়ে যাওয়াই ঠিক ছিল?

ওই আর কি! মানে ক্ষতিটা আর এমন কি হত!

থামো! শেষ পর্যন্ত জল কোথায় পৌঁছত তা খেয়াল আছে?

প্রবাল মাথা চুলকে বলল, সেটা কোন ভাবে ম্যানেজ করা যেত না? ধর আমি আবদার করে বললাম, ঢ্যাঙাদাদু, আজ তোমার সঙ্গে আমি একঘরে শোব, গল্প-টল্প করব।

আজ! তা বেশ! কাল? পর্শু? তর্সু?

আচ্ছা আচ্ছা, ভুল হয়েছে। তুমি অমন অগ্নিমূর্তি হয়ো না। বসে বসে সত্তর বছর আগের এক বিয়ের ঘটা-পটার গল্প শোন। যা দেখছি, সেই রাজসূয় যজ্ঞে কোন্ দিন কী রান্না হয়েছিল তাও শুনতে হবে আমাদের।

সুদত্তা বলল, হোক না। সেটাই বা মন্দ কী? এও তো এক ধরণের ইতিহাস। শতবর্ষ পূর্বের বাঙালীর সমাজজীবনের ইতিহাস।

তুমি যে এমন হার্টলেস্, আগে অনুভব করিনি।

অথচ তুমিই আমার কাছে তোমার নেবুমাসির গল্প করেছ।

সে আলাদা! এখন ওই দুই বুড়ো-বুড়ির বোকার মতো ঝগড়া দেখে—

থামতে হল। কারণ অভিযুক্ত আসামী যুগল সেই একই অপরাধ করতে করতে এসে পড়ল।

তোর ক্ষুরে আমি নমস্কার করি ঢ্যাঙা। বাচ্চুকে মাংস আনার কতা বলে রাকতে ভুলে গেলি? ও কি আর ভোর সকালে আসবে? হয়তো বেলায় অ্যাকেবারে মাচ নিয়েই চলে আসবে। এরা এয়েচে—শুধু মাচ দিয়েই চালাবার মতলব, কেমন?

প্রবাল তাড়াতাড়ি বলল, ওই মাছই তো ভালো নেবুমাসি। আবার মাংস-ফাংস কেন? ওখানে তো কেবলই ওই খাওয়া হয়। বরং তোমার ঘরের সেই সব ঘণ্ট নাকি, আর পোস্তর বড়া, ছেলেবেলায় যেগুলোয় দারুণ আকর্ষণ ছিল—সেই কর না।

নেবুমাসি হেসে উঠে বললেন, সে সব থেকেই কি আর বঞ্চিত হবি? শহুরে নাতনীকে কি আমি মোচার ঘণ্ট, গুঁড়ো মশলার সুক্তো, বড়িপোস্ত না খাইয়ে ছাড়ব? তবে শুধু তাই দিয়েই কাজ সারব নাকি? সকালে মাচ ভাত, পাঁচটা বেঞ্জন হোক, রাত্তিরে নুচি মাংস, পায়েস, মিষ্টি—

নেবুমাসি, তোমার রান্নাঘরের বারোমাসেব অতিথি হয়ে থেকে যাব না কি? যা লোভ দেখাচ্ছ।

আহা রে। সবাই অমন বলে। বেণুও সেবার এসে বলেছিল, দৌলতপুরে এখনো যা দৌলতের নমুনো দেকচি, থেকে যেতে ইচ্ছে করচে। ওই দু-চার দিনই ভালো লাগে রে। কাজের তাড়ায় ছুট ছুট।

ওইতো! 'কাজ' বলে একটা কড়া মনিব আছে। সে যাক, তুমি আর ওই মাংস-টাংসর জন্যে লোক ছুটিও না।

নেবুমাসি আত্মস্থ গলায় বললেন, ছোটাতে বাকি আচে নাকি? ঢ্যাঙা চলে গেল দেকলি না? গিয়ে নন্দর বৌকে বলে রাকবে, সে নন্দকে দিয়ে বাচ্চুকে খবর দেবে। ও হয়ে যাবে।

কী আশ্চর্য? এত ঝঞ্ঝাটের কী দরকার ছিল মাসিমা? সুদত্তা বলল, ভীষণ লজ্জা করছে আমার। আমি এলাম বলেই তো এত ব্যস্ত করা।

নেবুমাসি হঠাৎ গলা খাটো করেন। বলেন, এই ছুতোয় ওরও একটু খাওয়া হবে, তাতেই আরো ব্যস্ত করা, বুজলে না? এদিকে ওই জিনিসটিতে খুব মন। কিন্তু আমার অসুবিধে হবে বলে কিচুতে আনতে দেবে না। বলে, একটা মানুষের জন্যে এত হ্যাঙ্গামা। আমি যদি বাচ্চুকে বলে রাকি, তলে তলে বারণ করে রাকে। তা এই কেউ এলে গেলে তার সুবাদে হুকুম করি। নচেৎ মিচে করে বানিয়ে বলি, বাচ্চু খেতে চেয়েচে, নন্দ মুক ফুটে বলেচে একদিন একেনে পাতা পাড়বে। ওই করে ওই একটু হয়। পেটে খিদে মুকে লজ্জা, এই মানুষকে ভাল মন্দ একটু খাওয়ানো দুষ্কর। আগে কেবলই বলত বসে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্চি কোতাও চলে যাই। একদিন আচ্ছা করে তুলো ধোনা করে গাল্ দিতে তবে সে বাতিক ছেড়েচে। জম্মোকাল এ বাড়িতে রইল, তবু পর পর ভাব গেল না। ওই যে আসচেন বাবু!

হুকুম তামিল করে আসা হয়েছে—বেশ প্রাবল্যের সঙ্গে কতাটা বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন সরোজমোহন।

সঙ্গে সঙ্গেই নেবুমাসি বলে উঠলেন, কেতাত্ত হলাম। একটু বেশী করে আনতে বলা হয়েচে কি? বাচ্চু ছোঁড়াটাও খাবে তো। সুখী সুখীর মা রয়েচে।

ও সব জানি না। আনতে হবে সেটাই বাচ্চুকে বলে এলাম। ওর সঙ্গেই দেখা হল।

ঠিক আচে। বললেন নেবুমাসি, বাচ্চুর আন্দাজ বুদ্ধি তোর থেকে বেশী আয় খুকু, তখনকার গপ্পোর বাকিটা শেষ করি আয়।

সরোজমোহন ব্যঙ্গের গলায় বললেন, বাঃ, চমৎকার! এখুনি ভদ্রলোকের মেয়েটাকে তুই-তোকারি আরম্ভ করা হয়ে গেছে?

গেচে! আমি গাঁইয়া ভূত, ওই রকমই ব্যাভার। তোর সাধ হয়, আপনি আজ্ঞে কর। নয়তো বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসে থাকগে। একেনে থাকলেই তো কতায় কতায় ফোড়ন কেটে গপ্পো এগোতে দিবি না।

ঢ্যাঙা জেদের গলায় বলে উঠলেন, ঠিক আছে। আয় পলা, আমরা বেটাছেলেরা বৈঠকখানা ঘরে গিয়েই বসিগে।

নেবুমাসি কথার ডানা মেলে এক ঝাপট মারেন, কেন? পলা যাবে কেন? ও বলে পুরনো গপ্পো শুনতে কত ভালোবাসে।

ও ভালোবাসে কিনা জানি না, আমি কিন্তু ভীষণ ভালোবাসি মাসিমা। বলল সুদত্তা।

ও পাগল মেয়ে! মাসি কেন? বল দিদিমা। পলা ছোঁড়া মায়ের দেকাদিকি নেবুমাসি বলে তাই। নচেৎ দিদিমা হই তো।

বলায় কি আসে যায়? সুদত্তা বলল, একটা কিচু বললেই হল।

শোন কতা! একটা কিচু বললেই হল? নেবুমাসি নিজস্ব ভঙ্গীতে হি হি করে হেসে ওঠেন, যাকে তাকে তুই প্রাণেশ্বর বলতে পারিস? যাকগে তামাশার কতা, পুরনো অট্টালিকায় বসে পুরনো কালের কাহিনী শোন। একেনে বাতাস বইচে দেক কী প্রাণ জুড়ানো। একেই কবিরা বলে মলয় বাতাস, তাই না রে পলা?

অতঃপর সেই মনোরম মলয় বাতাসের স্পর্শে উদ্বেলিত হৃদয়টি নিয়ে পলাকে শোনা গল্পই বসে বসে শুনতে হয়, গাঁ-সুদ্ধু লোকের কারো ঘরে ওই একটি মাস উনুন জ্বলেনি। বাবার হুকুম। জ্বলতে দেওয়া হয়নি। সব এই যুজ্ঞিবাড়ি থেকে হবে। মায় কচি ছেলের দুধটা বার্লিটা পর্যন্ত।....

দেখা যায় ঢ্যাঙা তাঁর লম্বা ছায়া নিয়ে এই আসরেই বসে আছেন একটি গোলালো তাকিযা কোলে নিয়ে, এবং যথারীতিই কথার মাঝে মধ্যে ফোড়ন কেটে চলেছেন।

যে সব জ্ঞাতি গোত্র ওই এক মাস ধরে ভোজ খেলো, তারাই শেষে বলে বেড়াতে লাগল—মেয়ে বছরের মধ্যে বিধবা হবে এ আর আশ্চর্য্যি কী, এত বাড়াবাড়ি ভাগ্যে সয়? ভাগ্যেরও একটা সহ্যশক্তির সীমা থাকে।

নেবুমাসি বললেন, তা কেন? সেই সোনার কড়ি নিয়ে কড়ি খেলার—

সোনাব কড়ি! সুদত্তা অবাক হল।

ওই তো। আমার মায়ের উদ্ভুট্টি শক। তাঁর এত আদরের মেয়ের এত সাধের বিয়ে, মেয়ে বরের সঙ্গে কড়ি খেলবে সোনার কড়ি নিয়ে। তাই নিজের আঠারো ভরির গোট ভেঙে সওয়া পাঁচগণ্ডা কড়ি গড়িয়ে রেখেছিলেন। তাই দেখে সব গিন্নীরা রাগারাগি করতে লাগল—পয়সার গুমোরে শাস্তর নিয়ম উল্টানো...বাপের কালে কেউ শুনেচে সোনার কড়ি দিয়ে শুভকাজ হয়!...শেষ পর্যন্ত রাগারাগি করে সবাই আবার সমুদ্দুরের কড়ি এনে খেলাল, আর কোন্ ফাঁকে কে যে সেগুলো সরিয়ে ফেলল!

আবার হঠাৎ হেসে ওঠেন নেবুমাসি, সত্যি কথা বলি ভাই, সেই কড়ি ক'টা হারানোয় যত দুঃখু হয়েছিল, কপাল পোড়ায় তত নয়। এমন খাশা গড়েছিল যেন সদ্য কড়ি। আমাদের সেই শশীস্যাকরার যা হাত ছিল—

এলোমেলো কথা বলছিস কেন নেবু? তোর বিয়ের সময় আবার শশীস্যাকরা কোথা? তখন তো শশীর বাবা তারাপদ—

তুই বড়ো জানিস, না? বলি তুই বড়ো না আমি বড়ো?

তোর তিন মাসের বড়ো-গিরি তুলে রাখ নেবু। তুই বিয়ের কনে, তুই এত সব খবর জানতিস?

আর তুই যেন মস্ত গার্জেন ছিলি। তাই সব খবর রেখে বেড়াতিস।

তা বেড়াতামই তো। ফাঁকে ফাঁকে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে তোর কাছে সব খবর সাপ্লাই করতে হত না?...ঢ্যাঙা জোর গলায় বলেন, তখন কী খোসামোদ! বুজলি পলা? হেই ঢ্যাঙা লক্ষ্মীছেলে, কোতায় কী হচ্চে আমায় বলে যা। জিগ্যেস করলে লোকে বেহায়া বলবে। এদিকে আমার প্রাণ ছটফট করচে। বাবা যদি আর কারুর বিয়েতে এমন ঘটা করত, আমি প্রাণ ভরে আমোদ করতে পেতাম।

প্রতি পদে এহেন বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও, সুদত্তার সেকালের ঐশ্বর্যশালী বাঙালীর সমাজ জীবনের ইতিহাস একটু একটু করে জানা হয়ে যায়।...সুদত্তা বলে, ঐশ্বর্যটা তারা কেবল মাত্র স্ত্রী-পুত্রের উপভোগের গণ্ডির মধ্যেই নিবদ্ধ রাখতেন না। ভাগ করে ভোগ করতে জানত।...

সবাই তাই করত না হাতী—নেবুমাসি ঝঙ্কার দিয়েছেন, বাবার আমার জমিদারীর আর কোলিয়ারির পয়সা সব বারো ভূতে খেয়েচে।

কিন্তু সেই ঝঙ্কারের মধ্যে শুধু শব্দ ঝঙ্কারই দেখা গেছে, আক্ষেপ নয়।

৩

আমি কিন্তু খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি নেবুমাসি। রাত্রে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে সুদত্তা বলল।

না, আর মাসিমা নয় যথাযথ নিয়মে দিদিমাও নয়, সেই নেবুমাসিতেই এসে পৌঁছে গেল এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। হয়তো সেটাই আশ্চর্যের কারণ।

এই পুরনো বাড়ির ঘরে ঘরেই কালো কালো পালিশ উঠে যাওয়া বড়ো বড়ো জোড়া খাট পাতা, তবে নেবুমাসির ঘরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। একখানা সোরু চৌকিতে নেবুমাসির স্বল্প উপকরণ যুক্ত বিশুদ্ধ শয্যা।

সেই ঘরেরই ফাঁকা দেওয়ালের ধারে অন্য কোনো ঘর থেকে একটা সোরু খাট আনিয়ে পাতা হয়েছে, এবং ফর্সা চাদর বালিশ সম্বলিত বিছানা পাতা হয়েছে।

ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সুদত্তা—শূন্য শূন্য ঘরগুলোর দেয়ালেও বড়ো বড়ো এক একখানা আর্শি বসানো আছে, এ ঘরে তার কিছুই না। এ ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা মাত্র আলনা, তাতে নেবুমাসির দু-একটা থান ও ধুতি ও সেমিজ লম্বমান।

নেবুমাসি বলেছিলেন, পাশেই আয়না-টেবিলওয়ালা সাজানো ঘর রয়েছে ভাই, কিন্তু এই বুড়ো বুড়ো জানলা দরজাওলা বৃহৎ পুরনো ঘরে একা তোর ভালো লাগবে না, ভয় লাগবে। তাই এই বুড়ির ঘরেই স্থাপনা করলাম তোকে।

তারপর দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিলেন, তোরা যে আমার আশায় ছাই দিলি। নাতবৌ এলো বলে আহ্লাদে ভাসছি, তা নয় এখনো হবু। এখনকার যে সব কায়দা হয়েচে নেকাপড়া না শেষ করে বে করব না। ইদিকে নেকাপড়ারও শেষ হবার নাম নেই। মেয়ে পুরুষ সবাই বিদ্যের জাহাজ হবে এই পণ! তা যাক, এই বুড়ি বেঁচে থাকতে থাকতে শুভ কাজটা সেরে ফেলে একবার আসিস ভাই। সাধ মিটিয়ে—চুপ করে গেলেন।

সুদত্তা এই নিশ্চিত বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেনি, তুমি যত সিওর নেবুমাসি আমরা নিজেরা এখনো ততো নই। এখনো আমরা নিজেদের মন বুঝতে পারছি না।

সুদত্তা তাই ও পথ এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, বেঁচে থাকতে থাকতে মানে? একশো বচ্ছরের আগে আপনাকে পৃথিবী থেকে নড়তে দিচ্ছে কে?

নেবুমাসি হাসলেন, তা অসম্ভবও নয়। বাল্যবিধবার পরমায়ু পাথর দিয়ে বাঁধানো থাকে টসকাতে জানে না। নইলে দ্যাক এই আশী বচর বয়সেও তোদের মতন যুবিদের থেকে তিন গুণো খাচ্ছি, তিন টপ্‌কায় সিঁড়ি ভাঙছি। তবে মরতেও তো পারি।

ঘর বিছানা দেখিয়ে দেবার সময় এ সব আলোচনা। এখন শুতে এসে সুদত্তা খাটে পা ঝুলিয়ে বসে

বলল, আমার কিন্তু খুব অবাক লাগছে নেবুমাসি।

নেবুমাসি বললেন, কেন বল তো?

ভাবছি আপনারা তো পুরনো কালের লোক, পুরনো সংস্কার, এ ভাবে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একসঙ্গে ঘুরতে দেখে রাগ করলেন না, বিরক্ত হলেন না, নিন্দে করলেন না বরং এত ভালোবাসছেন—

নেবুমাসি হেসে উঠে বললেন, যে কালে যে ধর্ম, আমরা পুরনোরা রাগ করলে আর নিন্দে করতে বসলেই কি কাল তার স্বধর্ম হারাবে? আমাদের আমলে সাহেব মেমরা কোর্টশিপ করত, এ আমলে তোরা করচিস। জিনিসটা আমাদের অজানা নাকি?

আমরা কিন্তু মোটেই এটা ভাবিনি নেবুমাসি। একসঙ্গে পড়ি, বেড়াই-টেড়াই এই পর্যন্ত।

নেবুমাসি ঈষৎ গভীর গলায় বলেন, ও কথা বলিসনে ভাই, ছেলেটার মুখ চোখ দেখতে পাসনে? তোর পানে তাকালেই বিভোর—

সর্বনাশ! নেবুমাসি এই সব দেখছেন আপনি? ধ্যেৎ! কক্ষনো না।

দেখব বলে কি আর দেখচি রে বাপু। চোকে পড়ে গেলে করব কি? যাকগে। একটা কতা ভাবছি সারাদিন—

কি ভাবচেন? কাল সকাল থেকে রাত অবদি কি কি খাওয়াবেন আপনার আদরের অতিথিদের?

নেবুমাসি হেসে ফেলে বললেন, তাও ভাবছি, তবে আরো একটা কতা ভাবছি, থাক কাল বলব।

প্রবালের আশ্রয় জুটেছিল সরোজমোহনের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত তার উচ্চ হাসি আর উচ্চরবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, সুদত্তা ভাবছিল এই ভেঙে পড়া প্রাসাদেব মধ্যে এই জীর্ণ বিবর্ণ সব আসবাব পত্রের আবেষ্টনে, দিনরাত্রির খাজনা জুগিয়ে চলা ছাড়া আর তো কোনো কাজ নেই বুড়ো ভদ্রলোকের—তবু এত প্রাণশক্তি আসে কোথা থেকে?

মহিলাটির কথা তবু আলাদা। তিনি তাঁর পিতৃকুলের কুলমর্যাদা, বংশমর্যাদা, আচার-আচরণ সবকিছুর দায়িত্ব বহন করে চলে আসছেন, তার মধ্যে কর্তৃত্ব গৌরব রয়েছে। রয়েছে সংসার করার সুখও।.

হলেও সে সংসারের সদস্য সুখী, সুখীর মা, চিরকালের প্রজা ঘর, বিনা ভাড়ায় বাসিন্দা রিকশাওলা নন্দ, আর পুরনো সরকার মণি পালের নাতি বাচ্চু। সংসারের ঠাট তো আছে। বাড়িটাই সংসার।

তবে প্রকাণ্ড এক প্রশ্নচিহ্নের মতো বিরাজ করছেন ওই বৃদ্ধ।

অনেক রাত্রে শুনতে পেল সুদত্তা, নেবুমাসি গলা তুলে কাকে যেন বলছেন, আজ রাতে কী আর ঘুমুতে-টুমুতে হবে না? বলি ঘুমের কম্‌তিতে ছেলেটার শরীর বিগড়ালে?

কত বাত এখন? প্রবাল এখনো জেগে ছিল?

হঠাৎ খুব একটা ব্যাকুল আবেগ অনুভব করল সুদত্তা। ইচ্ছে করলেই সুদত্তা স্বর্গলোকের একখানি টিকিট কিনে ফেলতে পারে।

৪

ঘুম ভাঙল সুদত্তার রিকশাওলা নন্দর ডাক-হাঁকে।

দাদাবাবু গাঁ দেখতে বেরোবেন নাকি? গাড়ি মজুত আচে।

নেবুমাসি কখন উঠে গেছেন কে জানে। দেখল ওঁর বিছানাটি পরিপাটি করে ঝাড়া ঠিক করা। আস্তে বেরিয়ে এসে ভিতর দালানের জানালার ধারে দাঁড়াল সুদত্তা। দেখতে পেল উঠোনের ওপারে বারান্দায় প্রবালও সদ্য নিদ্রোত্থিত ভাবে দাঁড়িয়ে।

অপূর্ব একটা আনন্দরসে ভরে উঠল মন। নিজেকে হঠাৎ নববিবাহিতা বধূর মতোই মনে হল সুদত্তার। প্রবালের মুখে চোখেও বুঝি সেই একই অভিব্যক্তি। ইশারায় বলল, যাচ্ছি ওদিকে।

আর এই সময় নেবুমাসির চড়া গলার প্রশ্ন শোনা গেল—এই অতি সকালে গাঁ দেকাতে নিয়ে যেতে এসেছিস মুকপোড়া? একটু বোধ-গ্যান নেই? বলি বিচানা থেকে তুলে নিয়ে যাবি নাকি? অ্যা!...কাগে এখনো বাসা ছাড়েনি। এখনো এসেচ গাড়ি নিয়ে!

নন্দ সতেজে বলল, আমার কি দোষ? দাদু কাল বলে থুয়েছে ভোরে আসবি নন্দ। বেলা করে বেরোলে ফিরতে রোদ চড়া হয়ে যাবে।

অ তাই বল। আমিও তাই ভাবচি, নন্দ এমন সাতসকালে কাঁথা মাদুর ছেড়ে এয়েচে! যা, এখন যা, এক ঘণ্টা বাদ আসবি।

খোয়া খাপরা রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা চলার শব্দ শোনা গেল। এবং নন্দ বিদায় পর্ব সমাধা হতে না হতেই সরোজমোহনের বিরক্ত গলা শোনা গেল, দেওয়া হল তো বিদেয় করে? নাও দেখ এখন কোন্ বেলায় আসে। ওদের এক ঘণ্টা মানেই তিন ঘণ্টা।

সুদত্তা আর প্রবাল দুজনে দু'দিক থেকে ঝুঁকে একই দৃশ্য দেখতে পায়।

লাল টুকটুকে সিমেন্টের দাওয়া বোধ হয় সদ্য ধোওয়া হয়েছে, ঈষৎ দূরত্ব রেখে মুখোমুখি দুখানি আসন পেতে চা খেতে বসেছেন। সদ্যস্নাতা নেবুমাসির পরণে কেটে থান, গায়ে একটা মটকা চাদর।

নেবুমাসির সামনে একটি উঁচু পাথরের গেলাসে চা। ঢ্যাঙার সামনে অবশ্য কাঁচের গ্লাস। চায়ের আসল সরঞ্জাম নামেনি। তার মানে এটি ওদের বলতে গেলে বেড-টী।

আচ্ছা, মুখের ভাবে তো পরিতৃপ্তির কোনো অভাব নেই। তবে গলার স্বর এই সক্কালবেলাতেই এমন কড়া কেন? নেবুমাসিরই অধিক।

তবে আর কি, হাত মুখ ধোবে না, চা জল খাবার খাবে না, বিচানা থেকে উঠেই গাঁ দেখতে বেরোবে। কী একেবারে তাজমহল দেকবার দেশ!

তাহলে আর ঘটা করে দেখতে যাওয়াই বা কেন? সরোজমোহন প্রায় খিঁচিয়ে ওঠেন. ফেরার সময় রোদ চড়বে সেটাই বলা হয়েছে। গোঁসাইবাগানে যাবে, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে যাবে—

যাবে তাতে আর কী? তোর সব তাতেই উটোন সমুদ্দুর ঢ্যাঙা। আমি এই নিত্য দিন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে যাই, তোর বচরে এ্যাকদিন হয়ে ওঠে না। রিশকোয় যাবে আসবে—বলি ওটা হচ্চে যে?... গেলাশটা পাত। বাটিতে চা আচে আরো।

বাঁ হাতের কাছে একটা ঢাকা দেওয়া বাটিতে বোধ হয় বাড়তি চা মজুৎ। ঢ্যাঙা সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, ওই তো ওইটুকু, থাক ও থেকে আর তোর দাতব্য করতে হবে না, নিজের গলায় ঢাল।

রাগ বাড়াসনে ঢ্যাঙা। কেন? সবটুকু আমার গলায় ঢালতে হবে কেন? মরুভূমি হয়ে আচে বলেচি?

তবে দে বাবা দে! গেলাসটা পাতলেন সরোজমোহন।

নেবুমাসি আঁচলের কোণ দিয়ে বাঁ হাতে বাটিটা ধরে দুটো গেলাশেই একটু একটু ঢেলে নিলেন।

সরোজমোহন একটু কোমল হাসি হেসে বললেন, এই সকালের চাটুকুই চা! এ চায়ের সঙ্গে সুখীর মা'র হাতের চা। হুঁঃ!

চা সাঙ্গ করেই উঠে গলা তুললেন সরোজমোহন. ওহে প্রবালবাবু, উঠেছেন নাকি?

উঠে পড়ে নেবুমাসিও গলা তুললেন, হল ডাক-হাঁক শুরু? কাল তো মাজ রাত্তির অবদি বকবক করে ছেলেটাকে ঘুমুতে দাওনি—

তবে ঘুমোক। যা বরং নাতির গায়ে আঁচল চাপা দিয়ে বসগে যা। এই মেয়েছেলেগুলোই হচ্ছে দেশের সর্বনাশের মূল। মায়ায় মরে গিয়ে বেটাছেলেদের আর বেটাছেলে হতে দেয় না।

নেবুমাসির হি হি হাসি ধ্বনিত হলয়, ওঃ, কী আমার পণ্ডিতমশাই বুদ্দি চূড়োমণি এলেন গো! তো বলি, তোর জন্যে তো জম্মোজীবনে কেউ মায়ায় মরেনি ঢ্যাঙা, তুই কেন ইয়া বীরপুরুষ হয়ে যুদ্দে গেলি না। ঘরকুনো কুড়ের সর্দার।...নে, ওষুদটুকু খেয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে করগে যা।

রোজ রোজ কিসের ওষুধ? খাব না, যাঃ।

মদু দিয়ে মেড়ে ফেলেচি ঢ্যাঙা, আজ খেয়ে নে। কাল থেকে খাসনে।

এ কথা তো রোজ বলিস।

কি করব? হাঁপানির টান উটলে আমারই তো দুদ্দশা। এই ব্যাধিটি যদি না থাকত, নেবু এই দৌলতপুরের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকত? চাটি-বাটি উঠিয়ে কাশীবাস করতাম গিয়ে।

সরোজমোহনের বিদ্রূপের গলা আকাশে ওঠে, থাম নেবু, আর বাকতাল্লা মারিস না। তুই নইলে আর কাশীবাসী হবে কে? বলে একটা তেল মাখার বাটি হারালে বাড়ি মাথায় করিস, এই বৃহৎ পুরী দু'বেলা ঝাড়ু না পড়লে রাজ্য রসাতলে যায় তোর, আবার বৈরিগী বুলি!...আমার ব্যাধি আমার আছে, তোর কি?

তা তো নিশ্চয়। নেবুমাসি গম্ভীরভাবে বলেন, কতাতেই আছে মামার শালা পিসের ভাই তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। তা এ তো আবার পিসের ভাইপো। ওদের ছোটো কাল থেকে দেখচি বলেই এ্যাকটা বিবেক-বোদ।

ওরে বাপ! শুধু বৈরাগ্য নয়, আবার বিবেক। যাত্রা পালা একেবারে। আর এক গেলাশ চা গলায় ঢাল নেবু। নইলে মাথা পরিষ্কার হবে না! বলে হা হা করে হেসে ওঠেন সরোজমোহন।

গোঁসাইবাগানের পথে যেতে যেতে নন্দ বলে, আজন্মো এক ঠাঁই রইল তবু দুটো মনিষ্যি যেন সাপে নেউলে। দেখতেচেন দাদাবাবু?

দেখতেচি।

ব্রেদ্ধ হয়েচে, এখনো সেই ছোটোকালের ঝুটোপুটি ঝগড়ার অবোস গেল না। আমরা দেখি আর হাসি। অথচ এমনিতে দুটো মানুষই খুব ভালো। বাচ্চু বলে দুজনারই বোধ হয় কোঁদল লগ্নে জম্মো!

হাত চালাও নন্দদা। মানে পা চালাও। প্রবাল বলল, আগে যখন বাড়িতে আরো লোকজন ছিল। তখন এমন ছিল না বাবা। কে কোথায় থাকত। এখন ফাঁকা বাড়িতে চেঁচামেচির খুব সুবিধে হয়েছে।

সুদত্তা অদ্ভুত হেসে বলল, চেঁচামেচির সুবিধে নয়, চেঁচামেচিটাই সুবিধে।

তা চেঁচামেচিও থাকল, হাসি গল্পও থাকল পুরো দমে। খাওয়া দাওয়ারও মহোৎসব চলল। যাওয়ার আগের দুপুরে নেবুমাসি সেই কাল বলব বলে তুলে রাখা কথাটি ব্যক্ত করেন।

কবে আছেন কবে নেই তিনি বলা তো যায় না। তাই প্রবালের ভাবী বৌয়ের আশীর্বাদ পর্বটা সেরে রাখবেন তিনি। অতএব—

হ্যাঁ সেই অতএবটাই আসল। শবদিন্দুনিভাননীর বাবার দেওয়ালে পোঁতা চোরাসিন্দুক থেকে তাঁর গহনার বাক্সটি বার করে দিতে হবে।

আমার সেই গিণির মালাটা আমি মনে মনে পলার বৌ'র জন্যে তুলে রেকেচি। নেবুমাসী বললেন।

গিণির মালা, প্রবাল লাফিয়ে ওঠে। ক্ষেপেছ না পাগল হয়ে গেছ? নাকি আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছ নেবুমাসি? আজকালকার দিনে গিণির মালা! ঢ্যাঙা দাদু, তুমি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

নেবুমাসি সতেজে বলেন, আমার জিনিস, আমি যদি স্বেচ্ছায় কাউকে উপকার দিই, তাতে থানা পুলিশের কথা আসে কেন রে?

কেউ বিশ্বাস করবে না নেবুমাসি! গিণির মালা! এক একখানা গিণির এখন কত দাম জানো?

জানিনে। জানতে চাইওনে। আমি তো কিনতে যাচ্চিনে। বাবা দিয়েছিল, ও তো আমার স্ত্রীধন। যাকে ইচ্ছে দেব। দিইনি কী? কতজনাকে কত দিয়েচি আগে আগে। গহনা তো কম ছিল না। বুঝলি খুকু, ওজন করে দু'সের সোনা দিয়েছিল বাবা—

দু'সের! সুদত্তা হেসে উঠে বলল, সোনার সের!

তোদের একালে ভাতের চাল ভরি দরে বিকোয় আমাদের সেকালে অবস্থাপন্নের ঘরে সোনার হিসেব ওই রকমেই হতো বাছা। মাতা থেকে পা অবদি সোনায় মোড়া বৌ গিয়ে দুধে আলতার পাতরে গিয়ে

দাঁড়াল। ... আর তো যাইনি, সকল সোনা বাবার ওই চোরা সিন্দুকের মধ্যে। তো একে একে বিলিয়েচি অনেক। যতজনের বে হয়েচে, একেকখানা করে গহনা দিয়েচি। চর বাজুবন্দ, চিক সিঁতিপাটি, সীতাহার, পুষ্পহার, গোট, বিছে, অনন্ত, তাগা, ইয়া মকরমুকো বালা, ফাঁস হার রতনচুর—

নেবুমাসি। প্রবাল বলে ওঠে, এই সব তুমি দাতব্য করেছ? শুনে আমার মাথা ঘুরছে। দিলে কোন্ প্রাণে?

হেসে ওঠেন নেবুমাসি, কি ছেলেবয়েসের বুদ্ধি। বিধবা মানুষ গহনা নিয়ে কী করব? তা যাক, একনো যা আচে অনেক। পালিশপাতের চুড়ি, বারোমেসে গোখরিচুড়ি, মানতাশা, ও গিণির মালাটা—তো বাক্সটা তুই আমায় বের করে দে দিকিনি ঢ্যাঙা।

ঢ্যাঙা অম্লান মুখে বলেন, কত কাল থেকে বলছি না, চাবিটা হারিয়ে গেছে। লোকজন ডেকে চাবি বানাও।

নেবুমাসি ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, শুনছিস পলা বেআক্কেলের কতা! লোকজন ডেকে আমি চোরাসিন্দুক দেকাই। পর দিন বাড়িতে ডাকাত পড়বে না?

ঢ্যাঙা অবিচল, তবে আমি নাচার!

নাচার বললেই নাচার? আমি বড় মুক করে বললাম গিণির মালা দিয়ে আশীর্বাদ করব পলার হবু বৌকে—

তুমি দিলেই কি আমি নিতাম নেবুমাসি? প্রবাল বলে।

নিতিস না?

পাগল তো নই! তাছাড়া তুমি তো স্বপ্নে বাগান বানাচ্ছ। তোমার ওই খুকু আমার বৌ হতে রাজী হবে কিনা সে-গ্যারান্টি আছে?

বটে? নেই গ্যারান্টি? ডাকত দেকি তাকে—খুকু!

থাক থাক—ঢ্যাঙা বলে ওঠেন, জিনিসটা যখন দিতেই পারছ না—

দিতেই পাচ্ছি না? সাফ জবাব? তুই বুড়ো ধাড়ি ছেলে, সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে বসে আচিস। তা. একটু হায়া লজ্জা নেই? চাবি না থাকে পলাতে তোতে চাড় দিয়ে খোল।

প্রবাল আর সরোজমোহনের চোখে চোখে একটা ইশারা খেলে যায়। এবং প্রবাল প্রবল স্বরে বলে, চাড় দিয়ে? সেকালের বিলিতি কোম্পানির দেয়ালে গাঁথা আয়রণ সেফ চাড দিয়ে খুলবে তুমি নেবুমাসি? বরং তোমার বাবার এই বাড়িখানা চাড় দিয়ে খুলতে পারতে পারো—ওটিকে পারবে না।

তবে কি তোরা বলতে চাস, আমার সেই গহনার কাঁড়ি, সেই গিণির মালা দেয়ালের মধ্যে গুম্‌খুন হয়ে মরে পচবে? ও সব শুনতে চাই না ঢ্যাঙা, গিণির মালা আমার চাই-ই চাই।

চাই বললেই চাই? আজ দশ বছর ধরে তো সেই চাবি খুঁজছি রে বাপু। না পেলে?

পাশের ঘরে সুদত্তা। শুনতে পেয়েছে সবই।

স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবে, তাকে কেন্দ্র করে এ কী ভয়ানক একটা কলঙ্কিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে পড়ল? সুদত্তা কি ছুটে গিয়ে বলবে, আমি এক্ষুনি চলে যাব। ফুল ভেবে যা ধরতে যাচ্ছিলাম, সেটা এমন ভয়ঙ্কব একটা সাপ?

ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক! কিন্তু তাই কি সম্ভব? এত বড় ভয়ানক অপরাধ করে এমন নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকতে পারে কেউ?

চাবি তুই হারালি কেন?

ইচ্ছে করে কেউ হারায়? তুই আমায় দিতেই বা গিয়েছিলি কেন? নিজে রাখলেই পারতিস।

আমি ও সব কলকব্জা জানি? ইংরিজি ইংরিজি অক্ষর সব ঘোরাতে হয়, কতা তৈরি করতে হয়, সে কি আমার কম্মো?

তবে যেমন কম্ম তেমনি ফল ভোগ কর। বাপ ভাইকেই লোকে বিশ্বাস করে চাবি দেয় না, আর

আমি একটা পরস্য পর, আমার হাতে চাবি দিতে এলি। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। এখন কী করবি কর। পুলিশ ডেকে হাতকড়া দিতে ইচ্ছে হয়েছে!

বলেছি আমি সে-কতা?

পাকে প্রকারে বলছিস। চাবি হারিয়ে গেচে। গিণির মালা পাওয়া যাবে না, ব্যস—বলে সরোজমোহন নামের ব্যক্তিটি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

নেবুমাসি চেঁচাতে থাকেন, এত অহঙ্কার ভালো নয় ঢ্যাঙা। আমায় মনিষ্যি বলেই মনে করচিস না। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলি—

প্রবাল এ ঘরে এসে বলে, সত্যি কথাটা বলে ফেলুন না দাদু! দারুণ চটেছেন নেবুমাসি।

সরোজমোহন একটু রহস্যের হাসি হেসে বলেন, সত্যি কথাটা শুনলে আরও চটবে রে পলা। যখন শুনবে ওর জন্যেই আমার এই অকম্মো তখন—

কিন্তু আপনার এই ডিসিশান নেওয়াটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত ঢ্যাঙা দাদু।

সরোজমোহন গম্ভীর ভাবে সিগারেটে টান দিতে দিতে বলেন, উপায় কী বল? রাজকন্যের যে অনুষ্ঠানের ক্রুটি হবার জো নেই। বাড়ি ভেঙে ওয়ার হচ্ছে, তবু ঠাট-বাটটি বজায় থাকা চাই। দোল-দুর্গোৎসব চাই, গোটা চারেক দাসদাসী চাই—এখনো লোকলৌকিকতার বাহারটি সমান রাখা চাই। পাড়ায় কারো বাড়িতে ভাত পৈতে বিয়ে হোক না, এ বাড়ি থেকে সেরা মাল যাবে। আকাশ থেকে পড়বে টাকা? কিন্তু এতদিন বেচারা জানতেন তার বাক্সভর্তি গহনা আছে, হঠাৎ যদি টের পান সব হাওয়া, হার্টফেল করে বসবেন না? সেই ভয়েই তো চাবিটাকে হারাতে হয়েছে রে ভাই।

কিন্তু ভয়টাব কি সত্যিই কোন মূল্য ছিল? না অমূলক?

নইলে এরা যখন চলে আসছে, তখন কি না বলে ওঠেন নেবুমাসি, থাক হয়েছে। আর চাবি খোঁজা চাবি খোঁজা চাবি খোঁজা খেলা খেলতে হবে না ঢ্যাঙা। এরা এগোচ্চে, বেরিয়ে আয় ঘর থেকে। চাবি বেরোলেই কি আর আমার সেই গিণির মালা বেরোবে? ও নির্ঘাৎ তুই তলে তলে বেচে খেয়েচিস! নচেৎ দশ বচর ধরে নাকি লোকে চাবি খুঁজে মরে পায় না! ..... সন্দ আমার হয়েচে কবে থেকেই, লপচপানি চলচে কোথা থেকে? নেবু যখন গা হুকুম করচে তামিল হচ্চে। নেবুব বাপের জমিদারী তো ওদিকে টুঁ টুঁ হয়ে এয়েচে।..... অমনি হচ্চে? কত ধানে কত চাল বোজে না নেবু? কিন্তু তোর দুঃসাহসকে বলিহারী দিই ঢ্যাঙা। এ বার্তা পাঁচ কান হলে লোকে তোকে কি বলবে ভেবে দেকেচিস?

ঢ্যাঙা বিশ্ব নস্যাতের ভঙ্গীতে বলেন, দেখব না আবার কেন? তুই যা বলছিস, তাই বলবে। বলবে চোর।

কি? কি বললি? আমি তোকে চোর বলেচি?

চোর না হয় জোচ্চোর বলেছিস।

নেবুমাসি চড়া গলায় বলেন, তা বলবই তো, জোচ্চোরকে জোচ্চোর বলব না তো কি মহাপুরুষ বলব? বল তো পলা—বল তো বাছা খুকু? '

সুদত্তা প্রণাম করছিল। প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত নেবুমাসি!

রিক্শায় চলতে চলতে প্রবাল বলল, আসার সময় ওই কথাটা বলা তোমার ঠিক হয়নি সুদত্তা। শুনতে খারাপ লাগল।

কোন্ কথাটা? সুদত্তা সচকিত হয়।

ওই নেবুমাসির সঙ্গে একমত হওয়া।

সুদত্তা হেসে উঠে বলে, সত্যি কথাগুলোই সব সময় শুনতে খারাপ লাগে প্রবাল। চিরদিনই তো লোকটা জোচ্চুরী করে এসেছে। নিজের সঙ্গে, ভালোবাসার লোকের সঙ্গে।

সূর্যোদয়

প্রস্তুতি চলছে অনেকক্ষণ থেকে।

আশ্চর্যসুন্দর মহান আবির্ভাবের প্রস্তুতি।

সারা পূব আকাশ জুড়ে সেই প্রস্তুতির সমারোহ।

শিল্পী বসেছেন রং-তুলি নিয়ে, চলছে তুলির টান একটার পর একটা। সেই টানে ফুটে ফুটে উঠছে—কী লাবণ্য, কী সুষমা!—রং একটাই, কিন্তু একটা রং থেকেই যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের কত কারিগরি সম্ভব, এ যেন তারই নমুনার আসর।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চমক লাগে, অন্তরালে অবস্থিত অদৃশ্য সেই মহান শিল্পীর পরম মহিমার কাছে মাথা নত হয়ে আসে।—নিত্য দেখা এই অপরূপ উদ্ভাসনের দৃশ্য চন্দ্রকান্তর মধ্যে যেন একটা ব্যাকুলতা এনে দেয়। বিরহের মত, বিচ্ছেদ বেদনার মত। পরম কোনো উপলব্ধির আনন্দ বুঝি বিষণ্ণ বেদনারই সমগোত্র।

তবু এই অনির্বচনীয় স্বাদটুকুর জন্য শেষ রাত্রি থেকে আর ঘুম হয় না চন্দ্রকান্তর। ঘোর ঘোর অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে পূবের দালানের খোলা খিলানের সামনে পাতা জলচৌকিটায় এসে বসেন—আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এ একটা নেশার মত চন্দ্রকান্তর।

চিরপুরাতনের এই নিত্যনতুন প্রকাশ, চন্দ্রকান্তর কাছে যেন এক অফুরন্ত বিস্ময়ের ডালি।

যেন প্রতিটি তিমির রাত্রির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে চন্দ্রকান্তকে এই আশ্চর্য উপহারটি দেবার জন্যই তার ডালি সাজানো। ঋতুতে ঋতুতে প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য। তবে সব থেকে মনোরম বুঝি এই গ্রীষ্ম ঋতুর নির্মল ঊষার আকাশ। এ ঋতুতে রাত্রি শেষ না হতেই যবনিকা উত্তোলনের আভাস দেখা দেয়।

আকাশে বর্ণচ্ছটা, বাতাসে প্রাণকণা।

আর কোনো ঋতুতে এমন দীর্ঘস্থায়ী সমারোহ নেই আবির্ভাব উৎসবের। আর কদিন পরেই ঋতুর পালা বদল হবে, বর্ষা এসে পড়বে, পঞ্জিকার পাতায় তার ইশারা। সে সময় নিজেকে যেন বড় বঞ্চিত লাগে চন্দ্রকান্তর। এখন তাই লোভীর মত প্রথম থেকে শেষটুকু পর্যন্ত উপভোগ করে নেবার জন্যে উঠে এসে বসে থাকেন, অনুভূতির গভীরে গিয়ে।

অবশেষে রূপ থেকে অপরূপ, জ্যোতিঃ থেকে জ্যোতির্ময়। কোলের উপর জড়ো করে রাখা দুখানা হাত আপনিই জড়ো হয়ে যায়, আর বুঝি আপনিই উচ্চারিত হয়—

ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—

একটু পরে আস্তে পাশে রাখা গীতাখানা তুলে নিয়ে খুলে ধরেন। পড়তে হয় না, সবই মুখস্থ, তবু নিত্য পাঠের নিয়ম রাখতে সামনে খুলে ধরা। 'পেজমার্ক' হিসেবে আছে ছোট্ট একটু ময়ূরপুচ্ছ, চন্দ্রকান্তর বাবার আমলের। —বাবার পাঠ করা গীতা, বাবার হাতের 'পৃষ্ঠা চিহ্ন'। এটি চন্দ্রকান্ত তদবধিই পাঠের অভ্যাস করেছেন। পাঠ শেষে আবার সেটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে বই মুড়ে ফেলে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে চলেন—গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে সারমুত্তমম্—

গীতামাহাত্ম্য! এও নিত্য পাঠের অঙ্গ।

হোলো তোমার?

স্তব্ধতার সুর কেটে দিয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল এই আকস্মিক প্রশ্নের আঘাত। যেন নিস্তব্ধ দুপুরে দূরবর্তী ঘুঘুপাখির উদাস করুণ সুরের একটানা ছন্দের মাঝখানে উচ্চকিত হয়ে উঠল একটা চিলের কর্কশ ডাক।

চন্দ্রকান্ত চমকে ফিরে তাকালেন।

—অথচ চমকাবার কারণ ছিল না। আকস্মিক নয়, নির্দিষ্ট নিয়মের প্রশ্ন।—সুনয়নী এসে দাঁড়িয়েছেন শ্বেত পাথরের গেলাসে মিছরির পানা নিয়ে। এটাই চন্দ্রকান্তর সকালের পানীয়। এও তো প্রতিদিনই নতুন হয়ে দেখা দেয় পুষ্টি আর তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়ে, দেখা দেয় শুভ্র সুন্দর আধারে বাহিত হয়ে। তবু কী একঘেয়ে লাগল, কী অরুচিকর!

জিনিসটা একঘেয়ে? না, একঘেয়ে এই বহু-ব্যবহারে জীর্ণ প্রকাশ ভঙ্গীটা?

চন্দ্রকান্ত চট করে গেলাসটার জন্যে হাত বাড়ালেন না। সুনয়নীর দিকে তাকালেন একবার। সন্দেহ নেই, সদ্য স্নান করে এসেছেন সুনয়নী। কিন্তু পরনের তসর শাড়িটা মলিন বিবর্ণ লাট হয়ে যাওয়া, তেল-হলুদের হাত মোছার ছাপও সুস্পষ্ট।

দু'হাতে মোটা মোটা দু'গাছা কুমীর না হাঙর—কী যেন মুখো বালার সঙ্গে শাঁখের শাঁখা, বাঁ হাতে গোটা আষ্টেক নোয়া। ভিজে চুলের সিঁদুরের রেখাটা ভিজে ভিজে হয়ে কপালের উপর গড়িয়ে আসছে, আর সেই গড়িয়ে আসার ঠিক নীচেই গোলা সিঁদুরের চটচটে প্রকাণ্ড টিপটা নাকের উপর নেমে আসার তাল করছে।—শিরা প্রকট হয়ে ওঠা শীর্ণ মুখটায় এতো বড় টিপখানা যেন একটা অসঙ্গতি। সদ্য স্নাতা, কিন্তু সদ্য-স্নানের স্নিগ্ধ প্রশান্তি কই?

চন্দ্রকান্তর মনে হল, একদা সব সময় মনে হয়েছে 'সুনয়নী' নামটা কী সার্থক। ঘরে পরে বলেছেও সবাই সে-কথা। এখন আর ওর নামটা কারও মনেই পড়ে না। অবশ্য মনে পড়বার খুব কারণও নেই, নাম ধরে তো আর ডাকেন নি কখনো? স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর নাম উচ্চারণে শাস্ত্রীয় বাধা, পুরুষের পক্ষে তো তেমন কোনো বাধা নেই, তবু স্ত্রীকে কে কবে নাম ধরে ডাকে?—সেই যে একদা ছোটবৌ নামের জামাটা গায়ে চড়িয়ে এ-সংসারে ঢুকেছিল 'সুনয়নী' নামের মেয়েটা, ওই জামার আড়ালে তার নিজস্ব পরিচয়টা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নাও ধরো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে হাঁ করে?

চন্দ্রকান্ত হঠাৎ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে একটু হেসে বলেন, আমি যতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো।

ঢং। সুনয়নী ঠোঁটটা টিপে একটু ভুরুর ভঙ্গিমা করলেন।

ঢং কেন? দেখছিলামই তো হাঁ করে।

আচ্ছা খুব ন্যাকামি হয়েছে। নাও নাও—ছিষ্টির কাজ পড়ে।

চন্দ্রকান্ত হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে বলে উঠলেন, নেহাৎ কম ভোরে তো ওঠো না, ভোরের আকাশটা একটু দেখতে ইচ্ছে করে না?

সুনয়নী আবার ভ্রূভঙ্গী করলেন, কী দেখতে ইচ্ছে করে না?

ভোরবেলার পূব আকাশ। সূর্যোদয়ের দৃশ্য।

সূর্যি ওঠার দৃশ্য! সুনয়নী একটু ঝংকার দিলেন, খেয়ে-দেয়ে তো কাজ নেই আমার, তাই ভোরবেলা তোমার মতন আকাশ পানে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকব! বলে ঘুম থেকে উঠে পর্যন্তই চর্কি-পাক।

আচ্ছা, এতো কি কাজ তোমাদের বলতে পারো?

চন্দ্রকান্ত গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েছিলেন, আবার নামিয়ে ধরে প্রায় হতাশ গলায় বলেন, এতোগুলি মেয়েছেলে তোমরা, সবাই শুনি সকাল থেকে চর্কি-পাক ঘোরো। সেই চর্কিটা কী?

কী? তাই এখন তোমায় বোঝাবো বসে? নাও নাও, খেয়ে নাও তো। গেলাসটা নিয়ে যাই। কোথায় নামিয়ে রাখবে, কে ঠোক্কর দেবে, হয়ে যাবে দফা গয়া।

পতিসেবার পুণ্যটি অর্জন করতে শখ, তার জন্যে একটু সময় দিতে রাজি নয়।

চন্দ্রকান্ত গেলাসটা খালি করে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন। নীলকান্ত উঠেছে?

এই এক শখ চন্দ্রকান্তর—ছেলের পুরো নামটা ধরে ডাকা।

কে নীলে? সুনয়নী ঠোঁট উল্টে বলেন, সে নইলে আর এই সাতসকালে উঠবে কে?

অন্যায়, খুব অন্যায়! একটু পরেই তো পণ্ডিতমশাই এসে যাবেন।

পণ্ডিতও তেমনি, ও ওঠে না দেখে নিজেও দেরি করে আসেন।

আশ্চর্য! বরং ঠিক সময় এসে ছাত্রকে লজ্জা দিয়ে শিক্ষা দেয়া উচিত।

সুনয়নী আর একবার ঠোঁট ওল্টান, হ্যাঁ, বিশ্বসুদ্ধু লোক যে তোমার মতন উচিতের পুঁথি হাতে নিয়ে বসে আছে।

গেলাসটা নিয়ে সুনয়নী চলে যান।

চন্দ্রকান্তর হঠাৎ মনে হয়, একদা সুনয়নীর ঠোঁটের গড়নটা কী সুকুমার ছিল! একটা বিশ্রী মুদ্রাদোষের জন্যে গড়নটাই বদলে গেছে।

শুধুই কি চোখ আর ঠোঁট?

মাথা থেকে পা অবধি সমস্ত গঠন-ভঙ্গিমাটাই কি ছিল না সুন্দর সুকুমার? ছিল। বড় সুন্দরই ছিল।

বৌ দেখে চন্দ্রকান্তর ঠাকুমাকে সবাই ধন্যি ধন্যি করেছিল, নাতবৌ এনেছ বটে চন্দরের ঠাকুমা, যেন সরস্বতী প্রতিমাখানি।

হ্যাঁ, 'সরস্বতী প্রতিমাই' বলেছিলেন সবাই, বাজার চলতি 'লক্ষ্মী-প্রতিমা' কথাটি ব্যবহার করেন নি।

নতুন কনের শাঁখের মত শাদা রঙের সঙ্গে নিখুঁৎ কাটছাঁটের মুখ আর পাতলা ছিপছিপে গড়ন। সরস্বতীর তুলনাই মনে আনিয়ে দিয়েছিল দর্শকদের।

এই 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে যাওয়ার ধ্বনিটা সদ্য তরুণ অথবা প্রায়-কিশোর বরের কাছে এসে পৌঁছেছিল বৈকি। বাড়ির পাকাচোকা ছোট মেয়েগুলোর মারফৎ। মুখরাপ্রখরা বৌদি-স্থানীয়দের মারফৎ। নইলে আর কীভাবে হবে? বিয়েবাড়িতে গিন্নীরা যেখানে মহোৎসাহে একসঙ্গে মসগুল, বিয়ের বর তো সেখানের ত্রিসীমায় নেই।

বিয়ের বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যেকার নিজ ভূমিকাটুকু পালনের শেষেই তো বরের অন্তঃপুর-রঙ্গমঞ্চ হতে দ্রুত প্রস্থান।

তবু কানে এসে যাচ্ছে প্রায় সবই।

কম্পিত পুলকিত দুরু-দুরু বক্ষ বর গভীর হতাশার সঙ্গে ভেবেছে—আমায় কি আর একটু দেখতে দেবে? কী সব পুজোটুজো হয়ে গেলেই তো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। লোকমুখে অবশ্য শুনেছে, বরকেও নাকি সেই সঙ্গে যেতে হয়, 'জোড়ে' না কি!...কিন্তু তাতে আর লাভটা কী হবে, ঘোমটাখোলা মুখটা তো আর দেখতে দেবে না কেউ।

বিয়ের রাত্রে 'শুভদৃষ্টি' নামের ব্যাপারটার সময় অবশ্য একটা সুযোগ হারিয়েছে। উপায় কী? সবাই মিলে বলেছিল, তাকাও তাকাও, তাকিয়ে দেখো। তাকা না তাকা একবার—তাকাতে হয়।...কিন্তু তাই আবার পারা যায় নাকি? মাথাখারাপ!

কনে কি করেছিল কে জানে, দু'হাতে একখানা আস্ত পানপাতা মুখে চাপা দিয়ে তো বসেছিল পিঁড়ি ঘোরাবার সময়। সে পান ফেলে দিয়ে 'সুনয়নযুগল' মেলে দেখেছিল কি! বর অন্তত তা জানে না। বর মুখও তোলেনি, চোখও খোলেনি।

কিন্তু নিজালয়ে এসে বৌয়ের রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে মনে হতে থাকল, আহা, তখন যদি একবার দেখে নিতাম।

'ফুলশয্যে' বলেও একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু তার পিছনে তো একটা গভীর যড়যন্ত্রও ছিল। ক্ষুদে ভাগ্নী 'মেন্তি' চোখ মুখ ঘুরিয়ে চুপি চুপি একফাঁকে লাগিয়ে গিয়েছিল, 'জানো ছোটমামা, ওরা না সব্বাই আড়ি পাতবে। তুমি যেন বোকার মত কনে মামীমার সঙ্গে কথা কয়ে বোসো না।'

অতএব সুযোগ জোটেনি।

কিন্তু পরে দেখা গেল, 'ওরা' অর্থাৎ কৌতূহলাক্রান্ত মহিলাকুল একেবারে অবিবেচক নয়। অষ্টমঙ্গলার আগের রাত্রে ওঁরা এমন একটি ঘরে বরকনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন, যার কোনোদিক থেকেই আড়ি পাতবার উপযুক্ত গলতি জায়গা নেই। তেমন দুর্দান্ত কৌতূহল থাকলে আমবাগানের দিকে বাঁশের

ভারা বেঁধে উঠতে হবে। অবশ্য এ-ব্যবস্থার বহিরঙ্গের দৃশ্যে এটাই প্রকাশ, বাড়িতে মেলাই অভ্যাগত তখনো মজুত, ঘরের অকুলান। অতএব কোণের দিকের ওই ছোট্ট মানুষ দুটোর জন্যে বরাদ্দ হোক।

বড় ঘরে জোড়া পালঙ্ক ফুলশয্যা তো হয়ে গেছে।

পরেও কিন্তু জানলার সংখ্যায় দীন সেই ছোট্ট ঘরটাই অনেকদিন পর্যন্ত বাড়ির ছোট ছেলে-বৌয়ের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।... তা প্রথম সেই ঘরটায় ঠাঁই পেয়ে বর যখন বাড়ির দিকে সবটাই চাপা দেখেছিল, তখন কৃতার্থ হয়ে বৌয়ের কাছাকাছি খাটের একধারে বসে অনেকক্ষণ ঘামার পর বুকে জোর নিয়ে বলে ফেলেছিল, একটু ছোঁব তোমায়?

এ-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কনের ঘোমটা সরে গিয়েছিল আর তার সুগঠিত সুকুমার ঠোঁটটা উল্টে গিয়েছিল। কিন্তু শুধুই কি উল্টে গিয়েছিল? সেই ঠোঁটজোড়া থেকে একটি তিনাক্ষরযুক্ত কথা বেরিয়ে আসেনি? ...হ্যাঁ, স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল বর—

'মরণ।'

সেই প্রথম ছন্দপতন।

বাড়িতে ছোট মেয়ে অনেক আছে, তারাও কম পাকাটে নয়! হয়তো চন্দ্রকান্তর নিজের ভাগ্নী-ভাইঝিরাই এরকম শব্দ ব্যবহার করে থাকে।...চন্দ্রকান্তর ছোটমাসির মেয়ে তো (কতই বা বয়েস তার, সুনয়নীর থেকে এমন কিছু না) কথায় কথায় বলে, 'গলায় দড়ি আমার।'

চন্দ্রকান্তর কানে এলেই কানে বাজে, কিন্তু এমন প্রাণে বাজেনি কোনোদিন।

মাসতুতো বোনকে তবু বকা যায়। বলা যায়, এই এমন গিন্নীদের মতন বিচ্ছিরি করে কথা বলিস কেন?

কিন্তু এই সর্বালংকার-ভূষিতা সরস্বতী প্রতিমাকে কি বকা যায়? শুধু নিজেই মলিন হওয়া যায় মাত্র।

ঘরে আলোর মধ্যে দেয়ালে-লাগানো একটা 'দেয়ালগিরি।' কেরোসিনের আলো, পলতে বাড়ালে দিব্যি আলোই হবে। কিন্তু পলতে কমানো ছিল। তাই একটা আবছা আবছা আলো। সেই আলোয় ওই মেয়েকে যেন পরীর দেশের রাণীর মত দেখতে লাগছে। বিগলিত 'চন্দর' বিচলিত চিত্তে ভাবে, এই মুখ থেকে অমন বিচ্ছিরি একটা কথা বেরোলো কী করে?

তারপর ভাবল, গিন্নীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে বোধহয়, তাতেই এই বিশ্রী অভ্যাস। সেরে যাবে। এ-বাড়িতেও যে গিন্নীদের সঙ্গেই ঘুরবে একথা তখন মনে পড়ল না।...

একটুক্ষণ পরে মনের মলিনতা ঝেড়ে ফেলে বলল, আলোটা একটু বাড়িয়ে দেব?

কেন? আলো বাড়িয়ে কী সগ্‌গো লাভ হবে?

যদিও এটাও ছন্দের আর ধাপ পতন, তবু ছেলেটা একটু সাহসী হয়ে উঠেছে। তাই বলে ফেলে—তোমায় একটু বেশী করে দেখব।

বলার পরক্ষণেই একটুকরো হাসি ছিটকে উঠল সেই ললিত লাবণ্যময় সুকুমার ঠোঁটটা থেকে।...

হাসিটার জাত কী, সেটা অনুধাবন করবার সময় নেই, হাসিটাই তো পরম প্রাপ্তি। কৃতার্থমন্য বর খাট থেকে নেমে পড়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে যায় হাতটা বাড়িয়ে। কিন্তু সে তো মুহূর্তমাত্র।... আলোর দিকে বাড়ানো মনটা আর হাতটা ফিরে এল নিজের মধ্যে।

ওই হাসির টুকরোটার সঙ্গে যে একটা কথার টুকরোও ছিটকে উঠে ঢিলের মত এসে লাগল—সঙ না পাগল!

খাটের একধারে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট বালিশটায় মাথা গুঁজে ছেলেটা সেই যে শুয়ে পড়ল কনের দিকে পিঠ করে, সারা রাত্তিরের মধ্যে আর নড়ল চড়ল না।

বেশ কিছুক্ষণ যাকে বলে অলংকার শিঞ্জিনী, তা কানে আসতে থাকল। অস্বস্তিও হতে থাকল। মনে হতে থাকল, এতো নড়ছে কেন? ছারপোকা কামড়াচ্ছে? কই আমায় তো কামড়াচ্ছে না!. .আসলে অন্য বাড়ির বিছানায় ঘুম আসছে না, এরকম হয় অনেকের। কে জানে, ওদের বাড়ির বিছানা হয়তো বেশী

নরম।...কে জানে, মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যাস কিনা!

কনের নড়া চড়ার শব্দে এমন অনেক প্রশ্নই মাথায় এলো, কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবার সাহস হল না। কি জানি ঠকাস্ কী উত্তর আসবে পাথরের টুকরোর মত, অথবা পাথুরে ঢিলের মত।

পরদিন যে কোথায় কী ঘটনা ঘটল কে জানে। কোনো একসময় পিসতুতো বড়দিদি পদ্মলতা চুপি চুপি জিগ্যেস করে বসল, হ্যাঁরে চন্দর—কাল বউয়ের সঙ্গে কথা কসনি? কেঁদে কেঁদে মরছে।

চন্দ্রকান্ত প্রথমে শাদা হয়ে গেলো, তারপর নীল হলো, অতঃপর লাল হলো।

কেন কথা কসনি, কেন? বল?

বহুকষ্টে উত্তরটা আদায় করতে পারল দিদি। বাঃ! কী কথা কইবো?

পদ্মলতা বড়দিদি হলে কি হবে? বড় ফাজিল মেয়ে।

চন্দ্রকান্তর উত্তর শুনে মুখকে অমায়িক আর বিস্ময়াহত করে বলল, ওমা! তোদের ইস্কুলে পড়ায় নি, কী কথা কইতে হয় বৌয়ের সঙ্গে! মাষ্টার শেখায় নি?

আঃ! ধ্যেৎ!...

বলে পালিয়েছিল বর, কিন্তু অতঃপর মনের মধ্যে এক নতুন ছন্দের করুণ রাগিনী অনাহত সুরে বেজেই চলেছিল।...বৌ কেঁদে কেঁদে মরছে...বৌ কেঁদে কেঁদে মরছে...বৌ...বৌ...কেমন দেখায় সেই পরীকে কাঁদলে? কেমন দেখাচ্ছে? চন্দর কি দেখতে পাবে না একবার? কেন? চন্দর কি কেউ নয়?...বৌকে তোমরা পেতে কোথায়, যদি চন্দর টোপর ফোপর পরে গিয়ে খেটে খুটে নিয়ে না আসতো? এখন আর চন্দরের কোনো অধিকারই নেই।

কান্না মুখটা দেখতে কেমন এটা ভাবতে ভাবতে নিজেই প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছিল বর। আর নিজেকে নিজে ঠাশ ঠাশ করে চড়াতে ইচ্ছে হয়েছিল। এমন বোকা আমি, এমন বুদ্ধু আমি! বাড়ি সুদ্দু সবাই জানল, আমার অবহেলায় বৌ বেচারী কেঁদে কেঁদে মরছে।...আর কি কখনো ওরা আমাকে বৌয়ের ঘরে ঢুকতে দেবে? কক্ষনো দেবে না। দোষ শুধরে নেবার সুযোগ আর পাবো না। আমার ভাগ্য।

তা সত্যি চন্দরের ভাগ্যে সে দোষ শুধরে নেবার সুযোগ আর জুটল না। নাটকের পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল বৌ হি হি করে হাসছে। চড়বড়িয়ে কথা বলছে।

না, অনেক দিন পরে নয়, সেই দিনই।

সেই দিনই তো অষ্টমঙ্গলায় জোড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। সেখানে কান্নাব প্রশ্ন কোথায়? নিজ ভূমিতে এসে তো নিজমূর্তি। বৈঠকখানা বাড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছে, বৌ তা সদ্য শ্বশুরবাড়িবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে কোথায় কার সঙ্গে যেন হি হি করছে।

সখীদের সঙ্গে? না, মা পিসিদের সঙ্গে?

সখীদের সঙ্গে হলেই তো হয়েছে আর কি। নির্ঘাৎ সেই গত রাত্তিরের বরের কথা না বলার ইতিহাস ব্যক্ত করবে। সখীরা কি তাহলে চন্দরকে আস্ত রাখবে?

নাঃ, বোধহয় মা পিসির সঙ্গেই। একজন গিন্নীর গলা শুনতে পাওয়া গেল, গলা ছেড়ে কত হি হি করছিস? বাড়িতে জামাই রয়েছেন না?

কিন্তু তারপর ওর তো হি হি-টা বাড়লো বই কমল না।

রয়েছে তো রয়েছে, কী করবে আমায়? ফাঁসি দেবে?

হঠাৎ এতোকাল পরে সেই বেপরোয়া গলার প্রশ্নবেশী মন্তব্যটা যেন স্পষ্টই শুনতে পেলেন চন্দ্রকান্ত।

ফাঁসি শব্দটা ফাঁস থেকেই না?

তেরোদশী কখন ছাড়বে একবার দ্যাখ তো চন্দর—

কোথায় যেন একটা মিহি জালের নরম বুনুনির উপর একটা ঢিল এসে লাগল।

পাশের দেয়ালের কুলুঙ্গি থেকে পঞ্জিকাখানা পেড়ে নিয়ে উল্টে দেখে বলেন, তেরোদশী? তেরোদশী—তেরোদশী—তেরোদশী—ছাড়ছে বেলা তিনটেয়।

মরেছে। পিসি ব্যাজার গলায় বলে ওঠেন, তার মানে চৌপর বেলা গড়িয়ে সেই বিকেল বেলায় গেলন।

গেলন!

কী কুশ্রী, কী কুৎসিত শব্দ। শব্দটার ধাক্কায় যেন সকালের এই নির্মল আকাশটা ঘোলাটে হয়ে গেল। কিন্তু শব্দটা কি জীবনে এই প্রথম শুনলেন চন্দ্রকান্ত? আজীবনই তো শুনে আসছেন। আশৈশব। জেঠি পিসি সেজখুড়িদের মুখে। ওদের জীবনটা যে কত মূল্যহীন, কত ধিকৃত, সেইটা বোঝাবার জন্যেই ওঁরা নিজেদের সম্পর্কে এরকম অবজ্ঞেয় উক্তি করে থাকেন। বিশেষ করে পিসি। নাকি জ্ঞানোন্মেষের আগেই বিধবা হয়ে বসে আছেন।

পিসি নিরিমিষ ঘরের রান্না করতে যাবার সময় স্বচ্ছন্দে বলেন, বেলা গড়ালে, যাই পিণ্ডি চড়াইগে!...বাগদি বৌ-কে কদাচ কখনো যদি একখানা কাপড় কাচতে দেন তো বলেন, বৌ আমার ন্যাকড়াখানা সেদ্ধ করা আছে, ঘাট থেকে একটু ডুবিয়ে এনে মেলে দে তো—।

আর মাঝে মাঝে ওই গেলনের মাত্রা একটু বেশী করে ফেলে রোগ বাধিয়ে বলেন, চন্দর তোর ওই হোমো—পাখির দানা মানা দুটো দে দিকিন—পেটটা কেমন গুলোচ্ছে। ...জানি নিষিন্দে পাতা যমে ছোঁয় না, তবু গেরস্তকে পাছে ভোগাই তাই—

অসুখ করেছে একটু ওষুধ দে—না বলে এতো সব বিশ্রী কথা।

চন্দ্রকান্তর অভ্যস্ত কানও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন? বিকেলবেলাই বা গেলন কেন?

শোনো কথা। কেন—সে কথা জানিস নে তুই? তেরোদশী না ছাড়লে বেগুন চলবে?

চন্দ্রকান্ত তবু বলে ওঠেন, তা বেগুনটা বাদ দিয়ে সময়ে খেয়ে নেওয়া যায় না?

পিসি কদমছাঁট মাথাটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে খটখটিয়ে বলেন, বেগুন বাদ দেবো? শোনো কথা। বেগুন ছাড়া চচ্চড়ি জমবে? সুক্ত জমবে? ঝালের ঝোলটি জম্পেস হবে? কথাতেই বলে বিধবার বড়ি বেগুনের ঝোল—!

ইহ-সংসারে আর কোনো রান্না নেই? আর কোনো আনাজ নেই?

থাম্ বাবা।

পিসির মুখে একটা উপহাসের হাসি ফুটে ওঠে। যেন একটা অর্বাচীনের কথা শুনলেন।

দু-ঘন্টা আগে গিলে কি চারখানা হাত পা বেরোবে?...যাই ভালই হলো, পিণ্ডি সেদ্ধর আগে ধোঁয়া উনুনে চারটি মুগ কড়াই ভেজে নেওয়া যাবে।

চলে যান পিসি বকের মত পা ফেলে ফেলে।

আবার একটু বসে থাকেন চন্দ্রকান্ত।

আকাশের সেই বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত। সাদা রোদ্দুর দালানের দেয়ালে এসে পড়েছে। উঠে পড়লেন। নীচের তলায় নেমে এলেন।

নেমে এসেই থমকে যেতে হল, কোথা থেকে যেন সেজখুড়ির চাপা ক্রুদ্ধস্বর উচ্চারিত হতে শোনা গেল, খবরদার। টুঁ শব্দটি না। এ কথা যদি চন্দরের কানে ওঠে, তোমায় আমি বঁটিকাটা করবো।

কোথা থেকে এলো কথাটা! সিঁড়ির তলার চোরকুঠুরি থেকে কি? দুদিকে দেয়াল চাপা সিঁড়িতে তো চোরকুঠুরি একটা থাকেই। চোরকুঠুরি আর চিলেকোঠা—এ দুটো তো সিঁড়ির সঙ্গে উপরি পাওনা।

সে যাক, কী এই কথা? যা চন্দরের কানে ওঠার এতো ভয়, চন্দরের কানে ওঠানোয় বঁটি-কাটা করার মতো শাস্তি ঘোষণা। কারই বা কথা? কার সঙ্গে চন্দ্রকান্তর বিশেষ কোনো যোগসূত্র আছে!

সেজখুড়িরই গলা কি?

না, বাড়িতে আরো কেউ এসেছে টেসেছে? দিনের অধিকাংশ সময়ই তো সেজখুড়ি শুচিবাইয়ের ধান্ধায় অতিবাহিত করেন। সংসারে কারো সঙ্গেই তো তেমন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ওনাদের পিণ্ডি সেদ্দর

হেঁশেলে ওঁর কোনো কাজ নেন না পিসি ওনার হাতে পায়ে হাজা বলে। তাছাড়া সর্বত্র গোবরজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে এমন বদভ্যাস হয়ে গেছে যে, খাবার জিনিসেও সেটা চালান করে বসে। জল গোবর না হোক নিদেন পক্ষে শুকনো ঘুঁটের গুঁড়ো। খাবার জলের কলসীর মধ্যে, ঘন দুধের কড়ার মধ্যে থেকে প্রায়শঃই জিনিসটা আবিষ্কার হয়। তখনই ব্যাপারটা পুরুষমহলেরও কানে উঠে পড়ে। পিসি তো আর ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়, আর জেঠিও ছোট জায়ের প্রতি এতো মমতাময়ী নয়। হৈ চৈতে বাড়ি ভরে যায়।

সেজখুড়ি অবশ্য তাতে খুব দমেন না, তর্ক চালান। বলেন, তা গেলেই বা পেটে একটু গোবর, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? রাত্তিরদিনই তো পাপপাতক করা হচ্ছে সংসারে, ফোঁকটে যদি প্রাচিত্তির হয়ে যায়, মন্দটা কী?

সেই সেজখুড়ি হঠাৎ নিজে এতো বড় একখানা পাপ সংকল্প ঘোষণা করলেন। আশ্চর্য বৈকি! বঁটিকাটা করবার ভীতি প্রদর্শন। পাপ বলা যায় না? নাঃ, বোধহয় আর কেউ। উনি তো এ সময় উঠোনে গোবর-গোলা ছিটিয়ে বেড়ান।

কিন্তু কী সেই ঘটনা, যা চন্দরের কানে ওঠা সম্বন্ধেই সাবধানতা? মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে চলে এলেন আমিষ রান্নাঘরের দিকের রোয়াকে। এখানেও তো কোনো বৈলক্ষণ নেই। এ ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সুনয়নী যথারীতিই নিজাসনে বিরাজমান।

কাঠের উনুনে সবে আঁচ পড়েছে। ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি, সুনয়নী সেই ধোঁয়ার অন্তরালেই কী যেন করছেন।

চন্দ্রকান্ত এদিকে ওদিকে তাকালেন। না, ধারে-কাছে পিসি নেই, ছোটখুড়িও নেই। সেজখুড়ি তো থাকবেনই না।। অতএব নির্ভয়। চল্লিশোত্তীর্ণ চন্দ্রকান্ত এটি দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসেন। দরজার কাছে আসতেই ধোঁয়ার ধাক্কা। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, এতো ধোঁয়ার মধ্যে কেন? বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো।

আহা, সুনয়নী তো বললেও বলতে পারতেন, রন্ধনশালাতে যাই, তুঁয়া বঁধু গুণ গাই, ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি—

কবি গ্রন্থকার বৈষ্ণব সাহিত্য রসে রসিক পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত গুপ্তর সহধর্মিণীব উপযুক্তই হত সেটা। কিন্তু তাতো হবার নয়। হবেই বা কেন? ক'জনের ভাগ্যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ঘটনার ফসল ফলে? ধোঁয়ার আড়াল থেকে সুনয়নীর ঈষৎ ব্যঙ্গরসাশ্রিত চাঁচাছোঁলা কণ্ঠ উচ্চকিত হলো, জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলছে ডানা। তুমি আবার কী করতে ধোঁয়ায় এলে? সরো সরো, সরে যাও।

সরেই এলেন চন্দ্রকান্ত।

জানেন আর বলা বৃথা। চেনেন তো সুনয়নীকে। দেখে আসছেন দীর্ঘকাল। যতদূর নয়, ততদূর একজেদি এক-বগ্‌গা। অথচ গিন্নী মহলে সুখ্যাতির শেষ নেই। ছোটবৌমা বলতে সবাই অজ্ঞান। ছোটবৌমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে নাকি ভূভারতে দুটি নেই।

আরো তো সব বৌ আছে, এক দেয়ালেই ঘর, পার্টিশানের ওপারে বসবাস, বড় জেঠির বৌ-রা, (যাদের সূত্রে সুনয়নী শ্বশুর শাশুড়ীর একমাত্র ছেলের বৌ হয়েও ছোট বৌ) তাদের নিন্দেয় নাকি কান পাতা ভার।

চন্দ্রকান্তর কান নাকি কাছিমের চামড়ায় ঢাকা, অন্তত সুনয়নীর তাই মত। তবু ওই সব নিন্দে-সুখ্যাতি মাঝে মাঝে কানে এসে ঢুকে যায়। ও বাড়ির ওই বড়বৌ, মেজবৌ, সেজবৌ-রা নাকি স্বার্থপর, গতর-কুঁড়ে, নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো মাখানো নিয়েই বিভোর, আর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সংসারের আর কারো দিকে তাকিয়ে দেখে না।

মাঝে মাঝেই এসব কানে আসে, পিসিই তোলেন কানে এবং ওদের মুণ্ডুপাত ক'রে পরিশেষে ছোটবৌমার গুণের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হন। শুনে চন্দ্রকান্ত পুলকিত হবেন, এই ভেবেই কি তাঁকে শুনিয়ে বলেন? হয়তো সেটাই একটা কারণ, আবার গভীর গোপন আরও কারণ বিদ্যমান। কিন্তু চন্দ্রকান্ত কি পুলকিত হন? চন্দ্রকান্তর কি মনে হয় না—অনেকখানি দাম দিয়ে এই সুখ্যাতিটুকু কিনছে নির্বোধ ছোটবৌ।

তার বোধহীনতার সুযোগ নিয়ে সবাই তাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। চন্দ্রকান্ত যাই ভাবুন, সুনয়নীর বড় সুনাম।

সধবা হয়েও বিধবা গিন্নীদের পদ্ধতিতে নিজের সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখায় বলেই কি সুনয়নীর গিন্নীমহলে এতো প্রতিষ্ঠা? বৌ বটে ছোট বৌমা। ভূভারতে এমন রূপে গুণে আলো করা বৌ আর দুটি দেখবে না।

এই তাঁদের অভিমত।

এই অভিমতের সঙ্গে যোগ হয় 'লোকের বাড়ির বৌ ঝি এসে দেখে শিখে যাক। শরীরকে শরীর বলতে জানে না। আমার আমার বলতে জানে না, সাজগোজের দিক দিয়ে হাঁটে না। এমন নইলে মেয়েমানুষ।'

বলতেই হবে, এইগুলোই যদি 'আদর্শ নারী'র গুণ হয়, তো সুনয়নী সে আদর্শে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

সুনয়নীর ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে না, অসুখ করলে কষ্ট হয় না, শীতে শীত করে না, গরমে গরম হয় না, উপোসে পিত্তি পড়ে না, খাবার বেলা পার হয়ে গেলেও খিদে পায় না—এবং সুনয়নীর দিনান্তে একবারও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। অবকাশ হলেই সুনয়নী বাড়তি কাজ আবিষ্কার করে নিয়ে হাত চালাতে বসে।

কেউ অনুযোগ করলে বলে, দিনের বেলা গা গড়ালে রক্ষে আছে? রাতে ঘুম হবে না। হবে কি হবে না, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে যাচ্ছে কে?

সুনয়নী যে দিনান্তে অপরাহ্ণ বেলায় একবার আর্শি চিরুনী নিয়ে বসেন, সেটা কেবলমাত্র 'এয়ো-স্ত্রী'র এয়োত্ব রক্ষার্থে, প্রসাধনার্থে নয়।—সুনয়নী যে ভাতের পাতে মাছটুকু নিয়ে বসে, সেই নেহাত পতির মঙ্গলার্থে, জিভের আস্বাদে নয়। সেটা যে নয়, তা বোঝা যায়, অনেক বেশী মজুত থাকতেও, সুনয়নী মাছের কাঁটা চোপড়া কি চুনো মৌরলা রাখবে নিজের জন্যে।—সর্বোপরি রোগ-ব্যাধি হলে সুনয়নী ওষুধ খেতে রাজী হন না, ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন, গলায় দড়ি আমার, এইটুকুতেই ওষুধ গিলে মরবো? আগে মরণের রোগ আসুক।—নিজেকে এত অগ্রাহ্য!—এ বৌ-ও যদি 'পাশের ওপর জলপাণি' না পায় তো পাবে কে?

এরকম অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে চন্দ্রকান্তর, অতএব বুঝে ফেলেছেন আর ছারা নেই। তবে ভেবে আশ্চর্য হন, দোষগুলো গুণের পর্যায়ে উঠে গেছে কোন্ নীতিশাস্ত্রে? চন্দ্রকান্তর তো মনে হয়, সুনয়নীর মত জেদি, অবাধ্য, অনমনীয় মেয়ে তিনি কম দেখেছেন। কি জানি আদৌ দেখেছেন কিনা!...প্রায়শঃই মনে মনে বলেন চন্দ্রকান্ত, বড় বেশী দাম দিয়ে বড় তুচ্ছ একটা মাল কিনেছ ছোট বৌ। মনে করছ—ভারী, মজবুত, চিরস্থায়ী। দেখো, এতোটুকু অসাবধান হয়েছ কি ভেঙে টুকরো টুকরো।

সারাজীবন সাবধানে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বুকে করে বয়ে নিয়ে চলেছ, বুঝতে পারছ না—কিসের বদলে কী বিকোচ্ছ।

চিরদিন একান্ত সন্নিকটে থেকেও চন্দ্রকান্ত এই অপচয়িত জীবনের একটি নিরুপায় দর্শকমাত্র।

'সন্নিকটে' কিন্তু নিকটে কি?

তবু চন্দ্রকান্ত ছাড়া আর কার হিসেবের খাতায় এই অগাধ অপচয়ের হিসাবটা লেখা হয়ে চলেছে?

দুই

ভিতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বার বাড়ির দিকে আসছেন, দেখতে পেলেন, শশীকান্ত পাশ দরজা দিয়ে বাইরে থেকে ঢুকে আসছে।

চন্দ্রকান্তর চোখে চোখ পড়তেই সাঁ করে ভিতরে ঢুকে যাবার তাল করেও কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাঁ করে যাবেই বা কী করে?

শশীকান্তর পরণে সপসপে ভিজে ধুতি, মাথার চুল থেকে জল ঝরছে, কাঁধে একটা ভিজে ফতুয়া গামছার মত লম্বমান। তার থেকেও জল ঝরছে।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা 'স্নান' নয়, নেহাতই সবস্ত্রে ডুব মাত্র। হঠাৎ এর কী প্রয়োজন ঘটল?

চন্দ্রকান্তর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়, কী ব্যাপার শশী? এ সময় এভাবে?

শশী নামক ব্যক্তিটি বিশ্বসংসারে যদি কাউকে ভয় করে থাকে তো সে ব্যক্তি ভূতও নয়, ভগবানও নয়, মাত্র ছোড়দা। বড়দা মেজদাদের সামনে তো হাত আড়াল দিয়ে তামাক খায় শশী, কিন্তু ছোড়দা? সাক্ষাৎ যমসদৃশ।

তা উপার্জনে অক্ষম অপদার্থ শশীর ভাগ্যটাও এমন মন্দ, আশ্রয় জুটেছে এই যমেরই কাছে। একই সম্পর্কের অন্য দাদারা তো ডেকেও কথা বলে না।

হঠাৎ সামনে যম দেখলে লোকের যা হয়, তাই হল শশীর। শশী ঘাড় গুঁজে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যা উত্তর দিল তার অর্থ হচ্ছে—সারারাত গরমে ঘুম হয় নি, ভোরবেলায় ঘেমে যাচ্ছিল, তাই তাড়াতাড়ি খিড়কি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসেছে।

চন্দ্রকান্ত সন্দেহের গলায় বলেন, সারা রাত যে ঘুম হয়নি, সে তো মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এতো গরম পেলে কোথায়? কাল রাত্রে তো খুব বাতাস বইছিল, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কী জানি, আমার কি রকম—খুব ঘামটাম রাতে কী হয়েছিল না হয়েছিল কে জানে, এখন এই সকালেই ঘামতে শুরু করে শশীকান্ত—ভিজে কাপড় সত্বেও।

পেট-টেট গরম হয়েছিল বোধ হয়, চন্দ্রকান্ত বলেন, যাও—চট করে ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলোগে—স্নান করতে গিয়েছিলে, গামছা নিয়ে যাওনি! আশ্চর্য! এটা কত অবিধি জান?

না, মানে—ইয়ে ঠিক চানই করব ভেবে যাইনি, জলটা দেখে—

বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল শশী। জলটা দেখে কী ভাবের উদয় হল, সেটা অব্যক্ত রেখে সরেই পড়ল।

চন্দ্রকান্তর কপালে একটা রেখা দেখা গেল, শশীর আচরণটা যেন ঠিক স্বাভাবিক মনে হল না, আমার কাছে যেন কিছু গোপন করল।—রাত্রে কি কোনো অচ্ছুৎ জাতির শবদাহ করতে গিয়েছিল? কিন্তু তাতে গোপনের কী আছে? চন্দ্রকান্ত তো ইতিপূর্বে অন্য ক্ষেত্রে ঘোষণা করে থাকে, 'মড়ার আবার জাত কী? বিপদগ্রস্ত প্রতিবেশীর বিপদে এগিয়ে যাওয়াই উচিত শাস্ত্র'। তবে অকারণ ভয়।... শশীটা বরাবরই আমায় ভারী ভয় করে। কেন কে জানে! আমি তো কখনো তিরস্কার করি না।

স্বভাবটাই যে শশীর মুখচোরা তাতো নয়, চন্দ্রকান্তর অন্তরালে যে রীতিমত দাপট করে বেড়ায়, সেটা তো অবিদিত নেই কারো। সংবাদ পরিবেশক সংস্থা থেকে জেনে বাড়ি ফিরে একবার শশীকে ডেকে জিগ্যেসাবাদ করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে এগোলেন, কারণ এটা চন্দ্রকান্তর প্রাতঃভ্রমণের কাল। নিয়ম করে অনেকখানিটা হাঁটেন তিনি।

পথে বেরোলেই একটা অসুবিধে, দোহাত্তা 'সেলাম' খেতে হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ আর ব্রাহ্মণ বাদে যে কেউ পথে চোখাচোখি হলেই দাঁড়িয়ে পড়বে এবং এগিয়ে এসে পেন্নাম ঠুকবে।

চন্দ্রকান্ত যতই বলেন, প্রত্যহ দেখা হচ্ছে, তবু আবার এসব কেন বাবা? পথের ধুলো—

তা উত্তরটা যোগানোই থাকে। গ্রামের চাষাভুষো, তেলি, মালী, কামার, কুমোর, দার্শনিকতায় কেউই কম যায় না। এখন তারক তেলি প্রণামান্তে প্রণামের পদরজঃ মাথায় বুকে ও জিভে ঠেকিয়ে দরাজ গলায় বলে উঠল, পেত্যহ দেকা হলো বলো কি সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের দরজায় মাথা ঠুকবো নি ছোট কত্তা? না—বুড়ো শিবের থানের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব নি?

তোরা বড় অধিক বাড়াস তারক। এতো কিসের? আমি তো ব্রাহ্মণ সন্তানও নই।

তারক জিভ কেটে বলে, 'নয়' বলবেন না ছোট কত্তা, আপনি যাঁর সন্তান, তিনি বাম্ভনের দশগুণ বাড়া। মহা মহা বাম্ভনের থেকে চড়া বাম্ভন ছিলেন কবরেজ মশাই। তেমন মানুষ এ তল্লাটে একটা

বের করুন দিকিন।...কত কাল হল সগ্‌গে গেচেন, এখনো গরীব গুর্বোরা তেনার নাম করে ঘুরতেচে!...

তারক জোড়-করে সেই সগ্‌গের উদ্দেশ্যে একটা প্রণতি জানিয়ে বলে, আর ধুলো? ধুলোর কতা বলতেচেন? মহাজনদের চরণপশ্যে সব ধুলোই 'রজ' হয়ে যায় ছোট কত্তা।

ওরে বাবা, তুই তো বেশ শাস্তর পালা শিখে ফেলেছিস রে তারক। তা যাচ্ছিস কোথা? গায়ে জামা উঠেছে দেখছি। কুটুম বাড়ি বুঝি?

আগ্যে যা বলেচেন। খুকির শউর বাড়ি যেতেচি। মেয়েডারে পেটিয়ে দে অব্দি সব্বদা যেন চতুদ্দিকে শুণ্যি দেকি। খুকির গভ্যোধারিণী তো মেয়ের খেলাপাতি পুতুলের পেঁটরি দেকে আর ধরে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আহা খুকী আমার একটা পুতুলকে 'ছেলে' করেছেলো। সেইটা ছাড়া একদণ্ড থাকত নি, সঙ্গে নে খেতো, কাচে নে শুতো। সেইটা নে যেতে চেয়েছেলো, তা কুটুমবাড়ির পাচে কেউ কিচু বলে, তাই ওর গভ্যোধারিণী নে যেতে দেয়নি। এখন সেই দুখ্যে হাপসে হাপসে মরতেচে।

চন্দ্রকান্তর কন্যা নেই, ভাবেন—ভাগ্যিস নেই। থাকলে তো এই নাটকেরই অভিনয় হতো। দুঃখিত গলায় বললেন, মেয়ের বয়েস কতো?

এঁজ্ঞে—এই সাত পেরিয়ে আটে পা দেবে।

এতো কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কেন তারক? জানো, এতো শিশুকালে বিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কত পণ্ডিতজন মাথা খাটাচ্ছেন।

তারক একটা উদাস উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, পণ্ডিতজনা মাতা খাটাচ্‌চেন বলে কি আর এই হতোভাগা মুখ্যুজনাদের মাতা পোস্কের হবে ছোট কত্তা? এ হতভাগারা যে আঁদারে, সেই আঁদারেই থাকবে।

চন্দ্রকান্ত একটু কৌতুক অনুভব করলেন। বললেন, আঁধার বলে বুঝতে জানলে তো আর আঁধার থাকত না রে! নিজেই ভেবে দ্যাখ, এখানে মেয়ে পাঠিয়ে তোদের এই কষ্ট, আবার সেখানে কচি মেয়েটারও কত কষ্ট।

তারক মুখটা একটু ফেরায়, কোঁচার খুঁটটা তুলে সারা মুখটা মোছার ছলে চোখ দুটো মুছে নেয়, তারপর গলা ঝেড়ে বলে, সেই শুনেই তো আরো পাঁচজনে বলতেচে শাউড়িমাগী না কি বড্ড মারধোর করে, খুন্তি পুইড়ে ছ্যাঁকা দেয়—

অ্যাঁ! চন্দ্রকান্ত শিউরে উঠে বলেন, তবু এখানে বসে আছিস? নিয়ে চলে আয়।

তারক দোমনা গলায় বলে, সে কথা ভাবি। তবে আমার ব্যাই লোকটা ভাল বেচক্ষণ। ও পরিবারকে ধমকে দে বলে, চার কুড়ি ট্যাকা পণ দে বৌ এনিচি, সেই বৌকে যদি মেরে ধরে মেরে ফেলিস, আর বৌ জোটাতে পারবো আমি? মরিস মাগী চেরদিন হাঁড়ি ঠেলে। তাতেই মাগী এটটু সমজায়। খুকীর শউরবাড়ির পাশেই আমার এক ভাগ্নীর শউরবাড়ি, তাই এতো বিত্তান্ত জানা।

চন্দ্রকান্তর ভিতর থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস ওঠে। কত সহজে কত ভয়ানক অনাচার মেনে নেয় এরা। এ নিয়ে চলেছে সমাজ।

নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তোর বেয়াই ভাল বলেই কি তোর ভরসা আছে? ভেতরকার কলকাঠি তো মেয়েছেলেদের হাতে। এতো কচি বয়সে বিয়ে দেওয়াটা বাপু খুব খারাপ। প্রতিজ্ঞা করে এর একটা বিহিত করা উচিত।

তারকও নিঃশ্বাস ফেলে—গরীবের কি আর ইচ্ছে পিতিজ্ঞে খাটে ছোট কত্তা? আমার জেঠাতো ভাই চরণ—সেও তো ছ'বছরের মেয়েটার বে ঠিক কর ফেলেচে। ঠেকায় পড়ে কতদিন হল জমি বন্দক দে রেখেছিলো, ছাড়াতে মুরোদ হচ্ছে না, মেয়েটার বে দে পাঁচ কুড়ি এক ট্যাকা পণ পাবে, জমিটা ছাড়ান করে দিতে পারবে।

ওঃ! তাহলে মেয়েও তোদের ঘরে এক একটা তালুক বল? দশটা মেয়ে থাকলে রাজা!

চন্দ্রকান্ত বিষণ্ণ মনে এগিয়ে যান। তারপর ভাবেন, কিন্তু তারকদেরই বা অবজ্ঞা করছি কেন? আমাদের উচ্চবর্ণের ঘরেও তো ওই একই অবস্থা। শুধু জিনিসটার হেরফের। মেয়ে নয় ছেলে।...ছেলে মানেই

তালুক। নচেৎ শশীর বিয়ের সময়ও সেজখুড়ি পণের কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন কেন—পরোক্ষে আদায়ও তো করেছিলেন। চন্দ্রকান্ত কন্যাপক্ষের কাছে দাবি করতে দেননি বলে নিজেই সেই দাবির টাকা খুড়ির হাতে ধরে দিয়েছিলেন—'ছেলের বিয়ের খরচা কোরো' বলে। এতে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

পিসি তো বটেই, সুনয়নীও। তাছাড়া বড়দা? একদা যিনি বাড়িতে পার্টিশান তুলে ভাগ ভিন্ন হবার চেষ্টায় সব থেকে বেশী জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং বিধবা পিসি খুড়িদের মত আলতু ফালতু মালকে ঠাঁই দেবার মত ঠাঁই তার নেই ঘোষণা করে দায়িত্ব-মুক্ত হয়েছিলেন, তিনি কেমন করে যেন সহসা অনাথা সেজখুড়ির ছেলের বিয়ের ব্যাপারে প্রধান অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারেই চন্দরের গোঁয়ার্তুমি দেখছিলেন, আর সেজ খুড়ির হৃদয়-বেদনার শরিক হচ্ছিলেন।

সকলেরই বক্তব্য—একটু চাপ দিলেই কনের বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নেওয়া যেত। গোঁয়ার্তুমির বশে অথবা বুদ্ধির দোষে সেই মোটা পাওনাটি পেতে দিলে না তুমি বেচারী বিধবা খুড়িকে। এখন নিজে গচ্ছা দিয়ে চন্দ্রকান্ত, নিজের মুখ রাখছে। কিন্তু তাতে কার কী, মেয়ের বাপকে চাপ দিয়ে 'বাপ' বলিয়ে কতটি ঘরে তোলা যেত, জানো তুমি!

আদর্শ বৌ সুনয়নী পিস-শাশুড়ীর গোড়েই গোড়। চন্দ্রকান্তর সামনে তিনি শাশুড়ীদের সঙ্গে কথা বলেন না, কিন্তু চন্দ্রকান্তর কানে পৌঁছনোয় বাধা ঘটে না। ঘোমটা দিয়ে পিস-শাশুড়ীর পিছনে বসে বলেন, যা বলেছ পিসিমা, একেই বলে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

উচ্চবর্ণের বলে কতই অহংকার আমাঁদের, কিন্তু জীবনচর্চায় ওদের সঙ্গে তফাৎ কোথায়?

শুধু ওদের বলে নয়, আমাদের বলে নয়, সমগ্র সমাজটারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি। কুপ্রথা আর কুসংস্কারের নৈবেদ্য সাজানোই আছে সেই শনি-দেবতার পুজোর জন্য। দেবতা আর সিংহাসনচ্যুত হবেন কি করে?

আস্তে আস্তে পথ হাঁটেন চন্দ্রকান্ত। মাথার মধ্যে একটা ছন্দ পাক খাচ্ছে, দু একটি তীব্র শব্দ সম্বলিত জ্বলন্ত ছত্র সেই ছন্দকে আশ্রয় করে থিতু হয়ে বসতে চাইছে, কিন্তু হচ্ছে না।. কলম কাগজ নিয়ে না বসলে ঠিক হয় না। তৈরি হয়ে ওঠা ছত্রগুলোও যেন হাত ফসকে পালিয়ে যায়।

কতকাল ঘুমাইবি আর?

কত যুগ যুগান্তর হয়ে গেল পার।

এ যে তোর মৃত্যুঘুম, এর থেকে হবি না উদ্ধার?

—নাঃ, শেষ ছত্রটা অচল।

বেড়িয়ে ফিরেই দোয়াত কলম নিয়ে বসতে হবে।

এই যে বাবাজী বের হয়েছ?

খড়ম খট্‌খটিয়ে এগিয়ে আসেন বটু ভট্‌চার্য। বটু ভট্‌চার্যের পরণে লালটিন ধুতি, গায়ে শক্তি নামাংকিত নামাবলী, কপালে রক্তচন্দনের টিকা, মাথায় রক্তপুষ্প সম্বলিত শিখা, পায়ে উঁচু খুরো খড়ম, হাতে পিতলের জালিকাটা সাজি।...সারা সকাল বটু ভট্‌চার্য এই সাজিটি হাতে ঝুলিয়ে ফুল সংগ্রহ করে বেড়ান। পাড়ার হেন বাড়ি নেই, যে বাড়ির উঠোনে বাগানে বটু ভট্‌চার্যের প্রবেশাধিকার নেই। আপন শক্তিতেই এ অধিকার অর্জন করে নিয়েছেন তিনি।

বটুর ভয়ে গাছের ফুল সামলাতে যে যত ভোরেই উঠে পড়ুক, বটু তার আগে এসে হাজির।

লোকেদের আপন গাছের ফুল সামলানোর ওই অপচেষ্টাকে ধিক্কার দেন বটু। ছিঃ! ছিঃ! বাত থাকতে গাছটাকে নির্মূল করে ফেলেছিস?...বলি তোর ঠাকুর আর বটু ভটচার্যের ঠাকুর কি আলাদা রে?. বটু যখন তার ঘরে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়, খোদ সেই জগজ্জননী মায়ের পায়ে গিয়ে পড়ে, বুঝলি? তবে? তবে আবার নির্বুদ্ধির মতন ফুল সামলে মরিস ক্যানোরে বাপু?

বটু ভট্‌চার্য শূদ্র যাজক, ব্রাহ্মণ যাজক পুরোহিত মহলে ওঁর কলকে নেই। কিন্তু বটু নিজেকে 'সাধক' বলে প্রতিপন্ন করে বিশেষ কলকে-র আশা পোষণ করে থাকেন। তাই বটুর কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, তিনি বুঝি সেই জগজ্জননী মায়ের খাস মহলের প্রজা।

কিন্তু লোকে ওঁর পিছনে বক দেখায়, মুখে হাত আড়াল দিয়ে হাসে। কারণ আছে। বটুর বয়স অপরাহ্নে চলে এলেও, মন্দ লোকে বলে থাকে, বটু ভট্চার্যের এই শেষরাত থেকে সাজি হাতে নিয়ে বেড়ানোর উদ্দেশ্য আলাদা, সাজিটা ছল। নচেৎ ঘাটের পথগুলি ছাড়া আর পথ খুঁজে পান না কেন ভট্চার্য?

সকলেই অশ্রদ্ধা করে, হাসাহাসি করে, তবু মুখের উপর বড় কেউ কিছু বলে ওঠে না। কারণ, রাগলে বটুর জ্ঞান থাকে না, শাপ শাপান্ত করে ছাড়ে।...তদুপরি আবার বটুর এক মাসি, যিনি বটুর বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী, তিনি নাকি আবার তুক্‌তাকে পটিয়সী। আর শনি, মঙ্গলবারে—অমাবস্যা পড়লে তাঁর উপর মা কালীর ভর হয়।

এ লোককে চটানোর সাহস হয় না। তাই যে যার গাছের ফুল সামলাবার চেষ্টা করে। বৌ ঝি-রা সামলে মরে আপন আপন স্নান-দৃশ্য।

চন্দ্রকান্ত এই লোকটাকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন। অথচ এমনই আশ্চর্য, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ওর মুখ-দর্শন করতেই হবে। যে রাস্তা দিয়েই হাঁটুন, কোনোখানে না কোনোখানে বটু এসে আবির্ভূত হবেনই।

বটুর হাতের বৃহৎ সাজিটি ভর্তি হয়ে উপচে পড়তে চাইছে, তবু বটু লালায়িত দৃষ্টিতে শোভারাম ঘোষের উঠোনে ফুটে থাকা কাঠচাঁপাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতেই বলে ওঠেন, বাবাজীর আমার শরীরে আলস্য বলে কিছু নাই।...পূবের আকাশের সূয্যি, আর এই আমাদের ঘরের চন্দর, সমান নিয়মী।

এতো জুৎসই একখানা কথা বলে ফেলতে পেরে বটু বড় আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

চন্দ্রকান্ত পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার তাল করতে করতে বলেন, আপনিও তো কম নিয়মী নন ভট্চার্য মশাই! নিত্যই এই এক সময়—

আমার কথা বাদ দাও বাবা। বটু বলেন, আমার কি বিছানায় পড়ে থাকার জো আছে বাবাজী? দজ্জাল বেটি ঘাড় ধরে উঠিয়ে ছাড়ে। বেটির এই হতভাগা বটুককে নিয়ে যে কী খেলা—এই, এই আহা অমন করে আঁকশি দিসনে রে! মড়কা ডাল—

কিন্তু ততক্ষণে শোভারামের বছর আষ্টেক নয়ের মেয়েটা আঁকশি বাগিয়ে কাঠচাঁপার থোকা থোকা ফুলসমেত ডালের আগাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে কোঁচড়ে ভরে ফেলেছে।

বটু আর চন্দ্রকান্তর দিকে ফিরে তাকান না, ওই মেয়েটার প্রতিই মনোনিবেশ করেন। আঁকশি দিয়ে ওভাবে ফুল পাড়া যে কত গর্হিত, সেটা বোঝাবার জন্যে বার বার তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেন এবং ইস্—সব ফুলগুলো তুলে নিয়ে নিলি, আমার মায়ের জন্যে কিছু রাখলি নি?.. বলে জোর করে মেয়েটার কোঁচড় থেকে কিছু ফুল নিয়ে নিজের সাজিতে ভরেন।

মেয়েটা হঠাৎ একবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে।

পরক্ষণেই আঙ্গুল মটকে মটকে বিজবিজ করে গাল দেয় এবং পলায়নপর বটুর পিছন দিকে জিভ দেখায়।

পলায়নই ভালো, কারণ মেয়েটার ভ্যাঁ করা দেখেই বেগতিক বুঝেছেন বটু।

চলে যেতে যেতেও ঘটনাটা শেষ অব্দি চোখ এড়াল না চন্দ্রকান্তর। ভিতরে ভিতরে ভারী একটা গ্লানি বোধ করলেন। সকালের আলোয় আর জীবনরসের আস্বাদ নেই।

শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষ ক্রমশঃই চলে যাচ্ছে ইহ-সংসার থেকে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখব এমন মুখ বিরল। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখাব কথা ভাবতে গেলেই বাবার কথা মনে পড়ে যায় চন্দ্রকান্তর।

কী ছিল সেই মুখে—যাতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করতো! এখন একটা ছোট ছেলেকে দেখতে পাচ্ছেন চন্দ্রকান্ত, যে ছেলেটা খেলতে খেলতে পড়তে পড়তে, কোনো কিচ্ছু না করতে করতেও চোখ তুলে অপলকে তাকিয়ে আছে তার বাবার মুখের দিকে। কিন্তু শুধুই কি সেই ছোট ছেলেটাই? একজন যুবা নয়? একটি বিবাহিত পুরুষ নয়? একজন পুত্রের পিতা নয়?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন বিভোর হয়ে যেত।

কী ছিল সেই মুখে? দীপ্তি? প্রসন্নতা? ঔদার্য? নাকি গাম্ভীর্য, গভীরতা, আত্মমগ্নতা? কিসে আকৃষ্ট

হতো সেই ছেলেটা? সব মিলিয়ে একটা আশ্রয়, এই তো?

আমি আমার ছেলের হৃদয়ে সেই আসন পাততে পারিনি—

নিঃশ্বাস ফেললেন চন্দ্রকান্ত। আমারই অক্ষমতা। পিতাপুত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে কোনো গভীর যোগসূত্র তো নেইই, পারিবারিক জীবনে, পরিবারের সকলের মধ্যে যে সাধারণ যোগসূত্র থাকে, তাও প্রায় দুর্লভ। এতো কম দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে ওর সঙ্গে আমার যে, দুটো সহজ কথার আদান-প্রদানও হয় না।—অথচ বাবার কাছে গল্পচ্ছলে আমি কত কী শিখবার সুযোগ পেয়েছি!

বাপের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে, এমন পরিস্থিতিগুলি সযত্নে পরিহার করে নীলকান্ত। সেটা চন্দ্রকান্তর অজানা নয়। তবু ছেলেকে দোষ দেন না। ভাবেন, আমারই ত্রুটি। আমার মধ্যেই সে শক্তির অভাব যে শক্তিতে আপন আত্মজের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করা যায়। এটাই তো সংসারে সব থেকে কঠিন ঠাঁই।

অথচ সুনয়নী কতো সহজেই সে প্রভাব বিস্তার করে বসে আছেন। মা-কে নীলকান্ত প্রাণতুল্য ভালবাসে, আবার যমতুল্য ভয় করে।—মার সঙ্গে দিব্যি মাই ডিয়ার ভাবে গালগল্পও করে বসে বসে, আবার মা একটু চোখ রাঙালেই কাঁটা।

এটা কী করে হয় জানা নেই চন্দ্রকান্তর।

এমনিতে তো সুনয়নীকে মান মর্যাদা বজায় রাখা কাজ করতে বিশেষ দেখেন না। সুনয়নী অনায়াসেই পানের বাটা বিছিয়ে বসে সাজতে সাজতে নিজের মুখে একটা ফেলে, অপর একটা ছেলের দিকে বাড়িয়ে ধরতে পারেন, আবার অতি সহজেই 'দূরহ আমার সুমুখ থেকে, তোর মতন হাড় বজ্জাতে ছেলের মুখদর্শনেও পাপ—' বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেও পারেন।

ওই পান দেওয়ার ব্যাপারটা একদিন চোখে পড়ে যাওয়ায় চন্দ্রকান্ত সুনয়নীকে বোঝাতে উদ্যত হয়েছিলেন, কাজটা অসঙ্গত। এতে মাতৃসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু বোঝানো হয়নি। সুনয়নী প্রথম পর্বেই থাবাড়ি দিয়ে বলে উঠেছিলেন, অতো বিচার করলে চলে না। ছেলে কি কুটুম? তাই সর্বদা হিসেব করে চলতে হবে, কিসে আমার মান থাকবে আর কিসে মান যাবে!—যখন যা ইচ্ছে হবে করব,—বকার সময় বকব, আহ্লাদ দেবার সময় আহ্লাদ দেব। চুকে গেল ল্যাটা,—সাধে কি আর নীলে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়? দেখা হলেই তো উপদেশ ঝাড়বে!

আমি কি ওকে খুব উপদেশ দিই?

সুনয়নী ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে জাঁতি চালিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে বলেছিলেন, মুখে গ্যাজ গ্যাজ করে না দাও, চোখ মুখের ভাবেই বুক হিম করে দাও। তোমার দিকে ঘেঁসবে কি। আমি ডাকাবুকো ডাকাত, তাই তোমার ভয় খাই না। আর সবাইকে দেখো।

কিন্তু নিজের ওই অন্যের বুক হিম করে দেবার ক্ষমতাটা সম্পর্কে সচেতন নন চন্দ্রকান্ত। নিজেকে তো খুব নীরব রাখতেই ভালবাসেন। তাই রেখেই চলেন। অথচ লোকে যে তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে দূরে রাখতে চায়—তাও চোখ এড়ায় না। এর অর্থ অনুভব করতে পারেন না।

—হ্যাঁ, আমারই ত্রুটি, মনে মনে ভাবলেন চন্দ্রকান্ত—আমার অক্ষমতা, আমি কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারি না।—কিন্তু কার সঙ্গে হবো? কোথায় সেই অন্তর? যার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ইচ্ছে জাগে?

বড়দীঘির ধার পর্যন্ত হেঁটে আবার ফিরে আসা, এটাই সাধারণতঃ নিয়ম চন্দ্রকান্তর। আজও তাই ফিরছিলেন, দেখলেন সামনে উদ্ধব দুলে। তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।

দাঁড়ালেন।

উদ্ধব রাস্তার ধুলোমাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সেরে নিয়ে দু'হাতে নিজের কান দু'টো মুলে বলে উঠল, ছোটকত্তা বাবু, অপরাধ নিবেন নি। আপনার জন্যিই আমরা ছোটলোকরা এ্যাখনো মাতা হ্যাঁট করে আচি, কিন্তুক আর বোদায় চলবে নি।—ছোঁড়া ছোকরাগুলানকে খামিয়ে রাখতে পারতেচি নে—

চন্দ্রকান্ত অবাক হলেন।

বলতে গেলে প্রায় আকাশ থেকেই পড়লেন। চন্দ্রকান্ত বলেন, কী হলো রে উদ্ধব? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—

উদ্ধব ক্ষুব্ধ উত্তর দেয়, পারবেন নি তা জানি। আপনি হল গে আকাশের দ্যাবতা, মাটির পিরথিমির খবর বাত্তা জানেন নি। তবে আপনার নাগাল য্যাখন পেনু একবার, ত্যাখন জানিয়ে রাখি, অ্যাকটা কিছু ঘটে গেলে দোষ নিওনি। আমরা ছোটলোক, মুখ্যু, হতভাগা, সবই মানতেচি। তবে আপনাদের বড়লোকদেরও এডা মানতি হবে, ছোটলোকের ঘরের মেয়েছেলেদেরও ইজ্জৎ আচে।

চন্দ্রকান্ত দিশেহারা দৃষ্টিতে তাকান।

ব্যাকুলভাবে বলেন, তোর কথাটাতো আমি—

কথা শেষ হয় না, কোথা থেকে বদন দুলে এসে দাঁড়ায়। উদ্ধবের ভাইপো। কালো পাথরে কোঁদা চেহারা, ঘাড়ে বাবরি চুল। চওড়া মুখটার ধারে পাশে ওই চুলগুলো ফুলে থাকায় মুখটায় যেন সিংহ সিংহ ভাব। হাতে মাথা ছাড়ানো বাঁশের লাঠি।

বদন উদ্ধবকে প্রায় ঠেলে দিয়ে বলে, তুই এখেনে কী করতেচিস?

উদ্ধব ঠেলা খেয়ে রেগে উঠে বলে, করব আবার কী? ছোটকর্তাকে দেখনু তাই একটা পেন্নামের জন্যি—

আচ্ছা হয়েছে তো পেন্নাম? যা ঘর যা—

যাচ্চি বাবা যাচ্চি, বুড়ো উদ্ধব জোয়ান ভাইপোর তাড়নায় অনিচ্ছার সঙ্গে চলে যায়।

চন্দ্রকান্ত ফিরতে যাচ্ছিলেন, বদন মাটিতে একটু হেঁট হয়ে একটা প্রণামের মত করে নিয়ে বলে ওঠে, খুড়ো কী বলতেছেলো?

বদনের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তাপ।

চন্দ্রকান্ত বোঝেন, ভিতরে কোনো গৃহ-কলহের ব্যাপাব আছে। আবার চিন্তা করেন—কিন্তু উদ্ধবের বক্তব্যের সঙ্গে তো ঠিক গৃহকলহের সুর নেই, তার অভিযোগ যেন ভদ্দরলোকেদের বিরুদ্ধে। তবে কোনো চাপা আগুনকেই উস্কোনো ভাল নয়, তাই মৃদু হেসে বলেন, কী আর বলবে? ভক্তিটক্তি দেখাচ্ছিল।

বদন তার বাঁয়ের দিকে এসে পড়া বাবরি চুলের গোছা মাথা ঝাঁকিয়ে পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, খুড়োর মাথাটায় ইদানীং একটু গণ্ডগোল হয়ে গ্যাচে—বুজলেন। ওর কতা বিশ্শেস করবেন নি।

চন্দ্রকান্ত বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে? উদ্ধব তো কিছু বলেনি।

না বললিই ভালো, হট খট এটা ওটা বলে বেড়ায়, তাই বলতেচি।

বদন হাতের মাথা ছাড়ানো বাঁশের লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে গটগটিয়ে চলে যায়।

চন্দ্রকান্তর মনে হয়, ওর ওই ভঙ্গীটার মধ্যে যেন কোনো একটা কঠিন সংকল্পের রূঢ় দৃঢ়তা।

চন্দ্রকান্তর চেতনার গভীরে একটা আসন্ন অশুভের ছায়া পড়ে।

কোথায় কী হয়েছে?

কোথায় কী হতে পারে?

উদ্ধবের কথায় কিসের ইসারা ছিল?

চিন্তমগ্নভাবে খানিকটা চলতে চলতে—জোর করে মনের অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেললেন। —দূর, ওই ভাইপোটার কথাই বোধ হয় ঠিক। উদ্ধবের মাথার মধ্যেই কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে।

অস্বস্তিকে একেবারে দূরীভূত করতে, নতুন যে গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন, তাব চিন্তা করেন। কাব্য ছেড়ে—গদ্য লিখতে হচ্ছে। প্রথম দু'একবার ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেই লিখতে শুরু করেছিলেন, পছন্দ হয়নি, ঠেলে রেখে দিয়েছেন। বঙ্কিমবাবুর অক্ষম অনুকরণ বলে ঠেকেছে। একটা নতুন সামাজিক জীবন নিয়ে ভাবছেন চন্দ্রকান্ত। যে ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই উজ্জ্বল আশ্বাসের

বাণী বহন করে নিয়ে এসে আশার আলো দেখায়, সেই সমাজের কাহিনী রচনা করতে চান চন্দ্রকান্ত। এই চাওয়াটা কি ধৃষ্টতা?

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন চন্দ্রকান্ত। যদি লিখে উঠতে পারেন, সে গ্রন্থের নাম দেবেন ঃ আগামীকালের আলেখ্য।

সেই আগামীকালটা যে ঠিক কোন কালের মঞ্চে পা ফেলবে, সেটা এখনো বুঝতে পারছেন না চন্দ্রকান্ত। একশো বছর পরে—ওঃ, সে যে বড় দুরে! তবে আশী বছর পরে? সেও কম কি? আরো কমেই বা নয় কেন? সত্তর, ষাট, পঞ্চাশ। তখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা কেমন হতে পারে! অথবা বলা যায়, কেমনটি হলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে তারই এক-একটা রোমাঞ্চময় কল্পনায় আন্দোলিত হন চন্দ্রকান্ত। টুকরো টুকরো ছবি মনের মধ্যে ভেসে ভেসে ওঠে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটা খসড়া করে ফেলে, তাকে রূপ দেবার চেষ্টায় সফল হতে পারছেন না। চিন্তার খেই হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দানা বাঁধতে পারছে না।

কী কী হলে ভাল হয়, আর কতটুকু হয়ে ওঠা সম্ভব, এই দুটো চিন্তার সংঘর্ষে সেই ভবিষ্যৎকালের কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না, ঝাপসা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু একটা শর্ত নিশ্চিত সত্য রূপে বিদ্যমান, সেটা হচ্ছে—সেই কালের চেহারা হবে,—দেশ পরাধীনতাব গ্লানি মুক্ত, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের মহাদান—ভারতবাসীই ভাবতবর্ষের অধীশ্বর। আরও একটা শর্ত, সেই ভাবী সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী-সমাজের জীবন কেবলমাত্র ধূমলিন রান্নাঘরের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে না। লজ্জার ওজনটা তাদের শুধু ঘোমটার দৈর্ঘ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লজ্জাস্কর বস্তু যে অন্য অনেক আছে সে বোধ জন্মেছে। তাদের চিন্তার জগতে তেরোদশীতে বেগুন খাওয়া না খাওয়ার প্রশ্নটাই একটা বৃহৎ জায়গা দখল করে নেই, বৃহৎ পৃথিবীর বিচিত্র জীবনচর্চার সঙ্গে একাত্মা হবার স্বাদের আশায় উন্মুখ হচ্ছে তারা। ছোট গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবার সাধনা করছে। জীবনের এই নিদারুণ অপচয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু শুধুই কি নারী জাতির উন্নতির কথাই ভাবেন চন্দ্রকান্ত?

জীবনের অপচয়ের দৃশ্য তো অহরহ সর্বত্র।

কী অলসতা, কী কর্মহীনতা! কেবলমাত্র তাস পাশা খেলে, মাছ ধরে আর বাজে গালগল্প করে বৃথা জীবনযাপন করছে গ্রামের অধিকাংশ ছেলে। চিন্তাহীন উদ্যমহীন এই নিরেট মুখগুলো দেখলে কেমন একরকমের অস্থিরতা আসে চন্দ্রকান্তর। এসবের কী-ই বা লিখতে পারবেন চন্দ্রকান্ত? কতটুকুই বা লিখতে পারবেন?

ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অশ্বত্থতলার ছায়ায় এই সকালবেলাই সেই অপচয়ের একটু নমুনা। গাছের গোড়ায় ধুলো মাটি আব শিকড়ের উপর চেপে বসে গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে। কে ওরা? নীলকান্তর মত কে যেন।

না, নীলকান্ত নয়। কিন্তু হলেও হতে পারতো। সেই বয়েসেরই ছেলে কটা। হাঁটুর উপর ধুতি তোলা, খালি গা, খুব হাত মুখ নেড়ে গল্প করছে, জায়গাটা তামাকের গন্ধে ভরপুব। অথচ ধারে কাছে হুঁকো-কলকেব চিহ্ন নেই। তার মানে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ধোঁয়া খাওয়াব চাস চলছে। হাতের মধো গাছেব পাতা পাকিয়ে কেমন করে যেন টান দিতে শেখে এরা।

ওরা চন্দ্রকান্তকে না দেখতে পাওয়াব ভান কবছে।

চন্দ্রকান্ত যে ওদের দিকেই এগিয়ে আসবেন, তা ভাবেনি। এসে পড়েছেন দেখে তাড়াতাড়ি গা-ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রকান্ত শান্ত গলায় বললেন, সকালবেলা এভাবে বসে কেন বাবারা? কাজকর্ম নেই?

ওরা ঘাড় চুলকে বলল, না—ইয়ে বারোয়ারীতলায় যাত্রাগান হবে সেই খবরটাব জন্যে—

বারোয়ারীতলায় যাত্রাগান হবে? কবে?

আজ্ঞে ওই, কবে যেন রে সাধু?

ইয়ে মনসার ভাসানের দিন।

মনসার ভাসান? সে কি? তার ত এখন অনেক দেরী।

না, না, মনসাপুজোর দিনকে।

মনসা পুজো? দশহরার দিনের কথা বলছ?

ছেলেগুলো উত্তর খুঁজে পেয়ে মহোৎসাহে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই না রে ভজা?

তারও দেরী আছে বাপু, এখন তো সবে বৈশাখ চলছে। তার জন্যে এখন থেকে কী হচ্ছে? তোমরা করবে যাত্রাগান?

বলা বাহুল্য, অধোবদন হল ওরা।

চন্দ্রকান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দিনের শ্রেষ্ঠ কাল সকাল, আর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল কৈশোরকাল। দুটোই বৃথা অপচয় করো না তোমরা। আর কারো ক্ষতি হচ্ছে না—নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

ছেলেগুলো আমতা আমতা করছিল। চন্দ্রকান্ত চলে যেতেই আবার বসে পড়ে বলে উঠল ঃ এই এক গুরু-ঠাকুর আছেন বাবা গাঁয়ে, কারুর একটু স্বস্তি আছে! বদ্যির ছেলে, নাড়ি টিপে বেড়া না বাবা, তা না কেতাব লিখছে, আর যাকে পারছে ধরে ধরে লেকচার শোনাচ্ছে।

দূর! আমেজটাই মাটি করে দিল। দিব্যি মৌজ করে বসা হয়েছিল। ব্যাটা, দু'দশ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিস বলে যেন যারা পরে এসেছে তাদের মাথা কিনে নিয়েছিস। ধ্যেৎ!

আর চন্দ্রকান্ত যেতে যেতে ভাবছিলেন, বড়দের দেখলে তটস্থ হয় এখনো, এটুকু সভ্যতা আছে ছেলেগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ এখনো আদায় আছে।

এই জীবনগুলোকে যদি ঠিক পথে চালিত করা যেতো!

ফের সেই পুরনো ভাবনাতেই ফিরে আসেন চন্দ্রকান্ত, কিন্তু ভাবনা আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না। বর্তমানের পাথুরে পরিবেশটা যেন চন্দ্রকান্তের ওই চিন্তার বিলাসকে দুয়ো দিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসতে থাকে।

বাবা, বদ্যি জ্যাঠা—

বালককণ্ঠের এই উচ্ছ্বসিত উক্তিতে চমকে তাকালেন চন্দ্রকান্ত।

গৌরমোহনের ছেলে গোবিন্দর গলা না?

বাবা বলে কথা বলল। গৌরমোহন এসেছে তাহলে?

হঠাৎ ভারী ভাল লাগল। চন্দ্রকান্তর মনে হলো, ঠিক এই মুহূর্তে গৌরমোহনকেই যেন খুব দবকার ছিল তাঁর।

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

সামনেই গৌরমোহন।

দুজনেরই মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আরও একবার মনে হল চন্দ্রকান্তর—আশ্চর্য! টের পাচ্ছিলাম না, এখন বুঝতে পারছি—ঠিক এই মুহূর্তে গৌরমোহনকেই বড় দরকার হচ্ছিল আমার। গৌরমোহনের কাছাকাছি এলে মনে হয়, সংসারে অন্তরঙ্গ হতে পারার মত মানুষ হয়তো একেবারে বিরল নয়।

কবে এলে?

কাল সন্ধ্যায়।

গৌরমোহনের একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে তার বালক-পুত্র গোবিন্দ, গৌরমোহনের অপর হাতে একখানা পাট করা খবরের কাগজ।

তোমার কাছেই আসছিলাম—

গৌরমোহনের স্বর উৎফুল্ল।

তোমার কাছেই চলো—

চন্দ্রকান্তর স্বরে গভীর অভিব্যক্তি।

তিন

একখানা ময়লা গামছা কোমরে জড়িয়ে আর একখানা ময়লা গামছায় গা মাথা রগড়ে মুছতে মুছতে শশীকান্ত চাপা আক্রোশের গলায় বলে ওঠে, এই তুমি। তুমিই হচ্ছো যত নষ্টের গোড়া।

নিবারণী দেবী, যিনি নাকি চন্দ্রকান্তর সেজ খুড়ি, মিনমিনে গলায় বলেন, কেন? আমি আবার তোর কী পাকাধানে মই দিলাম?

দিলে না! দিলেই তো? রাতদিনই দিচ্ছো। শশী, বাবা, রাতে যা করিস তা করিস, ভোরে খিড়কির থেকে একটা ডুব দে তবে ঘরে আসিস—

মায়ের বাকভঙ্গীর অনুকরণ করে ভেঙিয়ে উঠে কথা শেষ করে শশীকান্ত—জগৎ সংসারে সবাই জানে, বেটাছেলে আড়াই পা বাড়ালে শুদ্ধ, উনি শুচিবাই বুড়ি এলেন নতুনশাস্তর নিয়ে। ঘাট থেকে ডুব দিয়ে আসতে গেলে লোকের চোখ বাঁচাতে পারবে তুমি? হয়ে গেল আজ মোক্ষম। একেবারে যমের মুখোমুখি।

কথার মাঝখানে শশীর বৌ অশ্রুমতী গলা অব্দি ঘোমটায় ঢেকে নিঃশব্দে একখানা জলকাচা ধুতি এনে শশীর কাছ বরাবর মাটিতে নামিয়ে রেখে গেল। নিবারণী তার দিকে একটা তিক্ত দৃষ্টি হেনে দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠেন, আর এই এক হয়েছে জন্মরুগ্নী। তুলে ধরতে উলে যাচ্ছেন। জগতের কোনো কম্মে যদি লাগে।

বল, তবু বল একবার শুনি—

শশী দুখানা গামছাই দেয়ালে পোঁতা দুটো পেরেকে আটকে আটকে ঝুলিয়ে দিয়ে মুখটা বাঁকিয়ে বলে, ইহ-সংসারে নেয্য কথা তো বড় শুনতে পাইনে। কোন চুলো থেকে যে একখানি রঙের রাধা নিয়ে এনে সংসারে ভর্তি করেছিলে!

নিবারণী ক্রোধের গলায় বলেন, আমি এনেছিলাম খুঁজে পেতে? তোর বড়দা তখন বড্ড হিতৃষী মুরুব্বী হয়ে নিজের শালী ঝিকে এনে বিয়ে দেওয়ালো না? মেয়ে যে রাঙের রাধা সে কথা ওর জানা ছেল না? আমি যাই ভাল মানুষের মেয়ে তাই ওই রুগ্নী মরুনীকে নিয়ে ঘর করছি; অন্য মা হলে ওই নলতে সলতে বৌকে নিব্বাসন দিয়ে ছেলের আবার বিয়ে দিতো।... গলাটা বেশ চোস্ত করেই বলেন নিবারণী, যাতে শুধু বৌ-ই নয়, বাড়ির অন্যেরাও শুনতে পায়। আবার অদূরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখে আঁচল চাপা দেন। তা আমার আবার অগ্খার। আজন্ম পবের গলে গেরো হয়ে পড়ে আচি, বাপের কুলে পয্যন্ত একটা মশামাছি অব্দি নেই। কোন মুকে বলবো, ওগো, এই আমার ইচ্ছে, এই আমার সাধ—

থাক থাক—আর ঘ্যান ঘ্যান করতে হবে না। শশীকান্ত একটা জলচৌকী টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলে, কিছু গিলতে টিলতে পাওয়া যাবে? না হরিমটর?

নিবারণীর হাতে একটা গোবরজল গোলা ঘটি, থানের খুঁটেয় এতোগুলি ঘুঁটের বুচি, নিবারণী ওই গোবরগোলা জল একটু দালানে ছিটিয়ে দিয়ে হাত বুলিয়ে মুছে নিয়ে হাঁক পাড়েন, কই গো নবাবকন্যে, হতভাগা গরীবটার ভাগ্যে কিচু জুটবে, কি জুটবে নি?

অশ্রুমতীর হৃৎস্পন্দন স্থির হয়ে আসে।

কিন্তু অশ্রুমতী কী করবে?

সে কি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কলসী-হাঁড়ি নেড়ে মুড়ি নারু ঢেলে নিয়ে আসবে? উঠোনের মাচার গাছে তো অগুনতি শশা ঝুলছে। মুড়ির সঙ্গে নারকেল কি শশা না হলে শশীকান্ত রেগে আগুন হয়, কিন্তু অশ্রুমতী কি নিজের বরের জন্যে গাছ থেকে শশা ছিঁড়ে নিয়ে এসে ছাড়াতে বসবে?...

আরো পাঁচজন খেতে জুটলে তবু হাত পা বার করা যায়, এ যে বেঁধে মারা। জলখাবারের পত্তন পড়তে এখনো দেরী আছে, শশীকান্তের যদি মাথায় জল দেওয়ার কারণে পেটে আগুন জ্বলে ওঠে, তার জন্যে তো গেরস্ত প্রস্তুত নেই।

অশ্রুমতী অশ্রুধারায় ঝাপসা চোখে ভাবে—শাশুড়ী তো জানেন সবই, তবু ছেলের সামনে বৌকে দোষী করছেন কেন? এসে না হয় দেখে যান অশ্রুমতীর অবস্থাটা কী? স্রেফ ভিখারিনীর মূর্তিতে তো ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে।

ভিক্ষাপাত্রই। শশী যে বেতের ধামিটায় মুড়ি খায়, সেটাই অশ্রুমতীর হাতে। অশ্রুমতী অস্ফুটে একবার আপন আর্জি পেশ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। জলখাবারের গিন্নী ছোট খুড়-শাশুড়ী ননীবালা স্নান সেরে এসে লক্ষ্মীর দেয়ালের সামনে আহ্নিকে বসেছেন। অশ্রুমতীর অস্ফুট আবেদনে একবার ফিরে তাকিয়ে 'অপেক্ষা' করতে ইসারা করে আবার চোখ বুজেছেন। কে জানে কখন খুলবেন!

প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি প্রহর।

অশ্রুমতী কি আর একবার ডাকবে?

গলা দিয়ে শব্দ বেরোবে?

তাহলে কি ও ঘরে গিয়ে অবস্থাটা বলে আসবে? কিন্তু নড়বে কেমন করে? মাটির সঙ্গে তো পুঁতে গেছে অশ্রুমতী নামের মেয়েটা।

শালার সংসারের কাঁথায় আগুন।—

শশীকান্ত চৌকীটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন হচ্ছে, ভিজে মাথা শুকিয়ে পিত্তি পড়ে গেল, একমুঠো মুড়ি গুড় জুটল না? তুমিই বা গোবর জলের ঘটি ধরে সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছো কেন নবাব নন্দিনী গর্ভধারিণী? শশেকে খাটে চড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ছড়া গোবর দেবে বলে?

দুগ্‌গা দুগ্‌গা! ষাট ষাট!

নিবারণী চোখ মুছে দুগ্‌গাকে স্মরণ করে ষাট বাঁচিয়ে বলেন, যাতা অকতা কুকতা তোর মুকে।...

তা যেমন মা, তার তেমনি ছা। কেন তুমি একবার দেখতে যেতে পারছ না, তোমাদের ভাঁড়ারে আগুন লেগেছে কিনা।

নিবারণী বেজার গলায় বলেন, আমি এখন ভাঁড়ারের পৈঠেয় উঠবো? না চান, না কিছু।

ছোটগিন্নীর এলাকা দালানের ও প্রান্তে হলেও শশীর ডাক-হাঁক কানে যাবে না, এতো ধ্যানস্থ হয়ে যান নি ছোটগিন্নী। এখন তিনি গলা তুলে বলে ওঠেন, তা ভাঁড়ারে আগুন লাগতে অধিক দেরীও নেই বাছা—বংশে যখন তোমাদের মতন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। তা এ ঘরে হাপসা কেন বাছা, নেয্য জায়গায় এসে বোস না। চন্দর বেড়িয়ে ফেরেন নি, তাই মায়ের পায়ে মুণ্ডুটা একটু ঠুকতে বসেছিলুম।...আসবে? না বৌয়ের হাতে দিয়ে দেব?

কি মনে করে শশী কোঁচার খুঁটটা টেনে এ দালানে এসে বসে। এখানে তিন-চারখানা পিঁড়ি পাতাই আছে। কাঁঠাল কাঠের ভারী পিঁড়ি, কোণে কোণে নক্সা কাটা। তার একটায় বসে পড়ে ঘাড় গুঁজে বলে, খিদে লেগেছে তাই বলা—

তা খিদে তো লাগতেই পারে—

ছোটখুড়ির অমায়িক গলা—বেলা তো কম হয় নি। কই নতুন বৌমা, পাত্তরটা।

চকচকে পিতলের কলসীতে মুড়ি ভেজে গরম গরম বেলায় ভরা থাকে।

ততোধিক চকচকে একটা পিতলের রেক-এ হড়হড় করে মুড়ি ঢেলে শশীর সামনের ধামিতে ঢেলে দেন ননীবালা, আর এক ছোট্ট ঘড়া থেকে বার করে আনেন ছোলা মটর ভাজা, এবং একটা ছোট কাঁসার রেকাবিতে করে চারটে নারকেল নাড়ু বসিয়ে দিয়ে যান।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত শশী বলে, তিলের নাড়ু আছে নাকি ছোট খুড়ি?

আছে বোধহয় দু'টো, দেখি—

আবার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে যান ননীবালা, আর ডেকে বলে যান, মাচা থেকে দুটো শশা ছিঁড়ে আনো না নতুন বৌমা, শশী মুড়ির সঙ্গে ভালবাসে—

এবার কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হবার পালা অশ্রুমতীর।

ছোটগিন্নী মুখে যতই ব্যাজার ভাব দেখান, কাউকে খাওয়াতে বসলে যত্ন না করে পারেন না। বলতে কি, স্বেচ্ছায় তিনি এই জলপানির ভারটি নিজের হাতে নিয়ে রেখেছেন।...খানিক বেলায় মুনিষরা আসে, গোয়ালের চাকরটা আসে, গরুর রাখাল আসে, বাসনমাজা ঝি আর তার নাতিটা আসে। সব্বাইকার জলপানি বরাদ্দ।—

ওদের জন্যে অবশ্য মোটা চালের চাল ভাজা। তবে সেই চালভাজার সঙ্গে আনুষঙ্গিকও আছে। বাটি বাটি গুড়, ব্যাসন নাড়ু, পক্কান্ন, তেল নুন কাঁচা লংকা।—গাছের শশার বহর দেখলে তাও ছিঁড়ে নিতে বলেন। আর কেউ ওদের পরিবেশন করলে পছন্দ হয় না ননীবালার।

দ্বিতীয় প্রস্থ মুড়ি আর তিলের নাড়ু খেয়ে বড় গেলাসের এক গেলাস জল খেয়ে শশী পরিতৃপ্তির শব্দ উচ্চারণ করে গলা তুলে বলে, আমি একটু চণ্ডীবাড়ির ওদিকে যাচ্ছি ছোট-খুড়ি, কেউ খোঁজ করলে বলে দিও।

কেউ অর্থে অবশ্যই চন্দ্রকান্ত।

কিন্তু চণ্ডীবাড়ি কি গুপ্তদের দোতলার শেষ কোণার ঘরে!

ছেলের বৌকে অকারণ খিঁচিয়ে নিবারণী চাপা গলায় বলেন, খবরদার। কাউকে নাগিয়ে দিতে যাবি না হারামজাদি যে, শশে ওপরে ঘুমোতে গেচে।—বুঝতে পেরেচিস? ঘুমে বাছা নটপট করছে, একটুক্ষ্যাণ ঘুমোতে না পেলে বাঁচবে কেন?—নাগিয়ে যদি দিস, তোর একদিন কি আমার একদিন। —যাও এক ঘটি জল নে গে রেকে এসো ওর মাতার কাচে, তেষ্টা পেলে গলা তুলে ডেকে চাইতে পারবে নি তো। আহা, বাছা আমার যেন চিরচোর! বাপ নেই বলেই তো? আজ যদি ওর বাপ থাকতো, কারুর সাদ্যি ছেলো চোক রাঙাতে? পরাশ্রয়ী তো নয়? নিজের বাপ দাদার ভিটে, শুধু দুটো ভাত কাপড। তার জন্যেই এতো নীচু হয়ে থাকা।— সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও। আসার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দে এসো। আর এই বলে রাকচি, খবরদার, যেন কেউ টের না পায় শশে ঘরে আচে।

শশী ভূমিষ্ঠ হবার আগে ওর বাপ মরেছিল, তবু নিবারণী ওর বাপ থাকা আর না থাকার অবস্থার তুলনা-মূলক আলোচনায় আক্ষেপ করতে ছাড়েন না।

শশীকান্ত যে ঘরটা অকাল নিদ্রার জন্যে বেছে নিয়েছিল, সেটা বলতে গেলে বাড়ির বাড়তি আবর্জনার ঘর। ভাঙা। ভাঙা টুল, নড়বড়ে আলনা, তুলো বেরিয়ে যাওয়া তোষক, ছেঁড়া মশারির ডাঁই, পুরনো কাপড়ের পোঁটলা ইত্যাদি। একটা যে ইঁট-ঠেকানো তেপায়া চৌকী পড়ে আছে, সেও জঞ্জাল হিসেবেই, তবু তার ওপর কিছু তোষক বালিশও আছে ওই রাখার জন্যেই।—এটাই শশীর সুখের গোলোকলা। যখনই বাড়িতে থেকেও গা-ঢাকা দেবার তাল করে শশী, এইখানে এসে শুয়ে পড়ে। সন্দেহের অতীতই জায়গাটা।

আর প্রধান সুবিধে—প্রবেশ পথটা লোকচক্ষুর অন্তরালে। দালান ছাড়িয়ে ঘেরা বারান্দার কোণে।

জলের গ্লাশটা নিয়ে ঘরে ঢুকল অশ্রুমতী।

মোটা একটা ময়লা তেলচিটে ওয়ারবিহীন পাশ-বালিশ জড়িয়ে শুয়েছিল শশী। দরজা খোলার শব্দে চমকে 'কে' বলেই উঠে বসে খিঁচিয়ে বলে উঠল, আবার কী করতে জ্বালাতে এলি?

পিসির কানে শশীকান্তর স্ত্রীর প্রতি মধুর সম্বোধন গেলে রাগ করে পিসি বলে, বদ্যির ঘরেব ছেলে, পরিবারকে 'তুই মুই' কী রে? তুমি বলতে মুখে ফোস্‌কা পড়ে?

অতএব শশীকান্ত লোক সমাজে একটু সামলে চলে। কিন্তু একা কোর্টে পেলে সামলাবার প্রশ্ন নেই। এমন সুবর্ণ সুযোগে তুই তো সামান্য, পিটিয়ে লাশ করাও চলে।

অশ্রুমতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, মা বললেন জলটা—ওর বেশী সাহসে কুলোয় না তিন ছেলের মা অশ্রুমতীর। 'ছেলে' অবশ্য নয়, মেয়ে। জন্ম-রুগ্ন হাড়সার তিনটে মেয়ে। যারা অশ্রুমতীর দুঃখের বোঝা আর পরাজয়ের স্বাক্ষর। তাই সাহসের প্রশ্ন নেই।

শশীকান্ত হাত বাড়িয়ে বলে, এদিকে আয়।

ওঃ। সরে এসে মারবার পরিশ্রমটুকুও করবে না। পায়ে হেঁটে গিয়ে মার খেতে হবে।— এগিয়ে গেলেই যে নির্ঘাৎ গালে ঠাস করে একটা চড় মারবে তাতে সন্দেহ কী?

অশ্রুমতী নড়ে না।

অথবা নড়তে পারে না।

কী? ন্যাকামি হচ্ছে? চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে হবে?—শশীকান্তর ভঙ্গী হিংস্র ক্ষুধার্ত।

অশ্রুমতীর সর্বশরীর থরথরিয়ে আসে, অশ্রুমতীর বুক ধড়ফড় করে ওঠে, চোখে জল উপচে ওঠে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় অশ্রুমতী আসন্ন ঝড়ের মুখে।—ভগবান।— ঘাড়ে পিঠে বুকে পেটে যেখানে হয় মারুক, যেন গালে না মারে। বড় লজ্জা! বড় লোক জানাজানি! লুকোবার উপায় নেই। তিন চারদিন কালসিটের দাগ থাকে।

ভগবান বোধয় বেচারী অশ্রুমতীর প্রার্থনা শুনতে পান।

গালে চড় বসিয়ে দেয় না তার পতি দেবতা।

কিন্তু ঠাশ করে গালে একটা চড় বসিয়ে দেওয়া কি এর থেকে বেশী ভয়াবহ ছিল?—

কিছুক্ষণ পরে যখন 'দূর হ কাঠের পুতুল' বলে অশ্রুমতীর রোগা শরীরটা চৌকী থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আবার গুছিয়ে ঘুমের জোগাড় করে শশীকান্ত, তখন তার হাতের মুঠোয় অশ্রুমতীর গলার সরু বিছে হার ছড়াটা।

কষ্টে কান্না থামিয়ে অশ্রুমতী বলে, গলা খালি দেখলে সবাই কী বলবে?

কী আবার বলবে? খানিক গাল-মন্দ করবে। তারপর থেমে যাবে।

জিগ্যেস করবে না কোথায় গেল?

করবে নিশ্চয়। বলবি চান করতে গিয়ে টিপ্‌কল খুলে জলে পড়ে গেছে।

আস্ত রাখবে আমায়?

না রাখে, ভাঙবে। যাকে দিয়ে এতটুকু সুখ নেই, অমন পরিবার থাকাই বা কী, যাওয়াই বা কী? নিজেই জলে ডুবতো না। লোকে ভাববে গয়নাসুদ্ধ ডুবেছে।

মেয়ে তিনটেকে কেউ দেকবে জানলে এক্ষুনি জলে ডুবতে যেতাম। তোমার মা তো ওদের কাঠি করেও ছোঁন না।

অ্যাঁ! কী বললি?

মাতৃভক্ত শশীকান্ত মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বৌয়ের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে, আমার মা তুলছিস?—মায়ের কথা নয়ে কথা?—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব না? ফের বলবি? ফের বলবি? যা বেরো দূর হয়ে যা!—স্বামী তোর একটা সোনা নিয়েছে বলে হাপসাচ্চিস? লজ্জা করে না? নিয়েছি তোর সাতপুরুষের ভাগ্যি তা জানিস?—স্বামীর কোনো কম্মে লাগিস খ্যাংরা কাঠি! অ্যাঁ লাগিস? তিনতিনটে মেয়ে বিইয়ে আমায় উদ্ধার করেছেন। হার নিয়েচি বেশ করেচি। কাউকে যদি বলবি, তো তোর ওই অরিস্টি-গরিস্টি-পাপিষ্ঠী মেয়ে তিনটেকে খালের ধারে গুঁজে রেখে আসবো। বাস, আমার এই শেষ কথা।

এই এক মোক্ষম অস্ত্র।

একেবারে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

অশ্রুমতী নামের মেয়েটা এই অস্ত্রে একেবারে নিথর!—মেয়ে কটা তার প্রাণ। সেটা বোঝে বলেই শশী এই অস্ত্রটাই শানিয়ে রাখে।

'হিতবানী' তো তোমার 'কাব্যকণিকা'র খুব প্রশংসা করেছে।—নিয়ে এলাম কাগজখানা—

হাতের কাগজখানা ফরাসের উপর বিছিয়ে ধরে গৌরমোহন। সেই মুদ্রিত জায়গাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে বলেন, 'হিতবাদী' বড় একটা এরকম ছাপে না। যাক—ভাই, তুমি একটা কাজের মত কাজ করে চলেছ।

চন্দ্রকান্ত সেই কলামটার উপর চোখ রেখে লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, কাজের মত কাজই বটে।

ছেলেখেলা করি একটু।—তুমি জোর করে খাতাটা নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ডটি করেছিলে, তাই হল। আমার তো জমাই হচ্ছে কেবল।

খুব অন্যায়। এসব জিনিস ছাপা হওয়া দরকার। 'ছেলেখেলা' হলে আর কাগজে সুখ্যাতি করতো না—

গৌরমোহনের কণ্ঠে উৎসাহ উদ্দীপনা আনন্দের অভিব্যক্তি।

এই তো দেখো না, 'কাব্যকণিকা'র কবিতাগুলিকে 'কণিকা' মাত্র বলা কবির অধিক বিনয়ের লক্ষণ। দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি যথার্থই আন্তরিক আবেগপ্রসূত।—সমাজচিন্তা সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে যেমন সমাজের অনাচার-অত্যাচারের উপর তীব্র কশাঘাত আছে, তেমনি আবার কবির দরদী হৃদয়ের বেদনাবোধের স্পর্শ আছে।—'জননী' কবিতাটিতে কবির চিন্তার স্বচ্ছতা, বক্তব্যের ঋজুতা ও সুগভীর অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একটি স্তবক উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

> হে জননী—
> তুমি কি কেবলই রবে 'স্নেহময়ী' রূপে
> শুধু সহ্য শুধু ক্ষমা,
> শুধু স্নেহ শুধু মায়া
> অক্লান্তে সেবিয়া যাবে, ধীরে
> চুপে চুপে?
> হবে না কি 'অগ্নিময়ী' কঠোর?
> অপদার্থ কুসন্তানে—
> কঠিন আঘাত হেনে—
> ঘুচায়ে দিবে না তার 'কাল' ঘুমঘোর?

স্থানাভাবে অধিক উদ্ধৃতি সম্ভব হইল না, তবে কবি জননীর যে আদর্শ রূপ কল্পনা করিয়াছেন ও তাঁহাদের যে কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুগোপযোগী হইয়াছে।

চন্দ্রকান্ত অল্প বয়স্ক নয়, চন্দ্রকান্তর প্রকৃতিতে গৌরমোহনের মত উচ্ছ্বাস নেই, তবু চন্দ্রকান্তর বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে, যেন একটা বেদনার মত আনন্দ বোধ হয়।

তবু চন্দ্রকান্ত মৃদু হেসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, এই সমালোচকটি তুমিই নও তো?

কী যে বল?

গৌরমোহনও হাসেন, আমি কে যে আমার বক্তব্য ছাপবে? তবে হ্যাঁ, প্রকাশের জন্যে দেওয়ার বাহাদুরীটা গৌরমোহনের প্রাপ্য। এবারেও তোমার কিছু কবিতা নিয়ে যাব। জমেছে তো কিছু?

চন্দ্রকান্তর মুখে আসে, এখন আমার কবিতার থেকে গদ্য রচনায় ঝোঁক হয়েছে,—লজ্জায় বলে ফেলতে পারেন না শুধু হেসে বলেন, তা জমেছে। যাক, থাকছ কতদিন?

কতদিন আর? মাত্র তো সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

চন্দ্রকান্ত বলেন, কলকাতার অবস্থা এখন কী রকম?

গৌরমোহন একটু তাকিয়ে বলেন, কোন্ অবস্থার কথা জানতে চাইছ? অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে?

সব বিষয়েই। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, সামাজিক আচার-আচরণ, নব্য যুবকদের মতিগতি, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামিতা—

ওরে বাবা! তোমার 'কোশ্চেন পেপার' পড়তেই তো আমার একটা বেলা কেটে যাবে। সব অ্যানসার দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, এক কথায় বলা চলে—কলকাতা হচ্ছে বহুরূপী।—একই মাটিতে একদিকে ধর্মের বন্যা, অপর দিকে পাপের স্রোত, একদিকে শিক্ষা সভ্যতা কালচারের অগ্রগতি, অপর দিকে পাপের

স্রোত, একদিকে শিক্ষা সভ্যতা কালচারের অগ্রগতি, অপর দিকে সভ্যতার নামে অসভ্যতা, শিক্ষার নামে বিভ্রান্তি। আর স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা যদি বলো—আচ্ছা চন্দর—

গৌরমোহন ব্যগ্রভাবে বলেন, তুমি একবার চলো না। কতকাল তো যাওনি। সেই অবধিই তো কলকাতাকে বর্জন করে বসে আছো।

চন্দ্রকান্ত গৌরমোহনের কথায় চকিত হন। তারপর আস্তে বলেন, ওটা কোন কথা নয়। বর্জনও নয়, তদবধিও কিছু নয়। যাওয়া হয়ে ওঠে না! এই পর্যন্ত।

চুপ করে যান দু জনেই। যেন অতীত স্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়ে অবগাহন করেন।

একটু পরে চন্দ্রকান্ত গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেন, তুমিতো সবই জানো। বড়দারা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি বড়ই বন্দী হয়ে গেছি। বাড়িতে তো আর দ্বিতীয় পুরুষ অভিভাবক নেই। অথচ—

গৌরমোহন বলেন, শশীকান্ত এখনো মানুষের মত হল না?

হলে আর ভাবনা কী ছিল? বরং মনে হচ্ছে, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দুর্মতি বাড়ছে। সেজ খুড়ির অদৃষ্ট। এই সব বন্ধনে—

তাহলেও—

গৌরমোহন বলেন, একবার চলো কয়েকটা দিন থেকে আসবে। মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটের সেই আগের বাসাটা বদল করেছি সে তো জানো? শোভাবাজারের এই বাসাটা অনেক বড, অনেক জায়গা। বড় বড় পাঁচখানা ঘর, দালান উঠোন। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

চন্দ্রকান্ত অন্যমনা ভাবে বলেন, আমার আবার কী অসুবিধে? কেষ্টর মায়ের অসুবিধে ঘটানো—

কৃষ্ণমোহন গৌরমোহনের বড় ছেলে. ডাকনাম কেষ্ট। গৌরমোহন ব্যস্ত হয়ে বলেন, আ ছি ছি। এ কী বলছ চন্দর? কেষ্টর জননী মানুষজন খুব ভালবাসে। রান্নায় খুব ওস্তাদ তো। খাওয়াতে টাওয়াতেও—

গৌরমোহনের কথার মাঝখানেই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়, বাড়ির ভিতর থেকে গোবিন্দ দুহাতে একটি থালা ধরে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন থালা বোঝাই।

চন্দ্রকান্ত শিহরিত হন। কী সর্বনাশ, এতো কে খাবে?

তুমিই খাবে। সকাল বেলা তো সেই শুধু সরবৎ খেয়ে বেরিয়েছ?

একথা কে বলল তোমায়?

বাঃ। চিরকাল যা কর জানি না? অভ্যাসের নড়চড় করবার লোক তো তুমি নও। খাও খেয়ে নাও। আমি তো ভাবছিলাম, গোবিন্দকে একবার তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দিই। পিসিমাকে বলে আসুক, আজ তুমি এখানেই সারাদিনটা থাকবে খাবে।

না, না।

চন্দ্রকান্ত ব্যস্ত হন, এসব আবার কেন?

আর কিছু নয়, অনেক কথা জমে আছে, মনে হচ্ছে সারাদিনেও ফুরোবে না। যাক না গোবিন্দ—

চন্দ্রকান্ত অবশ্য অনুরোধ কাটিয়ে নেন।

বন্ধু গর্বে যাতে আঘাত না লাগে গৌরমোহনের, এমন কোমলভাবেই বলেন, পিসিমার ছুতোও দেখান, তবু গৌরমোহন একেবারে ছাড়েন না। কথা হয়—তাঁর এই ছুটির কদিনের মধ্যে একটা দিন দুই বন্ধুতে একসঙ্গে ভাত খাওয়া হবে।

চন্দ্রকান্ত হেসে বলেন, সেটা আমার বাড়িতেই বা নয় কেন? না কি বদ্যি বাড়িতে চলবে না?

গৌরমোহন হেসে ফেলে বলেন, চিরকালইতো চলে এলো, হঠাৎ প্রশ্ন কেন? পিসিমার হাতে খেয়ে খেয়েই তো মানুষ হয়েছি—ঠিক আছে, একটা দুপুর তাও হবে। বামুনের ছেলে, পেটুক জাত, ভোজনে ব্যাজার নেই। তবে এ বাড়ির গিন্নীরও সাধটা মেটানো চাই। বামনাইয়ের কথা আর তুলোনা ভাই, কলকাতায় বসবাস করতে গেলে জাতের বড়াই করা ধৃষ্টতা। তাছাড়া—কেষ্টর মায়ের শরীর খারাপ হওয়ায় বাড়িতে

তো রাঁধুনী বামুনেরও আমদানী করতে হয়েছিল, উড়িষ্যার মাল, পৈতে একটা গলায় ছিল, ওতেই সন্তুষ্ট থেকেছি। গিন্নী ভাল হয়ে অবশ্য তাকে ভাগালেন।

কী হয়েছিল গিন্নির?

অন্যমনস্কভাবে বললেন চন্দ্রকান্ত।

গৌরমোহন একটু লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, আর বল কেন, বুড়ো বয়সের কেলেংকারী।

তাই না কি?

চন্দ্রকান্ত একটু সচেতন হলেন।

গৌরমোহন বলেন, টিকল না, শুধু কষ্টই সার হল। অসময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার বাড়তি ফল ওই স্বাস্থ্য ভঙ্গ। তুমি বেশ আছ ভাই, নীলকান্তর পর চুপচাপ। আমার তো দ্যাখো দুই মেয়ের পর কেষ্ট, লালু, এই গোবিন্দ, আর ওইতো শুনলে—

চন্দ্রকান্ত একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, নীলকান্তর জন্মের আগেরগুলিকে বুঝি হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছো?

আহা। ঈস্! ইয়ে—মানে—

গৌরমোহনের মুখটা অপ্রতিভ অপ্রতিভ লাগে।

ভুলেই গিয়েছিলেন সত্যি।

চন্দ্রকান্তের প্রথম পুত্র-সন্তানটি আঁতুড় ঘরেই মারা যায়।

ধাইয়ের মতে পেঁচোয় পেয়েছিল, সুনয়নীর মতে—ধাইয়ের অসাবধানতায় হাত থেকে পড়ে গিয়ে তড়কা হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার সুনয়নী আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যমজ কন্যা নিয়ে। এটা অনেকের কাছেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। ভগবান একজনকে অকালে নিয়ে ফেলে অনুশোচনায় পড়ে একসঙ্গে দুটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চিরকেলে পাকা কথা কইয়ে সুনয়নী অবশ্য বলেছিল, হ্যাঁ খুব পুণ্যি করেছেন ভগবান, নাকের বদলে নরুণ দিয়েছেন।

তবে কন্যা যুগলের আদরের ঘাটতি ছিল না, কারণ মেয়ে দুটি হয়েছিল পরমা সুন্দরী। কিন্তু সেটাই হল কাল, সুনয়নীর বাপের বাড়ির দিকের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় তাঁর একজোড়া যমজ ছেলের জন্য মেয়ে দুটিকে পছন্দ করে ফেলে এমন ঝুলে পড়ল যে নিতান্ত বালিকা বয়সেই তাদের গোত্র ছাড়া করে ফেলতে বাধ্য হলেন চন্দ্রকান্ত। তখন অবশ্য চন্দ্রকান্তর বাবা বেঁচে।

চন্দ্রকান্ত এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে তাঁর শরণ নিয়েছিলেন। তিনিও এতে খুব উৎসাহী ছিলেন না। যমজ পাত্র পাত্রীর বিবাহ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পূর্ণ অনুমোদিত নয় বলেই স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠল কুটুম্বর মর্যাদা রক্ষার।

বিয়ের প্রস্তাবক-কর্তা স্বয়ং সুনয়নীর বাবা, অতএব চন্দ্রকান্তরও পিতৃতুল্য গুরুজন, তাঁর একান্ত নির্বেদ সত্ত্বেও অরাজী হওয়া মানেই তাঁকে অসম্মান করা।

সুনয়নী তো একেবারে বাপের দিকে। তার মতে, একসঙ্গে একজোড়া কন্যাদায় উদ্ধার হয়ে যাওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ছেন এঁরা কেবলমাত্র প্রস্তাবটা গরীব কুটুম্বর কাছ থেকে এসেছে বলে! বাবার এতে মুখ থাকবে? এই সুনয়নীর নিভৃত-রাত্রির পটভূমিকা হলো—আমার বাবা গরীব, কিন্তু একটা মান্যমান লোক। তাছাড়া—পাত্রপক্ষ তো মস্ত বড় লোক। তোমরাই তোদের কাছে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে।

তা সেটাই বা কি লাভ?

বলি মেয়ে তো সুখে থাকবে।

তুমি পারবে এখন থেকে ওদের ছেড়ে থাকতে?

সুনয়নীর পাকা গিন্নী কথা, তা মা যখন হয়েছি, এ দুঃখ তো সইতেই হবে। আজ দশ বছরের আছে, কাল বারো বছরের হয়ে উঠবে। মেয়ের বাড় কলা গাছের বাড়। এরপর ওই মেয়েদের নিয়ে ভুগতে

হবে কিনা তা দিব্যি গেলে বলতে পারো? যমজের আধখানা লোকে সহজে নিতে চাইবে? আর এ সম্বন্ধ যদি তোমরা হেলায় ঠেলো, বাবা আর তোমাদের বাড়ির ছায়াও মাড়াবেন না তা মনে রেখো।

চন্দ্রকান্তর বাবা বললেন, এরকম ক্ষেত্রে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় দেখি না চন্দর। বৌমার যুক্তিটাও ফেলবার নয়, এরকম সবদিকে ভাল পাত্র সব সময় পাওয়া যায় না, মেয়েরা না হয় দুবছর এখানেই থাকবে—

অতএব পিতৃশরণ নেওয়াও কাজে লাগেনি চন্দ্রকান্তর। কিন্তু সেই সর্বাংশে ভাল পাত্রের পিতাটি যে সর্বাংশেই খারাপ তা বোঝা গেল বিয়ের পরে।

দু বছর তো দূরস্থান, দুদিনও বৌদের বাপের বাড়ি রাখতে রাজী হলেন না তারা। সেটা নাকি তাঁদের কুলগত নিয়মের বহির্ভূত।

আগে এ নিয়ম জানানো হয়নি কেন এ প্রশ্নে কিছু বচসা হল, এবং সেই সূত্রে চিরতরেই আসা বন্ধ হয়ে গেল মেয়েদের। পাঠাতেই যদি হয় জন্মের শোধই পাঠাবেন, এমন ঘোষণা পত্র পাঠালেন তারা। চন্দ্রকান্ত অবশ্য বলেছিলেন বাপের কাছে, তাই পাঠাক। জন্মের শোধই পাঠাক।

বয়েস তখন কম, রক্ত তপ্ত। এই সিদ্ধান্তই নেবেন স্বাভাবিক। কিন্তু চন্দ্রকান্তর ঠাণ্ডামাথা বাবা বললেন, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। নিজেদের জেদের লড়াইয়ে মেয়ে দুটোর—আখের ঘোচাবি বাবা? একটা আধটা নয়, দু-দুটো মেয়ে। তাদের চিরকালের কথাটা ভাব। তুই নাহয় তাদের ভাত কাপড় দিতে পারবি, কিন্তু স্বামী সংসার দিতে পারবি?

চন্দ্রকান্ত মাথা হেঁট করলেন।

অতএব নাটকে যবনিকা পতন।

মজা এই যে, কুটুম্ব বিচ্ছেদের ভয়ে এই ঘটনা ঘটানো, এ-ব্যাপারে সেই বিচ্ছেদই ঘটলো। সুনয়নীর বাবা এতে জামাইয়ের দোষ দেখে তারপর আর এ বাড়িতে পদার্পণ করেন না। ক্রমশঃ যেন ভুলেই গেল সবাই, ফুলি টুলি নামে টুকটুকে দুটো মেয়ে এ বাড়িতে ছিল।

অনেকদিন পরে কোথায় কোন মেলায় না মন্দিরে নাকি মেয়েদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন সুনয়নী, মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শাশুড়ির পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অতঃপর আর কি হতে পারে?

গৌরমোহনের এ ইতিহাস জানা।

দৈবাৎ ভুলে গিয়েছিলেন, তাই চন্দ্রকান্তের সন্তান সংখ্যার উল্লেখ করে ফেলেছিলেন। এখন অপ্রতিভ হলেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন, লজ্জা পাবার কিছু নেই ভাই, আমরাই তো প্রায় ভুলে গেছি তাদের। নীলকান্তর জননীর আচার আচরণ দেখলে তো মনে হয় না, নীলকান্ত ছাড়া আর কখনো কেউ ছিল ওর।

স্ত্রী সম্পর্কে 'মা' শব্দটাই উচ্চারণ নিষেধ, তাই 'জননী' বলেই কাজ সারতে হয়।

চন্দ্রকান্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলেন, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো গৌর, যে আমি বাল্য বিবাহের এতো বিরোধী, সেই আমারই মেয়েদের বিয়ে হল বলতে গেলে শিশুকালে। অথচ এমনিতেই এখন নানা কারণে বাল্য বিবাহ কমে আসছে। শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাও। বড় লজ্জা।

হঠাৎ আবার একটা স্তব্ধতা নামে।

এবার তাহলে উঠি গৌর।

একটু পরে বলেন চন্দ্রকান্ত।

আচ্ছা এসো, আমিও যাব পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে। কাল দুপুরের কথা বলে আসবো। তুমি আর নীলকান্ত—

নীলকান্ত? না না। ওটা থাক।

চন্দ্রকান্তর কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

গৌরমোহন বিস্মিত হন, কেন বল তো?

না এমনি, মানে তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

চন্দ্রকান্ত উঠে পড়েন।

যাবার মুখে বলে যান, মনের কথা বলবার মত লোক জগতে বড় দুর্লভ গৌর।

কথাটা সত্যি। চন্দ্রকান্ত তাঁর সেই সামাজিক উপন্যাসের পরিকল্পনার কথা বলতে চান গৌরমোহনকে। বলতে চান পরামর্শের জন্যেও। বর্তমানকে নিয়ে লেখা সহজ, অতীতকে নিয়ে আরো সহজ, কিন্তু ভবিষ্যৎকে নিয়ে? তাতে পদে পদে চিন্তার প্রশ্ন। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলে তো চলবে না। 'রূপকথা' না হয়ে যায়।

এসব কথা নীলকান্তর সামনে হতে পারে না। সেই নিয়ে মায়ের কাছে গল্প করতে বসবে। এমনিতে নেমন্তন্নতেই ভয়। ছেলে কোথাও নেমন্তন্ন গেলে, কোন খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে গেলে বাড়ি ফেরা মাত্রই সুনয়নী প্রশ্ন করবে, কী খেলি? তারপর তালিকা শুনে হয় সমালোচনা আর ব্যাখ্যানায় মুখর হবে, নয় চোখ কপালে তুলে ধন্যি ধন্যি করে সুনয়নী নিজে কবে কোথায় কী কী 'বড়' নেমন্তন্ন খেয়েছে, তার ফিরিস্তি দিতে বসবে। হয়তো সে ফিরিস্তিতে শুনতে হবে—সুনয়নীর পিসেমশাই একা আস্ত একটা পাঁঠা খেতে পারেন, একটা বিয়ে বাড়িতে এক গামলা মাছ ফুরিয়ে দিয়ে কী জব্দই না করেছিলেন।

অথবা সুনয়নীর মামা একাসনে বসে আড়াই সের বোঁদে আর সাড়ে তিন সেরি দইয়ের হাঁড়ি শেষ করেও আবার পুরোদমে মাছ, লুচি, ডাল, তরকারি খেয়ে কত অনায়াসে হজম করতেন।

প্রসঙ্গ আর ফুরোতেই চায় না।

চন্দ্রকান্তর মনে হয়, কী অরুচিকর এই সব প্রসঙ্গ। চন্দ্রকান্তর চিন্তায় অতিরিক্ত আহার বীভৎসতার সামিল, আর সুনয়নীর মতে সেটা রীতিমত বাহাদুরীর ব্যাপার।...

ছোট মামা না একবার কালীপুজোর পরদিন বাজি রেখে চারচারটি পাঁঠার মুণ্ডু খেয়েছিলেন—জানিস?

চন্দ্রকান্তর কানের কাছেই এ আলোচনা।

উঠে গিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত সেখান থেকে।

যাবার সময় শুনতে পেয়েছিলেন, তোমার ছোট মামা খুব বীর, তাইনা মা?

নিশ্চয়।

বালক পুত্রের কাছে 'বীরের' ধারণা জন্মানোর এই উপকরণ সম্বল ছিল সুনয়নীর।

কিসের সম্বলই বা আছে সুনয়নীর? কোথাও কোনোখানে?

কী নিঃসম্বল! কী রিক্ত!

অথচ সেই রিক্ততা সম্পর্কে বোধ মাত্র নেই।

চার

বাড়ি ফিরতে রোদ চড়চড়ে বেলা, দুপুর হয় হয়।

সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি না ঢুকে পিছনের আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঢুকবেন বলে উল্টোমুখো রাস্তা ধরে ঢেঁকিঘরের পাশ দিয়ে উঠোনে চলে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন চন্দ্রকান্ত। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে হবে বলে কষ্ট হল।

ঢেঁকিঘরের পাশের এই উঠোনটার মাঝখানেই বড় জেঠিদের পার্টিশনের প্রাচীর। টানা লম্বা সেই প্রাচীরটা ভর্তি করে ঘুঁটে লাগাচ্ছেন সুনয়নী। পচা গোবরের গন্ধে নাক চাপতে হল।

সুনয়নীর চুলগুলো ঝুঁটি করে মাথার চুড়োয় তোলা। সুনয়নীর পরণে একখানা, ও গায়ে একখানা গামছা। সুনয়নীর হাতে গোবর, মুখে ঘাম। সেই ঘাম ভেদ করে ফুটে উঠেছে ত্বকের বক্তিমা। এমনিতে শাঁখের মত শাদা, কিন্তু রোদে হয়ে উঠেছে লাল।

কিন্তু গালের ওই রক্তিমাভা কি চোখে পড়ে চন্দ্রকান্তর? লজ্জায়, ক্ষোভে নিজেই তো রক্তিম হয়ে ওঠেন তিনি।

কী কুৎসিত! কী জঘন্য!

দ্রুত এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, ছোট বৌ!

ওমা! ই কি! তুমি এদিকে কোনখান থেকে?

বিব্রত হয়ে গায়ের গামছার খুঁটটা টেনে মাথায় তোলবার বৃথা চেষ্টায় গাটাই আদুল হয়ে যায় সুনয়নীর। বাড়তির ভাগ—গালে কপালে বুকে লাগে গোবরের ছোপ্।

থাক থাক, আর লজ্জায় কাজ নেই—

চন্দ্রকান্ত ক্ষুব্ধ গাম্ভীর্যে বলেন, যথেষ্ট হয়েছে। 'লজ্জা' জিনিসটা যে কী, সে জ্ঞানই যদি থাকতো! তা এসব করবার লোক জোটেনি? বাগদী বৌ মরে গেছে?

বালাই ষাট মরবে কেন? দিব্যি আছে। রাঁধছে খাচ্ছে। ঘুঁটেগুলো দেবার গা নেই, সাতদিন ধরে গোবরের ডাঁই পচাচ্ছে। আর ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে।

ওঃ। তাই। তাই তুমি সেই পচা গোবরের সদগতি করতে লেগে গেছ? নিজের থেকেও দামী মনে হল তোমার ছোটবৌ এই পচা গোবরগুলো?

সুনয়নী তখনো মাথা ঢাকবার বৃথা চেষ্টায় গামছার খুঁটটাকে দাঁতে কামড়ে হাত উল্টে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন। করতে করতেই বলে ওঠেন, দামী সস্তা আবার কী! গেরস্ত ঘরের বৌ, একটু গেরস্তালী কাজ করলে হাত ক্ষয়ে যাবে? যাও তো ওদিকে, ব্যস্ত কোর না বাবু। কে কোনদিকে এসে পড়বে—

এসে পড়লে তোমায় তো দেখবেই এই মূর্তিতে।

আমায় একলা দেখলে আবার কী! গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝি একবারো গামছা পরে না? বেম্ম তো নেই, হিঁদু বাঙালী তো! গাঁ ঘরে বসত।

তা বটে। তাতেই সাতখুন মাপ।

চন্দ্রকান্ত সুনয়নীব ব্যতিব্যস্ত বিব্রত ভাব দেখে আর দাঁড়াল না। এসেই গৌরমোহনের গল্প করবেন বাড়িতে—এই ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, ছন্দ কেটে গেল। গল্পটা অবশ্য পিসি খুড়ির কাছেই, তবু সুনয়নী তো থাকতো ধারে কাছে।

বাবা, এতোক্ষণে এলি তুই? কোন ভোরে বেরিয়েছিলি!

পিসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ওখেনে তো জলটল খেয়ে এসেছিস। গৌরের ছেলে বলে গেল।

না খেলে ছাড়বে?

বলেই চন্দ্রকান্ত ইতস্ততঃ গলায় বলেন, বাগদী বৌয়ের কী হল পিসিমা? পচা গোবরের পাহাড় নিয়ে তোমাদের ছোটবৌমা—

ইতস্ততঃ তো করতেই হবে। এখুনি যদি পিসিমা 'বৌয়ের দুঃখে গলে গেলি' বলে সাত কথা শুনিয়ে দেন!

কিন্তু না। উল্টোই হলো।

পিসিমা বলেন, ওই তো দ্যাখনা! বললে শুনছে কে! বাগদী বৌ অবিশ্যি কামাই করছে। কিন্তু তাড়াই বা কী? সাতদিন পচছে। নয় আর একদিনও পচবে। চোদ্দবার বারণ করলাম, তা বলে কি—কাজ পড়ে থাকলে আমার স্বস্তি থাকে না। আমি তো বাবা মরে গেলেও ওই কম্মটিতে হাত লাগাতে যাইনে। তিনদিন তিন রাত্তিরে হাতের পচা গন্ধ যায় না। ছোটবৌমার তো শরীরে ঘেন্না পিত্তির বালাই নেই। যত বলি, ততো হেসেই আকুল হয়।

চন্দ্রকান্ত সরে আসেন।

অভিযোগই করছেন পিসিমা।

কিন্তু সেটাই কি আসল? তার মধ্যে থেকে কি অপরাধিনীর প্রতি প্রশ্রয়ের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না? প্রশ্রয়ের আর প্রশংসার। যে মারণাস্ত্রে সুনয়নী নামের মানুষটা নিহত।

দোতলায় উঠে এসে দেখলেন, নীলকান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাখিমারা গুলতি তৈরি করছে। নীলকান্তর হাতে একটা গাছের দু'ডালের মাঝখানের কোনাচে ডাল, শক্ত পোক্ত, আর খানিকটা শক্ত দড়ি। দুটোকে ধরে টেনে টেনে বাঁধছে মজবুত করে।

চন্দ্রকান্ত বিরক্তভাবে নিজের ঘরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, কি ভেবে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার গুলতি তৈরি করছো নীলকান্ত? অকারণ জীবহত্যার চেষ্টার বিষয়ে সেদিন যা বলেছিলাম, ভুলে গেছ?

নীলকান্ত এই দেখা ঠেখার পরও হাতের জিনিসটা লুকোতে চেষ্টা করে মিনমিনিয়ে বলে, পাখির জন্যে নয়, বাঁদর মারা হবে।

বাঁদর! গুলতি দিয়ে বাঁদর মারা হবে? এটা কে শেখালো তোমায়?

মা।

মা! তোমায় বলেছেন একথা?

নীলকান্ত হঠাৎ জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, তা বলবেন না তো কী? কষ্ট করে বড়ি দেওয়া হবে, আচার বানানো হবে, আর বাঁদর পাজীরা খেয়ে নেবে? আবদার না কি?

ওঃ! তাই জন্যে তাদের গুলতি দিয়ে মারতে হবে? বাঃ! তা ওরা জীব নয়? ওদের মারায় পাপ নেই?

নীলকান্তর গলা আরো সহজ হয়ে এলো, মরবে না হাতী! বাঁদর মারা এতো সোজা যেন।

বেটক্করে লেগে গেলে মরতেও পারে।

তা মরুক গে। ওরা তো পাজী।

চন্দ্রকান্ত ছেলের মুখের দিকে তাকান। মায়ের রূপের উত্তরাধিকারী। আবার বাড়ির মত লম্বা ছাঁদের গড়ন পেয়েছে, হঠাৎ দেখলে ওই ষোলো সতেরো বছরের ছেলেটাকে যুবক বলে ভুল হয়। কিন্তু মুখের রেখায় কোথায় সেই পরিণতির ছাপ? বালকোচিত কথা, বালকোচিত মুখ।

আস্তে বললেন, পাজী বলে মারতে হবে? আমরা মানুষরাও তো পাজী।

আহা! নীলকান্ত এটা বাবার তামাসা ভেবে বলে, আমরা কেন পাজী হতে যাব?

কেন হতে যাব? তা জানি না, তাইতো দেখা যায়। মানুষের মধ্যে পাজী দেখতে পাওনা তুমি?

নীলকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাপের কাছে সরে এসে আস্তে বলে, খুব দেখছি। ঠিক বলেছ বাবা, নতুন কাকা না দারুণ পাজী। নতুন কাকিমাকে এমন মারে।

কী বললে, অ্যাঁ, মারে? শশী স্ত্রীকে মারে?

চন্দ্রকান্তর পক্ষে এই অবাক হওয়াটা হয়তো অদ্ভুত, হয়তো বা ন্যাকামি বলেই মনে হতে পারে। কারণ শশীকান্ত সম্পর্কে ওই মহৎ সংবাদটি, কেবলমাত্র যে বাড়ির সকলেরই জানা তা নয়, পাড়ার সকলেরও জানা। অথচ চন্দ্রকান্ত অবাক হলেন। তার কাছে সত্যিই খবরটি অজ্ঞাত, তাই ধারণারও অগোচর।

এই অগোচরের কারণ হচ্ছে, এ ধরনের কথা চন্দ্রকান্তর কানে তুলতে সাহস হয় না কারো। অজানা একরকম ভীতি আছে সকলের, চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে। এমনিতে মানুষটা শান্ত ধীর ভদ্র মমতাশীল হৃদয়বান। কিন্তু সত্যকার কোনো অন্যায় দেখলে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন।

সংসারের মাথার উপর চন্দ্রকান্ত আছেন মাথা রক্ষার ছাতার মত। বর্ষণের ভরসা নিয়ে জলভরা মেঘের মত। আবার বুঝি সর্বদা উদ্যত বজ্রের মত।

কে জানে, এ খবর কানে গেলে শশীকান্তর উপর কী বজ্র ভেঙ্গে পড়ে! আবো ভয় এই, বৌ ঠ্যাঙ্গানোর খবরের সূত্রে আরো কিছু যদি জানাজানি হয়ে পড়ে। এই সব ভয়েই বাড়ির লোক তো বটেই, পাড়ার লোকরা পর্যন্ত খবরটা চন্দ্রকান্তর কাছে চেপে যায়। এমন কি বড়দা মেজদা পর্যন্ত, যাঁরা নাকি একান্ন ছেড়ে ভিন্ন অন্ন হয়ে অবধি খাঁটি জ্ঞাতির মতই ব্যবহাব করে আসছেন।

কিন্তু বড়দা আর শশীর নামে লাগাতে আসবেন কোন মুখে? শশীর বৌ অশ্রুমতী তাঁর শালীঝি হলেও, সবটাই চেপে যেতে হয়। শশীর বিবাহকালীন পরিস্থিতিটা চন্দ্রকান্ত যদি বা ভুলে গিয়ে থাকেন, বড়দা শ্রীকান্ত নিজে ভুলতে পারেন নি। তাঁর পৃষ্ঠবল না পেলে সাত-সকালে বিয়ে হতে শশীর?

তাছাড়া অন্যদের কাছে ব্যাপারটা তো সত্যই ভয়ানক কিছু নয়! পরিবারকে ধরে ঠ্যাঙ্গানো, অথবা দুলে বাগদী পাড়ায় রাতচরা এ আর এমন কি নতুন কথা? পাড়া হাটকালে এমন কত বেরোবে! শুধু ছেলে ছোকরা কেন, বুড়ো হাবড়াদের মধ্যেও এ দোষ বিদ্যমান। শুধু চন্দ্রকান্ত এসব টের পান না। কেউ টের পাওয়াতে আসেও যায় না।

সবাই জানে—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত মানুষ, ছাপার অক্ষরে বই বেরোয় তাঁর। তিনি কখনো ছোট কথা কইতে জানেন না। জ্ঞাতিদের সঙ্গে ভাগ ভিন্নর সময় কী পরিমাণ উদারতা দেখিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত ভাগের ব্যাপারে কত স্বার্থত্যাগ করছেন এবং সেই ভাগের সময় সংসারে যে কটি অখাদ্য মাল ছিল সব কটিকে নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন, এসব তো কারো অবিদিত নেই। সম্পর্ক তো সকলেরই সমান। চন্দ্রকান্ত সেকথা মুখে আনেন নি। যেসব মানুষকে অন্য দশজনের মাপে মাপা যায় না, অন্য দশজনের ছাঁচে ফেলা যায় না, তার সম্পর্কে লোকের অস্বস্তি থাকে। নির্ভয় হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

অপর দিকে আবার সেজগিন্নীর ভয়। সর্বদা গোবর জলের ঘটি নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি হবে, গলার জোরে তিনি হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করে মানুষকে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন, গালির জোরে লোককে অবশ করে দিতে পারেন। তাঁর ছেলের কথা নিয়ে কে কথা কইতে যাবে? ছেলেটিও তো কম গোঁয়ার নয়? চন্দ্রকান্তকেই যা ভয় করে। আর কাউকে কেয়ার করে?

কাজেই সকলেই মুখে তালা চাবি দিয়ে থাকেন। আজ নীলকান্তর আচমকা অসতর্কতায় চন্দ্রকান্ত চকিত, চমকিত।

শশী স্ত্রীকে মারে? তুমি জেনে বলছ? ঠিক জানো?

নীলকান্ত এরকম প্রশ্নে ভয় পেল, কিন্তু আর তো এখন পিছনো যায় না। ডুবেছি, না ডুবতে আছি! বাপের প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়, জানিই তো।

আর কেউ জানে?

নীলকান্তর কথার ভঙ্গীও মায়ের মত। নীলকান্ত হাত দুটো উল্টে বলে, বিশ্বসুদ্ধ লোকই জানে।

বাড়ির লোকেরা? তোমার মা?

খুব জানেন। নীলকান্ত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, মা আবার জানে না? মা তো নতুন খুড়িকে কত বলে, 'কেন কথা শুনিস না? মার খেয়ে মরিস।' কিছু লাভ হয় না। রোজ মারে। আজও তো মেরেছে তখন।

কখন?

এই যে তখন। নতুন কাকা না—মিছিমিছি করে—চণ্ডীতলায় যাচ্ছি বলে এই ওপরের ওই পচা ঘরটার মধ্যে কপাট বন্ধ করে ঘুম মারছিল। নতুন খুড়ি অতো জানে না, ডাকতে গেছে, ব্যাস। মেরে একেবারে হাড়গুঁড়ো।

চন্দ্রকান্ত ছেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন, সত্য বলছে, না কাকার প্রতি কোন আক্রোশের বশে! তা মনে হল না, মুখে এক প্রকার নির্বোধ খাঁটিত্বের ছাপ—তার সঙ্গে বেদনারও। ওই বৌটি দৈবাৎই তাঁর চোখ পড়ে, সাবেকী বাড়ির বিচিত্র নক্সার নানান ফাঁক ফোঁকরের মধ্যে কোনখানে যে ওই মেয়েটা আপন অস্তিত্ব গোপন করে বসে থাকে!

গম্ভীর প্রশ্ন করেন চন্দ্রকান্ত, কোথায় শশী? তোমার নতুন কাকা? ডাকো তো একবার।

সে এখন আছে নাকি?

নীলকান্ত স্বভাবসিদ্ধ বালকের ভঙ্গীতে হঠাৎ হিহি করে হেসে ওঠে। নতুন কাকা এখন আছে নাকি? তোমাকে আসতে দেখেই বাগানের দরজা খুলে—হি হি—তোমায় বাঘের মতন ভয় করে। সেজ ঠাকুমা তো বলেন, ছোড়দার ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাস যে, ছোড়দা—বাঘ না ভালুক? তবুও সাহস নেই।

হি হি হি। একদম সটকান মেরেছে—

নীলকান্ত নিজেও সর্বদা বাবাকে এড়িয়ে চলবার তালে থাকে, তবে বাবা কথা কইলে প্রাণটা খুলে বসে। তাই আবারও হি হি করে ওঠে। হয়েছেও তেমনি মজা। মা ঘুঁটে ঠুকছিল, সেই পচা গোবরে পা হড়কে, হি হি। মজা না সাজা।

থামো। চুপ করো।

চন্দ্রকান্ত পায়চারি করতে থাকেন। আর কথা বলেন না। নীলকান্ত নামক একটা প্রাণী যে সেখানে রয়েছে, তাও বোধ হয় ভুলে যান।

নীলকান্তও এই বিস্মৃতির সুযোগ নিয়ে বাঁচে। নিজের মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ে।

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে ভাবেন, আমি তাহলে একটা অবোধ অন্ধ? বাড়িতে এমন একটা অনাচার ঘটে চলেছে—আমি জানি না। অথচ সব্বাই জানে।

তার মানে, সব্বাই আমাকে চেপে যায়। আমার অন্ধত্বের সুযোগ নেয়।

সুনয়নীও আশ্চর্য!

অথচ এমনিতে সুনয়নী কারও নিন্দে করবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। আমার সঙ্গে যেটুকু গল্প সে করতে আসে, তার সবই তো প্রায় অপরের সমালোচনা, আর অপরের ব্যাখ্যানা।

অনেকক্ষণ বলার পর যখন টের পায় আমার কানের মধ্যে কিছুই ঢোকেনি, তখন—খুব মানুষের সঙ্গে কথা কইতে এসেছিলাম—বলে রাগ করে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

যৌবনকালের জোড়া পালঙ্কখানিই সুনয়নীর ভাগে। চন্দ্রকান্ত রাত্রে লেখাপড়ার সুবিধা হবে বলে একটা তক্তোপোষে নিজের ব্যবস্থা কায়েম করে নিয়েছেন। আড়াল দেওয়া সেজ-এর বাতি জ্বালেন যাতে সুনয়নীর চোখে আলো না লাগে।

এক আধবার মমতা আসে না কি চন্দ্রকান্তর! মনে হয় নাকি, রাগটা ভাঙাবার চেষ্টা করা উচিত। রাগ মানেই তো দুঃখ। কিন্তু সাহস হয় না. ভালবাসা শব্দটার একটাই মানে জানেন সুনয়নী। জানেন, রাগ ভাঙাতে কাছে আসার একটাই অর্থ। তাই হয়তো ফট করে বলে বসেন, বুড়ো বয়েসে যে আবার ভারী শখ দেখছি পণ্ডিতের।

রেগে নয়, বিজয়িনীর ভঙ্গীতে নিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে।

কী করতে পারেন তখন চন্দ্রকান্ত, ছিটকে সরে আসা ছাড়া?

কিন্তু সেকথা থাক।—এই কথাটা ভেবে যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছেন চন্দ্রকান্ত, বাড়ির মধ্যে একটা নিরুপায় মেয়ে এইভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছে, অথচ বাড়ির এতোজন মহিলা তার প্রতিকার তো দূরের কথা. টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছে না। এটা কী করে হয়? এটা কী করে হতে পারে?

বেশীক্ষণ চিন্তার সময় ছিল না। আহারের ডাক পড়ল।

চন্দ্রকান্ত থমথমে মুখে সামান্য কিছু খেয়েই প্রশ্ন করলেন, পিসিমা, শশী তার স্ত্রীকে মারে এটা সত্যি?

পিসি চমকান।

তবে সামলেও নেন, খুব অবলীলায় বলে ওঠেন, এই অখাদ্য কথাটা আবার তোর কানে তুলতে গেল কে?

পিসিমা!

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর গলায় বলেন, কে কানে তুলল, সেটা আসল কথা নয়। আসলটা হচ্ছে, বাড়িতে একটা মেয়ের উপর অত্যাচার হয়ে চলেছে অথচ তোমরা কেউ কিছু বলছ না?

পিসি ভবতারিণী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, গোঁয়ার গোবিন্দ বেটাছেলে যদি নিজের পরিবারকে ধরে ঠেঙায়, কার কি হাত আছে বাবা?

হাত নেই বলে চুপ করে বসে থাকবে?

তা কী করবো? নিজের মা যার পিষ্ঠবল তাকে শাসন করতে যাবার ধাষ্টামো কার হবে?

ভবতারিণী কথা ধরলে একেবারে শেষ না করে ছাড়েন না। ছেদ ভেদ থাকে না, কমা সেমিকোলন থাকে না, কাজেই ওঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়।

পিসির থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চন্দ্রকান্ত বলেন, মা পৃষ্ঠবল?

তবে না তো কী? মা আস্কারা না দিলে এতো বাড় বাড়তো? সেজ গিন্নিটির তো বুদ্ধি-সুদ্ধি মানুষের মতন নয়, বৌয়ের ওপর হিংসে আকোচ, তাই ছেলেকে টুইয়ে দেয় অত্যেচার করতে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিসি বলে, সংসারে যাই আমি এক দজ্জাল আচি আর তুমি হেন ছেলে আছো, তাই সংসারের আস্ত চেহারাটি আচে। নচেৎ উনি গিন্নী একখানি ঘর তিনখানি করতেন।

এসব কথায় বিরক্ত হন চন্দ্রকান্ত। অসহিষ্ণুভাবে বলেন, ওসব কথা থাক, শশীকে যেভাবেই হোক শাসন করা দরকার। এই সব মারধোর বন্ধ করতে হবে।

ভবতারিণী একটু হেসে ওঠেন। বলেন, পারো তো বন্ধ কর। তুমি বিজ্ঞবিচক্ষণ, তোমায় আর পিসি কি জ্ঞান দেবে! তবে ঝুনো মাথার দাম আচে, তাই বলচি—স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মদ্যে মাতা গলাতে গেলে ধাষ্টামো বৈ আর কিছু হয় না। হয়তো লোকসমাজে মুক রাখতে ওই বৌই বলে বসবে, কই মারেনি তো। মারে না তো। ত্যাখন?

চন্দ্রকান্ত একটু চুপ করে যান।

ঝুনো মাথাকে অস্বীকার করতে পারেন না।

লোকসমাজে মুখ রাখা। অমোঘ তার শাসন। 'লোকসমাজ' এইটাই বোধকরি সমাজবদ্ধ মানুষের সব থেকে বড় প্রভু।

কিন্তু এককথায়ই থেমে যাবেন?

অন্যমনস্কভাবে বলেন, তাহলে তুমি বলছো শশীকে শাসন করার দরকার নেই?

ভবতারিণী ব্যস্তভাবে বলেন, আমি কিছুই বলিনি বাবা। তুমি যদি পারো, কর শাসন। তবে ফল বিপরীত হতে পারে। তোমার শাসন খেয়ে হয়তো মুখপোড়া ছেলে আকোচের বশে—তুমি য্যাতোটি শাসন করবে, তার চতুরগুণ তাড়নটি করবে ঘরে গে। সেখেনে তো আর তুমি শাসন চালাতে যেতে পারবেনি বাবা। শশী মুখপোড়া কাজ ভাল করচে তা বলচিনে, খুবই মন্দ করচে, তবে নতুন কিছুই করেনি। পরিবার ঠ্যাঙানো কি জগৎ সংসারে নতুন ছিষ্টি চন্দোর? ঘরে ঘরেই ওই আপদ। তবে সবাই সব ঠ্যাঙানী টের পায় না। সেই যে কতায় আচে না—'মনে কাঁদলাম কেউ জানলনি, বনে কাঁদলাম কেউ শুনলনি, জনে জনে ধরে কাঁদলাম, ত্যাখন লোকে বলল, আহা দুঃখী বটে।'

বাপের সঙ্গে একটু তফাতে নীলকান্ত খেতে বসেছে, সে হঠাৎ হেসে উঠে বলে, ঠাকুমা যে কত ছড়া জানে! মার খাওয়ারও ছড়া জানে।

ছেলেটাকে কিছুতেই গুরুজন সম্পর্কে সম্যক সম্মানসূচক বাক্য শেখানো গেল না। বলে বলে পারা যায় না।

তবু এখনো চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে তাকাল।

সেটা দেখতে পায় না এই যা।

ভবতারিণী নিজের হেঁসেলের দিকের কিছু অবদান পরিবেশন করতে করতে বলেন, তা থাকবে নি ক্যানো? মার যে একরকমের যাদু! কেউ হাতে মারে, কেউ ভাতে মারে, কেউ বচনে মারে, কেউ ব্যাভারে মারে, কেউ বুঝে মারে কেউ না বুঝে মারে,—মার খেতে খেতেই জীবন অতিবাহিত করা। ও তোমার মেয়েপুরুষ ভেদ নেই, গরীব বড়মানুষে রক্ত ভেদ নেই। পেত্যক্ষে অপেত্যক্ষে কে যে কত পড়ে পড়ে মার খেয়ে চলেচে, তার হিসেব আছে?

স্বভাবগত পদ্ধতিতে এক দমে তত্ত্ব কথার বান বইয়ে তবে ক্ষ্যামা দেন ভবতারিণী।

কিন্তু চন্দ্রকান্তও কেন হঠাৎ এমন থেমে যান? স্তব্ধ হয়ে যান? হাতের ভাতটা মাখতে মাখতে যে হাত থেমে গেছে তা যেন মনেই থাকে না। শুধু আরো একবার ঝুনো মাথাকে স্বীকার করেন।

ভবতারিণীর অক্ষর পরিচয় নেই, শ্বশুরবাড়ির কী একটু ধানপান বিষয়-সম্পত্তি আছে, তার পাওনা-কড়ি নিয়ে সই দিতে 'টিপসই' দেন। কিন্তু ভবতারিণীর জীবনদর্শন, ভবতারিণীর জীবনবোধ, মানব চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান কী পরিষ্কার! প্রকাশভঙ্গী কী জোরালো!

'পড়ে পড়ে মার খাওয়া' কথাটা সন্দেহ নেই শব্দ ভাণ্ডারের একটি সম্পদ। একটি ছত্রে একটি দুঃসহ জীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষে ধরা দেয়।

পড়ে মার খাওয়ার নজির চন্দ্রকান্তর জানা জগতেই কি নেই?

পাঁচ

বহুকাল পরে আজ আহারান্তে পানের খিলি হাতে নিয়ে দোতলায় উঠে এলেন সুনয়নী। দুপুরের অবকাশটা তো তার কাটে কেবল অপ্রয়োজনীয় কাজকে প্রয়োজনীয় করে তোলবার সাধনায়। অবশ্য নীচের তলায় স্বগতোক্তিটা শুনিয়ে এসেছেন, যাই দেখি, বিছানা বালিশগুলো কদিন রোদে পড়েনি—

চন্দ্রকান্ত বেশ খানিকক্ষণ অস্থির চিন্তায় সময় কাটিয়ে জোর করে মনঃস্থির করে নিজের খাতাপত্র নিয়ে বসেছিলেন তক্তপোষের উপর। জানলামুখো হয়ে। এই জানলাটা দিয়ে বিকেলের আলো আসে, অনেকক্ষণ থাকে আলোটা। সবে দোয়াতে কলম ডুবিয়েছেন, সুনয়নী এসে জানলার কোণের চওড়া বেদীটার উপরই চেপে বসলেন। আলোটা কিঞ্চিত ব্যাহত হলো।

চন্দ্রকান্ত কিছু বললেন না, শুধু কলমটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন। বোঝা যাচ্ছে, সুনয়নীর কিছু বক্তব্য আছে।

হাতের বাড়তি পানের খিলিটা হাতে ধরে সুনয়নী বলেন, জন্মজীবনে আর তোমায় পান খাওয়াটা ধরাতে পারলাম না। একলা খেয়ে সুখ আছে?

চন্দ্রকান্ত একটু হাসলেন।

ব্যঙ্গের, না ক্ষোভের, না কৌতুকের?

বললেন, সুখ নেই, সেটা বুঝতে এতোদিন লাগল?

চিরদিনই বুঝেছি, কতদিন তো খোসামোদও করেছি, ভুলে গেছ তাই বল। বুড়োমিনসের যে পান খেলে জিভ তেতো হয়ে যায়, এ কখনো শুনিনি।

চন্দ্রকান্ত এ কথার আর উত্তর দেন না। দেবার আছেই বা কী? প্রশ্ন তো নয়।

মরুক গে, নিজেই চিবোই।—বলে পানটা মুখে ফেলে আঁচলের খুঁট থেকে এক টিপ দোক্তা বার করে মুখে দিয়ে সোজা জানলার গরাদের ফাঁকে ছপাৎ করে খানিকটা পিক ফেলেন।

বিচলিত চন্দ্রকান্ত বলে না উঠে পারেন না, ওটা কী হল?

কী আবার হবে?

কোথায় পড়ছে না দেখে—

সুনয়নী ময়লা শাড়ীর কোণ দিয়ে ঠোঁটের ভিজে ভিজে কোণটা মুছে নিয়ে অবহেলার গলায় বলেন, কোথায় আবার পড়তে যাবে, গাছপালার ওপর পড়েছে। জানলার ধার পর্যন্ত তো গাছ।

তলা দিয়ে কেউ যেতেও পারে।

তোমার যত ছিষ্টিছাড়া চিন্তা। এখন আবার কে বাগানের ধারে আসতে যাবে?

আবার একবার ঠোঁটের কোণটা মুছে নিলেন।

সুনয়নী এমন ময়লা কাপড় পরে কেন? সুনয়নীর কাপড় পরার ভঙ্গী এমন আলুথালু অগোছালো কেন? যখন তখন মাথায় এতোখানি ঘোমটা টানে, অথচ কাঁধ পিঠ প্রায় উন্মুক্ত।

কিন্তু সুনয়নী এমন গুছিয়ে এসে বসল কেন? শুধুই কি সারাজীবনের চেষ্টায় স্বামীকে পান খাওয়ার অভ্যাস ধরাতে না পারার দুঃখ জানাতে?

প্রশ্নটা অস্বস্তিতে ফেলল চন্দ্রকান্তকে।

অথচ এই একটুমাত্র আগে নানা অস্বস্তি জোর করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে খাতাপত্র নিয়ে বসেছিলেন। ...ভেবে দেখেছেন—এই বস্তুটার মধ্যেই শান্তি, এর মধ্যে আশ্রয়।

কিন্তু সুনয়নী সামনে বসে রয়েছেন একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত।

চন্দ্রকান্ত অতএব ওই চিহ্নের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকান।

সুনয়নী আরো একটু এদিকওদিক কথা বলে অবশেষে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেন। ছোট খুড়ির মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে নাকি একটি পরমা-সুন্দরী কন্যা আছে, শুনে পর্যন্ত সুনয়নীর মনপ্রাণ উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভাল জিনিস তো বাজারে পড়ে থাকতে পায় না, তাড়াতাড়ি ঘরে তুলতে না পারলে নির্ঘাৎ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই চন্দ্রকান্তকে বলতে আসা। পিসিমা আর ছোটখুড়ি মারফৎ তাহলে অবিলম্বে কথাটা পাড়ানো হোক। আশ্বাস পেলে কন্যেপক্ষ দস্তুরমাফিক প্রস্তাব করতে আসবে।

ধৈর্য ধরে কথাটা শুনলেও, প্রায় হাঁ-করেই তাকিয়ে দেখছিলেন চন্দ্রকান্ত সুনয়নীর আহ্লাদে উদ্বেল পানঠাশা শীর্ণ হয়ে যাওয়া মুখটা। পান চিবোনোর জন্যে মুখের পেশীগুলো ওঠানামা করায় রোগাত্বটা আরো ধরা পড়ছে।...

কথা শেষ হবার পর চন্দ্রকান্ত অবাক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কার জন্যে?

কী কার জন্যে?

পাত্রী?

সুনয়নী তাঁর পেটেন্ট কথাটি ছাড়েন, ন্যাকা। কার জন্যে হামলে মরছি আমি? ননীগয়লানীর ছেলের জন্যে?

ওঃ। তাহলে তোমার ছেলের জন্যে?

এতোক্ষণে বুঝলে? পণ্ডিতের মাথা তো, ছোট কথা সহজে ঢুকতে চায় না।

ঠিকই বলেছ, চন্দ্রকান্ত আবার কলমটা কালিতে ডুবিয়ে বলেন, কথাটা আমার মাথায় সহজে ঢোকবার নয়। তুমি যে এখন নীলকান্তর বিয়ের কথা ভাবতে বসছ, এটা বোঝা শক্ত বৈ কি।

সুনয়নী মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আহা! বলতে মাত্তরই হয়ে যাচ্ছে বিয়ে? বলতে কইতেই দিন যাবে। তবে মেয়ে নেহাৎ ছোট নয়, বারোর কাছে বয়েস, ওরা কি আর বেশীদিন রাখবে? পাকা দেখাটা করে রাখলে বেঁধে রাখা হল।

তোমার মনে হয় নীলকান্তর বিয়ের উপযুক্ত বয়েস হয়েছে?

সুনয়নী একটু অপরূপ হাসি হেসে গলা নামিয়ে বলেন, নিজের কোন বয়েসে বিয়ে হয়েছিল মশাই?...তখনই তো বলা হয়েছিল, 'আলো বাড়াই, তোমায় একটু দেখি।'

চন্দ্রকান্ত তাকিয়ে দেখলেন।

চন্দ্রকান্তর কি উচিত ছিল না এই কৌতুকে কৌতুক-হাসি যোগ করা? এই স্মৃতি রোমন্থনের অংশীদার হওয়া? কিন্তু কই তা হলেন? বরং মুখটা অধিক গম্ভীর হয়ে গেল চন্দ্রকান্তের, কাগজে কলমের রেখা টানতে টানতে বললেন, তোমার স্মৃতিশক্তিটা দেখছি খুব প্রখর।

সুনয়নী ভুরু কুঁচকে তাকালেন, কি শক্তি?

স্মৃতিশক্তি। পুরানো কথা তো খুব মনে থাকে।

সুনয়নী অবশ্যই এই গাম্ভীর্য আশা করেন নি, বেজার গলায় বললেন, তোমার মতন নতুন নতুন কথা তো মনে ঢুকছে না, পুরনো নিয়েই আছি।

হুঁ।...চন্দ্রকান্ত ক্ষুব্ধ হাসি হাসেন, বই টই তো পড়তেও জানতে একসময়। বঙ্কিমবাবুর কী একটা পড়েছিলে মনে হচ্ছে। সে সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছ কেন?

আহা। সে কোন ছোটবেলার কথা। এখন তোমার সংসারে পটের বিবি সেজে নাটক নভেল মুখে দিয়ে বসে থাকলেই চলবে আমার!

তা বটে!

চন্দ্রকান্ত একটু রূঢ় হাসি হাসেন, আমার সংসারের ঘুঁটে দেওয়াব দায়টা পর্যন্ত যখন তোমার, তখন আর ওই সব বইটই পড়ার মত বাজে কাজ করবার সময় কোথা! যাক! তোমার কথা হয়েছে?

সুনয়নী কণ্ঠস্বরে জ্বলে ওঠেন।

চন্দ্রকান্ত ওঁকে নির্বোধ ভাবলেও, তেমন নির্বোধ তো আর নয় সত্যি। এ অপমান বোঝবার ক্ষমতা আছে।

জ্বলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ঝকমারি হয়েছে আমার আহ্লাদ করে তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে আসা। বেশ...নীলের বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করব। কোন জম্মে সেই দুটো মেয়েকে গোত্তর পাল্টে বাড়ি ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে। আর কোন কাজ হয়েছে বাড়িতে? তুমি না হয় নিজের মহিমায় ডুবে বসে আছো, সাধ আহ্লাদ নেই, আমি তুচ্ছ মেয়েমানুষ, আমার সে সব আছে।

চন্দ্রকান্তর মুখে এসে যাচ্ছিল, শশীকান্তের বিয়ের আগে সেজখুড়ি ঠিক এই ভাষাই প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সামলে গেলেন। বিধবা সেজোখুড়ির সঙ্গে তুলনা করলে হয়তো বা দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে বসবেন সুনয়নী।

সুনয়নী চলে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে, রাতদিনের ঝি টেঁপির মা দরজার বাইরে থেকে বলে উঠল, ছোট বৌদিদি, পিসিমা বলে পাঠালো ও পাড়া থেকে গৌরবাবুর পরিবার দেকা করতে এয়েছে—

চমৎকার।

সুনয়নী আবার বসে পড়ে বলেন, আমি পারব না সেই মেম সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে।

চন্দ্রকান্ত চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন।

বিব্রতভাবে বলেন, গৌর—আমাদের গৌরমোহনের স্ত্রী। তিনি আবার মেমসায়েব হলেন কবে?

যতকাল কলকাতাবাসিনী হয়েছেন। সুনয়নী তেতো গলায় বলেন, আমি বাবা গেঁয়ো ভূত, ওসব সেমিজ-বডিস পরা কলকত্তাই মেয়েছেলের সঙ্গে কী কথা কইব? নেমে গিয়ে বল গে—ছোট বৌ পেট ব্যথায় ছটফট করছে। শুয়ে আছে।

বাঃ।

চন্দ্রকান্ত গাঢ় গভীর গলায় বলেন, ইচ্ছে করে নিজেকে ছোট কোর না ছোটবৌ। পিসি খুড়িমাবা সবাই গেঁয়ো, দ্যাখো গিয়ে তাঁরা কী রকম গল্প জুড়ে দিয়েছেন।

ওঁদের কথা বাদ দাও।

সুনয়নী জানলার রেলিং চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকেন।

চন্দ্রকান্ত হতাশ হয়ে বলেন, আমি গিয়ে মিছে কথা বলতে পারব না।

ওঃ! তাওতো বটে। মহাপুরুষ মানুষ! বেশ সত্যি কথাটাই বলগে গিয়ে, আমার মুখে চুনকালি মাখাতে।

চন্দ্রকান্ত অস্থির হন।

গৌরের স্ত্রী কী ভাবছে সুনয়নীর নামতে দেরী দেখে! কী ভাববে সুনয়নীর না আসায়! সবে এসে প্রায় অনুনয়ের গলায় বলেন, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে? তুমি দেখা না করলে কী মনে করবে?

তা কী করা যাবে?

সুনয়নী শক্ত মুখে বলেন, আমায় অসভ্য ছোটলোক ভাববে, আর কী হবে?...মেম সাহেবের ঢং তো জানি, হাত ধরে কথা বলবেই বলবে। এই পড়ন্ত বেলায় আবার ডুব দিয়ে মরতে হবে আমায়।

চন্দ্রকান্ত বসে পড়েন।

গৌরের স্ত্রী তোমার হাত ধরলে ডুব দিতে হবে?

না দিলে পিসিমাদের দিকে কিছু করতে পারব?

চন্দ্রকান্ত রাগটা চেপে ধরে বলেন, পিসিমা বলেছেন একথা?

সুনয়নী মুখ ফিরিয়ে বলেন, মুখে কি আর বলতে এসেছেন? ভাবে বুঝতে হয়।...ছোঁয়া গেলে নিজে তো ডুব দেন।

চন্দ্রকান্ত ভুলে যান নিচের তলায় কেউ দর্শনার্থী। কেমন একটা স্খলিত বিষণ্ণ স্বরে বলেন, এর অর্থ কী বলতে পারো? গৌরমোহন কি পতিত?

তা বেম্ম আর পতিতে তফাৎ কি?

বেম্ম! গৌরমোহন ব্রাম্ম? এমন অদ্ভুত কথা কে বলেছে তোমায়?

না বললে আর বোঝা যায় না?

সুনয়নী মুখটা বিকৃত করে বলেন, কলকাতায় বাস করলে জাত ধম্ম কিছু থাকে নাকি? হেঁশেলে রাঁধুনী বামুন, ঠিকে ঝিয়ের হাতে জল বাটনা! এখানে এসেও গায়ে জামা সেমিজ! ভগবান জানে সেখানে জুতো মোজাও পরে কিনা—বেম্ম খেষ্টান আর কাকে বলে!

চন্দ্রকান্ত অস্থির পদক্ষেপে ঘরে ঘুরে বেড়ান। সুনয়নীর দিকে তাকিয়ে দেখতেও ইচ্ছে হয় না আর। এই সময় আবার টেঁপির মা সিঁড়ি থেকে ডাক দেয়, কইগো ছোটবৌদি, নামলে নি? পিসিমা ব্যস্ত হতেচে।

অতএব সুনয়নীকে উঠতেই হয়।

পরিণামটাও তো চিন্তা করতে হবে।

সহজ মানুষ এই মাত্র হয়তো দোতলায় উঠল অকস্মাৎ। এমন পেটব্যথা করল যে নীচে নামতে পারছে না এরকম ঘটনার সংবাদে আবার সদলবলে সবাই ছুটে দেখতে না আসে!—হয়তো পিসিমা'দের সঙ্গে তিনিও এসে হাজির হবেন। ঘরের দৃষ্টি ছুঁয়ে লেপে এক করবেন। দরকার নেই বসে থেকে।

সুনয়নীকে অগ্রসর হতে দেখে চন্দ্রকান্ত আস্তে বলেন, একখানা ফর্সা কাপড় পরে গেলে হত না?

সুনয়নীর চোখে আবার ফস করে আগুন জ্বলে ওঠে, কেন? নইলে তোমার বন্ধুর পরিবার তোমার পরিবারকে বাড়ির ঝি ভাববে? ভাবুক। আমার অমন লোক দেখানো ঠাট্ আসে না। গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝির কাপড়ে তেল হলুদের দাগ থাকে না? সর্বদা ধোপ-দুরস্ত হয়ে বসে থাকে?

তরতরিয়ে নেমে যান।

চন্দ্রকান্ত শুনতে পান, সিঁড়িতে টেঁপির মার উদ্দেশ্যে একটি কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হচ্ছে—আর বলিসনে ভাই, একেবারে মরণের ঘুম ঘুমিয়ে মরেছিলাম! তোর ছোড়দাবাবু ডেকে দিল তাই—

চন্দ্রকান্ত কি কালি শুকিয়ে যাওয়া কলমটা ফের দোয়াতে ডুবিয়ে তাঁর ভাবী উপন্যাসেব ছক আঁকতে চেষ্টা করতে বসবেন?

বেলা পড়ে গেছে।

যে জানলাটা দিয়ে শেষবেলা পর্যন্ত আলো আসে, একটু আগে যার নীচে থেকে উঠে গেছেন, সেই জানলাটার বাইরে চোখ মেলে বসে থাকেন চন্দ্রকান্ত।

এখানে আকাশে অপরূপ বর্ণচ্ছটা। শুধু এই বিচিত্র বর্ণাভার পিছনে আলোর আশ্বাস নেই। অন্ধকারের ইসারা।

ক্রমশঃই ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে আসছে! ও-পিঠের আবছা আলো যেন সমস্ত দিগন্তটাকে একটা বিষণ্ণতায় মুড়ে ফেলে নিরুপায় চোখে বিদায় নিচ্ছে।...হঠাৎ চোখে পড়ল, জানলায় লাগানো তারের জালতির গায়ে দড়ির টুকরোর মত খানিকটা লম্বা হয়ে ঝুলছে সুনয়নীর ফেলা পানের পিক।

ছয়

ভাতে বসতে তো কিছু দেরী রয়েছে, একটু চা চলবে চন্দর?

বন্ধুর প্রশ্নে চকিত হন চন্দ্রকান্ত, চা?

কী হে, জিনিসটার নামই ভুলে গেছ নাকি?

গৌরমোহনের কণ্ঠ কুণ্ঠিত, চোখ হাস্যোজ্জ্বল। আমার তো ভাই কলকাতায় থাকতে থাকতে ওই বদভ্যাসটি পাকা হয়ে গেছে। শুধু আমরাই বা বলি কেন, গিন্নীটিও ওই পাপে পাপী। ছেলেমেয়েগুলোকে অভ্যাস করাতে বারণ করি, তাও মাতৃস্নেহের বশে একটু আধটু পেসাদ চলে। যাই হোক, সরঞ্জাম সব আনা হয়েছে, খাবে তো বল, গিন্নীকে অর্ডার দিয়ে আসি।

চন্দ্রকান্ত একটু হেসে বলেন, না ভাই। অভ্যাস নেই, হয়তো রাতে ঘুম হবে না।

না হলে জেগে জেগে কবিতা রচনা করবে। গৌরমোহন হাসেন, তোমার খাতিরে আমারও একটু প্রাপ্তি ঘটতো।...যাক। তোমার মনে আছে চন্দর, আমাদের সেই প্রথম চা খাওয়ার ইতিহাস? দ্বিজেন আমাদের ধরে নিয়ে গেল, মেছোবাজারে না মুক্তারামবাবুর গলিতে, ঠিক মনে পড়ছে না—ওর এক মাসতুতো দাদার বাড়ি।...বলল তোদের আজ আমার বৌদির হাতের চা খাওয়াবো। আমাদের সে কী ভয়, যেন নিষিদ্ধ কোন নেশার পাত্র হাতে নিয়ে বসেছি। বুকটুক বেশ ধড়ফড় করেছিল। তুমি ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলে, মানুষ যে কী করে প্রথম মদ খায়? চায়েই তো হৃৎকম্প হচ্ছিল। অথচ কলেজের ছাত্ররা তখন 'দোহাতা মদ' খেতো।

চন্দ্রকান্ত বলেন, তুমি বললে বলেই মনে পড়ল।

তারপর তো বেশ চালানো গেল কিছুদিন, একটা চায়ের দোকানও আবিষ্কার হল।...গৌরমোহন হেসে ফেলে বলেন, আমি তো ভাই তদবধিই চা-খোর। তুমি দেশে এসে পুরনো ধাঁচেই রয়ে গেলে। অবিশ্যি ভালই করেছ, নির্জনে বসে বসে জ্ঞান-চর্চা করে চলেছ।

চন্দ্রকান্ত অন্যমনস্কভাবে বলেন, জ্ঞানচর্চা করছি কি অজ্ঞানচর্চা করছি জানি না ভাই। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি তোমার মত কলকাতায় গিয়ে বসবাস করবার সুযোগ পেতাম, হয়তো জীবনেব চেহারা অন্যরকম হতো।

সে তো হতোই—

গৌরমোহন বলেন, আমার তো হল পাকেচক্রে—মা গেলেন, জেঠিমা গেলেন, বৌকে একা রেখে যাই কী করে! অথচ এতো দূর থেকে রোজ অফিস যাওয়া-আসাও পোষাল না—মাঝেমাঝে এখানে আকাশ বাতাসের জন্য মন কেমন করে, প্রাণ হাঁপায়, তবে ওখানের সুখ-সুবিধে আরাম আয়েস ভেবে আর।—আমি বলি, রিটায়ার করার পর দেশের বাড়িতে এসে থাকব। বৌ বলে অসম্ভব।

চন্দ্রকান্ত বলেন, না আসাই বোধ হয় ভাল গৌরমোহন। এখানে আকাশ-বাতাস খোলা, কিন্তু মানুষগুলো বদ্ধ জলার মত। জীবনের কোন পরিবর্তন নেই। কূপমণ্ডুকের মত যে যেমন ছিল, সে সেখানেই বসে আছে। পঞ্চাশ বছরেও একতিল নড়চড় নেই। কলকাতার জীবনে প্রবাহ আছে, তরঙ্গ আছে, স্রোত আছে, ভাঙ্গন আছে।

চন্দ্রকান্তর এই গভীর আর বিষণ্ণ কণ্ঠের প্রভাবে আবহাওযাটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

যদিও বাতাস আসছে এলোমেলো, দুপুরের গরম হলেও বৈশাখের বাতাসে মাদকতা আছে। জানলা দিয়ে একটা তেঁতুল গাছ চোখে পড়ছে, তার পাতাদের অবিরাম ঝিলিমিলি যেন হঠাৎ সমুদ্রের অবিরাম ঢেউয়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

বিশ্বপ্রকৃতির এই অকৃপণ সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে বাস করেও মনুষ্য-প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের এমন ঘাটতি কেন এখানে!

চন্দর, তোমার লেখাগুলি আনলে না?

পাগল।

কেন ভাই, আমি তো দেখি খুবই তারিফের যোগ্য। বিশেষ করে দেশাত্মবোধকগুলি—

নাঃ ভাই, ওসব ছেলেমানুষী লাগে এখন। ভাবছি—

কী ভাবছেন, বন্ধুর কাছে আস্তে আস্তে ব্যক্ত করেন চন্দ্রকান্ত। সমাজের চেহারা কেমন হলে ভাল হয়, তাই নিয়ে কল্পনা। সেই কল্পনার গাছে ফসল ফলাবার সাধ।

গৌরমোহন উৎসাহ দেন। বলেন, জিনিসটা একটা কিছু নতুন হবে। অতীতকে নিয়েই সবাই লেখে, কেউবা বর্তমানকে নিয়ে, কিন্তু ভবিষ্যৎকালকে নিয়ে! না, তোমার চিন্তাটা বেশ মৌলিক। মনে হচ্ছে—একদা এক গুপ্ত-কবি মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিয়ে যে ভবিষ্যৎ ছবি এঁকে টিটকিরি দিয়েছিলেন, আর এক গুপ্ত-কবি তার উচিত জবাব দিয়ে যাবে। কিন্তু ভাই—একবার কলকাতা গিয়ে কিছুদিন থাকা দরকার তোমার। সমাজ যে এখন বর্তমানে ঠিক কোথায় পৌঁছেছে, সে তুমি এখানে বসে বুঝতে পারবে না। তুলনা করলে—বহু বিষয়ে বাংলার এই গ্রামগুলো কলকাতার থেকে একশো বছর পিছিয়ে আছে। তবে? দুটো মিলিয়ে না দেখলে?

চন্দ্রকান্ত আস্তে বললেন, ভাবছি তাই যাব। তুমি আমার জন্যে একটা ছোট্ট বাসা দেখো।

কেন, আমার বাসায় থাকা চলবে না?

চন্দ্রকান্ত হাসেন, চলবে না কেন? তবে একা না থাকলে চোখ কান ঠিক সজাগ থাকে না।

গৌরমোহন ওই 'একা' শব্দটা ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না, একা মানে কি যৌথ পরিবার থেকে সরে গিয়ে একা সংসার পাতা! বলেন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

সর্বনাশ। নতুন করে আবার শব্দ তত্ত্ব পড়ো গৌরমোহন! 'একা' মানে কি সঙ্গে স্ত্রী?

বাঃ, তাহলে তোমার রান্নাটান্নার কী হবে? বন্ধুর বাড়ীতে যখন থাকছো না—

সেটা কোন চিন্তার বিষয়ই নয়। স্বপাকে সেরে নেওয়া যাবে।

গৌরমোহন মাথা নাড়েন, ওকথা বামুনের ছেলের মুখে সাজে চন্দর। বদ্যির ছেলের মুখে নয়।

তার মানে?

মানে এই, বদ্যির ছেলেদের অন্য অনেক ক্ষমতা থাকলেও রেঁধে খাবার ক্ষমতা নেই—এ আমার নিশ্চিত ধারণা। বদ্যির ছেলেরা এক গেলাস জল ঢেলে খেতেও পটুত্ব দেখাতে পারবে না।

অদ্ভুত কথা বলছ—

আরে বাবা, দেখে শুনে জেনেই বলছি। দেখলাম তো ঢের।

আচ্ছা দেখা যাক। বলেন চন্দ্রকান্ত। বলেন বটে—কিন্তু গৌরমোহনের নিশ্চিত ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো তর্ক করতেও পেরে ওঠেন না। খুব বেশী তো আস্থা খুঁজে পাচ্ছেন না নিজের মধ্যে। তবু ওই তুচ্ছ সমস্যাটাকে প্রাধান্যও দিলেন না। বললেন, সে দেখা যাবে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো চন্দর—

কী?

মনে হচ্ছে, তুমি যদি সে সময় মনস্থির করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে তোমার মনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেতে। চিন্তার বিস্তারের জায়গা পেতে। কু-সংস্কারমুক্ত একটা ধর্মেরই দরকার ছিল তোমার।

উঁহু—

চন্দ্রকান্ত বাধা দিলেন। ওটা ঠিক বললে না—ওঁরা যে 'কুসংস্কারমুক্ত' আমি অন্ততঃ বলতে পারব না। মন আমি স্থির করে ফেলেছিলাম গৌরমোহন, যখন উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এলাম কেন জানো? ওই কুসংস্কারে ঠেক খেয়েই।

কুসংস্কার! বল কী! কী দেখেছিলে বলতো?

দেখো গৌরমোহন, বলতে গেলে অনেক কথা। এতো দিন পরে আর কী বলব! তবে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা রীতিমত কুসংস্কারের মতই ওঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এ আমি প্রতিপদে লক্ষ্য করেছি ভাই। তার সঙ্গে শুচিবাই—

নাঃ। তুমি তো আমায় তাজ্জব করে দিচ্ছ চন্দর। আবার শুচিবাইও?

দেখো গৌরমোহন, শুধু দশবার পুকুরে ডুব দেওয়া অথবা, ছোঁওয়া-ছুঁৎই শুচিবাইয়ের একমাত্র লক্ষণ নয়। যে কোন ব্যাপারে অতিরিক্ত গোঁড়ামিকেই আমি শুচিবাই বলব!...আমি তখন ওই নবধর্মে আকৃষ্ট হয়ে যাঁর কাছে যাওয়া আসা করতাম, সেই যতীনবাবুর মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মের আদর্শ সম্বন্ধে যা গোঁড়ামি

দেখতাম, তা আমার কাছে 'শুচিবাই' বলেই মনে হতো।... অবশেষে একদিন শুনতে পেলাম, কোন একটি ছোট ছেলেকে তিরস্কার করা হচ্ছে—তুই যে দেখছি হিন্দুবাড়ির ছেলেদের মত অসভ্য অবাধ্য হয়ে উঠছিস, সেদিনই নিজেকে নিবৃত্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।...

চন্দ্রকান্ত হাসলেন, হয়তো এমন কিছুই নয়, আবার অনেকও।

কই সেদিন তো একথা বলনি। শুধু বলেছিলেন মনঃস্থির করতে পারছো না—

কথা তো তাই-ই গৌর!...তবে হ্যাঁ, ওদের কিছু আচার্যের মধ্যে যে উদার চিন্তা, যে গভীর ঈশ্বর উপলব্ধির এবং যে প্রশান্তি দেখেছি, তা আমায় যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল।...তাছাড়া মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে ওই যা বললাম—মনে হল, এ সর্বসাধারণের জন্যে নয়।

গৌরমোহন আস্তে বলেন, আমাদেরও তো ওই ধরনেরই চিন্তাভাবনা ছিল। তুমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলে। তাই বলছিলাম—

হয়েছিলাম গৌরমোহন, অস্বীকার করবো না। কিন্তু কাছে এসে সেখানে সেই গভীরতার স্পর্শ পেলাম না। আমার মনে হয়, যে ধর্ম্মমত অপর ধর্ম্মমতকে নীচু চোখে দেখে, তার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের উপাদানের অভাব।...আসলে—কোন ধর্ম্মমত বা রাজনৈতিক মতবাদের উপর ভিৎ গেড়ে পূর্ণ মনুষ্যত্ব সম্ভব নয়। তোমার কী মনে হয়?

গৌরমোহন আস্তে আস্তে বলেন, আমরা ভাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজ রাখি না। বামুনের ছেলে, একদা গলায় একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটাকেই আঁকড়ে আছি। আর সেটা ধরে দু বেলা গায়ত্রীটা করি—এই পর্যন্ত।...তাছাড়া অফিস যাই, বাজার করি, ছেলেদের পড়াই, ঠেঙাই, গিন্নীর সঙ্গে কখনো রসালাপ কখনো কযালাপ চালাই। বলতে বাধা নেই—মাছ মাংস ডিম পিঁয়াজ সবই খাই, আর চেষ্টা করি কখনো যেন কোনো অকাজ কুকাজে মন না যায়। ব্যাস।

চন্দ্রকান্ত বন্ধুর হাতের উপর একটা হাত রেখে একটু আবেগ ভরে তাতে চাপ দিয়ে গাঢ়স্বরে বলেন, তুমিই প্রকৃত সুখী গৌরমোহন।

সাত

চন্দ্রকান্ত যখন ও-বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বন্ধুর সঙ্গে বিশ্রামালাপে রত, তখন এ-বাড়িতে মহিলা মহলে এক উত্তপ্ত উত্তেজনার চাষ চলছে।...বাড়ির সকলে তো বটেই, উঠোনের মধ্যবর্তী পাঁচিলতোলা তালাবন্ধ দরজা খুলে ফেলে জ্যাঠতুতোরা সবাই এসে জড়ো হয়েছেন এবং সবাইকে জেরা করছেন।

অথর্ব বড় জ্যেঠি প্রাচীরের ওধার থেকে ভাঙা গলায় চেঁচাচ্ছেন, কী হয়েছে আমায় একবার বলে যাবি তো তোরা? হারামজাদিরা, অ নক্কীছাড়া মেয়েমানুষরা, হৈ চৈ করে বেরিয়ে গেলি, ভাবচিস না যে একবার বুড়িটা আটকাটিয়ে মরবে।

কিন্তু সেদিকে কারো কান নেই।

এখানে জেরাকর্ত্রীর প্রধান হচ্ছেন গুপ্তদের বড়বৌ। অশ্রুমতী যাঁর বোনঝি। টেঁপির মার চীৎকার তাঁর কানেই আগে পৌঁছেছিল।

জলে ডুবে গিয়েও ডুব জল থেকে উঠে আসা অশ্রুমতী দাওয়ার ধারে শুধু একখানা মাদুরে শুয়ে আছে, কারণ তাকে শুকনো একখানা কাপড় পরানো হলেও গা মাথা মোছানো যায় নি, ভিজে চুলের রাশি থেকে জল ঝরছে, কাজেই বালিশ বিছানায় শোওয়াবার প্রশ্ন ওঠেনি। অশ্রুমতীর চোখ দিয়ে যে পরিমাণ অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছে, জমিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে তাতেও ডুবে মরতে পারতো অশ্রুমতী। জমিয়ে রাখা হচ্ছে না এই যা।

কিন্তু অশ্রুমতী তো কিছুতেই স্বীকার করছে না, সে ডুবে মরতে গেয়েছিল। কেন তা যাবে? তার এতো সুখের শ্বশুরবাড়ি, এতো সুখের জীবন, মরতে যাবে কী দুঃখে? হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে—

এদিকে টেঁপির মা বিপরীত সাক্ষ্যে মুখর।

হঠাৎ পা পিচলে? বললেই হল? শ্যাওলা নাই, দাম নাই, খটখটি ঘাট, আমি বুড়ি পাঁজা পাঁজা বাসন নে যেতেচি, আসতেছি, পা পিচলোচ্ছে না, আর তুমি তেজপাতা হেন মেয়ে অমনি হঠাৎ পা পেচলালো?...বলি হঠাৎ পা পেচলাতে মানুষ ভরদুকুরে হাতের উলি, গলার হার খুলে থুয়ে চোরের মতন চুপিসাড়ে ইদিক উদিক চাইতে চাইতে ঘাটে আসে? হাতে শুধু শাঁখা, গলা খালি। অতএব মেয়েমানুষ, তুমি সোয়ামী শাউরির হাতে দড়ি দেওয়াতে এই মতলব ভেঁজেছিলে?

অশ্রুমতী অশ্রুর সাগরে ভাসে। খুলে রেখে যাবে কেন? হার বালা খুলে সাজিমাটি দিয়ে পরিষ্কার করছিল, সেই জন্যেই অসময়ে ঘাটে আসা। তা হাত ফসকে গয়না দুটো গেল জলে পড়ে, তাতেই না তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে নেমে যাচ্ছিল, আর সেটা তুলতে গিয়েই—

কিন্তু এতগুলো জেরার মুখের সামনে অশ্রুমতী নামের মেয়েটা কি বটবৃক্ষের মত স্থির থাকবে? শুকনো খড়ের মত উড়ে যাবে না?

হাত ফসকে পড়ে গেল?

গেল তো গেল কোথায়? পুকুর তো তোলপাড় করল টেঁপির বাপ আর তার ভাগ্নে।...যারা টেঁপির মার পরিত্রাহি চীৎকারে মাঠ থেকে ছুটে এসে অশ্রুমতীকে জল থেকে টেনে তুলে ছিল।

ভবতারিণী তাদের দুজনকে তৎক্ষণাৎ নগদ একটা করে টাকা বখশিস দিয়েছেন এবং অশ্রুমতীর জবানবন্দীটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন। চোখও টিপেছেন আরো কিছু দেবেন বলে, কিন্তু অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা এতোবড় সমারোহময় নাটকের এমন ঝুলে পড়া পরিসমাপ্তি দেখতে রাজী হবে কেন? তাছাড়া আসল প্রত্যক্ষদর্শী টেঁপির মা। যে আগাগোড়া জলজেয়ন্ত চোক চেয়ে দেকেচে।

বাসনের পাঁজা ঘাটে ভিজিয়ে ঘাটের ওপাশটায় নারকেল গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল বটে বেচারী, কিন্তু চোখ তো ঘাটেই ছিল বাসনগুলোকে পাহারা দিতে।...সে দেখল না—চোরের মত ইদিক উদিক তাকাতে তাকাতে নতুন বৌদি ঘাটে নামল! গহোনা মেজেচে না হাতী। এসেই তো নেবে গেল।.. আমি বলি কী না কি! কিন্তুক চোক আমি নড়াইনি, ভাব গতিক দেকে সন্দ লাগল, তা পরে দেকি ডুব দে আর ওটে না। ত্যাখন না চীচকার মিচ্‌কার করনু। ওনারা যাই মাটে ছেলো—

এতোখানি বাহাদুরীর লোভ ছেড়ে দেবে সে?

আচ্ছা তা হলে গহণা দুটো? ডুবে মরার মতলবে যদি খুলেই রেখে দিয়ে থাকে তো ঘরে আছে। ...ঘোষণা করলেন ভবতারিণী, খুঁজুক তালে সেজগিন্নী।

সেজগিন্নী ঝেড়ে জবাব দেন, কোতায় কোন্ আঁদাড়ে লুকিয়ে রেকে থুয়েচে, আমি খুঁজতে যাবো কোতায়? রেকেচে কি সেই শুক্‌নোচণ্ডী ভাইটার হাত দে পাচার করেচে তাই বা কে জানে? আসে তো সেটা মাজে মাজে।

ওদিকে অশ্রুমতীর যে মাসি উঁকি মেরেও দেখেন না কোনো দিন, সে-ই দিদির উদ্দেশে বিলাপ করতে করতে অশ্রুমতীর ভিজে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতির পটভূমিকায় নীলকান্ত ইস্কুল থেকে এসে দাঁড়িয়েই বলল, বাবা আসছে গৌরকাকার বাড়ি থেকে। দেখতে পেলাম।

দেড় ক্রোশ পথ ভেঙে ইস্কুলে যেতে হয়। যেতে আসতে তিনক্রোশ। গ্রামের মধ্যে তো ইস্কুল নেই। তা কটা ছেলেই আর প্রত্যহ এতো ব্যাগার খাটতে চায়? নীলকান্ত ও তার সম্প্রদায় বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে ও পকেটে নাড়ু মোয়া নিয়ে বেরোয়, খুব খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটি জায়গা নির্বাচন করে জমিয়ে বসে।...লোকের বাগানের ফল পাকড় দেখতে পেলে তার সদ্ব্যবহার করে, ঢিল মেরে মেরে কাঁচা আম পাড়ে, পেন্সিলকাটা ছুরিটা দিয়ে কেটে নুন দিয়ে ওগুলো খায়, অবশেষে আন্দাজ মত সময়ে বইখাতা গুছিয়ে তুলে বাড়ি ফেরে।... যথাসময়ে ক্লাসে উঠলে এতোদিনে এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে পড়তে যেতে পারতো নীলকান্ত, কিন্তু বছর দু'বছরে এক একবার ক্লাশে ওঠে সে।...অথচ চন্দ্রকান্তও ছাড়বেন না। শশীকান্তর স্নেহময়ী জননীর মত

নীলকান্তর জননীও বলেছিলেন, ওর দ্বারা হবে না বাপু, ওকে ছাড়ান দাও। একটা মাত্তর তো ছেলে, কত খাবে? তোমার যা খুদকুঁড়ো আছে, তাতে ওর জীবনটা কাটবে না?

চন্দ্রকান্ত কথা বলেন না, শুধু গভীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিলেন। অতঃপর আর কিছু বলেন নি সুনয়নী।...শুধু ছেলে যখন রোদে ঘেমে এসে দাঁড়ায়, তখন গামছা দিয়ে ছেলের মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে তার বাপের নিষ্ঠুরতা নিয়ে আক্ষেপ করেন।

আজ আর সুনয়নীর হাতে গামছা নেই, ছেলের জন্যে শুকনো কুলভিজের শরবৎ করাও নেই। সুনয়নী আধ ঘোমটা টেনে গিন্নীদের পিঠের আড়ালে বসে আছেন।...নীলকান্ত আসতেই চুপি চুপি ভবতারিণীকে বলে উঠে যান। চলে যান ছেলেকে নিয়ে দোতলায়।

নীচেরতলার দৃশ্যটা দেখে নীলকান্ত হকচকিয়ে উঠে এসেছে ইস্কুলের জামাকাপড় ছাড়তে। দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটা অচ্ছুৎ আলনা আছে, তাতে ওই অচ্ছুৎ জামা কাপড় ছেড়ে ভিজে গামছা পরে তবে কাচা আলনায় হাত দিতে হয়।...আজ তাকে সে সময় না দিয়েই সুনয়নী উঠে এসে তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে যা হোক কিছু বোঝান।...ভবতারিণীর নির্দেশিত কথাই বলেন, পা পিছলে ডুবে গেছল নতুন খুড়ি। ভাগ্যে টেঁপির মা দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু চন্দ্রকান্তর কাছে প্রকৃত কথাটি বলবার জন্য প্রাণ অস্থির হচ্ছে। এমন একটা নাটকীয় ঘটনা না বলে পারা যায়?

দোতলাতেই অপেক্ষা করতে হবে, নইলে তো নির্জনে পাওয়া যাবে না স্বামীকে। অতএব প্রকাণ্ড দালানটা ঝাঁটা দিয়ে সাফ্ করতে বসেন সুনয়নী। একটা উপলক্ষ না হলে চলবে কেন? বরের অপেক্ষায় বসে আছি? ছি ছি। কেউ বুঝতে পারলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?

আট

কিন্তু এতো কাণ্ড হয়ে গেল, নাটকের মূল নায়ক কোথায়? শশীকান্ত? সে তো ইস্কুলেও যায় না, অফিস কাছারিতেও যায় না, দিবানিদ্রাটি তো ভালই করে।

সেজগিন্নীর এলাকা হচ্ছে নীচের তলাতেই, একেবারে একটেরে...সাবেকী বাড়ির ন্যায্য ভাগ। দোতলাটা—চন্দ্রকান্তর বাবা কবিরাজ মশাই বানিয়েছিলেন, সেটার সবটাই চন্দ্রকান্তর। ব্যাপারটা স্বার্থপরের মত দেখতে লাগে বলে সুনয়নী বড়জেঠির সংসারের খানিকটাকে দোতলায় ডেকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু ভিন্নর পর আর তো সে পদ্ধতি চলল না? ছোট খুড়ির এলাকায় ছোটখুড়ি। বাকী শুধু ভবতারিণী।

তিনি তাঁর ঠাকুর দেবতাকে একতলায় ফেলে রেখে নিজে ঠাকুরদের শিরোধার্য হয়ে থাকতে রাজী হলেন না।

অতএব একা সুনয়নী।

প্রকাণ্ড দালানটা হাঁ হাঁ করে, সারি সারি ঘর শেকল বন্ধ পড়ে থাকে। সাধে আর ছেলের বিয়ে দেবার বাসনা জেগেছে? কিন্তু ওই চিরনিষ্ঠুর মানুষটি কি কখনো সুনয়নীর ভিতরটার দিয়ে তাকিয়ে দেখেন?

তবু মনের মধ্যে কথার ঢেউ উঠলে আর কার কাছে মুখ খুলবেন?

কাকে বলবেন—যে যতই চাপুক, আমি বাবা বুঝেছি ব্যাপারটা কী!...ডুবে মরতেই গিয়েছিল নতুন বৌ, মরল না তো, এখন বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলছে। না হলে রোজ নতুন ঠাকুর পো ঘরে দোর দিয়ে সারা দুকুর ঘুমোয়, আর আজকেই হাওয়া?...প্রেথমে তো সবাই ভেবেছিল, যেমন ঘুমোয় ঘুমোচ্ছে।...পিসিমা যখন বললেন, শশীকে ডেকে তুললো না কেন সেজবৌ? তখনও সেজখুড়ি বললেন, মরেতো আর যায়নি বৌ, একটু জলও গেলেনি। শুধু কেলেঙ্কারি। এ দেকতে আবার ব্যাটাছেলেকে ডাকবো কী?... ওমা তাপর কিনা দেখা গেল ঘরেই নেই।...কখন থেকে নেই সেজখুড়ি পর্যন্ত জানেন না।...বুঝতে

পারছো ভেতরে গোলমাল?...নতুন বৌয়ের গায়ের গহনা দুটোও তো ভূতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন।... ভয়ে তো তোমার কাছে সব কথা প্রকাশ করি না। কে প্রকাশ করেছে টের পেলে সেজখুড়ি কি আস্ত রাখবেন? ছেলের অনেক গুণ। নির্ঘাৎ গহনা নতুন ঠাকুরপোই সরিয়েছে। বৌ রাগ করে—

ঝাঁটা চালাতে চালাতে অনর্গল কথাগুলো মনে মনে আউড়ে যান সুনয়নী। এটা তাঁর বরাবরের মুদ্রাদোষ।

বৌঠাকরুণ যে রাগ করে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন, তা হল খালি ধাষ্টামো! রাম বোকা তো! আত্মঘাতী হতে গেলেও বুদ্ধির দরকার।...নতুন-বৌয়ের যা বুদ্ধি, গলায় দড়ি দিতে গেলেও হয়তো এমন দড়ি বাঁধতো যে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যেত।...সুনয়নীর এক মাসির বড়জা—নাকি মরবার জন্যে কলকে ফুলের ফল বেটে খেয়ে পাগল হয়ে বসে আছে। যতটি খেলে মরে ততোটি খায়নি।

আমি যদি কখনো ডুবে মরতে যাই বাবা, কখনো দিন-দুপুরে নয়। সন্ধের অন্ধকার হয়ে এলে ঘাট যখন শূন্য হয়ে যায়, তখনই হচ্ছে ডুবে মরবার যুগ্যি সময়।...তাও বাবা যদি মরি তো গলায় কলসী বেঁধে কলসীর মধ্যে পাথর পুরে।

হঠাৎ মনে মনে হেসে ওঠেন সুনয়নী, আ আমার মরণদশা। মরতে গেলে কেমন বুদ্ধি খাটাবো, এমন অনাছিষ্টি কথা ভেবে মরছি কেন?...অবিশ্যি মাঝে মাঝে ওই মানুষটির ওপর রাগে অভিমানে মরতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু তাতে ওনার এতোটুকু লোকসান হবে? জব্দ হওয়া তো দূরে থাক, হয়তো টেরও পাবেন না।...তবে শুধু শুধু নীলেটাকে মা-হারা করে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাই কেন?

কিন্তু দোতলায় কি তিনি আসবেন না আজ জামা-কাপড় ছাড়তে? কই পাত্তা নেই কেন? ...পিসির কাছে আদ্যোপান্ত শুনছেন বোধহয়।

আরো কত শুনতে হবে। আছেন তো কতজনা।

সাড়া-শব্দ আর পাচ্ছিনে। ওনাকে দেখে ঠাণ্ডা মেরে গেছে সবাই মনে হচ্ছে।...এতোক্ষণ তো যাত্রাথিয়েটারের মহল্লা চলছিল।

অস্থির সুনয়নী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে যাচ্ছেন তখন দেখতে পেলেন চন্দ্রকান্ত আসছেন। তার মানে সব শুনেটুনে। যাক, যা শুনেছেন তা-তো ভুয়ো।

প্রকৃত কথাটি কোন দিক থেকে শুরু করবেন মনে মনে গাঁথতে থাকেন সুনয়নী।...

সুনয়নী কি জানেন, তিনি নাটকের যে দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে এসেছেন, সে দৃশ্যে যবনিকাপাত হয়ে গেছে?

বাবা আসছেন বলে নীলকান্ত চলে এসেছে, পিছনে পিছনে সুনয়নীও। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজির মত মুহূর্তে মঞ্চের সমস্ত কুশীলব অন্তর্হিত। শূন্য মঞ্চে আসন্ন সন্ধ্যার স্তব্ধ শান্তি।...কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ উঠবে। শঙ্খধ্বনির।

বহিরাগতরা চটপট বিদায় নিলেন উঠোনের দরজা দিয়ে। ছোটগিন্নী তাড়াতাড়ি কাপড় কাচতে চলে গেলেন টেঁপির মাকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও মৃত্যু ঘটেনি, তবু যেন পুকুরঘাটের দিকে ভূতের আতঙ্ক।

এদিকে নিবারণী অশ্রুমতীকে প্রায় মাদুরসুদ্ধু হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে ফেলেছেন এবং নিজেও ঘরেই রয়ে গেছেন।

কেবলমাত্র ভবতারিণীই নির্বিকার। তিনি যথারীতি ঠাকুর ঘরের দরজার পাশে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছেন।...

সন্ধে দেওয়া আর শাঁক বাজানো দুটি কাজ ছোটগিন্নী ননীবালার। ঘাট থেকে এসেই নিজ কর্তব্য করবেন।

চন্দ্রকান্তর বারবাড়ি থেকে ভিতর বাড়িতে আসতেই এতো কাণ্ড হয়ে গেল, অতএব চন্দ্রকান্ত কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন না।

ওঁকে ঢুকতে দেখেই ভবতারিণী বলে উঠলেন, কী-রে চন্দোর, খুব নেমন্তন্ন খেলি দেখছি।...দুপুরের ভোজে বিকেল গড়িয়ে গেল। তা কী রেঁধেছিল গৌরের বৌ, বল?

নয়

নীচের তলার দিশ্যি দেখে বুঝি আর উঠে আসতে পারছিলে না?...

সুনয়নী বলে ওঠেন, তবু তো ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে যে এখন বাড়ীতে কী দক্ষযজ্ঞ হতো!

চন্দ্রকান্ত থমকে দাঁড়ান।

কী ব্যাপার?

কী ব্যাপার! দেখে এলে না নীচের তলায়?

চন্দ্রকান্ত মনে মনে একবার ভেবে নিয়ে বলেন, কই! কিছুই-তো দেখলাম না।

কিছুই দেখলে না?

না-তো!

কী দেখলে?

যেমন রোজ দেখি। কেউ কোথাও নেই, পিসি বসে আছেন সন্ধেটির অপেক্ষায়। সন্ধে হলে মালা ধরবে।

ও-মা সে কি!

সুনয়নী গালে হাত দেন, কেউ কোথাও নেই?

কেন? কী হলো?

সুনয়নী বলেন, হয়েছে অনেক কাণ্ড। শুনো পরে। তোমার আসার সাড়া পেয়ে পাখিরা সব উড়ে পালিয়েছে বোধহয়।... নতুন বৌকেও দেখতে পেলে না?

নতুন বৌ!

ওমা, নতুন বৌ কে তা জানো না? ঠাকুরপোর বৌ। টেবু ধেবুর মা—

আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। বুঝেছি। তা তিনি হঠাৎ? তাঁকে তো কোনদিনই—

তার মানে পিসিমা কিছুই বলেন নি—

নাঃ, এসব হেঁয়ালি বোঝা আমার অসাধ্য। বাইরের জামা-কাপড়গুলো ছাড়তে দাও তারপর তোমার হেঁয়ালী শোনা যাবে।.....

হঠাৎ কোথা থেকে যেন নীলকান্তর দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত গলা ভেসে আসে, হেঁয়ালী কী জানো বাবা? আজ নতুন খুড়ি খিড়কির পুকুরে ডুবে মরছিল।

দশ

অনেক দিন পরে সারাদিন বন্ধু সঙ্গ লাভে মনটা বড় ভাল লাগছিল—আকাশ বাতাস, গাছপালা।

গল্প করা কাকে বলে সে কথা তো ভুলেই গেছেন চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তের যা চিন্তার জগত সেখানকার নাগাল পাবার মত লোকই-বা কোথায় এখানে?...চন্দ্রকান্তর অধীত গ্রন্থ সম্পর্কে কে এমন ওয়াকিবহাল যে তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা চলে!

কেউ নেই, কেউ নেই।

চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তাদের আকাশ-পাতাল ব্যবধান।...মেজদা তো একটা পাশ করা, দেখগে যাও তাকে। কে বিশ্বাস করবে?... সারা সকাল গরু হেট হেট করছে, তারপর তাদের জন্য খড় কাটছে, খোল মাখছে, ভুষি মাখছে, গোটা কতক গরু পুষে তাই নিয়েই মশগুল।

অথচ কেউ যে নেই, সে কথাটা আজ দশ বছরের মধ্যে মনে পড়েনি।

দশ বছর পরে আজ বন্ধু সঙ্গের আস্বাদ পেয়ে মনে পড়ল, বড় নিঃসঙ্গ তাঁর জীবনটা।

ভাল লাগার আরো একটা কারণ, গৌরমোহনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করে ফেলেছেন—একবার কিছু দিনের জন্যে কলকাতায় যাবো।

কলকাতা যাবো। কলকাতা যাবো।

একটা যেন আনন্দের গুঞ্জন ধ্বনিত হয়ে চলেছে মনের মধ্যে।

আশ্চর্য! এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারের জন্যেও যাইনি কেন?

শুধুই কি সময়ের অভাব?

তা নয়। যেন একটা অভিমান বাধার প্রাচীর হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে অটল হয়ে।

কার উপর অভিমান?

হয়তো আপন জীবনের উপরই।

না কি ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিয়ে যাঁরা একটা কিশোরছেলেকে বিবাহিত বলে দেগে দিয়েছিলেন তাদের উপর?

ভুলে গিয়েছিলেন। আজ আবার হঠাৎ—

বহুদিন পূর্বে শ্রুত একটা ব্যঙ্গ-র হাসির ধ্বনি কানে বেজে উঠল, ওমা! এইটুকুন ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে? ছি ছি!...

একটা 'এইটুকুন' মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল, তবু ভয়ানক একটা দাহ সেই ছেলেটাকে যেন ঝলসে দিয়েছিল।...হয়তো সেখানেও জমে উঠেছিল একটা তীব্র অভিমান। ...আর একদা যে উদার ধর্মছত্রতলে আশ্রয় নেবার জন্যে উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন চন্দ্রকান্ত, সেও তো চন্দ্রকান্তর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।...

চলে আসার সময় মনে হয়েছিল চন্দ্রকান্তের, কলকাতা যেন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটা খোলা রাস্তার দরজায় তালা চাবি লাগিয়ে দিয়ে তার দিকে পিঠ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকার মত এই গ্রামের জীবনে নিজেকে ফেলে রেখেছেন চন্দ্রকান্ত। ধীরে ধীরে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে নিতে চেষ্টা করেছেন এবং সমস্ত অরুচিকর জিনিসগুলিকে সহ্য করে নেবার শক্তি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে চলেছেন।

তবু সহ্য হওয়া বড় শক্ত।

প্রহার সহ্য করা যায়, 'হার' সহ্য করা বড় কঠিন।

যাক, তবু আজ একটা আনন্দের সুর বাজছিল মনের মধ্যে। গৌরমোহনের মুখে বর্তমান কলকাতার কিছু কিছু ছবি একটু উদ্বেল করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করে কেন একটা মুক্তির পথ বন্ধ করে রেখেছি এতোদিন?...অনেককে বোকা ভাবি, আমিও তো কম বোকা নয়?...

নীলকান্তকে যদি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কলেজে পড়াতে পারতাম! আমার বাবা অতদিন আগে তার ছেলের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, আমি তা পারছি না। এ বিষয়ে ভাবা দরকার।

কিন্তু পরামর্শ করবার লোক কোথায়?

জীবনের দোসর নেই চন্দ্রকান্তর।

তবু আসছিলেন উৎফুল্ল মনে। কলকাতায় যাবার কথাটা পাড়া যাবে কী ভাবে ভাবতে ভাবতে। প্রথমেই তো পিসিমা।...কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেখানে? তারপর আর একখানা মুখ।

কিন্তু বাড়ি এসে সেই মুখ থেকে এমন একটা অভাবনীয় কথা শুনলেন।...যেটা চন্দ্রকান্তর হিসেবের বাইরে ছিল। শশীকান্ত বৌকে ধরে 'ঠেঙায়' এই ব্যাপারটা যখন বাড়ির প্রত্যেকে অতি সহজে উড়িয়ে দিল, প্রায় মায়েদের ছেলে ঠেঙানোর মতই স্বাভাবিক বলে ধরে নিল—তখন চন্দ্রকান্তও আর ও নিয়ে উচাটন হননি।

এখন আবার এ কী খবর?

সুনয়নী দোতলার দালানের জানালা দিয়ে পানের পিক্ ফেলে সরে এসে বললেন, আমি তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলতে পারি, গহনা নতুন ঠাকুরপোই মেরে ধরে কেড়ে নিয়েছে। সেই দুঃখে নতুন

বৌ, তবে এও বলি, তিন তিনটে কচি বাচ্চা তোর, তাদের মুখ চাইলি না? তাদের দুগ্‌গতির কথা ভাবলি না? মায়ের প্রাণ না, পাষাণ বাবা! মরলি না, বেঁচে উঠলি তাই, নইলে অ্যাতোক্ষণ কী ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিতো মেয়ে তিনটে ভাবো?

থামো।

চন্দ্রকান্ত বললো, কে পাষাণ সে হিসেব করার বুদ্ধি থাকলে--যাক শশী কোথায়?

ওই তো বললাম, আজ একেবারে বেপাত্তা। অথচ রোজ থাকে। আমার বিশ্বাস সেজখুড়ি জানেন সন্ধান। তা নইলে একটু হানফানালি দেখলাম না কেন!...যাই বলো বাবু, গুরুজন হলেও বলছি, যত নষ্টের গোড়া ওই মা'টি—

আঃ! তুমি থামবে?...নীলকান্ত অদূরে বসে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি ময়দার আঠা দিয়ে তাপ্পি লাগাচ্ছিল। বাপের কথায় বলে উঠল, খুব জানি।

কোথায়? কোথায় গেছে?

কোথাও নয়—

নীলু কাছে সরে এসে গলা নামিয়ে বলে, বাড়িতেই লুকিয়ে আছে।

বাড়িতে!

নীলু আঙুল উঁচিয়ে ছাদ দেখিয়ে দিয়ে আরো চুপি চুপি বলে, বড়ি আচারের ঘরে। সেজঠাকুমা লুকিয়ে রেখেছে। একটু আগে খাবার দিতে ঢুকেছিল, দেখতে পেলাম। আমি যে ওই কোণায় ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম তা দেখতে পায় নি বুড়ি।

আঃ নীলকান্ত!...চন্দ্রকান্তের মনে হল। তিনি কি কোনো কালে ওই ছাদটায় উঠেছেন? বড়ি আচারের ঘর! সেটা কী জিনিস। আমায় দেখিয়ে দিতে পারো?

পারবো না কেন? কিন্তু কাকাকে দেখতে পাবে না। সেজ ঠাকুমা কুলুপ লাগিয়ে রেখে গেছে।...

আচ্ছা সেজঠাকুমাকেই একবার। আচ্ছা থাক, আমিই যাচ্ছি। তুমি এ নিয়ে কাউকে কিছু—

চন্দ্রকান্তর কথা শেষ হয় না, হঠাৎ বাইরের দেউড়িতে বিরাট একটা রোল ওঠে। অনেকগুলো কণ্ঠের প্রচণ্ড চীৎকার।

এগারো

ভরা দুপুরে চন্দ্রকান্তর সংসারে যখন একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত বইছিল অশ্রুমতীকে নিয়ে, তখন গ্রামের আরও একটা জায়গা উত্তেজনায় থমথম করছিল।

এ উত্তেজনা দুলে পাড়ায়।

মেয়ে পুরুষ ছেলেবুড়ো এসে জড়ো হয়েছে বদন দুলের বাড়ির সামনের পোড়ো জমিটায়। সকলের মুখে উত্তপ্ত উত্তেজনা, গভীর উদ্বেগ। কারুর মুখে কোন কথা নেই। শুধু বুড়ো উদ্ধব কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে সবাইকে ধরে ধরে কী যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে। ...কারুর কারুর মুখে মেনে নেওয়ার ছাপ, অধিকাংশের মুখেই অনমনীয়তার ভঙ্গী।

জোয়ান ছেলেগুলোর সকলের হাতেই লাঠি। মাঝে মাঝে কেউ কেউ অসহিষ্ণুভাবে লাঠিটা মাটিতে ঠুকছে। সকলের মাঝখানে ভীষণতার প্রতিমূর্তির মতো মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে বদন দুলে। কালো পাথরে কোঁদা গড়ন, ঘাড়ে বাবরি চুল, সেই বাবরি চুলের আবেষ্টনীর মধ্যে ভীষণাকৃতি মুখটা সমেত বদনকে কেশর ফোলানো সিংহের মত দেখতে লাগছে।

কথা নেই, গুঞ্জন আছে!

আগুন নেই, উত্তাপ আছে।

এই অবস্থা থাকতে থাকতেই আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। হঠাৎ সমস্ত জটলার মধ্যে একটা

চাঞ্চল্য দেখা গেল। আর কর্কশ অনার্য কণ্ঠের সমবেত হুংকার। মেয়েমানুষদের গলা থেকেও তার সমর্থন ওঠে।

দুলেবস্তির ভেতর থেকে একটা দল বেরিয়ে আসছে জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে। আসন্ন সন্ধ্যার আকাশের নীচে সেই মশাল হাতে কালো পাথুরে মানুষগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, আদিম অরণ্য থেকে উঠে আসা গুহামানবের দল।

তবু উদ্ধব দুলে ওই কঠিন সংকল্পের মূর্তিগুলোর কাছে আবেদন জানাতে চেষ্টা করছিলো, অ্যাকনো সময় আছে বাবারা, মগজ ঠাণ্ডা করে ভেবে দ্যাক—অ্যাকবার। একটা বজ্জাত মেয়েছেলের নেগে অ্যাতোটা করতে যাবি কিনা! গোরা পুলিশদের মুকগুলান মনে আন বাবারা—

কেউ উদ্ধবের আবেদনে কর্ণপাত করছে বলে মনে হয় না। গ্রাহ্যও করে না। তারা শুধু বদনের মুখ থেকে শেষ হুংকারের অপেক্ষায় অসহিষ্ণু মুহূর্ত গুণছে।

উদ্ধব যেই বদনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, উঠল সেই হুংকার। 'যা ঘর যা বুড়ো'—

উদ্ধবকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে আওয়াজ তুলল বদন।...

মেয়েছেলেরা কেউ যাবেনি।

পড়ল আর একটা বাজ!

যাবেই বা কী করে? তাদের ঘর আগলানো আছে, শিশু সন্তান আছে। তবু কটা ডাকবুকো মেয়ে যাচ্ছিল পিছু পিছু। ফের ধমকে উঠল বদন, তফাৎ যা।

উদ্ধব ককিয়ে ওঠে, লাসটার কী হবে রে বদন?

খবরদার। একদম চুপ। জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব। যা হবার ফিরে এসে হবে।

মশাল হাতে রে রে করে এগিয়ে এসেছে তারা সেই বাড়ীর দেউড়িতে, যে দেউড়ির ধুলোর উপর তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা চিরদিন সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রণিপাত জানিয়েছে।

কোতায় সেই হারামজাদা শুয়োর! বের করে দে সেটাকে। তার চামড়া ছাইড়ে নেই। বেরিয়ে আয় শুয়োরের বাচ্চা।

অন্ধকার নেমে এসেছে। গাঢ় গভীর অমাবস্যার রাত্রি। সেই জমাট অন্ধকারের গায়ে মশালের আগুন যেন ক্রুদ্ধ দৈত্যের চোখের মত জ্বলছে। মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠায় ভয়াবহতা আরো প্রখর প্রকট।

* * *

তুমি কি খেপে গেলে? ওই রাক্কসদের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি?

সুনয়নী লোকলজ্জা ভুলে সকলের সামনে চীৎকার করে ওঠেন।

চীৎকার করে ওঠেন ভবতারিণীও। ও বাপ, তোর হাতে ধরি। ওদের সুমুকে যাসনে।

না গেলে ওরা দেউড়ি ভাঙবে।

নোয়াব দেউড়ি ভাঙলেই হলো?

ওরা যদি খেপে ওঠে, পৃথিবী ভাঙতে পারে পিসিমা। ভদ্দরলোকের রক্তর মত ঠাণ্ডা রক্ত নয় ওদের। ধরতে এসোনা। দেখতে দাও আমায়, শুনতে দাও ওদের কথা।

গিয়ে দাঁড়ালেন দেউড়ির সামনে। নিজের হাতে প্রকাণ্ড ভারী তালাটা খুলে ধরলেন।

হঠাৎ থেমে গেল আওয়াজ।

স্তব্ধতা নামল একটু।

চন্দ্রকান্ত বললেন, কী চাও? লুঠ করবে? চলে এসো।

কে একজন বলে উঠল, আমরা ছোটলোক হতে পারি হুজুর, বেইমান নই।

তবে, বল কী দরকার?

আর কিচ্ছুতে কাজ নাই আমাদের হুজুর, শুধু—

হুজুর হুজুর রাক্—

বদনের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ, সেই শুয়োরের বাচ্চাডারে বের করে দ্যান।

আবার হুংকারের রোল ওঠে।

চন্দ্রকান্ত অবশ্যই কিছু অনুমান করেন, তবু শান্ত কণ্ঠে বলেন, ভালভাবে কথা বল বদন, কে সে?

ক্যানো? মালুম হচ্ছেনি? তোমার ওই ভাইডা। শালাকে ডালকুত্তাকে দে খাওয়াবো।

শোনো, আমাকে বুঝতে দাও। কী হয়েছে বলতে হবে। আমি কিছুই জানি না।

চন্দ্রকান্তর দুটো হাত দুটো দেউড়িতে। মশালের আলোয় বিচিত্র একটা রূপ।

আবার কিছুটা নীরবতা। যারা আগুন লাগাবে বলে মশালগুলোকে নাচাচ্ছিল, তারা বেজার মুখে হাত থামায়। আর শক্ত মুখ একটা মাঝারি বয়সের লোক সরে আসে চন্দ্রকান্তর দিকে।

কি হয়েছে জানায়—

বদনের সংসারে আর কেউ নেই, না মা না ছাঁ, শুধু একটা ডব্‌কা বয়সের বাচাল বৌ। বদন যখন কাজে যায়, তখন বৌকে তালা বন্ধ করে রেখে যায়। বন্ধ ঘরের মধ্যে সে খায়, ঘুমোয়, গাল পাড়ে। বদন এসে তার তালা খোলে। কিন্তু কিছুদিন থেকে ওই শয়তান শশীকান্তকে বদনের বাড়ির ধারে কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে অন্য মেয়েছেলেরা। বদন গোঁয়ার বলে চট করে বলে দিতে সাহস করেনি। কিন্তু বদনও যেন সন্দেহ করেছে ঘরে আর কেউ আসে। অথচ তালা ঠিকই ঝোলে।

মাঝে মাঝে বদনকে কাজের জন্য ভিন গাঁয়ে যেতে হয়, রাতে ফেরে না। সেদিন ডবল তালা লাগিয়ে রেখে যায়, তবু সন্দেহ জমাট হতে থাকে। আর বদন হিংস্র হতে থাকে।

কিন্তু কাউকে কেন পাহারা দিতে রেখে যায় না বদন? ওইতো! ওখানেই গোঁয়ার্তুমি। নোকে জানবি পরিবারকে এঁটে উটতি পারবে না বদন দুলে, অপরের সাহায্য নিতে হচ্চে।

তা তক্কে তক্কে থাকে বদন।

আজ সকালে মিচে করে বলেচে বেরুচ্চি। আজ আর আসবুনি—ব্যাস, বজ্জাত মেয়েমানুষটা জো পেইচে—।

অতঃপর আর কি!

হাতে নাতে ধরা।

দিনদুপুরেই এসে হাজির হইচে 'কবরেজ মোশায়ে'র কুলাঙ্গার ভাইপোটি—

তো যেই না বদনা দুয়োরের তালাচাবি খুলেচে, সেই নক্কীছাড়া পাজী ঘরের পেচন দে দৌড় দে দৌড়। বদনা দেকে সিঁদেল চোরের মতন কাণ্ড! ভিতের গোড়ায় ইয়া একখান সিঁদ। তলেতলে কেটে রেকে থুয়েচে, তার মুকে একখান প্যাঁটরা ঠেশে থুয়েচে কুসমি।

না। বদন তো আর সিঁদের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধরতে যেতে পারে না, দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটেছে। দেখতে পায়নি।...ব্যাস, তখন অপর আসামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং দিশেহারা রাগে এমন পিটন পিটিয়েছে যে, মরেই গেছে 'কুসমি' নামের সেই জ্বলজ্বলে ছটফটে বাচাল বেহায়া মেয়েটা। এতো শাসনেও যার মুখের হাসি কমতো না।

কুসুমের কোল-আঁচলের খুঁটেয় নাকি একজোড়া সোনার বুলি, আর একগাছা বিছেহার বাঁধা ছিল। নিয়ে এসেছে বদন।

বের করে দ্যাকানা বদন, সনাক্ত করুক ইনি।

বদন রুক্ষ গলায় বলে, উনি কি সনাক্ত করবে! আসামীকে বের করে দেক। সেটাকেও 'লাশ' করে দেব, তাপর মড়ার মুকের ওপর এই গয়োনা দুখান ছুঁড়ে মেরে ফাঁসিকাটে ঝুলতি যাব, ব্যাস। দেন, বের করে দেন।

আচ্ছা, দিচ্ছি।

যে লোকটা চন্দ্রকান্তর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আপোসের সুরে কথা বলছিল, সে নীচু গলায় বলে,

পরিবারডারে প্রাণতুল্যি দেকতো হতভাগা, রাগের চোটি খুন করি ফ্যালে পাগলা বনি গ্যাচে।

ভিতরে চলে এলেন চন্দ্রকান্ত। মহিলাকুল যেখানে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে আছেন নীলকান্তকে এবং ছোট ছোট মেয়ে তিনটেকে নিয়ে, সেখানে এসে বিনা ভূমিকায় গম্ভীর গলায় বলেন, ছাদের বড়ি আচারের ঘরের চাবিটা দাও সেজখুড়ি।

সেজখুড়ি চমকে উঠে বলেন, ওমা সিকি! সে ঘরের চাবি নিয়ে কী করবে অ্যাখোন তুমি? আকাচা কাপড়।

থামো। আর পবিত্রতা দেখাতে এসোনা। চাবিটা দাও।...

সুনয়নী ঠকঠক করে কাঁপেন। ঠকঠক করে কাঁপে নীলকান্ত। কাঁপতে থাকে অশ্রুমতীও।

শুধু ভবতারিণী, ননীবালা, টেঁপির মা অবাক হয়ে তাকান। হঠাৎ এটা কোন ভাষা!

ভবতারিণী ভয়ে ভয়ে বলেন, চলে গেচে ওরা?

চলে যাবে? শুধু হাতে চলে যাবে?

তবে উমনোর মধ্যে ঝুমনোর বাদ্যি বড়ির ঘরের চাবির খোঁজ কেন বাবা? আমাদের তার মদ্যে ঢুকিয়ে দে লুটতরাজ করতে ছেড়ে দিবি?

লুঠতরাজ করতে আসেনি ওরা। কথা পরে হবে। চাবিটা দিয়ে দাও সেজখুড়ি।

আর ছলনা চলবে না।

অতএব এবার নিবারণী বাঘিনীর মূর্তিতে রুখে দাঁড়ান, ক্যানো? তোমার হাতে চাবি দিতে যাব ক্যানো? আপনার প্রাণ বাঁচাতে আমার শিবরাত্তিরের সলতেটুকুকে রাক্ষোসের মুকে ধরে দেবে বলে? ...চাবি? আমি দেব না। এই চললাম দুয়োর আগলাতে, দেকি আমায় না খুন করে কে দুয়োর খোলে!

চন্দ্রকান্ত সকলের মুখের দিকে তাকান।

বাইরে আবার যেন কলরোল উত্তাল হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত শান্ত গলায় বলেন, মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় সেজখুড়ি।...ছেলে যদি তোমার খুন হয়, তো জেনো সে খুনের খুনী তুমি। তবু আজ আরও একটা খুনের হাত থেকে দৈবে রেহাই পেয়েছ। নইলে পুলিশ এতোক্ষণে সবাইয়ের হাতে দড়ি পরাতো। যাক, বলছি ভালয় ভালয় ওদের হাতে ধরে দিলে বরং রেহাই পেতে পারে হতভাগা। ধরে না দিলে বাড়ি জ্বালিয়ে দরজা ভেঙে টেনে বার করে নিয়ে গিয়ে আছড়ে মারবে।

কিন্তু এই আশ্বাসেই কি চাবিটা ফেলে দেবেন নিবারণী? তাই কি সম্ভব?

নিবারণী ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেন, যা পারে করুক। আমায় না মেরে ওরা শশীর চুলের ডগাটুকু ছুঁক দিকি। পরের ছেলে বলে এতো সাউখুড়ি। বলি এ যদি তোমার নিজের ছেলেটি হতো?

চন্দ্রকান্ত কঠিন গলায় বলেন, যদি আমার নিজের ছেলে হতো? নিজের হাতে সে ছেলের টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলতাম।

নিবারণী উঠে দাঁড়ান।

কোমরের কাপড়টা ভালো করে জড়িয়ে নেন, যাতে চাবিটা কেউ কেড়ে নিতে না পারে। নিবারণীকে ডাকিনীর মত হিংস্র দেখতে লাগে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, আচ্ছা দেখবো। ছেলে জোয়ান হয়ে উঠতে আর ক'দিন? মরবো না তো। দেখবো সব্বই। তা তুমি মহাপুরুষ নিজের ছেলের টুঁটি ছিঁড়ো বাছা, আমার ছেলেকে শাসন করতে আসার কিসের এক্তিয়ার তোমার? আমরা তোমায় মান্যিমান করে চলি তাই? নচেৎ শাসন করবার তুমি কে? বাপ না, জ্যাঠা না, খুড়ো না, জ্ঞেয়াতি দাদা।...কই আর তো কেউ কিছু বলতে আসে না? দুটি ভাত দাও বলে?

চন্দ্রকান্ত স্তব্ধ হয়ে যান।

ওদিকে দেউড়ি ঝনঝন করে ওঠে। রব ওঠে—জয় মা চণ্ডী!

চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে আসেন। হাত জোড় করেন। শান্ত গলায় বলেন, বার করে এনে দিতে পারলাম

না বাবা। মাপ চাইছি। তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মত যা পারো করো। বাড়ি জ্বালিয়ে, আমায় বেঁধে রেখে, মেরে—যেভাবে খুশী।

বারো

নাঃ, ওদের খুশীমত কিছুই করেনি ওরা।

ওরা কিছুক্ষণ জটলা করে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল। ওদের হাতের মশালগুলো তখন নিভে গেছে। অন্ধকারে কালো কালো মানুষগুলো আরো চাপা একটা অন্ধকারের মত চলে গিয়েছিল আস্তে আস্তে।

টগবগিয়ে ফুটে ওঠা রক্তগুলো শুধু শুধু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় ওদের যেন কেমন ঝিমোনো ঝিমোনো লাগছিল। বদনাকে দুজনে দুদিক থেকে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ওরা জানে, বাড়ি পৌঁছেই বদন কুসমির মড়াটাকে নিয়ে আছড়া আছড়ি করে কাঁদবে।...

তবে ওরা কেউ জানে না, কখন বদন দেউড়ির সামনের ধুলোর মধ্যে সেই গহনা দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক সেইখানে, যেখানে ওর বাপ দাদা সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে এঁদের প্রণিপাত করতো।...

চন্দ্রকান্ত গুপ্তের বাড়ির এতোটুকু কিছু টস্‌কায়নি। একখানা ইঁটও খসেনি, একটু বালির চাপড়া ধ্বসেনি। লুঠতরাজের কথা তো ওঠেই না। ...শুধু সারা গ্রামে টী টী পড়ে গিয়েছিল।...

এতো মহাপুরুষ, ত্যাঁতো মহাপুরুষ, বই লিখিয়ে পণ্ডিত—স্বার্থের সময় দেখো। লুঠতরাজ বাঁচাতে ওই দুলে ডাকাতদের সামনে খুড়তুতো ভাইটাকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। নেহাৎ না কি সেজগিন্নি সিংহবাহিনী মূর্তিতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই তারা মানে মানে সরে গেল। নচেৎ কী হতো?

এটা যে চন্দ্রকান্তর খুব গর্হিত কাজ হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী? সত্যিই তো, খুড়তুতো ভাইকে শাসন করতে আসার তুমি কে?...একদা সেজকর্তা বাড়ির নিজের দিকে ভাগ বেচে দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন, আর তুমি বদান্যতা দেখিয়ে তাদের সেই বেচে দেওয়া মহলে থাকতে দিয়েছিল, এই অহঙ্কারে? বেশ তো, গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। শশীকান্ত স্ত্রী কন্যে আর বিধবা মাকে নিয়ে গাছতলায় থাকবে, তাও ভাল।...এমন নির্মায়িক শত্রুপক্ষের আশ্রয়ে থাকার চেয়ে গাছতলা শ্রেয়।...

যাঁরা এযাবৎ 'বাবাজীবন' বলে বিগলিত হতেন, তাঁরাও এসে এসে বলে যাচ্ছেন, কাজটা চন্দ্রকান্তর ঘোরতর গর্হিত হয়েছে...গাঁয়ে ঘরে কি ওই একটা মাত্তর ছেলেই দুলে বাগদীপাড়ায় ঘুরঘুর করে? 'বয়েসকালের দোষ' কথাটার তবে সৃষ্টি হয়েছে কেন? তাছাড়া বেচারার স্ত্রীটি যখন রোগগ্রস্ত। গোঁয়ারগোবিন্দ বদনা দুলে নিজে রাগের মাথায় পরিবারটাকে পিটিয়ে মেরে এসে ক্ষেপে গিয়ে যা তা বলল বলেই তুমি খুড়িকে জবরদস্ত করে চাবি নিতে গেলে? বিধবা খুড়ি, ওই সবেধন নীলমণিটুকু নিয়ে তোমার আশায় বিশ্বাস করে রয়েছে।

জনে জনে ওই কথাই বলছে।

ওই বিশ্বাস শব্দটাও ব্যবহার করেছে প্রায় সবাই।

তার মানে চন্দ্রকান্ত তাঁর পারিবারিক জীবনে ভয়ানক একটা বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসেছেন।

সুনয়নীর মনের মধ্যেও সেই ভয়। তাই চন্দ্রকান্তর যাত্রাকালে সে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সেই কথাই বললেন।

এমনিতে চন্দ্রকান্তর কলকাতায় বাসা করার সংকল্প শোনা পর্যন্তই সুনয়নী সবাইকে ধরে ধরে শুনিয়ে চলেছেন, আমি যাবো কী বল? বেটাছেলের খেয়াল ক'দিন থাকে কে জানে! আমি মরতে ল্যাজ ধরতে যাবো কেন? বাসার সেই পায়রার খুপরি দুখানা ঘরের মধ্যে আমি টিকতে পারবো? হাঁপিয়েই মরে যাবো তো। বেশ থাকবো বাবা আমি পিসিমাদের কাছে—

কিন্তু চন্দ্রকান্তর বিদায়কালে সুনয়নী পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে চোখ মুছে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন,

এখন আর কী বলবো! কলকাতায় বাসা নিচ্ছ শুনে মনটা দুলে উঠেছিল, ভেবেছিলাম চলে যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু সে ভরসা আর নেই। যা নির্মায়িক প্রাণ তোমার, আমার নীলু যদি কখনো একটা অকাম করে বসে, তুমি তার কী শাস্তি করবে তুমিই জানো। হয়তো হুকুম দেবে—পাপ করেছে, আগুনে ফেলে দাও ছেলেকে। প্রাচিত্তির হোক। তা তুমি বলতে পারো, তোমায় বিশ্বাস নেই।

বিশ্বাস নেই। চন্দ্রকান্তর উপর আর কারো বিশ্বাস নেই। অথচ নিজে চন্দ্রকান্ত এ পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসের নৌকোয় চেপে তরতরিয়ে পার হচ্ছি ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন। হয়তো এ আঘাতের দরকার ছিল। ভালই হল, মোহমুক্ত হলেন। আর চন্দ্রকান্তকে দায়িত্ববোধের ভারে ঝুঁকে পড়ে আটকে থাকতে হবে না।

গ্রাম থেকে স্টেশন ষোল মাইল দূর, গরুর গাড়ির পথ। শেষ রাত্তিরে গাড়ি নিয়ে এসে বসে আছে জয়দ্রথ, ঠিক সময় পৌঁছে দেবে। এখন থেকে না ছাড়লে ট্রেন ধরা শক্ত।

কুপী জ্বেলে গাড়ি ঠিক করেছে জয়দ্রথ। প্রদীপ ধরে গাড়িতে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। চারিদিকে অন্ধকার। খোলা মাঠ, দূরে দূরে এক একটা গাছ, ঝাঁকড়া চুল মানুষের মত দেখতে লাগছে।

গাড়ির কঁ্যাচ কোচের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। যেন বিশ্ব চরাচর একটা জাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে।

গরুরগাড়ির কতটুকু গতিবেগ? গাড়ি চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। দুদিন আগে পর্যন্তও কি ভাবতে পারতেন চন্দ্রকান্ত—এই গ্রামটাকে চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, অথচ মনে কোনো বেদনা আসছে না...যেন সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার বাইরে একটা অনুভূতিহীন অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু সেই দুদিন আগে কি 'চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছি' এমন কথা ভেবেছিলেন চন্দ্রকান্ত? ভাবা সম্ভব ছিল? অথচ আজ নিশ্চিত সংকল্পে গাড়িতে এসে উঠছেন। এখন হঠাৎ হঠাৎ এক একটা পাখি ডেকে উঠছে। নিথর প্রকৃতিতে জীবনের স্পন্দন জাগছে।

কি জানি কেমন ঠিক করেছে গৌরমোহন বাসাটা। কি জানি কেমনতর পরিবেশ।

আশ্চর্য! এখন সুনয়নী বললেন, মনটা দুলে উঠেছিল। সুনয়নীরও মন দুলে ওঠে? জগতে তাহলে এ ঘটনাও ঘটে? কিন্তু বড় পরে সুনয়নী, বড় দেরীতে। আর হয় না।

গাড়িটাকে একটা মোড় ঘোরালো জয়দ্রথ, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন চন্দ্রকান্ত।

কখন? কখন শুরু হয়ে গেছে এ দৃশ্য?

পূবের আকাশে অনন্ত বর্ণচ্ছটা, অফুরন্ত বিস্ময়। গাড়ী চলেছে, পূব আকাশও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এ এক আশ্চর্য রহস্য। কত কোটি কতকাল ধরে আকাশ বসে আছে পৃথিবীর শিয়রে, চলেছে পৃথিবীর সঙ্গে। আর কোটি কল্পকাল ধরেই তিমির গভীর রাত্রির তপস্যায় সঞ্চয় করে তোলা অনির্বাণ জ্যোতি, অসীম প্রাণরস প্রবাহ উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীকে পরম প্রেমে, পরম মমতায়। ক্লান্তি নেই, আলস্য নেই, বিরাগ নেই।

চন্দ্রকান্ত কোন শহরে যাচ্ছেন?

সেখানে তাঁর জন্য একটি ছোট বাসা ভাড়া করা আছে বলে? কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জুড়েই তো বাসা। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সুখের দুঃখের। তবে? পৃথিবীর বিশেষ একটুখানি মাটি আঁকড়ে সেই বিশেষ একটি ছোট্ট বাসার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখবেন কেন চন্দ্রকান্ত?

জয়দ্রথ! তোমার গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও বাবা, আমি এখানেই নামছি।

আজ্ঞে বলেন কি ছোট কত্তা, পথ যে এখনও অনেক বাকি। ইষ্টিশনে আসতে দেরী আছে।

নাঃ জয়দ্রথ, এসে গেছে আমার ইষ্টিশান। নামতে দাও আমায়। এই নাও।

পকেটে হাত পুরে একমুঠো টাকা পয়সা বার করলেন। এগিয়ে দিলেন জয়দ্রথের দিকে।

কিন্তুক ছোটকর্তা, এ যে একেবারে ধানক্ষেত, জন মনিষ্যের চিহ্ন মাত্তর নাই।

চন্দ্রকান্ত হেসে উঠলেন।

ধানক্ষেত তো আপনি জন্মায়নি জয়দ্রথ? জনমনিষ্যির হাত যে লেগে রয়েছে ওদের গায়ে। নামাও নামাও।

জয়দ্রথ গাড়ি নামাল। নেমে এলেন চন্দ্রকান্ত।

আছে। এখানেও সামনেই পুবের আকাশ।

পৃথিবীর কাছে কোন দিন বিশ্বাসভঙ্গ করবে না আকাশ। অকৃতজ্ঞ পৃথিবী যাই বলুক।

জয়দ্রথের গাড়ির চাকার ধুলোও ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল, চাকার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দটা ক্ষীণ হয়েও মিলিয়ে যেতে চাইছে না। ওইটা থেমে গেলেই চলতে শুরু করবেন চন্দ্রকান্ত। মাটিতে নেমে এসে আকাশটা আরো কাছাকাছি চলে এলো কী করে? আশ্চর্য তো!

এই অফুরন্ত আশ্চর্যের সঙ্গ রইল চন্দ্রকান্তর জন্যে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

জবর দখল

কার যেন গলার সাড়া পেয়ে ঝুপড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কালী। কার আর, সেই পবন মুখপোড়ারই হবে। সে ছাড়া আর কালীকে জ্বালাতে আসবে কে? উঁচুনীচু ঢিবি জায়গা থেকে নেমে এসে কালী এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

কিন্তু কই? কোথায় কে? একবার গলা ঝেড়ে মিথ্যে কাসি কেসে গেল কোথায় হতচ্ছাড়াটা? উঃ এত ফচকে! ...কালী একটা ঢিল তুলে নিয়ে অকারণ অনেকটা দূরে ছুঁড়ে মারল। কাকে ভেবে কে জানে।

কালীর পরনে একখানা মোটা তাঁতের খাটো বহরের লাল ডুরে শাড়ি পেঁচিয়ে পরা, গায়ে গাঢ় বেগুনী রঙা একটা ব্লাউজ। শাড়ির নীচে থেকে সাদা সায়ার ঝুল বেরিয়ে এসেছে। কালীর গড়নটা এত বাড়-বাড়ন্ত যে এই হেটো শাড়ির বহরটা যেন নিজেই নিজের হ্রস্বতায় লজ্জা পাচ্ছে। কালী কিন্তু নির্বিকার। ও অনায়াসে গলায় রঙচঙা পুঁতির মালার হালি দুলিয়ে, রেশমি চুড়ির গোছা ঝমঝমিয়ে, আর টান করে বাধা খোঁপায় বুনোফুলের থোকা গুঁজে ঘুরে বেড়ায়।

খোঁপায় ফুলটা কালী এই বীরভূমে এসে শিখেছে। দেশে থাকতে এ সাজ ছিল না, ওতে নিন্দে ছিল।

শীতের হাওয়া বইছিল হু হু করে। কালী আর এই পড়ন্ত বেলার বাইরে ঘুরতে সুখ পাচ্ছিল না। এই কদিন আগে পোষ মেলা গেল, দিনে রাতে মেলায় ঘুরে ঘুরে কালী জ্বরে পড়েছিল। বাপ তাই কেবলই ঠাণ্ডা লাগা নিয়ে টিক্ টিক্ করে।

গ্রামের নাম খুঁটিগাড়া। বোলপুর থেকে কটা স্টেশন পরে। এখানে রেল লাইনের ধারে উঁচু ঢিবিতে পুরনো ঝুপড়িগুলোর ধারে-পাশে যে নতুন ঝুপড়িগুলো গজাচ্ছে কিছুদিন থেকে, তারই একটায় কালীরা থাকে। 'রা' আর কে, ব্রজ আর তার মেয়ে কালী, অথবা কালী আর তার বাবা ব্রজ।

বাড়ির আসল কর্তা কে, ব্রজ না কালী, এ বিষয়ে আশপাশের বাসিন্দাদের সংশয় আছে।

ঝুপড়িগুলো মানুষের বাসস্থান হলেও পাখির বাসার সঙ্গেই বেশী সাদৃশ্য ও বাসার! এর উপকরণে কাক পাখির বাসার মতই নেই হেন জিনিস নেই। ভাঙা ক্যানেস্ত্রা, কাটা বাঁশ, ছেড়া চট, কাঠি-খসা মাদুর, মচকানো ঝুড়ি, চটা-ওঠা রবার ক্লথ, উলিডুলি ক্যাম্বিসের টুকরো।...সবই কুড়নো মাল। কেমন করে যে বানিয়েছে সব, আর কেমন করেই ওর মধ্যে বাস করে, ভাবলে অবাক লাগে। দরজা মানে তো এইটুকু একটু গর্ত, এক টুকরো চটের ঝাঁপই তার কপাট। কী করে যে ঢোকে বেরোয় ওরাই জানে! 'ঝুপড়ি' নামটা খুব মানানসই।

অথচ কালী ওর মধ্যে বসেই টিনমোড়া আয়না ধরে চুলে 'ভাবন' করে, মুখে পাউডার মাখে, কপালে টিপ আঁকে, পায়ে আলতা লাগায়, আর ওর মধ্যে থেকেই সায়া-ব্লাউজের ওপর শাড়ি পেঁচিয়ে পরে, গলায় পুঁতির মালা দুলিয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে বেরিয়ে আসে।

ব্রজদের এই ঝুপড়িটা কিন্তু ব্রজর নিজের তৈরী নয়, ব্রজ এটা ভাগ্যক্রমেই পেয়েছে। কে বা কারা যেন এ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, পরিত্যক্ত ঝুপড়িটা থেকে এ ও সে চটের টুকরোটা, ছেঁড়া মাদুরটা, টেনে টেনে সরিয়ে, ঝুপড়ির গায়ে জানলা ঘুলঘুলি বানাচ্ছিল। বানভাসি ব্রজ কয়াল, আরো অনেক জলের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এইখানে এসে গড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু একা তো নয় যে, গাছতলায় পড়ে থাকলেও চলে যাবে, সঙ্গে একটা ধাড়ী-ধিঙ্গি মেয়ে, ঝুপড়িটার সন্ধান পেয়ে বর্তে গিয়েছিল। ওর কাছে তখন এইটুকুই স্বর্গ।

ক্রমশঃ আবার তার জানলা-ঘুলঘুলি বুজিয়েছে, কোথা থেকে মস্ত একখানা পলিথিন সীট্ জোগাড় করে চাপা দিয়ে বর্ষা, শিশিরের হাত থেকেও আত্মরক্ষা করছে।

রেল লাইনের ধারে, এদিক-সেদিকে আলতু-ফালতু মাল মেলে বিস্তর। ওই পলিথিন সীট্‌টা কারা যেন বৃষ্টির দিনে নতুন সুটকেস মুড়ে নিয়ে এসেছিল, ট্রেনে উঠে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মুচড়ে-কুঁচকে। ব্রজ কয়াল ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে। ঝুপড়িতেই যখন থাকতে হচ্ছে, তখন সেটা সাধ্যমত মজবুত করা ভাল।

'ভালমত একটা বাসা জোগাড় করে এখান থেকে উঠে যাব' এমন স্বপ্ন দেখে না ব্রজ, দেখবে কোন সাহসে? সর্বস্বান্ত হয়েই তো চলে এসেছিল।

ভাবলে দুঃখ হয়, এই ব্রজ কয়াল মেদিনীপুর জেলায় তার গ্রামে, আস্ত একটা গেরস্ত ছিল। ধান জমি ছিল, মাঠ-কোঠার দো-চালা ছিল, ঘরে ঘরে কাঁঠাল কাঠের তক্তপোষ ছিল। শোবার বিছানা বাদেও, 'সাঙায়' রাশিকৃত লেপ-কাঁথার সম্বল ছিল, কাঁসা-পেতলের বাসন ছিল। সিঁদুর-চন্দনের ফোঁটা দেওয়া কাঠের সিন্দুকে ভালমন্দ কাপড়টা-চাদরটা, র‍্যাপারটা, গরম জামাটা ছিল। বৌ মরে যাওয়ার পর ব্রজই তাতে কর্পূর কালোজিরের পুঁটলি দিয়ে দিয়ে রাখত।

বৌ-ও ছিল বৈকি হতভাগার। একদা মা-বাপ, ভাই-বোনও ছিল। তারা কেউ নেই, তবে বানে যায়নি তারা, গেছে মড়কে।...তা সে অনেক কালের কথা। বাচ্চা একটা মেয়ের দিকে তাকিয়েই ব্রজ সেই শূন্য পুরীকেই আবার সংসারের চেহারা দিয়েছিল। ধান জমি ভাগ চাষে দিয়ে নিজে ফ্রি হয়ে একটা জ্বালানী কাঠের দোকান দিয়েছিল মেয়ে বড় হওয়া ইস্তক। টাকাতো জমানো চাই। বিয়ে তো দিতে হবে মেয়ের?

তা দোকানটি লক্ষ্মী হয়ে উঠেছিল। ইদানীং লোকে ওর দোকান থেকে মড়া পোড়াবার কাঠও কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। শ্মশানটা তো দোকান থেকে খুব দূরে ছিল না।

রেঁধে-বেড়ে কালীকে খাইয়ে-দাইয়ে দোকানে এনে বসিয়ে রাখত ব্রজ। কালী পা ঝুলিয়ে বসে যত খদ্দেরের সঙ্গে গালগল্প করত। অবস্থায় অতিরিক্ত ভাল ভাল ফ্রক কিনে দিত ব্রজ মেয়েকে, তেল জবজবে করে চুল আঁচড়ে লাল ফিতে বেঁধে দিত, আর হাতে ধরিয়ে দিত মুড়ির মোয়া কি চিঁড়ের চাক্তি, নয়তো-বা দুখানা মিষ্টি বিস্কুট।

লোকে ওই ছোট্ট মেয়েটার মুখে পাকা-পাকা কথা শুনে মজা পেত খুব। বাক ফোটার কাল থেকেই কালী তার বাপের কথার সঙ্গী, দ্বিতীয় প্রাণী ঘরে না থাকায় মেয়ের সঙ্গেই ছিল তার সব কথা। অতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে কালী সাত সকালেই বাড়ন্তও হয়ে উঠেছিল বেশ, আর অতিরিক্ত কথা কয়ে কয়ে হয়ে উঠেছিল গিন্নী।

ব্রজ মেয়ের বিয়ের সংস্থান করতে পোস্ট অফিসের খাতাও করেছিল, রাখতো দু'পাঁচ টাকা করে টিপে টিপে সংসার চালিয়ে।

তা সে সবই তো বানের জলে ভেসে গেছে, মায় পোস্ট অফিসটাও।... সর্বস্বান্ত ব্রজ কয়াল আবার যে এখন বুকে বল, আর কোমরে গামছা বেঁধে পেটের ভাতের জোগাড় করছে, সে শুধু ওই মেয়ের শিরদাঁড়ার জোরে। অথবা বলতে পারা যায় তার বাক্যির জোরে।

বানের জল ঠেলে বেরিয়ে এসে মেয়েটাকে নিয়ে অনেক ঘাটের জল খেয়েছে ব্রজ, কিন্তু যখনি ভেঙে পড়েছে তখনই কালী শাসিয়েছে 'খবরদার বলে দিচ্ছি বাবা, তোমার ওই বাপ-পিতেমোর ভিটের জন্যে নিঃশ্বেস ফেলবেনি, আর কি ছিল, কি ছিল, বলে 'হায় হায়' করবেনি, মনে কর তোমার কিছু ছেল না। এই মাত্তর পৃথিবীতে এসে পড়লে তুমি একটা ধাড়ি পাহাড় মেয়ে ঘাড়ে করে।' ... বলেছে, 'বাবা আবার? বসে বসে কপাল চাপড়াবে তো, এই কালীমতি যে দিকে দু'চক্ষু যায় চলে যাবে।'

কালীর জোরেই বাপ মেয়েতে বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চড়ে চড়ে এখান-ওখান করেছে।

টিকিট চেকার উঠলে কালী আগেই এগিয়ে গিয়ে বলেছে, শুনুন, আমাদের টিকিট-ফিকিট নাই, এই আগে থেকেই বলে রাকচি।'

চেকার শুনে হতভম্বই হয়, এমন সত্যভাষণ কখনো শুনেছে কিনা মনে করতে পারে না—তবে 'ভাষণ' শুনে শাসন ছাড়বে, সবাই এমন নয়। এই বোলপুরে আসার সময়ই লেগে যায় খটাখটি, চেকার

গম্ভীরভাবেই বলে, 'আগে থেকে বলে রেখে কিছু লাভ নেই। হয় ভাড়া গুণে দিতে হবে, নয় নেমে যেতে হবে।'

কালীও গম্ভীর হয়, 'ভাঁড়ার পয়সা থাকলে টিকিট না কেটে উঠতুম নি।'

'ওঃ। তা পয়সা না থাকলে নেমে যেতে হবে।'

কালী আরো গম্ভীর হয় তখন, বলে, 'এই দুটো প্রাণীর জন্যি ইঞ্জিনের কয়লা বেশী পুড়বে? গার্ট সায়েবের মাইনে বেশী লাগবে?

ব্রজ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'আঃ কালী, সর্বত্র তোর কটকটানি। চেকনারসায়েব, আমরা বানভাসি, সর্বনাশী আমাদের সর্বস্ব খেয়েচে—'

'তুমি থাম তো বাবা!' কালী ঠিকরে উঠেছে, বানভাসিদের জন্যি গরমেন্ট কত রিলিপ খুলচে, নঙ্গর খানা খুলচে, কাপড়-কম্বল বিলুচ্চে, আর রেলগাড়িতে একবার বিনা টিকিটে উঠলেই ফাঁসির ব্যবস্তা?'

চেকার বিদ্রুপের গলায় বলেছে, 'ওঃ' তা বানভাসি তো সেই লঙ্গর খানাতেই যাওগে। নামো। নাহলে—'

কালী কড়া গলায় বলেছে, 'না হলে পুলিস ডেকে নাবিয়ে দেবেন তো? তাই দিন না। ভালই হয়, জেল হাজতেও ভাত আছে, কী বল বাবা? সেখেনেও হরিহর ছত্তরের মেলা, সেই দিশ্যাই দেকে আসি দশদিন। দুটো ভাতের চেষ্টাতেই তো এদেশ সেদেশ করা বাবা? চল। ... সায়েব ডাকুন আপনার পুলিস-মুলিস।'

কী জানি কী ভেবে চেকার সাহেব আর কিছু বলেননি, একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে নেমে গেছেন।

কালী বিজয় গৌরবে সমবেত জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছে, 'লোকেরা যখন বস্তা বস্তা বেআইনী চাল চালান করে, ত্যাখন সায়েবদের টনক নড়ে না। দেকেচি তো আমাদের দেশ গাঁয়ে, আইনির চে বেআইনির কারবারই অধিক।'

ব্রজ হতাশ হয়ে বলেছে, 'কালী, তুই চুপ করবি?'

কালী সতেজে জবাব দিয়েছে, 'চুপ কেন করব বাবা? হক্ কতা কইচি বৈ মিচে কতা কইনি।'

এই কালী!

কাজেই এই 'ঝুপড়ি নগরে'ও আপন খ্যাতি বিস্তার করতে বেশীদিন সময় লাগেনি তার। কালী এখন সর্বজন পরিচিতা।

এদিকে ক্রমশঃ ব্রজরও 'জব ওয়ার্ক' মারফৎ মন্দ আয় হচ্ছে না। ব্রজকে যে কত রকম কাজ করতে দেখা যায়, অথবা ব্রজ যে কত রকম কাজ করে। ব্রজ কখনো গার্ড সাহেবের ফরমাস খাটছে, কখনো স্টেশন মাস্টারেব। কখনো ব্রজ বুকিং অফিসের মধ্যে ঢুকে বসে টিকিট বাছাইয়ে সাহায্য করছে, কখনো এঞ্জিনের কয়লা এগিয়ে দিচ্ছে। এই কাজটা দুচক্ষে দেখতে পারে না কালী, কিন্তু ব্রজ কী করবে, যে যখন কামাই করে ছুটি নেয়, ব্রজকে যে কেমন করে সবাই সেই খালি খাচাটায় পুরে দেয়। বাঁধা মাইনের কাজ কিছু নেই, এমনি উঞ্ছবৃত্তিতেই চলে, তবু আজকাল যেন হচ্ছে দু'পয়সা।

তাই বোলপুরের মেলায় মেয়ের জন্যে মবলগ খরচ করে ফেলেছে ব্রজ, কালীর পরণে এখন যা কিছু, সবই মেলা তলায় কেনা। মেলায় বারোমেসে হাটের থেকে দাম বেশী, তবু মেয়েকে নিয়ে মেলায় ঘুরে এটা সেটা কিনে দেওয়ার একটা আলাদা সুখ আছে।

কালীও জোর করে বাপের জন্যে একখানা জোর বাহারী সার্ট কিনেছে, তবে সেটা আর ব্রজ লজ্জায় পরতে পারে না। মেয়ে রাগ করলেই বলে, 'ভাল জামাটা একটা ভাল দিন দেখে গায়ে দেব কালী।'

কালী অনায়াসে বাপের মুখের ওপর বলে, 'তাহলে কালীর ছেরাদ্দর দিন পোর ব্রজ কয়াল, একটা দিনের মত দিন।' রাগ হলেই কালী বাপকে নাম ধরে ব্রজ কয়াল বলে ডাকে।

তবু এত লাঞ্ছনাতেও নতুন জামার টিকিটটা খুলে ফেলে দিয়ে জামাটা গায়ে ঠেকায় না ব্রজ। কারণ ব্রজ মনে মনে একটা সুখস্বপ্ন দেখে রেখেছে। জামাটা একটা ভাল কাজে লাগাবে। আর এ স্বপ্নও দেখে রেখেছে, হাতে টাকা এলেই একটি একটি করে জিনিস পত্তর কিনবে মেয়ের বিয়ের জন্যে।

তা হলেও, দেশে থাকতে মেয়ের বিয়ের সম্পর্কে যে গুরুতর একটা অবশ্য কর্তব্যবোধ ছিল সেটা যেন শিথিল হয়ে গেছে। ... এখন শুধু মনে মনে সাধ স্বপ্ন।

হয়তো এই কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যাওয়ার অন্তরালে ব্রজর এখানকার পরিবেশই দায়ী।

এই ঝুপড়ির সংসারে কালী-বিহীন নিজেকে ভাবতে দারুণ অসহায় লাগে ব্রজর। কালী বিয়ে হয়ে বরের ঘরে চলে গেছে, আর কালীর হাতের ওই হাড়ি-কুঁড়ি কৌটো-শিশির সামনে ব্রজ বসে আছে, ভাবলেই হাত-পা হিম হয়ে আসে!

ব্রজদের 'খণ্ডখোলা' গ্রামে থাকতে এমনটা হত না। সেখানে চিরকালের বসতভিটে, আশপাশের জ্ঞাতিগুষ্টি, নিয্যস ভরসার একটা জীবিকা, এরা সবাই বল জুগিয়ে জুগিয়ে ব্রজকে আস্ত একটা মানুষের পরিচয়ে রেখেছিল।

এখানে ব্রজ যেন 'মানুষ' নামের জীবনটার ভাঙাচুরো কতকগুলো অংশের সমষ্টি। ব্রজর এখনকার জীবিকার চেহারার সঙ্গে যার মিল আছে।

কালী যেন সেই ভাঙাচোরা আর বাঁকাচোরা অংশগুলো মুঠোয় চেপে ধরে আস্তর মত দেখতে করে রেখেছে। মুঠোটা আলগা হয়ে গেলেই ওই অসমান অংশগুলো ছড়িয়ে পড়ে এলোমেলো হয়ে যাবে।

অবিশ্যি স্পষ্ট করে এতসব ভাববার ক্ষমতা ব্রজর নেই, তবে মনের মধ্যে ওইরকম একটা 'সব বেঠিক হয়ে যাবে' ভাব যেন ব্রজর সব ঝাপসা করে দেয়, ব্রজ পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় না।

তাই ব্রজর এখন মেয়ের বিয়ের জন্যেও তেমন উচাটন হয় না। যেমন বানের আগে হত। আর মেয়েকে নিয়ে তেমন কড়াকড়িও করে না। মেয়ে এখানকার সাঁওতালী মেয়েদের দেখাদেখি টাইট্ করে শাড়ি পরে আর খোঁপায় ফুল গুঁজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়, ব্রজর চোখে আরামদায়ক না ঠেকলেও বলতে কিছু পারে না। মেয়ে-বৌয়ের আব্রু নিয়ে কড়াকড়ি এমন একখানা সংসারই বা দেখতে পায় কই ব্রজ?

দেশে-ঘরে যতই দীনদরিদ্র নিঃস্ব পরিবার থাকুক, সর্বহারা নয় তারা। কিছু না থেকেও যেন তাদেব সব কিছু আছে। ...বানের জলে সেই সব কিছু টুকু হারিয়ে ফেলেই যেন লরবড়ে হয়ে গেছে ব্রজ। এখন যদি ওকে বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করে বসা হয়, আগের মত গড়গড়িয়ে বলতে পারবে না, পিতার নাম ঈশ্বর রাধামোহন কয়াল, পিতামহের নাম ঈশ্বর মথুরামোহন কয়াল, প্রপিতামহের নাম, না চট করে বলতে পারে না। ভেবে-চিন্তে মনে আনতে হবে। ...মাঝে মাঝে মনে হয় ব্রজর, সেটা বোধহয় পূর্বজন্ম। এই তিন-চারটে বছরে কখনো এমনভাবে জীবন বদলে যেতে পারে?

মন হু হু করে ওঠে।

কালী কিন্তু ওই পূর্বজন্মটা যেন জীর্ণবস্ত্রের মতই ত্যাগ করেছে। নিজের মন হু হু করা তো দূরের কথা, কোন সময় বাপের স্মৃতি-উদ্বেল ভাব দেখলে, তাড়না করে তাড়ায় সে ভাবকে। অনায়াসেই বলে, 'বলি বাবা, মন্দটা কী আছে এখেনে? যা ইচ্ছে তাই করছ, যেমন ইচ্ছে চলছ. ওই কে কী মনে করল বলে তটস্থ হতে হচ্ছে? এখেনে তোমার বেঁচে থাকার কোন টেক্‌সো খাজনা নেই। আর দেশে-গাঁয়ে? উঠতে বস্‌তে টেক্‌সো। জগৎ-সংসারে যে যেখানে আছে তাদের মান রাখ আর হাত জোড় করে থাক. ওই বুঝি কার গোঁসা হল, ওই বুঝি কার ক্রোধ হল। যেন চোর দায়ে ধরা পড়ে থাকা। কেন রে বাপু? জন্মভোর অপরাধী হয়ে থাকা কিসের জন্যে? সেই যে বলে না, ভিখ দেবার কেউ নয়, ধিক দেবার কুটুম? তোমার গাঁ-ঘরে তাই। এখেনে তোমার কেউ ধিক্ দিতে আসছে—ব্রোজো তুই এখনো মেয়ের বে দিলিনে? ধাড়ি-ধিঙ্গী মেয়ে নিয়ে এখনো বসে আচিস?

শেষের দিকটা বাপের জ্ঞাতি পিসি হরিবালার বাচনভঙ্গীর নকল করে হেসে লুটোপুটি খায়। ব্রজরও যেন তখন মনে হয়, তা সত্যি, এটাই বা মন্দ কী? নির্দায় জীবনের মতন আরামের কী আছে?

তবে—সংস্কার কি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়?

ওই পবনটাকে দেখতে পারে না ব্রজ। বড্ড যেন মস্তান মার্কা, অথচ কালীর সঙ্গেই যেন তার দিনমান

ভোর যত দরকার। সব সময় শুনবে, 'কালী কোথায়? তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

একদিন ব্রজ বলে ফেলেছিল, 'কালী একটা ডব্‌কা-মেয়ে, তার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা তোমার এত কী দরকার হে বাপু?'

তদবধি যেন একটু কম দেখা যাচ্ছে তাকে। বলতেই হবে এই টাইটটি দেওয়া দরকার ছিল।

অবিশ্যি টাইটে সায়েস্তা হবার ছেলে পবন নয়। কিন্তু কালীর যে কড়া হুকুম 'আমার বাবাকে যদি কোনদিন একটা কথা বলবি, তোর সঙ্গে হয়ে যাবে।'

ওই হয়ে যাবার ভয়ে পবন নস্কর আর ব্রজ কয়ালের মুখে-মুখে কথা কইতে আসে না এবং সেই টাইটের প্রতিক্রিয়ায় ব্রজ যতক্ষণ না পাড়াছাড়া হয় ততক্ষণ কালীরও ছায়া মাড়ায় না।

পরের ছেলেকেই চুপিচুপি টাইট দিয়ে রেখেছে ব্রজ, নিজের মেয়েকে বলতে পারে না কিছু। বলবেই বা কী নিয়ে?

মেয়ের কি কখনো কোন বেচাল দেখেছে? কারুর সঙ্গে ঢলাঢলি, গলাগলি, ওই পবনটার সঙ্গেও তো কথা কয় যেন কাটোয়া সেপাই। একশো পুরুষের মাঝখানে বসে আড্ডা দিতে পারে কালী আর একটা পুরুষের মত! ব্রজ কয়াল তো নিজেই ওই ডাকাবুকো মেয়ের ছত্রছায়ায় থাকে।

ঢিল ছোঁড়ার পর কালী আশ-পাশের আর দু'একটা ঝুপড়ির কাছে গিয়ে কান পাতল, না কোনখান থেকে পবনের গলার সাড়া উঠছে না।

দুর ছাই! বোধ হয় মনের ভ্রম। •

ঠাণ্ডা বাতাস বড় জোর বইছে, ঝুপড়ির গায়ে চাপানো চট-ক্যাম্বিস-মাদুর-চাটাই সব যেন উড়ে যাবার তাল করছে, তাদের সেই চেষ্টার একটা শব্দ উড়ছে—মড়মড়, খসখস, ঝাপস ঝাপস।

ওদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কালী। সহজে উড়ে যাবে না, আর কেউ যা না করেছে, কালী তাদের ঘরটায় তাই করেছে; মোটা একটা দড়া দিয়ে গোল করে ঘিরে বেঁধে। সে দড়ার খুঁট দুটো মাটিতে গোঁজ পুঁতে, তার সঙ্গে বেঁধে রেখেছ। লোকে তাই ঠাট্টা করে বলে 'ব্রজর তাঁবু'। তাঁবুর দড়ির খুঁট ঠিক আছে কিনা দেখে কালী মাথা নীচু করে ঢুকতে গিয়ে অবাক। ঘরের মধ্যে এসে বসে আছে লক্ষ্মীছাড়া।

ঘরের মধ্যে শীতের পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোটুকু যেন কাক-জ্যোৎস্নার মত। আলোর একটু আভাস দিচ্ছে, তাও দরজার সামনেটায়। বাকি চারিদিকে ঘন অন্ধকার।

পবন বসেও আছে দরজার দিকে পাশ করে। ওই অন্ধকারেই তবু কালী ঠিক বুঝতে পারছে পবনের গায়ে সেই ডোরাকাটা মোটা গেঞ্জিটা গেল শনিবারের হাটে কিনে এনেছিল পবন কালীর গঞ্জনায়।

শীত হলেও গায়ে চাদর জড়িয়ে বেড়াতে পারে না পবন, অথচ ঘাড়-ছেঁড়া একটা সার্টের অধিক সম্বলও নেই, তাই কালী কড়া হুকুম দিয়েছিল, 'এই হাটে যদি একটা 'সুয়েটার' না কিনবি তো কালীর খাঁড়া পড়বে তোর ঘাড়ে। হিম লাগিয়ে লাগিয়ে মরবি নাকি?

পবন অগ্রাহ্য ভরে বলেছিল, 'ওসব হিমটিম বাবু-ভাইদের জন্যে, দেখিস না তাদেব চাপানোর বহর। গরীবের আবার হিম!'...তবু কিনে এনেও ছিল এই মোটা গেঞ্জিটা। সোয়েটার কেনা তার সাধ্যের বাইরে এটা ঘোষণা করে দেখিয়ে গিয়েছিল।

ওই গেঞ্জিটার সঙ্গে পবন একটা ডোরাকাটা পায়জামাও পরেছে। গলায় একটা রুমাল বাঁধা, তাও নজর এড়াল না কালীর। যাক, তবু হিমটাকে মানছে। কিন্তু এভাবে এসে চুপ করে ঘাড় গুঁজে বসে থাকবার মানেটা কী?

ক'দিন পবনের দেখা নেই, কেউ বলে লাভপুর গেছে, কেউ বলে রামপুর হাট। এত কী রাজকার্য পবনের? পবনের বন্ধু সত্য ঘুরছিল রেল লাইনের ওপারে, কালী তাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডেকেছিল, সত্য না এসে ভারী একটা অভব্যতা করেছিল। মুখের দুপাশে হাত আড়াল করে চেঁচিয়ে বলেছিল 'পবন ভাইঝির পাত্তর দেখতে গেছে—'

যেন কালী শুধু ওই জন্যেই ডাকতে পারে ওকে। আর কোন কারণেই নয়। ওইভাবে চেঁচানো একটা ভদ্রলোকের কাজ? তাও কালী লাইনের এপারে উঁচু টিবির ওপর, আর সত্য ওপারে মাটিতে, অতএব মুখটা তুলে চেঁচাতে হয়েছে। সেই থেকে ভেবে রেখেছে কালী, আসুক পবন, তার বন্ধুর মুণ্ডুপাত করছি। কিন্তু পবন ভাইঝির পাত্তর দেখে ফিরেও এদিকে আসেনি।

আজ ব্রজ সিউড়ি গেছে, রাত দশটার আগে ফিরছে না, তাই ওর বাস ছেড়ে দেওয়া দেখে এসেছে।

কালী ওকে দেখে কড়া গলায় বলে, 'সন্দ্যের অন্ধকারে ঘরের মদ্যি ঢুকে বসে আছিস যে? লাজ-লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছিস না কি পবন?'

কালী ওর বাপকে অভয় দেয়, 'এখেনে তোমার মানুষ সমাজকে টেক্সো দিতে হয় না।' কিন্তু কালী নিজেই সেই 'সমাজ' নামের অদৃশ্য ঘাতকের ট্যাক্সটি জোগান দেয়। বলে, 'লাজ-লজ্জার মাথাটা খেয়ে বসে আছিস না-কি রে পবন?'

পবন দুই হাঁটু তুলে মেঝের মাটিতে বসে মাটিতে এক টুকরো পাথরকুচি নিয়ে আঁক কাটছিল। তেমনি কাটতে কাটতেই ঘাড় গুঁজে বলে, 'আর কতকাল লাজ-লজ্জা ধরে বসে থাকতে হবে শুনি?'

কালী নিতান্ত নির্মারিকের মতো বলে, 'বলেই তো দিইছি কত দিন।'

'ওঃ, সেই বোলপুর বাজারে দোকান দিয়ে না বসা অবদি তো? তা দোকান এখন হচ্ছেটা কী দিয়ে তাই শুনি? দাদার সঙ্গে ভাগের জমি, নিজের ভাগটা বেচে দিয়ে চলে যাব তার জো নেই। বাপ-ঠাকুদ্দার প্যাঁচ কষা আছে, কেউ ভাগ ভেন্ন হয়ে জমি বেচতে পাবে না। তা দাদার তো নিত্যি ফ্যাচাং। এই বলে গম রুই, এই বলে আখ বুনি, এই বলে ভুট্টার দর আছে বাজারে, এই ফ্যাচাঙের তালে তাল দিতে হবে।...তা খাটছি খুটছি, তাই দাদা সদয়, জমির ভাগ বেচে দোকান দেব বললে দাদা ঠ্যাঙ ভেঙে ঘরে শুইয়ে রেখে দেবে।'

কালী ইত্যবসরে ঘরের কোণে কাঠের ফুলকি জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট সব উনুন মজুত আছে কালীর, নানা কাজের জন্যে। উনুনে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে বলে কালী, 'তাহলে ওই দাদার খামারে মুনিষ খাট, আর বৌদির পা-পুজো কর।...কালীমতির আশা ছাড়।'

পবন ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বৌদির পা-পুজো করতে চাই না আমি, ওর সঙ্গে আমার দিনভোর লাঠালাঠি। নেহাৎ দাদা আর ওই ভাইপো-ভাইঝি দুটোর জন্যেই—'

কালী একটা ছোট মাটির হাড়িতে জল চাপিয়েছিল। তার মধ্যেই একটু চায়ের পাতা আর একটু গুড়, আর চামচ দুই দুধ ফেলে দিয়ে হাতার বাঁট দিয়ে নেড়ে নিয়ে বলে, 'তোর দাদা লোক ভাল। দেখে ছেদ্দা আসে, কিন্তু তোর ডিপে-মুখী বৌদিকে দেখলে হাড় জ্বলে যায়: ওর সঙ্গে ঘর করা আমাব কম্মো নয়।'

পবন মলিন গলায় বলে, 'তবে তুই কী বলতে চাস বল? আপন জনের সঙ্গে সকল সম্পক্ক ত্যাগ করে, তোকে নিয়ে অকূলে ভাসব?'

কালী একটা এনামেলের গেলাসে চা ঢেলে পবনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে চা ঢেলে আঁচলের কোণ দিয়ে চেপে ধরে ফুঁ দিচ্ছিল। ফুঁ থামিয়ে বলে, 'আমায় নিয়ে অকূলে ভাসবি, এমন কথা বলেছি আমি তোকে? যা না বাবা, নিজের পথ দেখগে না। বানভাসি কালীমতি কয়ালকে তোর দরকারটা কী?'

পবন চায়ে হাত দেয না, তেমনি মনমরাভাবে বলে, 'দরকারটা যে কী তা যদি তোকে ঢাক পিটিয়ে বলতে হয় কালী, তাহলে তো নাচার।...দরকার আমার সংসার করার, দরকার আমার তোকে। বলি বয়েস কি বসে থাকবে?'

আসল কথা ভাইঝির জন্যে পাত্তর দেখতে গিয়ে পবনের মন বেদম বিগড়ে গেছে। সে ছোঁড়াটা বোধহয় হাঁটুব বয়সী, তার কিনা বিয়ের তোড়জোড়। দন্ত বিকশিত করে যখন এসে বসল ঘাড হেঁট করে, তখন পবন তো থ। এই বর! ছোঁড়ার যে এখনো বলতে গেলে গোঁফ গজায়নি!

চুপি চুপি বলল, "দাদা, এ যে একটা বাচ্চা!' বলতে গিয়ে দেখল দাদার মুখ আহ্লাদে উদ্ভাসিত। দাদা সেই উদ্ভাসিত মুখে আরো চুপি চুপি বলল, 'কমলিও তো এই সবে দশ ছাড়িয়েছে।' তবু ওই ছেলেটার আহ্লাদ উপচানো মুখ দেখে পবনের মনে হল, ছেলেটা গোপাল গোপাল হলে কী হবে, আসলে ইঁচড়ে পাকা।

মোট কথা মেজাজটাই বিগড়ে গেল।

ভেবে ফিরল, গিয়েই একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে। কালীর ওসব দোকান বাতিক ছাড়াতে হবে। বোলপুরে দোকান দিতে না পারলে বিয়ে করবার রাইট জন্মাবে না। এ কেমন কথা!

তাই রেগে রেগেই বলে, 'বয়েস কি বসে থাকবে?'

কালী একটু দার্শনিক হাসি হেসে বলে, 'তা কি আর থাকে রে পবন? এ পৃথিবীতে কেউ বসে থাকে না, বয়েসই বা থাকবে কেন? এক সময় আমারও দশ বছর বয়েস ছিল, বাবা তখন থেকে আমার বে'র জন্যি ক্ষেপে উঠেছিল। এই কনে দেখা, এই পাত্তর দেখা! তা—'

কালী একটু হাসল, 'রক্ষেকালী মেয়ের যুগ্যি বর আর খুঁজে পেল না বাব। সবার খুঁত কাটে, আর নাক কোঁচকায়। ওর বাবা মাতাল, ওর মা দজ্জাল, ওর চোখটা ট্যারা মতন, ও যেন একটু নেংচে হাঁটে, ঠগ বাছতে গাঁ ওজোড় হয়ে গেল।'

পবন চায়ের গেলাসটায় একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলে, 'ভালই হয়েছিল। নইলে পবনের জন্যে তোলা থাকতিস না। প্রাণে কোন সুখ নেই রে কালী।'

কালী বেশ তাড়া দেওয়া গলায় বলে, 'হয়েছে, সন্ধ্যেবেলা আর একা ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে মন-প্রাণের দুঃখু-গাথা গাইতে হবে নি। চা শেষ করে পালাও।'

পবন বলে, 'ব্রজরাজ তো শিউড়ি গেছে।'

ব্রজকে পবন দাদাও বলে না, কাকাও বলে না, বলে ব্রজরাজ।

কালী রাগ করলে বলে, "একেবারে 'বাবা' বলবার জন্যে ডাকটা তুলে রেখেছি রে কালী। দাদা, কাকা, মামা যা-হোক একটা বলে অভ্যেস খারাপ করতে চাইনে।"

কালী বলল, 'বাবার আড়ালে এসে গালগল্প করা আমার পছন্দ হয় না পবন, মনে হয় যেন অকম্ম করছি। বীরের মতন আসবি, বলবি, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বে দিন, তবে তো বলি বেটাছেলে!'

পবন ঢকঢক করে চাটা খেয়ে নিয়ে গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে বলে, 'তা বীরপুরুষ হতে কি পারিনে ভেবেছিস? ব্রজরাজের নাকের সামনে দিয়ে সুভদ্রা হরণও করতে পারি। তোব যে আবার ওই এক বায়নাক্কা! বাপের কালে শুনিনি—শহর বাজারে দোকান দিতে না পারলে পুরুষের বিয়ে হয় না।'

কালী গম্ভীরভাবে বলে, 'দোকানের কথা নয় পবন, ওটা উপলখ্যি, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দরকার, সেটাই হচ্ছে কথা। দাদা-বৌদির সংসারে যে কেমন থাকিস তা তো আর আমার জানতে বাকি নেই। এখন তোর সঙ্গে গিয়ে চাকরের বৌ চাকরানী হয়ে থাকতে হবে, এছাড়া আর কিছু না। কালীর দ্বারা ও পোষাবে নি, এই আমার সাদা বাংলা।'

পবন মনমরা ভাবটাকে তেজী করে বলে, 'তা বিয়ের দু'দশ দিন পরেই যদি হয় ওসব, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'দু' দশ দিন পরে তুই কোন তালুক থেকে টাকা আনবি?'

'সে হয়ে যাবে।'

কালী বলে, 'তা কি হয়? তখন তোর চেষ্টা চলে যাবে।'

পবন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তার মানে তুই, আমার মনপ্রাণ বুঝছিস না, আমায় হতভাগা বলে ঘেন্না করিস, এই এক ফিকির করে এড়াতে চাস।'

কালী নীচু হয়ে বসে হ্যারিকেন জ্বালছিল, সেটা জ্বেলে উঁচু করে তুলে পবনের মুখের সামনে ধরে বলে, 'এতদিন দেখে কালীকে তোর ফিকিরবাজ বলে মনে হল?'

আলোটা যে শুধু পবনের মুখেই পড়েছে তা নয়, কালীর গাঢ় কালো রংয়ের মাজা কাট-ছাঁটের মুখটার একপাশও আলোকিত করছে। ওই আলো-ছায়ায় কালীকে যেন একটা ভয়ঙ্করী প্রতিমার মতই দেখাচ্ছে।

পবন আস্তে ওর আলো ধরা হাতটার বাহুমূল চেপে ধরে আস্তে বলে, 'আমায় মাপ কর কালী! আমার মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলেছি।'

কালী আলোটা নামিয়ে রেখে শান্ত গলায় বলে, 'মাথা বেঠিক করতে নেই পবন, ভগবানে ভরসা রাখতে হয়। আমি বলছি—তুই কোনখান থেকে ঋণ কর্জ করে ছোট্ট একটা দোকান পেতে বোস, দেখতে দেখতে বাড়-বিদ্ধি হবে।'

পবন হতাশ গলায় বলে, 'আমায় কে ঋণ-কর্জ দেবে? আমার কী আছে?'

কালী জিদের গলায় বলে, 'তোর জমিজমা আছে।'

'দূর, সে সবই তো দাদার হাতে।'

কালীর মুখে একটু অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে, বলে, 'আর যদি আমি কর্জ করে এনে দিতে পারি? নিবি?'

'তুই?' পবনের গলায় বিদ্রূপের সুর ফোটে।

বলে, 'তোরই বা কী সম্পত্তি আছে? তাহলে নিজেকেই বন্ধক দিবি বল!'

কালী হঠাৎ খুব হেসে ওঠে, 'এই তো সবই বুঝে ফেলেছিস, কে বলে পবনের বুদ্ধি নেই! তা যা এখন বাড়ি যা।'

পবন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ তোর একটা কথা না নিয়ে নড়ছি না। দাদা বৌদিকে বলছিল, 'এই সঙ্গে পবনার বিয়েটাও লাগিয়ে দিলে হয়, এক আভ্যুদিক ছেরাদ্দর খরচে মিটে যায়।' তা বৌদি বলল, 'মেয়ের পাত্তর তো ঠিক করে এলে, ভাইয়ের কনেও ঠিক করে এসেছ নাকি?' দাদা বলল, 'মেয়ের আবার ভাবনা, এই খুঁটিগাড়া গ্রামেই কত যুগ্যি মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।' কালী ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, 'তবে ওই গড়াগড়ি খাওয়া মেয়েই একটা কুড়িয়ে নিয়ে বিয়েয় বোস গে যা।'

পবন বলে, 'তুই আমার দুঃখুটা বুঝিস না কালী, এটাই আমার সবচেয়ে দুঃখু! তোর কাছ থেকে সরে গেলেই আমার প্রাণের মধ্যে যেন কে কোদাল কোপায়, তোর কাছে আসবার জন্যে বুকের মধ্যে যেন কামান দাগে। গাধা খাটুনী খেটে মরি, সব যেন বিষ লাগে। ঘুরে-ফিরে বেড়াই, মনে হয় পিথিবীটার যেন কোন মানে নেই।'

কালী গম্ভীর গলায় বলে, 'সব কথা অত খুলে বলতে নেই পবন। যে খুলে খুলে বলে না, তার যে কিছুই হয় না, তা ভাবিস না। তবে ভাবিস নি আমি রাজি হলেই তোর দাদা-বৌদি রাজি হবে। নিজের পায়ের তলার মাটির কথা অমনি বলিনি রে!'

পবন উত্তেজিতভাবে বলে, 'রাজী হবে না মানে?'

'হবে না তাই বলছি। কথা তুলে দেখিস।'

'আচ্ছা এখনি গিয়ে বলছি।'

পবন যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিন্তু ওরা যদি রাজী হয়?'

কালী হেসে উঠে বলে, 'তাহলে আমিও রাজী আছি। তবে তোর বৌদির সঙ্গে আমার বনবে না, তা আগে থেকেই বলে রাখছি। বাড়িতে কাক উড়বে, চিল পড়বে।'

'পড়ুক উড়ুক।' বেশ বীরদর্পে বেরিয়ে পড়ে ঢিবি চাপা এবড়ো খেবড়ো দিয়ে অবলীলায় নেমে যায় পবন।

কালী ওই ঠাণ্ডাতেও দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে কেমন করে নেমে যাচ্ছে পবন।

ওদের এই ঢিবিটার থেকে রেল লাইন অনেকটা নীচুতে। গাড়ি আসে-যায়, ধারে দাঁড়িয়ে দেখে কালী।

প্রথম প্রথম বাবা বলত, 'সর্বনাশ ঘটাবি কালী, সরে আয়! পড়ে মরবি।' ক্রমশঃ আর বলে না, দেখে কালীর এ একটা নেশা। রেলগাড়ির যাওয়া-আসা দেখা।

এই খুঁটিগাড়া গ্রামে সব গাড়ি থামে না, হুশ হুশ করে আসে, হুশ হুশ করে বেরিয়ে যায়। দিনান্তে একখানা ট্রেন যেন বুড়ি ছুঁয়ে যায়। এক মিনিট মেয়াদে তার থামা। এ অঞ্চলের আসল সম্বল বাস! ব্রজ সেই বাসেই আসবে। রাত নটায়। ফিরতি বাসে ফিরবে।

শীতের রাতে একলা ওই ঝুপড়ির মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই, বেলা থাকতেই তো দু'খানা রুটি গড়ে কাজ সেরে রেখেছে। আর সকালের দরুণ ডাল, আলুর তরকারি আছে। শীতকালে এই একটা সুখ। দুবেলা রাঁধতে হয় না।

কিন্তু এত 'সুখ' নিয়েই বা করবে কি কালী? কাজের তার অন্ত নেই, অথচ অবকাশও বুঝি অফুরন্ত। বাঁধা, বাসন মাজা, জল তোলা, কাপড় কাঁচা, ক্ষার সেদ্ধ, কাঠ কাটা, কয়লা ভাঙা, পাড়া বেড়ানো, এত সব করেও কালী অবকাশ নিয়ে হাঁকপাক করে।

শীতকালটা আরো বিশ্রী। 'অবকাশ'টা যেন কালীকে কেটে কেটে নুন দেয়।

এই এখন গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা, ভাবতে গিয়ে যেন নিজের ওপর ঘেন্না এল কালীর। অথচ এই জনশূন্য জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে? শেয়াল-কুকুর আছে, 'মানুষ' জাতটার মত দেখতে শেয়াল-কুকুরেরও অভাব নেই সংসারে।

তা তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কালী ধারালো ঝকঝকে একখানা টাঙ্গি কাছে রাখে। রাতে বিছানার মাথার কাছে রাখে।

এই রাখার কথা সবাই এখন জেনে ফেলেছে, তাই কালীর দিকে কেউ আর এখন নজর দিতে সাহস করে না। তাছাড়া শুধুই তো কালী নয়, পবন আছে না? পবনের বার্তাটা পবনেই রটেছে, 'পাপচক্ষু' লোকেদেরও তো প্রাণের ভয় আছে! পবনের জিনিসে চক্ষুদান করবে, এত সাহস এই খুঁটিগাড়া গ্রামে নেই কারুর?

কালীর কাছেই পবন কেঁচো! কিন্তু অন্য লোকের কাছে পবন দুর্দান্ত। ভীতিকর। যেমনি বেপরোয়া, তেমনি রগচটা! কথায় কথায় কারও সঙ্গে বচসা হলে পবন এক কথায় ঘুঁষি তুলতে পারে, আর দু'কথায় মাথা ফাটাতে পারে। কালী যে ওকে কী মন্ত্রে বশ করেছে? কালী মরতে বললে মরতে পারে পবন। কিন্তু কালী? ওইখানেই একটা মস্ত প্রশ্ন চিহ্ন।

পবন কালীর জন্যে যতটা অস্থির, কালী কি তাই? কালী ঠিক বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে নিজে প্রশ্ন করে কালী, আমি পবন বিহনে চক্ষে অন্ধকার দেখি? পবনের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা না হলে কি আমি ওই রেল লাইনে গলা পেতে শুতে যাব?

এ প্রশ্নের সদুত্তর পায় না কালী।

ওর মন যেন অনেক অনেক দূরে কোথাও ভেসে যেতে চায়। ঝুপড়ির মধ্যে থেকে কালী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে। পবনের বাড়িঘর কালী দেখেছে। ঝুপড়ির তুলনায় স্বর্গ! মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, কিন্তু ঘর আছে অনেকগুলো, দাওয়া আছে, উঠোন আছে, পাতকুয়ো আছে, আবার খেড়কিতে পুকুরও আছে। এ বাড়ির বৌ-ঝির আরাম কত! তাছাড়া খাওয়া-পরার দুঃখু নেই। নিশ্চিন্তে রাঁধো-বাড়ো, গোয়াল নিকোও, ঢেঁকিতে পাড় দাও, চিঁড়ে কোটো, মুড়ি ভাজ এবং মাঝে মাঝে যোগাড়-যন্তর করে বোলপুরে গিয়ে সিনেমা দেখে এসো, ব্যস।

যাকে বলে সংসার-সুখ।

সুখ বৈকি! স্বামীও চোখ ছাড়া হয়ে এখান-সেখান ঘুরছে না পয়সার ধান্ধায়। সর্বদা চোখের ওপরই স্থিতি। ধান, চাল, অড়র, মটর, ছোলা, কলাই নানান জিনিসের চাষ পবনদের। পবনের দাদা নবীনের খামখেয়ালে তো আরো রকম রকম কারবার!...এখন আবার পোলট্রি করতে ঝুঁকেছে। তবে ইচ্ছেমত ডিমও খাবে।

কী আশ্চর্য! তবু কালী পবনকে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্ররোচনা দিচ্ছে। কালী কি বুঝছে না এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ দুর্গটির মূল্য কত! আর এর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভাগ্য ফলাবার চেষ্টার ঝুঁকি কত!

নাঃ, কালী বুঝছে না। এত বুদ্ধি ধরে কালী, তবু এত সহজ হিসেবটা বুঝতে পারছে না। কালী দূরের স্বপ্ন দেখছে।

পবন চোখ ছাড়া হয়ে অনেকটা দূরে চলে গেল, তবু কালী দাঁড়িয়েই থাকল। শীত করছে, শাড়ির প্যাঁচানো আঁচলটা আলগা করে নিয়ে পিঠটা ঢাকলে শীত কমে, তাতেও যেন আলিস্যি লাগছে। পবনের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে কালীর মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মনোভাবের উদয় হল। কালী ভাবুকের মত ভাবল, ওই ছেলেটা যদি এইভাবে আমার জীবন থেকে একেবারে চলে যায়, যেমন আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, তেমনি চিরতরে মিলিয়ে যায়, তাহলে কি আমি বুক ফেটে মরে যাব?

পবনের কথা ভাবতেই ওই 'ছেলেটা'ই মনে হল কালীর। তাই হয়। মুশকিল তো সেইখানেই। কালীর থেকে তো পবন চার বছরের বড়, তবু কেন কালীর পবনকে 'ছেলেমানুষ' বলে মনে হয়: কেন ওর কথা ভাবতে গেলে 'ছেলেটা' ছাড়া আর কোন বিশেষণ মনে আসে না?

পবনের ওই ভালবাসার তীব্রতা, কালীকে পাবার জন্যে আকুলতা, এটা যেন কালীর কাছে একটা দুরন্ত ছেলের বায়না আব্দারের মতো লাগে। যেন সে তার একটা শখের জিনিস চাইছে, যেটা তার পাবার কথা নয়।

তবু যদি কালী সেটা ওকে দিয়েই দেয়। তা সে দেওয়ার ভাবটা হবে, 'যাকগে, মরুকগে, নিকগে। না নিয়ে যখন ছাড়বেই না দেখছি।'

কিন্তু এইটা কি আত্ম-সমর্পণের ভাষা?

কালী বইয়ের মত করে ভাবতে না জানুক, কালীর মধ্যে অনেক ভাবের তরঙ্গ ওঠে, কালী সে তরঙ্গে আলোড়িত হয়।

নাঃ, আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না, হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠেছে। ...বাবার আসতে এখনো তিন ঘণ্টা। সাড়ে ছটার সময় যে ট্রেনটা এখানের লাইন কাঁপিয়ে গুম গুম করে চলে যায় না থেমে, সেটা এখনো আসেনি। সেটা চলে গেলে তবে কালী এখান থেকে যাবে ভাবছিল, কিন্তু দাঁড়াতে পারল না, দারুণ শীত ধরেছে। ফিরে দাঁড়িয়ে ঝুপড়ির দিকে যাবে, দেখে মালবাবু জগৎ সাহা।

তার মানে পিছনে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ ওৎ পেতে।...'ওৎ পেতে'ই মনে হল কালীর। কালীকে ফিরতে দেখেই জগৎ সাহা ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে উঠল, 'কী? ভাবের লোকটি চলে গেল? আর একটু বসল না? আহা-হা চুক চুক! তা এখুনি গেল কেন? ব্রজব ফিরতে তো আজ রাত্তির।'

রাগে মাথা জ্বলে গেল কালীর। ইচ্ছে হল ওই টিবির ধার থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। গড়াতে গড়াতে যমের বাড়ী পৌঁছে যাক।

লোকটাকে দেখলেই হাড় জ্বলে যায়, সুযোগ পেলেই জ্বালাতে আসে। অন্য কিছুই না, ভয়ঙ্কর কিছু করতে আসে না, আজেবাজে দুটো কথাই কইবে, কিন্তু ভঙ্গীটা কুৎসিত, হাসিটা নোংরা।

ওর ওই অলস্টার আর টুপী মোজায় মোড়া বেঁটে মোটা চেহারাটা দেখে কালীর বুনো ভালুকের চেহারার কথা মনে পড়ে যায়। ঠিক তেমনি পিঠ ফুলো, ঘাড় গোঁজা, আর হাত দুটো বেঁটে বেঁটে।

কালী চারদিক তাকিয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। ঝুপড়িগুলো যেন এখুনি ঘুমের সাধনা করছে। গা'টা একটু যে ছমছম করে না উঠল তা নয়, তবে কালী সেই ছমছমানিকে প্রশ্রয় দিল না, শুধু কায়দা করে একটু পিছিয়ে একেবারে টিবির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এই দাঁড়ানোয় বুকে বল মজুত থাকল।

এগোতে আসে, নীচে ঝাঁপ দেবার ভয় দেখান যাবে। হঠাৎ বেশী এগিয়ে আসে, ঠেলে ফেলে দেওয়া যাবে।

আত্মস্থ হয়ে উদ্ধত গলায় বলল, 'আপনি এখানে?'

'আহা, বড় অন্যায় হয়ে গেছে, না? তা জায়গাটা তো বাপু কারো কেনা নয়, এলুমই বা।'

'থাকুন।' বলে কালী দাঁড়িয়েই থাকে, নড়ে না।

মালবাবু জগৎ সাহা দেঁতো হাসি হেসে বলে, 'ভাবলাম ব্রজ বাড়ি নেই, তুই একা আছিস। একা

যে নেই তা জানলে কি আর মরতে মরতে আসি?'

কালী কড়া গলায় বলে, 'আপনি আমার বাবার নাম ধরে বলছেন যে? বাবা আপনার থেকে বয়েসে ছোট?'

জগৎ সাহা বোধহয় এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, থতমত খেয়ে বলে, 'তা কী বলতে হবে? ব্রজবাবু?'

'বাবু' শব্দটার ওপর একটা জোর দেয়।

কালী গম্ভীরভাবে বলে, 'তাই বলাই নিয়ম, ভদ্রলোকে ভদ্রলোককে বাবুই বলে। ছোটলোকের কথা আলাদা।'

কালীও 'ছোটলোক' শব্দটার ওপর জোর দেয়।

জগৎ সাহা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা। বাবুই বলব এবার থেকে। ব্রজবাবু! তা চল ঘরে গিয়ে একটু বসি? শীতে যে হাড় কালিয়ে যাচ্ছে। ঘরে গরম আছে। যতক্ষণ না তোর বাবা ফেরে—' একটু কেশে বলে, 'একটু আগলাতাম। দিনকাল তো ভাল নয়। ভয় খেতে পারিস—।'

কালী নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'ভয় খাবার কী আছে? ঘরে টাঙি আছে, কাঠ কাটার দা আছে, মাছ কোটা বঁটি আছে, আর হাঁড়িতে গরম জল ফুটছে!'

জগৎ সাহা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে, 'তুই আমায় ভয় দেখাচ্ছিস?'

কালী চোখ কপালে তোলে, 'ওমা, আমি আসব আপনাকে ভয় দেখাতে? আপনারাই তো আমাদের মতন গরীবের ভরসা। তা আপনি আমার জন্যি চিন্তা করতেছেন, তাই আপনার চিন্তা দূর করতেছি।'

জগৎ সাহা বোধহয় বুঝতে পারে হিম লাগিয়ে সর্দি-কাশি ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না এক্ষেত্রে, চালাকী করে দাঁড়িয়েছে কোথায় গিয়ে দেখ। তবু ঝপ্ করে চলে যাওয়া যায় না, হয়ত দুঃসাহসী ছুঁড়ি পেছনে টিটকিরি দিয়ে হাসবে। তাই বলে, 'কালী, বয়সের গরমে শীতকে শীত বলছিস না, গায়ে একখানা চাদর পর্যন্ত দিসনি, পাঁজরে হিম বিঁধে নিমুনিয়া হবে তা বলে দিলুম।'

কালী বলে, 'হলে ভয় কি? আপনারা তো রয়েছেন, আমাদের ডাক্তারবাবু আছেন।'

এই আর একটি লোক।

বটু ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, দু'রকম চিকিৎসা করে বটু। আসলে কোন বিদ্যেয় অধিকার তার তা কেউ জানে না। প্রেসকৃপশন দেয় বাঙলায়, আর বলে, 'তোদের ডাক্তারখানায় ইংরিজি বুঝবে না বুঝবে, তাই বাঙলাতেই দিলাম।'

বটুরও এদিকে নজর আছে।

আসলে কালীর মত এমন দস্যি বেপরোয়া মুখরা যথেচ্ছ বিহারিণী বেওয়ারিশ মেয়ে, কে কবে কটা দেখতে পায়? কালীর বয়েসে সবাই বিয়ে হয়ে দু'ছেলের মা হয়ে বসে আছে। আর যদি বা কারো ভাগ্যে বর না জুটে থাকে যে আপন বয়েসের লজ্জার ভারে ঘরের মধ্যে বন্দী থাকে। অতএব লুব্ধ পুরুষের চোখে পডবেই কালী।

হলেও রক্ষেকালী। কালীর রং কালো হলেও জেল্লাদার। মুখের কাটুনী ছুরি কাট, গড়নের বাড-বাডন্ত তো অন্য মেয়েমানুষের চক্ষুশূল।

বটু ডাক্তারের নামোল্লেখে জগৎ সাহার বোধহয় মনে পড়ে যায়। বটু ততক্ষণে ঝাঁপ বন্ধ করে মাল নিয়ে বসে আছে, মালবাবুর অপেক্ষায়। এটাই ওই 'মাল'টি নিয়ে বসবার সময়। দুই বন্ধুতে অনেক রাত অবধি ভোম্ হয়ে পড়ে থাকে।

জগৎ সাহা অতএব রণে ভঙ্গ দিয়ে বলতে বলতে চলে যায়, 'বাপ তোকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছে।'

কালী এখন গলা খুলে হেসে উঠে। ওর সেই বিখ্যাত হাসি, অনেকক্ষণ ধরে যা বাতাসকে চিরে চিরে সাত টুকরো করে তবে মিলোয়।

কালী ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, ঝাঁপটা টেনে বন্ধ করে যথারীতি দড়ি দিয়ে বেঁধে, হাতের কাছে কাঠ কাটা রামদা' খানা বাগিয়ে নিয়ে নিজের চৌকীটায় শুয়ে পড়ে। চৌকীতে শুলে উঠতে গিয়ে চালে মাথা ঠেকে, তবু কালীর ওটি চাই। বাবার আর নিজের দুখানা চৌকী সে কিনিয়েছে সেবার সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবে কালী, দূর ছাই, আর এ জীবন সহ্য হচ্ছে না। সর্বদা নিজেকে রক্ষে করে চলা সোজা কাজ? মরুকগে, ঐ পবনটাকে ধরেই ঝুলে পড়া যাক। পবনের দাদা নবীনের সংসারটি দুর্গস্বরূপ হবে সন্দেহ নেই। ওর মধ্যে আর কাউকে নাক গলাতে আসতে হবে না।

কিন্তু?

তাহলে তো কালীর সমস্ত ইচ্ছে-বাসনার সলিল সমাধি। কালীকে এই খুঁটিগাড়া গ্রামেই খুঁটি গেড়ে পড়ে পড়ে মাটি হতে হবে।

ব্রজ কয়াল হয়তো মেয়ের বর দেখে না হোক, ঘর দেখে সন্তোষ প্রকাশ করবে কিন্তু কালীর যে স্বপ্ন-টপ্ন সব শেষ হয়ে যাবে।

কালী যে দূর অরণ্যের ঘ্রাণ নিতে চায়, দূর আকাশের তারা গুণতে চায়।...কালী মনে মনে শ্বশুরবাড়ি যায় রেলগাড়ি চেপে, নৌকা চেপে, ইষ্টিমার চেপে। কালীর পরণে থাকে জরির চেলি, গায়ে সোনার ঝিলিক, মুখে মাথায় ওড়নার আবরণ। ভাল ঘরের বিয়ে দেখেছে কালী দেশে থাকতে, ওড়নার মধ্যে কনের মুখ। কী রমণীয়!

কিন্তু ওই কনের পাশে বসে কে?

মাথায় টোপর, কপালে চন্দন, গলায় বাসি হয়ে আসা ফুলের মালা।...ও কি পবন? নাঃ, স্পষ্ট কোন অবয়ব মনে আনতে পারে না কালী। তার ভাসা ভাসা ছায়া ছায়া কে যেন! টোপরের নীচে তার শুধু ললাটটুকু দেখতে পাওয়া যায়। মুখটা নয়।

পবন হলে তো স্পষ্টই হয়ে উঠত।

কত কত যুগ যেন পার হয়ে গেল। দূরে দূরে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। কালী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঝাঁপটা ঠেলছে কে?

কালী দা'খানা বাগিয়ে ধরল, আর তখন বাবার গলার শব্দ পেল, 'কালী, ঘুমিয়ে পড়লি না কি?'

হঠাৎ রাগে মাথা গরম হয়ে গেল কালীর।

ঝাঁপের দড়ির গিঁট খুলে ঝপাৎ করে ঝাঁপটা খুলে ধরে বলে ওঠে, 'কালী, একেবারে সেই শেষ ঘুম ঘুমোবে বাবা, তার আগে তার ঘুমের রাইট নেই।'

হ্যাঁ, 'রাইট', 'ফাইট', 'টাইম', এরকম কিছু কিছু কথা শিখে ফেলেছে কালী এবং উপযুক্ত জায়গায় লাগাতেও শিখেছে।

ব্রজ কিন্তু এ রাগে রেগে উঠল না, বলল না, সমস্তটা দিন তেতে-পুড়ে এলাম, এখন ভাল নৈবিদ্যি সাজালি কালী! না, বলল না, আজ ব্রজর সর্বাঙ্গ দিয়েই যেন খুশী উপচে পড়ছে। ব্রজ ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে বলে, 'ওঃ শীতটা জব্বর পড়েছে।' তারপর হাত বাড়িয়ে শালপাতা চাপা একটা বেশ বড়সড় মাটির খুরি মেয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নে ধর। শিউড়ির সবচেয়ে নামকরা দোকানের ল্যাংচা। এখনই খা দুটো।'

কালী বলে, 'কী বাবা, হঠাৎ তালুক-মুলুক পেলে না কী; একেবারে এক কিলো ভাঁড় ভর্তি করে ল্যাংচা এনে হাজির করলে!'

ব্রজর মুখে অপরিসীম একটি লাবণ্যের ছটা।

ব্রজ গায়ের চাদরটা খুলে দেয়ালে টাঙানো দড়িতে রেখে উৎফুল্ল গলায় বলে, 'হুঁ! ব্রজ কয়াল নইলে আর কে এক কিলো ল্যাংচা কিনবে! মুফতের ব্যাপার রে। এই যে আরো আছে—' বলে ব্রজ হাতকাটা শার্টের পকেট থেকে মিঠে পানের দোনা বার করে বলে, 'নে খা! বাবার খাওয়া হয়ে গেছে। পেট ভরে

খেয়ে এসেছি। রুটি-মাংস, মিষ্টি। তুই খেয়ে নে। খেতে খেতে তোর জন্যে এত মন কেমন করছিল!'

বাবা ভালমত খেয়ে এসেছে শুনে কালীর মেজাজের পারাটা একটু নামে, তবে ঝঙ্কারটা ছাড়ে না। 'হঠাৎ কি ভগবানের বর পেলে বাবা? তাই এত সব স্বপ্ন কথা!'

ব্রজ মিটি মিটি হাসে। 'তা শুনলে তাজ্জবই হবি, কিন্তু তার আগে তুই খেতে বোস মা। আমার জন্যে বসেছিলি তো? তোর তো ওই—'

কালী কিন্তু বাবার এই স্নেহ-সহানুভূতির মান-টান রাখে না। অনায়াসে বলে, 'তোমার জন্যি বসে থাকতে আমার দায় পড়েছে। খিদে ছিল না, তাই খাইনি।'

ব্রজ হেসে ফেলে বলে, 'তা এখন তো হয়েছে খিদে, বোস। দুটো মিষ্টি নিয়ে বোস।'

কালী বাবার অনুজ্ঞা পালন করে না, একটা মিষ্টি নিয়ে বসে। ব্রজ অসন্তুষ্ট গলায় বলে, 'ওইতো তোর দোষ কালী! নিজে কিছু খাবি না, কেবল বাপের জন্যে তাংড়াবি। অপরে দিয়েছে, তাও খাবি না প্রাণ ধরে?'

কালী বলে, 'খাব বাবা, খাব। কাল খাব। এখন বলতো শুনি হঠাৎ এমন রাজ্যপদ জুটল কী সুবাদে। কে ভাঁড় ভর্তি মিষ্টি দিল, কে পেট ভরে রুটি-মাংস খাওয়াল—'

ব্রজ অবশ্য সহজে বলে ফেলবে না।

আজকের ঘটনাটা তার জীবনে রীতিমত একটা ঘটনা। তাই একটু কেশে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, 'অকস্মাৎ এক দেলদরিয়া মানুষের দেখা পেয়ে গেলাম রে কালী! বাসে আমার পাশে বসল একজন, গা থেকে আতর আতর খোসবু বেরোচ্ছে, ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী উড়নি পরা, চোখ-মুখ খাশা, ভদ্দরলোকের মত হাবভাব। আমার তো বাতিক, কথা না কয়ে থাকতে পারি নে। বলে ফেললাম, 'আপনার আতরের খোসবুটা খুব জোর।' শুনে হাসল, বলল, 'আতর নয়, বিলিতি এসেন্স। এক জায়গায় গাওনা করতে গেছলাম, তারা খুব ছিটোল। পয়সাওলা লোকতো।' গাওনা করতে গেছল শুনে আমি তো পেয়ে বসেছি, কোথায়, কী বিত্তান্ত, কিসের গাওনা? কোথাকার লোক, এইসব—'

কালী রেগে উঠে বলে, 'আমার চোখ ছাড়া হলেই তোমার এই সব গাঁইয়াপনা আরো বাড়ে বাবা! লোকের কথায় তোমার এত কী দরকার?'

ব্রজ মৃদু হেসে বলে, 'আরে বাবা দরকার কি অমনি হয়? কোথাকার লোক জানিস? আমাদের খণ্ডখোলার।'

ব্রজ যেন দাবার একটা কিস্তি দিল। এইভাবে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে একটু থামে।

এতক্ষণে কালীর চৈতন্যে ঘা দিতে সমর্থ হয় ব্রজ। কালী বলে, 'খণ্ডখোলা! সে লোক আবার এখানে কী করতে? আমাদের মত বানভাসি তো নয়!'

ব্রজ বলে, 'পাগল! তিনপুরুষ ওরা এই শিউড়িতে! ঠাকুদ্দার মস্ত ব্যবসা ছিল। বাপের আমলেও রমরমা ছিল, তবে এর অন্য মন। আছে, দোকান-পশার আছে সবই, ব্যবসাও আছে, তবে ওই নিয়েই থাকতে পারে না, 'কেত্তন' গায়।'

কালী কেমন যেন অস্ফুট গলায় বলে, 'কেত্তন গায়?'

কালীর চোখের সামনে একটি মূর্তি ভেসে ওঠে, ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী উড়নি পরা, গলায় ফুলের মালা, গায়ে বিলিতি এসেন্সের খোসবাই। কেত্তন গাইছে আসরের মাঝখানে। হাবভাব ভদ্রলোকের মত। সেই লোকের সঙ্গে আলাপ হল। আবার সেই লোক বাবার দেশের লোক।

কালীকে বাবা সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কালী যেতে চায়নি। বলেছিল, 'যারা তোমায় কাজে পাঠাচ্ছে, তারা তোমারই ভাড়া দেবে বাবা, তোমার মেয়ের তো দেবে না। শুধু শুধু গ্যাঁট-গচ্চা দেবে কেন?'

এখন মনে হচ্ছে গেলেই হত। সেই লোক ব্রজ কয়ালকে পাত্তা দিল শুধু দেশের লোক শুনে। তাজ্জব বৈকি! শুধুই পাত্তা দেওয়া?

ব্রজ বলে, 'শিউড়িতে গিয়ে আমি দোকানে-মোকানে খেয়ে নেব শুনে কিছুতে ছাড়ল না। বলল,

দেশ-গাঁ কখনো চক্ষে দেখিনি বটে, তবু নাড়ির টান, আপনি আমার দেশের লোক, আর আপনাকে আমি দোকানে খেতে ছেড়ে দেব? আমার ওখানে যেতেই হবে। নাওয়া-খাওয়া করতে হবে।'

ব্রজ হেসে বলে, 'কথায় বলে যাচা অন্ন কাচা কাপড়, এ ছাড়তে নেই। গেলাম ওর সঙ্গে। কথায় কথায় প্রকাশ হল ওর ঠাকুদ্দা ভুবন নস্করের সঙ্গে আমার বাবা রাধামোহন কয়ালের মাল আমদানী-রপ্তানীর সম্পর্কে বন্ধুত্ব ছিল। সে শুনে তো আরো ব্যস্ত। বাড়ি নিয়ে গিয়ে নাওয়ান-খাওয়ান, আবার এবেলা রুটি-মাংসের ব্যবস্থা! তারপর আসার সময় ওই ল্যাংচার ভাঁড় গুছিয়ে দিল।...জগতে যে এখনো এমন মানুষ আছে, তা জানতুম নারে কালী।'

কালী গম্ভীরভাবে বলে, 'তা বাড়ির গিন্নীও ভাল বলতে হবে। দুম করে পথ থেকে একটা দেশের লোক কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে রাজ আদর, গিন্নী বেজার হল না?'

ব্রজর এবার হাসির পালা।

জোর হাসি হেসে বলে, 'হায় কপাল! মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! কোন্ ছোটবেলায় বাপ বিয়ে দেছল, সে বৌ ঘর করার আগেই মরে গেছে। তদবধি আর সংসার করেনি। বলে, আমি তো এক বাউণ্ডুলে, কেত্তন গাইছি, আবার লিখছি। দোকান-আড়ত লোকজনেই দেখে, দ্বিতীয়বার সংসার করা আর হয়ে ওঠেনি।...তথাপি বাড়িঘর যেন ঝকমক করছে, মা লক্ষ্মী উথলোনো সংসার! দেখে না কালী ইচ্ছে হচ্ছিল না যে আর ফিরে আসি। ওর দোকানের লোকজনের জন্যে যে মস্ত মস্ত দুখানা ঘর পড়ে আছে, তার আধখানায় আমাদের বাপ-বেটির থাকা হয়ে যায়!'...

কালী হেসে ওঠে, 'বাবা, দিবা স্বপ্ন দেখছ? তোমার নিজের হয়ে গেলেই হল?'

ব্রজ গম্ভীর গম্ভীর গলায় বলে, 'হত রে কালী। ওই মানুষ নিজে মুখে বলল, ইস কয়াল মশাই, আপনি যদি তখন ওই খুঁটিগোড়ায় খুঁটি গেড়ে না বসে এই শিউড়ির দিকে চলে আসতেন! আমার গার্জেনের মতন থাকতেন, দোকান-টোকান দেখতেন বর্তে যেতাম আমি। তা ব্রজ কয়ালের কপাল!'

কালীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এত রাত্তিরে আর থালা ধুতে না বেরিয়ে এক পাশে রেখে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে, বাবার দেওয়া মিঠে পান একটা হাতে নিয়ে বলে, 'তা এখনও তো কপাল ফিরতে পারে বাবা! দিক না তোমায় একটা চাকরি, থাকতেও দেবে কোন না—'

ব্রজ গভীর রহস্যময় একটু হেসে বলে, 'সে আশ্বাসও দিয়েছে রে কালী। বলেছে, আপনি চলে আসুন।...আসবেন একবার শীগগীরই এখানে।'

'এখানে?'

কালী চোখ কপালে তুলে বলে, 'এখেনে মানে?'

'আহা, আসবে নিজের কাজে বোলপুরে, তবে আমাকে বলতে কইতেই আসবে। রাস্তা থেকে বাস্তায় তো আর চাকরীতে নিয়োগ হয় না।'

কালী কাঁথা ঢাকা দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে বলে, 'হুঁ'! তার মানে এনেকোরি করতে আসবে। লোক্‌টা তুমি সত্যি কিনা, একটা চোর-জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ কিনা দেখে নেবে তো!'

ব্রজ শুয়ে পড়েছে। আহত গলায় বলে ওঠে, 'সে ছেলেকে দেখলে আর অমন সন্দেহের কথা বলতিসনে কালী। উদোমাদা!'

কালী তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'ছেলে আবার কোথা থেকে এল? এই যে বললে আড়তদার—'

ব্রজ উদাস গলায় বলে, 'বাপ-পিতামোর আড়ত আছে তাই আড়তদার! আমার কাছে ছেলেই। তিরিশের ঘরেই আছে এখনো।'

'তাই বল, তাই অমন দিলদরিয়া।' কালী বলে, 'বয়েস বাড়লেই পাকা ঝানু হয়ে যেত।'

বলেই হেসে ওঠে কালী, 'তা অবিশ্যি ঠিক নয়। তোমার মতন হলে কোন কালে ও ঝানু হবে না। তা নামটা কী?'

ব্রজ বলে, 'নামও ভাল, নাম হচ্ছে সুদাম নস্কর। আমাদের বংশের মতন ওদেরও সব বৈষ্ণব নাম।'

কালী বলে ওঠে, 'তা তোমাদের বংশে সবাইর যদি বোষ্টম নাম তো মেয়ের নাম কালী কেন বাবা?'

ব্রজ আস্তে বলে, 'এতদিন পরে শুধুলি, তাই বলি। তুই গভ্যে আসার আগে তোর মা স্বপন পেয়েছিল রে! ধড়মড়িয়ে ঘুমের থেকে উঠে এসে বলল, মা কালী এসেছিল ঘরে।...ওই যে ওইখেনে কুলুঙ্গীর কাছে দাঁড়িয়েছিল।'

কালী এযাবৎ কোন দিনই তার নাম-রহস্য জানত না। কালী হঠাৎ যেন কেমন বিহ্বল হয়। নিজেকে যেন রহস্যময় কোন আত্মার অধিকারিণী বলে মনে হয়। কালীর চোখের কোণ দিয়ে অকারণ ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। হয়তো এ অশ্রু আনন্দের।

এইমাত্র কোথায় যেন বড় একটা আশ্বাস পেয়েছে কালী, এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার। শিউড়িতে চাকরি হবে বাবার, থাকবার জন্যে কোঠাঘর পাবে, আর এক অদ্ভুত দিলদরিয়া মানুষের আশ্রয় পাবে, সে আড়তদার হলেও এখনো তিরিশের ঘরে বয়েস। যে টাকার মালিক হলেও উদোমাদা বাউণ্ডুলে। ফর্সা ধুতি উড়ুনি পরে গায়ে গন্ধ মেখে বেড়ায়, রাস্তা থেকে লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তুলে চব্য-চোষ্য খাওয়ার সঙ্গে মিষ্টির হাঁড়ি দেয়।

হ্যাঁ, এমন একটা লোককে দেখলেও পুণ্যি। কালী যেন সেই পুণ্যির প্রত্যাশাতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না।

ঘুম ব্রজরও আসছে না।

আজকের রোমাঞ্চকর ঘটনার ইতিহাস কালীর কাছে গল্প করলেও, প্রাণ খুলে সবটা বলতে পারেনি, কিছু রেখে-ঢেকে বলেছে।...সেটা বলেছে মেয়ের ভয়ে।...কারণ মেয়ে যে ফস করে কখন জ্বলে ওঠে! শুধু যে একটা চাকরীর ব্যবস্থাই পাকা করে এসেছে ব্রজ তা নয়, আরো একটা ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এসেছে।...ব্রজ কয়াল পয়সার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছে না, আর ব্রজ কয়ালের মেয়ের বয়স বাইশ পার হয়ে গেছে শুনে সুদাম যেন হাতে চাঁদ পাবার মতন বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, সংসার একটা করা দরকার সেটা মনে-প্রাণে বুঝছি কয়াল মশাই। কারণ ঘরে-সংসারে একটা শক্ত-পোক্ত মেয়েছেলে না থাকলে কুবেরের ভাঁড়ারও উবে যায়। আমাকে তো এই দেখছেন, কিছুর আটক-বাঁধন করতে পারিনি, হঠাৎ হঠাৎ টের পাই মায়ের সংসারের বড় বড় বাসন-পত্তর সব হাওয়া হয়ে গেছে, চাদর-সতরঞ্জির প্যাঁটরা শূন্য। মানে, মাঝে মাঝে বাড়িতে একটু আসর-টাসর বসাই, পাচজন খায়-দায়, তাই ওসবের সন্ধান পড়ে।...আরো কত দিকে কত ছিল জানিই না। তাই মনে হচ্ছে, এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

তারপরই কথায় কথায় বোলপুরে কাজে আসার ছুতোয় ব্রজ কয়ালের মেয়েকে দেখতে আসার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

সাহস করে এই অলৌকিক আনন্দের খবরটা মেয়েকে বলতে পারেনি ব্রজ, কিন্তু না বলেও ঘুম হবে না। কথা চাপা তার ধাতে নেই। তবু ব্রজ মনে মনে দিব্যি গেলেছে, একথা সে এখন কারো কাছেই ফাঁস করবে না।

ছেলেটার কথাও কী মিষ্টি!

বলে কিনা 'যেখানেই যান আর যত সুখের দেশই দেখুন আপনি কয়াল মশাই, ভিটে গাঁয়ের নামটা শুনলেই মনটা ধ্বক করে উঠবে। আমি তো ভাল করে চোখেও দেখিনি, কোন্ শৈশবে গেছি ঠাকুর্দার সঙ্গে, কিন্তু যেই বললেন আপনি খণ্ডখোলার লোক, অমনি মনে হল যেন চিরকালের আপন।' একথা যে ব্রজরই মনের কথা।

সামনেই মেয়েব বিয়ে, কুসুমের সকল কাজ একা হাতে। তাই তলে তলে সব সারছে। কড়া শীত আর কড়া রোদ থাকতে থাকতে বাড়ির পর্ব মিটিয়ে ফেলেছে, এখন সুপুরি কাটতে বসেছে। অবিশ্যি ঘরে লোক না থাকলেও পাড়ায় কি আর মেয়েছেলে নেই? আছে, ডাকলে এসে কাজ-কর্ম তুলেও দিয়ে যায়। কিন্তু কুসুমবালার পাড়াসুদ্ধু সকলের সঙ্গেই ঝগড়া, ডাকতে যাবে কোন মুখে।

তাছাড়া ডাকতে চায়ও না। কাউকে বিশ্বাস নেই ওর। কে বলতে পারে বড়ি দিতে বসে হাত সাফাই করে খানিকটা ডাল বাটা হাতিয়ে ফেলল, কি সুপুরি কাটতে বসে পেট কাপড়ে চারটি কাটা সুপুরিই বেঁধে নিল। তার থেকে মরে মরে নিজে করাই ভাল।

কেটে কেটে স্তূপ দিয়েছে, পবন এসে কাছে বসল। মায়া-মমতা মাখানো গলায় বলল, 'এই বাস, সেই তখন থেকে এখনো অবদি সুপুরি কাটছ তুমি? দাও, অস্তরখানা আমায় দাও, আমি চারটি কেটে দিই।'

দেওরের এমন মমতার কণ্ঠে কুসুম বোধহয় একটু খুশী হয়। মাড়ি বার করে হেসে উঠে বলে, 'হ্যাঁ, তুমি নিলে আর সুপুরি কুচোবে কে?'

'আরে বাবা অস্তরটা আমার দাওই না।'

কুসুম বলে, 'ক্ষ্যাপার মতন কতা! এ কম্ম কি মদ্দ পুরুষের নাকি? ধান কাটতে পাব বলেই বুঝি সুপুরি কাটতে পারবে? হ্যাঁ, তোমার একটা বৌ থাকত তো তাকে ঘাড়ে ধরে খাটিয়ে নিতাম।'

শুনে পবনের বুকের মধ্যেটা উথলে ওঠে। আহা! মেঘ না চাইতেই জল!

যে প্রসঙ্গ তোলবার জন্যে কাঠখড় পোড়াতে আসা, সে প্রসঙ্গ আপনিই উঠে পড়ল। সুযোগকে হাত বাড়িয়ে লুফে নিল পবন। বলে উঠল, 'তা এনেই নাও না তেমন একটা চাকরানী। তোমার খাটুনীগুলো খেটে দেবে।'

ও তাই। কুসুমের আর বুঝতে বাকি রইল না, হঠাৎ দেওরের বৌদির ওপর এত দরদ উথলে উঠল কেন। ভাইঝির বিয়ের জোগাড়-যন্তর দেখে কাকার অন্তর খাঁ খাঁ করে উঠছে। এমন মাড়ি চেপে হেসে বলল, 'তাই বল। আসল কতায় এসো। তা চাকরানী হবে কি আমার ওপর মহারাণী হয়ে উঠবে, 'গেরান্টি' আছে?'

পবন মহোৎসাহে বলে, 'ইস্! মহারাণী অমনি হলেই হল, তোমার ঠোনা নেই?'

'হুঁ! বে করার বাসনা হয়েছে।' কুসুম বলে, 'তা বে বললেই তো বে হয় না, পাত্তির দেখতে হবে তো—'

পবন ঘাড় চুলকে বলে, 'তা সে ঘর দেখা হয়েই আছে!'

'অ!'

কুসুম হাতের জাঁতি থামিয়ে হাতের বদলে সেটাকেই গালে ঠেকিয়ে বলে, 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে? বলি কোতায় দেখলে পাত্তির? তোমার স্যাঙাতের বোন ওই ড্যাবা চোখি দুগগাটি বুঝি?'

আবার পবনের হাতের মধ্যে কথার খেই এসে জোটে। পবন ঘাড় গুঁজেই মুচকি হেসে বলে, 'দুগগা নয়, সাক্ষেৎ কালী। ওই যে ওই রেল লাইনের ওপারে—ব্রজ কয়াল আছে না?' ঢোক গিলে বলে, 'তার মেয়ে কালী। দেখেছ তো? এয়েছিল একদিন—।'

কথা শেষ করতে হয় না, কুসুম জাঁতি ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে একপাক ঘুরে বলে, 'অ্যাঁ, কী বললে ঠাউরপো? কী বললে তুমি? ওই ঝুপড়িতে থাকা বানভাসিদের খাণ্ডার মেয়েটা? ওই তোমার পাত্তির? ওমা, আমি কোতায় যাব গো, শুনে যে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে গো, আমার আপিং খেতে ইচ্ছে করছে গো—'

কুসুমের পায়ের দাপটে কুচনো সুপুরি ছিটকে ছড়াছড়ি যায়।

ব্যাপারটা এমন দুরন্ত নাটকীয় হয়ে উঠবে, তা ভাবেনি পবন। তবে বোকা গোঁয়ার হলেও এটা বুঝতে বাকি থাকে না তার, এই নাটকটি বৌদির ইচ্ছাকৃত। পবনের প্রস্তাবটা যে কত অযৌক্তিক, সেটা প্রতিপন্ন করতেই এত আয়োজন।

কিন্তু আপাততঃ তো নাটক থামাতে হবে।

কুসুমের আক্ষেপ ধ্বনিতে ছুটে এসেছে কমলি এবং তার ছোট ভাই গোপাল। কমলির আশঙ্কা হয়, নির্ঘাৎ সেই বরের বাড়ি থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে। কমলি কাঁটা হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে

এবং গোপাল তারস্বরে কেঁদে ওঠে।

পবন ব্যস্ত হয়ে বলে, 'তা অত অমনই বা করছ কেন? বানভাসি তো কি পতিত হয়ে গেছে? আজ যদি আমাদের এখানে বান এসে তোমার সর্বস্ব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তোমাকেও বানভাসি হতে হবে। ঝুপড়িতে থাকতে হবে—'

এই যুক্তি-বাণীতে কুসুম আরো নেচে ওঠে, 'ওমা! ইকী অলুক্ষুণে কতা গো! তোমার পছন্দর মেয়ের সঙ্গে বে হবে না বলে তুমি আমায় শাঁপমুণ্যি দিচ্ছ! ওমা, ওই সেপাইয়ের মতন মেয়েটাকে তোমার এমন পছন্দ হল যে, জ্ঞান-গম্যি হারাচ্ছ? বলি, ও মেয়ের বয়েসের ঠিক আছে না জাতের ঠিক আছে? কোতা থেকে না কোতা থেকে এসে—'

'এই, খবরদার!' গোঁয়ার পবন ফুঁসে উঠে বলে, 'জাত ফাত তুলবে না বলছি। ভাল হবে না।'

'কী! ভাল হবে না?'

এরপর কুসুম আর মাটিতে থাকে না, শূন্যেই পাক খায়, 'আমায় তুমি ভাল হবে না দেখাতে এয়েছ? এখনো তোমার দাদা বেঁচে না? শ্যাঁকা—সিঁদুর ঘোচানো বেধবা ভাজ আমি তোমার? তাই 'খবরদর' বলতে এয়েচ! ওনার পরিবার এসে আমার চাকরাণী হবে! আরো কত শুনব! বে হয় নাই এখনো, তাই কান ভাঙিয়ে গুরুজনকে অপমান্যি করতে শেকাচ্চে, বে হয়ে এলে ওই রক্ষেকালী সিংঘবায়িনী হয়ে উঠবে না?'

কুসুম কপাল চাপড়ায়, আর নতুন নতুন কথাব জোগান দেয়, 'কী দেকে ওই দস্যিকে তোমার পছন্দ হল ঠাউরপো? নিঘ্‌ঘাত ও তোমায় গুণতুক করেচে। ওই মেয়ে বৌ হয়ে এলে সোমসারে আর মা নক্কী দাঁড়াবেন? চার পা তুলে নেত্য করবেন না?'

'তুমি থামবে?' পবন বলে, 'এসে তোমাদের ঘরে ঢুকবে না, হল? তবে ওই মেয়েকেই আমি বিয়ে করব, এই আমার সাফ্ কথা। আমি চলে যাব।'

'অ্যাঁ! কুসুম আবার নতুন করে মূর্ছা যায়। 'বে হবার আগেই তুমি ভেন্ন হবার কতা চিন্তা করচ ঠাউরপো? একবার খ্যাল করচ না, তোমার দাদার তুমিই ডান হাত! ওঁর আর কেউ নাই। ওমা, কী ডাকিনী মন্তর দিল গো তোমায় যে তোমার পেরাণতুল্য দাদাকে তুমি ভুললে!'

'ঠিক আছে, তুমি চেঁচিয়ে মর—।' বলে দাওয়া থেকে নেমে চলে যায় পবন, নাটকের এই মোক্ষম দৃশ্যে পবনের দাদা নবীনের রঙ্গস্থলে আবির্ভাব।

দূর থেকেই কুসুমের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল সে, তবে তাকে এমন গুরুত্ব দেয়নি। কুসুমের কণ্ঠনিনাদ তার কানে অভ্যস্ত। গোপাল আঁস্তাকুড় ছুঁয়ে এলেও কুসুম ওইভাবেই চেঁচায়।

কিন্তু এখন কুসুম শুধু চেঁচাচ্ছে না, নাচছে ও।

এটা গুরুতরের চিহ্ন। পড়শিনীদের সঙ্গে কোঁদল হলে এমন নাচে কুসুম কখনো কখনো।

সামনে গমনোদ্যত ভাইকে দেখে নবীন বলে, 'হল কী?' বলে হাতের কাস্তে খোন্তা নামায়।

তবে নবীনের গলায় উদ্বেগ-টুদ্বেগ ফোটেনা।

পবন দাদার এই আত্মস্থ ভাব দেখে নিজেও আত্মস্থ হয়। বলে, 'যে চেঁচাচ্ছে তাকেই শুধাও।'

নবীন তাকে শুধায় না, কমলির দিকে তাকায়। কমলি হাত উল্টে মাথা নাড়ে। ততক্ষণে কুসুম নিজেই বলে, 'তা তোমার নিজে মুকে বলতিই বা কী বাদা ঠাউরপো? বল! দাদার মুকের ওপরই বল? একন মুকে কতা নেই কেন?'

পবন ঘাড় তুলে বলে, 'কথা আবার থাকবে না ক্যানো? খুন করেছি না ডাকাতি করেছি?'

কুসুম আর একবার কপাল চাপড়ে বলে, 'তার থেকে কিছু কমও করনি। ...শুনবে ঘেন্নার কতা? তোমার সোয়াগের ভাই ওই বানভাসি বেরজোর সেই দজ্জাল মেয়েটাকে বে করবার জন্যি ক্ষেপেচে। ওকে বে করবে, তোমার সঙ্গে ভেন্ন হবে, পরিবার নিয়ে আলাদা বাসা করবে—'

পবন এখন ক্ষেপে যায়, বলে, 'বাজে বাজে কথা বলবে না বলছি। এসব আমি বলেছি?'

'বলনি? নাক ঘুরিয়ে কান দেকাওনি? আমায় 'খবদ্দার' বলনি? 'ভাল হবে না' বলনি?'

'বলেছি বলেছি বলেছি—' পবন আগুন ঝরা গলায় বলে, 'আরো যা যা বলতে চাও বল। সবই আমি বলেছি বলে মেনে নিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, ভয় আমি কাউকে পাই না। ওই ব্রজ কয়ালের মেয়েকেই আমি বিয়ে করব, ব্যস।'

ভাই আর বৌ এই দুই আগুনের মধ্যিখানে শীতল জলের মত, শান্ত গলায় নবীন বলে, 'তা ওই ব্রজ কি আমাদের স্ব-ঘর?'

পবন গোঁজ হয়ে বলে, 'ওসব ঘর-ফর আমি বুঝিনা—'

'আহা তুই না হয় না বুঝলি, আমায় তো বুঝতে হবে? সমাজকেও বোঝাতে হবে।'

পবনের সর্বাঙ্গের শিরা-বাহিত রক্ত এখন মাথায়। পবন সেই অবস্থার উপযুক্ত সুরেই বলে, 'আমি তোমাদের সমাজ-ফমাজের ধার ধারি না। ওর সঙ্গে বিয়ে হবে। তাতে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাও, দেবে। আমি এই বলতে যাচ্ছি—'

'বরফ মগজ' নবীন সাবধানে বলে, 'তা কমলির বেটা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে ভাই! নইলে মেয়ের বে'তে ব্যাগড়া পড়তে পারে।'

এখন পবন লজ্জিত হয়।

নরম গলায় বলে, 'আমি তো এমন কথা বলিনি, অপেক্ষা সইছে না!'

ততক্ষণে কমলি বাপের হাতে তামাক ধরিয়ে দিয়ে গেছে। নবীন তাতে একটা টান দিয়ে বলে, 'কী যে তুই বলেছিস, আর না বলেছিস, তুই-ই জানিস, আর তোর বৌদিই জানে, তবু আমি বলছি কমলির বেটা সুশৃংখলে হয়ে যাক।'

পবন এরপর ধীরে ধীরে চলে যায়। কিন্তু তার পিঠের উপর আবার এক বোমা পড়ে, 'আগে পিছে জানি না, ওই কালী এসে এ ভিটেয় ঢুকলে, আমি সঙ্গে সঙ্গে বেইরে যাব! একনো মা-বাপ বেঁচে আছে কুসুমের।'

পবন আবার ফিরে দাঁড়ায়, গম্ভীর গলায় বলে, 'তুমি সংসারের গিন্নী, তুমি যেতে যাবে কেন? যে যাবার সে যাবে। বাড়তি কেউ ঢুকতে আসবে না তোমার পুণ্যির বাড়িতে।'

নবীন হাঁ হাঁ করে, না, না ভাই, না পরিবার, কাউকেই সান্ত্বনা বাক্য শোনায় না, নিজের মনে তামাক খেতে থাকে। জানে, রক্ত ঠাণ্ডা হলে যে যার কাজে ঠিকই লাগবে। রক্ত-চড়াদের চড়ে যাওয়া রক্ত ঠাণ্ডা হতে সময় দিতে হয়। সান্ত্বনা দিতে গেলে আরো চড়ে।

এরপর নবীন তেল ডলে ডলে চান করবে, কমলিকে ডেকে বলবে, 'কমলি, পারিস তো ভাত কটা ঢেলে দে, পেটে পুরে নিই। দিনমান তো পুইয়ে এল।'

দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির।

পবন যদি দাদার মত হতে পারত, এমন সব পণ্ড করে বসত না। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ গুছিয়ে নিত। কিন্তু পবন বৌদির ওই কিম্ভূত ব্যবহারে মাথা ঠিক রাখতে পারল না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেলই।

অকারণ হন হন করে খানিকটা হেঁটে বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে একটা গাছতলায় বসল পবন। মাঘের শেষ, বেলা পড়লে হাড় কাঁপায়, কিন্তু দুপুর রোদ্দুরে হাঁটলে, রোদ পোহালে ঘাম ছোটায়। পবন তো আবার তার ওপর নিজের মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড বহন করে এনেছে।

ধুতি পরার একটা সুখ, কোঁচার কাপড়ে হেন কাজ নেই যা না করা যায়। মুখ মোছা থেকে জুতো মোছা, বাজার বওয়া থেকে গলায় ফাঁস লাগানো পর্যন্ত সব, সব কিছু।

পায়জামায় কোন সুবিধে নেই, একমাত্র লজ্জা নিবারণ ছাড়া। কিন্তু পবনের আজকের লজ্জা? সেটা নিবারণ হতে পারত পরণে ধুতি থাকলে। ওই উঁচু ডালটার ফেঁকড়াতে লাগিয়ে ঝুলে পড়ত পবন। কিন্তু সে তো দূরের কথা, এখন ঘাড় গলার চামটুকু মোছারও উপায় নেই।

ঘামতে ঘামতেই ভাবে পবন, এই মুখ এখন কালীকে দেখাব কি করে আমি? গিয়ে কি বলে উঠতে পারব, 'কালী, তুই ঠিক বলে ছিলিস, ওরা রাজী হবে না। জানিনে দাদা হত কিনা, তবে ওই কুসুমবালা? নাঃ। তা'ছাড়া ভেবে দেখলাম সত্যিই ওর সঙ্গে ঘর করতে তুই পারবি না। করা অসম্ভব।'

না, এখনকার মাথায় এ কথা ভাবতেই পারছে না পবন। ইচ্ছে হচ্ছে বিবাগী হয়ে চলে যায়। যেখানে দু'চক্ষু যায়।

কিন্তু কালীকে একবার জানিয়ে না গেলে? ওকে না বলে চলে গেলে, ফিরে আসার পরই কি আর মুখ দেখবে আমার?

বড় দোটানায় পড়ে পবন। আবার গিয়ে সেই বাড়িতে ঢোকা, সেই কুসুমবালার হাতের রান্না খাওয়া, এর চাইতে ঘৃণ্য কী আছে?

হঠাৎ একবার মনের মধ্যে আর এক বীরপুরুষ জেগে উঠল পবনের।... তাই বা ভাবছি কেন? বাড়ি কি ওর? আমার বাবার বাড়ি নয়? ওর আর আমার সমান ভাগ নেই? আমি যদি বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে জোর করে ঘরে তুলি, ওর কিছু করবার আইন আছে?...ভেবে হঠাৎ বেশ ভাল লাগল। ঠিক হয়, উপযুক্ত উচিত জব্দ হয়ে যায় কুসুমবালা! কুকুরের উপযুক্ত মুগুর হয়। কালীর কাছে আর পারতে হবে না। এতটুকু না চেঁচিয়েও কালী ওকে ঠিক করে ফেলতে পারবে।

যত ভাবে ততই তার অনুকূলে চিন্তাটা প্রবাহিত হয়। যেন একটা যুদ্ধে নামা ভাব হয়। ক্রমশঃ কালীর কাছে মুখ দেখানোর লজ্জাটা কেটে যায়, যেন। কীভাবে না বলে-কয়ে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে বৌকে বাড়িতে ঢুকিয়ে ফেলবে, সেই পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। এবং এই দণ্ডেই কালীকে জানাতে যেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু কে জানে, এই রোদের দুপুরে ব্রজরাজ আরামে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছেন কিনা। বেলা পড়ুক।

বেলা পড়েছে, এদিকে পিত্তিও পড়ছে, পেটের মধ্যে যেন জ্বালা করতে থাকে পবনের। আর এতকাল পরে, যে মাকে জ্ঞানে কখনো চোখে দেখেনি, সেই মায়ের জন্যে চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে তার। মা থাকলে কি পবনের এমন দুরবস্থা হত? পবনকে কি দাদা-বৌদির দয়ার কাঙাল হয়ে থাকতে হত? এমন কি মনে হত, পবনের কোন কিছুতেই অধিকার নেই, পবন ফালতু! কমলি গোপালের যে রাইট আছে সব বিষয়ে পবনের তার কিছুই নেই।

পবন একটা দার্শনিক চিন্তায় উদাস হয়।

পুরুষ বেটাছেলে তো নাঙ্গা ফকির, তার স্বার্থ হয় মা দেখে নয় বৌ দেখে, তা ব্যতীত কেউ না। কোঁচার অভাবে পবন হাঁটুতে চোখ ঘষে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যে হয় হয়, তখন নবীন আশপাশের অনেক দিক ঘুরে আবার বাড়ি ফিরে কুসুমকে উদ্দেশ করে জিগ্যেস করে বলে, 'ফেরেনি?'

কুসুম মুখ বাঁকিয়ে বলে; 'ফেরেনি, সে তো দেখতেই পাচ্ছো। ঘরের কোণে লুকিয়ে তো রাখিনি।'

কি যে হয়, চিরস্থির নবীন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে! চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'চুপ কর অলক্ষ্মী। তোর জন্যে আমার সব গেল। পাড়ায় আমার মান-ইজ্জত নেই, সংসারে আমার শান্তি নেই, ভাইটা ছিল, সেটাকে দূর করলি?'

বরের কাছে ধমক বড় খায় না কুসুম, তাই মনে মনে একটু ভয় পায়, তবু মুখে টন্‌কো হয়ে বলে, 'আমি দূর করলাম?'

'করলিই তো, করলি না?'

হঠাৎ কোঁচার খুঁটটা তুলে চোখে দিয়ে বলে, 'ভর দুপুরে খিদের সময়, একটা সামান্য কথা নিয়ে তুই যাত্রা-থেটার করলি, নাচন-কোঁদন করলি। বলি তার একটা মান-সম্মান নেই?'

কুসুম এখন আর রেগে না উঠে বেজার গলায় বলে, 'কতাটা সামান্যি হল? তোমার ভাই ওই বেরজোর মেয়েটাকে বে করবার বায়না করবে, সেটাই মানতে হবে?'

হয়তো, কথাটা মেনে নেবার মত কিনা একথা নবীনও ভাবতো, কিন্তু নবীনের চোখের কূলে কূলে জল।

যত ভাবছে, সে নিজে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে উঠেছে, আর পবনের ভাতটা বাড়া পড়ে আছে, রাগ দুঃখু করে কোথায় কোথায় ঘুরছে ছেলেটা, ততই আবেগ উথলে উঠছে। তাই নবীন খপ করে একটা বণ্ড লিখে বসে। পবনা যে খিদে সহ্য করতে পারে না একথা নবীনের মত আর কে জানে?

মা-মরা পবনকে টেনে তুলেছিল কে?

নবীনেরও আজ মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তাই বৌয়ের নাকে ঝামা দেওয়ার ভঙ্গীতে মুখের ওপর চড়া গলায় বলে, হ্যাঁ হবে মানতে। ওর যাকে খুশী বিয়ে করবে। বাড়ি ওর বাপের বৈ তোর বাপের নয়, তুই বিচার করবার কে? বাড়টা তোর বড্ড বেড়েছে। ওই বেরজোর মেয়ের মতন একটা জা আসা তোর দরকার। তবে যদি জব্দ হোস। এই বলে দিলাম ওই মেয়েটাকেই পবনের বৌ করে ঘরে আনব।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল! যেন আকাশ বাতাসকে সাক্ষী রাখল। আর বুঝি বা নিজেকে প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করাল।

বলতেই হবে পবনের পক্ষে শাপে বর হল কুসুমবালার বিদঘুটে ব্যবহারটা।

কিন্তু কোথায় সে হতভাগা?

যাকে দেখলে দাদা এখন হাত ধরে ভাত খাওয়াতে বসে। আজ বাদে কাল কমলির বিয়ে, পবন বিহনে সে বিয়ে কি বিষতুল্য হবে না নবীনের কাছে?

না, পবন এ পরিস্থিতির খবর শোনে না, পবন ইষ্টিশানের ধারে একটা চেনা চায়ের দোকানে ধারে একটু চা-বিস্কুট খেয়ে, কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বসে ভাবতে থাকে, টাকা-পয়সার বড় দরকার। বিবাগী হয়ে চলে যেতে হলেও পকেটে টাকা থাকা দরকার। এবং বেঁচে থাকতে হলে জিনিসটার নিয়মিত জোগানের দরকার।

কিন্তু পবনের মত লোকের হাতে হঠাৎ টাকা আসতে পারে কী করে, পকেটমারা অথবা ট্রেনে উঠে ছিনতাই করা ছাড়া। এই ব্যবসাটাই আজকাল খুব চালু ব্যবসা হয়ে উঠেছে।...কিন্তু পবন কি জানে ওর পথঘাট কি?

দিন যাচ্ছে একটা দুটো করে।

ব্রজ ব্যস্ত হয়ে আছে, কবে সেই সুদাম নস্কর ব্রজর মেয়েকে দেখতে আসে।

ঠিক করে রেখেছে, এই ঝুপড়ির মধ্যে দেখানো নয়। তাছাড়া লোক জানাজানির ভয়, কে কিভাবে ভাংচি দেবে। খবর পেলে মেয়েকেই ব্রজ বোলপুরে নিয়ে যাবে সিনেমা দেখানোর ছুতো করে।

কালী এত কথা জানে না, তাই কালী বিদ্রূপ করে, 'কী বাবা, তোমার দেশের লোকের কী হল? খুব তো এল। খুব তো চাকরী দিল।'

ব্রজর মুখ শুকিয়ে যায়। ভাবে; মানুষ কি এমন অদ্ভুত উল্টো-পাল্টা হতে পারে?

বাপের চিন্তার অংশীদার হয়ে কালীও ক'দিন ঘোরে আছে। কালী অহরহ বাবার চাকরির কথা ভাবছে আর এই ঝুপড়ির বাসা ছাড়ার কথা ভাবছে।

হঠাৎ খেয়াল হল, পবনটা ক'দিন আসেনি।

ক'দিন? তা ছ'সাত দিন হয়ে গেল। দুদিন ধরে বাবাকে না জানিয়ে সেই ল্যাংচা তুলে রেখেছিল দুটো, যদি আসে বলে। এল না। তারপরই যেন দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল। আজ মনে হল সেই যেদিন বীরদর্পে চলে গেল, বাড়িতে রাজী করাবে বলে, তদবধি আর আসেনি।

কী হল? ওই নিয়ে বচসা করে বাড়িছাড়া হল নাকি? পবনের হাড়হদ্দ জেনে নিয়েছে বলেই চট করে ওই কথাই মনে এল। আবার ভাবল, নাঃ বোধহয় ভাইঝির বিয়ের কাজে ব্যস্ত আছে।

চাষীর ঘরের কাজ, এখন হয়তো কাঠই কেটে রাখতে হবে দু'গাড়ি।

কালীর যে আজকাল কী হয়েছে! এক কথা ভাবতে বসে অন্য কথায় যায়। পবনের ভাইঝির বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে ব্রজ কয়ালের মেয়ের বিয়ের কথা। ব্রজ কয়ালের কে আছে যে তার মেয়ের বিয়েয় খাটবে? যতই ঘটা না থাক, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিনটে ব্যাপারে কিছু খাটুনি, অর্থব্যয় আছেই। ঘটা না থাকলেও ল্যাঠা আছে। ব্রজ কয়ালের না আছে লোকবল, না আছে অর্থবল। বলের মধ্যে তো দজ্জাল মেয়েটা, তা সে যদি কনে সেজে বসে—

কনে সাজা ভাবতে গিয়ে কালী যেন শূন্যে হোঁচট খায়।

কোথায় বসেছে কালী কনে সেজে? কে সাজিয়ে দিয়েছে?

আশপাশের ঝুপড়িতে যারা থাকে তারা তো ঠিক কালীদের মত নয়। তারা অবাঙালী রেলের কুলি ফ্যামিলি। বাবার চেনা-জানার মধ্যে মালবাবু আর ডাক্তারবাবু। হয়তো বাবা তাদেরই শরণাপন্ন হবে।

কিন্তু বাবা কি তাদের স্বরূপ চেনে?

তারা কালীর বিয়ের সহযোগিতা করতে আসবে? ব্রজ কয়ালের চোখে পৃথিবীর যে চেহারা, সত্যি তো আর তেমন নয় পৃথিবী!...এই যে বাবার দেশের লোক—

শীত শেষের পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে কালী বাবার কাঁথাখানা একটা পুরনো কাপড় বসিয়ে সেলাই করছিল, আর ভাবছিল বাবা এখনো মানুষ চিনতে শেখেনি, হঠাৎ দেশের লোক দেখে একটু আদিখ্যেতা করছে বলে সে অমনি ব্রজ কয়ালের মত একটা তুচ্ছ লোককে মনে রাখবে? চাকরি নিয়ে বসে থাকবে?

যার পাকা বড় বাড়ি, দোকান আড়ত, ব্যবসা। যে খাতা ভবে ভরে কবি গান লেখে। ব্রজরা তাদের মত লোকের কাছে কী? কালী কিনা সেই মানুষকে দেখবার আশায়—

হঠাৎ যেন কালীর সামনে বাজ পড়ে।

বাবা প্রায় ঝাঁপিয়ে এসে বলে, 'সর্বনাশ হয়েছে রে কালী, সে এসে হাজির!' কার আসার সঙ্গে সর্বনাশের সম্পর্ক আছে বুঝতে পারে না কালী। শুধু কোল থেকে কাঁথাখানা গুটিয়ে ঝুপড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে বলে ফেলে, 'কে, পবন?'

'পবন? পবনের চিন্তা করছিস বুঝি বসে বসে হারামজাদি?'

কক্ষনো যা তাই বলে না মেয়েকে, ব্রজ তাই বলে বসে। এবং তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, 'কী বলতে কী বলে ফেললাম মা, মনে নিসনি। বলা-কওয়া নেই, সুদাম এসে হাজির। সঙ্গের লোকের সঙ্গে দেখা, সে ব্রজ কয়ালের বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে ইস্টিশানের ধারেকাছে। সুদাম ইস্টিশান মাস্টারের ঘরে বসে। ওর সেই চাকর রামগতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। ওদের আসতে বলে, ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছি।'

কালী এখন আত্মস্থ গলায় বলে, 'তা আসবে তো বলেই ছিল, এসেছে। এতে হাঁপাবারই বা কী আছে?'

ব্রজর মুখে এসে যাচ্ছিল, 'আসছে যে কনে দেখতে তা জানিস হতভাগী মেয়ে?'

তারপরই সামলে নেয়, মনে মনে বলে 'নাঃ এখনো নয়।' মুখে বলে, 'কী আর? বলেছিল আগে খবর দেবে। ইস্টিশান মাস্টারের কেয়ারে চিঠি দেবে তো রোজই খোঁজ করছি—নেই নেই। এখন হঠাৎ না আছে ব্যবস্থা, না আছে দুটো মিষ্টি কেনা। বসবেই বা কোথা? মাথার মধ্যে কেমন করছে আমার। অমন একটা মান্যিমান লোক—'

কালী অবহেলায় বলে, 'তোমার মান্যিমান লোক তো জানছেই গরীব হতভাগা বানভাসির ঘরে আসছি। অত লাজ-লজ্জার কী আছে?'

বলতে বলতেই ঢালু পথ বেয়ে নীচু থেকে উঁচুতে উঠে আসে দু'টো মানুষ। আগে আগে রামগতি, পিছনে সুদাম নস্কর।

কালী তাকিয়ে দেখে। কালী যেন তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরকে দেখে। বাবার বর্ণনায় খাদ ছিল না বটে।

ব্রজ তদগদভাবে, 'এই যে কালী, সেই যাঁর কথা বলেছিলাম। দেশের লোক শুনে যিনি আমায়' ব্রজ হাঁপায়, 'খাইয়ে-দাইয়ে মিষ্টি সঙ্গে দিয়ে—।'

কালী যদিও নিজে বিমোহিত, তথাপি বাবার এই আদেখ্‌লে-পনায় রেগে না গিয়ে পারে না। তাড়াতাড়ি বলে, 'অত বলবার কিছু নেই বাবা! এত নেমক-হারাম নই যে এখুনি ভুলে যাব।'

ব্রজ মেয়ের সাহস দেখে অবাক হয়।

তবু নিজ স্বভাবে বলে ফেলে, 'তা ঠ্যাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পেন্নাম কর?'

ব্রজর ভাব দেখলে মনে হয়, পারলে সে নিজেই প্রণাম করে।

কালী আবারও বাবার ব্যাপারে বিরক্ত হয়। তবু বাধ্য হয়েই এগিয়ে যায় প্রণাম করতে। কিন্তু করতে হয় না। সুদাম নস্কর তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নেয় 'থাক থাক' বলে। তারপর বলে, 'চলুন কয়াল মশাই, আপনার ঘরে গিয়ে বসিগে।'

কনে দেখা বেলায় কনে দেখা তার হয়ে গেছে।

এমনি দীর্ঘাঙ্গী দৃপ্তদীপ্ত একটি মূর্তিই যেন তার কল্পনায় ছিল! যে সুদামের মায়ের হাতের সংসারটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে, সুদামের দায়-দায়িত্ব সব নেবে।

কালীর যে রংটা কালো তা যেন খেয়ালে এল না সুদামের। কালীর দৃঢ় সপ্রতিভ ভঙ্গী তাকে মোহিত করল। 'কনে দেখার' সেই চির পরিচিত ভঙ্গীর সঙ্গে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

সুদামের মা'ও কালো ছিলেন, সুদাম যেন এই ব্রজ কয়ালের মেয়ের মধ্যে সেই মায়ের ছায়া দেখতে পেল।...হ্যাঁ, এর হাতেই মায়ের সর্বস্ব আর নিজেকেও সঁপে দিয়ে সুদাম নিশ্চিত হয়ে 'আপন কাজ' করতে পারবে।

তাছাড়া—ব্রজ কয়াল মশাইও থাকবেন। যাঁর বাবা সুদামের ঠাকুরদার বন্ধু ছিলেন।

আঃ। কি মুক্তি।

সুদাম যেন এখনি একটা পরম নিশ্চিন্তার স্বাদ অনুভব করে।

ব্রজ ঘাড় হেঁট করে বলে, 'আমার আবার ঘর।'

'তাতে কি কয়াল মশাই? আমার বাবা বলতেন পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা। চলুন।...রামগতি, তুই বরং ততক্ষণ এদিক ওদিক ঘোর।'

ব্রজ বাঁচে, কালীও। মনিবের কাছে যা না লজ্জা হচ্ছে, তার থেকে বেশী হচ্ছে ওই চাকরের কাছে। ও চোখ ছাড়া হলে শান্তি।

রামগতি সরে যায় কাঁধের ঝোলা থেকে একবাক্স সন্দেশ বার করে রেখে দিয়ে।

এ আর খুঁটিগাড়ার মেটে দোকান নয় যে শালপাতাই সার। শিউড়ি বাজারের সেরা দোকানের মাল।

বাক্স দেখে ব্রজ মরমে মরে বলে, 'একি নস্কর মশাই, আপনি অতিথি, আর আপনিই—ছিঃ ছিঃ—'

কালী এখনো জানে না। সে 'কনে', তাই নিজ স্বভাবে বলে, 'ছিঃ দেবার কিছু নেই বাবা! উনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, জানেন গরীবের সংসারে হঠাৎ গিয়ে পড়লে তারা অতিথিকে নিয়ে দিশেহারা হবে, তাই ব্যবস্থা সঙ্গেই নিয়ে এসেছেন।'

সুদাম আর একবার চমৎকৃত হয়।

আর ব্রজ মনে মনে কপাল চাপড়ায়; মরতে কেন আমি ইশারায় জানিয়ে রাখিনি হারামজাদিকে। তাহলে একটু নম্র নত হত। এই খই-ফোটা কথা শুনে আর দুবার তাকাবে? হুঁঃ! মনে মনে নমস্কার করে সরে পড়বে।

তবে এও বলি, নাই বা বললুম। একটা মান্যিগন্যি মানুষ তো বটে? তুই অমনি তার সামনে খই ফোটাবি?

রাগে গর গর করে অথচ সামান্য কিছু বলতে পারে না। কিন্তু সুদাম নস্কর যে কী ভদ্র! সে সবিনয়ে বলে, 'আমায় যদি আপনি 'আপনি আজ্ঞে, নস্কর মশাই' করেন তা হলে তো বসা হয় না আমার।'

ব্রজ তাড়াতাড়ি বলে, 'হবে হবে, তাই হবে। মানে হঠাৎ—'

'হঠাৎ কিছু নয়, সেদিন তো আত্মীয়তা হয়েই গেছে কয়াল মশাই! আপনি আমার বাবাকে চিনতেন। তা বলুন আপনার মেয়েকে, উনি ঠিকই বলেছেন, হঠাৎ এসে পড়লাম, জানি আপনার ঘরে ছেলে নেই যে ছুটোছুটি করে দোকানে যাবে। আমিও তো আপনার ছেলের মতন। তাই বলি যে, নিয়ে যাই একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে। তবে চায়ের জন্যে খাটতে হবে আপনার মেয়েকে!'

একী ভাষা। এ কোন্ দেবলোকের কথা!

কালীর খই ফোটাও যেন শান্ত হয়ে যায়। কালী আচ্ছন্নের মত চা তৈরী করে। মেলায় কেনা নতুন কাঁচের গেলাশ দুটো বার করে বাপকে আর বাপের অতিথিকে চা দেয়, সন্দেশের বাক্স খুলে ঘরে মজুত শালপাতা থেকে পাতা নিয়ে সন্দেশ ভাগ করে ধরে দেয়। চটাওঠা কলাই করা প্লেটের থেকে শালপাতা ভাল।

ভয় করছিল, এই বুঝি বলে বসে, 'কয়াল মশাই, আপনার মেয়েকেও বলুন নিতে।' তা, কী ভাগ্যিস বলে না। ভদ্র আর বিচক্ষণ বলেই বলে না।... জানে গেরস্তর মেয়ে, বাইরের লোকের সামনে খায় না গবগবিয়ে।

'মানুষ দেখলি কালী?'

ওদের সঙ্গে লাইনের ওপার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরে এসে বসল ব্রজ, তখন তাকে দেখে মনে হল, সত্যিই যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে।

হাঁপাচ্ছে, এই ঠাণ্ডাতেও ঘামছে।

জিরিয়ে নিয়ে বলে, 'মানুষ দেখলি কালী?'

কালী তার স্বভাব বহির্ভূত ভাবে চায়ের সরঞ্জাম, খাওয়া পাতা, সব ছড়িয়ে ফেলে রেখে এতক্ষণ বসেছিল চুপচাপ, বাবাকে ফিরতে দেখে তৎপর হল। ঘর মুছতে মুছতে বলল, 'দেখলাম।'

ব্রজ সেই তখন মেয়ের চটপট কথায় জ্বলতে জ্বলতে ভাবছিল, পছন্দ যে করবে না, সে তো নিশ্চিত। ফিরে এসে মেয়েকে আচ্ছা করে ধুঙ্কুড়ি নেড়ে দেবো। বলব, 'বলি ভেবেছিস কি তুই? সবাই তোর ওই পবনা, সত্য, মালবাবু, বটু ডাক্তার?...ওদের সঙ্গে কটকটিয়ে কথা কয়ে কয়ে জিভ মাজা হয়ে গেছে, কেমন? মানী মানুষের সামনে একটু ঘাড় গুঁজে বসতে হয়, সাত চড়ে 'রা' কাড়তে নেই, এটুকু জান না তুমি?'

এই সবই ভেঁজে রেখেছিল এবং নীরবে মলিন মুখেই পৌঁছতে গিয়েছিল, কিন্তু কোন অমর্ত্যলোকের বার্তা শুনে এল ব্রজ?

ব্রজ আর একটু গৌরচন্দ্রিকা করল, বলল, 'মানুষটা জ্বর হয়ে বিছানায় পড়ে, আর আমরা ভাবছি ভুলেই গেল বোধহয়। বড়লোকের খেয়াল তো, যখন চিনল তখন খুব চিনল, আর যখন ইচ্ছে হল না, তখন আর চিনতে পারল না।' দেখ্ ভেবে কী অন্যাই করেছি।...

কালী কোন কথা বলে না। হৃদয়-ভারে ভারাক্রান্ত কালীর এখন এত বক-বকানি ভাল লাগে না। কিন্তু ব্রজর যে এখন প্রাণের মধ্যে কথার সমুদ্র।...তাই ব্রজ আবার গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদে। 'আজ যদি তোর মা থাকত কালী?' কালী হঠাৎ চমকে উঠে বলে, 'এতকাল পরে আবার মাকে চিতে থেকে তুলে আনা কেন বাবা?'

ব্রজ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আর কেন! এদিকে পাত্তর বলে গেল, মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছে, এই মাসেই শুভ কাজটা হয়ে যাক, অথচ আমার নেই কেউ করবার। অবিশ্যি বিচক্ষণ ছেলে, সব দায় নিজে নিচ্ছে, তবু—'

'তবুটা' কি সেটাই জোগাড় করে উঠতে পারে না বলেই বোধহয় ব্রজ থেমে যায়।

এই অবকাশে কালী বলে, 'কী আবোল-তাবোল বকতে শুরু করলে বাবা? কোনখান থেকে আলাই-বালাই কিছু খেয়ে এলে নাকি?'

ব্রজ এ অপমানও গায়ে মাখে না।

বলে, 'যা ইচ্ছে বল। তবে আবোল-তাবোল নয় কালী, সত্যি কথা, খাঁটি কথা, সুদাম তো শুধু শুধু আসে নি, এয়েছিল কনে দেখতে!'

কালী গম্ভীরভাবে বলে, 'ও! সেদিন তাহলে ওই বাবদই মিষ্টির হাঁড়ি এসেছিল। তা আমি তো বাবা তোমার খুকী মেয়ে নই, আমায় বলতে কী হয়েছিল?'

ব্রজ আর এখন মেয়েকে ভয় করবে না। ব্রজ বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে, তাই বীরদর্পে বলে, 'হ্যাঁ, তোমায় বলি, আর তুমি সব ভণ্ডুল করে দাও। তোমায় বিশ্বাস নেই। এ বাবা পাকা কথা দিয়ে গেল, এখন নিশ্চিন্দি। বলে গেল, ঠিক এই রকম বড়সড় জোরমন্ত মেয়েই মনের মধ্যে ছিল ওর। সংসার দেখবে, আড়তের আয়-ব্যয় দেখবে—'

'ওঃ!' কালী বলে, 'তোমার চাকরিটা তাহলে ভূয়ো। বোকা পেয়ে ঠকিয়ে নিজের কাজটি গুছিয়ে—'

ব্রজ রেগে উঠে বলে, 'মেলা অহঙ্কার করিস নি কালী! তুই ছাড়া আর ওর কনে জুটত না? এক গাঁয়ের মানুষ, সেই সুবাদেই এত ইয়ে। আমার চাকরী ভূয়ো? আমায় একেবারে আড়তের ম্যানেজার, মানে দেখা-শোনার ভার সব দিয়ে দিল। দেবতা একদিকে, আর ওই ছেলে একদিকে কালী! ওর নামে নিন্দে করলে মহা পাপ হবে। নইলে কে কবে নিজে থেকে বলে কন্যেপক্ষর সব খরচা তার?'

আস্তে আস্তে ভাঙে ব্রজ।

অনেক ধানাই-পানাইয়ের পর কালী জানতে পারে, বোলপুরের বাজারে সুদাম নস্করেব একখানা ছোট বাড়ি আছে, বাপের আমল থেকেই আছে। কাজের খাতিরে বোলপুরে প্রায়ই আসতে হয়, তাই স্থায়ী ব্যবস্থা। সেইখানে ব্রজ মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বসবে। বিয়ের ব্যবস্থা সব মজুত থাকবে, বরযাত্রী খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকবে, বর আসবে একটু বেশী রাতের দিকে। লগ্ন যখন অধিক রাত্রে, তখন আর সন্ধ্যায় কেন? যা করবার সুদামের লোকজনই করবে, ব্রজ শুধু কন্যেদানের পুণ্যটুকু অর্জন করবে।

চিরমুখরা কালী শুনে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই কিছুক্ষণ আগেই না সে ভাবছিল, ধনবল, জনবল আর মনোবল, এই তিনটে বলই হীন ব্রজ কয়ালের মেয়ের বিয়ে কে উদ্ধার করবে? ভগবান এখনও কানে শোনেন?

একটা মানুষের কিছুক্ষণ উপস্থিতি, দু-চারটি কথা, একটুখানি হাসি, এতেই মানুষ জ্বরের ঘোর অথবা নেশার ঘোরের মত আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে?

কালীর যেন এখন আর মনে পড়ছে না, সে কে, কী কী কর্তব্য, এখন তার! বাবা একবার বলল, 'আর রাত করে কী হবে' কালী বলল, 'এই যে দিই', তারপর উঠতে ভুলে গেল। অনেকক্ষণ পরে আবার যখন বাবা বলল, তখন লজ্জিত হয়ে বলল, 'শুধু শুধু এমন আলিস্যি ধরেছিল!"

কালীর বাপের ইচ্ছে হচ্ছিল যতক্ষণ পারে মেয়ের সঙ্গে গল্প চালিয়ে যায়! কিন্তু মেয়ে যেন আজ স্বভাব ছাড়া ব্যবহার করছে। কথাই নেই মুখে।

হুঁ বুঝেছি, আর কিছু নয়, সেই লক্ষ্মীছাড়াটার চিন্তা হচ্ছে। সাধে কি আর বলে, মেয়েমানুষ জাতটা হচ্ছে মুখ্যু বোকা, একের নম্বর বুদ্ধু।

কিন্তু ছোঁড়াটাকে তো আর দেখি না! হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল কেন?

কিন্তু ব্রজর আশঙ্কা অমূলক, ব্রজর মেয়ে সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া হতভাগা ছোঁড়াটার কথা মোটেই ভাবছে না তখন। তার জীবনে হঠাৎ এসে পড়া আলোর ঝলকের ধাক্কাটাই তাকে অমন শুদ্ধ করে দিয়েছে।

ও শুধু ভাবছে, এ কী সম্ভব? এ কখনও হতে পারে? না, আপাতত কালী লোকটার পয়সা-কড়ি, ঘর-বাড়ির চিন্তায় বিভোর হচ্ছে না, বিভোর হয়ে আছে কেবল মাত্র মানুষটার চিন্তাতেই।

কালী নিজে প্রখরা মুখরা প্রবলা, অথচ একটা সূক্ষ্ম সুকুমার সুরুচিসম্পন্ন মানুষের সামান্যতম সংস্পর্শ এত মুগ্ধ করে কালীকে!

আজও কালীর ঘুম আসে না। ঘুম-জাগরণের মাঝখানে কালী একটা বিয়ে বাড়ির স্বপ্ন দেখে।...তখন আর সে বিয়ের বরের চেহারাটা ঝাপসা নয়।

পবনের কথা মনে পড়ল পরদিন।

কালী ধরে নিচ্ছিল, সেদিন জোর গলায় ঘোষণা করে এবং কালীকে রাজী করিয়ে নিয়ে চলে যাবার পর ভাই-ভাজের মত করাতে না পেরে লজ্জায় আর আসতে পারছে না।

অথচ আবার কালীর ধনুকভাঙা পণ।

কে জানে সেই অসাধ্য সাধনের কাজেই নেমে পড়ল না তো ছেলেটা? আবারও সেই 'ছেলেটা'ই মনে হয় কালীর। ভাবল, সত্যর কাছ থেকে একবার সন্ধান নিতে হবে। ওদের বাড়িতে তো আর নিজে যাবার মুখ নেই কালীর।

কিন্তু কালীকে আর কষ্ট করতে হল না। সত্যর কাছে খবর নিতে যেতে হল না। পরদিন মালবাবু এল।

কালী তখন ঝুপড়ির বাইরে বাসন ধুচ্ছিল রোদে বসে! মালবাবু পিছন থেকে বলে ওঠে, 'বাহারে কালী, তুই যা করিস, তাতেই কী সোনা ফলে রে? বাসন মাজছিস তা-ও দেখবার মতন।'

কালীর হাত ছাই-মাটি মাখা, তাই পিঠের আঁচলটা টানতে পারে না, নিজেই টানটান হয়ে বলে, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

'ও বাবা, তুই যেন কালী সর্বদাই মিলিটারী! বলি, কাল অত বাহারের কে এসেছিল রে তোদের বাড়ি? চাকর সঙ্গে করা লোক।'

কালী সংক্ষেপে বলে, 'বাবার দেশের লোক।'

'দেশের লোক, সেটি আবার কোথা থেকে জুটল?'

কালীর ইচ্ছে নয় যে এই লোকটার সঙ্গে সুদামের কথা বেশী বলে। কিন্তু চাপতে গেলে বিপদ আছে, তাই অগ্রাহ্যভরে বলে, 'ওই তো শিউড়িতে গিয়ে!'

'তা বাবা গিয়েছিল বলে, সে-ও এসেছিল বদলা দিতে?

কালী এ কথার উত্তর দেয় না।

মালবাবু সরে এসে বলে, 'বেশ মেকদারের লোক বলেই মনে হল, নাম কী?'

কালী এবার নিজের স্বভাবে ফেরে, ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'বাবার দেশের লোক তার নাম জেনে আমারই বা কী, আপনারই বা কী সাহা মশাই?'

জগৎ সাহা এতে টলে না, টেনে টেনে হেসে হেসে বলে, 'না, তাই বলছি। তোর বাবা যা জামাই আদর ভাব করছিল, মনে করলাম বুঝি তোকে কনে দেখতেই এল!'

কালী কেঁপে ওঠে। তার বুঝতে বাকি থাকে না, শয়তানটা সব জেনে বুঝে এসে ন্যাকামি করছে। উঃ কী শয়তান!

জগৎ সাহা বলে, 'অহঙ্কারে তো মটমট করছিস। তবে বলি, যার তেজে এত তেজ, সে তো কেটে পড়েছে! শুনেছিস তো পবনার কেলেঙ্কার?'

পবনের কেলেঙ্কার!

কালীর চোখের সামনে সব ধোঁয়া লাগে। গলায় দড়ি-টড়ি দেয়নি তো? এ যা শয়তান, সেই কথাটাই হয়তো হেসে হেসে বলতে এসেছে। তবু মুখে টান গলায় বলে, কারুর কেলেঙ্কার শোনবার সময় আমার নেই সাহা মশাই!'

'আহা শোন শোন, তোর অত পেয়ারের লোক। ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে 'ভেন্ন হব' বলে শাসিয়ে বেরিয়ে পড়ে বটু ডাক্তারের চেম্বার থেকে সাতাশটা টাকা চুরি করে পালিয়েছে।'

কালীর একথা বিশ্বাস হয় না! তাই বলে, 'ভালই করেছে। ওষুধের নামে জল বেচে তো পয়সা, বটু ডাক্তারের পাপের ধন প্রাচিত্তে গেছে!'

'হুঁ। বটু তো থানায় নালিশ করে এসেছে, যখন হাতে হাতকড়া পড়বে, তখন টেরটি পাবেন বাছাধন।'

'হাতে হাতকড়া?' কালী হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'সে কী সাহা মশাই? আপনি গরমেন্টের এত এত মাল সাফাই করছেন, তাতে হাতকড়া পড়ছে না, আর বটু ডাক্তারের তুচ্ছ কটা টাকার জন্যে হাতে হাতকড়া পড়বে পবনের?'

'কী'? জগৎ সাহার ভালুকে পোষাক পরা শরীরটা যেন নেচে ওঠে। বলে, 'আসপদ্দা বাড়তে বাড়তে যে আকাশে উঠছে রে কালী, মচকে ভেঙে যাবি যে!'

'মচকাব কী বলুন? আপনারা নেই?'

বলে বাসন কটা তুলে নিয়ে গিয়ে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে যায় কালী।

জগৎ সাহা কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে নেমে যায় ঢালু পথ দিয়ে। ঝুপড়ির মধ্যে উঁকি দেবার সাহস নেই। যা সব অস্তরের নাম করে করে রেখেছে।

জগৎ সাহা চলে যাবার পর কালী সত্যর সন্ধানে গেল! অধিকাংশ সময় চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে-টসে থাকে সে। দুই বন্ধুতেই থাকত। এখন একা ছিল।

কালীকে দেখেই সত্য গম্ভীরভাবে বলে, 'পবনের সঙ্গে সম্পক্ক নেই আর আমার।'

কালী বিদ্রূপের গলায় বলে, 'কেন, কী করল পবন?'

'কী না করল? বলি, না করল কী? চুরির বাড়া অকম্ম আছে?...নাঃ, চোরটার সঙ্গে আর সম্পক্ক রাখছি না।'

শুনে কালী সরে আসে, যাতে সত্যর সামনে না দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে তার।

সত্য নাকি পবনের বন্ধু ছিল?

'বন্ধু' মানে কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে পবন নামের একটা হতভাগ্য ছেলেও। বন্ধু মানে কী? চুরির কথাটা মিথ্যে না, বটু ডাক্তারের ড্রয়ার খুলে ওই টাকার ব্যাপারটি সেরেছিল পবন। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে পালানোর ক'দিন পরে একবার চুপি চুপি সত্যর কাছে এসেছিল। সত্য দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সগর্বে সে কথাটি ঘোষণা করে সত্য।

মাথা গরম পবন চলে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা সুদাম নস্করের 'পৌষ মাস' করে দিয়ে গেল বলতেই হবে। পবন যদি সামনে থাকত, যদি অহরহ কালীর কাছে এসে যেমন পড়ত আগে, তেমনই পড়ত, তাহলে কালী কী করত বলা শক্ত। যদিও পরিণত যুবতী কালী পবনের কথা ভাবতে গেলেই 'ছেলেটা' ভাবে। তবু ওই আছড়ে এসে পড়ার একটা ভার আছে বৈ কি! কালী এখন সেই ভার মুক্ত।

আবার এমন একটা কুকর্ম করে চলে গেছে পবন, তার নামে বিরূপতা না এসে পারছে না। এখন আর অবিশ্বাস করার উপায় নেই, সবাই ওই এক কথাই বলছে।

এমন কপাল কালীর যে, একদিন কিনা নবীন এলো কালীর কাছে, পবনের কোন সন্ধান সে জানে কি না জিজ্ঞেস করতে।

কালী তো শুনে স্তম্ভিত। বলল, আপনাদের কী মনে হচ্ছে 'চোরাই টাকাটা সে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে?'

নবীন বলল, 'মনে কিছু কর না মা, ভাইটার জন্যে মাথার ঠিক নেই। প্রকাশ্যে তো খোঁজারও উপায় নেই। বটু ডাক্তার থানায় ডাইরি করে রেখেছে।'

তার মানে পবন এখন পলাতক আসামী।

আর সুদাম?

আড়তদার সুদাম নলহাটিতে গিয়ে এমন কীর্তন গেয়ে এসেছে যে, সাড়া পড়ে গেছে। আবার ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে তার উঁচু নজরে! পাকা দেখায় এমন খাওয়ান খাইয়েছে, লোক অনেকদিন অমন খায়নি।

সেইসব লোকের মধ্যে মণিবাবুও আছে, সত্যও আছে, নবীনও আছে। সুদাম বলেছিল, আপনার

চেনা-জানা সবাইকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসবেন কয়াল মশাই! যজ্ঞি যখন হচ্ছেই।'

না, এখন আর লুকোছাপা নেই, আর তো ভাঙচির ভয় নেই। এখন ব্রজ সগৌরবে বলে বেড়াচ্ছে সবাইকে, কালীর কপালটা কী রকম।

গায়ে হলুদের আগের দিন বাপমেয়ে সুদামের বোলপুরের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। সবাই জেনেছে, ব্রজর কেউ করবার নেই, তাই ব্রজর ভাবী জামাই বিবেচনা করে বাড়ি দিয়েছে থাকতে, আবার খরচা দেবে সমস্ত।

নবীন কুসুমকে ডেকে বলে, 'দেখলি কুসুম? কালী মেয়ে ফ্যালনা নয়। যে পাত্তর বিয়ে করছে, সে পাত্তরের দাম শুনলে ভিরমি যাবি। ব্রজ কয়াল ভদ্দর লোক, অবস্থার বিপাকে—'

এখন যেন সকলেরই চোখ পড়ছে, কালী মেয়ে ফ্যালনা নয়। এমন কি, আশপাশের অন্য ঝুপড়িগুলোর বাসিন্দারাও কালী সম্বন্ধে এখন সচেতন হয়ে উঠে বলতে আসছে, 'ওহে কালী দিদিমণি শোশুর বাড়ি চলে যাবে, আমাদের পাড়া আঁধার হোয়ে যাবে।'

এখন আর ভাঙচির ভয় নেই, তাই আর লুকোছাপাও নেই। এখন কালীর ভাবী স্বামীর সুখ, ঐশ্বর্য, উদারতা, অকৃপণতা, এই খুঁটিগাড়া গ্রামের একমাত্র প্রসঙ্গ হয়েছে।

বিয়ের আগেই যে বর যখন-তখন তত্ত্ব পাঠাচ্ছে এবং বিয়ের পরেই ব্রজ কয়াল জামাইয়ের আড়তের ম্যানেজার হয়ে চলে যাবে শিউড়িতে, এ-ও এখন আর কারো অবিদিত নেই।

ব্রজ সবাইকে বলেই বেড়াচ্ছে। না বলতে পেরে হাঁপিয়ে মরছিল, এখন বাঁচছে।

গায়ে হলুদের আগের দিন কালীরা চলে যাবে বোলপুরে। সেখান থেকেই শিউড়ি। খুঁটিগাড়া গ্রামের এই ঝুপড়ির সংসারের এইখানেই ইতি।

কালী জিনিস-পত্তর তুলছিল। জিনিসপত্তর আর কী? বোলপুরের বাসায় বেমানান। তবু তুলছিল, ফেলছিল। ব্রজ বলল, 'আমি দেখি একবার জায়গাটাকে শেষ দেখা দেখে আসি। যতই হোক, মায়া পড়ে গেছে।'

ব্রজ গ্রামটাকে শেষ দেখা দেখতে বেরোল, কালী বসে রইল চুপচাপ। আর কাজে হাত-পা আসছে না, মনটা কেমন উদাস হয়ে যাচ্ছে। তারও যেন ইচ্ছে হচ্ছে একবার সবাইয়ের সঙ্গে শেষ দেখা করে আসে।

কোন মানুষের সঙ্গে নয়। গাছ-পালা, মাঠ-পথ, ফুল-ফল, ঘাস, ধুলো! এরাই তো কালীর এ যাবৎ কালের একান্ত বন্ধু।

যাক, এখন ভগবান যে বন্ধু জুটিয়ে দিচ্ছেন, সব বিরহ-বিচ্ছেদ মুছে যাবে।

কালী আবার ঘরটার দিকে তাকাল, মনে মনে বলল, তুই আমাদের অনেক দিন আশ্রয় দিয়েছিস রে, তোকে প্রেণাম জানাই।

মেঝেয়ে মাথাটা ঠেকিয়েছে, সে মাথা তুলেই কালী যেন ভূত দেখল।

সামনেই দাঁড়িয়ে।

প্রায় বলে ফেলেছিল, 'কে'? 'কে তুমি?' বলেনি ভাগ্যিস!

আস্তে বলল, 'তুই?'

পবন বলল, 'চলে এলাম।'

কালী পবনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এই রোগা কালো, গালের হাড় উঁচু, চোখের কোল বসা লোকটার নামই পবন? এই কিছুদিনে এত পরিবর্তন হয়? নাঃ এখন আর পবনকে দেখে 'ছেলেটা' বলে মনে হচ্ছে না।

কালী আস্তে বলল, কোথায় ছিলি এতদিন?'

'যেখানে সেখানে।'

'যাবার আগে আমায় একবার বলে গেলি না কেন?'

'মনের আক্ষেপে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলাম—'

কালী স্থির গলায় বলে, 'একেবারে 'হঠাৎ' বলা যায় কী করে? বটু ডাক্তারের ড্রয়ার খুলতে সময় লাগেনি?'

'ওঃ, সব শোনা হয়ে গেছে?'

পবন তাচ্ছিল্যের গলায় বলে 'গরীবের চোর হওয়া ছাড়া উপায় কী?'

'গরীব হলেই চোর হতে হবে?' কালীর কণ্ঠস্বর অনমনীয়।

পবন আরো অবজ্ঞার গলায় বলে, 'নিরুপায় হলেই হতে হবে।'

কালী গভীরভাবে বলে, 'তা হঠাৎ এই নিরুপায়টাই বা হতে হল কেন?'

'কেন?' পবন তীব্রস্বরে বলে, 'কেন? বলতে তোর লজ্জা করল না কালী?'

কালী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন? লজ্জা করবে? আমি তো চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি—'

পবন ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'চুরি করিসনি? একেবারেই না?...ভাল করে ভেবে দেখ।'

পবনের দৃষ্টির তীব্রতা কালীকে কাঁপায়।

তবু কালী স্থির থাকবার চেষ্টা করে বলে, 'ভেবে ভেবে তো মরলাম অনেক দিন, তুই কোন খবর দিলি? তোর বাড়িতে রাজি হল না হল, তুই কী ব্যবস্থা করতে পারলি, জানতে পারলাম আমি?'

পবন মাটিতে বসে পড়ে বলে, 'দেবার মতন না হওয়া পর্যন্ত কী দেব? কিন্তু এ-ও ভাবিনি, এতকালের কালী তুই, এযাবৎ তোর বাবা কোনো ব্যবস্থা করছিল না, হঠাৎ এই কটা দিনের মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে যাবে। ব্রজরাজ রাজপুত্তুর পাত্তর এনে কন্যে দান করতে বসবে, আর রাজপুত্তুরও এই হতভাগা পবনের বৌ-টা ছাড়া কনে খুঁজে পাবে না।

পবনের বৌ-টা!

কালী প্রায় ধমক দেওয়া সুরে বলে, 'কী বলছিল যা-তা? তোর বুদ্ধি বড় কাঁচা পবন! বয়েসকালে অমন কত ঠাঁই মন পড়ে, সেই জাগিয়ে বসে থাকলে কি চলে?'

পবন ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'পয়সার গন্ধ পেলে অবিশ্যি চলে না। কিন্তু ছি ছি কালী, ধিক দিই তোকে, তুইও পয়সা দেখে এমন অজ্ঞান হলি? তোকে এমন ভাবতাম না।'

কালীর বলবার কথা অনেক ছিল। কালী ওই রুক্ষ-শুষ্ক পোড়া কাঠ সদৃশ মানুষটাকে সান্ত্বনা বাক্য শোনাতে পারত, স্নেহ আদরে সুস্থির করবার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু কালী সেদিক দিয়ে গেল না। কালী দেখতে পাচ্ছে, ওর মধ্যে আগুন জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। এখানে সান্ত্বনাটা পরিহাস। বোঝানোর চেষ্টা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

কালী তাই সে পথে যায় না। দার্শনিকের গাম্ভীর্যে বলে, 'কেনই বা ভাবতিস না রক্তমাংসের মানুষ বৈ তো আকাশের দেব-দেবী নই? ইহ সংসারে পয়সাই সবের মূলাধার, তা কে না জানে? তুই জানছিস না?'

পবন তেরিয়া গলায় বলে, 'জানছি না? হাড়ে হাড়ে জানছি, তবু জানতাম কালী, জগতে মানুষ-মনিষ্যিও আছে। চিরকাল মনে জানি, তুই আমার বৌ, বাপের বাড়িতে পড়ে আছিস, অবস্থার গতিকে আনতে পারছিনে, আর তুই—' কথা বলতে পারে না বলেই থামে।

কালী আস্তে ঘরের কোণ থেকে এক ঘটি জল আর বাটি করে দুটো বড় রসগোল্লা রেখে বলে, 'রোদে রোদে ঘুরছিলি পবন, একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হ! তাপর কথা কস।'

বড় বড় দুটো রসগোল্লা আর ঠাণ্ডা এক ঘটি জল! পবনের বহু দিনের ক্ষুধার্ত পিপাসিত অন্তরাত্মা যেন ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায়, তবু পবন ঘৃণাভরে তাদের বাঁ-হাতের ঠেলায় দূরে সরিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের গলায় বলে, 'বড়মানুষ বরের গিন্নী হবার আগেই যে মস্ত বড় মানুষ হয়ে গেছিস কালী! ঘরে সর্বদা রাজভোগ-রসগোল্লা মজুত। কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আমি আসিনি কালী, স্পষ্ট কথা বলতে এসেছি, বড়মানুষের গিন্নী হওয়া তোর হবে না।'

কালী ওই তীব্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়, খুব নরম গলায় বলে, 'ছেলে মানুষের মতন কথা

বলিসনে পবন, বাবার কথাই ভাব? কত দুঃখু-ধান্ধা, কত উঞ্ছবিত্তি করে এযাবৎকাল কাটিয়ে এতদিনে একটু সুখের মুখ দেখার আশা পেয়েছে। নস্কর তার আড়তের মেনেজার করে দিয়েছে বাবাকে, কত সাহায্য করছে, এখন আমার বেগড়ালে চলবে কেন বল? সেটাই কি মনুষ-মনিষ্যত্ব হবে? পবন এতক্ষণে বোধহয় কালীর মুখের দিকে তাকায়, কী দেখে কে জানে। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ঠিক আছে, তোকে বিগড়োতে হবে না, যা করবার আমিই করব।'

কালীর মতো মেয়েও এই আগুনের ঢেলা চোখ দেখে ভয় পায়। এ আগুন তো শুধুই প্রেম-পাত্রীর বিশ্বাসভঙ্গের জ্বালার আগুন নয়, এই দীর্ঘ দিনগুলোর অনাহার, অনিদ্রা, দুঃখ, ক্লেশ বারুদ করে তুলেছিল তাকে।

কালী ভয়ে ভয়ে বলে, 'দোহাই তোর পবন, যা-তা কিছু করতে যাসনে। মনে কর তোর বৌ বাপের বাড়িতে পড়েছিল, ওলাউঠো হয়ে মরে গেছে। এমন মরে না?'

'থাম্ কালী। আর সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে আসিসনে।' পবন কড়া গলায় বলে, 'আড়তদারের বিয়ের সাধ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি, ব্যস।'

'পবন!' কালীও এখন মহাকালী হয়। কড়া গলায় বলে, 'তাই যদি দিতে যাস, ভেবেছিস আমি নাচতে নাচতে তোর গলায় মালা দিতে যাব?'

'যাসনি।' পবন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'বিয়ে পবনের এ জীবনে না হয় না হোক তবু এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে পারবে না। খুন করে ফাঁসি যেতে হয়, সে-ও বি আচ্ছা।

'পবন, আমি তোকে মাতার দিব্যি দিচ্ছি, গেয়োর্তুমি করিসনে। অবস্থা ফেরা, কত ভাল বৌ জুটবে তোর। আমি নিজে দাঁড়িয়ে বে দেব তোর। বলতে গেলে আমি তো তোর দিদির মতন পবন! তুই একটা কাঁচা-বুদ্ধি ছেলে মাত্তর আর আমি সাত ঘাটের জল খাওয়া, দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে মরা, একটা গিন্নি। তুই আমার নাগাল পাবিনে পবন, তুই আমার আশা ছাড়।'

'মরলে ছাড়ব', তার আগে নয়,' পবন ঝুপড়ি থেকে বেরোবার জন্যে পা বাড়ায়। কালী ব্যাকুলভাবে বলে, 'আমার মাথা খা পবন, মিষ্টিটুকু খেয়ে জল খেয়ে যা। 'না।' বলে পবন বেরিয়ে পড়ে।

তবু কালী জিনিস দুটো ঘর থেকে বার করে এনে বলে, 'না খেয়ে গেলে আমি বড় দুঃখু পাব পবন।'

'ওঃ। দুঃখু পাবি।' পবন তীব্র ব্যঙ্গে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'এখন থেকেই ভদ্দর লোকের ভাষা শিখছিস? ওই—রসগোল্লা তো সেই শালার দেওয়া? পবন পা দিয়েও ছোঁবে না। আর তোকেও চরিত্তির খারাপ করে রাবড়ি-রাজভোগ খেতে দেবে না।'

'পবন!' কালী নিজেই রসগোল্লা দুটো ছুঁড়ে ধুলোয় ফেলে দিয়ে বলে, 'যা মুখে আসছে তাই বলছিস যে দেখছি! বাড় বড্ড বেড়েছে! জানিস তোকে এক্ষুণি পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া যায়, তোর নামে থানায় ডাইরী করা আছে! বটু ডাক্তার—'

পবন তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'শুধু ওই একটা? দেখ্‌গে যা আরো কত থানায় কত ডাইরী—'

'ওঃ। তার মানে তুই এতদিন চুরি করেই বেড়াতিস? বাঃ পবন, বাঃ!'

পবন এ ধিক্কার গায়ে মাখে না, জোর গলায় বলে, 'চুরি, ছিনতাই সবই। না কবলে, কে আমায় ডেকে চাকরি দিচ্ছিল? পেটটা চালাতে হবে তো?'

কালী ঘৃণার গলায় বলে, 'অমন চালানোর থেকে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল পবন!'

পবন হঠাৎ কখনো যা না করেছে তাই করে। কালীর দুই কাঁধ চেপে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'তবে বলি কালী, তার আগে তোরও তাই উচিত। লোভে পড়ে বিশ্বাস ভাঙাও যা, চুরিও তা। তুই কি ওই আড়তদারটাকে চিনিস-জানিস? আগে কোনদিন দেখেছিস ওকে? কিছু না, শুধু লোভে পড়ে ওর গলায় মালা দিতে যাচ্ছিস। এত অধর্ম তোকে করতে দেব না কালী!'

কালী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না, শুধু খুব শান্ত হয়ে গিয়ে বলে 'এখন অন্য রকম হলেও খুব অধর্ম হবে পবন। আমি তোর কাছে হাত জোড় করছি—'

'ওঃ, হাত জোড়! অনেক নাটক শিখেছিস দেখছি—'

পবন ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ছেড়ে ফেলে দিয়ে বলতে বলতে চলে যায়, 'আচ্ছা, আমিও দেখাচ্ছি।'

কালী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে পবনের পথের দিকে নয়, পবনের সামনে ধরে দেওয়া সেই রসগোল্লা দুটোর কাদামাখা মূর্তির দিকে।...যতবার ঘরে খাবার মিষ্টি এসেছে ততবারই কালী বাবাকে লুকিয়ে তার থেকে কিছুটা তুলে রেখেছে, যদি হঠাৎ এসে যায় পবন। একটু গুড়ের চা ব্যতীত কোন দিন তো কিছু খাওয়াতে পারেনি, ভাল জিনিস খেতে গেলেই ওর কথা মনে পড়েছে। আজ ওকে দেখে বড় আহ্লাদ হল, কত আশা করে ঠাণ্ডা জলটা এগিয়ে দিল, তার এই দুর্দশা! অথচ ভেতরটা যে ওর ক্ষিধেয়, তেষ্টায় 'টা-টা' করছে তা তো স্পষ্ট চোখে দেখতেই পারছিল কালী।

জানি না কী অঘটন ঘটায়। আত্মঘাতী না হয়, এই ভাবনা কালীর।

ব্রজকে আসতে দেখা গেল। কালী তাড়াতাড়ি পা দিয়ে মিষ্টি দুটো আরো দূরে ফেলে দিল কোনদিন যাতে বাবার চোখে না পড়ে।

পবন কী-না-কি করে বসে, একথা কারোর কাছে প্রকাশের উপায় নেই। পবনের পিছনে পুলিশ ঘুরছে, এসেছিল শুনলেই হৈ-চৈ পড়ে যাবে। হয়ত ব্রজই ধরিয়ে দেবে।

আবার ভুল করে বসে কালী।

পুলিশের হাতে পড়া ছাড়া যে ওর গতি নেই, এইটা আন্দাজ করে, এখনি ধরিয়ে দিতে পারলে সব দিক রক্ষে হত। দুমাস চার মাস আটকে থাকত, ততদিনে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

আর যা এতদিন ভেবে রেখেছিল কালী। এতদিনে পাকাপাকি নস্কর গিন্নী হয়ে আব্দার করে বলতে পারত, 'আমার বাবাকে তো চাকরি দিয়েছ। আমার এই বন্ধুটাকেও দাও দিকি একটা চাকরি-বাকরি। আমার চোখের সামনে থাকুক, বাউণ্ডুলে উড়ন চণ্ডেটা—'

আহা, কালীর হিসেবের ভুলে সেসবের কিছু হল না। হল এই—

গায়ে হলুদ মাখা বর মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে গেল, আর উগ্রচণ্ডা বাউণ্ডুলেটাকে হাতে হাত কড়া লাগিয়ে জেলখানায় যেতে হল।

ব্রজ মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'আমার কপালে এই ছিল কালী! সুদাম কি আর এরপর এ বিয়েতে রাজী হবে?'

কালী বিচিত্র একটু হেসে বলে, 'সুদাম রাজী হলেও তোমার মেয়ে আর রাজী হতে পারছে কই বাবা!'

ব্রজ ছিটকে উঠে বলে, 'তার মানে?'

কালী একটু হেসে বলে, 'যে হতভাগা আমার জন্যে খুন করে ফাঁসি যেতেও প্রস্তুত, তোমার মেয়ে তাকে একটু বিয়ে করে কেতার্থ করতে পারবে না? কী এত মহারাণী মেয়ে তোমার বাবা।...নাঃ, বড় মানুষের শ্বশুর হওয়া আর তোমার ভাগ্যে হল না বাবা!'

স্বজাতি

স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল ছেলে দুটো ওই বুড়ো ভদ্রলোককে বাসের দরজার সামনে থেকে ঠেলে ফেলে দিল। স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। বাসের আরোহীরা সবাই দেখতে পেল। অবিশ্যি সবাই চট করে বুঝতে পারে নি, হঠাৎ ব্যাপারটা কি ঘটে গেল, কারণ ওই দরজাটার সামনেই তো যত জটলা।

পরে অবশ্য পারল বুঝতে।

বাসের আরোহীরা, আর বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরাও। ভদ্রলোকের হাতে একটা ভারীগোছের থলি ছিল। নেহাত চটের থলি নয়, সে জিনিস আজকাল আর বড় কেউ ব্যবহার করে না, বাদে রেশন আনা আর গমভাঙানো ছাড়া। চটের অথচ চটকদার এতো রকম থলি ঝোলা বাজারে মেলে যে, গরীবটরীব লোকেরা তাদের ভারবাহী চেহারা থেকে দীনহীন ভাবটা কমাতে পারে।

বুড়ো ভদ্রলোকের হাতে প্রিন্টেড্ শাড়ির মত সৌখিন প্রিন্ট করা রবার-কোটিং ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল, বেশ ভারীগোছের। প্রায় বাসটা ছেড়ে'দেবার মুখেই সেটা বয়ে তাড়াতাড়ি এসে উঠে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ উঠে পড়েছিলেন। পাদানীতে একটা পা, (ব্যাগ ছাড়া খালি হাতটা দিয়ে রডটা চেপেও ধরেছিলেন) এবং আর একটা পা বাসের ওপর তুলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় ঘটলো ঘটনাটা, মানে ছেলে দুটো ঘটালো।

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা হঠাৎ টুক করে চটি পরা একখানা পা তেরছা করে বাড়িয়ে দিল দরজার অপরদিকে, রডের দিকটায়। আর অন্য ছেলেটা, কাঁধটা ঝাঁকিয়ে, কনুইটা একটু তিনকোণা করে বাড়িয়ে দিল ভদ্রলোকের রড ধরা হাতটার দিকে।

অতএব ভদ্রলোককে মুখ থুবড়ে রাস্তার ওপর পড়ে যেতেই হল। ঠিক পুরোপুরি রাস্তার ওপরও নয়, কোমর থেকে পা অবধি রাস্তার ওপর, আর কোমরের ওপর থেকে শরীরের ওপর ভাগটা ফুটপাথের ওপর। তার কারণ বাসটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি একটা হৈ-চৈ উঠল।

উঠবেই, মানুষ তো আর অমানবিক নয় যে, একটা বুড়োলোক বাসে উঠতে না পেরে, ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল, আর সেই দৃশ্যের দর্শকরা হৈ-চৈ করে উঠবে না? যারা রাস্তায় ছিল, তারা তো নড়েচড়ে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখল ও মরেটরে গেল কিনা লোকটা।...

বাসের মধ্যেকার লোকেরা অবশ্য সিট বেদখল হয়ে যাবার ভয়ে দাঁড়ালো না। একখানা করে পা রাখবার মত সিটটাও তো দখলে রয়েছে। নড়ল না। শুধু গলা বাড়িয়ে যতটা সম্ভব দেখবার চেষ্টা করে পরস্পর পরস্পরকে জিগ্যেস করতে লাগল, ব্যাপার কী? কী হোল বলুন তো? কেউ পড়েটড়ে গেল না তো? ও, এই বুড়ো ভদ্রলোক? থলি হাতে?...রডটা চাপতে পারেনি, হাত ফস্‌কে গেছে?...আঃ এইসব বুড়োলোকেরা কেন যে ভিড়ের বাসে চড়তে আসে। তাও আবার মোটঘাট বয়ে।

বেশীর ভাগ অ্যাক্‌সিডেন্ট নিজের দোষেই হয়। দেখতে পাচ্ছেন কিছু? মাথা-ফাতা ফেটে গেল না তো? গেলেই বা কি? শহরের রাস্তায় এ তো নিত্য ঘটনা! নিত্য কী মশাই, প্রতিক্ষণের বলুন। মানুষের জীবনের আর কোনো দাম আছে?

বাস ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে অবশ্য।

একটা লোক বাসে উঠতে না পেরে যদি রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকে, সে দেখবার দায়িত্ব বাসের নয়। রাস্তার লোকগুলো তাহলে আছে কী করতে?

তবে? যারা বাসে চড়ে রয়েছে, তারাই বা আর কী করতে পারে, আরো খানিকক্ষণ আলোচনা করে চলা ছাড়া।...বর্তমানের পৃথিবীতে জীবন কত অনিত্য, মৃত্যুটা কী সহজ, এমনই সব দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে করতে যে যার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

রাস্তায় পড়া লোককে রাস্তার লোকে দেখবে এটা নিশ্চিত বলেই বিবেকের দংশন অনুভব করে না কেউ। কিন্তু আশ্চর্য, একটা লোকও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না, টু শব্দেও না যে, দরজায় দাঁড়ানো ছেলে দুটো, বুড়োকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। স্পষ্ট দেখেছে সবাই, একেবারে সবাই না হলেও অনেকেই। কিন্তু বলবে কোন সাহসে? প্রাণের ভয় নেই? সমাজের সবচেয়ে 'ভয়ঙ্কর' জীবের সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলে ফেলার মত ভয়ঙ্কর দুঃসাহস কার আছে?

হ্যাঁ, আজকের সমাজে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এই 'ছেলেরা'। সাপ, বাঘ, সিংহ, ভালুক, বোমা-বারুদ, আগুন কেউই ভয়ঙ্করতায় ওদের কাছে লাগে না। বড়বাজারের, গলায় কালো কারে বাঁধা রূপোর পদক পরা 'কালু মিঞা', 'খোকা সর্দার' ওদের কাছে খোকামাত্র। তাদের একদার নাম-ডাক, প্রভাব-প্রতিপত্তি এখন বাসি মুড়ির মত মিইয়ে গেছে এই ছেলেদের কাছে।

'ছেলেই' তো।

তাছাড়া আর কী বলা যায় ওদের? আর কোন্ পরিচয়ের মধ্যে ভরা যায়? ওই সুকুমারকান্তি, সুবেশ-সুকেশ সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ ছেলেগুলোকে তো 'লোক'ও বলা যায় না...খুঁজে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, বাড়িতে ওদের জামা-গেঞ্জি গুছিয়ে বেড়ায় মা কি দিদিরা এবং এখনো ওরা চকোলেট হাতে পেলে রীতিমত খুশী হয়ে ওঠে। ...তাছাড়া—ওরা হয়তো উচ্চস্তরের সাহিত্য পাঠক, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত, রাস্তায় যেতে আলি আকবরের সরোদা কি রবিশংকরের সেতার কানে এলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দোকান-টোকানের সামনে।

এদের কেউ কেউ হয়তো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রও।

তবে?

তাহলে?

তাহলে, উদয়াস্ত রাস্তায় থাকে বলেই কিছু আর ওদের রাস্তার ছেলেদের মত 'ছোঁড়া' বলা চলে না। আবার ছোকরা বললে, এদের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, ভুল সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অতএব এরা 'ছেলে'।

যদিও এরা যে-কোনো ভয়াবহ ডাকাতির নায়ক হতে পারে। বিমান ছিনতাইয়ের হীরো হতে পারে অনায়াসে। পথচলতি মানুষের পিছন থেকে পিঠে ছোরা বসিয়ে দিয়ে, রুমালে হাত মুছে, কফি হাউসে গিয়ে বসে মৌজ করে কফি খেতে পারে এবং অতি অক্লেশে রাস্তায় পার্ক করে রাখা লক্ করা অ্যামব্যাস্যাডার গাড়ি লুঠ করে নিয়ে, চটপট রং নাম্বার পাল্টে ফেলে যা নয় তাই করে বেড়াতে পারে। তবু ওদের কথা বলতে হলে বলতেই হবে 'ছেলে'।

আর এই বলার সময় ব্যবহারিক বাংলা ভাষা 'কী দরিদ্র' ভেবে দুঃখ করতে হবে। কিন্তু দুঃখ হলেও কাজ চালিয়ে তো যেতেই হবে।

যাক, রাস্তায় বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা দেখতে পেল ছেলে দুটোর কারসাজিতেই বুড়ো ভদ্রলোক পড়ে গেল কিন্তু সেকথা বলে হৈ-হৈ করে উঠবে এমন আত্মনাশা বুদ্ধি কার থাকতে যাবে?...ওরা পড়ে যাওয়া লোকটাকে ঘিরেই হৈ-হৈ করতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে টুকরো টুকরো শব্দ উঠছে 'হাসপাতাল' 'অ্যাম্বুল্যান্স' পকেটে ঠিকানা আছে কি?' এই তো দোষ মানুষের। রাস্তায় মরলে, আইডেন্টিফাই করাবার উপায় থাকে না'...'প্রত্যেকের উচিত পকেটে পরিচয়পত্র রাখা—

কিন্তু আপাতত লোকটার উচিত গতি করবার দায়িত্ব কার সেটা কারো মাথায় আসছে না। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, হঠাৎ দেখা গেল গোটাকতক ছেলেই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে মুহূর্তে জটলাকে চিরে ফেলে সেই ফাঁক দিয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে বার করে আনল, সাপটে তুলে বাগিয়ে ধরে।

ইতিমধ্যে যে একখানা ট্যাক্সিও এনে ফেলেছে ওরা তাও নজরে পড়ে নি কারুর! নজরে পড়ল, বুড়ো ভদ্রলোককে তার মধ্যে ঠেলে তোলার সময়।

ওরা দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের গ্রাহ্যমাত্র করল না,—জিগ্যেসও করল না ব্যাপারটা কি। যা কথা নিজেদের মধ্যেই করল। মোটামুটি আস্তেই—'এই সুকুমার, তুই মাথার দিগটা ধর, আমরা পায়ের দিকে'—বিজু দেখিস, টানা-হ্যাঁচড়াতেই না বুড়ো পটল তোলে। বুড়োর মাথাটা মাইরী ঝুনো নারকেল'—ফেটে চৌচির হয়ে যাবার কথা, দিব্যি আস্ত রয়েছে—রক্তটা কিসের?

ও কিছু না, নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়েছে...।

এমন ভাবভঙ্গী, লোকটা যেন ওদেরই সম্পত্তি, যা করাবার ওরাই করবে।

কিন্তু গাড়িতে ওঠানোর পর একটা অভাবিত ঘটনা ঘটল, প্রস্তুত ছিল না কেউ। দলের থেকে একটা ছেলে সরে এসে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে, দাঁড়িয়ে থাকা, মানে তখনো যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে এসে বলে উঠল, আপনারা কেউ একজন সঙ্গে আসবেন না-কি দাদু?

আ—আমরা।

সবাই নয়, একজন কেউ? হ্যাঁ, একজন হলেও চলবে।

কেন? আ—আপনারা তো হস্‌পিট্যালে নিয়েই যাচ্ছেন, আ-র—আর কী দরকার?

ছেলেটা দাড়ি-গোঁফের চাপের মধ্যে থেকে একটু মুচকি হেসে বলল, দরকার কিছু না, তবে আমাদের পক্ষে সুবিধে হতো। আপনারা তো গোড়া থেকে দেখেছেন ঘটনাটা।

আর একটা ছেলে বলল, আমাদের তো দাদু বাজারে তেমন সুনাম নেই, হস্‌পিট্যালে নিতে চাইবে না হয়তো। হয়তো ভাববে, আমরা নিজেরাই খতম করে, পট্টি দিতে হসপিট্যালে নিয়ে গেছি...মানে ওইভাবেই তো অনেক সময় লাশ পাচার করা হয়।...

একেবারে সামনের লোকটার পিটটান দেবার উপায় নেই বলেই বোধহয় নিথর পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পিছনের ওরা মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায়।

যাবে না? কে না বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটার অর্থ হচ্ছে 'সাক্ষী দেওয়া।'

'আপনারা গোড়া থেকে দেখেছেন।' ওরে সর্বনাশ!

কেউ কিছু দেখেনি বাবা। আগা-গোড়া-মাথা কিছু না। এ রাস্তা দিয়েই হাঁটেনি কেউ দশ দিনের মধ্যে।

বাজারে তোদের সুনাম নেই, তা যখন জানিস, তখন কেন নেই সেটা, তাও ভালোই জানিস। তবে? তবে তোদের সঙ্গে কে এক গাড়িতে উঠে মহানুভবতা দেখাতে হাসপাতালে ছুটবে মড়াটাকে নিয়ে।...

কী দাদু, স্ট্যাচু বলে গেলেন যে? যেতে সাহসে কুলোচ্ছে না? ভয়ের কিছু ছিল না দাদু। লাশ সঙ্গে নিয়ে ঠেলে হস্‌পিট্যালে গিয়ে উঠলে, ব্যাপারটা কি আমাদের পক্ষে সুবিধের হবে?...যাক, যাবেন না তা হলে? আপনারা—আরেস্‌ সাবাস। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল? এতোগুলো লোক বিলকুল হাওয়া? ঠিক আছে ঝুট-ঝামেলা হলে, ওই দোকানীবাবু রইল। ওর দোকান থেকে জল এসেছে। আচ্ছা দাদু, নোমোস্কার। এই বিজু, আর একটা ট্যাক্সির কী হল? ওটার তো সবটা জুড়ে বুড়োর লাশ।

দুটো গাড়ি ভরে চলে গেল ছেলেগুলো।

যাবার সময় মুখ বাড়িয়ে 'টা-টা' বলে বেদম হাসির আওয়াজ তুলে গেল।

পাষণ্ড আর কাকে বলে?

যাচ্ছিস একটা মড়া কোলে করে, তার সঙ্গে ওই হাসি।...ছিঃ ছিঃ! আহা বুড়ো ভদ্রলোক কী কাজে বেরিয়েছিল।

এগুলো কিন্তু মনে মনে! পরস্পরকে বলা যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, ভোজবাজির মত যারা হঠাৎ হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, আবার তো ফিরে আসতে হচ্ছে তাদের বাস স্ট্যাণ্ডে। না এসে গতি কি? একটা বুড়ো রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরল বলে কি লোকের জীবনছন্দে তালভঙ্গ হবে?

তবে আহা-উহু না করে পারবে কী করে?

এসব বলছে পরস্পর পরস্পরকে, কিন্তু ওই ছেলেগুলো সম্বন্ধে? একটা কথা না।

একজন বুঝি বলতে যাচ্ছিল, 'এই মস্তানবাবুরা এসব কাজে একপায়ে খাড়া—'

কিন্তু অন্য একজন ইশারায় থেমে যেতে বলল। প্রশংসাই হোক, আর নিন্দাই হোক, একই। ওদের প্রসঙ্গই বর্জনীয়। বাতাসে ওদের চর থাকে। অতএব কেউ কাউকে বলতে পারল না, 'এই ছেলেগুলোর মধ্যে বাসের দরজায় দাঁড়ানো সেই ছেলে দুটোকে দেখলাম। স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ!'

শুধু মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগলো—আর ভাবতে লাগল, কতক্ষণে বাড়ি গিয়ে গল্পটা ফলাও করে বলতে পারবে।

আচ্ছা, এরকম করল কেন?

বুড়োর হাতের ব্যাগটায় কি কিছু খানদানী মাল ছিল? অনেক সময় এইভাবে বাজার বওয়া থলিটলি করেই ব্যবসার কারেন্সি নোটের বোঝা নিয়ে ব্যাংকে জমা দিতে যায় নিরীহ দারোয়ানরা। অথবা সোনার দোকানের মালিকরা দোকান গুটিয়ে নিয়ে 'লকারে' রাখতে যায়।

ছেলেগুলো নির্ঘাৎ আগে থেকে সন্ধান পেয়েছিল।

কে বলতে পারে, বুড়োকে সত্যিই হাসপাতালে নিয়ে যাবে, না থলিটা বাগিয়ে নিয়ে লাশটাকে ময়দানের আশপাশে কোথাও ফেলে দিয়ে যাবে।

যত রকম নৃশংসতা আর বীভৎসতা সম্ভব, তা ভাবা হচ্ছে ছেলেগুলো সম্পর্কে। কারণ ওরাই এযুগের সব থেকে ভয়াবহ জীব। ওরা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

অথচ সব ছেলেরই একই সাজ। ঘরের ছেলেদেরও সাজের গুণে যেন পরের মত দেখতে লাগে। পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে যে চেহারা দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে, সেই চেহারার ছাঁদেই ছাঁচ।

সেই কোমল সুকুমার সদ্য তরুণ গালে চেষ্টা করে করে বানানো ঘন চাপ-দাড়ি-গোঁফ, সেই ঘাড়ে লতিয়ে পড়া, অথবা মাথার ওপর বাঁধা চুলের চাপ, আর সেই পলিয়েস্টার শার্ট, টেরিকট ট্রাউজার আর বহু বিচিত্র চপ্পল।

এটাই আদর্শ!

এটাই ছাঁচ।

'নেই' ঘরের ছেলেদেরও এই সাজের খাঁই।

এ-কি শুধুই ফ্যাসানের হুজুগ? না অবচেতনে অন্য কোনো রহস্য নিহিত? নিজেকে অন্যের কাছে ভীতিকর করে তোলার মধ্যে কি কিছু মজা আছে?

তা হয়তো আছে মজা।

অন্তত এই ছেলেগুলো রাস্তার ওই ভদ্রলোকদের ভীতি বেশ উপভোগ করলো।

পোড়া সিগারেটটা গাড়ির জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মানস বললো, আমাদের সঙ্গে যাসার প্রস্তাবে দাদুর আমাদের মুখটা কেমন হয়ে গেল দেখেছিলি বিজু? আহা, যেন সেই মাত্তর ইস্তিরি-বিয়োগের খবর নিয়ে টেলিগ্‌গেরাপ এলো।

বিজু খ্যা খ্যা করে হেসে বলল, আজ পর্যন্ত তো একখানা লাশ নাবাতে পারলাম না, তবু যে কেন এতো ভয়। দেখলো কি, যেন ভূত দেখলো।

সুকুমার বলল, যা বললি মাইরি। জ্যান্তে ভূত হয়ে বসে আছি। সেদিন ভাইফোঁটা নিতে দিদির বাড়ি যাচ্ছি শ্যামনগরে, বলব কি তোদের, রেলগাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঢেউ বয়ে গেল। ওই ভূত দেখার ঢেউ আর কি...মেয়েমানুষগুলো গলার হার-ফার ঢাকা দিতে শাড়ির কোণ গলায় টানছে, চুড়ি-বালা পরা হাতগুলো আঁচলের তলায় লুকোচ্ছে, বেটাছেলেগুলো চোরা চাউনি চেয়ে চেয়ে পুটপুট করে ঘড়ির ব্যাণ্ড খুলে খুলে পেন্টুলের পকেটে চালান করছে, সে একটা দৃশ্য মাইরি। যেন ওই সব করলেই পার পাবি গাড়োলরা। দেখে মজাও লাগছিল মাইরি, আবার নিজের

ওপর শালা ঘেন্নাও আসছিল।...নিরস্ত্র হয়ে দিদির বাড়ি যাচ্ছি নেমন্তন্ন খেতে,—

বিজু তেমনি 'খ্যা খ্যা' করে বলে, একেবারে নিরস্ত্র হয়ে? বিশ্বাস করতে বলছিস?

ওই তো! ওইটাতেই প্রাণে বড় দাগা লাগেরে। কেউ আর বিশ্বাস করে না। তোরাও না।

সুকুমার মুখ ফেরায়।

আহা-হা, মান করিস না, মান করিস না। কথার কথা বলেছি। তবে সত্যি নিরস্ত্র হয়ে বেরোনো ঠিক নয়। আমাদেরও আত্মরক্ষের দরকার আছে বাবা।

সুকুমার একটু হেসে বলল, সে যদি বলিস, সঙ্গে মামদোবাজী ছিল একটা। দিদির ছোট ছেলেটার সবচেয়ে লেটুস খেলা হচ্ছে মারদাঙ্গা। তাই ব্যাটার জন্যে একটা টয় রিভলবার নিয়ে যাচ্ছিলাম—

মানস দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে তেমনি মুচকি হেসে বলে, সেইটাকে হাতে নিয়ে কথকনাচ শেখাচ্ছিলি বোধহয়?

সুকুমার মাথা নাড়ল।

গড় প্রমিস মোনা, তখনও কিছুই করিনি। সবে রেলগাড়িতে পা ঠেকিয়েছি।...পরে অবিশ্যি—সুকুমারও মুচকি হাসল, প্যান্টের পকেটের মধ্যে থেকেই একটু লালুভুলু করে দেখালাম!...দরজার কাছ চেপে দাঁড়িয়ে আছি। কারুর নেবে যাবার উপায় নেই।

ওই তো শা—

বিজু বলল, এর নাম কি নিরস্ত্র?

সুকুমার পরিতাপের গলায় বলল, সে তো গরুগুলোর বেফায়দা ভয় দেখে রোখ্ এসে গেল। কিন্তু গোড়ায় যদি অমন না করতো, দিব্যি আড্ডা দিতে দিতে পলিটিক্সের ছেরাদ্দ করতে করতে ওটুকু রাস্তা পার করে দিতাম।...মেজাজ খিঁচিয়ে দেয় মাইরি।

বিজু চোখ কুঁচকে বলল, গাড়িতে শুধুই গরু ছিল শা—দু'একটা হরিণী-টরিণী ছিল না?

ছিল বৈকি। তা ওই তো বললাম, আঁচল তলায় হাত ঢাকতেই ব্যস্ত।

বিজু ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের সিটের দিকে তাকিয়ে বলল, কি-রে মানকে, বুড়ো টেঁসে গেল না তো?

মানিকই বুড়োকে সাপটে ধরে সিটে বসে আছে।

এরা তিনজন সামনের সিটে ঠাসাঠাসি করে।

এ গাড়ির ড্রাইভার তাদের দোস্ত।

আরো একটা ট্যাক্সি নিয়ে আরো দু-চারজনকে নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'এমারজেন্সি'তে ভর্তি করতে গেলে যদি গড়বড় করে, পৃষ্ঠবলটা দেখিয়ে দেবে।

লোকবল বড় বল।

মানিক বলল, না না, তেমন ঘাবড়াবার কিছু নেই মনে হচ্ছে মাথার চোটটা লেগে সেন্সলেস হয়ে গেছে।

মানস বললো, আর একটু কেয়ারফুলি কাজ করা উচিত ছিল রে মানকে। বুড়ো শুধু একটু ঘসটে পড়লেই কাজ মিটে যেতো।

এটা অঙ্ক কষা নয় মোনা।

নাঃ। তোর আর কোনদিনই জ্ঞান হবে না। এসব স্রেফ অঙ্ক কষাই।... পার্ক সার্কাসের মোড়ে সেদিন সেই হিড়িম্বার মতন দেখতে মহিলাটির ব্যাপার ভাব? পেটমোটা ব্যাগটা হাতে নিয়ে কী অহঙ্কারীর মতন রাস্তা ক্রশ করছিল মনে আছে? যেন নিজের বাড়ির বারান্দা পার হচ্ছে।...কিচ্ছু করেছিলাম আমি? স্রেফ 'বুদ্ধু' সেজে রাস্তা ক্রশ করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে আগু-পিছু করে পড়লাম মহিলার ঘাড়ে।...সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি এসে গেল ঘাড়ের কাছে।...হিড়িম্বা রাস্তায় পড়ে গেল। গাড়ি চলে গেল! কিন্তু হল কিছু তার? যা হয়েছিল ওই 'লাশখানি' নিয়ে আছাড় খাওয়ার জন্যে। অবিশ্যি ব্যাগটা হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে? বেশ কিছুদিনের মত রসদ জুটেছিল হিড়িম্বার ব্যাগ থেকে।

মনে আবার নেই? ব্যাগের মধ্যে ছিল না এমন জিনিস নেই। যাদুঘর বললেও হয়। কি কি ছিল রে বিজু?

আরে বাবা, সে তো চণ্ডী পাঠ থেকে জুতো সেলাই সব। ডাক্তারের প্রেসকৃপশন, দোকানের ক্যাশমেমো, লণ্ড্রীর বিল, ইনডেন গ্যাসের ভাউচার, নোভালজিন, ঘুমের বড়ি, টফি, সেপটিপিনের পাতা, মনিঅর্ডারের কুপন, স্টেট লটারির টিকিট, ব্যাঙ্কের পাশবই, একটা ইস্কুলের ছেলের মাইনের খাতা, কার যেন একখানা বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি।

উঃ সাবাস! বিজু। এতো মনে আছে তোর? ইস্ এই মেমারিটা লস্ যাচ্ছে। কোনো কাজে লাগছে না।...আচ্ছা, ওই ইস্কুলের মাইনের খাতা, আর ব্যাংকের পাশবইটা আমরা পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম না?

হ্যাঁতো! তোর যে আবার সেদিন বিবেক উথলে উঠল। বললি, আমাদের তো এগুলো কাজে লাগবে না, অথচ যে হারিয়েছে, তার জীবন মহানিশা।

দ্যাখ বিজু, ভেবে সুখ পাই বিবেক-ফিবেককে ঝাড়ু মেরে সাফ্ করে ফেলেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে কোথায় বসে যে পিন ফোটায়। সেদিন বাসে আর একটা মেয়ের হ্যাণ্ডব্যাগ সাফাই করে ভেতরে একটা নোটবুক পেলাম, বুঝলি। রাজ্যির ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা...দেখে পেটের মধ্যে না বুকের মধ্যে কে জানে কোথায় যেন চিন্‌চিন্ করে উঠল।...আহা নোটবুক হারানোর সঙ্গে সঙ্গে কত ভালবাসার সম্পর্কের যোগাযোগের রাস্তা হারালো বেচারী।...হয়তো পুরনো লাভারের ঠিকানা ছিল, কিম্বা নতুন প্রণয়ীর ফোন নম্বর।

এছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না তোর। মাসি, পিসি, দাদু, দিদা এদের সব থাকতে পারে না? ইস্কুল-কলেজের সহপাঠী? তোর মাথায় এল ওই একঝাঁক প্রণয়ী?

দূর! তা কেন? ঝাঁকের মধ্যে দু-একটা। তাতে গোপন করে রাখা সুবিধে বলেই—যাক গে—নিঃশ্বাস ফেলল মানিক, সেটা তো পড়েই রইল!

তা, এতই যদি হাহাকার, দিলেই পারতিস পাঠিয়ে।

ওইখানেই তো বিউটি। এতোজনের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর আছে, নিজেরটা নেই।

তুই শালা একটা শুয়োর। কি করে জানলি নিজেরটা নেই?

আহা নিজেরটা তো 'ইস্‌পেশাল' করে খাতায় পেরথম পিষ্ঠেয় লিখে রাখতে? প্রথম নম্বরই হচ্ছে কানপুরের একটা ঠিকানা। তারপরই হাওড়া রামরাজাতলা...এইরকমই ব্যাপার।

কলকাতার নেই?

থাকবে না কেন? শ'খানেক।

—তা' যে-কোন একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিলেই হতো। পেয়ে যেত।

পেয়ে যেত! মানে?

মানে অতি সোজা। যে পেতো, সে ঠিক লোককে পাঠিযে দিতো।

তোর কথাগুলো বিজু হান্ড্রেড পার্সেন্ট গোলমেলে। সেই বা বুঝবে কি করে, কার খাতা তার হাতে এসে গেছে।

মানস আর একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, সেটাও শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, মিথ্যে খাটছিস বিজু, মানকের মগজের দরজা-জানালাগুলো টাইট দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে ভগবান। হাতের লেখা দেখে চিনবে না?...অন্য অন্য আত্মীয়বন্ধুদের নাম-ঠিকানা দেখে সিওর হবে না?...জানালা-দরজাগুলোর হ্যান্ডেল ধরে রোজ খানিকক্ষণ করে ঝাঁকুনি দিবি বুঝলি, কিঞ্চিৎ ঢিলে হয়ে যাবে।...দেদার দিসনি আবার বেশি ঢিলে হলেও মুশকিল। এই বাগিয়ে ধর। এসে গেছি।

গাড়ি মেডিক্যাল কলেজের গেট-এ এসে দাঁড়াল।

দুই

শম্ভুনাথ পণ্ডিতে দিতে পারতো, সেটাই দেওয়া উচিত ছিল। কাছে পড়তো, কিন্তু ওটা চেনা পাড়া, কে কোন্ দিক থেকে দেখে চিনে ফেলবে! এটা সেফ্!

যদি জেরায় পড়তে হয়, 'ওপাড়া থেকে এপাড়ায় কেন বাবু? তার জবাব তৈরী আছে।' ভর্তি করে নিতে রাজী হয়নি। ভাগিয়ে দিয়েছে।...

কে কখন ভাগিয়ে দিয়েছে?

তারও জবাব তৈরী।

দোষ স্বীকার করছে না। এই সব হাসপাতালে-টাসপাতালেই তো যত দুর্নীতি, যত মিথ্যাচার। এ যুগের ডাক্তাররাই হচ্ছে দুনিয়ার সেরা নিষ্ঠুর।

এ ছাড়াও রক্ষাকবচ আছে।

পূর্ণ, পবিত্র আর জগদীশ শম্ভুনাথে নেমে এমারজেন্সিতে ঢুকে একটু ঘোরাঘুরি করে বলবে, 'একটা অ্যাকসিডেন্ট কেস আছে।' স্বভাবতই ওপক্ষ থেকে প্রতিরোধ আসবে। সত্যিই তো কর্তৃপক্ষ হৃদয়দুয়ার খুলে বসে থাকে না।

টালবাহানা করবে, কোথায় পেসেন্ট? কি রকম অ্যাকসিডেন্ট? কোন্ জায়গায় কীভাবে, গাড়ীর ধাক্কা, না গাড়িচাপা, জগদীশরা চোখ গরম করে বলবে, অত জেরার আগে লিখে নিন তো?

পেসেন্ট না দেখেই?

আসছে পিছনে। সাবধানে আনছে।

আসুক দেখি।

ঠিক আছে...।

বলে গট গট করে বেরিয়ে আসবে ওরা রীতিমত শাসিয়ে। ওরা আবার দক্ষিণের ছেলে নয়, উত্তরের আর পূবের। জগদীশ বেলেঘাটার ছেলে, পূর্ণ কাঁটাপুকুরের, পবিত্র রামধন মিত্তির লেনের। ছটি গ্রহের একত্র সমাবেশ হল কি করে, তা এরা নিজেরাই ভুলে গেছে।

এই পেশা এদের।

পকেটমারই।

কিন্তু নিঃশব্দে কাঁচি কাটার খেলোমি নেই এতে। তাছাড়া কাঁচি কাটার যুগও তো ফুরিয়েছে। অতি সৌখিন বহু লাখপতি অবাঙালী বিজনেসম্যান ছাড়া—কাঁচি কাটার উপযুক্ত চিকন আদ্দির পাঞ্জাবী আর কে পরে আজকাল?

তাদের পাঞ্জাবীর বুক পকেট ফুঁড়ে ওঠা একশো টাকু গোছা চোখের সামনে দেখতে পেলেও তাদের ধারে-কাছে, আগে-পিছে বডিগার্ড। বোঝা যায় না, আবার বোঝা যায়। অতএব সেদিকে কাঁচি নিয়ে তাকিয়ে লাভ নেই।

আর সব তো পেন্টুল।

'এ' থেকে 'জেড', অথবা 'ক' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত সক্কলের তো ওই সার। একটা পেন্টুল, একটা বুশশার্ট! তাদের পকেট-ফকেট অনির্দিষ্ট। ধুতি-পাঞ্জাবী পরত নেহাত প্রাচীনপন্থী গেরস্থ বুড়ো-হাবড়ারা। তা তাদের পকেটে থাকেই বা কি?

এই যে বুড়ো ভদ্রলোক বাস থেকে ছিটকে পড়ল, মোটা ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবী পরা, কি আছে তার পকেটে? হাতের ব্যাগেই বা কোন মূল্যবান বস্তু?

আসল কথা, দোকানী-পসারি ছাড়া, ঘরোয়া লোকেদের তো আজকাল আর পুরুষের পকেট বলে কিছু থাকে না; সর্বদাই তো মহিলাদের হ্যাণ্ড-ব্যাগে গিয়ে উঠছে।...এদের তাই প্রধান টার্গেট মহিলা। তবে তাক বুঝে কর্তাদের ওপরও হামলা পড়ে বৈকি।

কিন্তু এই ভদ্রলোকের কাছে কী ছিল?

যার জন্যে তাঁকে এখন রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়তে হলো?

ব্যাগটা দেখেছে পবিত্র-জগদীশরা। দেখে মুখ বাঁকিয়েছে।

কিন্তু আজকের এই শিকারের টার্গেট, ওই বুড়ো নয়। অতএব তার হাতের ব্যাগটাও নয়। টার্গেট অন্য।

টার্গেট সেই চাবুকের মত মেয়েটা!

বুড়োর বাড়িতে যার অবস্থান।

অবশ্য সুইনহো স্ট্রীটের ওপর ওই সৌখিন গেট বসানো, সুন্দর বারান্দাওলা বাড়িটাকে বুড়োর বাড়ি বলাটা ভুল, ওই লোকের ওই বাড়ি হতেই পারে না। কিন্তু ওটাই যখন বুড়োর আস্তানা, তখন আর কীই বা বলা যায়?

বিজু অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছে তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আবিষ্কার করতে পারেনি বুড়ো এ বাড়ির কে? কী সূত্রে এখানে বাস করে!

বিজু এসে আড্ডায় বলেছে মাইনে করা লোক বলে মনে হয় না, মানে বাজার সরকার-টরকার নয়। বাড়ির কাজ করবার লোকজনদের তো ধমক-ধামক দেয় শুনতে পাই। অথচ ওই চেহারা, ওই সাজসজ্জা।

বাড়ির খোদ কর্তার না প্যারালিসিস?

সেই তো। বছর তিন-চার ধরে বিছানায়। এদিকে নাকি হেলথ খুব ভালো, চেহারা অতি চমৎকার, কিন্তু ওই একটা দিক নাড়তে পারে না। এই বুড়ো চব্বিশ ঘণ্টাই সেই কর্তার ঘরে।

তার মানে মেল নার্স।

দূর। ওর কি সাধ্য যে সেই লাশকে নড়ায়? তার জন্যে আলাদা লোক আছে।

তবে এ কি করে।

কর্তার সঙ্গে তাস খেলে, দাবা খেলে, কাগজ পড়ে শোনায়।

ওই আগলি লোকটা? কেন মেয়েটা পারে না?

মেয়েটা যে বুড়োর কে তাই বা কে জানে।

তবে আর কি এনকোয়ারি যাদু?

ওই যা হয়েছে ঢের। যা একখানা কুকুর আছে বাড়িতে।

আর ওই দিদিমণিটি। উঃ! কলেজ যায় আসে, যেন একখানা জ্বলন্ত মশাল চলেছে। মানকের যেমন ভোকাট্টা বায়না। ওই মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করবে।

হ্যাঁ, ওদের পেশা যাই হোক, আপাতত আজকের ঘটনার মূল উদ্দেশ্য, ওই মেয়েটার কাছাকাছি পৌঁছনোর উপায় আবিষ্কার। এই অদ্ভুত উপায়টাই মাথায় এসেছে ওদের।

অবশ্য যুক্তি যে নেই তা নয়, কারো বিপদের সময়, মৃত্যুর বিশৃঙ্খলার সময় যত সহজে অন্দরের দরজায় পৌঁছে যাওয়া যায়, সহজ শৃঙ্খলা, সুখ-স্বস্তির সময় কি তা যায়? অতি ডাঁটুস বাড়িতেও এরকম আলগা সময় শিথিলতা আসে। আর সেই বিপদ-বিশৃঙ্খলার সময় যদি কেউ ত্রাণকর্তা হয়ে আসে?

সেই অবস্থাটা মনে মনে ছকে নিয়েই এদের এই কর্মপদ্ধতি।

তিন

খবরটা তাহলে তুই-ই দিতে যাচ্ছিস তো মানকে?

মানস বলল মুচকি হেসে।

আ-আমি একলা?

তবে আবার কী?

না, না, একজন কেউ আমার সঙ্গে চল।

কেন হে সোনারচাঁদ? বাসরে ঢোকবার সময় কি তুমি আর কাউকে সঙ্গে নেবে? যাও বুড়োর ব্যাগটি নিয়ে সোজা চলে যাও, বীরের মত গেট পার হয়ে 'বাড়ির লোকদের' ডেকে দিতে বলো গে—তারপর যা পারো করো।

এতো হার্টলেসের মতন কথা বলছিস কেন রে মোনা? তোরা পাঁচটা পাশ করা, তোদের বুদ্ধি বেশী—

পেরেম করতে বেশী বুদ্ধি লাগে না যাদু। ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই হলো। তা সেটা তো খানিক এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখগে যা, যেই তুই খবর দিবি, সেই উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি নিয়ে ছুটবে তোমার আরাধ্যা দেবী, তোমাকেই সঙ্গে নিয়ে। তবে কেন মিছে আর কাউকে নিয়ে ঝুটঝামেলা.

তুই বুঝতে পারছিস না মোনা। যদি কী বলতে কী বলে ফেলি! দৃশ্যটা তো চোখের ওপর ভাসছে। অসাবধানে মুখ দিয়ে কিছু উল্টোপাল্টা বেরিয়ে গেলে? তুই চল না বাবা, বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে—

আমি? আমি কী রে? আমার জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু, রাস্তায় পড়ে গেল দেখে, বুকে করে কুড়িয়ে নিয়ে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়েছি, শম্ভুনাথে জায়গা না পেয়ে—

তোর জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু?

আরে বলতে হবে তো একটা কিছু।

যদি এনকোয়ারি করে?

কোথায়? পরলোকে গিয়ে?

যাক। জ্যাঠামশাই ছিল তাহলে?

দ্যাখ মান্‌কে, একটা জ্যাঠামশাই নেই কিম্বা ছিল না, এমন হতভাগা আমাদের এদেশে অন্তত নেই। নিজের না থাক, তুতোও থাকে। সে ম্যানেজ হয়ে যাবে। দেখিস, বুড়োর বাড়ির লোক কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বলে উঠবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে জ্ঞানপ্রকাশ বাগচী তো? নামটা খুব শুনতাম এঁর মুখে।

কেন বলবে?

বলবে রে বলবে। ওটাই মনুষ্য রীতি। তবে ওই ডাঁটুস মেয়েটা কী রীতি-প্রকৃতির কে জানে। পুলিশ কেসেও ফেলে দিতে পারে। বললেই হলো বুড়োর সঙ্গে অ্যাতো ছিল, ত্যাতো ছিল—

মানিক কড়া গলায় বলে, কক্ষণো না। তেজীরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

কেন বলবে না? আমরাই কি কম তেজী? যে যার বাড়ি গিয়ে হিসেব করগে যা না। আমাকে তো বাড়ির সবাই বাঘের মত ভয় করে। জানে দারুণ তেজী ছেলে, ওকে ঘাঁটানো চলবে না। অথচ এই-তো মিথ্যে নিয়েই কারবার!

সেকথা আলাদা।

মানিক দুঃখিত গলায় বলে, কিন্তু পুলিস কেসের কথা বলছিস কেন বাবা। ভাল্লাগছে না।

আমারই কি লাগছে? উপায় কি? অ্যাকসিডেন্টের সেন্সলেস পেসেন্ট ভর্তি করতে গেলেই অনেক ঝুট্‌ঝামেলা। যতক্ষণ না সেন্স ফিরে আসছে। যাক, ঘাবড়াসনি! সুকুমারের পুলিশ অফিসার মামাকে বলতে গেছে সুকুমার। ম্যানেজ হয়ে যাবে।

মানিক ক্ষুব্ধ গলায় বলে, শালা সুকুমারটা দেখিস, ঠিক একদিন দল থেকে পিছলে পড়বে। ওই মামার দৌলতে চাকরি-বাকরি বাগিয়ে, দিব্যি একখানা বৌ জুটিয়ে ভদ্দরলোক বনে যাবে। এখনো মামা ব্যাটা ওকে সামলে বেড়াচ্ছে। আর আমার মামা মুখ দেখে না। এমন কি আমার কারণে, আমার মাকেও তফাত রাখে। নিজের মামা। অথচ সুকুমারের তুতো মামা—

মানস মুচকি হেসে বলে, 'তুতো' বলেই তো! তুতো দাদাদের তুতো বোনেদের ওপর টান বেশী। সে যাক, এখন সুকুমার না আসা পর্যন্ত—অন্তত বাড়ির লোকটোক এসে পড়লেও যদি আমার জ্যাঠামশাইকে মেনে নেয়, হয়ে যাবে ফয়সালা।

মানিক বলল, এতোসব হতে পারে ভাবিনি।

সেই তো—কে জানতো শ্রাদ্ধ এতো দূর গড়াবে। ভাবা গিয়েছিল, একটা ফার্স্ট এড্ গোছের দিয়ে, বুড়োকে বুকে ধরে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে, সেই ফাঁকে তুই ওই চাবুকের সঙ্গে একখানা ভোঁকাট্টা করে ফেলবি। তারপর তো আর কেউ স্পটে থাকব না, তোর লাইন ক্লীয়ার।

খোদা জানে কে কোন সূত্রে স্পটে এসে যাবে।

আরে বাবা ওই জন্যেই তো বলছি—'একলা চলো রে।'

তুই-তো কান্নাকাটি করেছিলি, এতোখানি বয়েস হলো—একটা ভালবাসাবাসি হল না। তা' তুই ফার্স্ট চান্স নে।

মানিক দুঃখের গলায় বলে, শুধু শুধু কান্নাকাটি করিনি রে, তোদের সঙ্গে আমার অনেক ফারাক। তোরা সব ইউনিভারসিটির জুয়েল এক একখানা। তোদের মামা-কাকার ভরসা আছে, ঠিকই একে একে বৈতরণী পার হয়ে যাবি। জগদীশটা তো অলরেডি একটা চাকরি বাগিয়ে ফেলেছে। আর হতভাগা মান্‌কে পার্ট টু ফেল, বাড়ি ঢুকলে বাপ মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, মা মুখনাড়া ছাড়া ভাত দেয় না, বোনটা সামনে দিয়ে কলেজ যায় আসে, ভাব দেখায় যেন চেনে না। আবার ছোট ভাইটাকে কী শিখিয়ে রেখেছে জানিস?—শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, মানিক্ মানিক মানিক, যাদুমণি, সোনামণি, দুদু খাবে খানিক। শুনে না রাগে--

বলিস কি। ও হো হো হো।

মানস হেসে ওঠে হো-হো-হো।

তারপরই বলে ওঠে, এই মান্‌কে দেরী করিস না। অ্যাডমিশনের টাইম থেকে টাইমলি খবর না দিলে—দিদিমণি খিঁচিয়ে বলবে, অ্যাতোক্ষণ পরে খবর দিতে এলেন।

দূর। এখন আর আমার ভাল্লাগছে না মোনা। মনে হচ্ছে এতোসব না করলেই হতো। বুড়ো যদি টেঁসে যায়?

না, না। তেমন কিছু নয় বলেই মনে হলো! থলিটা তোর জিম্মায় আছে তো?

হুঁ।

থলির মাল নড়চড় হয়নি তো?

নড়চড হবার আছে কি?

যা বলেছিস মাইরি? ব্যাপার বোঝা গেল না।

চার

সুইনহো স্ট্রীটের সেই বারান্দাওলা বাড়িটায় ঠিক এই সময় এই কথাটাই উচ্চারিত হচ্ছিল, 'ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

শোভনা বলল, বেলা চারটে বেজে গেল, ভাত খাবে তা খেয়াল নেই? যা দিকি টিসু, তোর দাদুকে একবার জিগ্যেস করে আয় দিকি। কোথাও পাঠিয়েছে কিনা?

লোকটা সংসারে এমন কিছু দামী মাল নয় যে, ঘণ্টা কয়েকের অদর্শনে কেউ ব্যাকুল হবে। ভাত খাবার সময়টা পার হয়ে গেছে, তাই খোঁজ পড়া। খাওয়ার পাট চুকিয়ে যদি বেরোতো ওই লোক, রাত দশটা অবধি পথে ঘুরলেও কেউ খোঁজ নিতো না।

ভাত নিয়ে বসে অবশ্য কেউ নেই। রাঁধুনি ঠাকুর টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে দিবানিদ্রার ঘুমটা ঘুমোতে গেছে অনেক আগে। শোভনাও কিছু বসে ছিল না তার চিরকাল ঘাড়ে পড়ে থাকা দূর সম্পর্কের বুড়ো খুড় শ্বশুরের জন্যে। সেও দিবানিদ্রা সেরে উঠে যখন দেখতে পেল টেবিলে যেমন চাপা দেওয়া ভাত-টাত ছিল তেমনি রয়েছে, তখন তার টনক নড়ল।

টিসুর আজ ছুটি ছিল কলেজে, নিজের মনে নিজের ঘরে ছিল, শুনে বলল, তাই না-কি? —আঃ, এইসব বুড়োদের নিয়ে আর পারা গেল না।

নেমে এলো দোতলা থেকে।

—কিন্তু নেমে এসে কি প্যাসেজ পার হয়ে সেই ঘরে ঢুকে যেতে পারল টিসু? যে ঘরে দাদু মৃগাঙ্কমোহন একখানা বিরাট পালংকে, বিরাট দেহখানা মেলে অনড় হয়ে পড়ে আছেন। আছেন প্রায় বছর তিনেক ধরে।

না, সে ঘরে ঢোকবার আগেই বলরাম ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে বলে উঠল, দিদিবাবু, ছোট দাদুর খবর নিয়ে একটা—থেমে গেল।

থেমে গেলি যে? একটা কে? কী খবর এনেছে?

চ-উৎকণ্ঠ গলায় প্রশ্নটা করে টিসু।

বলরামও ঢোক গিলে থেমে বলল, একটা ছেলে। মানে, ইয়ে মস্তান মত ছেলে।

ওঃ! তা' কী খবর এনেছে সে?

বলছে, বাস থেকে পড়ে গেছল ছোটদাদু। এখোন হাসপাতালে আছে।

চমৎকার।

বসে পড়বার মত জায়গা হাতের কাছে না থাকাতেই দাঁড়িয়ে থাকল টিসু, বলল, এইটিই ভাবছিলাম। তারপর তীক্ষ্ণ গলায় ডাক দিল—মা। শীগ্‌গির নেবে এসো। বলরাম, কোথায় সে ছেলে?

ওই যে গেটে—

গেটে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? আশ্চর্য।

পাঁচ

মানস বলেছিল, বাড়ির লোক বিগলিত হবে। কচু হল।

অভাগার কপাল! ফটাফট জেরা।

কখন পড়ে গেছলেন? কোথায়? কী অবস্থায়? আপনি কোথায় ছিলেন? সাউথের অ্যাকসিডেন্ট কেস্ নর্থে যায় কেন? সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে খবর দিলেই তো ঠিকমত কাজ হতো? যদি আরো সহকারী ছিল মানিকের তো তারা কোথায়? তাদের একজনের জ্যাঠামশাই এর বন্ধু ছিলেন? কী নাম তাঁর? ঠিকানা কি?—একসঙ্গে চার-পাঁচজন ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল কী উদ্দেশ্যে? ঠিক যেখানটায় পড়েছিলেন সেখানটা সনাক্ত করতে পারবে কি না এই সংবাদদাতা? ইত্যাদি ইত্যাদি, যেন জেরার ঝড়।

'মা' বলে ডাক দিল, কিন্তু সেই মা-জননীকে নীচের তলায় নেমে আসবার সময়টুকু না দিয়েই আইন নিজের হাতে নেওয়া হলো।

প্রথমটা কিঞ্চিৎ নার্ভাস বোধ করলেও, এই কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ভঙ্গী দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেল মানিকের। বেচারী! খেয়াল করে না তাদের মূর্তিই সর্বদা তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কামানো জুমনো তেলাগোলা মুখ, আর পাট-দোরস্ত শার্ট-প্যান্ট পরে এলে এই দিদিই খাতির করে ড্রইংরুমে বসিয়ে কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ মুখে ধন্যবাদের বচন ঝাড়তো। সেটা খেয়াল করল না বলেই রেগে গেল।

বলল, দেখুন, কেন যে মানুষ কারো বিপদ দেখলে তার মনুষ্যত্ববোধটুকু প্রকাশ না করে কেটে পড়ে, তা' বুঝতে পারছি। ভাল করতে গিয়ে মন্দ হচ্ছি। আমি যদি আপনার এতোসব প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য না থাকি, কী করবেন? পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবেন, অনধিকার চর্চার অপরাধে?

এরকমের উত্তরে জন্য অবশ্যই প্রস্তুত ছিল না টিসু, তাই এখন ঈষৎ অপ্রতিভ হয়। সামান্য নরম গলায় বলে, কী হল, আপনি এমন রেগে উঠছেন কেন? জেরা কে করছে আপনাকে? হঠাৎ এরকম একটা খবরে মানুষ আপসেট হয়ে যেতে পারে না?

মানিক যতই আকুলতা করে থাকুক, এই মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্যে, এবং যার জন্যে এতো জটিল পথ অবলম্বন, তবু ওই জেরাটার চোটপাট উত্তর দেবার বাসনাও প্রবল হয়ে উঠছে ওর। তাছাড়া—

মনে মনে ভেবে নেয়, বিপদের সূত্রে ভাব জমে যাওয়াও যেমন স্বাভাবিক, ঝগড়ার সূত্রে ভাব জমে ওঠাও তেমনি স্বাভাবিক। সিনেমায় তো এর অনেক উদাহরণ মেলে।

তবে? তবে কেন চোটপাট জবাব না দেবে?

বলে, দাঁড়ান, আপনি বোম্বে মেল চালিয়ে গেলেও, আমায় একটা একটা করে জবাব দিতে হবে। প্রথম, কখন পড়ে গেছলেন?

বেলা দশটা নাগাদ। তবে ক' মিনিট, ক' সেকেণ্ডে বলতে পারব না। তখন দেখে নেওয়া হয়নি। পরে জবাব দিতে হবে জানলে দেখে রাখতাম।...তারপর? আমি কোথায় ছিলাম?...আমি সেই বাসটাতেই ছিলাম। বুড়ো-লোকটি উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন দেখে লাফিয়ে নেমে তারপর—তারপর সাউথের কেস নর্থের হস্‌পিটালে কেন? দেখুন, ক্যাওড়াতলায় চুল্লি ভেকেন্ট না থাকলে মড়া ঘাড়ে নিয়ে নিমতলাতেও যেতে হতে পারে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা।

টিসু চোখ-মুখ-ভুরু—সব কুঁচকে বলে ওঠে, থাক, আপনাকে আর জবাব দিতে হবে না।.. মা। তুমি নামছ না কেন?

মানকের জেদ চেপে গেছে, মানিক জোর গলায় বলে, না, আমায় বলতে দিন। শুনতেই হবে আপনাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে খবর দেওয়া হল না কেন? হল না এই জন্যে, আমরা কেউ-ই 'পামিস্ট' নই যে, কারো চেহারা দেখলেই বাড়ির ঠিকানা বুঝে ফেলব।

আমার সঙ্গে আরো যারা ছিল তারা সকলেই বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। যার জ্যাঠামশাই ওনার বন্ধু? সে-তো ওখানে বসে আছে, নড়ছে না। তার ঠিকানা বলতে পারব, তবে তার জ্যাঠামশাইয়ের ঠিকানা? উহুঁ। বলা যাবে না। পরলোকের দিকে যাইনি কখনো।

থামুন তো। আপনি দেখ্‌ছি বড্ড ইয়ে। এতো কথা কইছেন কেন?

আপনিই কওয়াচ্ছেন। এখনো তো বাকি—জায়গাটা সনাক্ত করতে পারব কিনা? না পারার কিছু নেই। রাসবিহারীর মোড়ে, ইয়ের দোকানটার সামনে—

ইয়ে মানে? ইয়ে কি? কিসের দোকানের সামনে?

দেখুন, ওখানে এতো রকমের দোকান আছে, ঠিক কোন্‌টার সামনে সেটা তো মেপে দেখা হয়নি।

মা! তুমি নামবে?

টিসু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে থাকে।

এই বাচাল আর ইয়ার ছেলেটাকে উচিত শাস্তি দিতে পারতো টিসু। কিন্তু অবস্থাটা [illegible] বড় গোলমেলে! মা যদি বলে, খবরটা পুরো না নিয়ে তাড়িয়ে [illegible] ফ্যাসাদ। ফ্যাসাদ তো সবটাই। দাদুর কানে উঠলেই তো এক্ষুণি হৈ-চৈ বাঁধাবেন তিনি।...তাছাড়া যেতে [illegible] হবে এক্ষুণি মেডিক্যাল কলেজে। বাবাঃ সে কি একটা জায়গা। পুরো নীচতলাটা তো জমাদারদের সাম্রাজ্য। তারাই সেখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। যেতে হলে তো এই মস্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

রাগে অস্থির হচ্ছিল মায়ের উপর।

কী হলো কি তাঁর। আবার ডাকতে যাচ্ছে, তখন মঞ্চে এলেন শোভনা দেবী।

টিসু বিরক্ত দৃষ্টিতে মার সাজের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার মানে মা এতোক্ষণ বৈকালিক প্রসাধন করছিল। বাড়ির একটা লোক না খেয়ে কোথায় ঘুরছে, তার খবর জানতে টিসুকে মৃগাঙ্কর কাছে পাঠিয়ে, মা'র দেরী সইল না? তার মানে ভবদাদু আসুক না আসুক, মা ঠিক একটু পরেই তার গুরুমঠে চলে যাবে। নিত্য সেখানে পাঠ-কীর্তন হয়। পৃথিবী উল্টে গেলেও মা যাবে।

তাই এখন শোভনার পরনে ফর্সা ধবধবে মিহি কালোপাড় শাড়ি, গায়ে আরো মিহি সাদা ভয়েলের

ব্লাউজ। গলায় সোনার চেনে গাঁথা তুলসী কাঠের মালা, খোলা চুলের ঝাড় মুখের চারপাশে গোল হয়ে আছে। কপালে একটি চন্দনের টিপ।

টিসু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে এতোক্ষণে নামতে পারলে?

শোভনা পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে, অথবা কিছু একটা হয়েছে, সেটা অনুমান করতে পারে শোভনা, ওই মস্তান মার্কা ছেলেটাকে ভগ্নদূতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তবু উত্তরের অপেক্ষায় থাকে।

টিসু রাগ, অপমান, বিরক্তি, উদ্বেগ সব মেশানো গলায় বলে ওঠে, এই ভদ্রলোক বলতে এসেছেন, সকালে বেলা দশটায় ভবদাদুর বাস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে—এঁরা—

আঁ! বাস অ্যাকসিডেন্ট!

শোভনা অদূরে সিঁড়ির কাছে পড়ে থাকা একটা মোড়ায় বসে পড়ে। হাতের রুমাল নেড়ে মুখে বাতাস দিয়ে বলে, পুরো চাকাটা বডির ওপর দিয়ে চলে গেছে? স্পটেই ডেড্?

আঃ! কী মুশকিল।

টিসু রেগে বলে, ভাল করে না শুনেই যা তা বলছ কেন? ওসব কিছু না। বাসে উঠতে গিয়ে ছিটকে পড়ে মাথায় চোট্ লেগেছে। জ্ঞান নেই—

জ্ঞান নেই?

শোভনার ভুরু আরো কুঁচকে উঠল, তাহলে ঠিকানাটা পেলেন কি করে?

ঠিকানা?

মানিকের মুখে একটি আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে। মানিক তার কাঁধে ঝোলানো ঝোলাটা নামায় কাঁধ গলিয়ে। যেটা দেখে পর্যন্ত টিসু ভেবেছে, আজকাল ছেলেগুলো সব মেয়েলি জিনিস ব্যবহার করে।...এদিকে মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বানায়, অথচ গায়ে রঙচঙা মেয়েলী স্কার্ট গায়ে দেয়, মেয়েলী চপ্পল পরে—পরে মেয়েলী ব্যাগ ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেড়ায়। 'ঠিক ওই রকম একটা আমার ছিল' ভেবেছিল টিসু।

মানিক অবশ্য এসব কথা জানে না, মানিক মৃদু হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে, এই যে এর মধ্যে থেকে পেয়েছি।

তারপর মানিক ঝোলার মধ্যে থেকে টেনে বার করে একখানা ভারী বোঝা, মোট্টাসোট্টা আইনের বই।

এই বইয়ের মধ্যে যে নাম-ঠিকানা রয়েছে, সেটাই কাজে দিল।

বইটা হাতে নিয়েই টিসু চমকে ওঠে, মা? এর মানে?

শোভনাও এগিয়ে আসে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, এ বই আপনি পেলেন কোথা থেকে?

এই যে এই ঝোলার মধ্যে থেকে। আরো আছে। এই যে—ঝোলাটা সমেতই নামিয়ে দেয় মানিক। যার মধ্যে তেমনি একই সাইজের আরো দু'খানা বই মোটা চামড়ায় বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা।

শশাঙ্কমোহন রায়।

হ্যাঁ, এই নাম ওই বইগুলোর অধিকারী। যে রকম বই আরো অনেক সাজানো আছে মৃগাঙ্কর ঘরের পাশের ঘরটায় উঁচু আলমারিটার ভিতর।

ওই ঘরে আগে শশাঙ্কর চেম্বার ছিল।

বাইরের দিকের দরজা খুলে বসত শশাঙ্ক মক্কেলদের সঙ্গে। এখন ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ, মৃগাঙ্কর ঘরের মধ্যে দিয়েই যাওয়া-আসা। বই ঠাসা, অন্ধকার অন্ধকার ভ্যাপসা ঘরটায় কে কত যায়-আসে? দিনে একবার ঝাড়ুটা নাড়তে ঢোকে বলরাম।

টিসু!

শোভনা চীৎকার করে ওঠে, বুঝতে পারছিস? তোর বাবার 'ল-বুক।' তোমাদের ভবদাদু পাচার

করছিলেন! উঃ। ভাবা যায় না।...পৃথিবীতে বিশ্বাস করবার জায়গা বলে কিছু নেই।

মা থামো। ফিলজফি আউড়ো না। চল দাদুর কাছে দেখাবে। তাঁর সাধের ভাইয়ের কীর্তি। উঃ।

মানিক ডেকে বলে, দেখুন, আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারগুলো পরে মেটাবেন। এখন দয়া করে কেউ পেসেন্টের কাছে চলে গিয়ে আমার বন্ধুকে ছুটি দিন।

চলে? চলে কে যাবে?

তাইতো টিসুদের তো এখন ছুটে হাসপাতালে চলে যাবার কথা। ভবদাদুর ওপর ভক্তি-ভালবাসার বালাই না থাকলেও, কর্তব্য তো বটে। দাদুর কোন সুবাদের ভাই তো।

টিসু তো ভাবছিল, দাদুর কানে কথাটা না তুলেই দেখতে যাবে। কিন্তু টিসুর মরে যাওয়া বাবার আলমারি থেকে বই চুরি করে পাচার করতে গিয়ে যে লোক বাস অ্যাকসিডেন্ট করেছে, তার ওপর আমার মায়া কি? আর তার ভালবাসার দাদা ওই দাদুর ওপরই বা এতো কি মায়া!

সত্যি সমস্ত সহানুভূতি মুছে যাবে না? তার বদলে আসবে না রাগ-ঘৃণা-অশ্রদ্ধা।

একটা বুড়ো লোক তুমি, চিরকাল এই সংসারে প্রতিপালিত হয়েছে, এই তার প্রতিদান?

শোভনার তো আরো রাগ।

ওই অকারণ ঘাড়ে পড়ে থাকা লোকটার উপর তার কোনোদিনই মায়া ছিল না। মিছিমিছি অপচয়। একটা মানুষের খরচা কি কম? কি এমন আপন? সম্পর্ক খুঁজতে তো ইতিহাসের পাতা খুলতে হয়। কিন্তু শশাঙ্কও ছিল তেমনি, 'ভবকাকা' বলতে অজ্ঞান ছিল।

বলতো, ভবকাকার মতো একটা লোক বাড়িতে থাকা বাড়ির অ্যাসেট্। ভবকাকা নাকি আজীবন তাদের ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করেছে। যেদিকে জল পড়েছে সেদিকে ছাতি ধরেছে।

সেই শশাঙ্কই চলে গেল। টাটকা তাজা যুবাপুরুষ!

হাইকোর্টে প্র্যাকটিস উঠেছিল জমে।

হয়ে গেল সব শেষ।...তবে এখনো কেন এইসব আপদ পোষা?

একজনকে না হয় ফেলার উপায় নেই, মৃগাঙ্ক রায় নামক লোকটার ভার বইতেই হবে শোভনাকে তাঁর জীবৎকাল, অথবা শোভনার জীবৎকাল।

কিন্তু ওই গাঁইয়া বুড়োটাকে কেন?

চাকর চাকর দেখতে, ভাল জামাকাপড় দিলেও পরে না। (শশাঙ্ক তো দিতো) লোকের সামনে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

তাছাড়া—হলেও শশাঙ্ক অনেক টাকা রেখে গেছে এবং মৃগাঙ্কর তৈরী এই বাড়িটাও আছে আশ্রয়স্থল, তবু কলসীর জলের উদাহরণটা তো মানতে হবে?

শশাঙ্ক মারা যাবার কিছুদিন পরই, যখন শোভনা পাগল হয়ে গুরুদীক্ষা নিয়ে বসল দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়ে, তখন তোড়জোড় চালিয়েছিল ভবনাথকে বিদায় করতে। কিন্তু ভাগ্যহীনা শোভনার ভাগ্য সবদিকেই মন্দ। জমি যখন প্রস্তুত হয়ে এসেছে, ঠিক তখন মৃগাঙ্কমোহন হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শোভনার পরিকল্পনার বারোটা বাজিয়ে দিলেন।

আর ভবনাথকে ছাড়া যায় না, ভবনাথ তখন অপরিহার্য! হলেও তিনিও মৃগাঙ্কর প্রায় সমবয়সী, কিন্তু রোগা খটখটে চেহারার জন্যে খাটতে পারেন খুব।

মৃগাঙ্কর ঘরেই তাঁর খাট-বিছানা তুলে আনতে হয়েছে। দিনের বেলা বলরাম। রাতের ভরসা ভবনাথ।

একটা বিরক্তিকর লোক, যাকে বিদায় করবার চেষ্টা চলছিল, বাধ্য হয়ে যদি আবার তাকে পুজ্যি করে রাখতে হয়, সে যদি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তার উপর কী আহ্লাদের ভাব আসবে?

অ্যাকসিডেন্ট শুনে মমতা না এসে বিরক্তিই এসে গিয়েছিল। মস্ত একটা বিপদেই তো পড়া গেল। লোকবলহীন এই সংসারে কে এসব ঝামেলা পোহায়। তবু চাপা পড়ে থাকা বাড়াভাতের দৃশ্যটা মনে ভেসে উঠে মনটাকে একটু নরম করে আনছিল, কিন্তু এ কী? এ যে সহ্যের বাইরে।

প্রায় কড়া গলাতেই বলে উঠল শোভনা, চল দাদুর কাছে।

টিসু এখন মন বদলালো। বলল, দাদুর কাছে গিয়েই একেবারে হৈচৈ লাগিও না।

হৈচৈ আমার স্বভাব নয়। প্রকৃত ঘটনাটা বলতে হবে তো?

মানিক নাক গলাল।

বলল, উনি বুঝি অসুস্থ?

হুঁ। প্যারালিসিস।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে টিসু বলল, বলছিলাম, দাদুকে এখন বইয়ের কথা না বলে শুধু অ্যাকসিডেন্টের খবরটা দিলেই ভাল হয়।

কেন? কেন শুনি?...শোভনা ঝেঁজে ওঠে।

একসঙ্গে দু'-দুটো আঘাত।

করা যাবে কি? যা বলবার বলে নেওয়াই ভাল।

আর হঠাৎ যদি হার্টফেল করে বসে?

টিসু বেজার গলাতেই বলে।

থাম। হার্টফেল অতো সোজা নয়। হলে ছেলে চলে যাবার দিনই হতো।...না বললে উনিও ত ভাবতে পারেন আমরাই কোনো কাজে পাঠিয়ে তাঁর বিপদ ঘটিয়েছি।

মানিক দেখল, ওদের এই ঘরোয়া 'টক'-এর মধ্যে ও বেমানান। বিচ্ছিরি একটা অবস্থায় বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজেরই কেমন লাগছে।

একটা টিল ফেলল।

বলল, আমি তাহলে যাচ্ছি।

তার মানে?

টিসু ছিটকে ফিরে দাঁড়াল।

যাচ্ছেন মানে? আমাদের নিয়ে যাবে কে?

আ-আপনাদের? আ-আমি নিয়ে যাব?

না হলে? আমরা জানি কোথায় কি?

মানিক অবহেলাভরে বলে, কিছু না। মেডিকাল কলেজে এমারজেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকেই—

থামুন। আমায় আর ডিরেকশান দিতে হবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। ট্যাক্‌সি ডাকাচ্ছি, সঙ্গে যাবেন।

বাঃ গ্যারেজে গাড়ি রয়েছে দেখলাম যে—

আছে তো কি?

ট্যাকসির কথা বলছেন?

টিসু হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে বলে, বলছি আমার ইচ্ছে। চলে যাবেন না বলছি।

শশাঙ্কমোহনের মৃত্যুর পর থেকে গাড়ি আর বেরোয়নি গ্যারেজ থেকে। সে তো নিজেই চালাতো।

মানিক সেই প্যাসেজের সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়ে এক বুড়োগলার হাউমাউ চীৎকার। তীক্ষ্ণ-তীব্র মহিলাকণ্ঠের কঠোর সান্ত্বনাবাণী, আর একটা জ্বলন্ত স্বর, মা! মনে রেখো, লোকটাকে আটকে রেখে আসা হয়েছে। ভেগে গেলে ভবদাদুর খবর পাওয়ার বারোটা বেজে যাবে।

মানিকের কানের মধ্যে গলানো সীসে ঢুকে যায়।

'লোকটাকে'। 'ভেগে গেলে।'

তার সম্পর্কে এই মন্তব্য। সে মনে মনে বলে, হতভাগা মান্‌কে। তুই এসেছিস এই রাজনন্দিনীর ছায়ায় একটু ভালবাসার স্বাদ পেতে? তার জন্যে বন্ধুদের কাছে মিনতি, এতোখানি অ-মানবিকতা—

অবশ্য ওই বই চুরির ব্যাপারে মানিকেরও বুড়োর ওপর হতশ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে, তবু সেই কনুইয়ের

ঠেলাটার কথা তো ভুলতে পারছে না।...যেটা তার আরো কেয়ারফুলি করা উচিত ছিল।

ওই মেয়ে যে আমায় আটকে রেখে গেল, কিসের অধিকারে? আমি যদি সত্যিই ভেগে যাই? করবি কী, খুঁজে বেড়াগে যা মেডিক্যাল কলেজের তিনটে গেটে।

অথচ পারাও যাচ্ছে না চলে যেতে।

যাক বেরিয়ে এল টিসু, হেঁকে বলল, বলরাম, একটা ট্যাক্সি ডাক।

এবং এতোক্ষণ পরে বলল, আপনি তো দাঁড়িয়েই রইলেন।

মানিক বলল, ওর জন্যে কিছু না। ও আমাদের অভ্যাস আছে।

তা তো বুঝতেই পারছি—

টিসুর গলা ধাতব, রাস্তার মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ের ওপর খাড়া থাকাই তো আপনাদের পেশা।

মানিক মনে মনে বলল, মান্‌কে দ্যাখ, এই থেকেই তোর ভাগ্য খুলে যায় কিনা। যে রকম বোলচাল ছাড়ছে।

ছয়

শোভনাও বেরিয়ে এলো।

বললো, অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনেই এতো বেশী আপসেট হয়ে গেছে তোর দাদু। বইয়ের কথাটা বলতে পারা গেল না। বলাই উচিত ছিল। এক কান্নাতেই মিটে যেত।

বলরামকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দাও, কাছে থাকতে বলো—এই বলরাম। ট্যাক্সি এনেছিস? যা দাদুর কাছে থাকগে যা। কান্নাকাটি করছে—মা চলো। বটুয়ায় টাকাপত্র আছে তো বেশ কিছু?

মা চলো।

শোভনা আকাশ থেকে পড়ে।

আমি যাবো? এখন?

তো কখন যাবে?

কাল যাব অখন। আজ ঝুলনদ্বাদশী, ঠাকুরের উৎসব—আজ তুই দেখে আয়।

টিসু গম্ভীরভাবে বলে, একলা?

বাঃ একলা কেন? এই তো ছেলেটিকে আটকালি সঙ্গে যাবার জন্যে—এখন 'ছেলেটি'। মনে মনে হাসে মানিক।

টিসু একবার মার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, ছেলেটা তোমার চেনা?

ওমা। আমার চেনা হল কখন? মানে এই এখনই হলো আর কি?

তার সঙ্গে তোমার মেয়েকে এক ট্যাক্সিতে ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে?

মানিক চমকে ওঠে।

এ আবার কী কথা। সর্বনেশে মেয়ে।

শোভনা বলে ওঠে, কী যে আজে-বাজে কথা বলিস। তুই-ই তো বললি, হাসপাতালে কোথায় কি চিনি না—

বললাম—

টিসু এবার একবার মানিককে দেখে নিয়ে বলে, ধর এর সবটাই ফলস্‌। ধর, ভবদাদুকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে।

মানিক মেজাজ হারিয়ে ফেলে। চড়া গলায় বলে, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে কেউ পায়ে ধরে সাধেনি। রইল আপনার ট্যাক্সি, চললাম আমি—

কক্ষনো না, গেলেই হল?

বলেই একটা কিম্ভূত কাণ্ড করে বলে টিসু। খপ্ করে হাত বাড়িয়ে মানিকের একটা হাত চেপে ধরে বলে, নট নড়ন-চড়ন, নটু কিচ্ছু। কথাটা শেষ করতে দিন। মা, ধর ব্ল্যাকমেল নয়, হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছি বলে আমায় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে তুলল,—

আঃ টিসু, কী বিশ্রী কথা বলে চলেছিস। বেশ তো, অরবিন্দ যাবে তোর সঙ্গে। তার তো আর এখন রান্নার তাড়া নেই।

ওঃ, অরবিন্দ। যাকে ফুঁ দিলে পড়ে যায়—কোনো দরকার নেই, আমি একলাই যাচ্ছি। টাকাকড়িগুলো দিয়ে ঝুলনপূর্ণিমা করগে যাও।

'পূর্ণিমা' শব্দটার মধ্যে ব্যঙ্গ অনুভব করে শোভনা ক্রুদ্ধগলায় বলে, বলেছি পূর্ণিমা? ঝুলন-দ্বাদশী না?

ও একই কথা। দাও দাও টাকার বটুয়াটা দাও। কুইক। তবে প্রস্তুত থেকো, হয় তো ভবদাদুর মত আর না ফিরতেও পারি।

সাত

মানিকের স্বপ্ন তবে সফল হলো। আকাশের তারার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে চড়ে পাড়ি দিচ্ছে।

কিন্তু আকাশের তারা, না ধারালো ছোরা?

এই মেয়ের সঙ্গে ভালবাসার সাধ?

তবু কী ভীষণ আকর্ষণ! কী ভাল-লাগা।

মানিকের মনে হচ্ছে সে বুঝি মরে যাবে। হাতটা যেখানে চেপে ধরেছিল, সেখানটায় যেন আগুনের দাহ।...বিজু সুকুমার এদের কি বিশ্বাস করানো যাবে...?

কোন্দিকে চলেছেন খেয়াল রাখছেন?

মানিক সামনে, টিসু পিছনে।

হঠাৎ এই ধমকে চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়েই মানিক বলে বসল, সেটা তো আপনারই দেখার কথা। ভুলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছি কিনা—

হুঁ। রাগ আছে বিলক্ষণ।

ভ্যাগাবণ্ডের আবার রাগ। তবে অবাক হচ্ছিলাম বটে।

অবাক কেন?

কতো সহজে মানুষকে কতো অপমান করতে পারেন। নিজের মাকে পর্যন্ত ছাড়েন না। কী শক্ত শক্ত কথা।

মাকে? মাকে আরো অনেক শক্ত কথা বলা যেত। তাড়া ছিল তাই—

মানিক নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বাইরে থেকে মানুষকে কতো অন্যরকম ভাবা হয়। আপনাকে দেখে দেখে মনে হতো পৃথিবীর সেরা সুখী।...কিন্তু দেখছি একেবারে উল্টো। বাবা নেই, দাদু পঙ্গু, মার সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়—আর এক দাদু—

থাক, আর করুণা দেখাতে হবে না।

বলেই বলে ওঠে টিসু, 'আর দাদু' কী বলছেন?

বলছি, জানি না তিনি কী রকমের দাদু। তবে দাদু বলছেন তাই বলছি—আর এক দাদু বিশ্বাসঘাতক।

টিসু অন্যমনস্কভাবে বলে, ব্যাপারটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ভবদাদু সম্বন্ধে অঙ্কটা এক্ষুণি কষে ফেলতে পারছি না।...কথাটা বুঝতে পারছেন? লেখাপড়া করেছিলেন কিছু? না শুধুই মস্তানি করে বেড়িয়েছেন?

মানিক যেন ক্রমশই চমকাচ্ছে।

এদের বাড়ি ঢোকা অবধি মানিক সমানেই খুব সাবধানে কথা চালিয়ে আসছে। পাছে নিজেদের পরিভাষাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাই এই সাবধানতা।

সাবধানেই বলল, যাকে যা ইচ্ছে অপমান করবার একটা আশ্চর্য বাহাদুরী আছে আপনার।

সত্যি কথা শুনলেই অপমান মনে হয়, এই হচ্ছে মানুষের দোষ।

গাড়ি গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানিক বলল, এতোক্ষণে আশা করি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন।

টিসু ভুরু তুলে বলল, এতোক্ষণে? এর আগে করা হয়নি?

কিছু সন্দেহ ছিল নিশ্চয়।

সিকি ইঞ্চি থাকলেও, গাড়িতে আপনাকে নিতাম?

মানিক আবার চমকে টিসুর টানটান মাজা মাজা দৃপ্ত মুখটার দিকে তাকায়। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু আমি তো সত্যিই ভাল নই। আমি সত্যিই মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর।

আর কোনো ভাল ভাল বিশেষণ জানা নেই বুঝি?

টিসু বলল, আর চারটি মুখস্থ করে রাখবেন। যাক আপনার সেই বন্ধুর নাম কি?

অ্যাঁ, কী বলছেন?

আচ্ছা কেবল কেবল অমন চমকাচ্ছেন কেন বলুন তো? কোনো অসুখ আছে না কি? বলছি, যে বন্ধুটি হাসপাতালে আটকে বসে আছেন, তাঁর নাম কি?

ওঃ। মানস বোস।...এই যে, নামুন।'

আট

বিজু বলল, যা চেয়েছিলি, তা' তো পেয়ে গেলি বাবা, কাঁটায় কাঁটায় অঙ্ক মেলার মতন। তবে সর্বদা অমন বুঝ-ভোম্বল হয়ে বসে থাকিস কেন রে মান্‌কে? বুড়ো যদি মরতো, তবেও না হয় একটা কজ্ থাকতো।...ঘণ্টাকতক চোখ উল্টে ভির্মি খেয়ে পড়ে থেকে ঘোড়েল বুড়ো তো তোর ঘোড়া জিতিয়ে দিল।...খুব তো পটিয়ে ফেলেছিস চাবুকের সঙ্গে।

মানিক বলল, অসভ্যর মত কথা বলবি না।

ও রে বাবাঃ! এ যে কেস সিরিয়াস। আমরা আবার কবে সুসভ্যর মতন কথা বলিরে! 'বলব না'। এটাই তো আমাদের মটো।

মানিক তেমনি মেঘাক্রান্ত মুখে বলে, তাতে আমাদের লাভ কি হচ্ছে বল? নিজের অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়া?

হুঁঃ। বুঝেছি! প্রেয়সীর সামনে বেফাঁস কথা কয়ে ফেলে ফাঁস হয়ে যাচ্ছিস বুঝি?

ছাড় ওকথা ভাল্‌লাগে না।

দেখ মান্‌কে আমিই তোর নৌকো কূলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। তোর গাড়ি ওর দরজায় এনে দাঁড় করিয়েছি, আর তুই শালা আমায় একেবারে হুট আউট করে দিচ্ছিস? মাইরি, প্রাণে একটু দাগা লাগছে না?

হুট আউট্ আবার কী?

নয়? বুড়ো যে কদিন হাসপাতালে থাকলো, রোজ তুই ওর সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়েছিস এসেছিস, একদিনো বলেছিস বিজু চল।

বাঃ তা' কি করে বলব? গাড়ি আমার? ওর বাড়ির কাজ করার লোক ট্যাক্সী ডেকে আনে, আমায় দয়া করে সঙ্গে যেতে বলে।

হুঁঃ! তা বুড়ো বাড়ি ফেরার পরেও তো ও বাড়িতে দিব্যি যাতায়াত চালিয়ে যাচ্ছিস।

কী করবো। কাজ ঘাড়ে চাপায়।

তা তো চাপাবেই। এমন একটা ক্রীতদাসের ঘাড় পেলে কে ছাড়ে?

এ সময় মানস এলো।

নিজস্ব প্রথায় মুচকে হেসে বলল। কিসের টক্? সেই চাবুক?

বিজু বলল, আবার কি? কিন্তু গাড়োলটা মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে বিবেকের চাবুক খেয়ে মরছে। শ্লার ভদ্দরলোক বনে যাবার ইচ্ছে জাগছে। বাবু ভাষায় কথা কইতে সাধ হচ্ছে?

মানস বলল, হোক না। ক্ষতি কি?

ক্ষতি নেই? বিজু বলে ওঠে, তুই কি বলছিস মোনা?

একে একে আমাদের দলের ইয়ে কী বলে—হ্যাঁ, 'স্তম্ভোগুলো খসে পড়বে? পূর্ণটার শয়তানীর কথা ভাব? পাজীটা তলে তলে আমাদের অজ্ঞাতসারে ইন্টারভিউ দিয়েছে। চাকরি জোগাড় করেছে, ট্রেনের টিকিট পর্যন্ত কাটা তখন এসে জানিয়ে গেল, ভাই, একটা চাকরি পেয়ে কানপুরে চলে যেতে হচ্ছে।

'যেতে হচ্ছে।' যেন জেলে যেতে হচ্ছে। 'ভাই'। শ্লা নয়, 'শূয়োর' নয়, কিনা ভাই। একেবারে মায়ের আঁচল থেকে গড়িয়ে পড়ল যেন। আবার বলে কি না সি অফ্ করতে যাবি তো? মার থাপ্পড়। উনি বাক্স বেডিং বেঁধে, কপালে দইয়ের টিপ পরে রেলগাড়িতে গিয়ে উঠবেন, চারদিক ঘিরে আপনার লোকেরা চোখ মুছবে, নাক টানবে, আর মা গলা ধরে কাঁদবে, দাড়ি ধরে আদর করবে, আমরা যাব সেই দৃশ্যের দর্শক হতে। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গড়েরমাঠ পকেট নিয়ে গড়ের মাঠে এসে বসে চানাভাজা চিবোবো কেমন? লক্কড় রক্কড়ের আর জায়গা পায়নি।

মানস বলল, আমাদের জন্যে কে আবার কাঁদতে যাবে রে বিজু? দেশছাড়া হচ্ছে দেখে বাঁচবে। হরির লুঠ দেবে। আমরা মরে গেলেও বাড়ির লোকের মন কেমন করবে না।

ওইটিই তোমার ভুল ধারণা হে গাড়োল। যা কিছু 'দূর ছাই' তা আমরা ওনাদের পছন্দসই ছাঁচের নই বলে। যেই দেখবে সুড়সুড়িয়ে ওদের পছন্দের ছাঁচে ঢালাই হতে যাচ্ছি, চাকরি করছি, টোপর মাথায় দিয়ে ফুলসাজানো গাড়িতে উঠছি, অমনি ছেঁহ ভালবাসা উথলে উঠবে।

মানিক বলল, আমার মাও নেই বাপও নেই, আমি তোর কথা ভেরিফাই করতে পারব না।

মোনা বলল, ভেরিফাই করবার দিন এগিয়ে আসছে তাহলে?

মানিক বিষণ্ণ মুখে বলল, ওসব কথা বলে মেজাজ খিচে দিসনি মোনা। এখন সত্যিই দুঃখু হচ্ছে, ইচ্ছে করে নিজেকে নষ্ট করেছি ভেবে। একটাই তো জীবন একবার ভিন্ন দু'বার পাওয়া যায় না। ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করবার আগে ভাবা চেস্তা উচিত ছিল।

মোনা একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলে, ওই ছাঁচটা না হলেই নষ্ট?

আমি আমার মালিক, নিজেকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি আমি, সুবোধবালক হবার দায় আমার নেই, এটা একটা দারুণ লাভ নয়?

মানিক উদাস গলায় বলে, লাভ মনে হতো যদি ভেতরে যন্ত্রণা না হতো। বড় গলা করে বলতে পারবি আমরা খুব লাভ করেছি, আমরা খুব সুখী?

হঠাৎ তিনজনেই চুপ হয়ে যায়।

জায়গাটায় একটা স্তব্ধতা নামে।

নয়

এমনি স্তব্ধতা নেমে এসেছিল আরো একটা জায়গায় আর একদিন। যেখানে মৃগাঙ্কমোহন বলেছেন, ভবর দোষ নেই। ওকে আমিই পাঠিয়েছিলাম।

এই অবিশ্বাস্য ধাক্কায় পাথর হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল এ বাড়ির জন্য দুই বাসিন্দা। পাথর কেটে একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, কোথায় পাঠিয়েছিলেন?

মৃগাঙ্কমোহন ঘরের সীলিঙের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভাবশূন্য গলায় উত্তর দিলেন, বই বেচতে!

বাবা!

শোভনার গলা দিয়ে আরো তীক্ষ্ণ একটা শব্দ যেন ঘরের বাতাসে আছড়ে পড়ল, আপনি পাঠিয়েছিলেন বই বেচতে আপনার মরে যাওয়া ছেলের আলমারি থেকে বার করে? এই কথা বিশ্বাস করতে হবে?

মৃগাঙ্ক আবার তেমনি নির্লিপ্ত ভাবশূন্য, সত্যিকথা বিশ্বাস করতে হবে বৈকি বৌমা।

শোভনা পাশের সোফায় বসে পড়ে বলল, টিসু, পাখাটা বাড়িয়ে দে।

পাখা বাড়িয়ে দিয়ে টিসু তীব্র হলো। অনড় রোগীর বিছানার কাছে সরে এসে বসলো, দাদু, সবকিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। ভ্রাতৃস্নেহেরও। ভবদাদুকে রক্ষা করতে তুমি নিজের ঘাড়ে যে দোষটা নিচ্ছো, সেটা কতখানি ভয়ঙ্কর তা ঘাড়ে নেবার আগে ভেবে নিয়েছ?

মৃগাঙ্ক বললেন, অনেক ভেবেছি টিসু, এই এতোদিন ধরেই ভেবেই চলেছি। সত্যিটা প্রকাশ করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু—

মৃগাঙ্ক একটু থেমে জিরিয়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু যখন দেখলাম, একটা নিরপরাধ লোক, যে লোকটা চিরদিন আমার সেবা করেছে, খিদমদগারি করেছে, কেনা গোলামের যত নির্বিচারে আমার ভাল-মন্দ সব আদেশ পালন করে এসেছে, আমাকে প্রাণতুল্য ভালোবেসে এসেছে, আর এখন আমার অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে, লাঞ্ছনা অপমান নিন্দে ঘেন্না নীরবে মাথা পেতে বইছে অথচ মুখ ফুটে বলছে না 'ওগো' দোষ আমার নয়, তখন মনে বড় ঘেন্না এলো—

মৃগাঙ্ক আর একবার থামলেন।

দশ

সেদিন গুরুর আশ্রম থেকে ফিরেই শোভনা যখন বলরামের কাছে শুনলো দিদিমণি সেই গোঁফ-দাঁড়িওলা বাবুটার সঙ্গে চলে গেছে, এখনো ফেরেনি, তখন শোভনার পা থেকে মাথা অবধি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। আর মনের মধ্যে যে অপরাধবোধ চিড়িক দিচ্ছিল সেই বোধের তাড়নাতেই ছুটে মৃগাঙ্কমোহনের ঘরের মধ্য দিয়ে পাশের বই ভর্তি ঘরটায় ঢুকে পড়েই আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে এ ঘরে এসে তীব্র চীৎকার করে উঠেছিল বাবা!

মৃগাঙ্কমোহন সেদিন তখন সেই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে ঘুমের বড়ি না খেলে যাঁর ঘুম আসতে চায় না, তাঁর এই অকালনিদ্রা আশ্চর্য বৈকি। আজকের দুঃসংবাদেরই বোধহয় মুহ্যমান হয়ে অসময়ে এই ঘুম। যদিও টিসুর শাসনে দুটো আঘাত পেতে হয়নি মৃগাঙ্ককে।

কিন্তু শোভনা অতো কেয়ার করবে কেন?

শোভনা অন্যের অপরাধের পাল্লায় অধিক ওজন চাপাবার সুযোগ পেয়ে, নিজের পাল্লাটা হাল্কা বোধ করছে, তাই চীৎকার করে ঘোষণা করতেই আবার ডাকে বাবা। শুনবেন, শুনবেন আপনার আদরের ভাইয়ের কীর্তি—

এই চীৎকারের পর ঘুমের ভান করলে 'শ্বশুর মরে গেছে' ভেবে আরো চেঁচাবে শোভনা। মৃগাঙ্ককে তাই ঘুম ভেঙে চোখ খুলতে হয় এবং শুনতেই হয় তাঁর আদরের ভাইয়ের কীর্তি।

হ্যাঁ, মহৎ কীর্তিই সন্দেহ নেই।

তলে তলে পুরো একটা তাকের বই প্রায় নিঃশেষ।

কী হয়েছে সেই দামী দামী মোটা মোটা আইনের বইগুলো?

আর কী হবে বেআইনীর পরাকাষ্ঠা দেখতে তলে তলে পাচার করা ছাড়া?

মৃগাঙ্কমোহন চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন, বলছ কী বৌমা? আমার খোকার আলমারির বই থেকে বই চলে গেছে? আমি যে ভাবতে পারছি না। এ হতে পারে না।

হতে পারে না! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে তা হয়েছে বাবা।

মৃগাঙ্কমোহন তখন আরো চেঁচিয়ে বলেছেন, বলরাম, আমায় তুলে ধরে ও ঘরে নিয়ে চল। আমি দেখি গে, কে আমার খোকার আলমারির—

ওঠবার ক্ষমতা নেই, তবু ওঠবার চেষ্টা।

বলরাম চেপে ধরে রেখে বলেছে, বাবু, রাগারাগি করবেন না। আবার স্টোক্ হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু রাগারাগি করতে 'না' করেছে। সে বলেছে আবার স্টোক্ হলে আর বাঁচানো যাবে না।

মৃগাঙ্কমোহন ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে আরো চেঁচিয়েছেন বলেছেন, 'আমি রাগারাগি করছি? পাজী স্টুপিড। আমি তোর ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরে সেধেছি বাঁচিয়ে দেবার জন্যে? বলে আয় তোর ডাক্তারবাবুকে খানিকটা বিষ নিয়ে আসতে আমার জন্যে।'

ওঃ ভগবান। বলে ঘাড় লটকে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন! দীর্ঘকাল ধরে।

টিসু হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য দেখে দোতলায় উঠে এসে প্রশ্ন করেছিল, মা, ইতিমধ্যে দাদুকে বোধহয় কথাটা বলা হয়ে গেছে। তাই না?

শোভনা তখন গুরুদেবের চিত্রপটের সামনে ধূপ আরতি করছিল, অনেকক্ষণ ধরে সেটা চালিয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রণাম সেরে মুখ ফিরিয়ে বলেছেন কিসের কথা?

কিসের কথা তুমি ভালোই জানো। তা আজই ওটা না বললেই চলছিল না? ভবদাদুকে দাদু কতো ভালোবাসে, সেটা তুমি জানো না তা নয়। ভবদাদুই ওঁর সঙ্গী বন্ধু, ভরসা সহায়, তাঁর এই অ্যাক্সিডেন্টের খবরে দাদু আধমরা হয়ে গেছে। আর তুমি সেই যে কী বলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা তাই বসাতে গেলে? একটু দেরী সইল না? বারণ করলাম না তখন?

তুমিই প্রথমে বলেছিলে, চলো দাদুকে বলিগে।

বলেছিলাম হঠাৎ রাগের মাথায়। তারপর বারণ করেছি।

শোভনার মুখে আসে আমি তোমার হুকুমের চাকর নয় যে, যা বলবে তাই শুনতে হবে। কিন্তু সামলে নেয়। এখন আর তার যাকে যা ইচ্ছে বলার সাহস নেই। এখন মেয়েকেও ভয়। যদি মেজাজ দেখিয়ে চলে যায়। এ যুগে এইসব উগ্রচণ্ডী মেয়েদের জন্যে সুবিধের দরজা হাট করা আছে যে। দিকে দিকে 'লেডিস হোস্টেল।' গিয়ে উঠলেই হল একটাতে। হোস্টেল খরচের জন্যেই কি তোয়াক্কা করবে? যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে চালিয়ে নেবেই। এম.এ. পাশ করেছে, গানে ডিপ্লোমা আছে, মিশন ইনস্টিটিউটে গিয়ে গিয়ে কিসব ভাষা শিক্ষা করে রেখেছে, ওদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি! এ কি আর শোভনার মতন অভাগা যুগের মেয়ে?

বেচারা শোভনা।

ভরা যৌবনে স্বামী চলে গেল, ঘাড়ে রইল দুটো বুড়ো, আর একটা নাবালিকা মেয়ে, আর যাবতীয় দায়দায়িত্ব। তার ওপর আবার শ্বশুরঠাকুর পক্ষাঘাত হয়ে পরম উপকার সাধন করলেন। অথচ মেয়ের ইচ্ছে শোভনা বাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকুক! কেন? কিসের জন্যে? শোভনা মানুষ নয়? সিনেমা থিয়েটার দেখে বেড়ালে তোমরা ভাল বলতে? ঘরে পরে ছি-ছিক্কার হতো না? গুরু আশ্রমে যাই তাও দোয?

একদিন একথা বলে ফেলায় লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে আবার কটকট করে জবাব দেয় কিনা, 'ঢের ভালো ছিল মা সেটা।' সিনেমা থিয়েটার? সে তো উৎকৃষ্ট জিনিস। বিশ্বসুদ্ধ মানুষ দেখছে যাবারই জায়গা। সেখানে তো তুমি দর্শকমাত্র। আর তোমার ওই আশ্রমে? সেখানে যে তোমার নিজেরই নায়িকার ভূমিকা। বৃহৎ রিস্ক।

শুনলে হাড় জ্বলে যায়।

মায়ের হাড় জ্বালিয়ে কথা কয়েই ওর সব থেকে সুখ।

এই যে এখন?

বুঝছে তো মার হাড়মাস জ্বলে যাবে এমন কথায় তবু বলে কিনা তারপরে আমি বারণ করেছি। তুমি শোভনা রায়কে বারণ করবার কে হে?

তবু শোভনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমার প্রাণের জ্বালা বোঝবার ক্ষমতা থাকলে বারণ করতে না, দেখগে তোমার বাপের চেম্বার তারপর বলতে এসো—

টিসু বলল, দেখেই এলাম তো।

দেখেছ? নীচের দিকের একটা তাক প্রায় খালি হয়ে এসেছে দেখেছ?

দেখেছি।

দেখেছিস? তবু এমন ঠাণ্ডা মেরে বসে আছিস? উঃ। ভাবা যায় না! যে লোকটা চিরদিন এ সংসারের ঘাড়ে চেপে—

সব বুঝলাম মা। কিন্তু দাদুকে বলে কোনো লাভ হবে?

লাভ? উনি ওঁর প্রাণের বন্ধুর আদরের ভাইয়ের স্বরূপ চিনুন।

টিসুর সে সময় হঠাৎ কিছুক্ষণ আগে দেখে আসা অসাড় নিস্পন্দ মুখটা মনে পড়ে যায়। তাই বলে ওঠে, ধরো ভবদাদুর আর হস্‌পিটাল থেকে ফেরা হল না। ধরো ওখান থেকেই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন, তবে এইটুকুর জন্যে 'স্বরূপ' না চিনলেই বা ক্ষতি কি মা?

শোভনা বেজার গলায় বলেছিল, মরবে তো একদিন সবাই। তাহলে তো আর কাউকেই কিছু বলা চলে না।

টিসু বলেছিল, তুমি কিন্তু মা এখনো জিগ্যেস করনি লোকটা আছে কেমন। চোর হোক ডাকাত হোক, বাড়ির একটা লোক তো।

শোভনা নীরস গলায় বলেছিল, মা তো পাষাণ প্রাণ জানোই।

কিন্তু এসব তো সেই সেদিনের কথা। তখনের কথা।

যেদিন যখন ভবনাথ নামের লোকটা হাসপাতালের খাটে শুয়ে পড়েছিল চোখ বুজে।

তারপর গঙ্গায় কতো জল গড়িয়েছে, পরিস্থিতির কতো পরিবর্তন ঘটেছে।

ইত্যবসরে কেমন করে যেন 'মানিক' নামের ছেলেটা এ সংসারে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। মানিককে রোজ আসতে হয় এখানে, কাজ করতে হয় একশো রকম এবং নিত্যই এ বাড়ি থেকে খেয়ে যেতে হয়।

কাজের গতিকে বেলা হয়ে গেলেই টিসু হুকুম দেয়, এই মানিক, খবরদার না খেয়ে যাবে না। যদি শুনি না খেয়ে চলে গেছো, মনে রেখো তারপর এ বাড়িতে ঢোকা বন্ধ।

হ্যাঁ, এখন আর 'মানিকবাবু' আপনি নয়, স্রেফ্ মানিক তুমি এবং কথা শুনলে মনে হয় বুঝি বলরামের পর্যায়ের কারো সঙ্গে কথা বলছে। অথচ সেই মানিক বলবে, এখন তো আপনাব দাদু ভাল হয়ে উঠেছেন, এখন আর আমার এত আসার কী দরকার?

তখন টিসু অদ্ভুত এক রকম গভীর চোখে তাকিয়ে বলবে, আছে দরকার। আসতে হবে ব্যস!

এগারো

তার মানে মোনা কোম্পানীর একটা ক্যাল্‌কুলেশান ঠিক হলেও আর একটা নয়।

বিপদ-টিপদের হট্টগোলে কারো অন্দর মহলে পর্যন্ত ঢুকে পড়া যায়। বিশেষ করে যদি সে বাড়ি অভিভাবক শূন্য হয়, সাহায্যের হাতের দরকার থাকে। তাই না মানিকের অদ্ভুত আবদার মেটাতে সেদিনের সেই আয়োজন।

হিসেবে ভুল হয়নি। সেই সেদিন সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সূত্র ধরে, অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটে গেছে অভাগা মানিকের। যে নাকি দলের মধ্যে সব থেকে নীরস।

সকলেরই বাড়িতে অল্পবিস্তর কিছু আছে।

বাপ না থাকুক মা আছে, মা না থাকুক বাপ আছে। কিছু না থাকুক দাদা বৌদি আছে? 'স্নেহে বিগলিত'

না হলেও আছে তো? তাছাড়া—ভাল মন্দ যাই হোক ঘর-বাড়ি আছে (মোনার তো দারুণ বাড়ি আছে। গেটে দারোয়ান, গ্যারেজে গাড়ি) বাড়িতে বাড়া ভাত আছে এবং বেশ দু'চারটে ডিগ্রীও আছে ইউনিভার্সিটির! পবিত্রর তো আবার গীটারে রীতিমত হাত আছে; কিন্তু মানিক?

মানিকের কী আছে?

চাল না চুলো? কিছু না। দূর সম্পর্কের এক দিদি জামাইবাবুর বাড়ি থাকতে পেতো এবং দুবেলা দু মুঠো খেতে পেতো, কিন্তু অনিয়মিত গতিভঙ্গীর অপরাধে সেটুকু আশ্রয় গেছে। মানিক এখন একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে রাত্রে তার দোকান আগলাবার চাকরিটা জোগাড় করে ফেলে রাতের আশ্রয়ের সমস্যাটা ঘুচিয়েছে। খাওয়ার কোনো ঠিক নেই। তাছাড়া মানিকের কোনো ডিগ্রীও নেই।

দূর সম্পর্কের জামাইবাবু পড়াচ্ছিল, কিন্তু পার্ট টু-তে একবার ফেল মারতেই ঝেড়ে জবাব দিয়ে দিল। বলল, ভস্মে ঘি ঢালবার মত ঘি তার নেই।

সেই মানিক। দলের ওঁচা। যদিও মোনার দলে যখন এসে পড়েছিল, সে মোনা, জগদীশ; পুণ্য ওরা সমস্বরে একটা পুরানো কবিতার কটা লাইন গেয়ে উঠেছিল—

কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস?
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো
মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা,
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে—।

নিজেদেরকে ওরা এই 'সর্বহারা'র ছাপই দিয়ে রেখেছিল, তবু মানিক নিজেকে ওদের মধ্যে ওঁচা মনে করতো। আর কেমন করে যেন ওঁচা কাজগুলোই তার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিল। তার এবং বিজুর স্বভাবতই এটা হয়ে এসেছে। মোনা কি পুণ্য পবিত্র কি জগদীশ সহজে কখনো পথচারীকে ল্যাং মারতে বা কনুইয়ের খোঁচা দিতে যাবে না।

অথচ সেই মানিক এই বড়লোকের বাড়ির ডাঁটুস মেয়ের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

মোনাদের দ্বিতীয় অঙ্কটা অতএব মিলল না। 'দরকার ফুরিয়ে গেলে আর চিনতে পারবে না।' এটা ঠিক হল না।

চাবুকের মত সেই মেয়েটা রাজেন্দ্রানীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত গভীর চোখে তাকিয়ে বলে, আছে দরকার! আসতে হবে ব্যস!

ব্যস।

এর উপর আর কথা চলে? অতএব আসতেই হয়।

অবশ্য 'দরকার'টা 'আবিষ্কার' হয় কিছু কিছু।

মৃগাঙ্কমোহনের জন্যে অনেক কাজ।

ডাক্তার ওষুধ, 'মাসাজের' লোক কামাই করলে ধরে আনা, এসবের জন্যে কাজ আছে। যেগুলো ভবনাথের দ্বারা হতো। এখন ভবনাথও প্রায় রোগী।

কিন্তু কোথায় ভবনাথ?

মৃগাঙ্কমোহনের ঘরে তো দেখতে পাওয়া যায় না তাঁকে? নাঃ তার সেই চিরশয্যাটি এখনো খালি পড়ে। সিঁড়ির পাশের একটা ছোট্ট ঘরে ভবনাথ আস্তানা নিয়েছেন।

ভারী অদ্ভুত অবস্থায় এখনো এ বাড়িতে তাঁর অবস্থান। তিনি জেনে গেছেন, লোকে তাঁকে 'জেনে' গেছে।' শোভনার স্পষ্ট বক্রোক্তি সেটা প্রতিনিয়তই বুঝিয়ে ছাড়ছে।

অথচ শোভনার মেয়ে তাঁকে এই দুর্বল শরীরে ছেড়ে দিতে চাইছে না।

প্রথম যখন জ্ঞান হয়েছিল ভবনাথের টিসুর পাশে মানিককে দেখে উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠেছিলেন, ওকে ও কে?

টিসু বলে উঠেছিল, ও কেউ না ভবদাদু। একটা রাস্তার ছেলে।

বারো

রাস্তার ছেলে।

বলল একথা?

ছিটকে উঠেছিল বিজু।

মানিক উদাস হাসি হেসে বলেছিল, বললো তো।

প্রথম প্রথম নিয়মিত রিপোর্ট দিতে আসতে মানিক তাদের আড্ডায়। ক্রমশঃ নিয়মে ছেদ পড়তে শুরু করেছে, অতঃপর আরো ঝাপসা। কিন্তু তখন তো সদ্য টাটকা।

বিজু বললো, তবু তোর ওর সঙ্গে প্রেম করবার বাসনা শা—

মানস সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধীরে-সুস্থে মুচকে হেসে বলেছিল, সেইজন্যেই তো আরো। ওটা সাইকোলজির একটা বিশেষ থিয়োরি। যতো হ্যানস্থা, খিঁচুনি, দূর ছাই, প্রেম ততোই ঘনীভূত।

মানিক মলিন মুখে বলেছিল, ওসব বড়বড় কথা বলছিস কেন? কেমন যেন একটা ভূতে পেয়েছিল, মনে হতো যে কোনোভাবে একবারও যদি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পাই, দুটো কথা কইতে পাই—

এখন ভূত ছেড়ে গেছে।

বুঝতে পারছি না। বুড়ো যখন বলে উঠল 'কে? কে? ও কে?' তখনই তো হয়ে গেল আমার। কিন্তু মাথাটা ফাঁকা তো আর কিছু বলল না। চোখ বুজে ফেলল।

আর একদিন এসে রিপোর্ট দিল মানিক, কাল ছাড়া পাবে বুড়ো। তার মানে আমার কাজ ফুরোলো ওঁনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া-আসা ডিউটি ছিল তো আমার।

পবিত্র ছিল আড্ডায়, বলল, কেন বাবা! 'মশালের' এমন মোমবাতির মতন ব্যাভার কেন? ওরা আবার বডিগার্ডের ধার ধারে না কি?

ধারে।

মানিক বলল, ও বলে, একলা বিলেত চলে যেতে পারি কিন্তু ট্যাক্সিতে একলা সাউথ থেকে নর্থে? অসম্ভব।

কথা শেষ হয় না, অন্য প্রসঙ্গ এসে যায়।

মানিককে কেউ কেউ অভিনন্দন জানায়, কেউ বা বলে, মাইরি শা—তোর সঙ্গে ভাগ্য বদল করতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু ক্রমশই মানিক বেপাত্তা! হঠাৎ হঠাৎ একদিন হয় তো এসে হাজির হয়।

এরা বলে, কী রে মাকড়া, সত্যি সত্যি সগ্গের টিকিট কিনে ফেললি না কি? সেদিন যে বললি বুড়োকে বাড়ি আনা হয়েছে—

হয়েছে তো—

তো চোরামি ধরা পড়ে কি বলছে?

কিছু বলছে না।

বলে মানিক কেমন আলগা গলায় বলল, সত্যি বটে হাতে হাতে ধরা পড়েছে। গিন্নী তো দেয়ালকে

শুনিয়ে শুনিয়ে খুড়ো-শ্বশুরকে চোর জোচ্চোর ঠগ নেমকহারাম বলতে কিছু বাকি রাখল না, তবু বিশ্বাস হয় না লোকটা সত্যি খারাপ। মনে হয় ভেতরে বোধহয় অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

রাখ তোর কথা—

মানস বলেছে, ওদেরই বলে 'সিক্তমার্জার।' বুঝলি? আগে বুড়োকে আমি রেস-এর মাঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি, খানদানী দোকান থেকে বোতল নিয়ে বেরিয়ে আসতেও দেখেছি, বাজারের থলির মতন থলিতে পুরে ফেলে এমনভাবে হাঁটে যেন পুঁইশাক কিনে ঘরে ফিরছে। ঘুঘু বুড়ো।

দিন যাচ্ছে। আর—

এ আড্ডায় ক্রমেই মানিকের জায়গাটা ফাঁকা থাকছে।

ওদিকে কড়া হুকুম, 'একদিনও কামাই চলবে না—খবরদার।'

মানিক জানে না তার চাকরিটা কি। অথচ কামাই চলবে না।

প্রশ্ন করারও প্রশ্ন নেই। অদ্ভুত একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন অনুভূতি নিয়ে যেন বাতাসে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে মানিক। মানিকের অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমান লুপ্ত। 'মানিক' নামের যে একটা ইচ্ছে করে উচ্ছন্ন যাবার প্রতিজ্ঞা নেওয়া 'সর্বনেশে' দলের ছেলে ছিল সেটা যেন কতদিন আগে দেখা একটা সিনেমার দৃশ্য।

আবার ভবনাথ নামের সেই—দীনহীন বৃদ্ধটার অবস্থাও প্রায় একই।

এ সংসারে 'ভবনাথ' নামের যে লোকটা বাড়ির কর্তার ঘরের একাংশের বাসিন্দা ছিল, তাঁর আজীবনের সঙ্গী বন্ধু স্নেহভাজন অনুগত হিসেবে পরম মূল্যবান ছিল, আর 'বিশ্বস্ত' শব্দটার প্রতীক হিসেবে এ সংসারের সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হয়ে একটা নিশ্চিন্ততার স্বর্গে বাস করতো—সে লোকটা যেন আর কেউ। যেন ভবনাথ অনেকদিন আগে দেখা কোনো নাটকের দৃশ্যের নায়ক।

এখনো ভবনাথ, সেই ভবনাথকে ঘুরতে ফিরতে কাজ করে বেড়াতে দেখেন। দেখেন এক অনড় রোগীর বিছানার পাশে বসে তাস খেলতে, দাবা খেলতে, কাগজ পড়ে শোনাতে, রাত জাগতে।

সেই স্বর্গভূমিতে আর পা ঠেকাননি ভবনাথ।

গৃহকর্ত্রীর কঠোর নির্দেশে হাসপাতাল ফেরত ভবনাথের যেখানে থাকার ঠাঁই হয়েছে, সিঁড়ির পাশের সেই ছোট্ট ঘরটার সবটাই প্রায় বাড়ির প্রাক্তন তৈজসজনিত মালপত্রে বোঝাই। তাদের সঙ্গে সহাবস্থান ভবনাথের। শুয়ে শুয়ে সেইগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন ভবনাথ, সেইসব ভাঙা ট্রাঙ্ক বাক্স, মরচে পড়া বড় বড় লোহার কড়াই, গামলা, চাটু, ঝাঁজরি, তুলো বেরনো পুরনো বালিশ-বিছানা, বেতছেঁড়া চেয়ার, পায়া ভাঙা টুল আর আরও কত হিজিবিজির দিকে। তখন মনে মনে হেসে ভাবেন, তা আমিও তো বাড়ির একটা প্রাক্তন মাল বৈ নয়। ঠিক জায়গাতেই ঠাঁই হয়েছে আমার।

শুধু ভরসা এই, এ জঞ্জালটার একদিন চলৎশক্তি ফিরে পাবার আশা আছে, তাই ভরসা হয় ঘরের খানিকটা জায়গা অন্ততঃ একদিন একটু ফাঁকা হয়ে যাবে।

শোভনা অবশ্য বলে, চোট লেগেছিল মাথায়, এখনো পায়ের জোর হল না!' হুঁঃ! ছুতো! সুযোগ নেওয়া। জানা আছে, 'সেরে গেছে ভাল আছে' দেখলেই—লোকে বলবে, 'পথ দেখো'। যতদিন পারা যায় উসুল করে নিই।

পূজনীয় খুড়শ্বশুরের কান বাঁচিয়ে বলে এমন মনে করার হেতু নেই।

তেরো

এই রকম একটা দিনে হাজিরা খাতায় সই করতে আসা মানিককে চলতি পথে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ভবনাথ। আর কাছে আসতেই বিনা ভূমিকায় বলে উঠলেন, তুমি আর তোমার দলবল তো বাপু অসাধ্য সাধন করতে পারো। তা আমার একটা উপকার করতে পারবে?

'তুমি আর তোমার দলবল!'

মানিকের মনে হল তার পা দুটো কে মাটিতে পুঁতে দিল। মানিক বোকার মত বলল, 'আমি আর আমার দলবল' মানে?

মানে বুঝতে পারছো না বুঝি?

ভবনাথ একটু হাসলেন। বললেন, আচ্ছা না হয় মানে নেই। বুড়োরা অমন কত ভুলভাল বলে। বলছি—এ বাড়ির কাউকে না জানিয়ে এই বুড়োকে বাড়ির বার করে নিয়ে যেতে পারো?

কাউকে না জানিয়ে? অসম্ভব কথা বলছেন কেন?

ভবনাথ বললেন, অসম্ভব সম্ভব করবে এই আশা।

আমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না। আপনি তো দু'খানা বই নয়, যে ব্যাগে ভরে পাচার করা যাবে।

বলে ফেলেই থতমত খেয়ে যায় মানিক।

এ কী কথা বলে বসল সে।

এমন একটা কথা যে বলে বসতে পারে সে, এমন চিন্তা তো এক মুহূর্ত আগেও ছিল না। হঠাৎ যেন কেমন নিজেকে আক্রমিত মনে হলো। তাই—দিশেহারা হয়ে—

কিন্তু ভবনাথ কি এতে থমকে গেলেন?

তা তো নয়?

ভবনাথের মুখে একটা কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল।

বুড়োটি মুখে সেই হাসি ফুটিয়ে বলে উঠলেন, তোমার দ্বারা হবে না? আর আমি যদি তোমায় ব্ল্যাকমেল করি?

ব্ল্যাকমেল মানে?

মানিক বসে পড়তে পড়তে সামলে নেয়।

মানিকের কানে একটা আর্তস্বর যেন আছড়ে পড়ে। 'ও কে? ও কে? ও এখানে কেন?'

ভবনাথ বললেন, আরে অমন ঘাবড়ে গেলে কেন? সত্যি কি আমি তাই করব বাপু? তবে ভেবে পাচ্ছি না আর কাকে বলি?

কাউকে না জানিয়ে চলে যাওয়াই কি ভাল?

আস্তে বলে মানিক।

ভবনাথও আস্তে হেসে বলেন, কখনো কখনো জীবনে 'ভাল-মন্দ' দুটো শব্দ এক হয়ে যায় বাপু। এ জীবনের আরও কত বেশী লোকসান হবে? বড়জোর না হয় অপবাদ রটবে গৃহকর্ত্রীর লোহার আলমারীর মধ্যে থেকে গহনাগাঁটি পাওয়া যাচ্ছে না।

সেটা আপনার কাছে খুব তুচ্ছ হলো?

সবই তো আপেক্ষিক বাপু।

মানিক ওঁর নির্লিপ্ত নির্বেদ মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখল। ওই অবিচলিত ভাবটা দেখে মানিকের কেমন যেন রাগ হল। অথবা হিংসে। বসে উঠল, 'ভাল আর মন্দ' দুটোই যদি আপনার কাছে সমান, তবে কাউকে না জানিয়ে চোরের মতো চুপিচুপি চলে যেতে চান কেন? সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যান।

সে তোমায় বোঝাতে পারব না বাপু। মোটের মাথায় কোনো 'নাটুকে দৃশ্য'র আমদানী করতে চাই না।

ওঃ।

মানিক হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, আপনি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে পারেন বললেন কেন?

এমনি, 'দাদু' বলে ডাকো, ঠাট্টা করলাম একটু।

কক্ষনো না। আপনি নিশ্চয় আমায় চিনতে পেরেছেন।

চিনতে? আরে ভাই, এ জগতে কে কাকে চিনতে পারে? এই যে এ সংসার আমায় এতোকাল দেখছে, চিনতে পেরেছিল? এখন পারলো?

ওকথা আমি মানি না। কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে। তবে শুনুন, ব্ল্যাকমেল করতে গেলে কোনো

সুবিধে হবে না আপনার। আমি নিজেই প্রকাশ করে যাবো, আমি কে, কী আমার পরিচয়, আর কোন কৌশলে আমি এ বাড়িতে ঢুকতে পেয়েছি। আপনার ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে ক্ষমা ফমা চেয়ে ন্যাকামি করতে চাই না। ধরে নিচ্ছি—এসব আপনার ভাগ্যে ছিল।

ও দাদা, তাহলে আমার ব্যবস্থা হবে না? নিজে ব্যবস্থা করে ওঠবার মত ক্ষমতা পেতে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

আমি জানি না। বাড়ির লোককে না বলে—নাঃ অসম্ভব।

বেশ বলেই দিও—

চৌদ্দ

সেই বলাটাই বলা হয়েছিল।

আর মৃগাঙ্কমোহন বলে উঠেছিলেন, ওরে টিসু ওকে চলে যেতে দিসনে। বৌমা ও এভাবে চলে গেলে সংসারের মঙ্গল হবে না!

শোভনা বলে উঠেছিল, আর একজন বিশ্বাসঘাতক লোককে বাড়িতে রেখে দিলে বাড়ির খুব মঙ্গল?

মৃগাঙ্ক হতাশ গলায় বলেছিলেন, বিশ্বাসঘাতক ও নয় বৌমা। যে বিশ্বাসঘাতক সে তোমাদের সামনে পড়ে রয়েছে! ওর দোষ নেই। ওকে আমিই পাঠিয়েছিলাম।

তারপর থেমে থেমে বললেন, আমিই ওকে বলেছি, ও বই তো আর কারো কাজে লাগবে না—

টিসু বলল, বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছে দাদু।

তবু বিশ্বাস করতেই হবে দিদি। ভবকে আটকাতে হবে। আমার জন্য যদি ওকে কলঙ্কের কালি মেখে এ বাড়ি থেকে বিদায় হতে হয়, মরে সদগতি হবে না আমার।

টিসু হতাশ গলায় বলল, বেশ না হয় বিশ্বাসই করলাম! কিন্তু কেন এই জঘন্য কাজ করতে গেলে দাদু? সারাক্ষণ তো বিছানায় পড়ে আছো, বই বেচা টাকা দিয়ে কী করতে তুমি?

মৃগাঙ্ক যেন নিজের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তাই শক্ত গলায় বললেন, ওকে দিয়ে রেস খেলতে পাঠাতাম।

দাদু তুমি কি আমায় নাটক শোনাতে বসেছ? রেস খেলা টাকায় কী করতে শুনি? তা নয়, ভাইয়ের রেস খেলার নেশার জোগান দিতে এই তো?

ওরে না রে না! ভবকে তোরা কেউ চিনলি না। ভব দেবতা। তাই নীরবে সব পাপের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমাকে—

শক্ত থাকার চেষ্টাটা হঠাৎ ব্যর্থ হয়ে যায়।

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন মৃগাঙ্ক, আমারই নেশার জোগান দিতে—চিরকাল দু হাতে রোজগার করেছি, দু হাতে খরচ করেছি। আর নেশার বশীভূত হয়ে ভেবেছি এমনি দিন চিরদিন যাবে। দামী মদ ছাড়া খেতে পারি না। কিন্তু এখন তোর মার হাত তোলায় থেকে—

আরো চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেন মৃগাঙ্ক, বেটাছেলে, চিরকাল যে যথেচ্ছ টাকা উড়িয়েছে, শেষ বয়েসে তার হাতে যদি একটা পয়সা না থাকে—তার বড়ো যন্ত্রণা নেই রে—

পনেরো

তারপর? সমস্ত গোলমাল শান্ত।

শোভনা রাগ করে অসময়ে গুরু আশ্রমে চলে গেছেন, সেখানেই থাকবেন বলে।

ভবনাথকে মৃগাঙ্কর ঘরে নিয়ে এসে তাঁর নিজস্ব জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে। যদি মৃগাঙ্কর আবেগের অবিরল অশ্রু থামাতে পারেন তিনি।

মানিক আর টিসু এক শূন্য মঞ্চে বসে।

মানিক বলল, একজনের পাপ স্বীকার হয়ে গেছে। এবার মানিক হতভাগার পালা। আজ আমার কথা সব আপনাকে বলে যাব।

টিসু অগ্রাহ্যের গলায় বলল, যাবেটা কোথায়?

যে জাহান্নম থেকে এসেছি সেইখানেই যাব। আর কোথায় জায়গা বলুন আমাদের মত হতভাগ্যদের।

এ জায়গাটা জাহান্নামের থেকেও খারাপ লাগছে তোমার?

মানিক উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, আপনি যদি আমার পরিচয় জানতেন, জানতেন আমি কে, আমি কী, তাহলে আর একথা বলতেন না। নিজেই গলাধাক্কা দিয়ে—

গাঁইয়া কথাগুলো ছাড়ো মানিক। গলাধাক্কা কথাটা বড় সেকেলে।

এখনো আপনি ঠাট্টা করছেন? জানেন আমি কত বড় বিশ্বাসঘাতক। আপনার বিশ্বাস আর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছি খাচ্ছি পরছি। অথচ আমি—

টিসু হঠাৎ কড়া গলায় বলে, অতো বুদ্ধির অহঙ্কার কেন হে মানিকবাবু? আমার সরলতার, অজ্ঞানতার, নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে 'আপনি'—আহাহা। তোমার ইতিহাস যেন জানি না আমি। প্রথম দিনেই যেন আমি ধরে ফেলিনি, তুমি কী? কেন? কবে? কোথায়? ধরে ফেলিনি—দাদুর মাথা ভাঙার কারণ রহস্য? প্রথমদিনই জেনেছি বুঝলে হে!

কী বলছেন?

মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কী বলছেন আপনি? তবু আপনি আমায় বাড়িতে—

হুঁ তবু আমি—

কিন্তু কেন?

রুদ্ধ গলায় বলে ওঠে মানিক কেন? কেন?

আমার শখ্। বিদঘুটে শখই বলতে পারো। আর সেই বিদঘুটে শখেই তোমায় চিরকালের মত আটকে রাখবার তাল করছি।

টিসু।

বদ্ধ গভীর এই ডাকটাব উত্তরে টিসু হালকা গলায় বলে ওঠে, থাক। তবু একটু উন্নতি দেখছি। সুলক্ষণ।

টিসু। তোমার এই বিদঘুটে শখ ছাড়ো। শখের খেয়ালে সুইসাইড করতে বোসো না। ভেবে দেখো—আমি কী, আর তুমি কী?

হঠাৎ চপলতা ছেড়ে গম্ভীর হয় টিসু।

ক্লান্ত গলায় বলে, ভেবে দেখেছি। দেখেছি তুমি আমি স্বজাতিই। তুমিও দুঃখী, আমিও দুঃখী।

তুমি দুঃখী।

দুঃখী বৈকি! বাপ নেই, মা থেকেও নেই। বৈধব্য জীবনের পবিত্রতা ভুলে গুরু আশ্রমের ছুতোয় আত্মপ্রবঞ্চনা করে চলেছেন তিনি। আমি যে তাঁর একটা মাত্র সন্তান, সেকথা মনেই পড়ে না। আর আমার শ্রেষ্ঠ অভিভাবক বাবার বাবা, তিনি তাঁর মৃত পুত্রের জিনিস বেচে নেশার খরচ জোগান দেন, আর একটা সৎ মহৎ ভাল লোকের ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আজীবন তাকে ভাঙিয়ে খেয়ে চলেছেন, কখনো ভাবেননি তারও একটা মনপ্রাণ আছে, রুচি আদর্শ আছে। আর আমি নিজে?

টিসু আরো ক্লান্ত গলায় বলে, আমি আমার এই বঞ্চিত বিরক্তিকর জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে বসে, নিজেকেই বিকৃত করে তুলেছি। গড়ে তুলেছি উদ্ধত, অভদ্র, দুর্মুখ স্বেচ্ছাচারী করে। তোমার প্রবলেমও তো তাই! জীবন আর সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়ে হয়ে উঠেছো সমাজবিরোধী, জীবন বিরোধী। আমরা দুজনেই একই দুঃখের শিকার। কিন্তু দেখাই যাক না এই দুটো দুঃখী জীবন দিয়ে 'একখানা' সুখী জীবন গড়ে তোলা যায় কিনা।

ঘ র

আবার উটোউটি? আবার বেড়াল নাড়ানাড়ি কুকুর নাড়ানাড়ি? তোমার কতা আর সহ্যি হতেচে না বাপু। আবার ক্যানে? সাগরের চেরে ফাঁটা ভাঙ্গা গলার এই উত্তেজিত প্রশ্নটা যেন আর্তনাদের মত শোনায়, 'না। কোথাও যাবনি। মরতি হয় এই চুলোতিই মরব।'

কাঠি চাঁছা নারকেল পাতার সরু ফালিগুলো দিয়ে জ্বাল ঠেলে ঠেলে ভাত সেদ্ধ করছিল সাগর। পাতা পোড়ার কটু গন্ধ ধোঁয়া। আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে উনোনের ধারটা, তবু তার অন্তরালস্থিত ভাত ফোটার গন্ধটা অটল দাসের সমস্ত চৈতন্যটাকে যেন একটা মোহময় সুখের স্বাদে আচ্ছন্ন করে তুলল।

অটল দাস তার অবুঝ পরিবারকে খিঁচোতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'অদেষ্ট। গাঁ ভুঁই ছাড়া অবদিই তো বেদের টোল ফেলে ফেলে দিন গোঞাচচি।'

কোথা থেকে যেন ঘুরে এসেছে অটলদাস, হয়তো এই সুসংবাদটি আহরণ করতেই তার যাওয়া। গরমের দুপুর, পরণের ঘাড়গাটা হাতা ছেঁড়া হাফ হাতা হাওয়াই শার্টটা ঘামে ভিজে সপসপিয়ে উঠেছে, পরণের খাটো খেঁটে তালি সেলাই মারা ধুতিটাও তথৈবচ। তবু অটল দাস শুধু জামাটারই তত্ত্বাবধান করতে উঠোনে নামল। উঠোন মানে তিন কোণা এক চিলতে মেটে জায়গা যার বুকে একটি পেয়ারাগাছ যেন সবুজ স্নেহে এই অনেক আশার স্বপ্নে ঘেরা ছোট্ট সংসারটুকুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শাখা দুলিয়ে দুলিয়ে ভালবাসা জানায়।

এইখানে এসেই ওই পেয়ারার চারাটা পুঁতেছিল সাগর কোথা থেকে যেন সংগ্রহ করে। আর যত্ন নিয়েছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

তা গাছটা বেইমান নয়, ফল দিয়েছে। গত বছর দিয়েছে এ বছরও দেবার আশ্বাস। যেন আরো বেশীরই আশ্বাস। ছোট্ট ছোট কষাকষা শিশু ফলের সম্ভারে ভরা শাখাগুলি তার ইসারা বহন করছে।

পেয়ারা গাছটার কোলের গোড়ায় সাগরের তুলসীমঞ্চ। সেও অনেক যত্নে গড়া। গাছটা হয়েছিল নিজের খেয়ালে, সাগর আহ্লাদে অভিভূত হয়ে এখান ওখান থেকে দু-চারখানা ভাঙ্গা ইট জোগাড় করে তার ঘের দিয়ে আর মাটি লেপে মঞ্চটি খাড়া করেছিল। সাঁঝের পিদ্দিমটা নিত্য দিতে অবিশ্যি তেলে কুলোয় না তবে সকালে জলটুকু দেয় নিয়ম করে। মনে মনে বাল্যের লেখা মন্তরটি উচ্চারণ করে, তুলসী, তুলসী নারায়োণ, তুমি তুলসী বৃন্দাবন...

অটল দাসের এক ভাজ এসেছিল একবার কোথায় যেন যাবার পথে। ধরে করে তাকে দুদিন রেখেছিল সাগর। অতিথ আত্মীয় এলে তাকে ধরাকরা করে থাকতে বলাই তো সংসারের রীতি। সেটাই সংসারের স্বাদ। সাগর যে আবার সংসার করতে পেয়েছে, এইটুকুই জানাতে ইচ্ছে হয়েছিল সাগরের দেশের দূর সম্পর্কের ওই জাটিকে। জানাতে হয়েছিল ধরে রেখে আর যত্ন করে। চেনা মানুষই যদি সুখের দৃশ্য না দেখল তো সুখের অর্থ কী?

সাগর তখন তার সংসারটিকে 'সুখের' বলেই ভাবতে শুরু করেছিল। কারণ তখন অটল এই পড়ে পাওয়া ভাঙ্গা ঘরটুকুকে নিজের হাতে ছ্যাচাবেড়া, আর দর্মা তালি মেরে একখানা বাসস্থানের রূপ দিয়ে ফেলেছিল আর তিনকোণা ওই মাটিটুকু যাকে সাগর উটোন বলে সেইটুকুকে তখন কুড়িয়ে আনা বাঁশবাখারি কচাব ডাল বিছুটির ডাল দিয়ে ঘেরার কাজটা সদ্য শেষ করেছিল। আর সেই তখনই সাগরের পেয়ারা গাছটা সুগোল মসৃণ হালকা সবুজ রঙা ফলগুলি প্রসব করতে শুরু করেছিল।

আর তুলসী ঝাড়টা? যেন ভগবানের অকৃপণ আশীর্বাদের মত।

তা ওই গাছে জল ঢালার মন্ত্রটি কানে যেতেই বড়জা বলে উঠেছিল 'আমরণ! তুলসী তো হচছেন গে মেয়েছেলে আদাআনীর সতীন, তাঁকে আবার 'নারায়ণ' বলা ক্যানো?'

সাগর এতো জানে না। সাগর তো শৈশবকালে গুরুজনদের মুখেই এই মন্ত্র শুনেছে আর শুনে শুনে শিখেছে। তাই সাগর তার এই শাস্ত্রজ্ঞ বড় জায়ের মুখের দিকে না তাকিয়েই প্রণামান্তে বলেছিল ভগোমানের আবার ব্যাটাছেলে মেয়ে ছেলে কী?

'মরণ! ভগোমানের মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে নেই? বলি মা কালীকে তুই বাবা কালি বলবি? না শিবঠাকুরকে মা গো শিবঠাকুর বলবি?

সাগর বুঝেছিল সুবাসিনীর এটা মনান্তর বাধাবার ছল। ভেতরের হিংসের প্রকাশ। সর্বস্বান্ত সাগর যে বেদের টোল ফেলে ফেলে অবশেষে একটা আশ্রয় পেয়েছে আর দৈত্যের মত পরিশ্রমী অটলের চেষ্টায় যত্নে সে আস্তানায় এমন লক্ষ্মীশ্রী ফুটেছে, তাই দেখে সুবাসিনীর ভেতরে ভেতরে হিংসের জ্বালা ধরেছে। উদাস গলায় সাগর বলেছিল তোমার মতন শাস্তোর পালা তো জানিতে সুবাসদি, ছোটকালে মা-পিসির মুকে যা শুনিচি, তাই শিকিচি।

'ভুল শিক্ষে।'

সুবাসিনী আত্মস্থ গলায় রায় দিয়েছিল আদাআনীর পূজোয় তুলসী দেবার জো নাই। সতীন বলেই না?

তবু সুবাসিনীর যাবার বেলায় সাগর খইয়ের মোয়া করে দিয়েছিল চারটি, আর গাছের পেয়ারা দিয়েছিল পেড়ে পেড়ে।

চলে যাবার পর শংকু আর তুষু রাগ রাগ গলায় মাকে বলেছিল, ওই বুড়িটাকে সব মোয়াগুলান দিয়ে দিলি? গাচটা নিসুট্যি করে প্যায়ারা দিলি? ক্যানো? বুড়িটাতো পাজী।'

সাগর তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'ছিঃ। গুরুজন না?'

কিন্তু সেই সাগরই আবার বরের কাছে গুরুজনের নিন্দে করতে ছাড়েনি! গলা নামিয়ে বলেছিল, 'যাই বলিস তোর ভাজ বড্ড খালি হিঁসকুটে।'

তা তুই-ই তো রাকলি পায়ে ধরে? অটলের সাফ জবাব দুদিন ওনার নৈবিদ্যি জোগান দিতে নিজেদের পেটে টান।

'তা হোক', সাগর জবাব দিয়েছিল, মানুষ মনিষ্যিতি বলে একটা কতা আচে তো? না কি নাই?

তার মানে সাগর ধরে নিয়েছিল এখন তার মানুষ মনিষ্যত্ব দেখাবার অধিকার জন্মেছে। তার মানে তখন সাগর ধরে নিয়েছিল; অনেক দুঃখু ধান্ধার শেষে আদার কেটে ভোর হয়েছে তার।

তকতকে করে লেপা পোঁছা তুলসীমঞ্চ চকচকে করে নিকোনো উনোন যুগল, ছ্যাঁচাবেড়া আর দর্মা ঘেরা এই ঘরখানির মধ্যেই সাজানো সংসার। এ সবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক দূর অবধি স্বপ্ন দেখতো সাগর কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়ে।

দেখবে না কেন? ভগবান যে তার সহায়। নচেৎ যখন এই অজানা গেরামের একটেরে এই ছোট্ট পোড়ো জমিটুকুনের উপর একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে দেখে তার মধ্যে স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল, তখন অটল কি তার দুঃসাহসে কম ভয় পেয়েছিল? বলেছিল নাকি মালিক এসে দূর দূর করে বের করে দেবে কুকুর ছাগলের মতন পুলিশেও ধইরে দেতে পারে।

কিন্তু হয়েছে সে সব?

বানভাসি হয়ে ঘুরে ঘুরে সাত ঘাটের জল খেয়ে আর বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সত্যি বেড়াল নাড়ানাড়ি কুকুর নাড়ানাড়ি করে মরে, এই মাথা গোঁজার আচ্ছাদনটুকু পেয়েছে ওরা। গ্রামের লোকেরা বলে 'এটা নাকি' একটা সাধুর কুঁড়ে। একা এখানে বাস করতো সাধু। রাঁধতো কিনা রাঁধতো কে জানে দেখেনি কেউ, ভকত টকতও দেখেনি!

হঠাৎ আর কবে থেকে যেন দেখা গেল না তাকে।

শেকল তুলে দেওয়া দরজাটার ওপারে কি আছে দেখবার জন্যে কৌতূহলী ছেলেপুলে দরজাটা খুলে দেখেই পালিয়েছে। বলেছে, 'ওরে সন্নিসীটা আবার আসচে রে। ঘরের মধ্যে দড়িতে কাপড় চাদর ঝুলতেছে।

কিন্তু কালক্রমে ঝড়-বৃষ্টি সেই শেকল বন্ধ দরজাখানাকেই কোথায় আছড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। সেই চাদর কাপড় কোথায় লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরটা বেদখল হয়নি। দখল নিলে এসে সাগররা।

অটল ভর দেখালেই সাগর মুখ ঝামটা দিয়েছে, 'কতো লোক কতো জামজিরেৎ জবর দখল করে ঘর বাড়ি বানিয়ে রাজা হয়ে বসতেছে, শুনতে পাসনে? কি হয় তাদের? গরমেণ্ট হার মেনে ছেড়ে দেয়। আর এতো বেঅয়ারিশ! কার জায়গা গেরামের লোকও জানে না। বলে পুকুরটা আগে মস্ত ছেলো শুকোতে শুকোতে এই জমি উটেচে।

অতসব সাগর স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু সাগরের স্বপ্ন আর তার কল্পনার পাখায় ভর করে বেশী দূর এগোতে পায়নি। দিনকাল খারাপ হয়ে যাচছে দিনের দিন। ছেলেমেয়ে দুটো ক্রমশ ডাগর হয়ে উঠছে। শুধু ভাত জোটাতেই জান ছুটে যাচ্ছে অটলের। জাত ব্যবসা ঘরামির কাজ করে নগদা মজুর খেটে যখন যেভাবে পারে উঞ্ছবৃত্তি করে, যা পাচছে শুধু জঠরাগ্নিতে আহুতি দিতেই ফুরিয়ে যাচছে।

সাগর যে ভেবেছিল হাঁস পুষে আর ছাগল পুষে সে নিজে কিচু ওজগার করবে তা আর হবার আশা কই? প্রথমটায় তো পয়সা কড়ি খরচা করে তারপর শুরু করতে হবে?

তবু সাগর এই হাভাতের সংসারেও—তুলসীতলা নিকোয় দাওয়ায় কোলে পাতা উনুন দুটোকে পরিপাটি করে মাটি লাগায় ভাত কটা সেদ্ধ হয়ে গেলেই...কাজে তো লাগে একটা উনুন পাতা লতা জ্বেলে ভাতকটা সেদ্ধ করতে তবু দুটো উনুনকে সমান যত্ন করে সাগর।...

পাতবার সময় অটল হেসেছিল। 'প্রাণপাত করে পুকুর পাড় থেকে মাটি নে এসে দু দুটো চুলো গড়বার কি দরকার পড়ল রে সাগর? কত যজ্ঞি রাদবি?

এখন সাগরের সামান্য যা পুঁজি ছিল তাও একটা কবে বিক্রমপুরে যাচ্ছে। কিছুদিন অটল দাস হঠাৎ বেশ কিছু রোজগার করে ফেলেছিল। কেমন যেন কাজ পেয়ে যাচছিল ঝপাঝপ গ্রামের আর একজন আধবুড়ো ঘরামি তার সাকরেদের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গিয়ে হঠাৎ অটলদাসকে দেখে লুফে নিয়েছিল।

কাল হলো ডালভাঙ্গা গ্রামে এক যাত্রা পার্টি আসায়। যাত্রাদলের প্যাণ্ডেল বাঁধার কাজে কাজ পেল অটল দাসের সেই মুরুব্বি ফকির মোড়ল, অতএব অটলও। অসুরের মত খাটল অটল, ফকির গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তদারকী করল আর মজুরি ভাগের সময় ফকির একেবারে চোখের চামড়াহীনের মত কাজ করল। করল তার কারণও ছিল, ফকির টের পেয়ে গেল তার পুরনো সাকরেদ তলে তলে তার জামাই হবার পথ পাকা করে বসছে। অতএব তার সঙ্গে মিটমাট করা ছাড়া গতি কী।

কিন্তু অটল দাস এতো কারণের ধার ধারবে কেন? ছেড়ে দিল ফকিরের সাকরেদি।

একাই কাজ চালাতে লাগল বটে অটল, কিন্তু তেমন সুযোগ সুবিধে জোটে না। ফকিরকে সবাই চেনে, তার সঙ্গে আর কে আসে কে দেখে?

তারপর তো ক্রমশই আকাল লাগছে দেশে। রুজি-রোজগার শূন্যের অঙ্কে ঠেকতে বসছে।

ফকিরের কাছে থাকতে থাকতে তার সঙ্গেই মাঝে মাঝে হাটে গিয়েছে অটল, সাগরের বায়না মিটোতে এটা-ওটা কিনে কিনে এনেছে।

না, সাগর কোনদিন গন্ধতেল কাচের চুড়ি সাবান আলতা চায়নি, ডুরে শাড়িও না, সাগরের বায়না শুধু সংসারী জিনিসে। 'নোয়ার একটা কড়াই' যেই হলো, অমনি সাগরের মাথায় 'দুখান এনেমেলের শানকির ভূত চাপলো। সেটা যদি হলো তো একটা সিলবারের ভাত আঁদবার হাঁড়ি।

মাটির হাঁড়ি মালসা নিত্যি ভাঙ্গে 'ছুঁতো' হয়।

একে একে সাগরের অনেক কিছু হয়েছিল। বঁটি, কাটারি, শিলনোড়া, ডালের কাঠি, এনেমেলের থালা চারজন-এর চারখানা ইত্যাদি।

পিঁড়ি অবশ্য অটল বানিয়ে দিয়েছিল।

দাওয়ার ধারে সেই পিঁড়িতে বসে সাগর যখন উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে ঘটঘটিয়ে ডালে কাঠি দিত, রাণী মনে হতো সাগরের।

ক'দিনেরই বা খেলা? কালের কবলে সবই যাচ্ছে একে একে।

এই সেদিন প্রাণের অধিক প্রিয় 'সিলবারের' হাঁড়িটা বেচে দিতে হয়েছে গোষ্ঠ মুদির কাছে দেনার দায়ে।

তাছাড়া খুচখাচ সবই গেছে, ননী ধোপানীর কাছে, দীনু কামানীর কাছে, সত্য গয়লার মেয়ের কাছে।

তাছাড়া দরকারও তো ফুরিয়ে আসছে ক্রমশঃ। ডালই যদি রান্না না হয় তো ডালের কাঠি কোন কর্মে লাগবে? ব্যঞ্জন না রাঁধলে বাটনা বাটবার শিলনোড়া? কুটনো কোটার বঁটি?

ভাতই কি সবদিন জুটছে আর? হয়তো দুদিন হাহাকারের পর একদিন নারকেল পাতা পোড়া গন্ধের সঙ্গে ভাত ফোটার গন্ধ।

মাঝে মাঝে নারকেল কাঠি চাঁছার কাজ জোটায় সাগর, তার দরুন ওই সরু সরু কাঠিগুলো পায়।

ঘামে ভেজা জামাটা ঝেড়ে পেয়ারা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে অটল একটা কাঁচা ডালের আগা ভেঙে নিয়ে সেইটা দুলিয়ে দুলিয়ে বাতাস খেতে বলল, 'রান্না হয়ে গেচে?'

এখন 'সিলবারের' হাঁড়ি নেই। আবার মাটির মালসা। ফেন গালারও প্রশ্ন নেই। ভাত সেদ্ধ হয়ে আসার মুখে জ্বাল টেনে নিলেই ফেন বসে ভাত ঠিক হয়ে যাবে।

সাগর সেই জ্বাল টেনে নিতে নিতে ভারী গলায় বলল, 'আন্না একেবারে ধনে ধান কাবাসে বান' কতো। শউর-শাউরির মরার হবিষ্যির পিণ্ডি আঁদচি।

অটল জো পায়। বলে ওঠে, তবু তো ঘোট করে বসে থাকতি চাইছিস। মরি তো এইখেনে মরবো। বলি নিজেরা নয় না খেয়ে মরলাম, শংকু? তুষু?

সাগরের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অসহায়তা। তবু তার গলার স্বর কঠিন, 'বাস উটিয়ে যেখেনে যেতি বলচো সেখেনে দুবেলা খেতে দিতি পারবি ওদের, এ গেরাণ্টি আচে?'

অটল উৎসাহের গলায় বলে, না থাকলি কি বলতেচি? পেট পুরে খেতি দেবে, থাকবার জায়গা দেবে—'

সাগর আরো কঠিন মুখে বলে, 'তুই যেমন গাড়োল তাই এইসব কতায় বিশ্বেস করতেচিস। কার বাপ-মা মরা দায় পড়েচে যে তোকে আমাকে বুকে ধরে নে গিয়ে খেতি পরতি দেবে? গরমেন্ট? সেবারে যেমন দেছলো?

অটল একটু নিস্প্রভ গলায় বলে, 'সে আর এ এক হল?'

'ও সবই এক।'

'ও সবই এক।' সাগর দৃঢ় গলায় বলে, 'য্যাখন বেদের টোল ফেইলে ফেইলে ঘুইবে মরিচি, ত্যাখন পিত্যেক বার বলিস নাই, সাগর বাঁচতে চাস তো চল এখেন থেকে—। দুটো কাঁচা খোকা খুকি কোলে নে, কী নাটাপাকড়ি খেইচি তা আমিই জানি আর ভগোমান জানে।'

অটল এখন খেঁকিয়ে ওঠে বলে, ভগোমান দেলো তো, রুজি-রোজগার কেড়ে নেলো না? পেটে কীল মেরে আর কদিন চলবে? নেকচার বাবুরা তো বলতেচে এ কতা? না খেয়ে কদিন থাকবে তোমরা? চলো-ভাতের দেশে, মাচের দেশে—'

সাগর দপ করে জ্বলে ওঠে, 'বুড়ো হয়ে মরতি চললি, ঘটে একটুকু বুদ্ধি এলো না? নিযাস এই ঘরখানা আর জমিটুকুন নে নেবার মতলোব, তাই ভুজুং দিয়ে ঘরছাড়া করতি চাইচে।'

এবার অটলের অট্টহাস্যের পালা আমায় তো বোকা বুদ্ধু নিব্বুদ্ধি অনেক বলিস, নিজে কী? নেকচার বাবুরা আমাদের এই ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরখানা নিতি আসবে? যেনারা জিপ গাড়ি চড়ি রাস্তা মাতিয়ে আসচে যাচ্চে। শুদু তোকে আমায় বলতেচে না কি? রসুলপুর জবর দখল কলোনির সব্বাইকে বলতেচে। গরমেন্ট তো না, ওনারা হল গে, দেশসেবা মানুষ।

অটল মহোৎসাহে বোঝাতে থাকে শুনে এসেছে এইসব দুঃখী মানুষদের জন্যে ব্যবস্থা হয়ে গেছে, নিশ্চিত অন্নের নিশ্চিত আশ্রয়ের।

যত কথা শুনে এসেছে অটল, তবে সবটা বলে তার অবুঝ পরিবারের কাছে। হয়তো বা বেশী করেও বলে। তার মনটা এখন দড়ি-ছেঁড়া হয়ে গেছে। দেখতে পাচছে ওই যাত্রায় সে আর এতোদিনের মত একা নয়। সঙ্গী আছে। সঙ্গী পাবে। দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

এযাবৎ নিজেরাই ভেসে ভেসে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আশ্রয় খুঁজছে দুটো কচি ছেলেমেয়ে নিয়ে।

শহরবাসী বড়মানুষদের গাঁয়ের পোড়ো দালান বাড়ী ভেঙ্গে হুমড়ে পড়া ঠাকুরবাড়ীর দালানের আস্ত একটু কোণ, ছেলেদের কেলাব ঘরের পিছনের এক টুকরো চাতাল। কত জায়গায় হাঁপিয়ে বসে পড়েছে পুঁটলি পাটলা আর বাচ্চা দুটোকে নিয়ে, জায়গাগুলোকে আপাত বেওয়ারিশ ভেবে। ওমা কোথা থেকে না কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে ওয়ারিশ এসে হাজির হয়েছে, দূরদূর করে তাড়িয়ে দিতে।

আবার বুকে বল করে লোকেরা দোরে দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই আবেদন নিয়ে,মাইনে দিতি নাগবেনি বাবু। শুদু দুটো ভাত, আর একটু আশ্রয়। দুই মানুষে গতরে খেটে শোধ দেব—ঘরামির কাজ জানি। কোলে দু-দুটো ছেলে নিয়ে এই আবেদন।

কেউ মুখ বাঁকিয়েছে, কেউ উপহাসের হাসি হেসেছে।

সাগর বুঝে ফেলে কাতর অনুনয় করেছে 'এদিগে কিচু দিতি হবেনি মা, আমাদের পেট মেরেই এদিগের পেট চাইল্যে দেবো—' কিন্তু সাগর পাগল বলে, তারা তো আর পাগল নয়?

সেবার অনেক দুঃখের শেষে একবার হঠাৎ কপাল খুলে গেল। একটা খামার বাড়ীতে কাজ পেয়ে গেল তারা। মালিক কাজ চায়, পাহারাদার চায়। স্ত্রী পুত্র কন্যা সমেত একটা লোকের মত নির্ভরযোগ্য পাহারাদার আর কোথায় মিলবে? চুরিচামারি করে চট করে পালাতে পারবে না।....

চার-চারটে পেট বলে চমকালো না খামারের মালিক। দুটো ভাতে তার কিছু যায় আসে না। কাজ দরকার। তা কাজ সে ভদ্রলোক পেয়েছিল বৈকি।

মরা হাতী লাখ টাকা রোদে জলে ঘুরে বেডানো অটল দাসও দুটো দিন মাথায় তেল আর পেটে ভাত পেয়ে অসুর অবতার... সাগরও কম নয়।...বস্তা বস্তা মুগ কলাই অড়র খেসারি তোলাপাড়া ঝাড়াবাছা, কুলো পাছড়ানো, এসব কাজ অবলীলায় করেছে সাগর, আর অটল থেকেছে শস্যের ভার ক্ষেত থেকে এনে খামারজাত করা আর আবার তাদের লরীতে বোঝাই করার কাজে।

খাটুনি থাকুক বড় আনন্দে কেটে ছিল সেই দিন ক'টা।

কিন্তু অভাগার ভাগ্য। সেই ভর-ভরন্ত খামার বাড়িতে একদিন লাগলো আগুন।

তার মানে আগুনই অটল দাসদের কপালেই লাগলো।

হতাশ অটল ছুটে মনিবকে খবর দিতে গেছে। সেও তো অনেকটা দূরে।

ওই ভস্মাবশেষের কাছে লুটিয়ে পড়ে অটল দাস বুক চাপড়ে মাথা চাপড়ে বলেছে, বাবু আমায় জেলে দেন, ফাঁসি দেন, গলায় পা দে মেইরো ফেলান। হতভাগা আমি আমার কোত্তব্য কোরতে পারি নাই। আমি থাকতি, এই সব্বোনাশ হয়ে গেলো। তবে ভগোমান সাক্ষী বাবু অটল বেইমান নয়।

কর্তা ওর হাত ধরে তুলে বলে ছিলেন, আচ্ছা আচ্ছা থাম। তোরা চারটে যে বেগুনপোড়া হয়ে মরিসনি এই আমার ওপর ভগবানের দয়া।...এ কাজ যে কে করেছে তা বুঝেছি আমি। জ্ঞাতি শত্রুর কাজ। তোরা আর কি করবি বাবা! এখন, অন্য কাজ দেখগে।

অতএব আবার নিরাশ্রয়। মাইনের দাবি ছিল না, তবু অতোখানি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটা জোর করে অটল দাসের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন না করিছস কেন? কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে রাত পোহালে মুখে দিবি কী?

'মানুষ না, দ্যাবতা। বলেছিল সাগর।

আর সেই দেবতার আশীর্বাদীটুকুর শেষাংশ হাতে থাকতে থাকতেই ভগবানের দেওয়া আস্তানা পেয়ে

গিয়েছিল ওরা।...তখন অটল দাস আর সাগরবালা ভেবেছিল এবার রাত কাটলো, সকাল হলো, এখন শুধু আলোর দিকে এগোনো।

কিন্তু নিভে গেছে সেই আলোর আশ্বাস। আর কি দিন ফিরবে? তবু সাগর তার বড় যত্নে গড়া এই সংসারটার দিকে তাকিয়ে দেখে। ঘরের মধ্যে সারা দেওয়াল জুড়ে পেরেক গুঁজে গুঁজে জিনিস রাখা।...ঠাকুরের পট, মাটির টিয়াপাখী, সাধুর ঘুড়ি ইত্যাদি।

ঘরের একধারে দেওয়াল ঘেঁষে অটল দাসের নিজের হাতের শিল্প কলার নমুনা—বাঁশ বাখারি দিয়ে গড়া আধখানা ঘর জোড়া নীচু মাচান।

এইসব বাঁশ বাখারি সবই সংগ্রহের জিনিস। পরের ঝাড়ের বাঁশ কেটে নেওয়াকে খুব দোষের মনে করে না অটল।...

কেউ বাঁশ কাটতে দেখে জিগ্যেস করলে অটল সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলে, 'বাবুদের নেগে কাটতেচি।'

একজন ঘরামির পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক, তাই দ্বিতীয় কথা ওঠে না।

ওই মাচাটা বানাবার সময় সাগর বকবক করেছিল, জানিনে বাবা, এ আবার কী মোতি বুদ্ধি। ওইটুকুখানি ঘরের মদ্যে একখান বীরভদ্দর মাচান কিসের নেগে।'

কিন্তু পরে যখন অটল দাস তার উপর চ্যাটাই চট বিছিয়ে মাদুর কাঁথা সাজিয়ে বিছানা পেতে ফেলল, আর হাঁড়ি কলসী বাসনপত্রগুলো তার তলায় ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখল, তখন সাগর হঠাৎ টিপ করে তাকে একটা পেন্নাম করে বলেছিল 'ধন্যি বটে। করেচো একখান কাজের মতন কাজ।'

এইসব ফেলে রেখে অনিশ্চিত এক অজানার উদ্দেশে পা বাড়াতে হবে? সাগর বলে উঠে, 'কাদায় গুণ ফেলে বসি থাক। আবার দিন আসবে।'

আসবে! বলেচে তোকে। দেকচিস মানুষ দলে দলে গেরাম ছেড়ে চলে যেতেচে।'

এটা অস্বীকার করতে পারি না সাগর। একটু গুম হয়ে থেকে বলে ওঠে, তার মানে আবার সেই হাঁটা। সেই পা ছিঁড়ে পড়া, মাজা খসি পড়া!...আর শংকু, তুষু? ওরা পারবে হাঁটতি?'

'এই দ্যাকো! তবে এতোক্ষণ শুনলি কী?' অটল দাস একটু চতুর হাসি হেসে বলে, 'হাঁটনের দিক দেও যেতি হবে না! ওদের 'টেরাকে' চড়িয়ে নে যাবে সব্বাইকে।'

সাগর ভ্রুকুটি করে, 'ওদের গরজ?

অটল অকারণেই গলা নামিয়ে বলে, 'অটল দাস যে নিজেকে কলোনির লোক বলে নাম নিকিয়ে এলো রে।'

'তুই নিকিয়ে এলি, আর ওরা নিকালো?'

'আরে বাবা, অনেক প্যাঁচ কষে কায়দা কোশুল করে তবেই হয়েছে। এখোন ওদের সবার যা বেবস্থা, আমাদেরও তাই বেবস্থা?'

'আর ধরা পড়লে?'

'দূর ক্ষেপী! এর আবার ধরা পড়াপড়ি কী? বসন্ত সাক্ষী দেচে অটল দাস তার বোনাই!'

সাগরের মন অটলের মত খোলামেলা নয়, খুঁৎখুঁতে। তাই সেই একইভাবে বলে, 'ক্যানো? বসন্ত মিচে কতা বলতে গ্যালো ক্যানো?

'আহা দোস্তি হয়েচে না ওর সঙ্গে? দোস্তোর জন্যি একটু মিচে কতা কইলে পুণ্যি বৈ পাপ নাগে না।...ঘর এমন নিঃঝুম যে? ব্যাটা বেটি দুটো গ্যালো কোতা? খাবেনি?

'ঘাটে গামচা ছাঁকা দে পুঁটি ধরতে গ্যাচে। বলেছে মাচ এনে তবে মাচ পোড়া দে ভাত খাবে।'

অটল হেসে বলে, 'লবাবের ব্যাটাবেটি। নে বাবা চল এবার মাচের রাজ্যিতে। কত খাবি খা।'

সাগর সন্দেহের গলায় বলে, 'কোনখেনে নে যাবে?'

অটল আত্মস্থ। বলে 'গোসাবা, বাসন্তী, মোরেলগঞ্জ। সোঁদরবন, বুইলে সোঁদরবন।'

সাগর চমকে ওঠে, 'সোঁদরবন! মোরেলগঞ্জ! সেখেনে নে যাবে? সত্যি ঠিক বলতেচো?'

অটলও চমকায়। বলে, 'তা শুনে এমন বেভুল মারলি ক্যানো? আচে না কি কেউ সেখানে?

এখন নাই—' সাগর যেন আচ্ছন্নের মতো বলে, 'ছেলো। বাবা ছেলো। আর আমি ছিনু।'

'তুই ছিলি? সোঁদর বনে গেচিস তুই?'

অনেক দিন পরে সাগরের গলায় অভিমানী তরুণীর কণ্ঠ শোনা যায়, 'জানিস নাই না কি? ছোটকালে গপ্‌পো করি নাই? আমার কতা তো কখনো কান দে শুনিস না। মা মরে যেতে আতদিন কাঁদি কাটি, পিসি বাবাকে বললো, মেয়েটারে তোর সঙ্গে নে যা। বোটে বোটে নন্‌চে নন্‌চে ঘুরবে, দশটা দিশ্যি দেকবে, মনডা বুঝ হবে।

...তা নে গেল বাবা। ...বাবা তো একজনা ফলেস্টাবাবুর চাপরাশি ছেলো? বাবু আমাদের 'পাঁজিয়া' গেরামেরই। বাবাকে চাকরি দে নে গেছল চেনা জানা বিশ্বাসী নোক বলে। ধলাইতলা ঘাট থে নৌকোয়, তারপর নন্‌চা। কাঁহা কাঁহা মুলুকে যে গেচে বাবা আমায় নে।'

সাগর আনমনা ভাবে বলে, 'ফলেস্টা আপিসের বাড়িগুলান কী সোন্দর। ইয়া ইয়া খুঁটি গেড়ে তার উপরি কাটের পাটাতন দে উঁচু বাড়ি বানিয়েচে যেন সায়েব বাড়ি। সিঁড়ি দে উটে গেলে দেকবি তার মদ্যি চ্যায়ার টেবিল খাট বেছনা। বারেণ্ডা দে ঝুকে ঝুকে দ্যাকো ওই জলির মদ্যি ক্যাঁকড়া শিঙ্গি জলঢোঁড়া সাপ কিলবিলোচ্‌চে, তার সঙ্গে আবার কুচো চিংড়ি ছটকাচ্‌ছে।

'কুচো চিংড়ি ছটকাচ্‌ছে।'

অটল জিভের জলটা একটু শুকিয়ে নিল। বলল, 'তোর ভয় নাগতো নি?'

'ভয়? ত্যাখোন কি আর ভয়ের বয়েস গো? বরং সোঁদরবনে এসে বাঘ দেখনু না ক্যানো এই আক্ষেপ করে করে বাবাকে জ্বালিয়ে খেতুম।...বাবা বলতো 'খবরদার নাম করবিনে। বল মা বনবিবি রক্ষে করো।'...বাবার মনিব বাবু, নাম মনে নাই, আমি সদ্য মা মরা গেচি বলে কতো ভালো কতা বলতো।...আর কী খাওয়া। বললে হাঁ হবি। যতো বেপারিদের নৌকো পাশ করবে, সব থেকে ফলেস্ট্রো বাবুকে ভেট দে যাবে।....একা বাবু কত খাবে। বস্তাবন্দী নারকেল, কলসী কলসী মদু, কাঁটাল, হাঁসের ডিম, হরিণের মাংস আর মাছ। নেকাজোকা নেই এতো মাচ। ঝোড়া ঝোড়া মাচ ঢেলে দে যায় আপিস বাড়ির বারেণ্ডায়। মাচ খেয়ে খেয়ে অরুচি জম্মে গেচলো। ভাত মানেই মাচের ছেরাদ্দ।

অটল দাস তাড়াতাড়ি বলে 'আহাহা এই ভালো ভালো গপ্পো সব ফুইরে ফেলাস না...ওদের আসতে দে—'

সাগর মুচকি হেসে বলে 'ওর অনেক শুনেচে।'

তা শুনেছে বৈকি। ছেলে মেয়ের কাচে গল্প মানেই তো ছেলেবেলার গল্প।

অবিশ্যি বেশীদিন বাপের সঙ্গে ঘুরতে পায়নি সাগর। একটু ডাগর হতেই গাঁয়ে রেখে গেলো বাপ পিসির কাছে!

শংকু আর তুষু এলো ঘেমে লাল হয়ে।

তবু বিজয় গৌরব। চার-পাঁচটা পুঁটি পেয়েছে! আবার ক'টা 'ঘেনি কাঁকড়া!'

'ওমা, পোড়া নয় পোড়া নয় ঝাল রেঁদে দে—

'এখোন অ্যাতো বেলায় আবার ঝাল। আকার গরমের মদ্যি গুঁজে দে, দিব্যি দলকে যাবে, নুন দে মেকে খাবি।'

'না মা না।' শংকু বলে 'অ্যাতো কষ্ট করে ধরলাম—'

অগত্যাই উঠতে হয় সাগরকে।

অটল মেয়েটাকে কাছে টেনে পেয়ারা ডালটা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলে, 'এই মাচটুকু নিয়েই অ্যাতো আহ্লাদ? এইবার চল মাচ-ভাতের দেশে!

'মাচ ভাতের দেশে!'

অটল বোঝাতে বসে ছেলেমেয়েদের। হ্যাঁ, স্বর্গরাজ্যই। প্রাচুর্যের দেশে। ফেলা ছড়ার দেশ। মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে যায় সে দেশে।

'অ্যাঁ।'

'সোঁদরবন?'

'মায়ের বাপের সেই সোঁদরবন? শংকুর মুখ উত্তেজনায় আরক্ত।'

অটল হেসে বলে, 'হ্যাঁ, বাপ! তোদের মায়ের বাপের সেই সোঁদরবন। এ্যাখোন তোদের বাপের হবে।'

'বাপ, শব্দটার উপর একটু কৌতুক হাস্যের মিশেল দেয় অটল দাস। তুষু আর শংকু বাপের এই হাস্যরঞ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বর্তে যায়। কত কত দিন যেন বাপের এমন হাসি হাসি মুখ দেখে নি তারা। সর্বদাই তো একটা রুক্ষ-শুষ্ক উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অটল।

তবে যতো দুর্দশাই হোক, ছেলেমেয়েকে কখনো গালমন্দ করে না অটল। শুধু কথাবার্তাগুলো ছাড়া-ছাড়া নীরস বিরস। আর তুষুর বন্ধু পুঁটির বাপ? রাত-দিন ছেলেমেয়েদের গাল দেয়, দূর হয়ে যা না, দূর হয়ে যা। আমার হাড়ে বাতাস নাগুক।

পুঁটির মা নেই। পাঁচ-ছটা ছেলে মেয়েকে ফেলে রেখে কোথায় যেন পালিয়ে গেছে।...দেখে অবাক লাগে তুষুর। মা-বাপ আবার অমন রাক্কোস-এর মতন, ডাইনের মতন হয়?

তবু উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্ক বাপের দিকে আজকাল আর তেমন ঘেঁষছিল না তুষু। নইলে মেয়ে তো ছিল অটলের গলার হার। কাজে যাচছে মেয়ে সঙ্গে করে, হাটে যাচছে মেয়ে কাঁধে করে, খেতে বসতে তো মেয়েকে সঙ্গে চাই-ই চাই।

সাগর যদি রাগ করেছে, 'ওকে তো পেট চিরে গিলিয়েচি, আবার নিজের থে ভাগ দেওয়া ক্যানো?

অটল হেসে হেসে বলেছে, 'তুষু যেন তোমার সতীন ঝি! বুইলি তুষু? ওইটা তোর মা না, সৎমা।'

শংকু সাহস করে বলে, সোঁদরবনে অনেক মদু আচে না বাবা?

'আচেই তো—মদু তো আচেই।'

অটল উৎসাহে ওঠে দাঁড়ায়, 'আসল কতা বল মাচ আচে, ভাত আচে। দুবেলা পেট পুরে শুদু ভাত আর মাচ! তার সঙ্গে ওসব তো আচেই। মদু কাঁটাল নারকেল পানিকল—পাঁটা হাসের ডিম—'

ছেলে মেয়ে দুটো বাপের গা ঘেঁষে বসে। জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে শুনে যায়।

কী সূত্রে কোন পথ দিয়ে আসবে এসব কথা ভাবে না অটল দাস। ওর স্বপ্নাতুর চোখের সামনে ওই মায়াময় আকর্ষণীয় জিনিসগুলো যেন ভেসে ভেসে উঠতে থাকে নাম-না-জানা নোনা নদীর জল থেকে।

অটল নদীর নাম জানে না। সাগরেরও যে খুব মনে আছে তা নয়, তবু স্মৃতির অনুশীলন করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যাচছে—'ভোলা' 'বলেশ্বর' 'রূপসী' 'মৌলা'।

মনে পড়াতক শৈশব বাল্যের সেই ধূসর স্মৃতি, যা নাকি বানের জলে ধুয়ে যাবার কথা, আর এত দিনের ঝড়-ঝঞ্ঝার উড়ে যাবার কথা, তা যেন আবার নতুন রঙের ছোপ খেয়ে খেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ছেলেমেয়ে দুটোও মায়ের চোখ দিয়েই যেন সেই সমারোহময় জীবনের ছবি দেখতে পায়।

'মা, কবে যাওয়া হবে?'

'তোর বাপকে শুদো। ওজই তো বলবে দু দিন বাদ।'

'দু দিন দু দিন করে দশ দিন হয়ে গ্যালো।'

'মা, আমার গিন্নী পুঁতুলটা নে যাবো?

'শুদেগে তো বাপকে। বলচে তো কিচ্চু নে যেতে হবে নি, মোট পুঁটুলিতে ভার করতি হবে নি, ওরা সব দেবে। তুই ওটাকে নুকিয়ে সঙ্গে নে।'

'মা প্যায়রাগুলান সব গাঁয়ে পড়ে থাকবে?'

সাগরও সেই সবুজ পাতার নাচনের আড়ালে লুকিয়ে বসে-থাকা ছোট ছোট পেয়ারাগুল্যোর দিকে তাকিয়েছিল।

সামনের আকর্ষণ তীব্র, তবু ফেলে যাওয়া মাটির মমতাও তো কম নয়। এক এক সময় মনে হয়, চিরদিন কি আকাল যাবে? কষ্ট করে আর কিছু দিন এখানে চেপে বসে থাকতে পারলে আবার সুদিনের মুখ দেখা যেতো।

'মা, সেই দেশটা খুব সোন্দর বলে সোঁদরবন নাম, তাই না?

'তাই তো। আবার কী? শংকুর খুব বুদ্ধি আচে।'

তলে তলে দেয়ালে গোঁজা পেরেকগুলো উপড়ে উপড়ে জড়ো করে সাগর। আঁচলের কোণে বেঁধে নিয়ে যাবে। যাওয়া মাত্তর কে সাগরকে পেরেক দড়ি এসব জোগান দেবে?

'থাকতে তো দেবে, কিন্তু ঘরটা কেমন দেবে? মনের মধ্যে প্রশ্নের তোলাপাড়া।

নিজেই চাপান নিজেই কাটান। নিঘ্ঘাত ছোট মোটই হবে। বলেছে বটে, জবর দখলের মানুষগুলোকে মনিষ্যি হয়ে তারা ছাগল ভেড়ার মতন খোয়াড়ে পড়ে আচিস, দেখে প্রাণ কাঁদে—'

তবু এতো হুদো হুদো নোককে কি আর পেল্লাই পেল্লাই ঘর দিতি পারবি? ধরে নেয় সাগর ছোটই ঘর, কিন্তু কেমন হবে তার চেহারাটা?....সেই অদেখা ঘরটাকে কিছুতেই স্পষ্ট করে তুলতে পারে না সাগর।

'খগুখোলা' গ্রামের তার সেই শ্বশুর বাড়ির মাটির ঘরটা, সেই কিছু দিনের বাসা খামার বাড়ির খড়ের চালাটা মামুদপুরের এই ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরটা, সব যেন একাকার হয়ে যায়। আর তার উপর মোহময় একখানা ঘরের ছবি মাঝে মাঝে আবছা হয়ে ভেসে ভেসে ওঠে।

মোটা মোটা উঁচু উঁচু গরাণের খুঁটি শালের খুঁটির উপর কাঠের পাটাতন পাতা, তার উপরে বারান্দা-ঘেরা ছবির মতন সুন্দর বাড়ি! ভিতরে খাট বিছানা আয়না আলনা।

'কবে তোমার টেরাক আসবি শুনি? সাগর যেন আর এই ভাঙ্গা সংসারটা টানতে পারছে না। বর্ষা পড়ে গেছে, জলের ঝাপটায় দাওয়ায় বসে ভাত রাঁধা যায় না, ঘরের মধ্যে নারকেল পাতার জ্বালের ধোঁয়ায় অন্ধকার।

সাগরের মনে হয় ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সেই রথে চড়ে বসে, যে রথ তাদের নিয়ে যাবে সেই সবুজ দিগন্তের দেশে!

'তোকে ভাঁওতা দিয়ে বাড়তি একটা নাম নিকিয়ে নেচে মুকপোড়া বসন্ত। দেকিস, ওই টিকিটে ওর সত্যি কার বোনাই বেয়াই কেউ টেরাকে চড়ি পড়বে। য্যাখন বাবুরা খাতা ধরি বলবি—অটল দাস? অন্য আর একটা মিনসেকে ধরে দেকিয়ে বলবি এই যে হুজুর।'

অটল অটল বিশ্বাসে বলে, কী যে বলিস! তুই যে যাত্তারা পালা নিক্‌লি না ক্যানো, তাই ভাবতেচি। দেকিস পরে।

তবু ভিতরে ভিতরে ভয় নেই তা নয়, তাই এবেলা ওবেলা তিন চার মাইল রাস্তা হেঁটে রসুলপুর ঘুরে আসে অটল।

তারপর সত্যিই একদিন আসে।

'কাল ভোর রাত্তিরে টেরাক আসবি—হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে অটল, বেলা বারোটায় ছাড়বি। বসন্ত বলে দেচে শেষ রাত্তিরে গে পৌচে বসন্তর গুষ্টির সামিল হয়ে বসি থাকতি! আব আলসেমি না।—শংকু, তুষু, তোদের ঘুম ভাঙ্গবে তো ত্যাখন?'

ছটফট করে বেড়ায় অটল দাস।

একবার তার নিজে হাতে বাঁধা বেড়ার ডালগুলো টানে, একবার দর্মার দেওয়ালগুলোয় হাত চাপড়ায়, একবার বসে, একবার হাঁটে।...সাগর কিন্তু সুস্থির। ও যতটা সম্ভব পুটলী বাঁধছে।

ওদিকে দশ বছরের শংকু গাছে উঠে, কষা কষা পেয়ারার গাদা পেড়ে পেড়ে জড়ো করছে। কিন্তু ট্রাক কই?

ভোর থেকে বইতে শুরু করেছে ঝোড়ো হাওয়া, বসে থাকতে থাকতে কাঁপুনি ধরে যাচছে।...অটল দাস ঘোরাঘুরি করছে, আসছে-যাচছে, সাগর তার পুঁটলি পোঁটলা আর ছেলেমেয়ে দুটোকে আগলে নিয়ে বসে আছে শুকনো মুখে। আর থেকে থেকে ভগবানকে শাপ-শাপান্ত করছে এই দুর্যোগের জন্যে।

হঠাৎ অটলদাস ঘুরে এসে একটা সুখবর দিল।

ট্রাক আসছে। তার সঙ্গে আরো একটা ট্রাক আসছে তার মধ্যে হাণ্ডা হাণ্ডা খিচুড়ি। কলোনির লোকেরা আজ সংসার উঠিয়ে চলে যাচছে, রান্না খাওয়ার সুবিধে হবে না, তাই এই ব্যবস্থা?

'ভগোমান। তুমি তবে আচো।' সাগর দুহাতে নিজের নাক কান মলে, 'হেই ঠাকুর, হেই ভগোমান, অপরাদ নিওনি।'

ঝড়ে শালপাতা উড়ে যাচছে, বা হাতে চেপে ধরে তবে খাওয়া। স্বাদও যদি না থাকে তবু ও অমৃত!

ওই শক্ত কাঠ কাঠ বিবর্ণ বিস্বাদ খিচুরি ডেলার মধ্যে যেন 'জীবনের' স্বাদ, বর্ণাঢ্য ভবিষ্যৎ।

ঝোড়ো হাওয়া বয়েই চলেছে। মানুষগুলো যেন পাতার মত উড়ে যাবে। অথচ গত রাত পর্যন্ত আকাশ শান্ত ছিল! ছিল জ্যোৎস্না।

সাগর বলল, 'অদেষ্টটা দ্যাকো।'

অটল বলল, 'একা তোর আমার নয়, এই এতোগুলো মানুষের।'

সেই ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেই ট্রাক বোঝাই হতে থাকে। মানুষগুলোকে আর ছাগল ভেড়া বলেও মনে হয় না। যেন মাল মাত্র। যেভাবে মালের লরী বোঝাই হয়, সেইভাবেই হতে থাকে।

একসময় ট্রাক ছেড়ে দেয়।

শোরগোল চেঁচামেচি থামতেই চায় না। বেদম ঝোড়ো হাওয়ার শব্দকে পাল্লা দিয়ে মানুষের কলকল্লোল এগিয়ে চলে জানা অজানা পথ পার হয়ে।

মা-বাপের সঙ্গে আর কথা চলছে না। দুই ভাইবোনে গায়ে গা পিষে চুপি চুপি কথা!

'দাদা দ্যাক্ আমরা চলে যেতেচি বলে, এখেনের গাচপালাগুলো যেন মাতা ঝুঁইকে ঝুঁইকে কানতেচে—

'ঠিক বলিচিস! নুটিয়ে নুটিয়ে কানচে।'

'আত্তিরে আবার খেতি দেবে দাদা?'

'দেবেই তো। বসন্ত কাকা বলেচে—ননচে আঁদাবাড়া হবে, রাজাই খাওয়া-দাওয়া।'

'আর কক্ষনো এখেনে আসা হবেনি দাদা?'

দাদা নিজ মহিমা দেখাতে জোর গলায় বলে,—ক্যানো হবেনি? আমরা কি কইদী নাকি? জেলখানায় নে যাচচে?

কত পথ পার হয়ে, কত মাঠঘাট-ক্ষেতখামার ছাড়িয়ে ট্রাক চলেছে মানুষ বোঝাই দিয়ে।

যাত্রা শুরুর সেই কলকোলাহল আশ্চর্যরকম থেমে গেছে। এখন সকলেরই মুখ মলিন বিষণ্ণ। এ যেন অনন্ত যাত্রার পথে চলেছে তারা।

হঠাৎ তীব্র একটা আঁশটে গন্ধ এই বাতাসকেও ছাপিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়ল।

'দাদা।' ঠেলা মারল তুষু ঘুমন্ত দাদাকে, 'এসে গেচি বোদায়। মাচ মাচ গন্ধ আসতেচে—'

হঠাৎ রব উঠল, 'ক্যানিং ক্যানিং।'

আর ঠিক সেই সময় বৃষ্টি নামল মুষলধারে। সারাদিনের আফসানির শেষ পরিণতি।

তারপর এক অবর্ণনীয় হুলস্থূল কাণ্ড। ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, আর্তনাদ, হাহাকার। কার হাতের পুঁটুলি পড়ে গেছে, কে ছেলেপুলেকে দেখতে পাচছে না, তবু লাঠির গুতো খেতে খেতে কাদার চড়া ভেঙে লঞ্চে উঠতে হচছে।

লঞ্চের মধ্যে আলোর রেখা, কাদার চড়া, ঘুটঘুটে অন্ধকার।

...যারা সব নিজের নিজের হারিকেন লণ্ঠন সঙ্গে এনেছিল, তারা খুঁজে পাচছে না। জ্বালবার চেষ্টাও অবশ্য বাতুলতা।...মাঝি মাল্লাদের হুঙ্কার, সারেঙের হুইশিল, বৃষ্টির শব্দ ক্রমশঃ চৈতন্যকে অসাড় করে দিচছে।

তবু দু'হাতে দুই ছেলেমেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে কাদার চড়া ভেঙে ভেঙে লঞ্চের সিঁড়িতে উঠছে সাগর, অটলের কাঁধে মালপত্র। মাথার উপর বৃষ্টির মুষলধারা। চেঁচিয়ে উঠল সাগর, 'আজকেই কি ভগোমানের পেলয়ের দিন গো? পিথীমীর শেষ আজ?'

কে একটা বলে উঠল—'মর মাগী। কথার কী ছিরি।'

তারপরই একটা কাতর শিশুকণ্ঠ, 'দাদা প্যায়েরা পড়ে যাচছে।'

কিন্তু পড়ে গেল কি শুধুই। দুটো অবোধ শিশু বাহিত ক'টা কষা পেয়ারা?...সৃষ্টি কর্তার হাত থেকে পড়ে গেল না কি তার আপন সৃষ্টির কিছু সঞ্চয়?

ঘাট জুড়ে লঞ্চ। আগে পিছে, দূরে! একটাতে চড়ে পড়তে পারলে, তার থেকে সিঁড়ি নামিয়ে পিছনেরটায় চড়ে পড়া যাবে। কে কোনটায় চড়বে, কেউ জানে না। কোথায় নির্দশনামা, কোথায় কে?

থেকে থেকে শুধু রণ হুঙ্কারের মত হুঙ্কার ছাড়ছে মাঝি মাল্লারা।...বিশেষ একটা সাংকেতিক শব্দ। এই পটভূমিকায় ভয়াবহ মনে হচছে।

এই ভয়ঙ্করকে চিরে ফেলে সহসা একটা নারীকণ্ঠ উদ্দাম হয়ে উঠল, 'শংকু! তুষু। ওগো ওরা যে ওঠে নাই।'

'উটেচে, উটেচে!'

'কই কোতায় উটেচে? শংকু, শংকুরে! তুষু! তুষুরে!'

'আমি উটবনি! আমি যাবনি! আমার নাইমে দ্যাও।'

উন্মাদিনীর এই প্রলাপ বাক্যে কে কর্ণপাত করবে? লঞ্চ তো ছেড়ে দিয়েছে।

'খপরদার আমায ধরোনি, আমি যাবনি। আমি জলে ঝাঁপ দে চলে যাব।'

কিন্তু কে তাকে ছাড়বে?

হঠাৎ বসন্তর অভয়কণ্ঠ শোনা যায়, 'তারা তো উই আগের নন্‌চে উঠলো দেখলাম।'

'আগের ননচে!'

'কোন আগের?'

'উই যে যেটার গায়ে হলদে হলদে করে কী সব লেখা ছিলো।'

'সেটা কোন খেনে যাবে?'

'সবই এক জায়গা যাবে বাবা। অটলদাস তোমার পরিবারকে বুঝ দাও। চড়ে যখন পড়েছে, ঠিকই পৌঁছাবে।'

'পৌঁচাবে। কখন পৌঁচাবে?'

'তা জানি নে। বাতাসের মুখ বুঝে।'

এখন আর এলোমেলো চীৎকার নয়, শুধু একটানা একটা কাতর কান্না,—'ওরে শংকু বাপ আমার, ওরে মা তুষু, তোরা ক্যানো আমার হাত ছাইড়ে এগুয়ে গেলি? এই রাস্কোস ঠাঁইতে তোদের আমি কোতায় খুঁজবো?'

অনেকেই এ কান্নায় বিরক্ত হয়। যাত্রাকালে এ কী মড়া কান্না! কেউ কেউ আবার সান্ত্বনাও দিতে আসে, তোমাদের চেনা লোক যখন বলছে অন্য লঞ্চে উঠতে দেখেছে তখন যাবে কোথায়? ড্যাঙায় নাবলে ঠিক পেয়ে যাবে। ভাত রান্না হচ্ছে, খাও দাও।

অটলদাস কিছুই বলছে না। সাগরকে তার বড় ভয়। সান্ত্বনা দিতে এসে হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। এখন শুধু ড্যাঙার অপেক্ষা।

কিন্তু কোথায় সেই ডাঙা? যেখানে সাগর আর অটলদাস পায়ের তলায় মাটি পাবে?

সকালে প্রকৃতি মনোহারিণী রূপসী। কে বলবে কাল ওই কাণ্ড গেছে।

ভিজে মাটির চড়ার ওপর ঝকঝকে রোদ। বাসন্তীতে নোঙর করেছে এই লঞ্চ। ক্যাম্প পড়েছে চড়ার

ওপর দিকে উঁচুতে। আরো কিছু কিছু ক্যাম্প পড়েছে গোসাবায়। সেখানে আগে নেমে গেছে আগের লঞ্চের লোক।

'তোমার ছেলেমেয়ে বোধহয় ওই ওই আগের লঞ্চেই চেপে বসেছিল বাছা! মাঝি মাল্লাদের বলে কয়ে দ্যাখো। যদি ফিরতি পথে তোমাদের নিয়ে যায়।'

'নে যাবি?'

'যাবে না কেন? সংসারে ভাল নোকও আছে বৈকি।'

বৌয়ের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল অটলদাস, সাহস করে একবার এগিয়ে আসে। বলে, 'মাজিদের বলেচি, নে যাবে। কাল তো এতোটুকুন কিছু দাঁতে কাটিস নাই, ওখেনে পাউরুটি আর চা দেচ্ছে।'

এতোক্ষণ গুণগুনুনি চলছিল, আর চলছিল বৃথা খোঁজা। হঠাৎ বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগর নামের মেয়েছেলেটা। আর শত চক্ষুর সামনে দু হাতে কীল মারতে থাকে একটা শক্তসমর্থ পুরুষকে। ক্যানো আনলি তুই। ক্যানো আনলি? বল ক্যানো আনলি? এনে দে আমার শংকু তুষুকে। দে এনে!

কিন্তু কী সাধ্য অটল দাস নামের তুচ্ছ মানুষটার যে ওই লোনা জলের গভীর তলা থেকে সাগরের হারানে মানিক দুখানা খুঁজে এনে দেবে? দিন রাত পার হয়ে গেছে।...গোসাবা তো খুঁজে এল, খুঁজে এল মোরেলগঞ্জ খুঁজতে ফিরে এল ক্যানিং পর্যন্ত।...আবার গেল সেই গোসাবায়!

পথ চিনতে না পেরে মা-বাপকে খুঁজে খুঁজে কোথায় কোথায় হয়তো ঘুরে বেড়াচছে দুটো ছোট্ট মানুষ।

একশোবার জিগ্যেস করা হয়েছে বসন্তকে, 'বসন্ত তুমি কি সত্যি দেখেছিলে?'

বিপদকালে একটা স্তোক বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে যে এমন বিপদে পড়তে হবে তা কি ভেবেছিল বসন্ত? বলে, 'দেখলাম তো দাদা। নিজের চক্ষেই তো দেখলাম।'

বলে ফেলেছে তার জের তো টেনে চলতে হবে।

নিজের চক্ষে দেখেছে বসন্ত। তবে?

তবে এই জায়গাটা ছেড়ে রেখে কোথায় যাবে সাগর আর অটল? কিন্তু দুজনে কী একসঙ্গে? নাঃ সাগর একলা ফেরে। হঠাৎ হঠাৎ প্রবল শব্দে ডাক দেয়, শংকুরে—তুষুরে—! আর অটলকে ধারে কাছে আসতে দেখলেই ধাঁই ধাঁই করে মারতে থাকে।

নিশ্চিত খাওয়া নেই, নিশ্চিত নাওয়া নেই, নিশ্চিত আশ্রয় নেই, শেয়াল কুকুরের মতো ঘুরে ঘুরে, এখানে সেখানে দিন রাত্রি কাটানো।

হঠাৎ একদিন অটল দাস ওই পাগলীর মায়ের হাতটা চেপে ধরল, বলল, 'সাগর আমার দিকে তাকা। পষ্ট করি তাকা। দ্যাক আমার কি কিছুই নাগে নাই? তুষু আমার গলার হার ছেলো না? শংকু আমার পাজরার হাড়? জানিস নাই তুই?'

পাগলীর রুদ্র মূর্তি সহসা স্থির হয়ে যায়। তাকিয়ে থাকে ওই বেদনার্ত মুখটার দিকে। বারো বছর বয়েস থেকে এই বত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত যে মুখটার দিকেই তাকিয়ে কাটিয়ে এসেছে সে। সুখে দুঃখে জলে আগুনে অভাবে অনটনে। আগুন জ্বলা ধক ধকে চোখ দুটোর গভীর গহ্বর থেকে হঠাৎ বাষ্পোচ্ছ্বাস ওঠে, তারপর প্রবল জলোচ্ছ্বাস।

ডুকরে কেঁদে উঠে সাগর নামের সেই মেয়েটা, যে মেয়েটা একদিন জ্যালজেলে চেলির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে এক জেলা থেকে আর এক জেলায় চলে এসেছিল অটলদাসের পিছু পিছু সবিস্ময়ে তার চওড়া কাঁধ আর চ্যাটানো পিঠখানার দিকে তাকাতে তাকাতে।

শ্বাস নেই তবু হাড় ক'খানা আছে, মাস নাই তবু কাঠামোখানা আছে। সেই কাঠামোখানার ওপরই আছড়ে পড়ে মুখ চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে চলে সাগর। লোনা জলে ভাসিয়ে দেয় অটলদাসের চওড়া বুকের খাঁচাখানা।

কাঁদতে দেয় ওকে অটল। মনে মনে বলে কাঁদ, কান্নাই ওষুধ।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে বলে, যদি পাবার হয় তো একদিন খুঁজি পাবো সাগর। আর যদি ভগমানের কড়িনুকোনো খেলা হয়তো কিচু করার নাই।...কিন্তুক আমরা দু মানুষতো আচি? একদা ওরা ছেলো না, আসে নাই। শুদু তুই আর আমি থেকেচি। মনে ভাব সেই দিনে ফিরে গেচি আবাব। তুই আর আমি নোতুন করে জেবন আরম্ভ করতেচি।...

শরীরে আর সেই অসুরের বল নেই।

নেই সেই পেশী কঠিন চওড়া বুক পিঠ। নেই টগবগে মুখ, রগরগে চুল। তবু লোকটা অটল দাস।

এধার ওধার যেতে আসতে লোকে দেখে আলতু ফালতু কুড়োনো মাল হোগলা গোল পাতা, নারকেল পাতা খেজুরছড়া দিয়ে দিব্যি একখানা ঝুপড়ি বানিয়ে ফেলেছে একটা চরে ঘুরে বেড়ানো আধবুড়ো লোক বানিয়ে ফেলার পর কোথা থেকে যেন বয়ে বয়ে আনছে, মাটির মালসা জ্বালানিপাতা।

কেন যে?

ওই লোকটির মধ্যে যে কোনখানে কোথাও মান-অভিমানের বালাই বলে কিছু ছিল, থাকা সম্ভব, তা কে কবে ভেবেছে? ঘরে পরে?

নীহারের মুখের বুলিই তো ছিল, মানুষ না জানোয়ার, কী তুমি? লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, মান নেই, অপমান নেই, ইতর ছোটলোক!

পাড়াপড়শী আত্মীয়জনেরা বলত, আশ্চর্য বেহায়া লোক বাবা! গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি নাকি কে জানে। বলতে তো কিছু কসুর রাখি না। তবু—

আর লতু? সরকার বাড়ির লতু? যার কথাটা সব থেকে বুকে বাজত অধীরের। রক্তে সব থেকে দাহ ধরাত। লতু তার লাবণ্যময় মুখটাকে করুণ কৰুণ করে অনায়াসে বলত, মেসোমশাইয়ের কাণ্ড দেখে আমারই গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে অধীরদা। বাবা কী বলে জানো? বলে, রাস্তার বেড়াল কুকুরটারও যেটুকু মর্যোদা জ্ঞান আছে, এ লোকের তাও নেই। তাদের দূর দূর হেয় হেয় করলে দুটো দিনও সে বাড়ি ঢোকে না। আর এই সুধীর ভট্চায—ছিঃ। শুনে যেন মাথা কাটা যায় অধীরদা! ভগবান যে ওঁকে কেন অমন করে গড়েছেন! কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, ভগবানের সৃষ্টিতে পুরো ফাঁকি ছিল না। ওই সুধীর ভট্টচায লোকটার মধ্যে মান-অভিমান বলে বস্তু কিছুটা দিয়ে রেখেছিলেন কোন খাঁজে খোপে। অবশ্য একদিন দু'দিনে তা ধরা পড়েনি।

প্রথম ক'দিন নীহারই বলেছে, যাবে আবার কোন্ চুলোয়! কে কোথায় ওঁর জন্যে ভাত বেড়ে নিয়ে বসে আছে? পকেটের পয়সা ক'টা ফুরোলেই সুড়সুড় করে চলে আসবে। খবরদার বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিতে যাবি না অধীর।

রণধীর আর বান্টি চুপি চুপি বলাবলি করেছে যতদিন না আসে বাবাটা ততদিনই ভালো। বাড়িটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রয়েছে দেখছিস!

কিন্তু ওই আলোচনাগুলো ক্রমেই ধূসর হয়ে আসছে। ওই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাটা যেন সংসারটাকে ঠাণ্ডা সারিয়ে দিচ্ছে। আর এমনি ভাগ্যের ফের, বাপকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বিদেয় করার পর থেকেই অধীরের অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজটা যেন ফুলে ফেঁপে উঠছে।

যখন আশাতীত সব অর্ডার আসে, নোটের গোছাগুলো হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে যখন অবিশ্বাস্য লাগে, তখন গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবে অধীর, এর অর্থ কী? বাপকে গলাধাক্কা দিয়ে (মানে সত্যি সত্যি আক্ষরিক অর্থেই) বাড়ির বার করে দেওয়া তো পাপই। মহাপাপ! তা সে যেমন চরিত্রের বাপই হোক। অথচ সেই তখন থেকেই কেন এমন বাড়বাড়ন্ত। এখন টাকা হাতে নিয়ে এক এক সময় ভারী বিষণ্ণ হয়ে যায় অধীর। তখন যদি এ অবস্থা আসত! এর অর্ধেক আয় হলেও বাপের হাতে নিশ্চয়

কিছু কিছু তুলে দিতে পারত সে। তাহলে ওই নোংরামিটা করে বেড়াত না বাবা।

কী না করেছে সুধীর ভট্চায, কত না উঞ্ছবৃত্তি তার নেশার খরচ জোটাতে। লোকের দোরে দোরে হ্যাংলার মতো বারবার গিয়েছে, হাতে পায়ে ধরেছে, পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছে, এই শেষ আর চাইবে না, আর ছেলেকে শাপমন্যি দিয়েছে বাপের নেশার খরচ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে।

ভালো হবে না! এই বলে দিচ্ছি অধীর, তোর ভালো হবে না। তোর দুঃখে শ্যাল কুকুর কাঁদবে। বাপের শাপ, ব্রহ্মশাপ, তা মনে রাখিস। ছেলেকেও একদিন পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়েছিল সুধীর ভট্চায। শেষ অবধি আবার ছেঁড়া পৈতেটা কুড়িয়ে নিয়ে গিঁট দিয়ে পরেছিল, আর আজও শেষ অবধি সেই গিঁট দেওয়া তেলচিটা পৈতেটাই গলায় ছিল তার।

বাপের সেই ময়লা পৈতে পরা খালি গা চেহারাটা যখনই চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু কই, বাপের শাপ যদি ব্রহ্মশাপ হতো অধীরের ভাগ্যে উল্টোটাই হচ্ছে কেন? বাপ গিয়ে পর্যন্ত অবিরত ভালোই তো হচ্ছে তার। প্রথম যেদিন একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিল অধীর, সেদিন তার থেকে দুখানা বড় নোট হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, মনে মনে একখানা শীর্ণ শিরাবহুল হাতের দিকে বাড়িয়ে ধরে। তারপর আস্তে উঠে তুলে রেখেছিল দেরাজের একেবারে নীচে কাপড়-চোপড়ের তলায়। এখনও সে দুটো সেই ভাবেই তোলা আছে! অভাবের থাবা তাকে মুঠোয় চেপে উঠিয়ে নিয়ে যায়নি। কারণ অভাব বলতে অধীরের এখন শুধু সময়ের অভাব। আর কিছু না। হয়তো ভুলেই গেছে অধীর ও দুটোর কথা। অথবা মানতি পুজোর মতো তুলে রেখে দিয়েছে! কে জানে সেই শীর্ণ শিরাবহুল হাতখানা সত্যি প্রত্যক্ষ মূর্তিতে সামনে বাড়ানো থাকলে কী হত! এই মন কেমন, এই বিষণ্ণতা, এই অপরাধ-বোধ, মরুভূমিতে জলের ফোঁটার মতো শুকিয়ে যেত কিনা। দায়হীন ভারহীন তীব্রতার স্পর্শহীন ছায়াটুকুর সঙ্গে দুর্দান্ত দুরন্ত দাপুটে কায়ামূর্তির তফাৎ অনেক। ইচ্ছে করে অনেক সময় অধীর তার এই সাজানো সংসারে সেই দুরন্ত উপস্থিতিটা অনুভব করতে চেষ্টা করে, কিন্তু চেষ্টাটা দানা বাঁধে না। কিছুতেই সেই অসহনীয়তাটা অনুভবে আনতে পারে না। কেবলই কিছু কিছু নোটের গোছা সব আবছা করে দেয়?

টাকা হাতে পেলে কি অমন হ্যাংলা আর হিংস্র থাকত সুধীর ভট্চায নামের মানুষটা? লোকের কাছে হ্যাংলা, বাড়িতে হিংস্র। কিন্তু শুধুই কি হিংস্র, একটা সাধারণ গেরস্থ ঘরের মানুষের পক্ষে যত রকম নিঘিন্নেপনা, মিথ্যে কথা, জোচ্চুরী, হাত সাফাই, আর সর্বোপরি নির্লজ্জ মনোবিকার। বাড়িতে একটা কমবয়সী ঝি রাখবার পর্যন্ত জো ছিল না নীহারের! দৈবাৎ অসুবিধেয় পড়ে রাখতে হলে পাহারা দিয়ে দিয়ে বেড়াতে হত নীহারকে।

এদিকটা অবশ্য জানা ছিল না অধীরের। বিবাহিত পুরুষ তো নয় যে, সংসারের সর্altবিধ ঘটনার রিপোর্ট পাবে। মনের ঘেন্নায় চক্ষুলজ্জার দায়ে অথবা কী জানি আর কিসের জন্যে বড় ছেলের কাছে অনেক কিছুই লুকাতো নীহার। কিন্তু বাকিগুলো তো হাড়ে হাড়ে টের পেত অধীর।

টাকা এনে কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভেবে পেত না, মায়ের কাছে রেখে দিয়েও তো স্বস্তি নেই। সংসার খরচের জন্যে গুণে গুণে যেটুকু তুলে দেয় মায়ের হাতে, তার থেকেও তো কেড়ে নেয় মায়ের পতি পরম গুরু, খোসামোদ করে পায়ে পড়ে, অথবা খিঁচিয়ে, অকথ্য গালমন্দ করে হাত মুচড়ে।

দুটো একটা টাকাও প্যান্টের পকেটে রাখবার জো নেই, কোন্ ফাঁকে আলনায় ঝোলানো প্যান্টটার পকেটে হাত চালিয়ে সাফাই করেই উধাও হয়ে যাবে অধীরের পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ ..।

অসময়ে চাকরি খুইয়ে বসে থাকাও তো সুধীরের ওই গুণটির কল্যাণে। একদা তো একটা মাড়োয়ারী কর্ম প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষকের কাজ করত সুধীর ভট্টচায, বাড়ির লোকে অবশ্য কোন দিন তার পুরো মাইনের হিসেব জানত না, পেতও না, তবু নেহাৎ খারাপ ছিল না কাজটা। তা ছাড়াও অন্য নানাবিধ সুবিধা ছিল।

কিন্তু তলায় তলায় তিল তিল করে লোভের গর্ত খুঁড়ে চলেছিল সুধীর, এক সহকর্মী এক গুরুর প্ররোচনায় আর দুঃসাহসে।

লোভই ছিল সুধীরের, বুদ্ধি ছিল না। অতএব হঠাৎ একদিন সেই তিলের গহ্বরটি তাল প্রমাণ হয়ে মনিবের গোচরে এসে গেল। সুধীরের গুরু সেই পরামর্শদাতাটি দিব্যি গা বাঁচিয়ে রয়ে গেল, সুধীরের চাকরিটি খতম হল। জেল হল না এই ঢের।

মনিব বলেছিল, নিজের ঝঞ্ঝাট বাঁচাতে থানা পুলিশ করতে গেলাম না, তবে ভবিষ্যতে এইটা যেন তোমার জীবনের শিক্ষা হয়...আর শিক্ষা! কর্মজীবনে সেইখানেই সমাপ্তি-রেখা সুধীর ভট্টচার্যের। তদবধিই উঞ্ছবৃত্তির ওপর থেকেছে। নেহাৎ তখন থেকেই অধীর কিছুটা আনতে শিখেছে, তাই সংসারটা বালির চড়ায় মুখ থুসড়ে পড়েনি। কিন্তু সুধীরের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। বাপের ওপর রাগে ঘৃণায় সর্বদা শরীর রী রী করত অধীরের।

বাপের সঙ্গে কথা কইতেও প্রবৃত্তি হত না। হবেই বা কী করে? যে লোক কেবল মাত্র উঞ্ছবৃত্তি আর ভিক্ষুক বৃত্তির ওপর চলতে চলতে নেশার মাত্রা বাড়িয়েছে বলে, তার ওপরে কার শ্রদ্ধা ভালোবাসা আসবে?

লোকটারও হয়তো কর্মহীন দায়হীন শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্বন্ধহীন নিরলম্ব জীবনটার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাঁজা কোকেন ধেনো মদ।

ক্রমশ ঘৃণ্য এবং ভীতিকর হয়ে উঠছিল লোকটা ঘরে বাইরে। যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে শান্তি, বাড়ি ঢুকতে দেখলেই স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের আতঙ্ক। ওই এলো ধূমকেতুর মূর্তিতে।

আর বাইরের লোক? চেনা লোক রাস্তায় দেখা হলে না দেখার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় পাছে টাকা চেয়ে বসে। বাড়িতে আসছে দেখলে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে দেয়, বলিস আমি বাড়ি নেই। তবু তার মধ্যে থেকেও নাছোড়বান্দা ভিখিরির মতো—

সবথেকে বেশী ঘেন্না করেছে বিজন সরকার। লতুর বাবা। বলেছে, আপনার না হয় গায়ে গণ্ডারের চামড়া, কিন্তু আমার পকেটটা তো রবারের নয়! দয়া করে আর আসবেন না। আর এলে কিন্তু অপমানী হতে হবে।

যেন হচ্ছে না সেটা। যেন এটা অপমান নয়। কিন্তু তবু কি ঠেকাতে পেরেছে? সুধীর ভট্চার্য যে একদা বিজন সরকারের দাদা বিনয় সরকারের ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল, সেই কথা তুলে কাকুতি মিনতি করেছে সুধীর।...মরে যাওয়া দাদার ক্লাশফ্রেণ্ড সম্পর্কে কোন রকম দুর্বলতার ভাবই দেখায়নি বিজন সরকার, কিন্তু তার টাকা আছে অনেক, তাই তার কাছেই ধর্ণা দিতে গেছে সুধীর। তাছাড়া আরো একটা কারণ, তার ব্যাটা অধীরের টিকিটা এখানে বাঁধা পড়ে রয়ে আছে, অতএব চক্ষুলজ্জার দায়ে এবং মেয়ের মুখ চেয়ে না দিয়ে পারবে না বিজন।

কিন্তু আশ্চর্য, এই লোকটা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেউই গলা খুলে বলছে না, বাঁচা গেছে, আপদ গেছে, হাড়ে বাতাস লেগেছে আমাদের—

বরং সকলেরই কোথায় যেন একটা অপরাধ-বোধ আলপিনের খোঁচার মতো চিনচিন ধরাচ্ছে। ভাবটা—আহা, লোকটাকে অত দূরছাই না করলেই হত! নশো পঞ্চাশ কিছু তো চাইত না, বড় জোর টাকাটা সিকেটা, তার জন্যে বড় বেশী অপমান করা হয়েছে। কেউ কেউ আরো মমতায় গলে বলেছে, কী করবে, নেশার দাস হয়ে মরেছিল, অথচ ছেলে এক পয়সা হাত খরচ দিত না—তাই অমন করে বেড়িয়েছে। ...নেশা যে মানুষকে অমানুষ করে ছাড়ে।

হঠাৎ অবস্থা ফিরে যাওয়ায় এখন আর মুখোমুখি কেউ কিছু বলছে না অধীরকে। গোড়ার দিকে বলেছে বৈকি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা এসে এসে বলে গেছে, যতই হোক জন্মদাতা পিতা তো বটে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়াটা উচিত হয়নি তোমার অধীর! শুনতে পেলাম নাকি যেতে চাইছিল না, দরজা আঁকড়ে বসে পড়েছিল, তুমি ঠেলতে ঠেলতে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে!

কথাটা মিথ্যা নয়, তাই দিয়েছিল বটে, অধীর নামের সেদিনের সেই তীব্র গোঁ টা।

তোমায় আজ আমি বিদেয় করে তবে ছাড়ব—

কথাটা যেন যখন তখনই হঠাৎ হঠাৎ কানে বেজে ওঠে অধীরের। কথা নয়. গর্জন। কার গলা? অধীরের? এত কটু কঠোর রুক্ষ কর্কশ গর্জন অধীরের গলা থেকে বেরোতে পারে? তা পেরেছিল তো।

কিন্তু ওরা কি করে জানল? ওদের তো জানবার কথা নয়!

সংবাদদাতা পরিবেশিতই অবশ্য। কিন্তু কে সেই সংবাদদাতা? রণধীর? বান্টি? মা?...কোনটাই সম্ভব নয়। বান্টি রণধীরের তো কথাই ওঠে না, মার পক্ষেও অসম্ভব! সত্যি বলতে কি মার জন্যেই তো আরো—

সেই সন্ধ্যাটাকে মাঝে মাঝেই উঁচু তাক থেকে পেড়ে নামায় অধীর। এদিক থেকে ওদিক থেকে এগিয়ে পিছিয়ে সামনে থেকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর গভীর পরিতাপের সঙ্গে অস্থির উত্তেজনা নিয়ে ভাবে—ভেস্তে যাওয়া ফেলার তাসগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে আবার যদি নতুন দান সাজিয়ে বসা যেত! যদি ফিরিয়ে নেওয়া যেত সেই সন্ধ্যাটাকে!

খুব যথাযথ মনে করতে পারে অধীর সেই সন্ধ্যাটাকে। কারণ সেই কেবলই মনের মধ্যে মেলে ধরে দেখে অধীর।

বাপের কেলেঙ্কারীতে ধিক্কারে অপমানে লতুদের বাড়িতে আর যাচ্ছিল না ক'দিন অধীর, হঠাৎ রাস্তায় দেখা হল লতুর সঙ্গে। মান-অভিমান দেখাল খানিকটা, তারপরই বলল, তোমার বাবাকে তুমি কিছু কিছু টাকা দিও অধীরদা ওই সব নেশা-ফেশা করার জন্যে। নইলে আমার বাবার কাছে তো আর আমার মুখ থাকছে না। আজ কী হয়েছে জানো? সত্যি করে বাবার পায়ে ধরেছে মেসোমশাই। বলেছে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে তোমার পায়ে ধরছি বিজন, পাঁচটা টাকা আজ আমায় দিতেই হবে।...তা মা বলল...লতু মুখটাকে আদুরী আদুরী করে বলে উঠল, মা বলল, বামুন মানুষ পায়ে ধরছে, দিয়ে দাও টাকা ক'টা। পাঁচটা টাকা তো তোমার হাতের ময়লা! কিন্তু এ কথাও বলে বসেছে, অমন হাঘরের ছেলের সঙ্গে তোর বে দিচ্ছিনে আমি।... মাথায় আমার আকাশ ভেঙে পড়েছে অধীরদা।...

আকাশ-ভাঙাভাঙি আবার কী? বিয়ে-ফিয়ে তো করছি না—বলে অধীর রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরেছিল।

শরীরের সব রক্ত যেন আগুন হয়ে উঠেছে, জিভেয় স্বাদ তেতো। মনের অনুভূতি যেন জিভে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ঢোক গিলতেও যেন তেতো লাগছিল। এই শরীর মন নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকার পথেই শুনতে পেলো—মরো মরো, এক্ষুনি মরো তুমি! তোমার যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শাঁখা নোয়া ভেঙে গঙ্গা নেয়ে উঠি আমি।

কী কুৎসিত! কী অশ্লীল! ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এলো অধীর। দেখতে পেলো মায়ের আঁচলটা টেনে ধরে তাতে দাঁত বসাচ্ছে বাবা। গিঁট বাঁধা আছে মোক্ষম করে, নখের চেষ্টায় খোলবার ধৈর্য নেই, তাই দাঁতে ছিঁড়ে নিচ্ছে গিঁটটা সমেতই। গিঁট মানেই তো টাকা!

অধীর যে মুহূর্তে ঢুকেছে, সেই মুহূর্তেই খানিকটা শাড়ি ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে এসেছে সুধীরের দাঁতে।...বিপর্যস্ত নীহার গা কাপড় সামলাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে।

কী হচ্ছে কী? গর্জন করে ওঠে অধীর।

ছেলের সামনে কেঁচো। আর কথা নেই দুর্দান্ত সুধীর ভট্চাযের।

চেঁচিয়ে ওঠে নীহার, তুই এসেছিস! দ্যাখ, দ্যাখ তোর বাপের কীর্তি। বোঝ না কেন গালমন্দ করি। তুই সেই দশটা টাকা দিয়ে গেলি রেশনের জন্যে, আজ আর আনা হয়নি লক্ষ্মীছাড়া ছোটলোক টের পেয়ে আঁচল ছিঁড়ে কেড়ে নিচ্ছে—

অধীর তাকিয়ে দেখে দেয়ালের ধারে বান্টি আর রণধীর ভয়তরাসে চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে এই নাটকীয় দৃশ্য অবলোকন করেছে। আর বাবা গোঁজ হয়ে খুলে পড়ো পড়ো লুঙ্গিটা সামলে বাঁধছে, বোধ করি সট্কান দেবার তালে!

তেড়ে গিয়ে বাপের ঘাড়টা চেপে ধরে অধীর। আর ওই কটু কর্কশ রুক্ষ কঠোর দাঁত পেষা শব্দটা

কোথা থেকে যেন উচ্চারিত হয়—তোমায় আজ আমি বিদেয় করে তবে ছাড়ব।

তখন তো নীহারও আরও কটু আরও কর্কশ।—দে দে, তাই দে! ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দে।...এই ইতর ছোটলোক চামারকে নিয়ে আর পারছি না আমি...দে বার করে দে—হাড় জুড়ুক আমার।

সত্যিই তাই দিল অধীর।—যাও বেরিয়ে যাও। আর এ বাড়ীতে মাথা গলাতে চেষ্টা কোরো না।

ঠেলতে ঠেলতে পার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল অধীর তার হতভম্ব বাপের মুখের ওপর। হতভম্বই। সত্যি এমনটা হতে পারে তা বোধহয় ভাবতেই পারেনি সুধীর ভট্চায। শেষ চেষ্টা করতে দরজাটা আঁকড়ে ধরল, কিন্তু দুরন্ত রাগে জ্ঞান-শূন্য জোয়ান ছেলের জোরের সঙ্গে পারবে কেন?

এক ঝটকায় হাতটা খসে পড়তেই লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এ ভিটেয় পা দিচ্ছি না আমি। এই শেষ!

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অধীর হাঁপাতে থাকে, আর কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। কিন্তু নীহার তখনও চেঁচিয়ে চলে, মানুষের রক্ত যদি গায়ে থাকে তো ট্রামলাইনে মাথা পাতগে। লরীর তলায় ঝাঁপ দাওগে—কিছু না পারো, মা গঙ্গা আছেন।

মা থামো। ক্লান্ত বিধ্বস্ত অধীর ভট্চায গম্ভীর খাদে নামা গলায় বলে ওঠে, মা থামো।

এই নিষেধবাণী কাজে লাগে। হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে যায় গলার শির ওঠা ইস্পাত শক্ত চোয়াল পেশী কঠিন মুখ, একটা ক্ষ্যাপা গোঁ।

কিন্তু এই দৃশ্যর আর কোন দর্শক ছিল না, বাদে, বাণ্টি রেণু আর মা ছাড়া।...অথচ অধীরের যে যেখানে আছে সবাই জেনে ফেলল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, কোন্ পরিস্থিতিতে মূল ঘটনাটা ঘটল।...আশ্চর্য হয়ে যায় অধীর।

নাটকের ক্লাইম্যাক্সের পর যেন কিছুক্ষণের জন্যে মঞ্চে যবনিকা পড়ল। সাড়াহীন শব্দহীন একটা ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। অধীর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে, জানে না কে কোথায় কি করছে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ওই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে নীহারের ভাঙা ফাটা গলাটা কথা কয়ে উঠল—এই লক্ষ্মীছাড়ি বাণ্টি মজা করে ঘুম মারতে গেলি যে? জল দেওয়া পিঁড়ি পাতা সেও কি আমায় করতে হবে?

অধীরের ঘুম এসেছিল, ধড়মড় করে উঠে বসল। সংসারটা তাহলে থেমে যায়নি। নিত্য নিয়মে পিঁড়ি পড়বে, তার পাশে পাশে জলের গ্লাস বসবে, আহার্যপূর্ণ থালাও বসবে সামনে। মায়ের তীব্র অভিযোগের কণ্ঠ সেই পরম আশ্বাসবাহী।

দাদাকে ডাক। শুনতে পেল অধীর। ডাকের অপেক্ষায় পড়ে রইল।

বাণ্টি এসে ডাকল, দাদা এসো, মা খেতে দিয়েছে।

অধীর চৌকী থেকে নেমে দাঁড়িয়ে হাই তুলে সহজ হবার ভঙ্গীতে বলে, বাবা ফিরেছে?

বাবা! বাণ্টি প্রায় অবাক গলায় বলে, বাবা আবার ফিরবে?

অধীর আরও সহজ হতে চেষ্টা করে, ফিরবে না তো কি সত্যি সত্যি চলে যাবে নাকি? কোথায় থাকবে রাত্তিরে?—প্রবোধটা বাণ্টিকেই দিল অধীর, না নিজেকে, তা কে জানে।

অধীর ভেবেছিল ছেলেমেয়েদের খাইয়ে মা নিজের খাবার ঢেকে রেখে বসে থাকবে। এবং অধীরকে বলতে হবে, কেন মিথ্যে বসে থাকবে? আজকে আর আসবে না বাবা—রাতটা রাগ করে কোথাও পড়ে থাকবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল মা তাদের খেতে দিয়ে দেয়ালের ধারে নিজের জায়গাটায় ঠিকই বসে পড়ল রুটি তরকারি গুছিয়ে নিয়ে।...শুধু একটু তফাতে একটা জায়গা ফাঁকা পড়ে রইল আরো অস্বস্তিকর ফাঁকা-পিঁড়ি নিয়ে।

তদবধি চলছে সেই ফাঁকার কারবার। তবু প্রথমটা কেউ গায়ে মাখল না। ওই লোকের মধ্যে যে মান অভিমানের বালাই বলে কিছু আছে সে বিশ্বাস তো ছিল না কারুর।...তাই অধীর মাঝরাত্রে দু-একবার উঠে উঠে দেখেছে বাইরের দরজা খুলে—যদি নেশার ঘোরে এসে বসে থাকে।

সকালবেলা উঠে অধীর দেখল নীহার যথারীতি রান্নাঘরে খটখট করছে, ঘরের বাইরে বালতির উনুনটা যথারীতি গনগনে হয়ে জ্বলে উঠেছে। আগুনটাকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অধীর—আস্তে আস্তে বেশী লাল হয়ে উঠছে, অল্প অল্প নীল্‌চে শিখা উঠছে বাতাসে কাঁপছে।

একটু পরে নীহার বেরিয়ে এলো ঘর থেকে—একটা ভিজে গামছা নিয়ে বালতির হ্যান্ডেলটা চেপে ধরে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল উনুটা। ...অধীর রান্নাঘরের দরজায় এলো, একটু ইতস্তত ঘরে বলল, রাত্তির দরজা-টরজা ঠেলেনি তো?

নীহার নীরস গলায় বলল, ঠেললে তুমি শুনতে পেতে না?

আমি? আমার তো টিন পেটালেও ঘুম ভাঙে না। মানে—

অধীর আর একটু ইতস্তত করে বলে, ভাবলাম, কি জানি, দরজা ঠেলে খোলা না পেয়ে যদি আবার চলে-টলে গিয়ে থাকে।

নীহার বলল, কোন চুলোয় যাবে? কে ভাত বেড়ে নিয়ে বসে আছে?

অধীর আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে, ফিরে এলে তুমি যেন আবার বকাবকি কোরো না।

বকাবকি করা আমার সাধ তো—তাই করি। বলে নীহার শিল নোড়াটা নামিয়ে মশলা পিষতে বসল।

আমার জন্যে বেশী তাড়া কোরো না, আমি আজ একটু বেলায় বেরোব। মাকে নির্দেশটা দিয়ে দাড়িটা কামিয়ে নিল অধীর। তারপর বাজারের থলিটা নিয়ে মার কাছে এসে দাঁড়াল, বিশেষ কিছু আসবে।

নীহার তেমনি নীরস গলায় বলল, বিশেষের আবার কি আসবার আছে।

না, মানে লেবু কাঁচালঙ্কা কি উচ্ছে-টুচ্ছে?

যা আসবে, তাই বাঁধা হবে। বলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল নীহার।

অধীর বাজারে বেরিয়ে কেবলই আশেপাশে তাকাচ্ছিল—হয়তো দেখবে কোনখানে বসে আছে বাবা, খালি গায়ে গিঁট বাঁধা পৈতে গলায় ঝুলিয়ে লুঙ্গিটা হাঁটুর ওপর তুলে। কোন পানের দোকানের ধারে কি চায়ের দোকানে সামনের বেঞ্চে, কিংবা কোন বাড়ির রোয়াকে।

কিন্তু না, কোথাও দেখতে পেল না। অন্যমনস্ক ভাবে বাজার করল অধীর। ভগবান জানেন কেন অন্য দিনের থেকে মাছ খানিকটা বেশীই নিয়ে ফেলল।

বাড়ি ঢুকেই বুঝল নতুন কোন ঘটনা ঘটেনি। একটা আশা—হয়তো অধীরের কাজে বেরিয়ে যাবার সময়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপরে আস্তে আস্তে ঢুকবে। বড় ছেলেকে বড় ভয় সুধীর ভট্‌চাযের, সেটা বড় ছেলের জানা আছে।

বাবা যতদিন না আসে ততদিনই ভালো, তাই না দিদি?

রণুর কথায় বান্টি চোখ মুখ নাচিয়ে সায় দেয়, যা বলেছিস! আজ দেখ বাড়িটা কী ঠাণ্ডা! যেন ভগবানের হাওয়া বইছে।

কী জানি, এক্ষুনিই হয়তো এসে যাবে। রণুর গলায় আশঙ্কার সুর।

এলে মা ঢুকতে দেবে ভেবেছিস?...বান্টি গিন্নীর ভঙ্গীতে হাত তুলে একটু বিশেষ ভঙ্গী করে বলে, ঝাঁটা পিটিয়ে বার করে দেবে।

দেবেই তো—রণুর গলায় উত্তেজনা, মাকে যা করে! কালকে তো মেরেই দিয়েছিল।

দাদা আজ বেশী করে মাছ এনেছে কেন রে দিদি?

কেন আবার? বুঝতে পারছিস না। একটু বেশী করে খেতে পাবে বলে। দেখিসনি, কতদিন দাদা সকালে মাছ না খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলে মা দাদার রাত্তিরের জন্যে একটু তুলে রাখলে, বাবা ঢাকা খুলে খুঁজে বার করে লুকিয়ে খেয়ে রাখে।...রোজ রান্নাঘরে ঢুকে দেখে কী আছে।

বাবাটা যেন একটা রাক্কোস, না রে দিদি?

ঠিক বলেছিস। আমারও তাই মনে হয়। বাবা হয় তাই বলতে নেই।

বাবা যদি আর কক্ষনো ফিরে না আসে মা বাঁচে, না রে দিদি?

তাই তো। যত কষ্ট তো মারই।

আমরা খুব দুঃখী, না রে? ডাবু, বিশু, লক্ষ্মণ, অপূর্ব কারুর বাবা এ রকম বিচ্ছিরি নয়।

এই, চেঁচিয়ে বলিসনি, হঠাৎ কখন এসে পড়ে শুনে ফেলবে, আর মেরে শেষ করে দেবে।

হ্যাঁ, প্রথম দিকে অহরহ এই আশঙ্কা। ওই বুঝি কখন রে রে ঢুকে পড়ে, যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে, গাঁউ গাঁউ করে খায়, টাকা কেড়ে নেয় মায়ের কাছ থেকে, আর কারণে অকারণে ছেলে-মেয়ে দুটোকে মারে।...

বড়ছেলেকে ভয়, এই দুটো ছেলেমেয়ে যেন কবলের মধ্যে, তাই যত আক্রোশ ঝাড়ে তাদের ওপর। অধীরের পর দু-দুটো নষ্ট হয়ে গিয়ে এরা। নীহার বলে, মহারাজ। ছেলে দুটোকে মারতে তোমার লজ্জা করে না।

সুধীর ভট্চায খিঁচিয়ে বলে, লজ্জা তোমারই হওয়া উচিত ছিল। বুড়ো বয়সে দুটো হাঁস মুরগী পুষতে বসা। আগের দুটো যে পথে গেছল, সেই পথেই গেল না কেন?

মা-বাপ একখানা নাম দিয়েছিল বটে, নীহারও খিঁচোয়, নামে কলঙ্ক! বেহায়া ইল্লুতে! হাঁস মুরগী আমি খানা-ডোবা থেকে কুড়িয়ে এনেছি, না?

বাপ-মার ঝগড়ার অনেক কথাই বুঝতে পারে না এরা, রণধীর দিদি বিনতাকে নিজের থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন ভাবে, তাই অনেক সময় চুপি চুপি দিদিকে জিগ্যেস করে, বাবা যা বলল তার মানে কী রে দিদি? মা কী বলল বুঝতে পারলি দিদি?

দু'বছরের দিদি খেলা হয়ে যাবার ভয়ে বলে, বুঝব না কেন? ছোটদের ওসব শুনতে নেই।

তুই বুঝি ছোট নোস?

তোর থেকে তো বড়।

একটা কদর্য আর নিষ্ঠুর পৃথিবীর অসহায় দর্শক এই ছোট ছেলেমেয়ে দুটো যেন ওই পৃথিবীর কাছ থেকে নিজেদেরকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে নিয়ে পরস্পরকে অবলম্বন করে টিঁকে আছে।

দাদাকেও এরা খুব দূরের মানুষ বলে ভাবে। রুক্ষ তিক্ত, সর্বদা টাকার চিন্তায় ব্যস্ত ওই দাদার কাছে ঘেঁসতে সাহস হয় না। দাদাও কাছে ডাকে না।

কিন্তু বাবা চলে যাবার পর থেকে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা মমতার আভাস দেখতে পাচ্ছে। দাদা কাছে ডেকে পড়া জিগ্যেস করে, দাদা হঠাৎ হঠাৎ টফি লজেস নিমকি বিস্কুট এনে উপহার দেয়, এবং কেমন যেন অন্য রকম করে তাকায় ওদের দিকে। দেখে ভালো লাগে আবার কান্না কান্না পায়।

দাদা কেন আজকাল আমাদের এত দয়া মায়া করে জানিস? ...একজন বলে অন্যজনকে, দাদা ভাবে বাবার জন্যে আমাদের মন কেমন করছে, তাই। আমাদের তো আর মন কেমন করছে না,--অ্যাঁ? কেন করতে যাবে? বাবা কি আমাদের ভালোবাসত তো?

অন্যজন বলে, বাসত না। তবে দাদা এখন এত বেশী বেশী করে খাবার আনে, অনেক অনেক দিন মাংস আনে, এই দেখে মনটা কেমন করে ওঠে। বাবা খেতে ভীষণ ভালোবাসত তো।...

তোর মনে আছে রণু, একদিন সেই মাংস রান্না হয়েছিল, খুব কম কম, বাবা দেখে দাদাকে কিপ্‌টে বলে ঘেন্না দিল, দাদা রাগ করে খেল না, তখন মাও খেল না, সবটা বাবাকে দিয়ে দিল? বাবা কেমন চোর চোর মুখে খেল সবটা?

মনে আছে। মাংস খেতে গেলেই সেদিনের কথাটা আমার মনে পড়ে যায়।...অথচ দ্যাখ, এখন দাদা কত বেশী বেশী সব আনে।

এখন যে দাদার অনেক বেশী টাকা হচ্ছে। দেখিস না, কেবলই সন্দেশ নিয়ে এসে এসে মায়ের ঠাকুরের কাছে দেয়, আর বলে, তোমার ঠাকুরের দয়ায় আজ কিছু পাওয়া গেল মা। কিছু মানেই টাকা।

হ্যাঁ টাকা। অনেক টাকা এসে যাচ্ছে আজকাল সংসারের—অপ্রত্যাশিত, আশাতীত। আর মানসিক অবস্থা যেমনই থাক, লক্ষ্মী ঘরে ঢুকলে সংসারের চেহারা লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবেই। অবশ্য যদি লক্ষ্মীর বাহক কৃপণ না হয়।

অধীর কৃপণ নয়। অধীর এ যাবৎ কাল ওই বদনামটা বহন করে এসেছে প্রত্যক্ষ বাপের কাছে, পরোক্ষে মায়ের কাছে। মা বলেছে কী করে সংসার চালাই তা আমিই জানি। কতটুকু কী দাও আমায় হিসেব করে দ্যাখ।

আর বাপের কথা তো ধরে কাজ নেই। খাওয়া পছন্দ না হলে কী বলেছে আর কী না বলেছে।

দিন পেয়ে অধীর সেই বদনামটা ঘোচাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু যখন তখনই সুর কেটে যাচ্ছে। মায়ের কাছে টাকা রাখতে এলে, মা বলে, আমি আর নিয়ে কী করব, কোথায় রাখব, তুমিই রেখে দাও। আমাকে সংসার খরচের মতো হাত তুলে যা দেবে দিয়ে রাখ।

মার গলায় স্বরটা আগেও নীরস ছিল, কিন্তু এমন ধাতব ছিল কী? মা কতদিন 'তুই' বলে কথা বলেনি অধীরের সঙ্গে?

হঠাৎ হঠাৎ আজকাল মনে হয় অধীরের, মা যেন বিশ্বাস করে না এখন অধীরের অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মনে হয় মা যেন তাকে সন্দেহ করছে, বাপের ভয়ে সে টাকা চেপে রেখে এসেছে এতদিন, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বার করছে।

মায়ের চোখের শাণিত দৃষ্টিতে, কণ্ঠের ধাতব শব্দে ছুঁড়ে মারা টুকটাক মন্তব্যে সেই সন্দেহ গর্ত থেকে মুখ বাড়ানো জানোয়ারের মতো মুখ বাড়ায়।

অধীর যেদিন একটা গডরেজের আলমারী এনে হাজির করে বলল, এবার তো টাকা পয়সার ভার নিতে পারবে? এই আলমারী হল তোমার।

সেদিন নীহার ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে বলল, আমি আর কিছুর ভার নিতে চাই না বাছা, রেখে দাও তোমার বৌয়ের জন্যে। তবে মানুষটা যদি ওপরে উঠে গিয়ে থাকে তো সংসারের ভোল বদল দেখে হাঁ হয়ে যাবে।

সেদিন বলল, আগে রুটির ওপর সামান্য একটু গুড় জুটত না আর এখন ঘিয়ে ভাজা পরোটার ওপর সন্দেশ! বলতেই হবে সংসারের কুগ্রহ সরে গেছে তাই ভাগের এত বোলবেলাও।

আর একদিন বলল, হয় এবার বৌ এনে সংসার পাতো, নয় একটা রান্নার লোক রাখো অধীর, এত এত রান্না আমার দ্বারা হয়ে উঠছে না। মাছের ওপর মাংস, মাংসের ওপর ডিম, তার সঙ্গে গুচ্ছের কপি বেগুন মূলো মটরশুঁটি! কে যে খাবার লোক তার ঠিক নেই।

অধীর অপরাধী ভাবে বলে, বাণ্টি রণু ভালোবাসে—

ভালো চিরকালই বাসতো—

অধীর আরও মলিন হয়, তখন তো পেরে ওঠা যায়নি মা।

মা আনাজপাতিগুলো ধামায় ঢেলে ঘরে তুলতে তুলতে বলে যায়, একেবারে যেতো না সেটাই আশ্চর্য!

তবু অধীর মায়ের করুণা প্রার্থী হয়ে দাঁড়ায়। এখনকার এই পেরে ওঠার ভারটাও তো তার পক্ষে কম দুর্বহ নয়। মা যদি একটু অন্তরঙ্গ হত।

জগতে কম সমারোহ, বাজারে কত আয়োজন, অধীর তো তার হতাশ দর্শকের ভূমিকা নিয়েই কাটিয়ে এসেছে এতদিন, এখনও কি তাই থাকবে?...এখনও বাণ্টির ফ্রকের ছেঁড়াটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবে? রণুর জুতো থেকে আঙুল বেরিয়ে পড়া দেখে মুচি খুঁজে বেড়াবে?

মায়া কি ছিল না অধীর নামের ছেলেটার? ছোট ভাইবোন দুটোর ওপর? মায়ের ওপর? সে মায়া প্রকাশের পথ ছিল কোথায়? এখন পথ পেয়েও সে পথে পা বাড়াবার দরজা বন্ধ করে রাখবে মায়ের বাঁকা মন্তব্য, কুটিল নিশ্বাস আর শাস্তি চাহনির ভয়ে? কিনে আনবে না ভাইবোনের জন্যে বেশী বেশী জামা জুতো সোয়েটার মাফলার, মায়ের জন্য গরম চাদর।

কিন্তু মা সে চাদর গায়েই দিল না। বলল, জীবন গেল শুধু আঁচল জড়িয়ে, এখন আবার শীতে গরম চাদর! মরণকালে হরিনাম।

অথচ হিসেব মতে মায়ের বয়েস মাত্র পঁয়তাল্লিশ। অধীর চেষ্টা করে আসে, পঞ্চাশের পাঁচ বাকি

থাকতেই তোমার মরণকাল এসে গেল মা? তা তাই যদিই হয়, বুড়ো হাড়েই শীত লাগে বেশী, সেটা তো মানো?

রেখে দাও, লাগলে নেব। বলেছিল নীহার, কিন্তু নেয়নি। সারা শীত সে চাদর খাপে মোড়া পড়েই থাকল।

মাকে বুঝে উঠতে পারে না অধীর। বাবার চিহ্ন বলতে যা কিছু ছিল সব তো ধুয়ে মুছে ফর্সা করে ফেলেছে। অবিশ্যি ছিলই বা কী?...তবু বালিশটা বিছানাটা, থালাটা, গেলাসটা, লুঙ্গিটা, গেঞ্জিটা!...সুধীরের চৌকিটার ওপর এখন রাজ্যের বালিশ-বিছানা-লেপ-কাঁথা ডাঁই করে রেখে দিয়েছে নীহার। রান্নাঘরের ঘটিটা ফুটো হয়ে যাওয়ায় নাকি সুধীরের স্পেশাল লম্বা গেলাসটা নিয়ে রান্না করছে মা, আর সেদিন দেখল বাবার লুঙ্গিটা ছিঁড়ে ঝিকে ঘর মুছতে দিচ্ছে।

অধীরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, বাবার লুঙ্গিটা ন্যাতা করতে দিলে?

নীহার এমন একটা পাথুরে দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিল যে মাথাটা নীচু করা ছাড়া উপায় ছিল না। ঝি সরে গেলে খুব শান্ত গলায় বলেছিল নীহার, কপালে থাকলে ফিরে এসে জরিপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি পরবে।

কথা তো নয় তীক্ষ্ণ তীর। এ তীর সবটাই কি অধীরের প্রাপ্য? অধীরের মুখে কি যখন তখন এসে পড়তে চায় না—তুমিও তো কম বলনি মা। তুমিই তো বলেছিলে ঘাড় ধরে বার করে দে—

কিন্তু বল ত পারে না। জীবনে একবারই সহিষ্ণুতাব মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছিল সে, আর সেই অসহিষ্ণুতার খেসারৎ দিয়ে চলেছে বেচারী অবিরত।

ছোট ভাইবোন দুটোর মধ্যেও কি সন্দেহের বীজ দানা বাঁধছে? তারাও কি ভাবতে শুরু করছে বাবাকে খেতে দেবার ভয়ে দাদা তখন টাকা লুকিয়ে রাখত, খরচ করত না! ভাবছে—খোঁজাখুঁজি করলে বাবাকে নিশ্চয় পাওয়া যেত, দাদা ইচ্ছে করে খুঁজছে না!

একদিন তো আরো ভয়ানক একটা কথা বলে বলল রণু, আচ্ছা দাদা, তুমি কি সত্যিই বাবাকে আর কোন দিন দেখতে পাও না?

অধীরের সারা শরীরে চড়াৎ করে বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল, দেখতে পেলে নিয়ে আসব না?

রণু এদিক ওদিক তাকিয়ে দিদির কান বাঁচিয়ে বলেছিল, মা বলছিল, বাবাকে তুমি দেখতে পেয়ে শাসিয়ে রেখেছ খবরদার না আসতে।

এই কথা বলেছে মা! রণু দাদার ইস্পাত কণ্ঠে ভয় পেয়ে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল—ও দাদা তোমার পায়ে পড়ি, মাকে বোলো না, মা তাহলে আমায় মেরে ফেলবে।

অথচ নীহার খেতে বসে মাছের ল্যাজা চিবোতে চিবোতে অদ্ভুত একটা বিকৃত হাসি হেসে বলে উঠল সেদিন, মড়মড়িয়ে মাছ মাংসগুলো তো গিলছি, কী হয়ে বসে আছে ভগবান জানে।

অধীরের খাওয়ার হাত থেমে গিয়েছিল মায়ের কথা শুনে। অধীর পাতে আঙুলের আগায় হিজিবিজি কাটতে কাটতে বলেছিল, দুর্ঘটনার খবর খবরের কাগজে ওঠে মা।

সেটা তোমরাই জানো। আমি তো আর খবরের কাগজ পড়তে যাই না।

হঠাৎ বড় রাগ ধরে গিয়েছিল অধীরের। মা যেন বাবার ব্যাপারে সমস্ত দোষটা অধীরের ওপরই চাপাচ্ছে। বলে ফেলেছিল, তুমি না পড়, তোমার আপনজনেরা পড়ে।

আমার আপনজন? নীহার ভুরু কোঁচকানোর সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, আমার আপনজন যম ছাড়া আর কেউ নেই।

অধীরের জেদ চেপে গিয়েছিল। অবিরত মেনে নিতে নিতে হঠাৎ যেমন এক ধরনের বিদ্রোহের সাহস এসে যায় সেই সাহসে উঠেছিল, কেন? তোমার সুপরামর্শদাতারা? মেজমামা, ছোটমামা, মেসোমশাই, মাখনদা—

নীহার হঠাৎ জলের ঘটিটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ঘাড় উঁচু করে আলগোছে খানিকটা জল খেয়ে

নিয়ে বলেছিল, তা তোমার কাছে এ রকম কথা ছাড়া আর কি আশা করব! গুরুজনকে যে মান্য সমীহ করে কথা বলতে হয়, সেটা আর শিখলে কবে? তবে জেনে রাখ, কেউ আমায় কু-পরামর্শ দিতে আসে না, মায়া করে একটু দেখতে আসে কী ভাবে মানুষটার দিন কাটছে। বাড়িতে যে আছে তার তো একবার 'মা' বলে ডাকবারও সময় নাই।

অধীরের ডাক ছেড়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করে—মা, একবারও কি তুমি আমায় 'তুই' করে কথা বল আজকাল? তোমার এই নিষ্ঠুরতা আমায় তোমার কাছ থেকে ঠেলতে ঠেলতে দূরে অনেক দূরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি বলা যায়? কিম্বা সবাই পারে না ইচ্ছে মতো কথা বলতে।

আবার কেউ কেউ ভীষণ ভাবে পারে। নীহার তাদের মধ্যে একজন। নীহার অনায়াসেই হঠাৎ আবার বলে উঠতে পারে অপঘাতের কথা যদি কাগজে ওঠাই নিয়ম, তো বলতে হয় লোকটা তবে বৈরাগী হয়ে গেছে। অখদ্যে অবদ্যেরও পুনর্জন্ম হতে পারে। জগাই মাধাইও উদ্ধার হয়েছিল। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে রামায়ণ লিখেছিল, লালবাবু 'বেলা গেল' শুনে সংসার ছেড়েছিল। ছেলের হাতের কোঁৎকা খেয়ে মানুষটার বৈরাগী হয়ে যাওয়া আশ্চয্যি নয়। নচেৎ জলজ্যান্ত মানুষটা তো সত্যি কপ্পুর হয়ে উড়ে যেতে পারে না।

ছেলের হাতের কোঁৎকা! কী কুৎসিত! কী কদর্য! জগতে এই সব কুৎসিত কদর্য ভাষা চালু আছে এখনও? অধীরের আর একবার বলে উঠতে ইচ্ছে করল—না, তোমার নিষ্ঠুরতাও একটা মানুষকে ঘর ছাড়া বৈরাগী করে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট। আমারই তো মাঝে মাঝে—

কিন্তু বলে উঠল না কারণটা সেই একই—সবাই পারে না যথেষ্ট কথা বলতে।

আশ্চর্য! কী উল্টো ধারণাই ছিল অধীরের! নিরুপায় দর্শকের চোখে কেবলই দেখে এসেছে মা এক বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়ে ছটফটাচ্ছে, অধীরের কিছু করার নেই।

সীমিত আয়, সীমিত সাহস। কী করবে যে? করবার মধ্যে শুধু কল্পনার স্রোতে ইচ্ছের নৌকোখানা ছেড়ে দেওয়া। মসৃণ একখানি সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখত অধীর। যে রকম সচ্ছলতার সুধীর ভট্চায নামের ওই বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নটাকে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে রাখা যায়। আর সেই সরিয়ে রাখার ফলে বাড়ির চেহারাটি কেমন হয়।

তিল তিল করে সেই সুস্থ শান্ত নিরুদ্বেগ আর কুশ্রীতামুক্ত সংসারটাকে গড়ত অধীর মনে মনে। সেই সংসারের মধ্যমণি মায়ের মূর্তিটি কী উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আনন্দময়ী!

অধীরের ছেলেবেলার মায়ের সঙ্গে তার কিছুটা আদল আছে। যে ছেলেবেলায় অধীরই ছিল মায়ের একমাত্র। আর যে ছেলেবেলায় বাবা ফর্সা জামা কাপড় পরে নিয়মিত অফিস যেত। মাতে আর অধীরেতে তখন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আঁকা চলত। দুজনেরই হাতে রং তুলি ক্যানভাস একটাই। সেই ছবিটা হচ্ছে অধীর যখন 'বড় হবে'।

বড় হয়ে অধীর মাকে লাল টুকটুকে জরির শাড়ি কিনে দেবে। কিনে দেবে ঝিকঝিকে ঝিক্‌ঝিক্ সোনার মালা। আর গাদা গাদা জিনিস কিনে দেবে মাকে যত ইচ্ছে করতে। তখন তো আর বাবা বকতে পারবে না—এত খরচ কেন বলে।

রোজ কত করে আলু কিনবি অধীর?—একমণ, দু'মণ।

পটল?—ইয়া বড় তিন ঝুড়ি পাঁচ ঝুড়ি।

মাছ?—বিয়েবাড়ির মতন।

তেল?—কুড়ি সের।

ঘী?—কুড়ি সের।

চিনি?—কুড়ি সেব।

আরও অনেক প্রশ্নমালা!...উত্তর সবই মুখস্থ। রোজই তো প্রশ্নোত্তর। নিত্য এই এক বেলা ছিল মা ছেলের।

বাবা বাড়ি এলেই চুপ। বাবা তখন এত হিংস্র ছিল না। ফর্সা জামা কাপড় পরে অফিস থেকে ফিরত...বলত, মা ছেলে তো খুব কলকলাচ্ছিলে, হঠাৎ চুপ মেরে গেলে যে? কী গল্প হচ্ছিল?

ও রূপকথার গল্প...মায়ের মুখটা তখন রূপকথার রাজকন্যার মতোই লাগত অধীরের। চাপা হাসিতে উজ্জ্বল, গোপন কৌতুকে ঝকঝকে চোখ।

সেই অলৌকিক রূপকথার ওজনে না হোক, দিন পেয়েই তো অধীর মাকে সচ্ছলতার স্বাদ দিতে চাইছে। কিন্তু মা যেন সে স্বাদ পা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। যেটুকু নিচ্ছে যেন বাঁ হাতে নিচ্ছে।

অধীর কি অভিমান করে আবার 'পুনর্মূষিকোভব' মন্ত্র পড়বে? তাই বা পড়া যায় কী করে? দরকার তো তার নিজের জীবনেও আসছে।

কাজ বেড়েছে, বেড়েই চলেছে। বাড়িতে লোক আসছে হরদম। পদস্থ, অ-পদস্থ। বিশিষ্ট অ-বিশিষ্ট। কেউ বা দালাল, কেউ বা মালিক স্বয়ং। তাদের তো ভদ্রভাবে বসতে দেবার জায়গা দরকার?

সুতরাং নিজের নামের শোবার ঘরখানাকেই বসবার ঘরে পরিণত করতে বা করবার করতে হয়।...শোবার সরু চৌকীখানাই দিনের বেলা ভালো সুজনী গায়ে চাপিয়ে ডিভান। সময়ে কেনা রেডিমেড সোফাসেটি ক'টার সঙ্গে বিশেষ বেমানান লাগে না।

জানালা দরজায় জীবনে এই প্রথম পর্দা ঝুলেছে। প্রথম পর্দা, প্রথম আব্রু। অধীর বলে, খোলা দরজাটার সামনে দিয়ে তুমি যেন যা তা পরে যাওয়া আসা কোরো না মা। বাড়িতে যে অবস্থা করে থাকো। গামছা পরার কথাটা আর তোলে না, নিজের মুখে আনতেই লজ্জা করেছে, তাই তোলেনি।

নীহার কথা রেখেছে। রাখেও। কিন্তু সব সময় বলে, বাড়িতে আপিস বসালে বাড়ির লোকের দম আটকে আসে।

মার দম আটকানো নিবারণ করতে অধীর মা ভাইদের ঘরে একটা সীলিং ফ্যান করে দিয়েছে। নীহার সে বিষয়ে উদাসীন। পাখার হাওয়া খায় না তা নয়, কিন্তু খেয়ে কী ভাবের উদয় হচ্ছে মনে সেটা বলে না। যা কিছুই করে অধীর মায়ের সুবিধার জন্য, সবই যেন ভস্মে ঘী!

এদিকে লতু তাড়া লাগাচ্ছে। বলছে, আর দেরী করলে কিন্তু বাবা আর কারুর হাতে কন্যে সম্প্রদান করে বসবে তা বলে দিচ্ছি।

শূন্য পকেট অধীরের মুখে যে জৌলুস ছিল, এখন যেন আর তা নেই। পকেট ভারী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার বয়েসটাও বড় তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে যাচ্ছে। বুড়িয়ে যাচ্ছে অধীর। লতুর প্রাণে তাই ভয় ঢুকছে। লতু একবার ও বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে।

এ যাবৎকাল বাবা হায়রে বলে নাক সিটকাত, এখন আর তা করে না। বরং মাঝে মাঝে উল্টো সন্দেহ প্রকাশ করে। ও বাড়ির গিন্নী সুদ্দুরের বেটি বলে নাক কোঁচকাবেন নাতো? হাস্যবদনে বৌ বরণ করে ঘরে তুলবেন তো?

বুড়োটাই একটা কাদাখোঁচা হয়ে রইল। বলে লতুর মা। বাহান্ন বছর বয়সের সুধীর ভট্চাযকে বুড়োই বলে। আগে থেকেই বলত। সুধীরের ওপর অনাচারে অত্যাচারে হাড় বুড়োই তো দেখাত তাকে।

আবার এও বলে লতুর নিজেকে সান্ত্বনা দিত। তবু তো শাশুড়ী শাড়ি পরে বেড়াচ্ছে। বৌ বরণ করে ঘরে তুলতে পারবে। হঠাৎ কোনখান থেকে একটা বিচ্ছিরি খবর এসে পড়ে সব কিছু না ভণ্ডুল করে দেয়।

তা সে রকম কোন খবর এসে পড়ে না। সুধীর ভট্চায যে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হবে এ আশঙ্কা, বা এ আশা আর থাকছে না কারো। প্রথম দিকে আশঙ্কাই ছিল, ক্রমশ আশার সময়ের র‍্যাদার ঘষা খেয়ে খেয়ে লোকটা সম্পর্কে আর সবাইয়ের এবড়ো-খেবড়ো কর্কশ অনুভূতিগুলো আস্তে আস্তে পালিশ হয়ে যাচ্ছে। মনের ঘেন্নায় লোকটা যদি গঙ্গায় ঝাঁপ না দিয়ে থাকে তো সন্নিসী হয়ে গেছে,এই ধারণাই ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে আসছে লোকের।

মা বারণ করলেও বিজ্ঞাপন কিছুদিন দিয়েছিল বৈকি অধীর।...মামার নাম দিয়ে নীহার মৃত্যুশয্যায়

শেষ দেখা দেখে যাবার অনুরোধ জানিয়ে।...তারপর মনে হয়েছে যখন দেখা যাচ্ছে সুধীর ভট্‌চাযের মধ্যেও মান অভিমান বস্তুটা ছিল, তখন তার সম্মান রাখাই দরকার। সঙ্কেতে নিজের গর্হিত আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বাপকে অনুরোধ জানিয়েছিল ফিরে আসবার জন্যে।

কিন্তু অনুতপ্ত পুত্রের সে আবেদনও তো কর্ণপাত করেনি সেই বিতাড়িত ব্যক্তি। যখন বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তখন মার নিষেধ অগ্রাহ্য করার অপরাধে মা পাছে রাগ করে, এই ভয়ে মাকে জানায়নি। (বেচারী অধীর! কী বোকাই ছিল!) তবু মা কি আর সত্যি জানেনি? কাগজে ছাপা অক্ষর, কেউ কি আর মাকে বলে যায়নি? মা যে পড়তে না জানে তা নয়, গল্পের বই তো পেলেই গেলে। সিনেমা পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করে আনে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে, কিন্তু খবরের কাগজের দিক দিয়ে যায় না। তাহলেও জেনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাঙে না সে-কথা। অনায়াসে বাতাসকে শুনিয়ে বলে, কুকুর বেড়ালটাকেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে লোকে ফিরে উল্টে দেখে—তাইতো, গেল কোথায়! এ সংসারে সেটুকু মনুষ্যত্বও নেই।

আবার বলে, ওই হতভাগা পায়ের বেড়ি দুটোর জন্যেই তো হয়েছে যত জ্বালা। বেঁধে মার খাওয়া আর সহ্য হয় না। কে যে মারছে সেটা অবশ্য বলে না। ভগবান না মানুষ।

লতুর বাবা এসে প্রস্তাব করে যাওয়ার পর থেকেই এই উচ্চস্বর স্বগতোক্তি বেড়েছে। ডাঁটুস বিজন সরকার অনেকটাই নম্র হয়ে এসে বলেছিল—অধীর তো অনেকদিন থেকেই—মানে দুজনেই তো এক রকম মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, এখন আপনি অনুমতি করলেই—

নীহার রস নিংড়ে নেওয়া আখের গলায় বলল, সবই যখন ঠিক হয়ে আছে, তখন আর আমার অনুমতির কথা কেন? বলতে যাচ্ছিল ধাষ্টামো কেন? সেটা সামলে নিল।

ঘুঘু বিজন সরকার বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, সে ঠিক তো খেলাঘরের পুতুলের বিয়ের ঠিক, আপনি দিনস্থির করে না দিলে তো হতেই পারে না।

নীহার দেখল ধারে কাছে ছেলে নেই! বাইরের পুরুষের সঙ্গে বেরিয়েছে বলে একটা চাদর গায়ে দিয়েছে সেটাকে সাপটে টান টান করে জড়িয়ে নিয়ে উত্তর দেয় নীহার, মনস্থির না করতেই দিনস্থির?

সে কি! সে কি! সেটা কী একটা কথা নাকি? বিজন যেন আকাশ থেকে পড়েছে—মনস্থির করতে না পারলে তো—তবে কথা হচ্ছে—

বিজন দুঃখে অভিভূত হয়ে যায়, করুণায় বিগলিত। কথা হচ্ছে আপনার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ যে ঝড় বইছে তাতে কি আর মনস্থির হওয়া সম্ভব? মানুষের বাইরে থেকে তো ভেতর বোঝা যায় না, কিন্তু চোখ থাকলে বোঝা যায়। বুঝছি সবই। বাজ পড়া তাল গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন বৈ তো নয়। তবু মায়ের কর্তব্য করে যেতেও হবে। ছেলে যাতে সুখী হবে, মায়ের তাতেই সুখ। কী বলেন? তাই কিনা?

বিজন একটু থামে, দেখে ওষুধ ধরছে কিনা। মনে হচ্ছে যেন ধরছে।

সত্যি, নীহারকে কে কবে এত ভালো ভালো কথা শুনিয়েছে? বাইরের একজন পুরুষ! তবে নীহার সহজে ভাঙে না, আস্তে বলে, সে তো ঠিক!

সে তো ঠিক। আশাপ্রদ। কিন্তু এটা বিয়ের অনুভূতি নয়। দিনস্থিরও নয়। আরো খেলাতে হবে। লতুর মা অবশ্য বলেছিল বামনী বলে তো অহঙ্কার! সেই সুধীর বামনার বামনী তো? তার পায়ে নাক ঘসটাতে যাবার দরকার কী? ছেলে যখন তোমার হাতের মুঠোয়, তখন সেই বামনীর নাকে ঝামা ঘসে কাজ চালিয়ে যাও।

কিন্তু বিচক্ষণ বিজন সরকার তাতে রাজী হয়নি। ছেলে যে সত্যিই তার হাতের মুঠোয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বিজনের। আজকাল যেন কেমন একবগ্‌গা লাগে ছেলেটাকে। আগে মনমরা মনমরা লাগত, এখন ভাব বদলে গেছে। হতেই পারে, বাপটার জন্যে শান্তি নেই।... একদিন তো বলেই ফেলেছিল, আর কিছুদিন যাক না।

তার মানে এখনো আশা করছে বাপ ফিরে আসতে পারে।...ফিরে আর এসেছে! হুঃ। মাতাল গেঁজেল

লোক মনের দুঃখে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে, কি কোথায় গিয়ে রেললাইনে মাথা দিয়েছে, কে জানে। বেঁচে থাকলে এত দিনে আর ফিরত না? পেটের জ্বালাতেই ফিরত। রোজগারের তো মুরোদ নেই।

কিন্তু এ সব সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। বলতেই হয়েছে, দেখা তো উচিত।

নিশ্চয় উচিত। তবে কি জানো বাপু, আমার হল গিয়ে কন্যাদায়। কবে আছি কবে নেই কে বলতে পারে? চার হাত এক হয়ে গেলে নিশ্বাসটা নিয়ে বাঁচি। ভট্চায মশাই বৈরাগ্যের পথে চলে গেছেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বরং তীর্থ-স্থানে-টানে খোঁজ করলে হয়। তবে বিয়েটা টাঙিয়ে রেখে নয়।

নীহারের মুখের কাঠিন্য যেন একটু কমে আসছে। এই বিজন সরকার। পাড়ায় যার অবস্থাপন্ন বলে নামডাক। কণ্ট্রাক্টটেরীর ব্যবসা। মাঝে মাঝে লাল হয়ে যায়। তবে বড়লোকী কায়দায় থাকে না—এই যা। কিন্তু সেই লোক তো? সে নীহারের বাড়ি বয়ে এসে খোসামোদ করছে! মেয়ে এ বাড়ি পড়লে, বরাবরই করবে।

বিজন এবার আলগা ঝোপে কোপ মারে। এই সময় বলে ওঠে, তবে এইটি আপনি জেনে রাখুন, আপনি যদি একবার 'না' করেন, তবে আমার সাধ্য হবে না আপনার ছেলেকে রাজী করাতে। অধীর যে কী মাতৃভক্ত সন্তান জানেন না আপনি।

নীহার মনে মনে বলে, মরণদশা! আমি জানি না তুই জানিস। মেয়ে পার করার তালে কত কারসাজি। হয়কে নয়, নয়কে হয়। যা দেখছি বিয়েটা ঘটবেই মাঝখান থেকে আমি কেন আপত্তি করে খেলো হই? বৌ এসে সর্বেসর্বা হবে, এ তো দিব্যচক্ষেই দেখছি। তবু মেনেই নিতে হবে। জোয়ান ছেলে বিয়ে না দিলে আর কী করবে বলা শক্ত। ওই বাপের তো ছেলে।

নীহার অতএব উদারতা দেখায়, ঠিক আছে। আপনি যা বলছেন তাই হবে।

চতুর বিজন সরকার মাথা নাড়ে, উঁহু, এতে চলবে না। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

নীহার লোকটার ঘুঘুমি দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেও একটু হাসির ভাব দেখিয়ে বলে, বেশ আমিই বলছি পাঁজি দেখান।

ব্যস ব্যস। বিজন সরকার নীহারের পায়ের কাছের একটু ধুলোয় হাত ঠেকিয়ে মাথায় ঠেকায়।

নীহার আর একটু রাশ চাপে, আসলে কী জানেন সরকার মশাই, এ বংশে তো আজ পর্যন্ত বামুনের ঘরে ছাড়া কোন কাজ হয়নি, তাই মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করছিল।

বিজন সরকারের মুখে আসছিল—আহা ইস! তবু যদি না সেই বামুন-ঠাকুরকে বস্তিব ঝিয়ের ঘরে বসে মুড়ি বেগুনী খেতে দেখতাম!...সেই পরম কুলিনটি বিদেয় হয়েছেন, লোকে ভুলে-টুলে গেছে বলেই এ ঘরে মেয়ে দিতে সাধছি। কিন্তু মুখে আসা কথা যারা সামলাতে জানে বিজন তাদের একজন।...

এত ঝুট ঝামেলার মধ্যে কে আসতে চাইত, যদি মেয়ে অধীরদা বলে আঁধার না হত! একটা মাত্তর মেয়ে, তাকে জবরদস্তি করে দুঃখী বানিয়ে লাভ নেই। বিজন সরকারে এই সাধ্য সাধনা তো থিয়েটার। সেই থিয়েটারই চালিয়ে যায়, সে তো নিশ্চয়। একশোবার। খুঁৎ খুঁৎ তো করবেই। আমারই কি করছে না? তবে কি জানেন, আজকাল তো ঘরে ঘরেই এই। তাই মনকে মানিয়ে নেওয়া। আচ্ছা, তাহলে দিন দেখাইগে।

চলেই যাচ্ছিল। এই সময় নীহার একটা বোকার মতো কথা বলে বসল। বলল, তা মেয়ে জামাইকে কী দিচ্ছেন-টিচ্ছেন?

এই সময় ছেলে বাড়ি নেই বলে নিতে পারা গেল।

কথাটা শুনে কিন্তু চমকাল না সরকার, নীহারের মুখের রেখায় এ প্রশ্ন ছায়া ফেলে ফেলে যাচ্ছিল, তা সে দেখে বুঝছিল। বরং প্রশ্নটা অনুক্ত থেকে গেল দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল। এখন বলল, আপনি বলুন?

আমি আর কী বলব? আপনার মেয়ে-জামাই। আপনি মানী লোক—

না না, মানী-টানী কিছু না, তবে জানেনই তো আমার সবেধন ওই একটা মাত্তরই মেয়ে, আমার সাধ্যমত গহনা কাপড় খাট-বিছানা আলমারি বাসন-পত্র ঢেলে মেপেই দেব।...তাছাড়া আমার ঘরবাড়ি

লতুর মায়ের সাজানো সংসার সবই তো আপনার ছেলে- বৌয়েরই থাকবে। আমরা দুটো বুড়োবুড়ি আর ক'দিন? তবে আপনি যদি আরও কিছু বলেন আদেশ করুন।

না না, আর কিছু না। এমনি কথার কথা বলেছি। নীহার একটু উদাস গলায় বলে, আমার আর কিসের কী? ওরা সুখী হলেই হল।

বিজন সরকার বলে, বাঃ, তা বললে হবে কেন? আপনার আর একটি ছেলে নেই? কালে ভবিষ্যতে বিয়ে দিতে মেয়ে নেই?... আপনার যা দরকার জানাবেন।

বিজন সরকার চলে যায়। লঙ্কাবিজয়ী বিজয় সিংহের মতো বীরদর্পে।

সেই অবধি বুকের মধ্যে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে নীহারের। ভাবী-বৌটা যে বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে, তা জানা ছিল না। তার যথাসর্বস্ব ভবিষ্যতে নীহারের ছেলে-বৌয়ের হবে, এতে কোন সান্ত্বনা নেই নীহারের।...কার যে হবে তা আর জানতে বাকি নেই নীহারের। দেখছে না পৃথিবীকে?

আর সব তো ছার, ছেলেটাও যে আর নীহারের থাকবে না, বৌমার বর হয়ে যাবে, তা জানে নীহার। তাই ভেবেই প্রাণের মধ্যে হু হু করে উঠেছে।

এই তো এখন যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখাক নীহার ছেলেকে, ছেলে তো চোদ্দবার মায়ের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে—চূণ চূণ মুখ দিয়ে। মায়ের একটু মন রাখবার জন্যে আকুলি বিকুলি করছে, এরপর আর করবে তা? আর এসে দাঁড়াবে কাছে?

দোরের কাছে বড়লোক শ্বশুরের বাড়ি, সেইখানেই গিয়ে বসে থাকবে শ্বশুরের মেয়েটিকে নিয়ে। মনোরঞ্জন যা করবার তারাই করবে। একেই তো যুগের ধর্ম, তায় আবার ভাবের বিয়ে। তার মানে মুগুর খাওয়া কপালে নীহারের নতুন মুগুর পড়তে চলেছে।

ভয়ানক আক্রোশ আসে। ভয়ানক রাগ। ছেলের উদ্দেশ্যে যা মুখে আসে তাই গাল দিতে ইচ্ছে করে। বেহায়া স্বার্থপর ধর্মখেগো ছেলে! ধাপকে গলা ধরে বিদেয় করে দিয়ে এখন সুখের সংসার পাততে বসছ নিজে? বাপ দুটো পয়সার জন্যে ভিখিরির মতন দোরে দোরে ঘুরছে, আর তুমি চোখের চামড়াখোর ছেলে, লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমিয়েছ পরে লপচপানি করবে বলে। ধর্মে সইবে?

বুকের মধ্যে রাবণের চিতা। বাতাসে তার দাহ ছড়ায়। বাতাসকে উদ্দেশ্য করে কথা।

কিন্তু নীহারেরই বা দোষ কী? মাতাল হোক গেঁজেল হোক নীচ নোংরা যা-ই হোক সেই লোকটাই তো নীহারের পায়ের তলার মাটি। নীহারের সামাজিক পরিচয়ের মলাট। নীহারের জীবন আস্বাদনের স্বাদের স্নায়ু।...সেই দুঃস্বপ্নের মতো লোকটা বিহনে নীহারের দিনরাত্রির সব কিছুই অর্থহীন। রান্না খাওয়া ছেলে মেয়ের পাতে ভাত বেড়ে ধরে দেওয়া সবই অর্থহীন।

অধীর যদি আগের মতো গরীব থাকত, তাহলে হয়তো এতটা জ্বালার সৃষ্টি হত না। এই প্রাচুর্যের জ্বালা অভাবের থেকেও মর্মান্তিক। সামান্যর জন্য কত দুর্বাক্য বলেছে তাকে ভেবে নিদারুণ জ্বালা। সামান্য একখানা দশটাকার নোটের জন্যে মানুষটাকে জন্মের শোধ হারাতে হল, সে কী দুরন্ত জ্বালা। এখন তো সামান্যই মনে হয় দশটাকাকে।

অহরহ ওই জ্বালার ওপর এলো ছেলের ভালোবাসার বিয়ের জ্বালা। যে বিয়েয় নিজের মাতৃমহিমা প্রকাশের কোন পথ নেই, সে বিয়ে জ্বালা ছাড়া আর কী? তাও যদি গরীব গেরস্ত ঘরের পাঁচটা মেয়ের একটা হত। এ একেবারে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডা। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। ওদের সমারোহময় দাম্পত্য জীবনের অভাগিনী দর্শক– এই পরিচয় নীহারের। নীহারের যদি অহরহ মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হয়, দোষ দেওয়া যায় না।

লতুর মুখে আহ্লাদ উদ্ভাসিত—তুমি এমন ভাব করছিলে যেন তোমার মার মত পাওয়া খুব শক্ত হবে। বাবা গেল আর মত আদায় করে ফিরে এলো।

আদায়! এইটুকু বলে অধীর।

আহা ওই হল, না হয় পাওয়া। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া শক্ত। পান থেকে চূণ খসবার জো নেই।

যাক—এখন লেগে পড়। তোমার তো আর করবার কেউ নেই। মামা মেসো তো কেবল সমালোচনা করতেই ওস্তাদ। নিজের ঘাড়েই সব। নিজেই বর নিজেই বরকর্তা।

নিজেই বরকর্তা! বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে অধীরের। সারা শরীরের মধ্যে একটা তোলপাড় ওঠে।...আর সেই তোলপাড়ের মধ্যে নিত্য দেখা একটা ছেঁড়া লুঙ্গি পরা, গিঁট-বাঁধা ময়লা পৈতে গলায় লোককে হঠাৎ যেন ফর্সা ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী পরে পাট করা চাদর কাঁধে ফেলে গর্বিত ভঙ্গীতে কোন টোপর পরা বরের আগে আগে একটা ফুল সাজানো মটর গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে।...ওই লোকের মুখের চেহারাটিও তার চলার ভঙ্গীর সঙ্গে দিব্যি মানানসই।

তোলপাড়টা থামতে চায় না যেন। ওই মুখটা কি সত্যিই পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে?...গেছেই এইটা ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারার মতো করে কে খুঁজে দেখেছে পৃথিবীটাকে?

কী হল? অমন চুপ মেরে গেলে যে? লতু ঠোঁট ফোলায়।

তার ওই কৌতুক উচ্ছ্বসিত কথাটায় যে কারুর মনের মধ্যে আলোড়ন উঠতে পারে, এমন অবিশ্বাস্য কথা ভাবে না লতু।..শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে একখানা ফুল সাজানো গাড়ি থেকে লতু একটা মানুষকেই নামতে দেখে তাদের আলোয় মোড়া বাড়ির দরজার সামনে। মাথায় টোপর কপালে চন্দনলেখা গলায় ফুলের মালা। চির পবিচিতকে সেই আকাঙ্ক্ষিত অপরিচিতের মূর্তিতে দেখবার উদ্বেল আবেগের মধ্যে সেই গাড়ি থেকে ফাল্‌তু আর কেউ নামল কি না নামল ভাবতে খেয়ালও আসে না লতুর। বলে, কী এমন বললাম যে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে?

অধীর বলে, না কিছু না। মাথাটা কেমন ধরে রয়েছে। কিন্তু সত্যি তো—বর নিজেই বরকর্তা হবে? তাই পারে না কি? ধ্যেৎ!...প্রতিকারের চেষ্টার দরকার।

কিন্তু সেই প্রতিকারের চেষ্টাটা করা যাবে কোন্ পথ দিয়ে? খবরের কাগজের নিরুদ্দেশ কলমের রাজরাস্তা যখন কাজে দেয়নি তখন নোংরা পচা সরু গলির পথ ধরেই আর কোথায়? যেখানে মুখে মুখে খবরের লেনদেন।...সেই ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি পরা লোকটা যেখানে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বসে থাকত।...

মুড়িওয়ালী কেষ্টুর মা বলে, সে তো আজ দু-তিন বছরের কথা দাদাবাবু। আর তো দেখি না তেনাকে।...তবে হ্যাঁ, নিত্যি নে যেতো বটে ত্যাখন মুড়ি ফুলুরি ছোলা সেদ্ধ! নে যেতো আর হেসে হেসে বলত, এ জন্মে আর তোর সব ধার শোধ হবেনি কেষ্টুর মা, আসচে জন্মে হবে।

অনুসন্ধানকারী চমকে ওঠে। মুখটা লাল হয়ে ওঠে তার। গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, কত ধার আছে তোমার কাছে?

কেষ্টর মা জিভ কাটে, ও মা, অমন কতা বলুনি। বামুন মানুষ খেয়েছেলো খেয়েছেলো, তার জন্যে আমি দোষ ধরি নাই।

দোষ ধরার কথা নয়, ধারটা শোধ করা দরকার।

কেষ্টর মা শঙ্কিত গলায় বলে, মারা গ্যাচে বুঝি? তা সে কি আর আমার হিসেব আছে? হবে দশ-বারো টাকা।...কে হও? ছেলে নাকি?

উত্তর দেবার দায়িত্ব নেয় না লোকটা, প্যান্টের পকেট থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বের করে কেষ্টর মার মুড়ি ঢালা চটের ওপর ফেলে দিয়ে চলে যায়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে নোট দুখানা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে মুড়িওলি কেষ্টর মা আপন মনে বলে, ব্যাটা ছাড়া আর কে হবে? পিত্রিঋণ শুদবার দায়ে ঘুরতেচে। মুকের আদলে বামুনদাদার আদল আছে।

পানের দোকানের শশী বলল, কথা তো অনেক দিনের বাবু। অনেকজনকে জিগেস করেছি, কেউ বলতে পারে না। বলে, নেশা খোরের খেয়াল। কে জানে কিসের খেয়ালে নিরুদ্দিশ হয়ে গ্যালো। ওই খাল পাড়ে যে একটা রাং ঝালাইয়ের দোকান আছে, ফুটো ঘটি বাটি বদনা গাড়ু সারাই করে, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। ওইখানে খুব দহরম-মহরম ছিল।

তোমার কাছে কোন ধার-টার ছিল সেই লোকের?

ধার? শশী চকিত হয়। ব্যাপার কী? পুলিশ এনকোয়ারি নয় তো? ধারে পানটা বিড়িটা খেয়েছে অবিশ্যি, সে কথা কবুল না করাই ভালো। কে জানে বাবা কী থেকে কী হয়? বলে, না বাবু, আমার সঙ্গে তেমন কিছু ছিল না। মাঝে মধ্যে বিড়িটা পানটা নিত এই পর্যন্ত।

রাং ঝালাইয়ের দোকানের ছেলেটা বলল, দু-তিন বছর আগে? ত্যাখন আমার কাকা বসত দোকানে?

কাকা নেই?

আছে। তবে না থাকাই। হাঁপানি, ঘরে বসে থাকে।

ঘরটা কোথায়?

এই তো দোকানের পেচনে।

আমায় নিয়ে যেতে পারবে?

দোকান ছেড়ে যাব কেমন করে? সাফ জবাব।

অনেক তুতিয়ে-বাতিয়ে একবার ওঠাতে রাজী করানো গেল ছেলেটিকে। একটু এগিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলল, ওই যে, সামনের চালাটা। কেশব বলে ডাক দিলেই হবে।

ডেকে পাওয়া গেল কেশবকে। কিন্তু কেশবের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ।—এতদিন পরে, কী ব্যাপার বলেন তো?

ব্যাপার কিছু না। সেই অবধিই খোঁজ চলছে। একজন বলল, এইখানে খবর পাওয়া যেতে পারে।

কেশব চোখ তুলে বলল, পুলিশের লোক?

না না, কী মুশকিল, সে সব কিছু না। আসলে সেই লোকের বাজারে কিছু ধার-টার ছিল, তাই খোঁজ নিচ্ছি।

ধার ছিল তাই এতকাল পরে খোঁজ নিতে এসেছেন!...তাজ্জব তো! বাড়ির লোক? তা তিনি মাবা গেছেন বুঝি?

অনুসন্ধানকাবী মৃদু উত্তর দেয়, তাও জানি না।

তা হক্ কথা বলব বাবু ধার আমার কাছে নেই কিছু। বরং এখেনে বসে নেশাটা আসটা করত বলে আমাকেই খাওয়াত।...ধার আছে বাবুলের দোকানে—গলা নামায়, বলে, আপনি সেখেনে যেতে পারবেন না ববং লোকটাকে ডাকিয়ে আনাই। কিছু যদি মনে না করেন, একটা পাঁইট-এর দাম দিলে লোক পাঠানোর ছুতো হয়।

খালপাড়ের এই জায়গাটা যেমন কাদা তেমনি এবড়ো-খেবড়ো। রাং ঝালাই কেশবের বাসাটা পর্যন্ত যদি বা একটু রাস্তা টমতো আছে, তারপর শুধু খানিক জল থই থই আর পাঁকের 'হদ্'! এক কথায় নরককুণ্ড।

এখন পড়ন্ত বেলা, একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। বেলাবেলি এখান থেকে ফিরতে পারলে হয়।

টাকা বাব করে দিয়ে দেশী মদওয়ালা বাবুলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা চারিদিকে তাকিয়ে একটু দার্শনিক হাসি হাসে। আমি অধীর ভট্চায, ভদ্রলোকের খাতাতেই নাম আছে, দু'দিন বাদে আমার বিয়ে, আব আমি এই নরককুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক বোতল ধেনোমদের প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু প্রতীক্ষাব শেষে বড আশার বাণী শোনা গেল। বাবুলের কাছে ধার ছিল ভালোই। বাবুল ভেবেছিল চারিদিকে দেনা করে মরে লোকটা গা ঢাকা দিয়েছে, ও আর উদ্ধার হবে না।...কিন্তু হঠাৎ একদিন জগদ্দল না কোথা থেকে দশটাকা মনিঅর্ডার এলো বাবুলের নামে, প্রেরক সুধীর ভট্চায! সেই থেকে আরো দু'বার দিয়েছে পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা করে। কুপনে লিখেছে আরো পাঠাচ্ছি। ঋণী হয়ে মরতে ইচ্ছে নেই।...

সেই কুপন আছে?

শেষ টাকা পাঠানোর রসিদটা এনে দেখায় বাবুল। বাকি সব ধার শোধের বিনিময়ে। ঠিকানাও সাপ্লাই করল বাবুল।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। আকাশে অনেক নক্ষত্র। লোকালয়ে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নেয় অধীর। বাড়ি

ফেরার পথে গাড়ির গদিতে পিঠ ঠেসিয়ে বসে ভাবতে থাকে, ঠিক জায়গায় খুঁজতে জানি না বলেই আমরা অনেক কিছুই সময় খুঁজে পাই না।

আবার ভাবল, অথবা সময়টাই আসল। সে না এলে কিছুই হয় না। তিন বছর আগে আমি কি কখনও ভাবতে পেরেছিলাম এই নরককুণ্ডে আমাকে আসতে হবে আমার জীবনের পরম দুর্গ্রহকে খুঁজতে। সময় আমাদের পিটিয়ে পিটিয়ে ভিন্ন গড়ন দেয়।

তা হয়তো সময় সবাইকেই দেয় ভিন্ন গড়ন। নইলে সুখস্বর্গের দরজা অবধি খোলা পেয়েও সুধীর ভট্‌চাযের মতো চিরদিনের লোভী হ্যাংলা লোকটা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে? বলতে পারে—তুই যে আমায় নিয়ে যেতে চাইলি এই আমার যাওয়া হল খোকা।...এই আমার স্বর্গ হাতে পাওয়া। কিন্তু ভেবে দেখছি ভবানীপুরের নীহারকণা দেবীর সংসারে চটকলের কুলি এই পৈতে ফেলা ঘনশ্যাম দাসকে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যাবে না।...এ এক রকম বেশ আছি। যেমন আমার চরিত্তির তেমনিই জীবন। কলের ভোঁ বাজলেই কারখানায় ছুটি, আবার ভোঁ বাজলে ফিরি।...একটা কামিনমাগী ভাত জল করে ঘর সংসার দেখে, চলে যাচ্ছে এক রকম। আমি গেলেই তোদের সাজানো সংসার আবার তচনচ বৈতো নয়।

বাবা, এখন আর সংসারে তেমন অভাব নেই।

জানি, খবর পাই, কিন্তু সুধীর ভট্‌চায যা কেলেঙ্কারি কবত তাব সবটাই তো অভাবে নয় বাবা, করত স্বভাবে। তা স্বভাবের স্বভাব তো জানিস? কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে। তুই এলি আমায় আবার বাবা বলে ডাকলি, এতেই আমি বর্তে গেলাম।

আবার ফিরছে অধীর। রেলগাড়ির কামরায়। বাবা বলেছিল, তোকে কিছু খাওয়াতে পারলাম না এ দুঃখু মলেও যাবে না। কিন্তু এই নরকে তোকে খাওয়াবার চেষ্টা করব না। জীবনটা তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় বাবা, নিজেকে সর্বদাই অশুদ্ধ মনে হয়।

অধীরের বুক-পকেটে দুখানা একশো টাকার নোট। সুধীর ভট্‌চায তার শীর্ণ আঙুল ক'টা দিয়ে সেটা অনেকক্ষণ ধরে থেকে আবার ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। চোখের জলটা সামলাতে সময় লেগেছিল বলেই একটু পরে বলেছিল, এ আমার টাকা নয় রে খোকা, ভগবানের আশীর্বাদ। মাথায় করে নিলাম। এখন এটা আমার ছেলের বৌয়ের জন্যে নিয়ে যা, শ্বশুরের আশীর্বাদ বলে।

আমার টাকা তাহলে তুমি নেবে না বাবা?

ও কথা বলিস না খোকা, কখন কী হয় কে বলতে পারে? তবে এখন আর লোভের ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর তুই দিলেই কি আমার ভোগে লাগবে? ওই হারামজাদি মাগী হাত মুচড়ে কেড়ে নেবে।...দেখ না, ওখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

অধীর চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল, অদূরে একটি মাঝবয়সী মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। মুখে বসন্তের দাগ, কপালে চকচকে টিপ। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অধীর।

তবু অধীর মনে মনে খসড়া করছে, গিয়ে মাকে কী বলবে। হ্যাঁ, ঠিক করে নিয়েছে, বলবে, মা, তোমার ধারণাই ঠিক জানতে পারলাম, বৈরাগ্যের পথেই চলে গেছে বাবা। বিয়েটা এখন স্থগিত থাক, চল, তোমায় নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে দেখি একটু, এখন চলে যাওয়াই ভালো।

মা যেন খবর না পেয়ে কোথা থেকে জানতে পারল অধীর।... শুধু একটা কথা মনে যন্ত্রণার পিন ফোটাচ্ছে। আসবার ঠিক আগেই মিথ্যা কথা বলে এসেছে বাপের কাছে। একেবারে চলে আসবার সময় বাবা কেমন একটা ছেলেমানুষী হাসি হেসে বলে উঠেছিল, হ্যাঁ রে, তোমার মার রাগটা পড়েছে?

অধীর বলে উঠতে পারেনি, মা তোমার জন্যে মরে যাচ্ছে বাবা। অধীর বলেছিল, মার কথা বোঝা যায় না।

বাবার আশা আশা মুখটা নিভে গিয়েছিল। বলেছিল, ওই তো, ওই তো দুঃখু! কোন দিন বুঝতে পারলাম না মানুষটাকে।

কিন্তু কেন যে অধীর আসল কথাটা না বলে অন্য একটা কথা বলে এলো, তা নিজেই জানে না।

একই ছাদের নীচে

ঢং!

দেওয়াল ঘড়িটা মৃদুগম্ভীর আওয়াজে একটি ঘণ্টাধ্বনি দিলো!...শব্দের এই মৃদু গাম্ভীর্য ঘড়িটার প্রবীণত্বের পরিচায়ক। সেকেলে পুরনো দেওয়াল ঘড়িগুলোই এ রকম আত্মস্থ গৃহকর্তার ভঙ্গীতে ঘণ্টা ধ্বনি দেয় যেন সংসার সদস্যদের সময় সম্পর্কে সচেতন করে দিতে।

আগে সাধারণ একখানা দেওয়াল ঘড়ি প্রায় সব বাড়িতে থাকতো, সাধারণ গেরস্থ বাড়িতেও। আজকাল সাধারণ গেরস্থ বাড়ির দেওয়ালে, একখানা বড়সড় ঘড়ি ঝুলছে এমন দৃশ্য প্রায় দুর্লভ। যাদের আছে তাদের আছে। অর্থাৎ যারা সাবেক কালের এই প্রাণীটাকে চেষ্টা যত্ন করে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। যেমন—সুধামাধবের বাড়িতে।...ঘড়ির সাদা জমিটা পুরনো খবরের কাগজের মত ঘোলাটে ময়লা ঝাপসা হয়ে গেছে, পিতলের কাঁটা দুটো স্রেফ লোহার মত, তবু কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আজকাল আর এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার চালটাকে কেউ তেমন শ্রদ্ধাসমীহ করে না, নাই বাতিলরা অপসারিত হয়ে হয়তো জঞ্জালের স্তূপে ঠাঁই নেয়, নয় তো শিশি বোতলগুলোর ঝুলিতে চড়ে বিদায় নেয়। নতুন করে ধ্বনিময় একটা দেওয়াল ঘড়ি বড় একটা কেউ কেনে না। অন্ততঃ সাধারণ গেরস্থরা। কারণটা হয়তো তার আকাশছোঁয়া দাম। ঘড়ির দাম তো ঘোড়ার মত ছুটে ছুটে সেকাল থেকে একালে এসে পৌঁচেছে। তাছাড়া সত্যি, জিনিসটা তেমন কাজেও লাগে না আর আজকাল। মেয়েমানুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলেরই হাতে হাতে নিজস্ব একটা করে বাঁধা থাকে। বাড়ির সিঁড়ির সামনে দালানের উঁচু দেওয়ালে টাঙানো একটা মাত্র ঘড়ি দেখে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করবার দুঃখজনক অবস্থায় কেউ আর আজ থাকতে চায় না।

সুধামাধবের বাড়িতেও তাই।

তবু সুধামাধবের বাবা ব্রজমাধবের কেনা এই বড় ঘড়িটা এখনো বাজে। নির্ভুল নিয়মে আত্মস্থ গৃহকর্তার ভঙ্গীতে মৃদু গাম্ভীর্যে। তার সেই ঘণ্টা ধ্বনিতে বাড়ির আর কেউ কান না দিক, সুধামাধব দেন। আর যখনি ওর আওয়াজটা কানে আসে, বাবার সেই কথাটা মনে পড়ে যায়। ব্রজমাধব এই ঘড়িটাকে বলতেন 'সময়ের প্রহরী'।

সুধামাধব ভাবতেন বাবা বেশ শব্দগুলো কথার মধ্যে বসান। সময়ের সেই প্রহরীর ওই একটি মাত্র ধ্বনি শুনেই বিছানায় উঠে বসলেন সুধামাধব।

এই একটা শব্দ 'বারোটা বেজে যাওয়া' দিন রাত্রির আবার নবোদ্যমের সূচনা নয়। এটা অর্দ্ধমাত্রিক স্মারক। আধ ঘণ্টা সময় আগে ঘড়িটা যে চারবার ঘণ্টা বাজিয়েছিল ঘুমন্ত সংসারটার চেতনায় ঘা দেবার বৃথা চেষ্টায়, সেটা 'অজানা ঘুম' সুধামাধবও শুনতে পান নি, এটা পেলেন, এবং অনুভব করলেন, এটা ভোর সাড়ে চারটে।

আষাঢ় মাসের আকাশ এখনি দিনের ধাক্কায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে।

সুধামাধবও উঠে পডলেন।

নীলিমার মত ঘুম ভেঙে উঠে বহুক্ষণ বিছানায় বসে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে স্মরণ করবার অভ্যাস সুধামাধবের নেই, তিনি বিছানা থেকে উঠে পড়েই খাটের তলায় রাখা রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে আস্তে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

দালানের সামনের দেওয়ালে পাশাপাশি যে দু'খানি ছবি ঝোলানো আছে, একবার তাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রণাম করে নিয়ে দালানের অন্য একটা দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো সিঁড়ির চাবিটা পেড়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ছবি দু'খানা সুধামাধবের মা মনোরমা দেবীকে আর বাবা ব্রজমাধবের। দুজনে একত্রে ছবি তোলার সুযোগ আর ঘটে ওঠেনি ওদের জীবনে, তাই পরে সুধামাধব দু'খানা ছবিকে নিবিড় সান্নিধ্যে পাশাপাশি টাঙিয়ে রেখে হয়তো মৃত আত্মাদের সান্ত্বনা, এবং আপন আত্মার শান্তিবিধান করেছেন।

সুধামাধবের শোবার ঘর থেকে বেরোতেই সামনেই পড়েন ওঁরা। দেবদ্বিজে ভক্তিমতী নীলিমা একবার ওই দেওয়ালেই ফটো দুখানার মাথার উপর একটা ছোট ব্র্যাকেট বসিয়ে তার উপর একখানি মাটির কালীমূর্তি স্থাপন করেছিলেন, যাতে ঘুম ভেঙে উঠেই দেবী দর্শন হয়, দিন ভাল যায়। কিন্তু স্বল্পভাষী সুধামাধব বলেছিলেন, বাড়িতে তো আরো অনেক দেওয়াল আছে। নীলিমার মুখের দিকে আর তাকাননি।

বাড়ির সেই অনেক দেওয়ালের একটা দেওয়ালের পেরেক থেকে চাবিটা নিয়ে—সিঁড়ির মুখের কোলাপসিবলের গেটটা খুলে, দুদিকে একটা ঠেলে একটা মানুষ যাতায়াতের মত ফাঁক বার করে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন।

রবারের চটি, তাই বাবার সুঁড়তোলা বিদ্যেসাগরী চটির মত অথবা ঠাকুর্দার খড়মের মত সিঁড়ি নামা ওঠার চটাস চটাস খটাস খটাস আওয়াজ হয় না। ওঁরা হয়তো ভাবতেন গৃহকর্তার পদধ্বনির একটু জানান থাকা ভালো, সংসারের অধস্তন সদস্যারা অবহিত হতে সময় পায়। সুধামাধবের সে ভাবনা নেই, কারণ ওই অবহিত হয়ে ওঠার প্রশ্নটাই নেই। অতএব রবারের চটিটাকেও আস্তে আস্তে চেপে চেপে নিঃশব্দে নেমে আসেন।

সিঁড়ির তলার পাশেই ক্ষুদে একটা 'ঘরের মতন'এ লালটু শুয়ে থাকে, ওর ওই ঘটা একেবারে সদর দরজার গায়েই। ভোরবেলা বাসনমাজা মহিলাটিকে দরজা খুলে দেবার দায়িত্ব তার। কিন্তু দায়িত্ব থাকলেই যে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই?

অতএব আগে প্রায়ই মহিলা কড়া নেড়ে ফিরে যেতেন, এবং পরে ডাকতে গেলে মুখ নাড়া দিয়ে বলতেন, কার এতো সময় সস্তা, যে চৌপর দিন আপনাদের দরজায় পড়ে থাকব? ...ফাষ্ট পালায় দোর খুলে না দিলে লাষ্ট পালাতেই পড়তে হবে।

চার বাড়ির কাজ, সময়ের দাম সোনার দামে, এ অহঙ্কার তার আছে।

কিন্তু লালটুও ঝাড়গ্রামের ছেলে, ঘুমেও যেমন পটু কথাতেও তেমন পটু। সে সতেজে বলে, কুসুমদির ফাষ্ট পালা মানেই তো অর্দ্ধেক রাত্তির কে দরজা খুলবে তখন? দরজার ফুটোর কাঁচ দেখে আমার ভয় লাগে। পেতণী শাঁকচুন্নি মনে হয়।...বলাই বাহুল্য এনিয়ে খণ্ড প্রলয় বেধে গিয়েছিল, এবং 'কে থাকবে, কে যাবে' এই নিয়ে টাগ অফ্ ওয়ার চলেছিল, শেষ পর্যন্ত শান্তিচুক্তি হলো সুধামাধবের মধ্যস্থতায়। তিনি বললেন, ঠিক আছে দরজা খুলে দেওয়ার ভারটা আমিই নিচ্ছি। আমি তো ভোরেই উঠি।

এতে নীলিমা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, ভোরে ওঠো বলে মাঝ রাত্তিরে? কুসুমের 'ফাষ্ট পালা' কখন জানো? রাত সাড়ে চারটেয়।

সুধামাধব মৃদু হেসেছিলেন, ওটা রাত নয়। শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মমুহূর্ত। আমার বরং ভালই হবে। তাছাড়া—ফাষ্ট ট্রেনটা ধরতে না পারলে তো তোমাদের অসুবিধে। সেই লাষ্ট ট্রেনে গিয়ে ঠেকবে! নানান বিশৃঙ্খলা।

তদ্‌বধি কাজটা নিঃশব্দে হচ্ছে এবং সংসার রথখানি বেশ কুসুমাস্তীর্ণ পথেই চলছে। বাড়ির সবাই যদি ঘুম থেকে উঠে দেখে, চারিদিক সব ধোওয়ামোছা-চকচকে, রান্নাঘর শুকনো খটখটে, বাসনের গোছা ধোওয়ামাজা, খাবার টেবিলটা নির্মল বক্ষপেতে বসে আছে চায়ের সরঞ্জাম নামার অপেক্ষায়, তাহলে কুসুমাস্তীর্ণ ছাড়া আর কি বলা যায়? উল্টোটা হলে তো রথের চাকা কাদায় বসে যাওয়া।

প্রত্যেকে প্রত্যেককে দোষারোপ করবে সামান্যতম অসুবিধে ঘটলেও, যে চায়ের টেবিলে মলয় বাতাস বয়, সেখানে তুফান উঠবে, চেঁচামেচি গোলমালে সকালের রমণীয় স্নিগ্ধতা ছিন্নভিন্ন হবে।

'অসুবিধে' বড় ভয়ানক জিনিস।

ওতে মুহূর্তে মানুষকে অভদ্র করে তুলতে পারে, স্বার্থপর করে তুলতে পারে, রুক্ষ করে ফেলতে পারে।...অথচ সে 'অসুবিধের' কারণ হয়তো সামান্যই।

সুধামাধব এইটি অনুধাবন করেই ওই কাজের ভারটি নিয়েছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা সুবিধে সত্ত্বেও—কথা শোনাতে ছাড়ে না কেউ।

'বাবাই প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ওই লালটুবাবুর মাথাটি খেলেন। লালটুকে পাছে কাঁচা ঘুমে উঠতে হয়, তাই বাবা নিজে—ভাবা যায় না।...' 'বাড়ির কর্তার পোষ্টটা আমার হলে দেখিয়ে দিতাম ঝিকে জাষ্ট্ ছটার সময় আসতে বাধ্য করা যায় কিনা।... ওর অসুবিধে হবে বলে উনি রাত থাকতে এসে ইলেক্‌ট্রিসিটি খরচা করে কাজ করবেন! ভাবা যায় না।'....

...'সাত জন্মে কেউ' কখনো শুনেছে চাকর নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, আর বাড়ির কর্তা যান দরজা খুলতে।...'এরপর হয়তো দেখা যাবে বাবা বেডটি বানিয়ে লালটুকে ডেকে খাওয়াচ্ছেন।' ...গোবর গণেশ কর্তা হলেই সবাই পেয়ে বসে, দেখে আসছি তো চিরকাল।'

ইত্যাকার নানা মন্তব্যই শোনা যায়, সামনে আড়ালে। তবে সুধামাধবের কানে ঢোকে কিনা বোঝা যায় না।...

সুধামাধব যথারীতি নিজের কাজগুলো করে যান পর পর।

নীচে নেমেই সিঁড়ির পাশের বসবার ঘরের জানলাগুলো সব খুলে দেন, যদিও এটা লালটুরই করণীয়।...কিন্তু করণীয় কাজ কে কত করে? প্রায়ই দেখা যায় বেলা দশটা পর্যন্ত ঘরটা জানলা দরজা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

তাই নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সবাই ওই বালক, বা নাবালকটাকে একহাত নেবে। অথচ কাজটা একমিনিটের।

বাইরের দরজায় ভিতর থেকে ভারী একটা লোহার তালা ঝোলানো থাকে সুধামাধবের বাতিকের চিহ্ন বহন করে। সবাই হাসাহাসি করে, বলে 'বাড়ির মধ্যে থেকে তালা ভেঙে বেরিয়ে যাবার তাল করবার মত কে আছে?'

তবু তালাটা ঝোলে, যেমন ঝুলতো ব্রজমাধবের আমলে। তখন 'নবতাল' ওঠেনি—গডরেজও না, কে জানে কোন্ কোম্পানীর, তবু অটুট আছে এখনো।

তালাটা খুলে দরজার একটা পাল্লা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সুধামাধব।...মিনিট খানেকও নয়, নির্দিষ্ট মোড়ের মাথায় কুসুমবালার লম্বা রোগা কালো কাঠ ঠকঠকে মূর্তিখানি ফুটে উঠলো, প্রাক উষার আর রাস্তার বিজলি বাল্‌বের মিশ্রিত আলোয়।

ওসময় ও এসে না ঢোকা পর্যন্ত দোরটা খুলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। কিন্তু দৈবাৎ একমিনিটের বেশী সময় দাঁড়াতে হয় সুধামাধবকে। এইজন্যে কেবলমাত্র এই জন্যেই ওই কাংসকণ্ঠী এবং সত্যিই প্রায় শাঁকচুন্নি সদৃশ কুসুমবালাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন সুধামাধব।

কুসুমবালা সম্পর্কে শ্রদ্ধা শব্দটা হয়তো হাস্যকর, তত্রাচ ওই শব্দটাই সুধামাধবের মধ্যে কাজ করে। কখনো কখনো ইচ্ছে হয় বাড়ির লোককে বলেন, 'কুসুমের কাছেও তোমাদের শিক্ষা করবার আছে'—কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করতে ইচ্ছে হয়না। কথাটা তো কারুর উপকার বহন করে আনবে না। বরং সুধামাধবেরই অপকার বহন করে আনবে। অবমানিকেরা—অবশ্যই কথার বিষটা ফেরৎ দিতে চেষ্টা করবে।

কুসুম ঢুকতেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুধামাধব। বেশ লাগে এ সময় ঠাণ্ডা রাস্তায় একটু পায়চারি করতে।...এক একদিন প্রায় লেকের কাছ পর্যন্ত চলে যান, আর ভাবেন, কে যে কার কিসের নিমিত্ত হয়! ওই বাসনমাজা ঝিটা আমার এই অনির্বচনীয় মাধুর্য স্বাদের নিমিত্ত।...সত্যি, কবে আর এমন উষা ভোরে অকারণ রাস্তা বেড়িয়েছি?

বাড়ির অন্য সকলের থেকে ভোরে অবশ্য উঠি চিরকালই, কিন্তু এমন সময়? কই আর? ...উঠেছি কলঘরে গিয়েছি, দাড়ি কামিয়েছি, নিজস্ব টুকিটাকি কাজ করেছি, তারপর বাজারে বেরিয়েছি।...এমন

করে তো কোনোদিন অনুভব করিনি ভোরের বাতাস কত স্নিগ্ধ। ভোরের আকাশ কত সুন্দর। কলকাতার রাস্তাও ভোরে কেমন মোলায়েম।...আগে আগে না হয় চাকরীর দোহাই ছিল, কিন্তু রিটায়ার ও তো করেছেন কম দিন নয়। কই মনে তো পড়েনি, যাই ভোরবেলা উঠে রাস্তায় বেড়াইগে।

আষাঢ়ের ভোর বড় তাড়াতাড়ি বিলীন হয়, খুব বেশীদূর গেলেন না সুধামাধব...আস্তে ফিরে এলেন।...

ঘুরে এসে দেখলেন কুসুম সিঁড়ি মুছছে। এটাই কর্ম সমাপনের শেষ সঙ্কেত।...কুসুম ওঁকে দেখেই বলে উঠল, লক্ষ্মীছাড়াটাকে একটু ডাকুন না বাবা! আমি সেই ইস্তক ডেকে ডেকে মরছি। তা নবাবের জামাইয়ের ঘুম আর ভাঙছে না। আপনার সাড়া পেলে তবে যদি...

সুধামাধব বললেন, উঠবে। আপনিই উঠবে।...বাড়ির আর কেউতো ওঠেও নি। ওকী কাজ করবে?

কুসুম ধড়াং করে বালতিটা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে খ্যান্‌খেনে গলায় বলে ওঠে, ওইতো! ওই তো আপনার দোষ বাবু। এতো মায়ার শরীর করলে চলে না। পয়সার বিনিময়ে খাটতে এসেছে বৈ তো আয়েস করতে আসেনি।

সুধামাধব মনে মনে একটু হাসেন।

সবাইয়ের যদি এ 'সেন্‌স'টা থাকতো।

যদিও এই শান্ত ভোরের পরিবেশে কুসুমের চড়া গলার ক্যানক্যানানি রীতিমত আশ্রমপীড়া ঘটায়, তবে সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। দেখা যায়, কথা শেষ না করেই ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে কুসুম।

তবু ওর সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল সুধামাধব।

অনেক সময় ভাবেন সবাই যদি ওর মতো সময়নিষ্ঠ হতো!

দোতলায় উঠে যাবার আগে একবার ডাক দিলেন, লালটু। এই লালটু! উঠে পড়। আর শুয়ে থাকলে বকা খাবি তো।

তারপর উঠে এসে দাঁড়ান।

বাড়ি এখনো নিথর, কেউ ওঠেনি ঘুম থেকে। শুধু দালানের ধারে মাজা বাসনের গোছাগুলো একটা জাগ্রত ভূমির আভাস জানাচ্ছে।

সুধামাধব নিঃশব্দে স্নানের ঘরে ঢুকে গেলেও যথানিয়মে একেবারে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে নিজের গেঞ্জি পায়জামা সাবান দিয়ে কেচে নিয়ে যখন পায়জামা গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এসে ভিজে দুটো সামনের তারে শুকোতে দিয়ে ক্লিপ আটকে একটু আগে ভেজিয়ে রেখে যাওয়া দরজাটা আস্তে ঠেলে খুলে ঘরে ঢুকলেন, দেখলেন সেখানেও যথানিয়মে নিজের খাটের উপর ধ্যানাসন হয়ে বসে নীলিমা বিজবিজ করে স্তব পাঠ করছেন।

এ সময় সাড়া শব্দ করা বিধি নয়, তাই বাজারে কী দরকার না দরকার আগের রাত্রে জেনে নিয়ে লিখে রাখেন সুধামাধব। নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে সেই ফর্দটা আর টাকাটা বার করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কারো সম্পর্কে কিছু ভাববোনা সংকল্প থাকলেও না ভেবে পারলেন না, নীলিমা দেবী স্বর্গের রাস্তায় কতদূর এগোতে পারলে?...তোমার এই স্তব স্তোত্র ধ্যান জপ সমাপ্ত করে উঠে এসেই তো তুমি সংসারের সবাইয়ের উপর এক হাত নিতে শুরু করবে।...তখনতো তোমায় দেখে মনে হবে না তুমি এতোক্ষণ ঈশ্বর সান্নিধ্য করে এলে।

আবার ভাবলেন চিরকাল দেখেছি স্নান শুদ্ধ হয়ে পূজোপাঠ করতে হয়, বিছানায় বসে পূজোটা অভিনব।...অথচ শুনতে পাওয়া যায় নীলিমার গুরু এই সময়টির উপরই বিশেষ জোর দেন।...সারারাত্রিব্যাপী সুখসুপ্তির পর শরীর মন নাকি হালকা আর পবিত্র থাকে।

হবেও বা। সুধামাধবতো কখনো ও ধার ধারেননি।

ধারকাছ দিয়ে হাঁটেনও নি।

নীলিমার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে অনায়াসে পিছলে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

নীচের তলায় নেমে এসে দেখলেন, ঝোলা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা লালটু বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে পরপর হাই তুলে যাচ্ছে।

সুধামাধব হাসি চেপে বললেন, কী? এখনো ঘুমের নেশা কাটেনি? যা হাতেমুখে জল দিয়ে আস্ত জামা প্যান্ট পরে আয়।

লালটু মলিন মুখে বলে, 'ঠাক্‌মা বলে রাতের শোওয়া ওই ছেঁড়া গেঞ্জি পেণ্টুল পরেই বাজার যাবি।'

তার মানে? এ হুকুম কেন?

ঠাক্‌মা বলে, বাজারে ধাঙড় মেথর ছোঁওয়া যায়, এসে একেবারে সাফ্ সুৎরো হয়ে 'কাচা জামা' পরবি।

সুধামাধব এখন একটু হেসে বলেন, তা' সেসব তো আমারও ছোঁওয়া যায়। ওরা কি বেছে বেছে ছোঁয়?

আপনার কথা বাদ দাও দাদু। আপনাকে বলতে আসবে এমন সাধ্য থাকলে তো?

থাক। খুব কথা শিখেছিস! তোর ঠাকুরমাকে বলিস এরকম ময়লা নোংরা জামাপরা দেখলে আমি তোকে নিয়ে যাব না।...এতো ছেঁড়া পরিসইবা কেন? আর নেই?

লালটু অপ্রতিভ মুখে বলে, আছে। তা' ঠাক্‌মা বলে, ছেঁড়া বলে ফেলে দিবি না কি? রাতে শুবি।

তা' বেশ ভালই বলেন। তা' এখন তো আর রাতে শুচ্ছিস না। যা চটপট বদলে আয়, আমি এগোচ্ছি, তুই থলি দুটো নিয়ে চলে আসবি।...

লালটু বিজ্ঞের ভূমিকা নেয়।

বলে, এতো সকালে বাজার খোলেনি।

না খুলে থাকে, খানিক ছাওয়া খাবি।

বৌদি রাগ করে। বলে চা পর্যন্ত না খেয়ে বাজার যাবার কোনো মানে হয় না। অফিস তো যেতে হবেনা, এতো তাড়া কিসের?

সুধামাধব এখনো হাসেন। বলেন, বলে বুঝি? আমার আবার এই ভোরবেলাতেই বাজারে আসতে ভালো লাগে, ভীড় থাকে না। যাকগে তুই চটপট চলে আয়। আমি কালোর দোকানের কাছে আছি।

নীলিমা যে বলেন, বাড়ির লোকের সঙ্গে একটা বৈ দুটো কথা খরচ করতে নারাজ, মিথ্যে বলেন না বোধহয়। ...

সত্যি এই ছেলেটার সঙ্গে অনেক সময়ই একাধিক কথা বলেন সুধামাধব। হয়তো বা অকারণেও। তাছাড়া—একথাও মিথ্যেও নয়, ছেলেটা সম্পর্কে তাঁর একটা দুর্বলতা আছে। যখনই দেখেন—ও একা একা কোথাও উদাস মুখে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা মলিন মুখে ন্যাতাবালতি নিয়ে ঘর মুছছে, কি বয়েসের অনুপাতে কঠিন কঠিন কাজ করছে, মনটা কেমন করে ওঠে সুধামাধবের।...শুধু অভাবের তাড়নাতে এই ছোট্ট ছেলেটাকে মা বাপ ভাইবোন ছেড়ে দূর দূরান্তরে এসে একটা নিষ্পরের বাড়িতে প্রাণপাত করে খেটে মরতে হচ্ছে।...অনেক ভালো ছিলো চাষী বাপের ছেলেরূপে মাঠে খাটা। তবু তো মায়ের হাতে খেতে পেতো।

এই দুর্বলতার বশেই সুধামাধব নিত্য বাজার যাবার পথে ওই কালোর দোকানে এসে দাঁড়ান একবার। খান চারেক জিলিপি কি দুখানা গজা কিনে লালুটকে খেয়ে নিতে বলেন, তারপর বাজারে ঢোকেন।

লালুট অবশ্য এতে খুবই লজ্জা পায় 'না না' করে। বলে আপনি কিছু খাননা, আমি গপ্ গপ্ করে খাব আমার বুঝি লজ্জা লাগেনা?

সুধামাধব হেসে ফেলেন।

তোর মতন দোকানে দাঁড়িয়ে জিলিপি খাবো আমি?

তারপর আবার হয়তো কৌতুকের গলায় বলে ওঠেন, আমি বাড়ি ফিরলেই আমার জন্যে এই চা আসবে, এই মাখন মাথা টোষ্ট আসবে, ডিম সেদ্ধ আসবে, সন্দেশ আসবে, তোর জন্যে আসবে তা?...তোর ভাগ্যে তো সেই সকলের শেষে—

আশ্চর্য! ছোট্ট ছেলেটাকে কেউ ছোট ভাবে না। ভাবলে না কি ও সাপের পাঁচ পা দেখবে, মাথায় চড়ে বসবে, বেয়াড়া হয়ে উঠবে।

অতএব বাবুদের খাওয়ার আগে খেতে দেওয়া চলে না ওকে।...কাজেই কালো দোকানের ওই গজা জিলিপির বরাদ্দ। যদিও জানেন সুধামাধব নামক ব্যক্তিটির প্রতি গঞ্জনার ও লালটু নামক ছেলেটার প্রতি লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না, তথাপি বাড়িতে—বলিসনে—এমন ছোট কথাটাও এই ছোট ছেলেটার কাছে বলতে পারেন না।

তথাপি সহজাত বুদ্ধির বশেই ছেলেটা এই সত্যটি গোপন করে চলে।

ছুটতে ছুটতেই চলে এলো লালটু, একটা কাচা জামা মাথায় গলাতে গলাতে। হাতের মধ্যে বাজারের থলি গলিয়ে।...জিলিপির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে লালটুর চোখে মুখে যে অনির্বচনীয় ভাবটি ফুটে ওঠে, তার দাম কী, আর ওই কটা পয়সা তার কাছে কতটুকু সেটাই ভাবতে চেষ্টা করেন সুধামাধব...

সামান্যর বিনিময়ে অসামান্য!

কানাকড়ির বিনিময়ে রাজত্ব।

ভাল করে হাত ধুয়ে নে—

বলে বাজারের দিকে এগোন সুধামাধব। পিছনে পিছনে হৃষ্ট মুখ লালটু শূন্য থলি দুটোকে বেদম দোলাতে দোলাতে।

সুধামাধবের ঘরে ঢোকা, টাকা পয়সা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া, গভীর ধ্যানস্থ অবস্থাতেও নীলিমাব চোখে এড়ায়নি। নীলিমার ›তনায় এটাও ধরা পড়ে আছে—মাত্র দু'এক মিনিট আগেই অনলস প্রহবী ঘড়িটা পর পর ছটা ঘণ্টা বাজিয়েছে। এই সাত সকালেই বাজারে ছোটা হল বাবুব!

আসবেন সেই বেলা আটটায়। লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটার সঙ্গে গাল গল্প করতে করতে। ছোঁড়া বাজাব থেকে ফেরে যেন আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে। দাদুর আদরে ধরাখানিকে সরাখানা দেখে পাজীটা।

সেদিন মৌরলা মাছ কুটতে বলায় বলে কিনা, এসব কি আর আমার দ্বারা হয় ঠাক্‌মা এ হচ্ছে মেয়েছেলের কাজ।

নীলিমা অবিশ্যি ওর ঘাড ধরে চড়িয়ে ছাড়লেন, 'ঠাক্‌মা' ডেকে আহ্লাদ বাড়ালেই কি তিনি সুধামাধবের মত নাতির আদর করতে বসবেন ওকে?

আজ পূর্ণিমা। নীলিমা ঠাকুরের জন্যে একটু ফল আনতে বলবেন ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু ধ্যানের মাঝখানে তো আর কথা বলতে পারেন না।

কথা তুললে বলবেন, রাতে কেন বলে রাখোনি?

মানুষ যেন যন্ত্র। তার যেন আর ভুল হয়ে যেতে পারে না, অথবা হঠাৎ নতুন একটা ইচ্ছে হতে পারে না। কেন, নীলিমা ধ্যানপূজো সেরে উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারা যায় না? রোজই তো শুনতে পাওয়া যায় বৌমা আক্ষেপ করছে, বাবা কেন যে খালিপেটে বেরোন। চা টা খেয়ে তো বাজার যাবেন!...শুনতে লজ্জা করে না নীলিমার?...কেন? কী এমন রাজকার্য তোমার? রিটাযার বুড়ো তো বেকারের সামিল। ...দেব নেই দ্বিজ নেই, ঠাকুর দেবতার নাম মুখে আনা নেই। এখনো যেন উঠতি বয়সের ছোকরা। এখনো মাংস মুর্গী ডিম পিঁয়াজ খাচ্ছেন, সর্বদা ফর্সা জামা কাপড় পরছেন, ঘড়ির কাঁটায় চলছেন। ছিঃ'

মনে মনে অভিযোগের পসরা সাজাতে সাজাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন নীলিমা। ফুলো ফুলো মুখ, এলোমেলো চুল, মুখেব রেখায় বিশ্বের বিরক্তি। সংসারের কিছু তাঁর মনের মত নয়।

এইতো তাঁর গুরুভগ্নী বাসনাদির বাড়িটি।

কতবার গেছেন নীলিমা, দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়িতে ঠাকুর ঘরে বাসনাদি যে গোপাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিত্য তাঁর ভোগরাগ। বাড়ির সকলেই সেই ঠাকুর অভিমুখী চিত্ত। মেয়েটি সকালবেলা উঠে শুদ্ধবস্ত্রে মায়ের পুজোর গোছ করে দিচ্ছে, ছেলের বৌটি তারপরে আলাদা উনুন জ্বেলে ঠাকুরের

নাড়ু ক্ষীর ছানা সুজির পায়েস এইসব বানাচ্ছে, কর্তা পর্যন্ত একখানা স্কেটের ধুতি পরে ঠাকুরের সন্ধেআরতি করে দিচ্ছেন...বাসনাদির ওপর আদেশ আছে নিত্য হাজার জপ করতে, সেই করতেই তাঁর দিন যায়। সবাই মিলে সাহায্য না করলে ঠাকুর সেবাটি ঠিকমত হবে কী করে? সেটি সংসারের সবাই বোঝে। সবাই শুদ্ধাচারী, সবাই সংযমী! বাড়িতে মাছটুকু ছাড়া কোনো অমেধ্য ঢোকে না।

আর নীলিমার সংসার?

বাড়ির মাথা থেকে পা অবধি মাছ মাংস মুরগী পিঁয়াজ আর বিস্কুট পাউরুটিতে মাখা। সধবা হয়েও নীলিমাকে বিধবার মত আলাদা রান্না করে খেতে হয়। রাঁধুনী ঠাকুর গোটা কতক আস্ত আলু পটল কপি কুমড়ো আর খান চারেক কাঁচা মাছ একদিকে সরিয়ে রেখে দেয়, নীলিমা সেই কোন্ বেলায় পূজো করে নেমে এসে একেবারে দুবেলার মত একটা তরকারি রেধে নেন, আর দুটি ভাত ফুটিয়ে নেন। বাস। কেন, নীলিমার কি দৈবাৎও ইচ্ছে করতে পারে না পাঁচ রকম খাই দাই। মাছও তো খান না সবদিন. অমাবস্যা, পূর্ণিমা সংক্রান্তি গুরুদেবের জন্মতিথি, আরো কত বার ব্রত থাকে, সে সব দিনে তো নিরামিষ তার মানেই ভাতে ভাত। তাছাড়া আর কি করবেন? অথচ ডাল তরকারি সুক্ত চচ্চড়ি এসব খেতে তো বাধা নেই? কিন্তু জুটবে কোথা থেকে? কর্তা এতোরকম তরিতরকারি আনেন, সব শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো তুমি নীলিমা দেবী।

কিন্তু ও বেলায় শুধু বৌয়েরই গৌরব, নীলিমার কচু। নীলিমা কি ওঁদের ওই মাংস মুরগী খাওয়া শরীরের রান্না খেতে যাবেন? চান করে কাচা কাপড় পরে দিতে পারবে? হুঁঃ। কাকে যে 'শুদ্ধাচার' বলে তাই জানে না। এই তো সেদিন সদ্য নেয়ে এসেছে দেখে বলেছিলাম, বৌমা একখানা সিল্কের মিল্কের কাপড় জড়িয়ে এসে আমার এই ফুলের মালা কটা গেথে দিতে পারবে?

তা এক গাল হেসে বলা তো হলো, ওমা, কেন পারবোনা? মালা গাঁথতে আমি খুব ভালবাসি।

কিন্তু করলেন কী? সিল্কের কাপড়ের সঙ্গে বাছা সুতির জামা সায়া পরে এসে দাঁড়ালেন। একে আর কী চৈতন্য করাবো? বললাম, ওই ওখানে বসে আলগোছে গেথে দাও। গঙ্গাজল দিয়ে নেব। দিল তাই, তবে সে মালা কি আমি ঠাকুরের গলায় দিতে পারলাম? কাঠটার গায়ে ঝুলিয়ে রাখলাম।

...এই তো ব্যবস্থা আমার সংসারের। ইচ্ছে হয় একবার বাসনাদির ঘর সংসারটা দেখিয়ে আনি এদের।. .তা দেখালেই কি মন মতি ফেরে? আমার যে আসল ঘরেই মুসল নেই। কর্তাদি যদি এমন ম্লেচ্ছ না হতেন, বাসনাদির স্বামীর মত হতেন, তা'হলে সংসারের ছাঁচ বদলাতো। ...বলবো কি আমার নিজের পেটের ছেলে মেয়েরাই আমার প্রতিপক্ষ। বৌটির তবু যাহোক সৌজন্য সভ্যতা আছে, কিন্তু আমার ওই হারামজাদা মেয়েটি? কথা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়!

বলে কিনা, আহাহা মায়ের খাওয়া নিয়ে বৃথা দুঃখ কোরোনা বৌদি, মা জননী আমাদের কৃচ্ছ্র সাধনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সশরীরে স্বর্গে যাবার তাল করছেন।...আবার শয়তানী হেসে হেসে বলে, আচ্ছা, মা তোমার এই শরীরেই একদা তুমিও আমাদের মত যত সব অমেধ্য বস্তু খেয়েছ, ওই দাঁতেই মাংসের হাড় চিবিয়েছ। ওদের বিশুদ্ধ করে নিতে পারলে কী ক'রে? আমাদের কাপে চা পর্যন্ত যখন চলে না তোমার। আর ছেলেদের তো কথাই নেই। বড়টাতো উঠতে বসতে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আমার গুরু গোবিন্দ নিয়ে, আর ছোটটা বলে কিনা. মালা জপা বুড়িগুলোই হয় পৃথিবীর সবথেকে কুচুটে। মা সেই দলে গিয়ে ভিড়ছে। অতএব মারও বারোটা বেজে গেছে।

এই কণ্টকাকীর্ণ সংসারে বাস নীলিমার।

তবে কিসের সুখে মুখে হাসি আহ্লাদ প্রসন্নতা আসবে?

কর্তাও কি মাঝে মাঝে চিপটেন কাটতে ছাড়েন? আমাকে শুনিয়ে ছেলে মেয়েদের বলবেন কিনা. দ্যাখ চিরকাল শুনে এসেছি—'প্রসন্ন মন নারায়ণের আসন', তা তোর মা তার ঠাকুরকে কোথায় বসায় বল দেখি? আসন তো নেই। এই সব সহ্য করে অধ্যাত্ম পথে এগিয়ে যেতে হচ্ছে নীলিমাকে।...গুরুদেব বলেন 'প্রাক্তন ক্ষয় হচ্ছে—' ওই চিরকেলে ছেদো কথাটা কি আর মেজাজ ঠিক রাখবে?

মেজাজ বেঠিক হবার ঘটনা তো অহরহ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখতে পেলেন নীলিমা দুই ননদ ভাজে চায়ের টেবিলে মুখোমুখি বসে একেবারে আহ্লাদে গড়িয়ে পড়ে কী যেন বলাবলি করছে।

নিশ্চয় নীলিমার প্রসঙ্গ।

তা' নইলে এতো ইয়ে কিসের?

বিরক্ত নীলিমা বলে না উঠে পারলেন না, সকাল বেলা এতো হাসির কী হল শুনি?

মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে আরো হাসতে লাগল আর বৌ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ও শুভ্রার কলেজের একটা মেয়ের ব্যাপার মা।

নীলিমা ঘাসের বীচি খান? নীলিমা বুঝতে পারলেন না ওরা নীলিমার কাছে চাপছে? নীলিমা রাগে গরগরিয়ে বলে উঠলেন, এইত একটু আগে সব ঘুমোচ্ছিলে। এখুনি চায়ের বাটি নিয়ে বসা হল? অ্যাড়া বাসি কাপড়গুলো তো ছাড়াই নেই, মুখটাও কি ধুতে ইচ্ছে করেনা?

শুভ্রা বলে ওঠে, এ মা! আমরা মুখ না ধুয়ে খাই? তোমার থেকে ডবল ভাল করে ধুই।...তোমার মতন অমন বিনা ব্রাশে দাঁত মাজি না আমরা।

নীলিমা কি তবুও সেখানে দাঁড়াবেন?

সরে যান। রাঁধুনী ঠাকুরের পিছনে লাগতে যান। না লাগলে হবে কেন? সে শক্‌ড়ি হাত ধুলো কিনা, রান্না করে সব আগে নিজের জন্যে তুলে রাখলো কিনা। চাল ডাল তেল মশলা সরাবে? কি না, বড় বড় মাছের চাকাগুলো কাকে দিতে কাকে দিচ্ছে? এসব তদারকি আর কেউ করতে আসবে নীলিমা ছাড়া?

অথচ বাড়িসুদ্ধ সবাই বলতে আসবেন এতো দেরি করে স্নানে যাও কেন তুমি? এতো দেরী করে পূজোয়?

সুধামাধব আবার বলেন, সকালে তো একবার পূজো টুজো হয় দেখি, ক'বার করতে লাগে?-

প্রশ্নটি শুনতে নিরীহ, কিন্তু তাৎপর্যটি কি তা বুঝতে বাকী থাকে নীলিমার? কাকে বলে ধ্যান ধারণা, কাকে বলে জপতপ পূজো পাঠ, এ সব জ্ঞান আছে তোমার? নাস্তিকের অগ্রগণ্য। বোঝাতে চেষ্টা করতেও রুচি হয় না। প্রথম দিকে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ওই পাথরের মন গলাবে কে? একদিন হাতজোড় করে বলে বসলেন কিনা, দেখো ওসব যদি বুঝতেই হয়, তো হিমালয়ে চলে গিয়ে গুহায় বসে বুঝতে চেষ্টা করবো, তোমার কাছে কেন?

অথচ মঠের উৎসবে টুৎসবে কী মধুর দৃশ্যই চোখে পড়ে। সকলেরই কিছুই স্বামী পুত্র সবাই দীক্ষিত নয়, কিন্তু উৎসবে সবাই আসে।...গুরু-ভগ্নীরা মেয়ে জামাই নাতি নাতনী ছেলে বৌ কর্তা সবাইকে 'বাবা'র কাছে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ নিচ্ছে, আর নীলিমা এক পাশে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তাঁর কেউ কোথাও নেই।

ভাগ্য। সবই ভাগ্য।

গুরু গোবিন্দ গোপাল নারায়ণ জপ তপ, কেউই ভাগ্যকে বদলে দিতে পারে না।...

অথচ কতটুকুই বা চাহিদা ছিল নীলিমার?

সংসারে সবাই সদাচার সম্পন্ন হবে,—ঈশ্বরমুখী মন হবে সকলের, নীলিমার জীবনের যা সম্বল, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, ব্যস। এইটুকুতো চাওয়া। তার এক চিলতেও জুটলনা নীলিমার ভাগ্যে।

কিন্তু লোকচক্ষে?

এমন ভাগ্যবতী না কি হয় না।

সবাইতো তাই বলে। নীলিমার নিজের লোকেরা পর্যন্ত। নীলিমার নাকি সুখে থাকতে ভূতের কীল খাওয়া, সেধে দুঃখু গলায় নেওয়া আর জীবনের মধ্যে বিদ্‌ঘুটে এক ঝঞ্ঝাট ডেকে এনে সংসারকে অশান্তি দেওয়া।

নীলিমার নিজের বোন পর্যন্ত বলে কিনা, জামাইবাবুকে তুই যতই 'নাস্তিক' বলে ঘেন্না দিস মেজদি, উনি তোর থেকে অনেক জ্ঞানী।

স্বল্পভাষী সুধামাধবের যেমন ভিতরে বাইরে কোনোখানেই 'কথা' নামক বস্তুটার কোনো চাষ নেই, সুধামাধবের চিরসঙ্গিনী নীলিমার তেমনি ভিতরে বাইরে শুধু ওই কথারই চাষ। জপের মন্ত্রের মধ্যে কথারা ঢুকে পড়ে হানা দেয়, ধ্যানের মধ্যে কথারা তৈরী হতে থাকে। অতএব নীলিমা তাঁর অফুরন্ত অনন্ত কথার ভার বাড়িতে যতগুলো কান আছে তাদের বর্ষণ করে চলেন। তা বাইরে না হলেও ভিতরে কথার চাষ চলে এ বাড়ির আর একটি মহিলারও।

শ্বশুরের মত অত স্বল্প ভাষী না হলেও কথা কমই বলে, অমৃত মাধবের বৌ অসীমা। কিন্তু মনে মনে কথা কয়ে চলে যায়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই। প্রথম কথা শুরু ওই 'অমৃত' মাধব নামক ঘুমন্ত লোকটাকে উদ্দেশ্য করেই।

আহা কী সুন্দর জীবনটিই বেছে নিয়েছ।

সকালবেলা যত ইচ্ছে বেলা অবধি ঘুমোবো, তারপর শুধু এক কাপ চা গলায় ঢেলে চাল যাব 'অঙ্গরাগ' করতে, 'অঙ্গরাগই' বলব, নইলে শুধু দাড়ি 'কামাতে', চান করতে, আর সাজসজ্জা করতে সারা সকালটা খরচা হয় একটা ইয়াং লোকের! তোমার থেকে অনেক স্মার্ট তোমার প্রৌঢ় বাবা! তোমরা দু ভাই বিছানায় গড়াগড়ি দাও আর তোমাদের বাবা ছোটেন বাজারে। কারণ ঠাকুর চাকরের কেনা মাছ তরকারি তোমাদের পছন্দ হয় না। হবার কথাও নয় অবিশ্যি। সে যাক।

ঘণ্টা দেড়েক ধরে দেহ পরিচর্যা করে তুমি একেবারে যুটেড্, বুটেড্, হয়ে টেবিলে এসে বসলে ব্রেকফাস্ট করতে। যে ব্রেকফাস্টটির অনেকখানি অংশই প্রোটিন সম্বলিত। কারণ এটাই তোমার বাড়ির আসল খাওয়া। লাঞ্চটা জোটে অফিসের ক্যান্টিনে। অফিসারের পোষ্টে উঠেই তুমি বাড়িব ভাত ছাড়লে। কারণ সাত সকালে ভাত পেটে দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে অফিসে যাওয়া অফিসারের মানায় না। যদিও ওই পোস্টটায় বসার আগের দিন পর্যন্তও তুমি সকালে ভাতের থালা নিয়ে বসতে। তবু তো এ গ্রেড হতে পারছ না এখনো পর্যন্ত। আর পার টেবিলে বসে তুমি অম্লান মুখে অকুণ্ঠিত চিত্তে, রেলিশ করে বাবার নিয়ে আসা মাছ মাংস ডিম টিমের সিংহভাগটি ভোগে লাগিয়ে কেটে পডতে। ব্যস। অফিসার হয়ে পর্যন্ত তুমি 'মিনি বাস' ছাড়া চড়ছনা, দেরী হয়ে গেলেই ট্যাক্সী। দেখে শুনে মনে হয় যেন অফিসার হয়েই জন্মেছ তুমি। অথচ তোমার বাবার কোনদিনই এরকম ভঙ্গী দেখিনি। তিনিও তো কিছু কম ছিলেন না। তোমার ভঙ্গী দেখে মনে হয় মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য সরকারি অফিসের অফিসার হওয়া, এবং তাঁর থেকেও উচ্চতর লক্ষ্য এ গ্রেড্ হওয়া।

অথচ আর এক বোকামিতে তুমি তোমার এই পরমতম শ্রেয়কেও এতাবৎ কাল ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে এসেছো, এবং এখনো তাই করে আসছো।

প্রমোশন দিলেই কলকাতা থেকে বদলি করে দেবে, এই আতঙ্কে তুমি প্রমোশন পর্যন্ত নিতে চাওনি, বারবার বহু কৌশলের পর হঠাৎ তুমি বিনা বদলিতে প্রমোশনটা বাগাতে সক্ষম হয়েছ।

কিন্তু পরবর্তী পথটি?

সেও হয়তো ওই একই কৌশলে বাগিয়ে ফেলবে। না পারলে, বরং প্রমোশন ছাড়বে, তবু কলকাতা ছাড়বে না। আশ্চর্য! কী মোহ কলকাতায়।...যেন কলকাতা ছাড়তে হলেই তোমার সর্বস্ব ভেসে যাবে।

অথচ আমি?

জন্মেছি এক পাহাড়ের কাছাকাছি দেশে, মানুষ হয়েছি তেমনি সব দেশে, বাবার বদলীর চাকরীর সুযোগে বরাবর খোলামেলা জায়গায় মানুষ হয়েছি। আমার মনের জগতে তেমনি একটা কোনো দেশের ছবি আঁকা ছিল, সেই ছবিটার গায়ে রঙিন তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে একখানি ছিমছাম 'ফিটফাট্ সংসার' পেতেছিলাম।

সেই ছবি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ সেই সংসারটা আর কোনো দিনই পাতা হবে না। কারণ তুমি

তোমার পরম স্বর্গ প্রমোশন ত্যাগ করেও কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে।

আমার সেই সোনালী স্বপ্নটা ভেঙেই গেল। আবার তোমার আর এক ফ্যাসানের শিকার হয়ে পড়ে আছি আমি। এতোগুলো বছর বিয়ে হয়েছে আমার, তবু না কি এখনো 'মা' হওয়ার অধিকার অর্জন করিনি আমি। আমাদের নাকি আরো অপেক্ষা করতে হবে—প্রতিষ্ঠিত হতে। ভাবছোনা যে আমার দিনগুলো কাটে কী করে!...সকাল থেকে রাত অবধি তোমাদের এই সংসারের তদারকি করা, আর সকলের সঙ্গে অ্যাড্‌জাষ্ট করে চলবার চেষ্টা করা, আর সারাক্ষণ তোমার ওই 'হরিচরণে লীন' জননীর অনর্থক বকবকানি শোনা। ...তোমার বাবা অবশ্য দেবতুল্য মানুষ। কিন্তু বড় দূরের মানুষ আমার বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে, অথচ আবার কোথায় যেন দারুণ তফাৎ। আমার বাবা যেন বড় কাছের মানুষ, শুধু আমাদের বলেই নয়, সকলের কাছেই।...তোমার বোনটির কথা বাদ দাও, তিনি তো এখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কথা বলতে হয় নিক্তির ওজনে। কখন কি হয়ে যায় কে জানে। অতএব তার সঙ্গে শুধু শাড়ি গহনা, সিনেমা গল্পের বইয়ের গল্প করে চালাতে হয়।

এদিক ওদিক করতে ভয় হয়।

আর তোমার ভাইটি?

সে তো পৃথিবীকে তৃণমূল্য আর আত্মীয়জনকে নস্যসম জ্ঞান করে। ব্যঙ্গের ছুরি বিঁধিয়ে ছাড়া কথাই বলতে জানে না সে।

কিন্তু আমি বেচারা মফস্বলের মেয়ে, অত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ধার ধারি না। আমি তাই সাধ্যপক্ষে ওর সঙ্গে বেশী কথা কই না। আর কথা কইলেই তো তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে পলিটিক্‌সের দিকে।

তোমাদের এই এতো বড় বাড়ি, এতো পুরনো পুরনো আসবাব পত্রে ঠাসা অকারণ ভারী সংসার, এতো কথা, এতো বিশৃঙ্খলা, আর তোমার এই নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ততা আমার যেন দম বন্ধ করে আনে।

ভাগ্যের কাছে অধিক কিছু প্রত্যাশা তো ছিল না আমার। প্রত্যাশা ছিল শুধু হালকা ছিমছাম সুন্দর একটি জীবন। সেখানে আমার পদ্ধতিতে আমি সকলকে যত্ন করবো, সেবা করবো, ভালবাসবো।

সেটা কি খুব বেশী চাওয়া?

ধরো আমরা যদি কোনো একটি মফস্বল শহরে সুন্দর একটি সংসার পেতে বসতাম ছোট্ট দু' একটি বাচ্চা নিয়ে, আমাদের সংসারে ডাকতাম তোমার আপন জনেদের, তাঁরা গেলে আমরা যত্নে আদরে ডুবিয়ে দিতাম তাঁদের, কী মনোরম সেই জীবনখানি। এই জীবন দেখেছি আমার মার। কী প্রসন্ন মুখ ছিল মার, কী নির্মল উজ্জ্বল হাসি! অথচ তোমার মা?...

থাক, গুরুজন সম্পর্কে সমালোচনা করতে চাই না, শুধু ভাবি 'ভগবান পেতে হলে কি মানুষকে ত্যাগ করতে হয়, আর অফিসার হতে গেলে?'

এ বাড়ির সবাই যে বেলা অবধি ঘুমোয় এটা কিন্তু সত্য নয়। হয়তো কেউই তেমন ঘুমোয় না গৃহকর্তার বড় ছেলে অমৃতমাধব বাদে।...ডাকনামে যে 'অমি' বলে পরিচিত।

অমৃতমাধবের ঘুমটা সত্যিই দারুণ ব্যাপার।

রাত্রে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অথবা আক্ষরিক অর্থে বৌয়ের কথা শুনতে শুনতে সেই যে হঠাৎ পাশ ফিরে নাক ডাকাতে শুরু করে, সে ডাক থামে সকালের ডাকাডাকিতে।

বৌ বলে, 'ক্লাস ওয়ান' অফিসাররা নাক ডাকায় বলে শুনিনি।

'অমি' হাই তুলে বলে, তখনো শুনবে না। ইত্যবসরে ডাকিয়ে নিই।

কথা বলতে বলতে যে কী করে ঘুমিয়ে ষ্টীল হয়ে যাও। আশ্চর্য!

অমৃতমাধব আলস্য ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বলতে বলতে নয়, শুনতে শুনতে।

তা' বটে! বর্ষার রাতে ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতেও ঘুম আসে।

কী মুস্কিল! তোমার সব সময় কেবল একহাত নেবার তাল। বলে স্নানের ঘরে ঢুকে যায় অমৃতমাধব নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে।

বৌয়ের মনের মধ্যেটা যে সর্বদাই একটা বোকাটে অভিমানে বাষ্পে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে তা' অমৃতমাধবের অজানা নয়। তবে নিজে সে বোকার মত বৌয়ের কাছে সেই জানার খবরটা ব্যক্ত করে ফেলে তার ভারাক্রান্ত চিত্তের ভার লাঘবের চেষ্টা করে না। জিনিসটাকে তো সে গুরুত্ব দেয় না।

অমৃতমাধবের ধারণায় 'অসন্তোষ' মেয়েমানুষের স্বধর্ম; ওর সন্তুষ্ট বিধানের চেষ্টাটি হচ্ছে খাল কেটে কুমীর আনা। অতএব ও ফাঁদে পা দিতে যায় না অমৃতমাধব নামক বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি। যতই বিদুষী বিদ্যেবতী হোক, 'মেয়ে' সেই আদি অকৃত্রিম মেয়েই। যাদের প্রকৃতিই হচ্ছে সেধে দুঃখু ডেকে আনা, সব থাকলেও সর্বহারা ভাব। তাই তাদের কাজ হচ্ছে অকারণ মনভার, কারণে অকারণে কান্না যে কোনো প্রসঙ্গেই নিজের প্রসঙ্গ এনে ফেলে আক্ষেপোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি, ভাগ্যকে আসামী বানিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। আমি শালা কোথায় কত কাঠ খড় পুড়িয়ে, কত কায়দা কৌশল খেলে ট্র্যান্সফারটা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আসছি। আর তুমি শ্রীমতী দুঃখে ভেঙে পড়ছো তোমার বর কলকাতা ত্যাগ করে একটা হাড-হাভাতে মফস্বল জায়গায় বদলী হচ্ছে না কেন বলে? এখানের সুখটা তোমার নজরেই পড়ছে না।....

এখানে শালা বাপের হোটেলে আছি, কি তোফা আছি দেখতে পাও না? চক্ষুলজ্জার দায়ে গোটাকতক টাকা ধরে দিই মাত্তর, তাতে যে এ বাজারে কত হয় তা তো আর জানতে বাকি নেই। অফিসের হতভাগ্যদের হাহাকার, শুনতে শুনতে তো কান পচে গেল। 'বাজার দর' আর তাই নিয়ে কার কত কষ্ট এটাই তো প্রধান প্রসঙ্গ।

এ হোটেলে চাঁদু তোমার ঘরভাড়াটি ফ্রী, ইচ্ছেমত আহার, আঙুলটি নাড়তে হয় না, আগুন তাতটি লাগে না, বাড়াভাত খাচ্ছ, ফ্যানের তলায় পড়ে দিবানিদ্রাটি দিচ্ছ, সাজছো গুজছো, দ্যাওর ননদকে জুটিয়ে নিয়ে মার্কেটিং করছো, সিনেমা যাচ্ছো। বাড়ি থেকে বেরোতে দরজায় তালা লাগাবার চিন্তা নেই, ইনসিকিউরিটির প্রশ্ন নেই, খাও দাও কাঁসি বাজাও। এতো স্বস্তি ছেড়ে কোথায় গিয়ে তোমার সোনার সংসারটি পাততে যেতে চাও মানিক? কত মাইনে পাব আমি? যতই ক্লাশ ওয়ান হই, এই আরামটি আর পেতে হয় না!...অন্যত্র গেলে খাটতে খাটতে জান নিকলোবে তোমার। একটু বেড়াতে বেরোলেই ফেরার সময় গায়ে কাঁটা দেবে, গিয়ে কী দৃশ্য দেখবো ভেবে। আরো কত ঝামেলা তার হিসেব আছে? 'মুক্ত প্রকৃতি'র দৃশ্য দেখে দেখে পেট ভরাবে?...

কলকাতায় ওনার প্রাণ হাঁপায়।

দম আটকায়।

শুনলে মাথা জ্বালা করে।

বলে হোল্ ইন্ডিয়ার তাবৎলোক এই কলকাতায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে মরছে! দেখছো না? জায়গাটা যদি এতো বিচ্ছিরিই হবে, ভারতসুদ্ধু লোক কেন এখানেই মরতে আসে তাই বল?

যাকগে, মরুকগে, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাকে এখন অনেক অঙ্ক কষে কষে চলতে হবে, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।...প্রমোশনটাও হয়, ট্র্যান্সফারটাও রদ হয়।

এতো অঙ্ক কষে চলে অমৃতমাধব, তবু তার ঘুমের ঘরে ঘাটতি নেই।...দেওয়াল ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি তার ঘুমের দেওয়ালে ফাটল ধরাতে পাবে না।

কিন্তু ওদের ঘুমের দেওয়ালে ফাটল ধরায়। অমৃতমাধবের ছোট ভাই মধুমাধবের আর ছোটবোন খুকুর। ভাল নাম তার একটা আছেই অবশ্য, কিন্তু ওতেই সে পরিচিত।

ওরা ঘড়ি ঘণ্টা সবাই শুনতে পায়, সেই ভোর থেকেই। ইচ্ছে করে ওঠে না। জেগে জেগে শুয়ে থাকে।...সাবেক চালের বাড়ি, আগে লোক ধরতো না, এক একটা ঘরে গড়াগড় বালিশ পড়তো এক গাদা করে। কমবয়সী ছেলে মেয়েরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না প্রত্যেকের নিজস্ব এক একখানা ঘর থাকবে। কিন্তু এদের ভাগ্যে সেটা জুটে গেছে। বাড়ির সদস্য হিসেবে ঘরের স্বচ্ছলতা বেশী, তাই সকলের ভাগ্যে আস্ত এক একখানা ঘর বাদেও, মধুমাধবের ছোট একটা পড়বার ঘর আছে, অমৃতমাধবের ভাগ্যেও তেমনি খুদে বাক্স প্যাঁটরা আলমারি দেরাজ রাখবার জন্যে বাড়তি একটা।...

অতএব আপন আপন ঘরে সবাই রাজা।

জেগে জেগে শুয়ে পা নাচালে, সাতবার এপাশ ওপাশ করলে, অথবা জাঙিয়া পরে ডন্‌বৈঠক করলেও কেউ চোখ ফেলতে আসছে না।

খুকু শুয়ে শুয়েই টের পায় বাবা সিঁড়ির কোলাপ্‌সিবলটা ঠেললেন, নীচে নামলেন, যতই চটির শব্দ না করুন তবু টের পায়। মৃদু হলেও সদর দবজা খোলার আওয়াজ পায়, তারপর আওয়াজ পায় কুসুমবালার। কুসুমবালা সুধামাধব নয়, যে ভোরের শান্তি ব্যাহত হবার ভয়ে পা টিপে টিপে হাঁটবে, অথবা বাসনপত্রের 'ঝনন রনন' শব্দ তুলবে না।

খুকুর যে কোনোদিনই উঠে পড়তে ইচ্ছে হয় না তা' নয়, বিশেষ করে বেশী গরমের দিনের ভোরে। তবু ওঠে না। শুয়ে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে ভাবে এখন উঠে কী করব?..ওঠবার কি উদ্দেশ্য আছে আমার? যতদিন কলেজ ছিল, ততদিন তবু দিনরাত্রির একটা মানে ছিল, এখন তো স্রেফ্ জাবরকাটা।

এই জাবরকাটা জীবন থেকে কবে যে উদ্ধার পাবো!...সেই হতভাগাটারও কি তেমনি গোঁ, ভাল চাকরী না পেলে না কি বিয়ের পীড়িতে বসার চিন্তা অচল। আরে বাবা ভাল মন্দ যাই হোক, করছিস তো একটা। তাতে হবে না? তবে পীঁড়িতে বসবার ভাগ্য ঘটবে কি না, জানেন ভগবান, আর শ্রীমতী নীলিমা দেবী, এবং শ্রীযুক্ত বাবু সুধামাধব গুপ্ত।...কারণ ওঁদের মতে তো 'সে' সিডিউল্ কাস্টের দলে পড়বে।...

বিপদ তো সেইখানেই।

ওঁরা যদি ওঁদের সুউচ্চ কুল আর পবিত্র বংশগৌরবের ধ্বজা তুলে এ বিয়ে আটকাতে চেষ্টা কবেন, তাহলে ফাইট করে একবস্ত্রে শূন্যহাতে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু সেটা কি একটা কথার মতো কথা হল?...আমি বলে কতকাল থেকে বিয়ের ঘটা আর বিয়ের সাজ সজ্জার স্বপ্ন দেখছি।...তাছাড়া—ওপক্ষেও তো শুনছি 'অর্দ্ধচন্দ্রের' ব্যবস্থা। তাহ'লে?

সংসারটা পাতিয়ে দেবে কে শুনি?

আর শাড়ি গহনা জাঁকজমক নেমন্তন্ন আমন্ত্রন্ন এসব ছাড়া বিয়ের সুখ কী? অর্থ কী? গৌবব কী?.. বরের কাছেইবা মুখ কোথায়? ...বাপের দেওয়া পালিশ চকচকে জোলা খাটে 'ফুলশয্যার' শয্যা বিছোতে না পেলে জীবনটাই তো মরুভূমি। বৌদিটা অবশ্য আশ্বাস দেয়; বলে যত ভাবছ, তত নয়। আজকাল তো সব বাড়িতেই এরকম হচ্ছে। সেটা আর ওঁরা বুঝবেন না? বাবা মোটেই সেরকম গোঁড়া নন।

আমার কিন্তু ভয় ভাঙে না। বাবার বিষয় যদিবা নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টাটুকুও করা যায়, কিন্তু মা জননীর বিষয়ে? নৈব, নৈব।...তিনি তাঁর গুরু ভ্রাতা ভগ্নীদিগের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে? যদি তাঁর বাড়িতে এমন একটা ভয়াবহ নারকীয় ঘটনা ঘটে? অসম্ভব।

বরং তিনি তাঁর কন্যাকে চাবি বন্ধ করে আটকে রাখবেন, অথবা গুম্ খুম্ করে ফেলবেন। তত্রাচ বলতে পারবেন না, 'বেরো লক্ষ্মীছাড়ি মুখপুড়ি আমার বাড়ি থেকে, যা প্রাণ চায় তোর করগে যা।'

উঃ! কবে যে সমাজ থেকে এই সব মাথা মুণ্ডহীন কুসংস্কারগুলো দূর হবে।...কুল শীল গাঁই গোত্র, ঠিকুজি কুষ্ঠি, আর সর্বোপরি—অহমিকাস্ফীত অভিভাবকদের আকাশছোঁওয়া বংশমর্যাদা। এতগুলো বেড়া ডিঙিয়ে, এতগুলো খানাখন্দ পার করে, তবে একখানা বিয়ে? ধ্যেৎতারি নিকুচি করেছে।

এক এক সময় ভাবি হতভাগাকে বলে দিই, তুমি তোমার ভাল চাকরীর মগডালের দিকে তাকিয়ে থাকো, তোমার হাতের খাবারের পুঁটুলিটা ততক্ষণে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাক।

আশ্চর্য বাবা? আমাদের ক্লাশের কতগুলো মেয়ের কি পটাপটই বিয়ে হয়ে গেল! প্রেমে পড়া বিয়ে, ছাঁদনা তলায় প্রথম দেখা বিয়ে, অনেক দিন ধরে লুকিয়ে লটকে থেকে, শেষ পর্যন্ত মা বাপকে ভিজিয়ে ভজিয়ে দান সামগ্রী গহনা শাড়ি আদায় করে ড্যাংডেঙিয়ে বিয়ে। কত রকমই দেখলাম। আমার ভাগ্যেই নৌকো বালির চড়ায় আটকে বসে আছে।

ভাগ্যটাই মন্দ।

তার সাক্ষী আমার পরিবেশের চেহারা, স্থিতপ্রজ্ঞ নিরুদ্যম পিতা, 'ভগবৎ চরণে বিলীন' ঘোরতর সংসারী জননী, পরম স্বার্থপর দাদা, বিশ্বনস্যাৎ কারী ছোট ভাই আর করুণাময়ী, অথচ নিতান্তই ক্ষমতা হীনা এক বৌদি, এই সম্বল।

যেদিকে তাকাই, অন্ধকার।

কলেজ যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে পর্যন্ত সেটার দেখা হওয়ার স্কোপ কম। কোন উৎসাহে আর ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুরে ফিরে বেড়াব? একঘেয়ে দৃশ্য একঘেয়ে কথা। ভাল লাগে না। কপাল আমার! মরতে প্রেমে পড়তে গেলাম একটা 'পকেট ফর্সা' ছোঁড়ার সঙ্গে। ওর যদি পায়ের তলায় মাটি থাকতো। আমি নিশ্চয় আমার পায়ের তলার মাটি ত্যাগ করে ওর কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

হবে না, কিছু হবে না আমার।

যতক্ষণ বিছানায় পড়ে পড়ে ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণই সুখ।

সেকেলে ধাঁচের বাড়ি, চওড়া দালানের একধারে সারি সারি ঘর, তাই ঘরের বাসিন্দারা প্রকৃত পক্ষে নিতান্তই পাশাপাশি ঘেঁসাঘেসি বসে শুয়ে পরস্পর বিরোধী কথা ভাবে। শুধু ওদের মাঝখানের ওই পনেরো ইঞ্চি দেওয়ালগুলোই প্রত্যেককে এতো নিশ্চিন্ত স্বাধীনতা দান করেছে।

খুকুর ঘরের একপাশে দাদা বৌদির জিনিসের ঘর, অপর পাশে ছোট ভাই মধুমাধবের।

এই অদ্ভুত নামের ছেলেটাও ঘুমোয় না বেলা অবধি। তবে সেও অন্য সকলের মতই ঘরেব দরজা খোলেনা, তাই এই ভুলধারণা!

ওর ভাষায় 'প্রপিতামহের ঘড়িতে, যখন ছটা ঘণ্টা বেজেছে। তখনই ওই বিছানায় উঠে বসে আছে স্রেফ্ একটা জাঙ্গিয়া পরে। ভোরে উঠে 'যোগ ব্যায়াম' করার অভ্যাস তার, এটা তারই প্রস্তুতি।

মধুমাধবের ভাগ্যে ওর ঘরে মস্ত একখানা 'দাঁড়া' আর্শি, দাঁড় করানো আছে দেয়ালের একধারে। দুপাশে 'গামছা-মোড়া' গড়নের পাক দেওয়া কালো পালিশের স্ট্যাণ্ড। কাঁচটা ভরে এখানে সেখানে ছোট বড় 'মেচেতা পডা'র মত দাগ।...নীলিমা যাকে বলে 'চিতিধরা'। মধুমাধবের ভাষায় এও 'প্রপিতামহীর আয়না'।

তা হোক প্রপিতামহীর, হোক মেচেতাধরা, তবু বিরাট একখানা মালতো বটে। মধুমাধব নামক তরুণ যুবার পুরো অবয়বখানির ছায়াতো পড়ে। সেটাই কি কম লাভ? যোগব্যায়ামের পক্ষে যেটা পরম দরকারী।

বিছানায় বসে বসেই আর্শির মধ্যে নিজেকে অবলোকন করতে করতে মুখভঙ্গী করছিল মধুমাধব। এটা ওর একটা বিশেষ 'হবি', নিজেকে ভ্যাংচানো। এখনও ভেঙচে ভেঙচে বলে, এই যে শ্রীমান মধুমাধব, ইহ পৃথিবীতে একমাত্র যে প্রপার্টিটি আছে তোমার, সেইটিকে সুরক্ষিত রাখতে যত্নবান হও এবার। অনেকক্ষণ তো শুয়ে কাটালে।

এই! শুধুমাত্র এই দেহখানিইতো তোমার সম্বল, যাকে বলা চলে পিতৃদত্ত ধন। তা প্রপার্টিটা খুব একটা মন্দ নয়।....

খাট থেকে নেমে এসে আর্শির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিযে ফিরিয়ে মাস্‌ল ফুলিয়ে দেখতে দেখতে একটু প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, বরং অনেকের থেকেই ভাল। এটিযে পরম পূজনীয় অগ্রজ, শ্রীঅমৃত মাধবের মত ঘাড়ে গর্দানে পেটমোটা হয়নি এ একটা লাক্!...কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্তই।...ওইটুকু সাপ্লাই দিয়েই, 'বেশী দেওয়া হয়ে গেল' ভেবে হাত গুটিয়ে নিলেন গার্জেনরা।...নইলে—কেউ কখনো শুনেছে একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ভদ্দবলোকের বাড়িতে বড় সাধের কনিষ্ঠপুত্রের এরকম একখানা নাম রাখে?...এমন দুখানি ওয়ার্ড, যে তার কোনো একটা টুকরো বেছে নিয়েও লোক সমাজে কিছু কিঞ্চিৎ মুখ রক্ষা সম্ভব হবে।...এই যে আমাদের ক্লাশের একটা ছেলে ছিল, নাম গজেশ কুমার, ও শুধু শেষের অংশটুকুই বেছে নিয়েই কাজ চালিয়ে চলতো।

কুমার! কুমার! এই নামে কেল্লা মারতো সে। শুধু ও কেন, কলেজের রণদাচরণ? সে ও তো ওই 'চরণটা' ছেড়ে খানিকটা স্মার্টনেস বজায় রেখেছিল! সবচেয়ে বড় কথা ছোট পিসেমশাইয়ের ভাই? কী

একখানা নাম পেয়েছিল সে তার ছমাস বয়েসে! না—নাম হল পাতকী নিধন!...সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটার বুকের ওপর এই গন্ধমাধন খানি চাপিয়ে দিতে এক ফোঁটা মায়াও হয়নি তার বাপ ঠাকুর্দার!

উঃ! ভাবা যায় না।

তবে অ-বাক তো চির অ-বাক থাকে না?...নির্যাতিত ও চিরদিন পড়ে মার খায় না। কে. জি. ছেড়ে বড় স্কুলে যাবার প্রাক্কালেই 'পাতকীনিধন' বেঁকে বসে বলল, আমার নামটা বিচ্ছিরি। ও নাম বদলে দাও।

শুনে বাড়ির লোক 'থ'। নামকরণের নাম, রাশিলগ্নে ওটা পুরোহিত নির্দেশিত ব্যাপার, বদলাবো কী?

তা হলে আমি ইস্কুলে ভর্তিই হব না।

অতএব আট বছরের সেই ছেলেটা, নামের শেষাংশ 'নিধন' শব্দটাকে নিধন করে, আর প্রথম অংশটাকে একটু তেড়িয়ে নিয়ে স্রেফ্ 'পতাকী' হয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হে হতভাগ্য মধুমাধব! তোমার কোনো দিক থেকেই মুক্তির কোনো রাস্তা নেই। তোমার হাত পা বাঁধা।...জগৎ সংসারে 'মধু' শব্দটা যতই মধুময় হোক, ওই নামের ফ্রেমে নিজেকে আটকে নিয়ে বেড়ালে, তোমাকে বাড়ির ঘরঝাড়া চাকর ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।...আর মাধব? আহা! যেন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে হঠাৎ ঝরে পড়েছ।...দূর দূর!

ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে মূল্যবোধ কত কম থাকলে এরকম নাম রাখা সম্ভব? তাও ডাকা হয় 'মেধো' বলে।

একমাত্র বাবা মেধো না বলে মাধব হলেন।

অবিশ্যি তাতেও আহ্লাদের কিছু নেই।

তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার পরস পরিচয় ওই 'মেধো'র সঙ্গে মাধবের খুব বেশী পার্থক্য নেই আমার কাছে।

এই বাড়ি তোমার হে মধুমাধব। এই পরিস্থিতি।

বাবা গৃহে থেকেও বৈরাগী, মা ঘোরতর বিষয়ী হয়েও সন্ন্যাসিনী। তোমার দাদার মোক্ষের জগৎ তোমার কাছে হাস্যকর। তোমার সদা অভিমানিনী বৌদি মাঝে মধ্যে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে তোমার উপকার করে বটে, কিন্তু 'কিপ্‌টে সোয়ামীর' পকেট থেকে কতটুকুইবা খসাতে পারে?

খালি পকেট নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। হায় মেধো, তোমার দিদিটি তো একটা ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে লটকে পড়ে হাত, কামড়াচ্ছে তার কাছেও নো হোপ! ...কিন্তু এই কি একটা ভদ্র কালচার্ড পরিবার?...যাদের মধ্যে একজনও পলিটিক্‌স কাকে বলে জানে না, দেশের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কালচারাল্ কোনো ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রাখে না।...

এবাড়িতে নিত্য নির্ভুল নিয়মে ঘড়ি বাজবে, নির্ভুল নিয়মে বাজার হবে, রান্না হবে, খাওয়া হবে, চায়ের কোয়ালিটি অথবা সিনেমা সংক্রান্ত একটু আলোচনা হবে, বাড়িতে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটলে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা হবে এবং আবার পরদিন রান্নাখাওয়ার ব্যবস্থায় তৎপর হবে।

আবার বলি, হায় মধুমাধব! এই তোমার জন্মাগার! এই তোমার পরিবেশ।...ছ্যাঃ।

ব্যায়াম সেরে মধুমাধব যখন চায়ের টেবিলে এসে বসে, তখন দেখতে পায় বৌদি তার পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুরের জন্যে চা ছাঁকছে। আহা দুর্গাঠাকুরের মুখের ঘামতেলের মত, মুখে কেমন একখানা ভক্তির প্রলেপ! ধন্য মহিলা তুমিই ধন্য। পুরু করে মাখন মাখাও শ্বশুরের টোস্টে।

মধু প্রতীক্ষা করে সুধামাধব তাকে কিছু বলবেন, সমালোচনা সূচক, অথবা উপদেশসূচক, কিন্তু বললেন না। কিছুদিন থেকেই যেন লক্ষ্য করছে মধুমাধব, বাবা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তার মানে এখন মধুমাধবকে দুটো পাল্‌টা জবাব শুনিয়ে দেবার স্কোপটুকুও দিতে নারাজ।

কাজেই মধুকে বাবার সামনে বসে বসে নীরবে চা খেতে হয় নিমপাতা চিবোনো মুখ নিয়ে।....শুধু বৌদির দু'একটি সমীহপূর্ণ উক্তি আর দিদির বেজার বেজার কথা কানে এসে পড়ে মনের সঙ্গে কিছুটা

কৌতুক রসের সৃজন করে। বৌদি বলে, বাড়িখানকে কিন্তু এবার একবার ভাল করে মেরামত করা দরকার বাবা, অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

আহা শ্বশুরের এই পচা পুরানো ভিটে খানার মুমূর্ষু অবস্থায় মহিলা যেন কতইনা বিচলিত! মনে মনে তো শিকলিকাটা পাখি হয়ে আকাশে উড়ছো।...স্রেফ্ বাকতাল্লা! শ্বশুরের মনোরঞ্জনের প্রয়াস।...তা শ্বশুর ঠাকুরটি তো আর তোমার মত বোকা নয় যে, এই ছলনাটুকু ধরতে পারবেন না?...তবে হ্যাঁ, ডায়লগের পিঠে একখানা ডায়ালগ তিনি বসান। বলেন, এ বাড়ি মেরামত করা আমার দ্বারা আর হবে না বৌমা!...বাপ পিতামহের কাটা ফসল খেয়ে শেষ করে বিদায় নেব। দিদি অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেজার মুখে মামাবাবু হরদম যেকথা বলে বলে যায়, সেই কথাটাই বলে বসে, 'তোমার দ্বারা হবে না' এটা তোমার স্বেচ্ছাকৃত নিরুপায়তা বাবা। এই কটা মানুষে এতোবড় বাড়িখানা দখল করে বসে না থেকে খানিকটায় ভাড়াটে বসালে, অনায়াসেই সেই টাকায় বাড়ি সারানো যেতো। আত্মস্থ পিতা অবশ্য এনিয়ে বাদ প্রতিবাদ করতে আসেন না, মৃদু হেসে বলেন, বড় ভুল হয়ে গেছে বটে। এই এক এক বগ্‌গা ঝানু আদর্শবাদী পণ্ডিতমূর্খ ব্যক্তি। সেন্টিমেন্টের খাতিরে আখের দেখল না। দিদির কথাগুলো চ্যাটাং চ্যাটাং হলেও উড়িয়ে দেবার নয়।

'ভিটেয় ভাড়াটে বসাবো না।'

অদ্ভুত একখানা গোঁ বটে।

যাকগে চুলোয় যাক।

এ বাড়ি কর্পোরেশনে ভেঙে দিয়ে গেলেও আমার কিছু এসে যাবে না। আমি তালে আছি তোমাদের এই সোনার ভারত ছেড়ে কেটে পড়তে পারা যায় কি করে। এই হতভাগা দেশে আবার মানুষে থাকে?

সুধামাধবের সংসারের দিনের প্রারম্ভের চেহারাটা মোটামুটি এই।...এরপর যে যার তালে সারাদিন ঘুরবে। ঘুরবে রাত পর্যন্ত। ফিরবে খুশীমত। খাবে যার যখন সুবিধে। পরিবারের সবাই দিনান্তে অন্ততঃ একবারও একত্রে বসে খাবে, এ বিধি এখন আর পালিত হয় না। খাবার জন্যে কোনো নিয়মবাঁধা সময় নেই।

নিয়মী সুধামাধবই শুধু যথানিয়মে রাত্তির সাড়ে নটার ঘণ্টা পড়লেই টেবিলে এসে বসে বলেন, ঠাকুর আমায় দিয়ে দাও।

প্রকাণ্ড একখানা শূন্য টেবিলের একধারে কোণ ঘেঁসে বসেন, যাতে থালাটা অন্যের না অসুবিধে ঘটায়।

ব্রজমাধবের সংসারে টেবিল ছিল না, পীড়িই সার।...সুধামাধবই এই প্রকাণ্ড টেবিলখানা বানিয়েছিলেন সবাইমিলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া দাওয়া হবে বলে। তখন তো তাঁর ছোট দুইভাইও ছিল, ললিতমাধব আর অমিয়মাধব। তাদের একজন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বসবাস করছে। আর একজন সোজাসুজি পৃথিবী ছেড়েই চলে গেছে।

তবু এরা তখন ছোট ছিল, 'বাবার সঙ্গে যাব' বলে বসে থাকতো।.. আর নীলিমা? নীলিমাও অবশ্যই। তাঁর তো তখন গুরুমন্ত্র হয়নি।

খেতে বসে যা কথা ঠাকুরের সঙ্গে।

লালটুর এ সময় নীচে বসে থাকার ডিউটি। কে কখন ফিরবে, দরজাখোলা পেতে দেরী হলে রেগে যাবে। কে কোথায় গেছে জিগ্যেস করেননা সুধামাধব, তবু ঠাকুর স্বতঃ- প্রবৃত্ত হয়ে যা জানায়, তা সুধামাধবের অজানা নয়। বড়দাদাবাবু যে অফিস ফেরৎ ক্লাবে যায়, ছোড়দাদাবাবু কোথায় না কোথায়, মা গুরুআশ্রমে কীর্তনগান শুনতে, এবং বৌদিদি আর দিদিমনি পাশের বাড়িতে টি.ভি. দেখতে ও তথ্য সুধামাধবকে পরিবেশন না করলেও চলতো।...তবু লোকটা আহার্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে ওই তথ্যগুলোও পরিবেশন করে ফেলে।

হয়তো অন্য কোনো কারণে নয় স্রেফ্ মমতার বসেই। ভালমানুষটা একা বসে খাচ্ছে, দেখে দুঃখ হয় ওর। যেন কেউ নেই ওনার।

তাই এটা ওটা কথা বলে পরিস্থিতিটা সহনীয় করে তুলতে চায়। ঠিকে ঠাকুর বটে, তবে অনেক দিনের পুরনো।

খাওয়ার পর সুধামাধব বেশ কিছুক্ষণ বইটই পড়েন।

সেটা শোবার ঘর সংলগ্ন ছোট্ট একটু ঘেরা বারান্দায়। কাচের জানালা বসানো এই ঘরবারান্দাটিতে সুধামাধবের একটা ছোট টেবিল আছে, আছে চেয়ার আর একটা টেবিল ল্যাম্প। এখানেই তাঁর পঠন পাঠন।

বারান্দাটা এমন জায়গায় যে এখানে বসে বসেই তিনি টের পাচ্ছেন, একে একে সবাই আসছে। সকলের আগে 'অমি'। শুনতে পেলেন এসেই প্রশ্ন করছে বৌদিরা ফেরেনি এখনো?

বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ শ্রীমান লালটুর প্রতি। তবে তার ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর শোনা যায় না। কিন্তু উত্তর তো নেতি বাচকই হবে।

সুধামাধব শুনতে পান ক্রুদ্ধ অমৃতমাধবের মন্তব্য, রাবিশ জিনিস এসেছে দেশে। টিভি।

সুধামাধবের মনের মুখে এক চিল্‌তে হাসি ফুটে ওঠে।

এরপর ভারী ভারী জুতোর শব্দ পান। দোতলায় উঠে এসেছে 'অমি'। ঘাড় ছোট লোকেদের কি জুতোর শব্দ একটু ভারী হয়?

নিজের ঘরে ঢুকে গেল। বলে গেল, ঠাকুর এক কাপ গরম জল দাও।

কী করবে গরম জল? ওষুধ খাবে বোধ হয়। ওই এক বাতিক আছে ওর, ওষুধ খাওয়া। কখনো ডাক্তারী, কখনো হোমিওপ্যাথি, কখনো বা কবিরাজীও। কোনো একটা চিকিৎসার অধীনে ব্যতীত যে থাকতে পারেনা।

এরপর বাড়ি ঢোকেন বাড়ির গৃহিণী।

বোধকরি একদল গুরু ভগ্নীর সঙ্গে, কলোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাস শোনা গেল দরজায়।...

'তোমার এই কাজ হয়েছে ভাই, গাড়ির মধ্যে একটি বাহিনীকে ভরে নিয়ে বাড়ি বাড়ি নামাতে নামাতে ফেরা। গাড়ি থাকার ঝকমারি।'

হয়েছে, হয়েছে, তোমাকে আর সৌজন্য করতে হবেনা বাবা! কেমন গল্প করতে করতে আসা হল। আহা, কী কের্তনই গাইলেন! কান প্রাণ দুই জুড়িয়ে গেল। একেই বলে সাধনা। ভক্ত কণ্ঠ ভিন্ন এ সুর খেলেনা।

ধমাস করে গাড়ির শব্দ হল।

গাড়িবতী চলে গেলেন।

নীলিমা উঠে এলেন হাঁসফাঁস করতে করতে। আর এসেই উঁকি দিলেন সুধামাধবের পড়ার জায়গায়।

বসা হয়েছে তো বই মুখে দিয়ে? ওঃ। জগতের আর কিছুই জানলেনা।...একদিন যদি যেতে ওখানে, বুঝতে জীবনটা কী বৃথা অপচয় করেছো।

সুধামাধব মৃদু হেসে বললেন, সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

হুঁ। জানোতো খালি সকল কথা উড়িয়ে দিতে।

নীলিমা হাতের ঝকমকে তোলা চুড়ির গোছাটা খুলতে খুলতে বলেন, রাখো ততক্ষণ এগুলো, হাত মুখ ধুয়ে আসি। টেবিলে রাখলেন।

সুধামাধব এক পলক তাকিয়ে বললেন, এই সব পরে রাত্তিরে রাস্তায় বেরোনো ভাল? আজকালতো শুনি—

নীলিমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, তবে কি পাঁচজনের আমলে দীন দুঃখীর মতন শুধু এই ক'য়া চুড়ি কটা হাতে দিয়ে যেতে হবে? একে তো—নিত্যদিন হ্যাংলার মত পরের গাড়ি চড়ে যাচ্ছি আসছি।...কতজনের যে গাড়ি আছে—

সুধামাধব একটু হাসলেন, কতজনের আবার নেইও। একজনের নৌকোয় দশজন পার হয়।

হুঁঃ। এই কথাই বলবে জানি।

চলে গেলেন পরণের চওড়া জরিপাড় শাড়ি খানি কাঁধ থেকে নামিয়ে পাট করতে করতে। বোঝা যাচ্ছে আজ বিশেষ উৎসবের দিন ছিল।

এতক্ষণে বোধহয় বাড়ির তরুণী মেয়ে দুটি ফিরল। পাতলা গলার টুকরো টুকরো কথা শোনা গেল।

ওমা! দাদা! তুমি খেতে বসে গেছ?

তা' কী করতে হবে?...অমৃতমাধবের অমৃত কণ্ঠ নিনাদ, তোমরা কখন আড্ডা দিয়ে ফিরবে সেই আশায় পেট জ্বলিয়ে বসে থাকবো?

আহা! নিজে যখন তাস খেলে দেরী করে ফেরো। দেখছিস বৌদি, দাদার ব্যাভার?

বৌদির দেখা টেখা হয়ে গেছে। তুমি দেখো।

তাই দেখছি, ঠাকুর আমাদেরও দিয়ে দাও। বৌদিকে আমাকে।...ছোট বাবু ফেরেননি তো? জানি।...ঠিক আছে। কী আর করবে? ওর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তুমি খেয়ে নিয়ে চলে যাও। লালটুকেও দিয়ে দিও।

ঘরের ভিতর থেকে নীলিমার গলা ভেসে এলো, এই খুকু। তোর যে খুব সর্দারি দেখছি। এক্ষুনি আর ওদের খেয়ে না নিলে চলবে না? আর একটু দেখুক না!

দেখে কী হবে মা? বাবুতো এসে একঘণ্টা চান করবেন। ওরা কতক্ষণ হাঁ করে বসে থাকবে?

নীলিমার বেজার গলা শোনা যায়। মেধোর কপালে রোজ এই। বাড়িসুদ্ধ সকলের এঁটো পাতের ধারে—

তা' যেমন কর্ম তেমনি ফল।

খুকু ঘরঘরিয়ে ঘরে ঢুকে যায়, বোধ হয় বাইরের সাজ ছাড়তে।

নীলিমা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

রাগী গলায় বলেন, লালটু সুদ্ধু খেতে বসলে, মেধোকে দোর খুলে দেবে কে?

এখন সুধামাধবও উঠে আসেন।

বলেন, আমি দেব।

ওরা খেতে খেতেই কড়ানাড়ার শব্দ ওঠে।

খুট্ করে একটু। এই স্টাইল মধুমাধবের, দাদার মত ভীম বেগে নাড়ে না। সুধামাধবকে দরজা খুলতে দেখে ঈষৎ অপ্রতিভ গলায় বলে, তুমি এলে? আর কেউ নেই?

সুধামাধব পাশ কাটিয়ে উত্তর দিলেন, আরে, আমাকে তো নামতেই হতো তালা লাগাতে।

চাবিটা লালটুর কাছে রেখে দিলেও তো হয়।

পাগল!

অযৌক্তিক কথা উড়িয়ে দেবার এই পদ্ধতি সুধামাধবের।

সকলের খাওয়া হয়ে যায়, সব ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নীলিমা দরজা বন্ধ করেননি বটে, চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। গুরু আশ্রমে আজ উৎসবের ভোগে প্রসাদ, রীতিমত গুরুভোজন হয়ে গেছে।

সুধামাধব সিঁড়ির কোলাপসিবলটা টেনে বন্ধ করে তালা লাগান, তালাটা টেনে দেখেন। তারপর ওদের পরিত্যক্ত একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, তার উপর দাঁড়িয়ে ঘড়িটায় দম দেন, আস্তে আস্তে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

আজ বুধবার।

দম দেবার দিন।

নতুন দম খাওয়া যন্ত্র আবার যখন 'ঢং' করে একটা ঘণ্টা মারে 'বারোটা বেজে যাওয়া' রাত্তিরের পর নতুন তারিখের ঘোষণা জানিয়ে, সেটা সত্যিই আর কারো কানে পৌঁছয় না।

ততক্ষণে বিক্ষুব্ধ অভিযোগ-ক্লান্ত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের জীব গভীর অন্ধকারের তলায় তলিয়ে গেছে একই ছাদের তলায় শুয়ে।